

মহানবী

জীবন

চরিত্র

ড. মুহাম্মদ হাফিজ হাফিজ

মহানবীর



জীবন

চরিত্র

ড. মুহাম্মদ হোসাইন হামকজ

ভারতীয় দাখিলি (সি) চরিত্র

ভারতীয় দাখিলি (সি) চরিত্র

ভারতীয় দাখিলি (সি) চরিত্র

ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল

মহানবীর (সা) জীবন চরিত

মওলানা আবদুল আউয়াল

অনূদিত

30.06.15
imahirul07@gmail.com



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

Price : Tk 450.00 : US Dollar : 22.00

মহানবীর (সা) জীবন চরিত

ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল

মাওলানা আবদুল আউয়াল অনূদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৪৪.

ইফা প্রকাশনা : ১৯১৮/৩

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩

ISBN : 984-06-0454-6

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৮

চতুর্থ সংস্করণ (রাজস্ব)

নভেম্বর ২০১৩

অগ্রহায়ণ ১৪২০

মুহররম ১৪৩৪

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

নুরুল ইসলাম মানিক

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মু. হারুনুর রশিদ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪১৬ টাকা মাত্র।

MOHANABEER (SM) JIBAN CHARIT [The Life of Hazrat Mhammad (sm)] :
Written by Dr. Muhammad Hossain Haikal in Arabic, translated by Moulana
Abdul Awal into Bangla and Published by Nurul Islam Manik, Director, Publication,
Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone :
8181538

E-mail : directorpubif@yahoo.com

Website : www.islamicfoundation.org.bd.

Price : Tk 416.00 ; US Dollar : 22.00

প্রকাশকের কথা

‘মহানবীর (সা) জীবন চরিত’ গ্রন্থটি মিসরের প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল প্রণীত ‘হায়াতে মুহাম্মদ (সা)’ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা আবদুল আউয়াল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রণীত হয়ে আসছে শত শত সীরাত গ্রন্থ। মানুষ তার চিন্তা-চেতনায় মহানবী (সা) সম্পর্কে যত কথাই লিখুক, তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চারিত্রিক মহাসাগরের কতিপয় তরঙ্গমাত্র। যেখানে গোটা কুরআনই তাঁর চরিত্র সেখানে তাঁর সম্পর্কে মানুষের নানা ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জনৈক সাহাবী কর্তৃক উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন, “তুমি কি কুরআন পড়নি? পবিত্র কুরআনই তো তাঁর অনুপম চরিত্র।” তাঁর মহান চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেন, “আপনি তো মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।” মানব জাতির হিত সাধনে মহানবী (সা)-এর দরদী হৃদয়ের ব্যাকুলতা কুরআনে প্রকাশ পেয়েছে এভাবে, “তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছেন। তোমাদের যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু’মিনদের প্রতি তিনি দয়াদ্র ও পরম দয়ালু।”

অতুলনীয় ও পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী মহানবী (সা)-এর জীবনী গ্রন্থ লেখা ও প্রকাশ করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। যুগে যুগে নবী-প্রেমিকগণ এ সৌভাগ্য অর্জনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান গ্রন্থখানি সে প্রয়াসেরই কিঞ্চিৎ ফসল।

এ গ্রন্থে লেখক প্রাচীন আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বিবরণ ঐতিহাসিক নিয়ম-নিগড়ে বিধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমকালীন আরবের পরিবেশ জানার জন্য এরূপ বর্ণনা অপরিহার্য। মহানবী (সা)-এর জীবনী বর্ণনাকালে লেখক সীরাতের প্রাচীন রীতি অনুসরণ করলেও তথ্যগত বিচার-বিশ্লেষণ তিনি যাচাই-বাছাইয়ের আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এই আধুনিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বনের কারণেই গ্রন্থখানি সীরাত গ্রন্থ জগতে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে আসছে। অন্ধ আবেগে নয় বরং তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক ও ঘটনাবলি এতে উপস্থাপন করা হয়েছে ইতিহাসের শাস্বত সত্যের মাপকাঠিতে। আমরা মনে করি, এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে গ্রন্থখানি সীরাত সমুদ্রে নয়া সংযোজন।

বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। অতি দ্রুত বইটি নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যাপক পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। সচেতন পাঠকদের পরামর্শে বইটিকে যথাসম্ভব পরিমার্জিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের আনন্দমুহূর্তে আমরা মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই।

বইটির লেখক, অনুবাদক এবং যারা বইটি প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ছিলেন আল্লাহ তা’আলা তাদের খেদমত ইবাদত হিসাবে কবুল করুন। আমীন!

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অনুবাদকের কথা

ইসলাম ব্যবহারিক ও সামাজিক ধর্ম। সমাজের প্রথম ও আদি ধাপ হলো ব্যক্তি। কাজেই ব্যক্তি যদি সৎকর্মশীল না হয়, সমাজ কখনো সৎ ও মহৎ হতে পারে না। ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত হয় সমাজ। ব্যক্তির জীবন ও সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুয়ের সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপরই মানুষের কল্যাণ ও শান্তি নির্ভরশীল। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর বাণী ও কাজের মাধ্যমে এই সমন্বয় ও সহযোগিতার পথ-নির্দেশ দিয়ে গেছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে।

চৌদ্দ শ' বছর আগে মহানবী (সা) যে জীবন-দর্শন ও জীবনের যে আদর্শ বিশ্ববাসীর সামনে স্থাপন করেছেন, আজও তা পুরনো হয়নি, হয়নি অকেজো। বর্তমান সমাজ অনেক জটিল হয়েছে, এ কথা সত্য। লোকসংখ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে দেখা দিয়েছে পূর্বে অজ্ঞাত বহু সমস্যা। মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবন আজ আর আগের মতো সরল নেই। এখন তা অনেক দুরূহ ও কঠিন হয়ে পড়েছে। মহানবী (সা)-এর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম। অন্যভাবে বলা যায়, মহানবী (সা)-এর শিক্ষা ও জীবনাদর্শই আধুনিক জীবনের বিচিত্র সমস্যা-সংকুল পথে একমাত্র আলোকবর্তিকার কাজ করতে পারে।

মহানবী (সা) সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল ছিলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণীবাহক ছিলেন; কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে মানুষ, আদর্শ মানুষ। সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য এমন কোন অসম্ভব, অস্বাভাবিক ও আজগুबी আদেশ-নির্দেশও তিনি দেননি। যে বাণী ও যে সত্য তিনি প্রচার করেছেন, নিজের জীবনে তিনি তা পালন করেছেন। পেশাদার 'প্রচারকদের' মতো তিনি শুধু অপরের জন্য উপদেশ খয়রাত করেননি। পবিত্র কোরআনে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তিনি নিজে যা উপদেশ দিয়েছেন, সবই তিনি নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন। অনেক মহাপুরুষের সাথে এখানেই তাঁর বড় তফাৎ।

নবুয়তের মর্যাদা ছাড়াও তিনি ছিলেন পুরোপুরি ঐতিহাসিক মানুষ। তাঁর সব কাজ-কর্ম, নীতি ও উপদেশ আর জীবনের সব খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ রয়েছে ইতিহাসে। তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ধারণা করার জন্য কোন প্রকার কল্পনার আশ্রয় নেয়ার দরকার নেই। তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল উন্মুক্ত আর তাঁর সাহাবারাই তা পুংখানুপুংখরূপে বর্ণনা করে গেছেন। মহানবী (সা) নিজেই বলেছেন, "আমি তোমাদের মতোই মানুষ। আমার নিকট শুধু আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়।" আর মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। তাই তিনি মানুষকেই দিয়েছেন স্বীকৃতি, সম্মান ও মর্যাদা। 'দ্বীর্ঘ মুখে এক গ্রাস খাবার তুলে দেয়াও পুণ্য', 'যে নিজের

ছেলেমেয়েকে ভালবাসে না, সে আমার কেউ নয়'। চাকরকে ক'বার ক্ষমা করতে হবে, বলেছেন, 'দিনে অন্তত সত্তর বার।' জনৈক বেদুঈন একবার মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছিল। দেখে সাহাবীরা মারমুখো হয়ে ছুটে এলেন। মহানবী (সা) বললেন, 'আগে তাকে তার কাজ শেষ করতে দাও। পরে ওখানে এক মশক পানি ঢেলে দাও। মানুষের কাজ সহজ করার জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, কঠিন করার জন্য নয়।' এভাবে মানুষ ও মনুষ্যত্বের প্রতি কি অপূর্ব শ্রদ্ধাই না তিনি দেখিয়ে গেছেন আর রেখে গেছেন সহিষ্ণুতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত।

মহানবী (সা) এতীম ছিলেন। ছিলেন অনেকটা অসহায়। তবু জীবনে কোন দিন কারো কাছে তিনি হাত পাতেননি। তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের মতো জীবিকার জন্য তিনি মেঘ চরিয়েছেন, দূরদেশে গিয়ে বাণিজ্য করেছেন। মানুষ কেন ছোট হবে, কেন অবমাননা করবে নিজের মনুষ্যত্বের! মহানবী (সা)-এর জীবন, তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশগুলো অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে, মানুষ যাতে ছোট না হয়, তার মনুষ্যত্ব যাতে লাক্ষিত না হয় এবং মানুষ যাতে সর্বতোভাবে আত্মমর্যাদার জীবন যাপন করতে পারে, সে আদর্শই তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন।

যে দেশ ও সমাজ আর যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল অত্যন্ত অধঃপতিত। তার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, কল্যাণমুখী শিক্ষা ও সর্বত্যাগী একনিষ্ঠতা যেভাবে অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁর দেশ, সমাজ ও কালকে এক মহান গৌরবের আসনে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে, তার আর একটি দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।

মহানবী (সা) বলেছেন, "গায়ের ঘাম শুকোবার আগেই শ্রমিকের মজুরী দিয়ে দাও।" "যে ব্যক্তি পেট ভরে খায়-দায় অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত সে মু'মিন নয়।" মৃত্যুশয্যা থেকে মহানবী (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে ঘরে যে অর্থ আছে তা বিলিয়ে দেয়ার আদেশ করে বললেন, "মজুদ ধন রেখে মুহাম্মদ কি করে তার হাবীবের সাথে সাক্ষাৎ করবে!" মজুদ ধন-সম্পদের প্রতি এই ছিল মহানবী (সা)-এর নির্দেশ আর এই ছিল তাঁর দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন আপসহীন ও অনমনীয়।

বাড়তি ধন-সম্পদই তো আজ পৃথিবীতে বহু অনর্থ ডেকে এনেছে। মানুষে মানুষে সৃষ্টি করেছে এক দুস্তর ব্যবধান। সৃষ্টি করেছে মালিক ও সর্বহারা। এই ব্যবধান শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও এক বিষময় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। নৈতিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছে। এমনকি সামাজিক ন্যায়বিচারকেও পক্ষপাতদুষ্ট করে তুলেছে। তাই মহানবী (সা) সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, "অতীতে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য বহু জাতির ধ্বংসের কারণ হয়েছে।"

জীবন ও জীবনের সমস্যা বুঝতে হলে, মানুষ ও সমাজকে জানতে হলে, সর্বোপরি পরকালের মুক্তির পথ সুগম করতে হলে আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান বিশৃংখলময় বিশ্বে এ ছাড়া ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির বিকল্প কোনও পথ নেই। এ কথা অপ্রিয় হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলা ভাষায় নির্ভরযোগ্য মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত বিষয়ক পুস্তকের সংখ্যা খুবই কম। দু'একটা পুস্তকে জীবন-চরিতের নামে উপন্যাস স্টাইলে সাহিত্য চর্চা করা হয়েছে। কিছু কিছু

পুস্তকের ভাষা ও পরিবেশন পদ্ধতি অত্যন্ত দুর্বল। সেগুলো আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে আকৃষ্ট করে না। তাই দীর্ঘ দিন থেকে মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত সম্পর্কে কিছু লেখার একটা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আসছিলাম। এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমি কিছু পড়াশোনা শুরু করি। এক পর্যায়ে মিসরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কলের 'হায়াতে মুহাম্মদ (সা)' শীর্ষক গ্রন্থটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থটি পৃথিবীর বিশটি ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। অবশেষে মৌলিকভাবে কোনো বই না লিখে এই গ্রন্থটি অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। 'মহানবীর (সা) জীবন চরিত' 'হায়াতে মুহাম্মদ (সা)'-এরই বাংলা অনুবাদ।

গ্রন্থটির অনুবাদ করতে গিয়ে আমাকে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবু আল্লাহ তা'আলার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আমার মতো একজন সাধারণ লোককে তিনি গ্রন্থটির অনুবাদ সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেছেন।

এক ব্যক্তির কাছ থেকে হায়াতে মুহাম্মদ (সা) গ্রন্থের একটি আরবী সংস্করণ ধার নিয়ে আমি অনুবাদ শুরু করি। অনুবাদ অর্ধেক হওয়ার পর একদিন তিনি তাঁর কিতাবটি নিয়ে যান। দীর্ঘ দিন অনুবাদ বন্ধ থাকে। অনেক চেষ্টা করেও কিতাবটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক আলী আশরাফ ওআইসি'র বণিক সমিতির এক সম্মেলন উপলক্ষে জিন্দায় যান। অনেক ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি সেখান থেকে আমার জন্য এক কপি কিতাব সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই না।

গ্রন্থের আরবী সংস্করণে মহানবীর পবিত্র নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমি এভাবে বার বার তাঁর নাম উল্লেখ করা সমীচীন মনে করিনি। আমি মূল নামের পরিবর্তে কোথাও 'মহানবী', কোথাও 'নবী করীম (সা)' লিখেছি। এ ছাড়া কোন কোন বিষয়ে আমি লেখকের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করতে পারিনি। সেসব স্থানের টীকায় আমি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরাজির অভিমত উল্লেখ করেছি। এভাবে আমি গ্রন্থটি সর্বজনগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছি। আমার দীনতম প্রচেষ্টা কতটুকু সার্থক হয়েছে পাঠক সমাজই তা বলতে পারেন।

সূচিপত্র

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা : ২৯-৫৬

হযরত মুহাম্মদ (সা)	২৯
ইসলামের বিজয়	২৯
ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম	৩০
ইসলামে হযরত ঈসা (আ)-এর মর্যাদা	৩১
খৃষ্টীয় গোঁড়ামি ও হযরত মুহাম্মদ (সা)	৩১
ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের প্রাথমিক নীতিমালা	৩৩
মুসলমান ও খৃষ্টানদের বিরোধ	৩৫
মহানবী (সা)-এর সাথে খৃষ্টানদের বহস	৩৭
হযরত ঈসা (আ)-কে শূলে চড়ানোর ঘটনা	৪০
মুসলমান ও রোমান খৃষ্টান	৪১
খৃষ্টান লেখকদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা)	৪২
ইসলামের প্রতি খৃষ্টানদের শত্রুতার কারণ	৪৪
সাম্রাজ্যবাদী লোভে ইসলামের বিরোধিতা	৪৬
ইসলাম ও মুসলিম জাতি	৪৭
মুসলমানদের দৃষ্টিতে অনুকরণ ও গবেষণা	৪৮
প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন	৪৯
গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য	৫১
পবিত্র কোরআন উত্তম উৎস	৫২
আলোচনার সূচনা	৫৪
গবেষণার ফল	৫৫

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা : ৫৭-১০০

গ্রন্থের সমীক্ষা	৫৭
প্রাচ্যবিদদের অভিযোগের জবাব	৫৮
মিসরীয় প্রবন্ধকারের সমালোচনা	৫৮
প্রাচ্যবিদদের ভুল-ভ্রান্তির কারণ	৫৯
প্রাচ্যবিদ ও ধর্মের নীতিমালা	৬১

কোরআন বিকৃতির মিথ্যা অভিযোগ	৬১
উইলিয়াম ম্যুরের অভিযত	৬৩
নবী করীম (সা)-এর আমলে লিখিত কোরআন	৬৪
পবিত্র কোরআনের প্রথম সংকলন	৬৫
ওসমানী সংস্করণ	৬৫
ওসমানী সংস্করণের পরিপূর্ণতা	৬৭
ইসলামের প্রতি আক্রমণ	৭০
গবেষণার উত্তম পস্থা	৭০
মৃগীর অভিযোগ	(১৫) নবী করীম (সা) ৭১
জ্ঞানের ক্রটি-বিচ্যুতি	৭৩
নবী করীম (সা)-এর দোষ অনুসন্ধান	৭৪
মুসলমানদের সমালোচনা	৭৫
দরুদ ও সালাম	৭৬
প্রাচ্যবিদদের সমালোচনা উল্লেখের অভিযোগ	(১৫) নবী করীম (সা) ও দীর্ঘাণি ৭৭
হাদীস ও জীবন-চরিত বিষয়ক গ্রন্থরাজি	৭৭
প্রাচীন গ্রন্থরাজির বৈপরীত্য	৭৮
গ্রন্থ রচনায় যুগের প্রভাব	৭৯
রাজনৈতিক কলহের প্রভাব	৮০
হাদীস সংকলনের সূচনা	৮১
বিশুদ্ধ হাদীসের নিরিখ	(১৫) নবী করীম (সা) ও দীর্ঘাণি ৮২
মামুনের আমলে হাদীস সংকলন	৮৪
পবিত্র কোরআন ও মু'জিয়া	৮৬
শ্রেষ্ঠতম মু'জিয়া	৮৮
রাসূলের আমলের মুসলমান	৯১
গারানিক বা প্রতিমা ও তাবুকের ঘটনা	৯২
আমার আলোচনা পদ্ধতি	৯৫
প্রাচ্যবিদদের আলোচনা পদ্ধতি	৯৬
মুসলমান ও ইসলামী গবেষণা	৯৭

প্রথম অধ্যায়

প্রাক-ইসলামী যুগের আরব : ১০৩-১২২

মানব সভ্যতার সূতিকাগার	১০৩
ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর উপকূল	১০৩
খৃষ্টীয় ও যরথুষ্ট্রীয় ধর্ম	১০৪
রোমের উত্তরাধিকারী বাইজেন্টাইন	১০৫
খৃষ্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্তি	১০৬

যরথুস্ত্র ধর্মের অবক্ষয়	১০৭
দুই বৃহৎ শক্তির মাঝে আরব উপদ্বীপ	১০৭
আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান	১০৮
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	১০৯
মক্কার শাসক	১০৯
বাণিজ্য কাফেলার পথ	১০৯
ইয়ামন সভ্যতা	১১১
ইয়ামনে ইহুদী ও খৃষ্টান	১১১
ইরানের ইয়ামন অধিকার	১১৪
ইরানে শেরবিয়া শাসন	১১৪
মাআরেব বাঁধের ধ্বংস	১১৫
আরব উপদ্বীপের সমাজ ব্যবস্থা	১১৬
যাযাবর রীতি-নীতি	১১৭
আরবদের মূর্তিপূজা	১১৭
ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম	১১৮
পৌত্তলিকতা	১২০
মক্কার গুরুত্ব	১২১

০৮৫-৩৫ : হাদিসী ক্যান্ডি (১৫) লালচন্দ্র হুসাইন

দ্বিতীয় অধ্যায়

মক্কা, কা'বা ও কুরাইশ : ১২৩-১৫০

মক্কার ভৌগোলিক অবস্থান	১২৩
হযরত ইবরাহীম (আ)	১২৩
মিসরে হযরত ইবরাহীম (আ) ও বিবি সারা	১২৬
কোরআনে কোরবানীর ঘটনা	১২৬
ঐতিহাসিক বর্ণনার আলোকে কোরবানী	১২৮
স্ত্রী-পুত্র নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মক্কা গমন	১২৮
আবে যমযম	১২৮
হযরত ইসমাইল (আ)-এর বিবাহ	১২৯
বর্ণনারাজির বৈপরীত্য	১৩০
আরবে নক্ষত্রপূজা	১৩২
আরবের নবীগণ	১৩৩
কা'বাঘর ও বিভিন্ন দায়িত্ব	১৩৪
কুসাইর আগে মক্কার অবস্থা	১৩৫
কুরাইশদের বিজয়	১৩৬
কুসাই ইবনে কিলাব	১৩৬
খোয়ায়া গোত্র ও কুসাই	১৩৭

মক্কায় বাসস্থান নির্মাণ	১৩৭
কুসাইর সন্তান	১৩৮
আবদে মান্নাফের সন্তান-সন্ততি	১৩৮
হাশিম ইবনে আবদে মান্নাফ	১৩৯
মক্কার সামাজিক জীবন	১৩৯
আবদুল মোত্তালিব	১৪০
যমযম কূপ খনন	১৪১
মানত ও তা পূরণ	১৪২
আমুল ফিল বা হাতির বছর (খৃ. ৫৭০)	১৪৪
আবরাহা ও কা'বা	১৪৫
হাতির ঘটনার পর মক্কার মর্যাদা	১৪৬
মক্কাবাসীদের ঘরবাড়ি	১৪৭
আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিব	১৪৮
বংশ তালিকা	১৫০

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ (সা) জন্ম থেকে বিবাহ : ১৫১-১৭০

আবদুল্লাহর সাথে আমেনার বিবাহ	১৫১
আবদুল্লাহর ইন্তেকাল ও তাঁর সম্পদ	১৫১
নবী করীমের জন্ম (খৃ. ৫৭০)	১৫২
দুগ্ধপান	১৫৩
হালিমা সাদিয়া	১৫৪
বক্ষ বিদারণ	১৫৫
মরুভূমিতে হযরত মুহাম্মদ (সা)	১৫৭
আবদুল মোত্তালিবের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ	১৫৭
সাইয়েদা আমেনার ইন্তেকাল	১৫৮
আবদুল মোত্তালিবের ইন্তেকাল	১৫৯
আবু তালেবের লালন-পালন	১৫৯
সিরিয়ায় প্রথম সফর	১৬০
ফুজ্জারের যুদ্ধ	১৬২
হিলফুল ফযুল	১৬৪
চিন্তাভাবনার জীবন	১৬৫
বিবি খাদীজার ব্যবসায়ে মহানবী (সা)	১৬৭
সফরে যাত্রা	১৬৮
খাদীজার সাথে বিবাহ	১৬৯

চতুর্থ অধ্যায়

দাম্পত্য জীবন থেকে নবুয়ত লাভ : ১৭১ - ১৮২

দেহাকৃতি ও বৈশিষ্ট্য	১৭১
কা'বার পুনর্নির্মাণ	১৭২
হাজরে আসওয়াদ স্থাপন	১৭৩
কুরাইশ নেতৃবর্গ ও মূর্তিপূজা	১৭৪
মহানবী (সা)-এর সন্তান-সন্ততি	১৭৬
মহানবী (সা)-এর কন্যা সন্তান	১৭৭
নির্জন হিরা গুহায় ধ্যান	১৭৭
সত্য স্বপ্ন	১৭৯
ওহীর সূচনা	১৮০

পঞ্চম অধ্যায়

নবুয়ত থেকে হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ : ১৭১-২১৪

হযরত খাদীজা ও ওয়ারাকা ইবনে নওফেল	১৮৩
ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের সাক্ষাৎ	১৮৫
ওহীর বিরতি	১৮৬
ওহী নাযিল পুনরারম্ভ	১৮৬
ইসলামের প্রতি আহ্বান ও প্রচার	১৮৭
নামায	১৮৮
হযরত আলী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ	১৮৯
হযরত আবু বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ	১৮৯
প্রাথমিক মুসলমান	১৯০
মুসলমান ও কুরাইশ	১৯০
আত্মীয়দের ইসলামের দাওয়াত	১৯১
ইসলামের প্রচার	১৯২
কুরাইশ কবি	১৯৪
মু'জিবার দাবি	১৯৪
প্রতিমাদের নিন্দা	১৯৫
ইতিহাসের দু'ধারা	১৯৭
বনু হাশিমের সমর্থন	১৯৮
কুরাইশদের নির্যাতন	১৯৯
শত্রুর নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ	২০০
আহ্বানের সারকথা	২০২
হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণ	২০৪
উতবা ইবনে রবীআর বার্তা	২০৫

আবিসিনিয়ায় হিজরত	২০৬
নাঈশাশীর দরবারে কুরাইশ দূত	২০৭
নাঈশাশী ও অমাত্যদের জবাব	২১০
মুসলমান ও খ্রিষ্টধর্ম	২১০
ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব	২১১
হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ	২১২

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রতিমাদের ঘটনা : ২১৫-২২৫

আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন	২১৫
প্রতিমাদের ঘটনার মূলকথা	২১৭
প্রাচ্যবিদদের কর্মধারা	২১৮
অভিযোগ খণ্ডন	২১৮
আবিসিনিয়ার বিদ্রোহ	২১৯
ভিত্তিহীন প্রমাণাদি	২২০
প্রতিমাদের ঘটনার পর্যালোচনা	২২১
সূরা নজমের পূর্বাপর ভাষ্য	২২১
মহানবী (সা)-এর সত্যবাদিতা	২২২
তাওহীদের প্রতি মিথ্যা আরোপ	২২৪

সপ্তম অধ্যায়

কুরাইশদের নতুন ষড়যন্ত্র : ২২৬-২৪২

বিরোধী প্রচারণা	২২৭
নযর ইবনে হারেস	২২৯
খ্রিষ্টান জাবর	২২৯
তোফায়েল ইবনে আমর দোসী	২৩০
আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল ও আখনাস	২৩১
গ্রহণ থেকে বিরত থাকা	২৩৫
হিংসা-বিদ্বেষ ও ঈর্ষা	২৩৬
পরকাল ও হিসাব-নিকাশের ভয়	২৩৮
কুরাইশ ও বেহেশত-দোষখ	২৪০
কল্যাণ ও অকল্যাণের ধারণা	২৪১

অষ্টম অধ্যায়

চুক্তিপত্র বিনষ্ট থেকে মি'রাজ : ২৪৩-২৬০

বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের প্রতি আহবান	২৪৩
-------------------------------------	-----

শেয়াবে আবু তালেবে নজরবন্দী জীবন
আবু তালেব ও হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তেকাল
কুরাইশদের নিপীড়ন বৃদ্ধি
তায়েফ সফর
খৃষ্টান ত্রীতদাস আদাস
আরবের বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের প্রতি আহবান
হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে বিবাহ
মি'রাজ
মি'রাজ আত্মিক না শারীরিক
সীরাত গ্রন্থাবলিতে বিধৃত মি'রাজের চিত্র
ইবনে হিশামের বর্ণনা
মি'রাজ ও অদ্বিতীয় সত্তা
মি'রাজ ও আধুনিক জ্ঞান
কুরাইশদের ভূমিকা
শারীরিক মি'রাজ

জীবন চরিত্র চর- (১৮) জিহাদ ২৪৩
হাজরত ২৪৭
দ্বিতীয় ককীলিয়ার ২৪৮
জীবন চরিত্র চর- (১৯) ২৪৯
জিহাদ চরিত্র ২৫০
দ্বিতীয় হাজরত চরিত্র ২৫০
হাজরত চরিত্র ২৫১
ককীলিয়ার চরিত্র ২৫২
হাজরত চরিত্র ২৫২
জিহাদ চর- (২০) জিহাদ চরিত্র ২৫৩
২৫৫
২৫৭
২৫৮
২৫৯
২৫৯

নবম অধ্যায়

আকাবায় দুটো চুক্তি : ২৬১-২৭৪

মি'রাজের প্রতিক্রিয়া
ইয়াসরিব থেকে সাহায্য
আউস ও খায়রাজ
ইহুদীদের সংস্রবের প্রভাব
সোয়াইদ ইবনে সামেতের ঘটনা
আয়াস ইবনে মুআয
বুয়াছের যুদ্ধ
ইয়াসরিবে ইসলামের সূচনা
আকাবায় প্রথম বায়'আত
হিজরত প্রসঙ্গে
আকাবায় দ্বিতীয় বায়'আত
বায়'আতের প্রাক্কালে আলোচনা
কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া
হিজরত ও কুরাইশ

গাইনি নাজদীয় চরিত্র চর- (২১) ২৬১
জিহাদ চরিত্র চর- (২২) ২৬২
জিহাদ চরিত্র চর- (২৩) ২৬৩
জিহাদ চরিত্র ২৬৪
জিহাদ চরিত্র ২৬৪
জিহাদ চরিত্র চর- (২৪) ২৬৫
জিহাদ চরিত্র চর- (২৫) ২৬৫
জিহাদ চরিত্র ২৬৬
জিহাদ চরিত্র চর- (২৬) ২৬৭
জিহাদ চরিত্র চর- (২৭) ২৬৭
জিহাদ চরিত্র চর- (২৮) ২৬৯
জিহাদ চরিত্র চর- (২৯) ২৭০
জিহাদ চরিত্র চর- (৩০) ২৭১
জিহাদ চরিত্র চর- (৩১) ২৭৩
জিহাদ চরিত্র চর- (৩২) ২৭৩

দশম অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজরত : ২৭৫-২৮৬

হিজরতের অনুমতি

জিহাদ চরিত্র চর- (৩৩) ২৭৫
জিহাদ চরিত্র চর- (৩৪) ২৭৫

হযরত আলী (রা)-এর জীবন বাজি
ছওর গুহায়
গুহার অলৌকিক ঘটনা
মু'জিয়া ও জীবন-চরিত গ্রন্থরাজি
ইয়াসরিবের পথে
সুরাকা ইবনে জু'শুমের ঘটনা
রাস্তায় দুর্বিষহ গরম
ইয়াসরিবে মুসলমানদের প্রতীক্ষা
ইয়াসরিবে ইসলাম প্রচার
ইয়াসরিবে মহানবী (সা)-এর প্রবেশ

একাদশ অধ্যায়

মদীনায প্রাথমিক দিনগুলো : ২৮৭-৩১৪

প্রাণঢালা সংবর্ধনা
মসজিদে নববী ও রাসূলের বাসস্থান নির্মাণ
চিত্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা
যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা
মদীনাবাসীদের ধ্যান-ধারণা
মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক
ইহুদীদের সাথে চুক্তি
চুক্তির বিবরণ
রাজনৈতিক বিজয়
রাসূল (সা)-এর গৃহে হযরত আয়েশা (রা)-এর আগমন
যাকাত ও রোযার বিধান
আযান প্রবর্তন
ইসলামী তামাদুনের বুনিয়াদ
ভ্রাতৃত্বের বাস্তব রূপ
জীবের প্রতি দয়া
ইনসাফ ও ন্যায়বিচার
তাকওয়া ও নির্লোভ জীবন
ইহুদীদের বিরোধিতা
নবী করীম (সা) ও ইহুদী
আউস ও খায়রাজ
ফিনহাসের কাহিনী
নাজরানের প্রতিনিধি

হযরত আলী (রা)-এর জীবন বাজি	২৭৫
ছওর গুহায়	২৭৬
গুহার অলৌকিক ঘটনা	২৭৮
মু'জিয়া ও জীবন-চরিত গ্রন্থরাজি	২৭৮
ইয়াসরিবের পথে	২৭৯
সুরাকা ইবনে জু'শুমের ঘটনা	২৮১
রাস্তায় দুর্বিষহ গরম	২৮২
ইয়াসরিবে মুসলমানদের প্রতীক্ষা	২৮২
ইয়াসরিবে ইসলাম প্রচার	২৮৩
ইয়াসরিবে মহানবী (সা)-এর প্রবেশ	২৮৫
একাদশ অধ্যায়	
মদীনায প্রাথমিক দিনগুলো : ২৮৭-৩১৪	
প্রাণঢালা সংবর্ধনা	২৮৭
মসজিদে নববী ও রাসূলের বাসস্থান নির্মাণ	২৮৮
চিত্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা	২৮৯
যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা	২৮৯
মদীনাবাসীদের ধ্যান-ধারণা	২৯০
মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক	২৯১
ইহুদীদের সাথে চুক্তি	২৯৩
চুক্তির বিবরণ	২৯৪
রাজনৈতিক বিজয়	২৯৬
রাসূল (সা)-এর গৃহে হযরত আয়েশা (রা)-এর আগমন	২৯৭
যাকাত ও রোযার বিধান	২৯৭
আযান প্রবর্তন	২৯৭
ইসলামী তামাদুনের বুনিয়াদ	২৯৯
ভ্রাতৃত্বের বাস্তব রূপ	৩০০
জীবের প্রতি দয়া	৩০১
ইনসাফ ও ন্যায়বিচার	৩০১
তাকওয়া ও নির্লোভ জীবন	৩০২
ইহুদীদের বিরোধিতা	৩০৫
নবী করীম (সা) ও ইহুদী	৩০৬
আউস ও খায়রাজ	৩০৬
ফিনহাসের কাহিনী	৩০৮
নাজরানের প্রতিনিধি	৩১০

তিনটি ধর্মীয় সম্মেলন
কুরাইশ ও মক্কা

দ্বাদশ অধ্যায়

সামরিক বাহিনী ও প্রাথমিক যুদ্ধ-বিগ্রহ : ৩১৫-৩২৯

মদীনায় মুসলমানদের রাজনীতি

সৈন্যদল গঠন

নবী করীম (সা)-এর সফর

প্রাথমিক যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের অভিমত

আমাদের অভিমত

কুরাইশ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ

আনসার ও যুদ্ধ-বিগ্রহ

মদীনাবাসীদের স্বভাব

ইহুদীদের ভীতি প্রদর্শন

ইহুদীদের ষড়যন্ত্র

ইসলাম ও যুদ্ধ

আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের বাহিনী

বিশৃঙ্খলা রক্তপাতের চেয়ে খারাপ

আল্লাহর পথে জিহাদ

খৃষ্টধর্ম ও যুদ্ধ

মুসলমান ও খৃষ্টান মনীষী

স্বভাবজাত ধর্ম ইসলাম

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বদর যুদ্ধ : ৩৩০-৩৫৫

আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা

বদরের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের যাত্রা

কানানা ও কুরাইশদের পুরনো শত্রুতা

মুসলমানদের যাত্রা

হযরত সাআদ ইবনে মুআযের ভাষণ

মহানবী (সা)-এর প্রজ্ঞা

আবু সুফিয়ানের পলায়ন

বদরে মুসলমানদের আগমন

ছাউনী নির্মাণ

মুসলমানদের ঈমানী শক্তি

যুদ্ধের সূচনা

আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা	৩৩৯
উমাইয়া ইবনে খালফের পরিণতি	৩৪২
গনীমতের সুষম বণ্টন	৩৪৫
দু'জন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা	৩৪৭
মদীনায় বিজয় সংবাদ	৩৪৭
বদরের যুদ্ধবন্দী	৩৪৮
বন্দীদের সম্পর্কে মতপার্থক্য	৩৪৯
প্রাচ্যবিদদের সমালোচনা	৩৫২
মক্কায় পরাজয়ের খবর	৩৫৩
বদরে নিহতদের শোক	৩৫৫

চতুর্দশ অধ্যায়

বদর থেকে ওহদ : ৩৫৬-৩৬৭

বদর যুদ্ধের প্রভাব	৩৫৬
ইহুদীদের বিরোধিতা	৩৫৬
আবু ইফ্ক ও আসমার হত্যা	৩৫৭
কাআব ইবনে আশরাফের হত্যা	৩৫৮
ইহুদীদের শত্রুতা	৩৫৯
বনী কায়নুকা গোত্র অবরোধ	৩৫৯
আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর আবদার	৩৬০
মদীনা থেকে ইহুদীদের নির্বাসন	৩৬০
মদীনায় রাজনৈতিক প্রাধান্য	৩৬১
ছাতুর যুদ্ধ	৩৬১
সিরিয়ায় বাণিজ্য সফর	৩৬২
মুসলমানদের সম্পর্কে বিভিন্ন আরব গোত্রের ভয়-ভীতি	৩৬৩
ইহুদীদের ভীতি	৩৬৪
কুরাইশদের বাণিজ্যিক দুরবস্থা	৩৬৪
মহানবী (সা)-এর সাথে হযরত হাফসার বিবাহ	৩৬৬

পঞ্চদশ অধ্যায়

উহদের যুদ্ধ : ৩৬৮-৩৮৫

কুরাইশদের প্রতিশোধস্পৃহা	৩৬৮
কুরাইশ বাহিনীর যাত্রা	৩৬৯
হযরত আব্বাসের দূত	৩৭০
রণাঙ্গন সম্পর্কে মতবিরোধ	৩৭১
বীরত্ব ও শাহাদাত	৩৭২
মুসলমানদের কাতারবন্দী	৩৭৪

হযরত আবু দুজানার বীরত্ব	৩৭৫
হযরত হামযার শাহাদাত	৩৭৭
বিশ্বাস ও ঈমানের শক্তি	৩৭৯
বিজয়ের পর পরাজয়	৩৭৯
মুসলমানদের মরণপণ সংগ্রাম	৩৮১
উহদের শহীদদের দাফন	৩৮৪
কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবন	৩৮৪

ষোড়শ অধ্যায়

উহদ যুদ্ধের পরিণাম : ৩৮৬-৪০০

উহদ যুদ্ধের পর	৩৮৬
বনী আসাদ গোত্রে অভিযান	৩৮৬
খালিদ হুযালী	৩৮৭
রাজীর ঘটনা	৩৮৮
হযরত খোবায়ের (রা)-এর শাহাদাত	৩৮৯
মাউনা কূপের ঘটনা	৩৯০
মদীনার মোনাফেক ও ইহুদী	৩৯১
ইহুদীদের ষড়যন্ত্র	৩৯২
আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর ঔদ্ধত্য	৩৯৩
বনী নযীরদের অবরোধ	৩৯৪
বনু নযীরদের নির্বাসন	৩৯৫
নবী করীম (সা)-এর লেখক	৩৯৬
দ্বিতীয় বদর	৩৯৭
যাতুর রিকা'র অভিযান	৩৯৯
দুমাতুল জান্দাল অভিযান	৪০০

সপ্তদশ অধ্যায়

রাসূলে করীম (সা)-এর সহধর্মিণীগণ : ৪০১-৪১৫

যয়নব বিনতে জাহশ ও প্রাচ্যবিদগণ	৪০১
পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত একই স্ত্রী	৪০৫
হযরত সাওদার সাথে বিবাহ	৪০৭
হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা)	৪০৭
হযরত যয়নব বিনতে খোযায়মা	৪০৮
হযরত উম্মে সালামা	৪০৮
ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফল	৪০৯
হযরত যয়নব বিনতে জাহশের ঘটনা	৪১০
হযরত য়ায়েদের সাথে বিয়ে	৪১১

খন্দকের যুদ্ধ ও বনু কোরায়যা : ৪১৬-৪৩৬

ইহুদীদের চরম শত্রুতা	৪১৭
ইহুদীদের দূত	৪১৭
ইসলামের উপর পৌত্তলিকতার প্রাধান্য	৪১৮
এক ইহুদী ঐতিহাসিকের সমালোচনা	৪১৮
বিভিন্ন আরব গোত্রে যুদ্ধের আন্দোলন	৪১৯
মুসলমানদের ভয়-ভীতি	৪১৯
পরিখা দেখে কুরাইশদের বিস্ময়	৪২০
কাফের বাহিনীর শীত-ভীতি	৪২১
হুয়াই ইবনে আখতাবের চাল	৪২২
বনু কোরায়যা ও মহানবী (সা)-এর দূত	৪২৩
আরব বাহিনীর সাহস	৪২৩
মদীনায় অন্তরীণ মুসলমানদের উদ্বেগ	৪২৪
কাফেরদের আক্রমণ	৪২৫
ইহুদীদের ঔদ্ধত্য	৪২৫
নাসিম ইবনে মাসউদের রাজনীতি	৪২৭
মক্কাভাড়া	৪২৮
পরিস্থিতির মূল্যায়ন	৪২৯
বনু কোরায়যা অভিযান	৪৩০
অবরোধ	৪৩১
কাআব ইবনে আসাদের অতিমত	৪৩১
সাআদ ইবনে মুআযের সালিসি	৪৩২
বধ্যভূমিতে ইহুদীদের মনোবল	৪৩৩
বনু কোরায়যাদের হত্যার দায়-দায়িত্ব	৪৩৪
বনু কোরায়যাদের সম্পদ বন্টন	৪৩৫

উনিশতম অধ্যায়

বনু কোরায়যার যুদ্ধ থেকে হোদায়বিয়ার সন্ধি : ৪৩৭-৪৬০

নারী-পুরুষের সম্পর্ক	৪৩৮
আরবে নারীর মর্যাদা	৪৩৯
ইসলাম ও সমাজ-সংস্কার	৪৪০
সৌন্দর্য প্রদর্শনের নিন্দা	৪৪১
রাসূলের প্রতি আদব	৪৪৪
বনু লিহইয়ান অভিযান	৪৪৬
যী-সারাদ অভিযান	৪৪৭

বনী মুসতালিক বা মুরায়সীর যুদ্ধ	৪৪৮
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর হিংসা-বিদ্বেষ	৪৫০
হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ	৪৫২
গনীমতের মাল বণ্টন	৪৫৩
উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়াহ্ (রা)	৪৫৩
মিথ্যা অপবাদের কাহিনী	৪৫৪
মহানবী (সা)-এর উদ্বেগ	৪৫৪
হযরত আয়েশা (রা)-এর অসুস্থতা	৪৫৫
হযরত আয়েশা (রা)-কে অপবাদ সম্পর্কে অবহিতকরণ	৪৫৬
মহানবী (সা)-এর পরামর্শ	৪৫৬
হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসাবাদ	৪৫৭
ওহী	৪৫৮
উইলিয়াম ম্যুরের অভিমত	৪৬০
অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার পর	৪৬০

বিশতম অধ্যায়

হোদায়বিয়ার সন্ধি : ৪৬১-৪৮০

বায়তুল্লাহর যিয়ারতে বাধা	৪৬১
মাতৃভূমির আকর্ষণ	৪৬৩
আরব ও কা'বাঘর	৪৬৩
কা'বাঘর ও মুসলমান	৪৬৪
হজ্জের ঘোষণা	৪৬৪
অমুসলিম গোত্রগুলোকে হজ্জের দাওয়াত	৪৬৫
মুসলমানদের হজ্জ ও কুরাইশ	৪৬৬
উভয় বাহিনীর মুখোমুখি	৪৬৮
উভয় পক্ষের দূরদর্শিতা	৪৬৮
উরওয়া ইবনে মাসউদের প্রতিনিধিত্ব	৪৬৯
রাসূল (সা)-এর দূতের সাথে দুর্ব্যবহার	৪৭০
দূত হিসাবে হযরত ওসমান (রা)	৪৭১
বায়'আতে রেদওয়ান	৪৭১
কুরাইশদের বার্তা	৪৭২
উভয় পক্ষের আলোচনা অব্যাহত	৪৭৩
সন্ধির ধারা	৪৭৪
মহানবী (সা)-এর সন্ধি প্রস্তাব অনুসরণ	৪৭৪
হোদায়বিয়ার সন্ধি স্পষ্ট বিজয়	৪৭৬
আবু বাসীরের ঘটনা	৪৭৭

মুসলিম মুহাজির মহিলাদের ব্যাপার
মহানবী (সা)-এর কর্মধারা

একুশতম অধ্যায়

খায়বরের যুদ্ধ ও বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরণ : ৪৮১-৫০২

ইসলামের দাওয়াত	৪৮১
শরাবের প্রতি নিষেধাজ্ঞা	৪৮১
রোম ও ইরান সাম্রাজ্য	৪৮৪
মহানবী (সা)-এর দূত	৪৮৫
ইরান ও বাইজেন্টাইন	৪৮৬
বস্তু ও আত্মার সমন্বয়	৪৮৭
ইহুদীদের উৎখাত	৪৮৮
খায়বর যুদ্ধের প্রস্তুতি	৪৮৮
ইহুদীদের হতবুদ্ধিতা	৪৮৯
খায়বর অবরোধ	৪৯০
ইহুদীদের হতাশা	৪৯৩
ইহুদী সন্ধির অবসান	৪৯৩
ফাদাকের ইহুদী	৪৯৪
ওয়াদিউল কোরার আনুগত্য	৪৯৪
বিষ-মেশানো মাংস	৪৯৫
হিরাক্রিয়াসের জবাব	৪৯৮
কিসরা বা পারস্য সম্রাটের আচরণ	৪৯৮
মুকাওকেসের জবাব	৪৯৯
নাজ্জাশীর জবাব	৫০০
জবাবের ধরন	৫০০
আবিসিনিয়া থেকে মুসলমানদের প্রত্যাবর্তন	৫০২

বাইশতম অধ্যায়

ওমরাতুল কাযা : ৫০৩-৫০৮

কুরাইশদের মক্কা ত্যাগ	৫০৪
মক্কায় তিন দিন	৫০৫
মহানবী (সা)-এর সাথে হযরত মায়মুনার বিবাহ	৫০৬
মুসলমানদের মদীনা রওয়ানা	৫০৬
খালেদ ইবনে ওয়ালীদে ইসলাম গ্রহণ	৫০৭
আমর ইবনে আস ও ওসমান ইবনে তালহার ইসলাম গ্রহণ	৫০৮

মুতার যুদ্ধ	৫১০
যুদ্ধের প্রস্তুতি	৫১০
যায়েদ ইবনে হারেসার শাহাদাত	৫১১
জা'ফর ইবনে আবু তালেবের শাহাদাত	৫১২
আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদাত	৫১২
খালিদ ইবনে ওয়ালীদেদের সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ	৫১৩
শহীদদের আত্মীয়দের শোক	৫১৪
যাতুস্ সালাসিল অভিযান	৫১৫

আরবের উত্তরাংশে ইসলামের প্রসার	৫১৭
হোদায়বিয়ার সন্ধি লংঘন	৫১৮
নবী করীম (সা)-এর নিকট খোয়াআদের সাহায্য প্রার্থনা	৫১৯
কুরাইশ নেতাদের ভয়	৫১৯
মদীনায় আবু সুফিয়ান	৫২০
মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি	৫২১
হাতিব ইবনে আবী বালতাআর চিঠি	৫২১
মুসলিম বাহিনীর মক্কা রওয়ানা	৫২২
বনু হাশিমের ইসলাম গ্রহণ	৫২৩
হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিব	৫২৪
আবু সুফিয়ানের গোয়েন্দাগিরি	৫২৪
নবী করীম (সা)-এর দরবারে আবু সুফিয়ান	৫২৫
এসব ঘটনা কি আকস্মিক !	৫২৬
মহানবী (সা)-এর মক্কা প্রবেশের কৌশল	৫২৭
সৈন্যদের বিন্যাস	৫২৮
মক্কায় প্রবেশ	৫২৯
সাধারণ ক্ষমা	৫৩১
কা'বাঘরের ছবি	৫৩১
কা'বাঘর প্রতিমা থেকে পবিত্রকরণ	৫৩২
আনসারদের ভয়	৫৩২
অনুশোচনাকারীদের ক্ষমা প্রদর্শন	৫৩৩
মক্কাতে নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা	৫৩৪
বনু জুযায়মার উদ্দেশে	৫৩৫

পঁচিশতম অধ্যায়

হুনায়েন ও তায়েফ : ৫৩৭-৫৫১

হাওয়ায়েনদের মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি	৫৩৭
মুসলমানদের হুনায়েন অভিযান	৫৩৮
মহানবী (সা)-এর দৃঢ়তা	৫৩৯
হযরত আব্বাসের বজ্রধ্বনি	৫৪০
মুসলমানদের প্রত্যাভর্তন ও বিজয়	৫৪০
শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন	৫৪১
মুশরিকদের পুরোপুরি পরাজয়	৫৪২
বিজয়ের মূল্য	৫৪৩
তায়েফ অবরোধ	৫৪৪
তায়েফের মসজিদ	৫৪৪
বনু হাওয়ায়েন প্রতিনিধিদল	৫৪৬
হাওয়ায়েন বন্দীদের ফেরত দান	৫৪৮
আনসার ও নতুন মুসলমানদের দান	৫৪৯

ছাব্বিশতম অধ্যায়

ইবরাহীম ও রাসূলের সহধর্মিণীগণ : ৫৫২-৫৬৬

আরবে মক্কা বিজয়ের প্রভাব	৫৫২
কাআব ইবনে যোহায়রের ঘটনা	৫৫৩
মহানবী (সা)-এর দরবারে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি	৫৫৩
হযরত যয়নবের ইন্তেকাল	৫৫৪
ইবরাহীমের জন্ম	৫৫৫
মারিয়া কিবতিয়া ও অন্যান্য সহধর্মিণী	৫৫৬
নবী করীম (সা) ও তাঁর সহধর্মিণীগণ	৫৫৬
উম্মুল মু'মিনীনদের পারস্পরিক পরামর্শ	৫৫৮
মহানবী (সা)-এর নিকট উম্মুল মু'মিনীনদের অভিযোগ	৫৫৯
হযরত যয়নব ও আয়েশার ঝগড়া	৫৬০
উম্মুল মু'মিনীনদের মন-কষাকষির পরিণতি	৫৬১
স্ত্রীদের সংস্রব পরিত্যাগ	৫৬১
হযরত ওমরের পদক্ষেপ	৫৬২
সমালোচনার কষ্টিপাথরে	৫৬৩
প্রাচ্যবিদদের সমালোচনার জবাব	৫৬৫

সাতাশতম অধ্যায়

তাবুকের যুদ্ধ ও ইবরাহীমের ইন্তেকাল : ৫৬৭-৫৮১

যাকাত ও খাজনা নির্ধারণ	৫৬৭
------------------------	-----

রোমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি	৫৬৯
মুসলমানদের মধ্যে আহ্বানের প্রভাব	৫৬৯
মোনাফেকদের বিরোধিতা	৫৭০
দরিদ্র বাহিনীর প্রস্তুতি	৫৭১
সৈন্যবাহিনীর রওয়ানা	৫৭২
হিজর নামক স্থানে যাত্রাবিরতি	৫৭৩
রোমানদের প্রত্যাবর্তন	৫৭৩
সীমান্তবাসীদের সাথে চুক্তি	৫৭৪
হযরত খালিদের দূমা অভিযান	৫৭৫
মুসলিম বাহিনীর মদীনায় প্রত্যাবর্তন	৫৭৫
যারা অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি	৫৭৬
মোনাফেকদের প্রতি কঠোরতা	৫৭৭
তাবুক ছিল শেষ অভিযান	৫৭৮
পুত্র ইবরাহীমের প্রতি আকর্ষণ	৫৭৮
রোগশয্যায় ইবরাহীম	৫৭৯

আটশতম অধ্যায়

প্রতিনিধিদলের বছর এবং হজ্জে হযরত আবু বকর (রা)-এর নেতৃত্ব : ৫৮২-৫৯৯

তাবুক অভিযানের ফলাফল	৫৮২
ইসলামের প্রতি আরবদের আকর্ষণ	৫৮২
উরওয়া ইবনে মাসউদের ইসলাম গ্রহণ	৫৮৩
মহানবী (সা)-এর খেদমতে বনী সাকীফ প্রতিনিধিদল	৫৮৪
প্রতিমা রাখার দাবি	৫৮৫
নামায থেকে অব্যাহতির দাবি	৫৮৫
লাত প্রতিমা ধ্বংস	৫৮৬
প্রতিনিধিদলের মদীনায় অনবরত আগমন	৫৮৬
হযরত আবু বকর (রা)-এর নেতৃত্বে হজ্জ	৫৮৭
ইসলামী রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি	৫৯১
মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা	৫৯৩
নগ্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম	৫৯৪
মত প্রকাশের স্বাধীনতা-বিরোধী আইন প্রণয়নের বৈধতা	৫৯৫
মোশরেকদের জীবনচিত্র	৫৯৫
পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার বৈধতা	৫৯৬
আমের ইবনে তোফায়েল	৫৯৭
আরবাদ ইবনে কায়েস	৫৯৭

মুসায়লামা

বিভিন্ন আরব প্রতিনিধিদলের নাম

৫৯৮

৫৯৮

উনত্রিশতম অধ্যায়

বিদায় হজ্জ : ৬০০-৬১৪

ইহুদী-খৃষ্টান ও মোশরেকদের মধ্যে পার্থক্য

৬০০

প্রতিনিধিদলের অব্যাহত আগমন

৬০৫

আরবে ইসলামী সংহতি

৬০৭

নাজরানের খৃষ্টানদের ইসলাম গ্রহণ

৬০৮

সর্বশেষ প্রতিনিধিদলের আগমন

৬০৮

মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের প্রস্তুতি

৬০৮

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হজ্জে রওয়ানা

৬০৯

ইহ্রাম ও তালবিয়া

৬০৯

ইয়ামন থেকে হযরত আলী (রা)-এর প্রত্যাবর্তন

৬১০

হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন

৬১১

বিদায় হজ্জে ভাষণ

৬১১

দীন পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ

৬১৩

ত্রিশতম অধ্যায়

মৃত্যুরোগ ও ইন্তেকাল : ৬১৫-৬৩০

মিথ্যা নবীদের আবির্ভাব

৬১৫

মিথ্যা নবী তালীহা, আসওয়াদ আনসী ও মুসায়লামা

৬১৬

রোমানদের উপর প্রতিশোধ পরিকল্পনা

৬১৭

উসামার প্রতি মহানবী (সা)-এর উপদেশ

৬১৮

মহানবী (সা)-এর অসুস্থতা ও উসামা বাহিনী

৬১৯

কবরবাসীদের উদ্দেশে নবী করীম (সা)-এর ভাষণ

৬২১

হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে কৌতুক

৬২২

অসুস্থ অবস্থায় মসজিদে গমন

৬২৩

আনসারদের ব্যাপারে মুহাজিরদের প্রতি উপদেশ

৬২৪

হযরত ফাতেমা (রা)-এর সাথে আলাপ

৬২৫

কাগজের ঘটনা

৬২৬

ওষুধ পানে অসন্তোষ

৬২৭

শেষ পুঁজি সাদাকার নির্দেশ

৬২৭

শেষবার মসজিদে গমন

৬২৮

স্বাস্থ্যের উন্নতিতে মুসলমানদের আনন্দ

৬২৮

ইন্তেকাল-পূর্ব সুস্থতা

৬২৯

ইন্তেকাল

৬৩০

ইত্তেকালের সংবাদে মুসলমানদের হতবুদ্ধিতা	৬৩১
হযরত ওমর (রা)-এর অস্বীকৃতি	৬৩১
হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রত্যাবর্তন	৬৩২
আসলে কি মহানবী (সা) ইত্তেকাল করেছেন	৬৩৩
উসামা বাহিনীর মদীনায় প্রত্যাবর্তন	৬৩৪
সাকীফায়ে বনী সাইদার ঘটনা	৬৩৪
আনসারদের উদ্দেশে হযরত আবু বকর (রা)	৬৩৫
মসজিদে নববীতে সাধারণ বায়'আত	৬৩৬
প্রথম খলীফার ভাষণ	৬৩৭
কোথায় রাসূলকে দাফন করা হবে	৬৩৭
নবী করীম (সা)-এর গোসল	৬৩৮
শেষ দেখা	৬৩৯
নামায়ে জানাযা	৬৩৯
ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা	৬৪০
আরব গোত্রগুলোর ধর্মত্যাগের প্রবণতা	৬৪০
কবর খনন	৬৪১
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাফন	৬৪১
হযরত আয়েশা (রা) ও মাযার কক্ষ	৬৪২
উসামা বাহিনীর রওয়ানা	৬৪২
নবীদের উত্তরাধিকার	৬৪৩
রাসূলের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার	৬৪৩

০১৭৩১২৪১২৪৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

হযরত মুহাম্মদ (সা)

হযরত মুহাম্মদ (সা) একটি নাম। কোটি কোটি মানুষের ওষ্ঠদ্বয় প্রতিদিন অনেকবার এই পবিত্র নামের আশ্বাদ গ্রহণ করে। এই নাম তাদের হৃদয়ে বইয়ে দেয় খুশী ও আনন্দের ফলুধারা। সাড়ে তের শ' বছর ধরে এভাবে চলে আসছে। পৃথিবীর শেষ দিনটি পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের মুখে তার উচ্চারণ এবং হৃদয়ে তার অনুরাগ এমনিভাবে অব্যাহত থাকবে।

প্রত্যুষে সুব্হে সাদিক যখন রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে পূর্বাকাশে আলোর ছটা ছড়িয়ে দেয়, তখন মুয়ায্যিনের কণ্ঠে ভেসে ওঠে আযানধ্বনি। তিনি 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম' বা 'ঘুম থেকে নামায উত্তম' বলে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার সামনে শির নত করা এবং তাঁর রাসূলের প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণের জন্য আহ্বান জানান। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে কোটি কোটি মানুষ এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে সালাত ও সালামের মাধ্যমে প্রতিটি দিনের শুরুতে রহমতে সিক্ত হন। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর মুয়ায্যিনের কণ্ঠে আবার আযান ধ্বনিত হয়। সূর্যের প্রখরতায় ভাটা পড়ার পর আসরের নামাযের জন্য মুয়ায্যিন আবার তার পুনরাবৃত্তি করেন। তারপর সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিব এবং সর্বশেষে এশার নামাযের জন্যে পুনরায় তার কণ্ঠে আযান ধ্বনিত হয়।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে প্রতিটি মুসলমান অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে স্মরণ করে নামাযের মধ্যে। কোথাও মহানবী (সা)-এর নাম শুনতে পেলে তাদের অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুরাগ আরো বেড়ে যায়। মুসলমানদের এই আকর্ষণ ও ভক্তি-শ্রদ্ধা অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং আল্লাহ তাঁর দীনকে বিজয়মণ্ডিত এবং গোটা মানবজাতির জন্যে তাঁর নিয়ামতরাশিকে পূর্ণ না করা পর্যন্ত ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

ইসলামের বিজয়

ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে মহানবী (সা)-কে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে হয়নি। আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা)-এর ওফাতের পূর্বেই এই ধর্মকে পরিপূর্ণতা ও সফলতার দিগন্তে পৌঁছে দেন। ইরানী নৃপতি কিসরা ও রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস প্রমুখ রাজ-রাজড়াকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত সংবলিত পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারের যে উদ্যোগ মহানবী (সা) গ্রহণ করেন, তার দেড় শতাব্দীর মধ্যেই পশ্চিম ইউরোপে স্পেন এবং পূর্ব

এশিয়ায় হিন্দুস্তান, তুর্কিস্তান ও চীন পর্যন্ত ইসলাম প্রসার লাভ করে। সিরিয়া, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, মিসর, বারকা,^১ তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো প্রভৃতি দেশে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়। এসব দেশে আজো ইসলামের পতাকা শোভা পাচ্ছে। ব্যতিক্রম শুধু স্পেন। খৃষ্টানরা স্পেনের মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন চালায়। ফলে লাখ লাখ মুসলমান শাহাদাত বরণ করে। অনেকে আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করে। অনেকে খৃষ্টানদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে জীবনের ভয়ে নিজেদের পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে নির্যাতনকারীদের ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

পশ্চিম ইউরোপের স্পেনে মুসলমানরা যে অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়, উসমানীয় শাসকদের ইস্তাম্বুল বিজয়ে ও মুহাম্মদী দীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে ক্ষতি পূরণ হয়। ইউরোপের পূর্ব প্রান্তের সাথে মিলিত এক বিরাট অংশ মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তুরস্ক থেকে বলকান এবং সেখান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যান্ড পর্যন্ত ইসলাম বিস্তার লাভ করে। ইউরোপের যে অংশে মুসলমানদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হলো, তা ছিল আয়তনে হত স্পেনের তুলনায় কয়েক গুণ বড়। সে সব এলাকায় ইসলামের বিজয়ের সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন ধর্মই ইসলামের উপর বিজয় লাভ করতে পারেনি। অবশ্য কোন কোন এলাকায় মুসলমানরা শত্রুদের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ফলে তাদের ঈমানের শক্তি, মনোবলের দৃঢ়তা এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহের প্রতি আস্থা পূর্বের চাইতেও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইসলাম খৃষ্টধর্মের চাইতে অধিক প্রচার-প্রসার লাভ করে। আর এটা খৃষ্টধর্মের অনুসারীরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। ফলে উভয় ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়।

হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর জীবদ্দশায়ই আরব উপদ্বীপে মূর্তিপূজার মূলোৎপাটন করেন। তাঁর ইত্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীন ইরান, আফগানিস্তান এবং ভারতীয় উপমহাদেশের এক বিরাট অংশ থেকেও মূর্তিপূজা নির্মূল করেন। হীরা (ইরাক), ইয়ামন, সিরিয়া, মিসর এমনকি খৃষ্টধর্মের কেন্দ্রভূমি ইস্তাম্বুল পর্যন্ত ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে খৃষ্টীয় মতবাদের উপর চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই ধর্মের সীমাহীন শোচনীয় অবস্থা দেখা দেয়।

হযরত মুহাম্মদ (সা) খৃষ্টধর্মকে আল্লাহ তা'আলার ধর্ম হিসাবে স্বীকার করা এবং হযরত ঈসা (আ)-এর নবুয়ত সম্পর্কে প্রত্যাশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও খৃষ্টানদের অবস্থা আরবের মূর্তিপূজারীদের অনুরূপই হয়েছিল। সে সময় মরুময় আরবের বেদুঈন অধিবাসীদের ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন ছিল যে, তারা স্পেন ও এশিয়া মাইনরের মনো শস্য-শ্যামল খৃষ্টান-শাসিত রাষ্ট্রগুলো অধিকার করতে সক্ষম হন। অপরদিকে আরব মুসলিমদের পূর্ববর্তী খৃষ্টান শাসকরা এসব দেশ হাতছাড়া করার চাইতে মৃত্যুকে অগ্রাধিকার দেয়াটা শ্রেয় মনে করত।

১. বর্তমান লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় একটি প্রদেশ। হযরত আমর ইবনে আস (রা) ৬৪২ খৃষ্টাব্দে এই এলাকা জয় করেন।

বস্তুত এই সংঘাতের ফলশ্রুতি হিসাবে খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ অব্যাহত থাকে। এই যুদ্ধ সমরাস্ত্রের মধ্যে সীমিত থাকেনি, উভয় পক্ষের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্ক সভাও অনুষ্ঠিত হত। এসব বিতর্ক অনুষ্ঠানে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে পরাস্ত ও নিজের সম্প্রদায়কে জয়যুক্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতো।

ইসলামে হযরত ইসা (আ)-এর মর্যাদা

ইসলাম মুসলমানদেরকে হযরত ইসা (আ)-এর মর্যাদাহানি করতে বাধা দিয়েছে। ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে, তিনি আল্লাহর বান্দা। তাঁর নিকট আল্লাহ তা'আলার কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁকে নবুয়তের সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। তিনি প্রতিটি স্থানে বরকতময়। আল্লাহ তাঁকে আজীবন নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর মায়ের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তিনি উদ্ধত কিংবা হতভাগ্য ছিলেন না। জন্মের দিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং শেষ বিচারের দিন তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক।

খৃষ্টীয় গোঁড়ামি ও হযরত মুহাম্মদ (সা)

পক্ষান্তরে অধিকাংশ খৃষ্টান হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে যেসব ভাষা ব্যবহার করেছে কোন সভ্য লোক তা করে না, করতে পারে না। মহানবী (সা) সম্পর্কে তাদের অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষের উপশম ও পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই তারা এমনটি করেছে।

কয়েক শতাব্দী আগেই ক্রুসেডের যুদ্ধ শেষ হয়েছে বলে সাধারণত ধারণা করা হলেও হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে গির্জাবাসীদের গোঁড়ামি ও হিংসা-বিদ্বেষ পুরাদস্তুর রয়ে গেছে। বর্তমান কাল পর্যন্ত তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন দেখা দেয়নি। পূর্বের তুলনায় তা বৃদ্ধি না পেলেও হ্রাস পায়নি এতটুকু।

অতীতকালে খৃষ্টান সমালোচকরা যেকোন নগ্ন পন্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অপবাদ রটনার দায়িত্ব পালন করত, বর্তমান যুগে তার ধরন পাল্টে গেছে। প্রথমে খৃষ্টান ধর্মযাজক ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্টরাই এই ঘৃণ্য কাজে নিয়োজিত ছিল। বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকার লেখক-চিন্তাবিদ-দার্শনিক ও প্রাচ্যবিদরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার ছদ্মাবরণে মহানবী (সা)-এর সমালোচনার দায়িত্ব পালন করছেন। আর এসব লেখক-চিন্তাবিদের বাহ্যত গির্জার সাথে কোন সম্পর্ক দৃষ্টিগোচর হয় না। বিশ্বয়কর ব্যাপার হলো, পাশ্চাত্যের এসব চিন্তাবিদই বর্তমান যুগকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির দিক থেকে সবচাইতে উন্নত বলে ধারণা করেন। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে তাদের বলগাহীন সমালোচনা কিরূপ মূর্খতার পরিচায়ক!

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক মুসলমানদের প্রাথমিক দিনগুলোর প্রতি তাকালে দেখতে পাবে, তারা তৎকালীন পারস্যের অগ্নিপূজারীদের তুলনায় রোমান খৃষ্টানদের সমর্থন করত। মুসলমানদের এই মনোভাব ছিল হিজরত পূর্বকালীন সময়ে। এ সময়ে রোমের খৃষ্টান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট ইরানী সম্রাট কিসরা পরাজয় বরণ করেছিল। রোমান বাহিনী ইরানের অগ্নিকুণ্ডুলো একের পর এক নিভিয়ে দিচ্ছিল। সে সময়টা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত নাজুক ছিল। ইরানের দক্ষিণ সীমানা ছিল আরব উপদ্বীপের সাথে মিলিত। ইরান মক্কার কাফেরদের সাথে মিলে মুষ্টিমেয় মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার একটা আশংকা সব

সময় বিরাজ করছিল। কারণ এর কিছু দিন আগে ইরানের কিসরা তার অধিকৃত ইয়ামন প্রদেশ থেকে সকল হাবশীকে বের করে দিয়েছিল।

এই কিসরাই ৬১৪ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক দুর্ধর্ষ বাহিনী প্রেরণ করেন। শহরবরাজ নামক এক সরদারকে এই বাহিনীর অধিনায়ক করা হয়। ইরানী বাহিনী রোমানদের তাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়। তাদের কলরবমুখর শহর-জনপদগুলো ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। চিরবসন্তময় যয়তুনের বাগানগুলো কেটে একাকার করে দেয়া হয়। পরিশেষে রোমানরা তাদের আকাশচুম্বী বিভিন্ন দুর্গ ও শস্য-শ্যামল উর্বর প্রান্তর থেকে বিতাড়িত হয়ে সিরিয়ার আরব সীমান্তবর্তী বাজরায়াত ও বোসরা নামক স্থানে বসতি স্থাপনে বাধ্য হয়।

সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল একেবারে নগণ্য। তারা মক্কায় কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও মুসলমানদের আন্তরিক সমবেদনা প্রতিবেশী ইরানীদের পরিবর্তে আহলে কিতাব রোমান খৃষ্টানদের প্রতি ছিল। অপরদিকে মক্কার কাফেরদের সমবেদনা ছিল ইরানীদের প্রতি। কারণ ইরানীরা মক্কার কাফেরদের মতো কিতাবধারী ছিল না এবং তারা ওহীর প্রতিও বিশ্বাস রাখত না। রোমান খৃষ্টানরা কিতাবধারী হওয়ার দরুন মক্কার কাফেররা মুসলমানদের মতো তাদেরও শত্রু মনে করত। এ কারণেই মুসলমানরা রোমান খৃষ্টানদের পরাজয়ের খবর শুনে অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

এই যুগের সবচাইতে বৃহৎ রাষ্ট্রদুটোর মধ্যে একটি ছিল অগ্নিপূজারী ইরান এবং অপরটি ছিল খৃষ্টধর্মের অনুসারী রোম। আরবের দক্ষিণাংশ ইরান সীমান্তের সঙ্গে মিলিত। অপর দিকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের সাথে মিলিত ছিল। ইরান সীমান্তের নিকটবর্তী আরবরা ইরানীদের প্রভাবাধীন ছিল। অনুরূপ রোমান সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী আরবরা ছিল রোমানদের প্রভাবাধীন। এদিক থেকেও মক্কার মুসলমানরা প্রকাশ্যভাবেই ইরানীদের শত্রু এবং রোমানদের বন্ধু ছিল। ধর্মহীনতার দিক থেকে ইরানীদের সাথে মক্কার কাফেরদের সাদৃশ্য ছিল। রোমানরা ছিল কিতাবধারী এবং মুসলমানদের মতো আসমানী ধর্মের অনুসারী। এ জন্য মক্কার কাফেররা প্রকাশ্য রোমানদের বিরোধিতা করত। উপরে উল্লিখিত যুদ্ধে রোমান খৃষ্টানদের পরাজয়ের খবর পেয়ে মক্কার কাফেররা আনন্দে মেতে উঠল। কিন্তু মক্কার মুসলমানরা এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মান্তিক হলে। এমনকি এই জয়-পরাজয় মক্কার মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

উবাই ইবনে খালফ নামের মক্কার জনৈক কাফের সরদার হযরত আবু বকর (রা)-এর সামনে খৃষ্টানদের পরাজয়ে আনন্দ প্রকাশ করে কিছু কথা বলে বসল। কথাগুলো হযরত আবু বকর (রা)-এর খুবই খারাপ লাগল। তিনি উবাইকে লক্ষ করে বললেন, এই বিজয়ের আনন্দে এত আটখানা হয়ো না। অদূর ভবিষ্যতে খৃষ্টানরাই অগ্নিপূজারীদের হারিয়ে দেবে। হযরত আবু বকর (রা) এই কথাটি কোন চিন্তা-ভাবনা না করে এমনি বলেননি। কারণ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার

১. (মূল গ্রন্থের টীকা)- ডঃ বাটলার তাঁর 'ফতহুল আরব' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, উক্ত সেনাপতির নাম খোরিয়াম। বিভিন্ন গ্রন্থে তার উপাধির একাধিক উচ্চারণ লেখা হয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে 'শহরবার্জ', 'শহরবরাজ', 'শরাওজিয়া' প্রভৃতি। মূলত এগুলো ফারসী শব্দ 'শহরওয়ারাজ'-এর বিকৃত রূপ। এর অর্থ হচ্ছে 'বনের দুর্ধর্ষ শূকর'। এজন্যই ইরানের বাদশাহদের মোহরেও শূকরের প্রতিকৃতি থাকত। আরমানীয়দের মোহরেও অনুরূপ প্রতিকৃতি ছিল। (ফতহুল আরব, ৫৩ পৃষ্ঠা)

দিক দিয়ে তিনি সমসাময়িকদের মধ্যে অত্যন্ত খ্যাত ছিলেন। তাঁর মুখে এ কথা শুনে উবাই ইবনে খাল্ফ অত্যন্ত রেগে গেল। সে সদৃশে হযরত আবু বকরকে বলল, “তুমি মিথ্যাবাদী!” হযরত আবু বকরও নিজের প্রজ্ঞার উপর আস্থাভান ছিলেন। তিনি বললেন, “হে আল্লাহর দূশমন, তুমি মিথ্যাবাদী। যদি তুমি নিজের সত্যবাদিতায় আস্থাভান হও, তবে আমি এই ব্যাপারে দশটি উটের শর্তারোপ করছি। এক বছরের ভিতর যদি খৃষ্টানরা অগ্নিপূজারীদের হারিয়ে দিতে না পারে, তাহলে এই শর্তে আমার পরাজয় হবে। আর যদি খৃষ্টানরা জয়লাভ করে, তবে তুমি আমাকে দশটি উট প্রদান করবে।”

উট প্রদানের শর্ত করার এই ঘটনা হযরত মুহাম্মদ (সা) শুনতে পান। তিনি হযরত আবু বকরকে বললেন, “সময়সীমা বাড়িয়ে উবাই যদি দশ হাজারেরও বেশি উটের বাজি ধরতে চায় তাতেও আপনি এতটুকু দ্বিধা করবেন না।” মহানবী (সা)-এর এই উপদেশ শুনে হযরত আবু বকর (রা) পুনরায় উবাইকে উৎসাহী করেন। অতঃপর উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় শর্ত নির্ধারিত হয়। এবার উটের সংখ্যা করা হয় এক শ’ এবং সময়সীমা বাড়ানো হয় নয় বছর। অতঃপর ৬২৫ খৃষ্টাব্দে রোমান খৃষ্টান সম্রাট হিরাক্লিয়াস ইরান আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ইরানীরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। রোমানরা তাদের হারানো শাম বা সিরিয়া পুনরুদ্ধার করে। তাতে করে রোমান খৃষ্টানরা তাদের হৃত গৌরব পুনরায় ফিরে পায়। রোমান খৃষ্টানদের বিজয়ের ফলে হযরত আবু বকর (রা)-ও বাজি ধরায় জয়লাভ করেন। রোমানদের পূর্ব পরাজয়ের পরপরই পুনরায় রোমানদের বিজয়ী হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি নাথিল হয়েছিল :

الْم. غَلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. فِي بَضْعِ سِنِينَ - لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ - وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ - وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَعَدَ اللَّهُ - لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

“আলীফ-লাম-মীম। রোমানরাই তো পরাজিত হয়ে গেল। নিকটবর্তী এক দেশে-এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই তারা বিজয়ী হবে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই। আল্লাহর হাতেই পূর্বাপর সব কাজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সেদিন মু’মিন-মুসলমানরা সন্তুষ্ট হবে। আল্লাহ তা’আলার সাহায্যে-তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য দান করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও দয়ালু। আল্লাহর ওয়াদা-আল্লাহ নিজের ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।” (৩০ : ১-৬)

ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের প্রাথমিক নীতিমালা

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও খৃষ্টানদের জন্যে মুসলমানদের অত্যন্ত দরদ-সহানুভূতি ছিল। এমনকি মহানবী (সা)-এর জীবিতকালেই মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে

১. তখনও ইসলাম ধর্মে বাজি ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি। (তাফসীরে মায়ালিমুত-তানযীল)-অনুবাদক

অনেকটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সে যুগে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে কখনও কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদ দেখা দেয়নি। কিন্তু ইহুদীরা ছিল ব্যতিক্রম। হিজরতের পর ইহুদীরা ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে মুসলমানদের সাথে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে। আর এই দ্বন্দ্ব দিন দিন বেড়েই চলে। পরিণামে ইহুদীদের আরব উপদ্বীপ থেকে নির্বাসিত হতে হয়। মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টানদের পারস্পরিক ব্যাপার ও তার পরিণাম সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي - ذَلِكَ بِأَن
مِّنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ .

“আপনি দেখতে পাবেন, যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে সবচাইতে বেশি শত্রুতা করছে ইহুদী ও মুশরিকরাই। আর মু’মিনদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তাদেরকেই খুব কাছে পাবেন—যারা বলছে, আমরা তো নাসারা। কারণ তাদের মধ্যে সাধু-সজ্জন রয়েছে। আর তারা মোটেই অহংকার করে না।” (৫ : ৮২)

পবিত্র কোরআনের ভাষ্যে আপনি দেখতে পেলেন ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলমান ও খৃষ্টানরা কত ঘনিষ্ঠ। মানবজীবন ও তার সূচনা সম্পর্কেও উভয় সম্প্রদায় অনেকটা ঐকমত্য পোষণ করে। (পবিত্র কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী) “আল্লাহ তা’আলা হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করে বেহেশতে বসবাস করতে দেন। তাঁদের বলে দেন, শয়তানের প্ররোচনায় তোমরা কখনো এই বৃক্ষের ফল খাবে না। যদি তা কর, তোমাদের বেহেশত থেকে বের করে দেয়া হবে। শয়তান তোমাদের চিরশত্রু। এজন্যই সে আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করেছে।”

এক্ষেত্রে খৃষ্টানরা শুধু এতটুকু মতপার্থক্য পোষণ করে যে, হযরত আদমকে সিজদা না করে ‘শয়তান আল্লাহর বাণীর পবিত্রতা প্রকাশ্যেই অস্বীকার করে বসে। সে বিবি হাওয়াকে বিপথগামী করে এবং তাঁর সামনে একটি মনভুলানো চিত্র তুলে ধরে। বিবি হাওয়া হযরত আদমকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার জন্য সম্মত করান।”

এই কাহিনীর পরবর্তী অধ্যায়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। পবিত্র কোরআন ও বাইবেল উভয় গ্রন্থেই বলা হয়েছে, “হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়া শয়তানের প্ররোচনার শিকার হন। তাঁরা উক্ত নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শরীর থেকে স্বর্গীয় পোশাক খুলে যায়। তাঁরা বিবস্ত্র হয়ে পড়েন। তাঁরা নিজেদের এই অবস্থা দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েন। উভয়ে আল্লাহ তা’আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি তাদের ক্ষমা মঞ্জুর করেন বটে, কিন্তু বেহেশত থেকে বের করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। এখানে তাঁদের বংশধারা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়।

ওদিকে ইবলিসের বংশধর হযরত আদমের বংশধরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য সব সময় পেছনে লেগে আছে। তাদের প্রতারণার শিকার হয়ে কিছু লোক বিপথগামী হয়। আর কিছু লোককে শয়তান পথভ্রষ্ট করতে পারে না। জীবনপথে তারা হয় কামিয়াব। আল্লাহ তা’আলাও হযরত আদমের বংশধরকে শয়তানের প্রতারণা থেকে নিরাপদ রাখার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল

পাঠিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা (আ) প্রমুখ। আল্লাহ তা'আলা এসব নবী-রাসূলের নিকট তাঁদের ভাষায় কিতাব নাযিল করেছেন। এসব গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট নবী-রাসূলদের সত্যতা বর্ণনার সাথে সাথে পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাঁদের নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থরাজিরও সত্যতার প্রতি স্বীকৃতি জানান হয়েছে।

ইবলিসের বংশধররা যেমন সব সময় ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টিতে লেগে আছে, তেমনি ফেরেশতারাও প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় নিয়োজিত রয়েছে। হযরত আদমের বংশধরদের মধ্যকার শয়তানের পূজারী দল ও আল্লাহ তা'আলার ইবাদতকারী দলের মধ্যে কোন প্রকার সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে না। জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উভয় দল পরস্পরে সংগ্রামমুখর থাকবে-এমনি অবস্থায় এক পর্যায়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর সেদিন সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيْمًا -

“এবং এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে কোন কথাই জিজ্ঞেস করবে না।” (৭০ : ১০)

মুসলমান ও খৃষ্টানদের বিরোধ

পবিত্র কোরআনে অত্যন্ত সুন্দরভাবে হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর মাতা হযরত মরিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই প্রমাণিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও প্রতিটি মানুষের মনে একটা প্রশ্নের উদ্বেক হয় যে, তাহলে মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যুগ যুগ থেকে এ ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত কেন।

এরূপ সম্পর্কের পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে কিছু হলো মুসলমান ও খৃষ্টানদের বুনিয়াদী আকায়েদ বা মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাসের বৈপরীত্য। এর ফলে নবী করীম (সা)-এর আমলেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তর্কবিতর্ক হতো (কিন্তু এসব তর্ক পারস্পরিক শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ পর্যন্ত গড়াতো না)। খৃষ্টানরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসাবে স্বীকার করে না। কিন্তু মুসলমানরা হযরত ঈসাকে নবী হিসাবে স্বীকার করে। খৃষ্টানরা ত্রিত্ববাদের প্রবক্তা। অপরদিকে মুসলমানরা তাওহীদ বা একত্ববাদে প্রবল বিশ্বাসী। তারা আল্লাহ তা'আলার ব্যক্তিতে অপর কারো বিন্দু পরিমাণ অংশীদারিত্ব সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা হযরত ঈসাকে খোদা বলে মনে করে। এ ব্যাপারে প্রমাণ হিসাবে তারা বলে :

(১) হযরত ঈসা দোলায় কথা বলেছেন। (২) হযরত ঈসা যেসব মু'জিয়া বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, অন্য কোন নবী তা ছিলেন না। (৩) হযরত ঈসা ঐশ্বরিক মর্যাদায় পৌঁছে ছিলেন। মহানবী (সা)-এর আমলের খৃষ্টানরা এ ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে তর্কবিতর্কে পবিত্র কোরআনের নিম্নলিখিত ভাষ্য প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করত :

اِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يَبْشُرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ . وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ . قَالَتْ رَبِّ اَنْتَ يَكُوْنُ لى وَلَدٌ

وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرًا - قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ - إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ . وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ - أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ - وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ - إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ .

“ফেরেশতারা যখন বললো, হে মরিয়ম ! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর একটি হুকুমের সুখবর দিচ্ছেন। তার নাম মসীহ- মরিয়মের ছেলে, ইহকাল-পরকালে মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠদের অন্যতম। মায়ের কোলে থাকতে এবং বয়স হওয়ার পর মানুষের সাথে কথা বলবে। সে নেককারদের মধ্যে পরিগণিত। সে বললো, হে আমার পালনকর্তা! কোথেকে আমার ছেলে হবে ! কোন পুরুষ তো আমাকে স্পর্শও করেনি। আল্লাহ্ বললেন, আল্লাহ্ যা চান এমনি তা সৃষ্টি করেন। কোনো কিছু মর্জি হলে শুধু বলেন, ‘হও’ আর সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। তিনি তাকে কিতাব, জ্ঞান, তথ্য আর তাওরাত ও ইন্জীল শেখাবেন। বনী ইসরাঈলদের কাছে রাসূল হিসাবে আসবে। বলবে : আমি তোমাদের পালনকর্তার কাছ থেকেই নিদর্শন নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি-এ কথা নিশ্চিত। তোমাদের জন্যে মাটি দিয়ে পাখির মতো তৈরি করে ফুঁ দিচ্ছি। দেখবে আল্লাহ্র হুকুমে তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্র হুকুমে চির অন্ধ, কুষ্ঠরোগীকে ভাল করি, মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তুলি। তোমরা যা খেয়ে আস, যা তোমরা ঘরে রেখে আস, তাও আমি বলতে পারি। নিশ্চয়ই তাতে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। (৩ : ৪৫-৪৯)

সে যুগের খৃস্টানরা পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত ভাষ্য হযরত ঈসার খোদায়িত্বের প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করত। তারা বলত :

হযরত ঈসা মৃতদের জীবিত করতেন। জন্মান্দের দৃষ্টিশক্তি দান করতেন। কুষ্ঠ রোগীদের রোগ নিরাময় করতেন। তিনি মাটি দ্বারা পাখির মূর্তি বানিয়ে তাতে ফুঁ দিতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তা সত্যিকার জীবন্ত পাখি হয়ে যেতো। তিনি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, সবই সত্য প্রমাণিত হতো। খৃস্টানরা বলত, খোদা ছাড়া অন্য কেউ এ সব গুণের অধিকারী হতে পারে না। মহানবী (সা)-এর আমলের খৃস্টানরা মুসলমানদের সাথে তর্কবিতর্কে এসব প্রমাণ উল্লেখ করে বলত, হযরত ঈসাও খোদা ! সে যুগের কোন কোন খৃস্টান হযরত মরিয়মকে এজন্য খোদায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করেছিল যে, তাঁর পেটে আল্লাহ্ তা‘আলার ‘কলেমা’ বা নির্দেশ স্থান পেয়েছিল। এই অর্থেই সেকালের খৃস্টানরা হযরত মরিয়মকে তিনের এক মনে করত। তারা বলত, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। হযরত ঈসা ও তাঁর মাতা হযরত মরিয়মকে ত্রিত্বে অন্তর্ভুক্তকারী খৃস্টানদের সংখ্যা মহানবী (সা)-এর আমলে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তাঁরা আরবের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল।

মহানবী (সা)-এর সাথে খৃষ্টানদের বহস

মাঝে মাঝে খৃষ্টানরা মহানবী (সা)-এর সাথে বহস করত। তাদের এক শ্রেণী বলত, হযরত ঈসাও খোদা। একদল বলত, হযরত ঈসা (আ) হলেন আল্লাহ্ তা'আলার ছেলে। আর একদলের মতে হযরত ঈসা (আ) ত্রিত্বের এক ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত ঈসাকে খোদা হিসাবে গণ্যকারীদের প্রমাণ আমরা উল্লেখ করেছি। যারা তাঁকে খোদার ছেলে মনে করে এবার তাদের প্রমাণ উল্লেখ করা যাক। তারা বলে :

“হযরত ঈসা (আ) পিতা ছাড়াই জন্মলাভ করেছেন। তিনি দোলনায় কথা বলেছেন। আর জ্ঞানী লোক মাত্রই জানেন, পিতা ছাড়া কেউ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। এবং দোলনায়ও কোন শিশু কথা বলতে পারে না।” আর হযরত ঈসার এসব বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে যে, তিনি আল্লাহ্‌র ছেলে। তাদের মধ্যে যারা হযরত ঈসাকে তিনের এক মনে করে, তাদের প্রমাণ হলো, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসার সৃষ্টির জন্য বহুবচন ধাতুরূপ ব্যবহার করেছেন। বলেছেন, “আমরা নির্দেশ প্রদান করেছি,” “আমরা সৃষ্টি করেছি।” তাতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ একজন নন। যদি অদ্বিতীয় হতেন, তাহলে বলতেন, “আমি নির্দেশ দিয়েছি।” “আমি সৃষ্টি করেছি।”

হযরত মুহাম্মদ (সা) খৃষ্টানদের সব যুক্তি-তর্ক শুনতেন। কিন্তু সব কথার জবাব দিতেন না। বরং যেসব কথার জবাব দেয়া সম্ভব মনে করতেন, কেবল সে সবারই উত্তর দিতেন। মূর্তিপূজারী ও অন্যান্য মুশরিকদের বেলায় তিনি যেরূপ কঠোর নীতি গ্রহণ করতেন, খৃষ্টানদের ক্ষেত্রে তা করতেন না। এ ব্যাপারে তাঁর জবাবদানের উৎস ছিল আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে প্রাপ্ত ওহী ও খৃষ্টানদের গ্রন্থরাজি। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ - قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا - وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا - يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ - قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ - بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ - يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ .

“তারা তো কুফরীতেই লিপ্ত হলো, যারা বলে : আল্লাহ্‌ই তো মরিয়মের ছেলে মসীহ। আপনি তাদের বলুন, কোনো ব্যাপারে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারই বা এমন কি ক্ষমতা রয়েছে। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন, মরিয়মের ছেলে মসীহ, তাঁর মা আর এই দুনিয়ার বুকে যত লোক বাস করছে সবাইকে তিনি নির্মূল করতো, তাহলে তা কে ঠেকিয়ে রাখতে পারে? আল্লাহ্‌র তো আসমান-যমীনের আধিপত্য আর এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু রয়েছে, সে সবার মালিকানাও একমাত্র তাঁরই, তিনি নিজের খুশীমতো সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ তা'আলাই সকল বিষয়ে শক্তির একমাত্র অধিকারী। ইহুদী ও নাসারারা বলে,

আমরা তো আল্লাহরই পুত্র ও তাঁর বন্ধু। আপনি বলুন, তাহলে তিনি কেন তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেবেন। বরং তোমরা তো মানুষ-যা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। যাকে খুশী তিনি মাফ করেন। আর যাকে খুশী তিনি শাস্তি দেবেন।” (৫ : ১৭-১৮)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ - وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ - وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ . لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ . وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

“নিশ্চয়ই তারা কাফের হয়ে গেল, যারা বলে, আল্লাহ হচ্চেন মরিয়মের ছেলে মসীহ। অথচ মসীহ বলতো, হে বনী-ইসরাঈলগণ ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করো। যিনি আমার পালনকর্তা, তোমাদেরও তিনিই পালনকর্তা। যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। আর তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আর জালিমদের জন্য কোনও সাহায্যকারী নেই। তারাও কাফের হয়ে গেল, যারা বলে, আল্লাহ তো তিনজনের মধ্যে তৃতীয়জন। অথচ মাবুদ বলতে একজন ছাড়া আর কেউ নেই। তারা যদি ক্ষান্ত না হয়, যা তারা বলছে তা থেকে, তাহলে তাদের মধ্যে যারা অবাধ্য কাফের তারা নিদারুণ শাস্তি ভোগ করবে।” (৫ : ৭২-৭৩)

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেছেন :

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ - قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ - إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ - تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ - إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ . مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ - وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ . إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ - وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

“আল্লাহ যখন এরশাদ করবেন : হে মরিয়মের ছেলে ঈসা ! তুমি কি লোকজনকে বলেছ যে, আল্লাহ ছাড়া আমাকে আর আমার মাকে উপাস্যরূপে মেনে নাও ? তিনি বলবেন, পরম পবিত্রতা শুধু আপনারই। আমার পক্ষে এ কথা মোটেই শোভা পেতো না-যে কথা বলার কোনো অধিকার আমার ছিল না তা-ই আমি বলব। আমি যদি বলেই থাকি, তা হলে তো আপনিই তা জানতেন। আমার মনে যা কিছু আছে তা আপনি জানেন। কিন্তু

আপনার অন্তরের কথা আমি জানি না। নিশ্চয়ই আপনি অপ্রকাশ্য সব কিছুই ভাল করে জানেন। যে কথা বলার জন্য আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তা ছাড়া আমি তাদের কোনও কথা বলিনি। (তা হলো) তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করো। আমি যত দিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী। তারপর আপনি যখন আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিলেন, তখন তো আপনিই তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং আপনিই তো সব কিছুর খবর রাখছেন। আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা আপনারই বান্দা। আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করেন, তাহলে তো আপনি নিশ্চয়ই মহাপরাক্রমশালী ও পরম কুশলী।” (৫ : ১১৬-১১৮)

খৃষ্টানরা তো ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার দরুন হযরত ঈসাকে আল্লাহ তা‘আলার ছেলে বানিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের উদ্ভট মতবাদের চরম বিরোধী। ইসলাম ধর্মমতে আল্লাহ তা‘আলার কোনও সন্তানই হতে পারে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

“আপনি ঘোষণা করুন- তিনিই একক আল্লাহ। আল্লাহ কারোর মুখাপেক্ষী নন। তিনি কারো পিতা নন, আর কারো ছেলেও নন। আর কেউ তাঁর সমকক্ষও নেই।” (১১২ : ১-৪)

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেছেন :

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ -

“সন্তান হিসাবে কাউকে গ্রহণ করা আল্লাহ তা‘আলার মর্যাদার পরিপন্থী। সকল পবিত্রতা শুধু সেই সুমহান সত্তার জন্যই।”

পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে :

إِنْ مَثَلٌ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ - خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .

“আল্লাহ তা‘আলার দরবারে ঈসার উপমা হচ্ছে ঠিক আদমের মতই। তাঁকে মাটি দিয়ে তৈরি করে বললেন, জীবিত হও, সঙ্গে সঙ্গে তা-ই হয়ে গেল।” (৩ : ৫৯)’

১. এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে সকল তাফসীরকার একমত যে, নাজরানের একটি খৃষ্টান প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত থাকা অবস্থায় এটি নাযিল হয়েছে। তারা মহানবী (সা)-কে বলেছিল, আপনি কোনও মানুষকে হযরত ঈসার পিতা স্বীকার করছেন না। তাতে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আল্লাহই তাঁর পিতা। তাদের এ কথার প্রতি-উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পবিত্র বাণীর মাধ্যমে জানালেন, আদমকে দেখ, তাঁর পিতা-মাতা কেউই ছিল না। তাতে কি তিনি আল্লাহ তা‘আলার ছেলে হয়ে গেলেন? ঈসার দৃষ্টান্তও অনুরূপ। পিতা না হওয়াতে তিনিও আল্লাহ তা‘আলার ছেলে নন। -অনুবাদক

গুণগত ও বস্তুগত উভয় দিক থেকেই ইসলামের বুনিয়াদ বা ভিত্তি একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনও বস্তুর আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণরাজিতে প্রবেশাধিকার কোনও অবস্থায়ই ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলাম এরূপ ধারণার ঘোর বিরোধিতা করে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ -

“যদি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ মোটেই ক্ষমা করবেন না। আর সব গুনাহ তিনি নিজ ইচ্ছা মোতাবেক ক্ষমা করবেন।” (৪ : ৪৮)

যদিও ত্রিত্ববাদের সাথে প্রাচীন কোন কোন ধর্মমতের সাদৃশ্য রয়েছে ; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা) তা সঠিক মনে করেননি। তাঁর বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনও শরীক নেই। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো জাতও নন। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।

মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে উপরোক্ত ব্যাপারে মৌলিক বিরোধ ছিল (এবং আজো রয়েছে)। এর ফলে মহানবী (সা)-এর আমলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বহস-তর্ক হওয়াটা কোনও বিস্ময়কর বা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। এসব ক্ষেত্রে মহানবী (সা) আল্লাহ তা'আলার উপদেশ- “তাদের সাথে উত্তম পন্থায় আলাপ-আলোচনা করো” পুরোপুরি অনুসরণ করতেন। বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ ওহী এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছে। পাঠকরা উপরে উল্লিখিত আয়াতগুলো দ্বারা তা অনুধাবন করতে পেরেছেন।

হযরত ঈসা (আ)-কে শূলে চড়ানোর ঘটনা

আর একটি ঘটনা হলো হযরত ঈসা (আ)-কে শূলে চড়ানোর ব্যাপার। মহানবী (সা)-এর আমলে এ নিয়ে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে একাধিকবার বহস হয়েছে। খৃষ্টানদের দাবি ছিল, সারা বিশ্বের মুক্তির জন্য হযরত ঈসা (আ) নিজের গলায় ফাঁসীর রশি লাগিয়ে আত্মদান করেন। মুসলমানরা তা স্বীকার করে না। তাদের বিশ্বাস হলো, ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করেনি, এমনকি শূলেও চড়াতে পারেনি। পবিত্র কোরআনের ভাষ্যই হলো এ ব্যাপারে মুসলমানদের বিশ্বাস। তাতে বলা হয়েছে :

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ - وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ - مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا . بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ - وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا .

“তাদের এ কথা আমরা মরিয়মের ছেলে মসীহকে হত্যা করেছি, যিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে হত্যা করেনি। তারা তাঁকে শূলেও চড়ায়নি। বরং তাদের এরূপ মনে হয়েছিল। যারা এ নিয়ে বিরোধে লিপ্ত হয়, তারা কিন্তু তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে। আসলে শুধু উদ্ভট কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোনও জ্ঞান নেই।

নিশ্চয়ই ওরা তাঁকে হত্যা করেনি, এ কথাই ঠিক। বরং আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ্ যে মহা পরাক্রমশালী, পরম কুশলী।” (৪ : ১৫৭-১৫৮)

হযরত ইসাকে মানবজাতির সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে শূলে আত্মত্যাগী মনে করা বাহ্যিক দিক থেকে খুবই চমৎকার দেখায়। এ নিয়ে খুব সুন্দর কাব্যও রচনা করা যায়। নৈতিক ও মানবিক দিক থেকেও অনুপম কাহিনীর রূপ দেয়া যায়। কিন্তু ইসলামের মূলনীতির দৃষ্টিতে কেউ কারো পাপের বোঝা নিতে পারে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন : لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ কোনো লোক অপর কারো পাপের বোঝা বহন করবে না।” (৩৯ : ৭)

পরকালে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ পুণ্যের ফল ভোগ করবে এবং পাপের শাস্তিও সংশ্লিষ্ট পাপীকেই ভোগ করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন :

لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا -

“সেদিন সম্পর্কে ভয় করো যেদিন কোনও পিতা নিজ সন্তানের উপকারে আসবে না, আর কোনও সন্তান তার পিতার কোনও উপকার করতে পারবে না।” (৩১ : ৩৩)

ইসলামের উপরোক্ত নীতির প্রেক্ষিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসে কোনও অবস্থায়ই সমঝোতা সম্ভব নয়।

মুসলমান ও রোমান খৃষ্টান

সে যুগে খৃষ্টানদের কেউ মুসলমানদের একত্ববাদ ও খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের মধ্যে কোনও প্রকার সমঝোতামূলক সমাধান দিতে পারেনি। শীর্ষস্থানীয় খৃষ্টানদের এই উদাসীনতা ও ব্যর্থতার পরিণামে ত্রিত্ববাদের অনুসারী খৃষ্টানরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে একত্ববাদের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে। অতঃপর রোমান খৃষ্টানদের অশ্রুভারাক্রান্ত যুগটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ইরানের অগ্নিপূজারী সরকার খৃষ্টানদের নাস্তানাবুদ করে তাদের পৈতৃক ভিটে-মাটি থেকে বের করে দেয়। সে সময় মক্কার মুসলমানরা কুরাইশদের হাতে নির্যাতিত-নিপীড়িত হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও রোমান খৃষ্টানরা আসমানী কিতাবের অধিকারী হওয়ায় তাদের শোচনীয় পরাজয়ে মুসলমানরা আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করে। তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়, ব্যথায় ব্যথিত হয়। কিন্তু রোমান খৃষ্টানরা ইসলামের একত্ববাদের ব্যাপারে কোনও প্রকার চিন্তা-গবেষণাই করে না। তারা বরং ইসলামের রাজনৈতিক ভবিষ্যত পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, মুসলমানরা শক্তিশালী হওয়ার পর আমাদেরই হারিয়ে দেবে। এই ভবিষ্যত আশংকায় আশেপাশের খৃষ্টানরা ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা এক লাখ, অন্য বর্ণনায় দুই লাখ সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাবুক নামক স্থানে সমবেত হয়। মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) স্বয়ং। শেষ পর্যন্ত রোমানরা মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা না করে পিছু হটে যায়। এই যুদ্ধই ইতিহাসে তাবুকের যুদ্ধ নামে খ্যাত।

এ সময় থেকেই খৃষ্টানদের অন্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিদ্বেষ দানা বাঁধে। পরবর্তীকালে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে। এর ফলে পশ্চিমে মুসলমানরা খৃষ্টানদের নিকট থেকে স্পেন ছিনিয়ে নেয় এবং পূর্বদিকে মুসলমানদের বিজয় অভিযান (তৎকালীন ভারতীয়) উপমহাদেশ ও চীন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। তাতে করে এই

বিশাল এলাকা মুসলমানদের অধিকারে আসে। অসংখ্য লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বিজিত এলাকায় আরবী ভাষা সরকারী ভাষার মর্যাদা লাভ করে।

ইতিহাসের চাকার গতি আবার ভিন্ন পথ ধরে। খৃষ্টানরা মুসলমানদের নিকট থেকে স্পেন পুনরুদ্ধার করে। তাতে তাদের মধ্যে শক্তির অহমিকা দানা বেঁধে ওঠে। তারা মুসলমানদের সাথে ক্রুসেডের যুদ্ধ আরম্ভ করে। এসব যুদ্ধের প্রতি জনমত আকৃষ্ট করার জন্য খৃষ্টান ধর্মযাজকরা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে নানান আপত্তিকর মন্তব্য করত। ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে অশ্লীল মিথ্যে কাহিনী রটানো তারা নিজেদের নিত্য-নৈমিত্তিক দায়িত্ব বলে মনে করত। সবচাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, পবিত্র কোরআনের যেসব আয়াতে এবং মহানবী (সা)-এর (সা) যেসব বাণীতে হযরত ঈসার মর্যাদা ও তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, খৃষ্টান ধর্মযাজকরা সে সব ভুলে উল্লেখ করত না। তারা সেগুলো পুরোপুরি এড়িয়ে যেতো।

খৃষ্টান লেখকদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা)

সে যুগের খৃষ্টান লেখকরা হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে কিরূপ বিষোদগার করেছে, তার কিছুটা নমুনা দেখতে পাওয়া যায় ‘লারুসা ফ্রান্সিয়া’ গ্রন্থে। এটি খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লেখা। তাতে এক স্থানে বলা হয়েছে :

“... এসব সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন বদস্বভাব, জাদুকর, লুটেরা ও অহংকারী। তিনি এসব পন্থার মাধ্যমে পোপের স্থান দখল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়ে তিনি প্রতিপক্ষের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। তাতে তিনি নিজের মনগড়া কাহিনী সৃষ্টি করেন।”

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপে মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত সম্পর্কে যে কটি গ্রন্থ লেখা হয়েছে, সবকটিতেই এ ধরনের চরম আপত্তিকর ও মিথ্যে কাহিনী লেখা হয়েছে। ১৮৩১ সালে রিনিও ফ্রান্সিস্ক ম্যাসেল তার পুস্তকে মহানবী (সা)-এর যেসব ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তাতেও এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর সম্পর্কে মধ্যযুগের খৃষ্টান লেখকরা কিরূপ পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে খৃষ্টান লেখক বেল পবিত্র কোরআনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সংকলন করেন। মহানবী (সা) সম্পর্কে তিনিও তাঁর অন্তরে লুক্কায়িত বিদ্বেষ সংযত রাখতে পারেননি। তিনি স্বীকার করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিবলে একটি সুন্দর নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরিশেষে আবার বলেছেন, “উক্ত ব্যবস্থায় যদি মৃত্যুদণ্ড ও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধান না হতো, তাহলে খৃষ্টীয় ও ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থায় কোনো পার্থক্য থাকত না।”

পশ্চিমা লেখকদের মধ্যে একজন লেখক হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে মসি চালনায় কিছুটা নীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি হলেন ফরাসী লেখক এ্যামেল দারমিংহাম। তিনি তাঁর গ্রন্থে কোনও কোনও নীতিজ্ঞানহীন খৃষ্টান লেখকের ভাষ্যও উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, “খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে উভয় সম্প্রদায়ের মতবিরোধ ও বিদ্বেষের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। দিন দিন তা বেড়েই চলে। পশ্চিমা জগত তাদের জামার আঁচল দ্বারা বায়ু সঞ্চারণ করে তা আরো বাড়িয়ে

তোলে।” পশ্চিমা লেখকরা কোনও প্রকার তথ্যানুসন্ধান ছাড়াই ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগারে সীমা ছাড়িয়ে যায়। খৃষ্টান কবিরাও এসব লেখককে অনুসরণ করে। তারা অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় কাব্য রচনা করে স্পেনীয় মুসলমানদের সমালোচনা করে। এসব কবি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে লুণ্ঠনকারী, দস্যু দলের সরদার, কপট, ইন্দ্রের পূজারী, লোভী ও জাদুকর বলতেও দ্বিধা করেনি। কোনও কোনও পাশ্চাত্য লেখক হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এক শ্রেণীর রোমান ধর্মযাজকের সাথে তুলনা করেছে। এসব ধর্মযাজক নিজেরা পোপের মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হয়ে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে বেড়িয়েছে। জনৈক লেখক হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে মিথ্যে অভিযোগ করেছে, তিনি নাকি খোদা হয়ে বসেছিলেন। তাঁর রোষ স্তিমিত করার জন্য অনুসারীরা নাকি তাঁর নামে মানুষ কোরবানী দিত। আর একজন লেখক হলেন জাবির দানুজন। তার বক্তব্যের সবই অভিযোগ আর অভিযোগ। তিনি লিখেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) নাকি নেশাতুর অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। অনুসারীরা নাকি তাঁর মৃতদেহ ময়লা আবর্জনার স্তুপে পেয়েছে। তাঁর মৃতদেহের কিছু অংশ নাকি শূকর খেয়ে ফেলেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে ব্যঙ্গ কবিতা রচনাকারী কবিরা বলেছে, মহানবী (সা)-এর ব্রোঞ্জের প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়েছে। অনুসারীরা মসজিদে তাঁর প্রতিকৃতি কেবলার দিক করে রাখে। তৎকালীন ইস্তাম্বুলের কবি সাখ্নুর, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ উল্লেখ করে হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে। তাতে বলা হয়, কয়েকজন লোক দেখেছে, সোনা ও রূপা দ্বারা মহানবী (সা)-এর প্রতিকৃতি তৈরি করে হাতীর পিঠে রাখা হয়েছে। কবি রোলান তার কাব্যে এক উদ্ভট ঘটনা বিবৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, স্পেনীয় খৃষ্টান বাহিনী নাকি মুসলমানদের প্রতিমাগুলো ভেঙে ফেলে আর এসব প্রতিমার মধ্যে তিন খোদাও ছিল। তাদের নাম হলো, তরকাজান, মাছুম ও এপোলোন। ‘মুহাম্মদের কাহিনী’ শীর্ষক গ্রন্থের লেখক তার গ্রন্থে লিখেছেন, ইসলাম ধর্মে একজন স্ত্রীলোকের জন্য একাধিক স্বামী বৈধ!

মোটকথা এসব বিদ্বৈষী খৃষ্টান লেখকদের ইসলাম ও ইসলাম ধর্ম প্রবর্তকের বিরুদ্ধে এ ধরনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অনবরত বেড়েই চলতে থাকে। বিশেষ করে রোদুলফ দুলুহ্যাম-এর সময় থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত নিকোলাদেকিস, মারাতাশী, হুতানজার, ববিলইয়ান্দার, প্রেদো প্রমুখ পর্যন্ত এই বিষোদগার একই ধারায় চলে আসছে। তাদের ভাষায় হযরত মুহাম্মদ হলেন দাজ্জাল আর ইসলাম হলো সকল অশ্লীল ও কুকাজের পরিণাম। তারা লিখেছে, মুসলমানরা নাকি অসভ্য জাতি আর তাদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআন হচ্ছে একটা বাজে গ্রন্থ। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এসব খৃষ্টান লেখক ইসলাম সম্পর্কে জঘন্য ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার পরও তারা আবার দুঃখও প্রকাশ করেছে।

কাযাবেলী হলেন খৃষ্টান লেখকদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি, যিনি ল্যাটিন ভাষায় পবিত্র কোরআন অনুবাদ করে ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রপাসকল ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিকাশ সম্পর্কে পুস্তক লিখেন। আনুসান অষ্টম তার গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদকে হযরত ঈসার শত্রু প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। মধ্যযুগের অধিকাংশ খৃষ্টান লেখক হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে ধর্মহীন প্রমাণ করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালান।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লারমোন লিওন, ষোড়শ শতাব্দীতে গায়লিউস বাস্তেল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রোলা ও জাঁবিয়া এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে দুবুরুজলী ও রেনান প্রমুখ ইসলামকে পরস্পরবিরোধী

ধর্মীয় বিশ্বাসের সমাহার বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তা সত্ত্বেও কিছুসংখ্যক পাশ্চাত্য লেখক তাঁদের গ্রন্থরাজিতে ইসলাম ও তার প্রবর্তক সম্পর্কে কিছুটা ন্যায্যনীতির পরিচয় দিয়েছেন। এসব লেখকের মধ্যে রয়েছেন বোলানকিলিয়াহ্ শোভেল, কোশন দোবারসকাল, দোজি, স্প্রেংগার, বারতলমী, সাঁতলার, দোকাস্তুরী, কারলাইল প্রমুখ। তা সত্ত্বেও ১৮৭৬ সালে দুর্ভুতি তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) নাকি “অপবিত্র আরব মোনাফেক” ছিলেন। তার আগে ১৮২২ সালে ফস্টারও মহানবী (সা) সম্পর্কে অনুরূপ জঘন্য মন্তব্য করেন। সত্যি কথা বলতে কি, ইসলাম সম্পর্কে খৃষ্টানদের এই ঘৃণ্য আচরণ কোনও দিনই পরিবর্তন হবে না।

পাশ্চাত্য লেখকরা দাবি করছেন, তাদের এ যুগ হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ, চিন্তার স্বাধীনতা ও সাম্য-মৈত্রীর যুগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও শত শত বছর থেকে চলে আসা মানুষে মানুষে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ তারা অত্যন্ত নির্মমভাবে টিকিয়ে রেখেছে। স্বয়ং দরমিংহামও এই ঘৃণ্য আচরণের প্রতি ইঙ্গিত করে তাদের নিন্দা করেছেন।

অবশ্য পাশ্চাত্য লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ কেউ স্বীকার করেছেন যে, “নিজের রিসালাতের উপর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ঈমান ছিল অত্যন্ত প্রগাঢ়। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর বিধি-বিধান প্রচারের জন্য ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করেছেন—এ ব্যাপারেও মহানবী (সা)-এর অটল বিশ্বাস ছিল।”

কোনও কোনও লেখক স্বীকার করেছেন, “মহানবী শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর স্বভাব ছিল অমায়িক। তিনি বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন। সব দিক থেকে তিনি ছিলেন অতুলনীয় আদর্শ চরিত্রবান ব্যক্তি।”

সংগুণাবলির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়ায় কোনও কোনও খৃষ্টান চিন্তাবিদ মহানবী (সা)-এর প্রশংসাও করেছেন। তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জগৎ ইসলাম ও তার প্রবর্তকের সাথে চরম শত্রুতামুক্ত হতে পারেনি। তারা বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে খৃষ্টধর্ম প্রচারক পাঠাচ্ছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, খৃষ্টধর্ম প্রচারকের ছদ্মবেশে ইসলাম সম্পর্কে নানান অমূলক অভিযোগ ও কুৎসা রটনা করা এবং মুসলমানদের তাদের দীন-ধর্ম থেকে বিভ্রান্ত করে খৃষ্ট মতবাদের দিকে আকৃষ্ট করা।

ইসলামের প্রতি খৃষ্টানদের শত্রুতার কারণ

খৃষ্টানরা ইসলামের বিরুদ্ধে কেন এরূপ শত্রুতা করছে। কেন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিরলস প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কেন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছে—এর পর্যালোচনা করা দরকার। খৃষ্টানদের এরূপ করার প্রধান কারণ হলো ইসলামের মূলতত্ত্ব ও ইসলাম ধর্মপ্রবর্তকের মহান চরিত্র সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, শত্রু বা প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো বিদ্বেষ ও শত্রুতার সবচাইতে বড় কারণ। সত্যি কথা বলতে কি, বিগত শতাব্দীগুলোতে ইসলাম ধর্ম ও তার প্রবর্তকের প্রতি শত্রুতা খৃষ্টানদের শিরায়-উপশিরায় স্থান করে নিয়েছে। তাদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানোর ভূত একাধিক রং ও রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর এ সব ভূত তাড়ানোর জন্য প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী উদ্যোগ-প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আগা-গোড়াই এর সুতীব্র অভাব দেখা গেছে। দ্বিতীয় কারণ হলো, সারা বিশ্বে পাশ্চাত্যজগতের রাজনৈতিক

প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার লোভ-লালসা। এই লোভ চরিতার্থ করার জন্য তারা পৃথিবীর অনুন্নত জাতিগুলোতে নিজেদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ আরম্ভ করে। মূলত তাদের এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ইসলাম বিদ্বেষ খৃষ্টধর্মীয় মতবাদে দীক্ষিত থাকার ফলশ্রুতি ছিল না। তার কারণ খৃষ্টধর্মের বাণী ‘দুনিয়াবিমুখতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য’ পাশ্চাত্য জাতিগুলোর মন-মানসিকতা ও পরিবেশের অনুকূল ছিল না। খৃষ্টধর্ম গ্রহণের আগেও তারা একাধিক খোদার পূজা করত। প্রাকৃতিক অবস্থার দরুন বছরের বার মাসই তারা হাড়কাঁপানো শীতে বন্দী হয়ে থাকত। ফলে দু’মুঠো খাবারের জন্য তাদের ভাবনার অন্ত ছিল না। এমনকি এজন্য তারা হযরত ঈসাকে ‘রিষিকদাতা হিসাবে গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেনি। কিন্তু এ পথেও তারা প্রয়োজনীয় অনুসংস্থানে কামিয়াব হলো না। অবশেষে এই অভাব-অনটন দূর করার জন্য তারা দূরদূরান্তের অনুন্নত জাতিগুলোকে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অকটোপাসে আবদ্ধ করার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ বেছে নিল। তাতে করে তারা খৃষ্টধর্মের বাণী ‘দুনিয়াবিমুখতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যকে নিজেদের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ-বিগ্রহে রূপান্তরিত করে ফেললো।

যুগে যুগে নব্যত্বের ক্রমবিকাশ ধারায় খৃষ্টধর্ম ছিল একটি উত্তম যোগসূত্র। এর শেষ সীমা হলো ইসলাম। ইসলামের মাধ্যমেই এই ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে। আত্মা ও শরীর যেমন একে অপরের সহায়তায় সচল থাকে, তেমনি খৃষ্টধর্ম ও অন্যান্য আসমানী ধর্মের মধ্যেও মূলগতভাবে একটা অভিন্নতা ও একাত্মতা রয়েছে। আর এসব ধর্মের পারস্পরিক যোগসূত্রতা ও ধারাবাহিকতার ফলশ্রুতি হিসাবেই বিশ্ব-সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে এবং করছে। কিন্তু পশ্চিমা খৃষ্টজগত তাদের শক্তির মদমত্ততা ও সাম্রাজ্যবাদী লিপসায় প্রকৃতির এসব অমোঘ বিধান ভুলে বসে। তারা মানব সভ্যতার এই ক্রমবিকাশ ও বিন্যাস-ধারায় অত্যন্ত নির্মমভাবে কুঠারাঘাত হানে।

আমাদের মতে ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মনোভাব অনেকটা তৎকালীন আবিসিনিয়ার খৃষ্টান সম্রাটের অনুরূপ ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা) কিছুসংখ্যক মুসলমানকে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। সেখানকার সম্রাট ইসলামের মাহাত্ম্য অনুধাবন করেন কিন্তু সিংহাসনচ্যুত হওয়ার ভয়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অনুরূপ পাশ্চাত্যের খৃষ্টানরাও তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হওয়ার আশংকায় ইসলামের মাহাত্ম্য অনুধাবন করা সত্ত্বেও তারা এ ধর্ম গ্রহণ করেনি। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ ও অস্ত্র ধারণের পথ বেছে নেয়।

এ কথা বাস্তব সত্য যে, পাশ্চাত্য জগত ধর্মপরায়ণতা ও নাস্তিকতার বাড়াবাড়িতে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে, মধ্যপন্থা ও বাড়াবাড়ির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলে। অবশ্য তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিল, যারা হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর শিষ্যদের সঠিক অনুসরণ করত। এ ধরনের হাতে গোনা কয়েকজন লোক ছাড়া সমগ্র পাশ্চাত্য জগতকে যুদ্ধোন্মাদনায় পেয়ে বসে। বাহ্যত তারা ধর্মের নামেই এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ করত। তার গভীরে নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল। প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার প্রবল নেশা তাদের এমন পেয়ে বসে যে, অখৃষ্টান প্রতিপক্ষ তো ছিলই, এমনকি নিজেরাও এক ফেরকা আর এক ফেরকার সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধাতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। খৃষ্টানদের এই আত্মঘাতী যুদ্ধে উভয় পক্ষের পোপরা সেনাপতির দায়িত্ব পালন করত। তাদের এসব যুদ্ধ-বিগ্রহের অবস্থা

এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, আজ হয়তো এক সম্প্রদায় বিজয় লাভ করল। কাল আবার এই বিজয়ী দলই অন্যের নিকট পরাজয় বরণ করল। অবশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটি দল চিরদিনের জন্য প্রতিপক্ষ দলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। যে দলীলের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হতো, শেষ পর্যন্ত বিজয়ী দল তা হস্তগত করে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই দলীলটি উভয় দলের নিকট অত্যন্ত সম্মানিত বস্তু হিসাবে বিবেচিত হতো। আর তাই যাদের ঘরে এটি যেতো, মনে করা হতো সব ঈমান-বিশ্বাস সে ঘরে গিয়ে জমা হয়েছে। এমনকি, বিজয়ী দল উক্ত দলীলের নাম দেয় ইল্ম বা 'জ্ঞান'।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে খোদ পাশ্চাত্য জগতই খৃষ্টধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। তারা হযরত ঈসার 'শিক্ষায়' আত্মার খোরাকের শূন্যতা তীব্রভাবে অনুভব করতে আরম্ভ করে। তারা গলা থেকে ক্রুশেডের প্রতীক ফেলে দেয়ার জন্য প্রকাশ্য আন্দোলন আরম্ভ করে। তারা সমকালীন বিশ্বে প্রচলিত সবক'টি ধর্মের প্রতি তাকাতে শুরু করে। কিন্তু কোনও ধর্মেই তারা তাদের হৃদয়ের অস্থিরতার সমাধান খুঁজে পায় না! অবশেষে নিজেরাই 'খিওসোফিক্যাল সোসাইটি' নামে একটি দলের গোড়াপত্তন করে। তাতে তারা নিজেদের আত্মার প্রশান্তি আছে বলে মনে করে। ইউরোপ-আমেরিকার খৃষ্টানরা দলে দলে এই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে থাকে। অবশ্য খৃষ্টধর্মের সত্যিকার বিধানগুলোই নিজেদের জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা তাদের উচিত ছিল। কারণ এগুলোই পাশ্চাত্যের ভৌগোলিক পরিবেশ ও মন-মানসিকতার অনুকূল ছিল। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তারা মানসিক শান্তির উপাদান এমন সময় অন্বেষণ করে, যখন তাদের বস্তুগত স্বার্থ ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। সমগ্র প্রাচ্য উপনিবেশে পরিণত করেও তাদের সাম্রাজ্যবাদী লিঙ্গায় এতটুকু ভাটা পড়ে না। সবচাইতে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, তারা এরূপ বস্তুবাদী স্বার্থান্ধ হয়ে পড়ে যে, ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কেও অবহিত হতে পারেনি। অথচ ইসলামে মানসিক প্রশান্তির সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা রয়েছে (এমনকি সে সময় তারা নিজেদের খৃষ্টধর্মেরও পুনর্মূল্যায়ন করেনি)। এ বস্তুর অনুসন্ধানে তারা ভারতীয় উপমহাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে। কতো ভাল হতো ইসলামের মধ্যে যদি তারা সে বস্তুটি অনুসন্ধান করত। ইসলামের এই বস্তুটিই হৃদয়ের প্রশান্তির উপাদান এবং আত্মার বেঁচে থাকার জন্য জীবনীশক্তি। এ ছাড়া কোনও জীবন টিকে থাকতে পারে না। বস্তুত ইসলামের এই বস্তুটি প্রকৃতি ও জীবন ব্যবস্থারই অভিন্ন অংশ।

সাম্রাজ্যবাদী লোভে ইসলামের বিরোধিতা

সাম্রাজ্যবাদী লিঙ্গা বাস্তবায়নের পথে পাশ্চাত্যের জন্য ইসলামের অস্তিত্ব বিরাট প্রতিবন্ধকতা ছিল। তাই তারা তাদের জনসাধারণের মধ্যে ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে নিন্দাবাদ ছড়াতে থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও রোমানদের শোচনীয় পরাজয়ে মক্কার কুরাইশরা তাদের মুশরিক বন্ধু রাষ্ট্র ইরানের সমর্থনে যে ধরনের প্রচার-প্রাপাগাণ্ডা চালিয়েছিল পাশ্চাত্য জগতও হুবহু অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করে। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক জাদুকররা তাদের নিজ নিজ মহলে এরূপ একটা ধারণা প্রতিষ্ঠা করে যে, "মুসলমানদের অপমানের একমাত্র কারণ হলো ইসলাম। এর জন্যই তারা অন্যান্য জাতির অধীনে শৃংখলাবদ্ধ হয়ে আছে।"

ইসলামের প্রতি তাদের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক ও কূটউদ্দেশ্য প্রণোদিত। পাশ্চাত্য জগত কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে যে, কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ইসলামই ছিল তাহযীব-তামাদুনের মধ্যমণি। জ্ঞান-বিজ্ঞান ইসলামের কোলেই লালিত-পালিত হয়েছে। সারাবিশ্ব ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকেই আলোকিত হয়েছে। পাশ্চাত্য জগত এই সেদিন অজ্ঞতা ও দীনতার অভিশাপমুক্ত হলো। অথচ তারাই আবার ইসলামের সমালোচনা করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে তারা যে অভিযোগ করছে, তা বরং তাদের নিজেদের প্রতিই আরোপিত হয়। কারণ খৃষ্টধর্ম গ্রহণের ফলেই তারা এত দিন জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত ছিল। পক্ষান্তরে ইসলাম একটি মরুবাসী জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি ও রাজকীয় মুকুট পরিয়ে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এমনকি পাশ্চাত্যেরই একটা অংশ (স্পেন) কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল।

ইসলাম ও মুসলিম জাতি

পাশ্চাত্য লেখক যারা ইসলামই মুসলমানদের রাজনৈতিক পতনের কারণ বলে থাকেন, তাদের এই ভূমিকা অনেকটা ক্ষমার চোখে দেখা যায়। কারণ তারা দুটো উৎস থেকে এ ধরনের লেখার উপকরণ লাভ করেছেন। একটি হলো ইসলামের বন্ধুবর্ষী শত্রুদের বই-পুস্তক। অপরটি ইসলামের অজ্ঞ মুসলিম বন্ধুদের লেখা। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকরা আল্লাহ তা'আলার ধর্ম ইসলামে এমন সব কথা অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন, যেগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কিছুতেই পছন্দ করতে পারেন না। অথচ এই শ্রেণীটির আচরণ অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ। কেউ ধর্ম সম্পর্কে তাদের এসব বানানো কথা অস্বীকার করেছে। তা তার ভাগ্যে জুটেছে কাফেরীয় ফতোয়া। এখানে সে সবার বিস্তারিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। মুসলমানদেরই লেখা মহানবী (সা)-এর কোনও কোনও জীবন-চরিত গ্রন্থ দেখে আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ি। এসব গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে এমন সব কথা জুড়ে দেয়া হয়েছে, যা দেখে হতভম্ব হতে হয়। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো ইসলামের এসব অজ্ঞ বন্ধু তাদের বানানো কথাবার্তাকে মহানবী (সা)-এর রিসালাত প্রমাণের সহায়ক মনে করে বসে আছে। অথচ এসবে নবুয়তের আবাস্তবতাই ফুটে ওঠে। বস্তুত এসব ভিত্তিহীন তথ্য মূলধন করেই প্রাচ্যবিদরা ইসলাম, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এবং মুসলমানদের সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ করে থাকে। এক শ্রেণীর অজ্ঞ মুসলমান লেখক অন্ধ বিশ্বাসের শিকার হয়ে মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত বিষয়ক গ্রন্থরাজিতে যেসব মনগড়া কথা লিখেছে প্রাচ্যবিদরা যদি এসবের উপর নির্ভর না করত, তাহলে আমাদের এতটা অভিযোগ ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্যের লেখকরা সেসব মনগড়া তথ্যই আরো রং চড়িয়ে পরিবেশন করেছে। তাতে আসল-নকলের ফরক করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে। আরো দুঃখজনক ব্যাপার হলো, তারা তাদের এসব লেখাকে 'আধুনিক অনুসন্ধান' নাম দিয়েছে। অথচ আধুনিক অনুসন্ধানের ধর্ম হলো, কোনও বিষয় সম্পর্কে কলম ধরার আগে তার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করতে হবে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে অপ্রাসঙ্গিক অংশগুলো একদিকে ফেলে রাখতে হবে। এরপর মূল তথ্যাবলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের লেখায় দেখা যায়, তারা শুধু দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িয়েছে। পরিষ্কার দেখা যায়, তারা তাদের দাবি এরূপ আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করেছে

যাতে তাদের অনুসারীরা এসব বাস্তব হিসাবে গ্রহণ করে, সত্য বলে মনে করে। সত্যকে এরূপ বিকৃত করা স্বার্থান্ধ ও বিদ্বেষী পাশ্চাত্য লেখকদের আদৌ উচিত হয়নি। অবশ্য এরপরও আমরা স্বীকার করছি, কিছুসংখ্যক নিরপেক্ষ খৃষ্টান লেখক রয়েছেন, যারা ইসলাম ও তার প্রবর্তক সম্পর্কে কলম-চালনায় খুব একটা ন্যায্যনীতিভ্রষ্ট হননি।

মুসলমানদের দৃষ্টিতে অনুকরণ ও গবেষণা

পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা ইসলাম ও তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে যেসব ভিত্তিহীন ও মিথ্যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে, মুসলিম লেখকরা সেসব খণ্ডন করার নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মিসরের মুফতী আবদুহ। তিনি ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ। দুঃখের বিষয়, মুসলিম লেখকদের এই মহলটির বক্তব্য সঠিক বলে স্বীকার করে নেয়ার পথে দু'টি ব্যাপার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত এসব মুসলিম লেখক-চিন্তাবিদ তাঁদের মনের ভাব আধুনিক পদ্ধতিতে পরিবেশন করতে পারেননি। এই বাহানায় মুসলমানদের চিরশত্রু প্রাচ্যবিদরা সেসব লেখা প্রত্যাখ্যান করে। অপর বাধাটি হলো, একদল মুসলিম লেখককে মুসলমানদের পক্ষ থেকেই নাস্তিক ও বেদীন বলে দোষারোপ করা হয়েছে। এসব অভিযুক্তের অগ্রনায়ক হলেন মিসরের মুফতী আবদুহ। মুসলমানদের তথ্যপূর্ণ লেখা গ্রহণ না করার জন্য পশ্চিমা-লেখকরা এটাও একটা বাহানা পেয়ে যায়। তাতে করে তারা এসব মুসলিম চিন্তাবিদের লেখা গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রত্যাখ্যান করে।

মুসলিম যুব সমাজ মুফতী আবদুহর মতো যুক্তিবাদী মুসলিম লেখকদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিল। প্রাচীনপন্থী আলেমগণ যখন প্রগতিশীল আলেমদের বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া প্রকাশ করেন, যুব সমাজে এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়। তারা ভাবতে শুরু করে আমাদের প্রাচীনপন্থী আলেমগণ ইসলাম সম্পর্কে যে কোনও যুক্তিপূর্ণ ও দর্শনভিত্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকেই কুফরী কাজ বলে গণ্য করে থাকে। এসব আলেমের দৃষ্টিতে 'ইজতেহাদ' করার অর্থই অনেকটা কুফরী করা। আর ঈমান মানে অনেকটা স্থবিরতা। অধিকন্তু তারা মুসলিম লেখক-চিন্তাবিদদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। তাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, মুসলিম লেখকরা ইসলামের যেসব তত্ত্ব, তথ্য ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেননি, পশ্চিমা লেখকরা সেসব অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছে। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য মুসলিম যুব সমাজ পশ্চিমা লেখকদের গ্রন্থরাজির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা আধুনিক লেখকদের চাতুর্যময় কলম চালনা সম্পর্কে মুসলিম যুব সমাজ মোটেও আঁচ করতে পারেনি।

এমনকি ইসলামের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের অতীত প্রচার-প্রপাগান্ডা সম্পর্কেও মুসলিম যুব সমাজ খোঁজ-খবর নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। পাশ্চাত্যের আধুনিক প্রাচ্যবিদদের আগে গির্জার লেখকরা ইসলাম ও ইসলামের রাসূল (সা) সম্পর্কে নগ্নপন্থায় বিষোদগার করত আর মুসলমানরা সে সব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করত। মুসলমানদের এরূপ কঠোর মনোভাব দেখে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচারধারা পরিবর্তন করে। তারা গির্জাবাসীদের নগ্ন বিষোদগারের পথ পরিহার করে। এবার তারা গবেষণার নামাবলি পরিধান করে অভিনব পন্থা অবলম্বন করে কখনো তারা দর্শন সাহিত্যের শিরোনামে মুসলিম যুব

সমাজের ধর্মবিশ্বাসে ইসলামবিরোধী প্রভাব বিস্তারের অভিযান চালায়। আবার, কখনো সাহিত্য ও কাব্যের মন ভুলানো রূপে যুব মনে স্থান করে নেয়ার প্রয়াস চালায়। যুক্তি-প্রমাণের নামে প্রতিটি বস্তুর সামনে মাথা নত করাই মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। মুসলিম যুবকরাও তার ব্যতিক্রম নয়। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদদের যুক্তিধর্মী বক্তব্য তাদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের উত্থাপিত প্রশ্নাবলির সমাধান নিজেদের প্রাচীনপন্থী আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনীয়তাও মুসলিম যুব সমাজের মনে অনুভূত হয়। পরস্পরেই আবার ভাবে সমাজে তাদের সংখ্যা খুবই কম। অপরদিকে আলেমরা প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের সাহায্য-সহায়তাকারীর সংখ্যাও অগণিত। কিন্তু যুবকদের সাহায্যে কেউই এগিয়ে আসবে না এসব দিক ভেবে নীরব থাকাই তারা শ্রেয় মনে করে। আর তার পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, প্রথমে ধর্ম সম্পর্কেই মুসলিম যুব সমাজের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এরপর ইসলাম ধর্ম ও তার প্রবর্তক সম্পর্কে তাদের মনে নানা সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে পড়ে।

মুসলিম যুব সমাজের ইসলামের প্রতি বিদ্রোহী হওয়ার আর একটা কারণ হলো, ধর্মের অনেক বিষয় আধুনিক তর্ক-শাস্ত্রের নীতিমালার নিরিখে মূল্যায়ন করা যাচ্ছে না। বিশেষ করে, ইসলামের যেসব বিষয় ধর্মীয় সূত্র থেকেই অতিপ্রাকৃতিক বলা হয়েছে, তাদের ভাষায় দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো সঠিক নয়।

এসব মুসলিম যুবক পশ্চিমা লেখকদের গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করার সময় এ বিষয়টির প্রতিও দৃষ্টিপাত করেছে যে, বিভিন্ন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রে গির্জা ও ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে দা-মাছের সম্পর্ক রয়েছে। কোনও খৃষ্টান দেশ, সেটা প্রোটেস্ট্যান্টই হোক কিংবা ক্যাথলিকই হোক, রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের কোনও হাত নেই। গির্জার পক্ষ থেকে সল্লিষ্ট দেশের সরকারের প্রতি শুধু সমর্থন দেয়া হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এ ছাড়া পোপের আর কোনও অধিকার নেই। কিন্তু সরলমনা মুসলিম যুব সমাজ পাশ্চাত্য জাতিগুলোর এই ক্ষমতা বন্টন থেকেও উল্টো শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তারা দেখেছে, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সরকার তাদের খৃষ্ট ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তা সত্ত্বেও ইসলামের ব্যাপারে এসব শাসক গোষ্ঠী কত উদার। তারা ইসলাম সম্পর্কে গবেষণার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছে। ইসলামের ব্যাপারে এই ভূমিকাকে সরলমনা মুসলিম যুব সমাজ পাশ্চাত্যের বিদ্যানুরাগিতা হিসাবে বিশ্বাস করেছে। পাশ্চাত্য লেখকদের গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করার সময় মুসলিম যুব সমাজের মনে এ ধরনের অসংখ্য কারণ এসে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তারা পাশ্চাত্য লেখকদের নিরপেক্ষ আদর্শবান মনে করে এবং তাদের লেখা দর্শন ও সাহিত্য গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে। অথচ এসবের প্রতিটি অংশ ইসলাম ধর্ম ও তার রাসূল (সা) সম্পর্কে বিদ্রোহ ছড়ানোর ক্ষেত্রে পাকা শিকারীর লক্ষ্যভ্রষ্টহীন তীরের মতো কাজ করেছে।

প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন

অবশ্য পাশ্চাত্য লেখকদের সাহিত্য ও বর্ণনাধারা থেকে উপকৃত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে প্রাচ্য তার প্রাচীরাবন্ধদের তাদের অতীতের অস্পষ্টতা থেকে অনেকটা বের করে ফেলেছে। ফলে তার অতীতের জড়তা পর্দায় ঢাকা পড়ে গেছে। অবশ্য প্রাচ্যবাসীদের তাদের অনগ্রসরতার প্রতিও তাকাতে হবে। আর

পাশ্চাত্যের গবেষণা পদ্ধতির অনুসরণ ছাড়া সেদিকে দৃষ্টিপাত করাও সম্ভব নয়। প্রাচ্যবাসী আধুনিক চিন্তাধারার মাধ্যমেই তাদের বর্তমান যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় করে গড়ে তুলতে পারে।

পাশ্চাত্যের লেখকরা যে অত্যন্ত পরিশ্রম করে ইসলাম ও প্রাচ্যের বিভিন্ন বিষয় একত্রিত করেছেন, আমরা তাদের এই অবদান অস্বীকার করছি না। কিন্তু ইসলাম ও প্রাচ্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁরা যেসব গ্রন্থ লিখেছেন, সেগুলো কলেবরে যতই বড় হোক, তথ্যাবলির দিক থেকে প্রাথমিক স্তর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এখন আমাদের কর্তব্য হলো পাশ্চাত্য লেখকদের গ্রন্থরাজির ভুলভ্রান্তি ও বাহুল্য ঝেড়ে ফেলে পরিষ্কার করা। এরপর এগুলোকে প্রয়োজনীয় সংযোজনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ রূপ দান করা। কেননা সমস্যা যে দেশ ও জাতির স্বভাবত তারাই সে সব সবচাইতে বেশি উপলব্ধি করতে পারে। আর আমরা যদি তাতে সফল হই, তাহলে আমরা ইসলাম ও প্রাচ্যের মূল তত্ত্বকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব পালনে সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবো। পাশ্চাত্যের লেখকরা ইসলাম ও প্রাচ্যের প্রতি যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছে এবং এক্ষেত্রে তারা যেসব যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছে, সেগুলো নিছক প্রত্যাখ্যান করে বসে থাকা আমাদের জন্য উচিত হবে না। কারণ ইসলাম আমাদেরই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জীবনাদর্শ। আর এর হেফাযত করা আমাদেরই পরম কর্তব্য। এ ব্যাপারে আমাদের পুরো শক্তি নিয়োগ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হচ্ছে একটি আলোর মিনার। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এই আলো থেকে আমাদের নিজেদের আলোকিত করতে হবে। এরপর অন্যদেরও আলো দান করতে হবে। সুখের বিষয়, বর্তমান যুগে অনেক মুসলিম লেখকও পাশ্চাত্যের আধুনিক স্টাইলে লিখতে পারেন। তাদের প্রতিভার কথা পশ্চিমা লেখকরাও অকপটে স্বীকার করেন।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের আধুনিক চিন্তাবিদরা লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। আমরা আশা করি, উভয় পক্ষের প্রচেষ্টা পরস্পরের জন্য ফলপ্রসূ হবে। খৃস্টান ধর্মযাজক সম্প্রদায় পূর্বের মতোই এখনো ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে কুৎসা রটনায় ব্যস্ত রয়েছে। তারা তাদের পূর্বসূরিদের পথ থেকে এতটুকু সরেনি। প্রাচীন কালের খৃস্টান ধর্মযাজকদের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

ইসলাম সম্পর্কে খৃস্টান ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ আচরণকে পাশ্চাত্যের শাসক গোষ্ঠী গণতন্ত্র ও চিন্তার স্বাধীনতা বলে অভিহিত করে থাকে। চিত্রের অপর দিকের প্রতি তাকালে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। এসব শাসকই তাদের ধর্মযাজক সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রেখেছেন। দুধ থেকে মাখন যেমন পৃথক করে ফেলা হয়, পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীও রাষ্ট্রীয় কাজ থেকে পোপ সম্প্রদায়কে তেমনি পৃথক করে রেখেছেন। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলাম ও তার প্রবর্তকের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য শুধু তাদের ধর্মযাজকদেরকেই আস্কারা দিয়ে রাখেনি, এক শ্রেণীর মুসলমানকেও তারা এ ব্যাপারে ব্যবহার করেছে। এরা হলো সংকীর্ণমনা ইসলামী বিশেষজ্ঞ এবং বক্রদৃষ্টিসম্পন্ন লেখক। তাদের মনোবৃত্তি দেখে স্বয়ং ইসলামও লজ্জাবোধ করছে। এসব আলেম হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে যেসব অর্থহীন ও আজগুবি কথা বানিয়ে রেখেছে তাতে শুধু তাঁর আত্মাই দুঃখ-ভারাক্রান্ত নয়, অন্য মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য

শিক্ষা জীবন শেষ করে সবেমাত্র কর্মজীবনে পা বাড়িয়েছি। দেখতে পেলাম, ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে যেসব অবাস্তব কাহিনী ও রূপকথা ছড়ানো হয়েছে, তা নিয়ে সারা মুসলিম বিশ্ব প্রতিক্রিয়া-জর্জরিত। বিভিন্ন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র ও পরাধীন দেশের মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে একই রূপ দেখা গেল। যেসব ভ্রান্ত বর্ণনা ও চিত্তাকর্ষক কাহিনীর ঘূর্ণিপাকে পড়ে মুসলমান তথা সমগ্র প্রাচ্য হতভম্ব ছিল, আমি সেগুলোর অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করি। পাশ্চাত্যের ধূর্ত লেখকগোষ্ঠি এবং ইসলামের গোঁড়া বিশেষজ্ঞদের এই বাঁকা পথ শুধু ইসলাম ধর্মই নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক ছিল। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানরা বিশ্বের প্রতিটি অংশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করেছে। যদি তাদেরই ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম প্রবর্তকের আচার-ব্যবহার ও কাজ-কর্মে অন্যায়-অজ্ঞতার প্রাবল্য প্রমাণিত হয়, তাহলে মুসলমানদের সংস্পর্শে যেসব জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার লাভ করেছে, তাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে! সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের কি করে কামিয়াব বলা যাবে। এসব দিক চিন্তা করে আমি উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করি। তাতে করে ‘মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত’ লেখার প্রতি আমার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়। এই গ্রন্থ রচনায় আমি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছি। এগুলো হলো, (ক) খৃষ্টান ধর্মযাজক ও প্রাচ্যবিদরা বিদ্বেষবশত ইসলাম ধর্ম ও মহানবী (সা)-এর প্রতি যেসব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে, সেগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। (খ) যেসব গোঁড়া মুসলিম লেখক আবেগের আতিশয্যে ইসলাম ও মহানবী (সা) সম্পর্কে অত্যাুক্তি করেছে, তাদের ভ্রান্তি চিহ্নিত করা। আর এই কিতাবের গ্রন্থনায় আমি পাশ্চাত্যের আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ব্যাপারে আমার সকল উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা একটি মাত্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আর তা হলো, সত্য প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্যোগের পিছনে এ ছাড়া অন্য কোনও লক্ষ্য আমার বিন্দুমাত্র নেই।

এই পর্যায়ে আমি মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত সম্পর্কিত গ্রন্থরাজি পড়াশুনা আরম্ভ করি। কয়েকটি গ্রন্থ আমি একাধিকবার অধ্যয়ন করি। এগুলো হলো (১) সীরাতে ইবনে হিশাম, (২) তাবাকাতে ইবনে সাআদ, (৩) মাগাযী মুহাম্মদ আল-ওয়াকিদী এবং (৪) ‘স্পিরিট অব ইসলাম’-সৈয়দ আমীর আলী। এ ছাড়া মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত বিষয়ক প্রাচ্যবিদদের কয়েকটি গ্রন্থও আমি অধ্যয়ন করি। এসবের মধ্যে রয়েছে ‘হযরত মুহাম্মদের জীবন-চরিত’ দরমিংহাম, ওয়াশিংটন ইরকাঞ্জ প্রমুখের লেখা।

উপরোক্ত গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করার পর ১৯৩২ সালের পুরো শীতকাল আমি আল-আযহারে অতিবাহিত করি। সেখানে অবস্থানকালেই ‘হায়াত-ই-মুহাম্মদ (সা)’ বা ‘মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত’ লেখা আরম্ভ করি। আমার আশংকা ছিল লেখার আধুনিক ধরন ও বিন্যাসের কথা জানতে পারলে সংকীর্ণমনা এক-শ্রেণীর মুসলমান হয়তো আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করবে। এই আশংকায় আমি সাহস হারিয়ে ফেলি। এমনকি লেখাই বন্ধ করে দেই। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক আমার চিন্তাধারার প্রতি বেশ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কিতাবের প্রাথমিক রূপরেখাটিও তাঁরা দেখেছিলেন। লেখা বন্ধ রাখার খবর পেয়ে পুনরায় শুরু করার জন্য তাঁরা পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। যে পদ্ধতিতে লেখা শুরু করেছি, তা অব্যাহত রাখার

জন্যও তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁদের অনুরোধ আমার মধ্যে পুনরায় আগ্রহ সঞ্চার করে। আমি পুনরায় লেখা শুরু করি।

পবিত্র কোরআন উত্তম উৎস

পবিত্র কোরআনে মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিতের পূর্ণ চিত্র রয়েছে। তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনার প্রতি কোরআনে ইঙ্গিত রয়েছে। এসবের আলোকে মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত রচনার জন্য সঠিক পথ লাভ করা যায়। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনকে বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করে পবিত্র হাদীস ও অন্যান্য জীবন-চরিত গ্রন্থকে প্রমাণ হিসাবে নেয়া যেতে পারে। এই নীতি সামনে রেখে আমি এ সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর সংকলন আরম্ভ করি।

মিসরের দারুল কুতুব গ্রন্থাগারের পরিচালক আকা আহমদ লতিফী আমাকে এ কাজে সাহায্য করেন। তিনি এই বিষয় সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো সংকলন করে দেন। ফলে একটা বিরাট পরিশ্রম থেকে আমি বেঁচে যাই। এরপর প্রয়োজন হয় প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার। আর তার জন্য প্রতিটি আয়াতের শানে নুয়ুল সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। তাফসীরকারদের লেখনীর অদূরদর্শিতা এক্ষেত্রে আমাকে রীতিমত হ্যরান করে তোলে। অধিকাংশ তাফসীরকার বিভিন্ন আয়াতের শানে নুয়ুল পুরোপুরি বর্ণনা করেননি। অবশ্য দু'জন মুফাস্সির এক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা সংক্ষেপে হলেও অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিভিন্ন আয়াতের শানে নুয়ুল বর্ণনা করেছেন। তাঁদের একজন হলেন আসবাবুন নুয়ুলের গ্রন্থকার ওয়াকিদী। অপরজন হলেন 'আন্-নাসিখু ওয়াল মানসুখের' লেখক ইবনে সালামা। অন্যান্য তাফসীর ও জীবন-চরিত গ্রন্থের সাথে আমি উক্ত দু'টি গ্রন্থও বেছে নেই।

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ব্যক্তির গ্রন্থ রচনায় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শেখ মুহাম্মদ মুস্তফা মারাগীর সহযোগিতার শুকরিয়া আমি কখনো শেষ করতে পারব না। মিসরের দারুল কুতুব গ্রন্থাগারের প্রধান ওস্তাদ আবদুর রহীম আমাকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থাগারের দরজা তিনি আমার জন্য সব সময় অব্যাহত রেখেছেন। এ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের পরিচিত-অপরিচিত অন্যান্য কর্মচারীও আমাকে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছেন। জা'ফর পাশা আমাকে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ, বিশেষ করে 'সহীহ মুসলিম' ও 'পবিত্র মক্কার ইতিহাস' গ্রন্থ ধার দিয়েছেন। এ ছাড়া কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন। উবায়দ পাশা আমাকে স্যার উইলিয়াম ম্যুর-এর 'হায়াত-ই-মুহাম্মদ' এবং পাদরী লা'মিনসের আল-ইসলাম' গ্রন্থ ধার দিয়েছেন। এ ছাড়াও যেসব গ্রন্থ থেকে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি, সেগুলো 'ফজরুল ইসলাম'-ওস্তাদ আহমদ আমীন, 'কাসাসাসুল আশ্বিয়া'-ওস্তাদ আবদুল ওহাব আনুজ্জার, 'আল আদাবুল জাহিলী'- ডঃ তাহা হোসাইন, 'আল ইয়াহুদু ফি বিলাদিল আরব, ইসরাঈল ও লা'ফিন্সন।

এক্ষেত্রে একটা বিষয় উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, 'মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত' গ্রন্থ প্রণয়নকালে আমার সামনে একটার পর একটা কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যা

উপস্থিত হয়েছে। এসব সমস্যার সমাধানে আমি শুধু মুসলমানদের লেখা বিভিন্ন তাফসীর ও জীবন-চরিত গ্রন্থেরই সাহায্য নেইনি, কোনও কোনও প্রাচ্যবিদের গ্রন্থও আমাকে বেশ সাহায্য করেছে।

এক্ষেত্রে আর একটা বিষয় আমার কাজে বেশ সমস্যার সৃষ্টি করে। সেটা হলো, মহানবী (সা)-এর মহান জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর সাহাবীদের ভূমিকাও জড়িয়ে আছে। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বেড়ে যাওয়ার আশংকায় এসব ক্ষেত্রে আমি শুধু মহানবী (সা)-এর ঘটনাবলিই গ্রহণ করেছি।

এ প্রসঙ্গে আর একটা বিষয় উল্লেখ করতে হয়। সেটা হলো কুসান দ্যা পারসিভালের 'তারিখ-ই-আরব' থেকেও আমি একাধিক তথ্য নিয়েছি। এই গ্রন্থটি তিন খণ্ডে লেখা হয়েছে। প্রথম দুই খণ্ডে প্রাক-ইসলামিক আরবের বিভিন্ন গোত্র ও তাদের জীবনধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে মহানবী ও তাঁর প্রথম দুই খলীফার জীবনালেখ্য। অনুরূপ তবাকাতে ইব্ন সাআদেরও একাধিক খণ্ড রয়েছে। তার মধ্যে প্রথম খণ্ডটি মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত নিয়ে লেখা হয়েছে। অবশিষ্ট খণ্ডগুলোতে সাহাবাদের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থ প্রণয়নের প্রথম থেকেই একটা বিষয়ের প্রতি আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি। আর তা হচ্ছে আমার আলোচনা যেন মহানবী (সা)-এর জীবনালেখ্যের বাইরে না যায়। কারণ তাতে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতির আশংকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সাহাবীদের জীবনী অন্তর্ভুক্ত না করার আর একটা কারণ হলো, মহানবী (সা)-এর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের সামনে যেমন অন্য কারো দিকে দৃষ্টি যায় না, তেমনি হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-ও নিজ নিজ খেলাফত আমলে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের সাথে অন্য কারো তুলনা হয় না। অনুরূপ শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তাঁদের সাথে অন্য কোনও সাহাবার তুলনা করা যায় না। এমনকি, তাঁদের সুকীর্তি ও গুণাবলির উপর পরবর্তীরা গর্বের ইমারত কায়েম করেছেন। শুধু হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) তথা শীর্ষস্থানীয় চারজনই নন, বরং মহানবী (সা)-এর জীবিতকালে তাঁর আলোর সামনে সকল সাহাবার ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলিই ছিল নগণ্য। এই জন্য প্রত্যেক লেখকেরই উচিত, মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত বর্ণনায় অন্যান্য ব্যক্তিত্বের জীবন-চরিত সংযোগ না করা। বিশেষ করে আধুনিক পদ্ধতিতে মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত লেখার সময় এ বিষয়টির প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখা উচিত। তাতে মহানবী (সা)-এর অতুলনীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের অন্তর ও মস্তিষ্কে রেখাপাত করতে পারে। এ পদ্ধতিতে ঈমান ও বিশ্বাস সুদৃঢ় করা সম্ভব।

আমাদের কিছুসংখ্যক সংকীর্ণমনা লেখক অজ্ঞতাবশত শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে মহানবী (সা)-এর সাথে এমন ব্যবহার করেছে, যা শত্রুরাও করেনি। তাদের তুলনায় বরং প্রাচ্যবিদদের লেখা মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থরাজিই অধিক দৃষ্টিদানযোগ্য। তাদের লেখায় একদিকে মহানবী (সা)-এর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, অপরদিকে এরূপ বিচার-বিবেচনার দৃষ্টি নিয়ে মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনের প্রতি তাকালে নিজের ঈমানীশক্তিও বৃদ্ধি পায়। এসব প্রাচ্যবিদের মধ্যে রয়েছেন 'আল-ইবতাল'-এর লেখক

টমাস কার্লাইল, 'লাইফ অব মুহাম্মদ'-এর লেখক স্যার উইলিয়াম ম্যুর, ইরকাঞ্জ, স্প্রিংগার, ওয়াইল প্রমুখ। তাঁরা প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে মহানবী (সা)-এর অতুলনীয় ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোনও কোনও ব্যাপারে মুহাম্মদ (সা)-এর সমালোচনাও করেছেন। এ ধরনের সমালোচনার পিছনে বাহ্যত একটি কারণই আমরা প্রধানত দেখতে পাই। তা হলো, উল্লিখিত প্রাচ্যবিদরা বিতর্কিত বিষয়গুলো গভীর দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন ও বিচার-বিবেচনা করেননি। কোনও কোনও তাফসীর ও জীবন-চরিত গ্রন্থে পরিবেশিত এসব বর্ণনাকে তাঁরা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। ইসলামের প্রথম দুই শতাব্দীতে এসব বর্ণনা রূপ লাভ করে। শুধু মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত সম্পর্কেই নয়, ইসলামের অন্যান্য বিষয়েও ইহুদীদের কারসাজিতে এ ধরনের কল্পকথার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ সময়ে ইসলামের শত্রুরা অনেক 'মওজু হাদীস' মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।^১ আর এ ব্যাপারটি স্বয়ং প্রাচ্যবিদরাও স্বীকার করেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা এসব বর্ণনা নিজেদের গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন। অথচ তাঁরা মামুলীভাবে দৃষ্টিপাত করলেও সঠিক ও ভিত্তিহীন বর্ণনাগুলো চিহ্নিত করতে পারতেন। মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত লিখতে গিয়ে প্রাচ্যবিদরা যেসব ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে গারানিক বা দেবতাদের কাহিনী, হযরত য়ায়েদ ও যয়নবের ঘটনা, মহানবী (সা)-এর একাধিক স্ত্রী প্রভৃতি। এসব লেখক চিন্তাবিদ যদি বিতর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করতেন, তাহলে ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেতেন। আমি এ ধরনের ব্যাপারের বর্ণনাগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

আলোচনার সূচনা

এ কথা দাবি করতে পারি না যে, মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত পরিবেশনায় আমি আমার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছি। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় শুধু একটা বিষয়ের গোড়াপত্তন করতে পেরেছি বলে আমার বিশ্বাস। আর তা হলো নতুন ধারায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করা। প্রকৃতপক্ষে অতীতকালেও কোনও কোনও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক সমকালীন ঘটনাবলি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার দৃষ্টি নিয়ে লিখেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ওলারের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি ফরাসী বিপ্লবের উপর লিখেছেন।

এ ছাড়া আরো অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন জাতির জাগরণের সঠিক চিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তুলে ধরেছেন।

পৃথিবীর যেসব মহান ব্যক্তির জীবন চরিত লেখা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যক্তিত্ব তাঁদের সবার উপরে। সুতরাং ইনসাফ ও জ্ঞানানুরাগের দাবি হলো, অত্যন্ত উদার ও নিষ্কলুষ মন নিয়ে মহানবী (সা) সম্পর্কে কলম ধরতে হবে। বিশেষ করে এক্ষেত্রে আরবের ভৌগোলিক ও গোত্রীয় অবস্থার সাথে পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ড ও জাতিরও তুলনা করতে হবে। এই বর্ণনাধারা শুধু ইসলামের সামগ্রিকতার ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হবে না, সারা বিশ্বের জন্যও কল্যাণকর প্রমাণিত হবে। তাতে পৃথিবীর অসংখ্য আধ্যাত্মিক ও মানবিক বিষয় আলোকময় হয়ে উঠবে।

১. পরবর্তীকালে হাদীস বিশেষজ্ঞরা বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে মওজু হাদীসগুলো বের করে ফেলেন। -অনুবাদক

এই আলোকমালা বিভিন্ন জাতির সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থার বিন্যাসে সহায়ক হবে। ইসলাম ও খৃষ্টধর্মে এখনো যেসব দ্বন্দ্ব-কলহ বিরাজ করছে, এই আলোকমালার প্রভাবে এমনি সেগুলো মিটে যাবে। মুসলমানদের তাদের ঘর বাড়ি থেকে বের করে দেয়া কিংবা ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করার যে প্রবণতা খৃষ্টান ধর্মযাজকদের রয়েছে, তারও অবসান হবে।

গবেষণার ফলশ্রুতি

ইসলামই মানবজাতির শান্তি ও কল্যাণের একমাত্র উপায়। আর এই শান্তি ও কল্যাণের জন্যই বর্তমান সভ্যযুগে মানুষ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে খৃষ্টান সমাজ বিদ্বৈষম্য হতে ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনাদর্শের প্রতি তাকাচ্ছে না। তারা 'থিওসোফি' বা মোল্লাতন্ত্র কিংবা হিন্দুধর্মের বেদ-বেদান্তকে প্রাধান্য দিচ্ছে। বিশ্বমানবের এরূপ নাজুক পরিস্থিতিতে প্রাচ্যের মুসলিম চিন্তাবিদ ও ইহুদী-খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল পণ্ডিত ব্যক্তিদের পরম কর্তব্য হলো, সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির আলোকে ইসলাম ও তার প্রবর্তকের জীবনের বিভিন্ন দিক মানব সমাজে তুলে ধরা। যাতে করে বিশ্ব-মানব সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারে। যদি ইসলামকে আধুনিক গবেষণার আলোকে মানবজাতির সামনে পেশ করা হয়, তাহলে এর মাধ্যমেই তারা ইহকাল ও পরকালে কামিয়াবীর নবদিগন্তে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

আর স্বভাবজাতভাবে ইসলামের মধ্যেই এমন সব বিষয় রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দিক থেকে মানব জীবনকে সুসমামণ্ডিত করে তুলতে পারে। তা দেখে নিছক জ্ঞান যা কারো ভাল-মন্দ কিছুই করতে পারে না হতবাক হয়ে পড়বে। ইসলামকে এই পদ্ধতিতে তুলে ধরার একটা কৌশল এটাও হতে পারে যে, প্রতিটি যুগের চাহিদা অনুযায়ী মানবজীবন ও তার বিন্যাসে ইসলামী আদর্শের আলোকে শক্তি সঞ্চার করতে হবে। কয়েকটি দার্শনিক বিষয় যেমন, জীবন কি? পৃথিবীর সাথে মানুষের কি সম্পর্ক? মানুষ কেন বাঁচতে চায়? কোন্ কোন্ বিশ্বাস বিভিন্ন জাতিকে দুর্বল করে ফেলে। সত্তা ও একক সত্তা কি? একক সত্তার সাথে মানুষের কী সম্পর্ক? এসবের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুগ যুগ ধরে আলোচনা হয়ে আসছে। ধর্মীয় সাহিত্যের অসংখ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছে। মুসলমানরা এসব সম্পর্কিত আলোচনায় তর্কশাস্ত্র ও দর্শনের সয়লাব বইয়ে দিয়েছে। আব্বাসীয় আমল থেকে আজ পর্যন্ত এসবের পিছনে যুক্তি ও বুদ্ধির যে শক্তি কার্যকর রয়েছে, তা যদি মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত ও তাঁর শিক্ষার বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ব্যয় করা হতো, তাহলে বর্তমানে বিশ্ব-মানচিত্র অন্যরূপে দেখা যেতো। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের ভূমিকাও মুসলমানদের ব্যতিক্রম নয়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তারাও মুসলমানদের ন্যায় অনুপকারী বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান নিয়ে ব্যস্ত থাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উল্লিখিত দিনগুলোতে 'ইল্ম' বা জ্ঞান বেচারা এই ভেবে হতবাক হয়ে পড়েছিল যে, মানব সমাজের অগ্রগতির আমিই তো উপায় বা মাধ্যম। কিন্তু মুসলমান ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানের দাবিদাররা এ কোন্ ধরনের আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছে।

এ কথা বাস্তব সত্য যে, মানব জাতির জন্য জ্ঞানের সবচাইতে কল্যাণকর দিক একটি মাত্র পন্থায়ই উদ্ভাসিত হতে পারে। তা হলো, স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক স্থাপন

করা, যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব-মানবকে একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ দেখা যাবে। আর এই শিক্ষা শুধু মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিতেই রয়েছে। তবে শর্ত হলো তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোচনা-পর্যালোচনা করতে হবে। আর এর ফল হিসাবে বিশ্ব-মানব বর্তমান জড়পূজার অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে সক্ষম হবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়, এই লক্ষ্যে পৌছা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু বর্তমান যুগে যেসব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বস্তুবাদের কর্তৃত্ব পতনোন্মুখ বলে মনে করেন, তাঁরা যদি মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত সামনে রেখে উপরোক্ত বিষয়গুলোর সমাধানে সচেষ্ট হন, তাহলে অতি সহজে তাদের সামনে জড়পূজার দেউলিয়াত্ব ভেসে উঠবে। সত্যি কথা বলতে কি, মহানবী (সা)-এর জীবন চরিতের দীপশিখায় ইতিমধ্যে অনেক সামাজিক সমস্যা অন্ধকারের অস্পষ্টতা কাটিয়ে আলোতে আসতে শুরু করেছে। আমরা আশা করি, এই পথে বিশ্বমানব তার হারানো সফলতা পুনরায় লাভ করতে সক্ষম হবে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই গ্রন্থ উপরোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটা স্বাভাবিক পর্যায়ের পদক্ষেপ মাত্র। তা সত্ত্বেও আমার এরূপ আশা রাখা অসঙ্গত হবে না যে, এই কিতাব পাঠের মাধ্যমে সত্য অনুসন্ধিসূরা সান্ত্বনা লাভ করবে। আর এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গবেষণা করে মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত লেখার প্রয়াস পাবেন। লেখক-চিন্তাবিদরা এই পথে তাদের অনুসন্ধানী শ্রম ব্যয় করবেন। তাঁরা মহানবী (সা)-এর জীবন চরিতের আলোকে মানবজাতির শান্তি, ক্লান্তি ও অবসন্নতা দূর করার প্রচেষ্টা করবেন। এসবের মধ্যে একটি লক্ষ্যও যদি অর্জিত হয়, তাহলে আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো। আর তাই হবে আমার অকল্পনীয় সফলতা।

মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ দশ হাজার কপি ছাপা হয়। ছাপার সময়ই তার এক-তৃতীয়াংশ বিক্রি হয়ে যায়। বাদবাকি সব কপি প্রকাশিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। গ্রন্থটি এরূপ আশাতীত জনপ্রিয়তা লাভ করায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় একটু চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে আমার নিজের মনেই তিনটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম সংস্করণটিই দ্বিতীয় সংস্করণ হিসাবে বের করে দেয়া, প্রথম সংস্করণের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিভিন্ন সমালোচনার ব্যাখ্যা সংযোজন করা, না প্রথম সংস্করণে যেসব আলোচনা ও অধ্যায় বাদ পড়ে গেছে, সেগুলোও দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজন করা। এই তিনটি প্রশ্ন নিয়ে মূল্যবান পরামর্শ দান করতে পারেন এমন সব বন্ধু-বান্ধবের সাথে আমি আলোচনা করি। তাঁরা বললেন, কোনও প্রকার সংযোজন-বিয়োজন না করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করায় দু'টি উপকার রয়েছে। তার একটি হলো প্রথম সংস্করণের খরিদদাররা মনোক্ষুণ্ণ হবে না। কারণ তাদের নিকট প্রথম সংস্করণের যে কপি রয়েছে তাতে এবং দ্বিতীয় সংস্করণের কপিতে কোনও প্রকার পরিবর্তন দেখতে পাবে না। দ্বিতীয়ত, এরপর আপনি ধীরে-সুস্থে তৃতীয় সংস্করণের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবেন। তৃতীয় সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংযোজনও করতে পারবেন।

গ্রন্থের সমীক্ষা

আমি উপরোক্ত পরামর্শ অনুযায়ী গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করি। তাতে কয়েক মাস আগেই দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়ে যেতো। কয়েকটি কারণে আমি এই পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকি। গ্রন্থের কয়েকটি বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করি। এগুলো হলো, গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ছাপার সময়ই ওস্তাদ মুহাম্মদ মোস্তফা আল্ মারাগী তাঁর কিছু বক্তব্য নোট করেন এবং পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি সেসব আমার নিকট হস্তান্তর করেন। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর একাধিক লেখক-চিন্তাবিদ বিভিন্ন সংবাদপত্র, সাময়িকী ও বেতারে বইটি সম্পর্কে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেন। তাতে তাঁরা মন খুলে বইটির প্রশংসা করেন। এসবের প্রতিও আমাকে নজর দিতে হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে একদিকে আমার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের তুলনায় অনেক বেশি প্রশংসা করা হয়েছে। অপরদিকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লেখকের দৃষ্টি দেয়া দরকার। এগুলো হলো, বিভিন্ন বিষয় ও সেসব সম্পর্কিত বর্ণনার মধ্যে যোগসূত্রের অভাব রয়েছে। এটা দূর করা উচিত। কোনও কোনও বিষয় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। কোনও কোনও অধ্যায়ের আলোচনায় দুর্বোধ্যতা রয়েছে। আবার কোনও কোনও শব্দ একাধিক অর্থবোধক হওয়ায় পাঠক

সমাজের পক্ষে সঠিক অর্থ উদ্ধার করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। এজন্য এই সঙ্গে সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা দরকার।

পণ্ডিত ব্যক্তিদের এসব উপদেশ আমাকে পুস্তকটি সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রেরণা যুগিয়েছে। এমনকি তাঁরা লক্ষ করেননি, এমন কিছু বিষয়ের প্রতিও পুনরায় দৃষ্টি দেয়া আমি প্রয়োজন মনে করেছি। তাতে করে দ্বিতীয় সংস্করণটি পাঠক সমাজের চোখে আরো সারগর্ভ রূপ লাভ করতে সক্ষম হবে। অবশ্য আমি এই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করছি যে, জ্ঞান ও গবেষণার বিচারে এ গ্রন্থটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। এ ব্যাপারটি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়ও আমি অকপটে উল্লেখ করেছি।

প্রাচ্যবিদদের অভিযোগের জবাব

প্রথম সংস্করণের পাণ্ডুলিপিতে কোনও কোনও বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। এর পিছনে প্রধান লক্ষ্য ছিল, গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর পণ্ডিত ব্যক্তির এসব বিষয় সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করবেন। তাঁদের অভিমত আমার আলোচনায় সহায়ক হবে। সত্যি কথা বলতে কি, বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠ করার ব্যাপারে সবাইকে আমি অস্থির দেখতে পেয়েছি। নতুবা পণ্ডিত ব্যক্তির বইটির কোনও কোনও বিষয় সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন তুলেছেন, এগুলো প্রথম থেকে আমার মনেও ছিল। তাঁদের অভিমত আমার ধারণাকে সুদৃঢ় করেছে। সে যাই হোক, তাঁদের এসব উপদেশ আমি আমার সৌভাগ্য হিসাবে গ্রহণ করি। প্রথম সংস্করণে যেসব বিষয় ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে আমি সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংযোজন করি। আর এসব ছিল মহানবী (সা)-এর জীবন চরিতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর গ্রন্থের কোনও কোনও তথ্য সম্পর্কে সমালোচনাও হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলোর আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া গ্রন্থের শেষাংশে দুটো নতুন অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। তাতে প্রথম সংস্করণে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখকৃত কয়েকটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সেটা হলো, প্রথম সংস্করণে কয়েকটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপরও কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি সেগুলো আরো বিস্তারিত আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁদের উপদেশও রক্ষা করা হয়েছে।

মিসরীয় প্রবন্ধকারের সমালোচনা

সর্বপ্রথম একজন মিসরীয় প্রবন্ধকারের সমালোচনাটি উল্লেখ করতে হয়। তিনি এটি আরবী ভাষায় লিখে জনৈক জার্মান প্রাচ্যবিদের নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি তা জার্মান ভাষায় রূপান্তরিত করে নিজের সাময়িকীতে প্রকাশ করেন। মিসরীয় সমালোচক তাঁর লেখাটি কোনও আরবী সাময়িকীতে প্রকাশ করেননি। তার কারণ তাতে অত্যন্ত আপত্তিকর ও ভিত্তিহীন বক্তব্য ছিল। এজন্য আমি নিজেও তার জবাব কোনও আরবী সাময়িকীতে পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করাটা সঙ্গত মনে করিনি। তা'ছাড়া এটা একান্তভাবেই সমালোচকের দায়িত্ব ছিল। উক্ত সমালোচকের নাম জানা সত্ত্বেও আমি উল্লেখ করলাম না। কারণ তাতে হয়তো তিনি অস্বীকার করে বসতে পারেন। তাঁর প্রতিবেদনটির সারকথা হলো : “মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত”

গ্রন্থ আধুনিক পদ্ধতিতে লেখা হয়নি। গ্রন্থকার তাঁর পুস্তকে জার্মান প্রাচ্যবিদ যেমন ফিল, জোভিলাদ যহর, নোভেলাদ কী প্রমুখের অভিমত কেন উল্লেখ করলেন না। গ্রন্থকার তাঁর আলোচনার ভিত্তি হিসাবে (পবিত্র) কোরআনকে কেন গ্রহণ করলেন। অথচ (পবিত্র) কোরআন সম্পর্কে জার্মান প্রাচ্যবিদের অভিমত হলো— ইসলামে নবীর ইন্তেকালের পর এই গ্রন্থে (পবিত্র কোরআনে) বিকৃতি ও পরিবর্তন করা হয়েছে। এসব বিকৃতির মধ্যে নবীর নামও রয়েছে। আসলে তাঁর নাম ছিল ‘কাসম’ কিংবা ‘কাসামা’। পরে পরিবর্তন করে হযরত মুহাম্মদ (সা) করা হয়। আর হযরত মুহাম্মদ (সা) নাম প্রমাণ করার জন্য কোরআনে একটি আয়াত সংযোজন করা হয়। আয়াতটি হলো : وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ : أَحْمَدُ “এবং আর একটি সুসংবাদ নিয়ে আমার পরে একজন রাসূল আসবেন, তাঁর নাম হলো আহমদ।” (৬১ : ৬) তাতে বাইবেলের একটি উদ্ধৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথচ বাইবেলে বলা হয়েছে, “হযরত ঈসার পর একজন নবী আসবেন।” কিন্তু তাঁর নাম যে ‘আহমদ’ কিংবা ‘মুহাম্মদ’ হবে, এ কথা বলা হয়নি।

উপরে উল্লিখিত প্রাচ্যবিদরা এ কথাও বলেছেন যে, “হযরত মুহাম্মদ (সা) যেসব কথা আল্লাহর বাণী বলে অনুসারীদের মধ্যে প্রচার করতেন, এসব ছিল তাঁর মৃগী রোগের প্রতিক্রিয়া। এই রোগাক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর শরীরে কম্পন আরম্ভ হতো। মুখ দিয়ে শ্লেষ্মা বেরুতো। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর নিজের কথা ‘আল্লাহর ওহী’ বলে শোনাতেন এবং বলতেন, সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এসব কথা তাঁর নিকট নাযিল হয়েছে।”

এই প্রবন্ধকার মিসরীয় এবং মুসলমান না হলে এসব বাজে প্রলাপের প্রতি আমি নজরই দিতাম না। এমনকি কোনও প্রাচ্যবিদ কিংবা খৃষ্টান ধর্মযাজক এ ধরনের সমালোচনা করলেও গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতাম না। কারণ প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় খৃষ্টান ধর্মযাজকদের সমালোচনা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তাতে সংযোজন করার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু মিসরীয় প্রবন্ধকার আমার স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় ভাই। তাঁর চিন্তাধারা হলো আমাদের একশ্রেণীর মুসলিম যুবকের মনোভাবের মতো। তারা বিশ্বাস করে, প্রাচ্যবিদরাই ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তারা কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

প্রাচ্যবিদদের ভুল-ভ্রান্তির কারণ

প্রাচ্যবিদদের ইসলাম সম্পর্কিত গবেষণার প্রতি অন্ধ-বিশ্বাসী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এখানে কয়েকটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমত সকল প্রাচ্যবিদই ইসলাম ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন, তাদের প্রতি আমরা এমন দোষারোপ করছি না। ইসলাম সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাদের কেউ কেউ নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব এবং আরবী ভাষার উপর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি না থাকার দরুন কোন কিছু লিখতে চাইলে বেরিয়ে পড়ে আর একটা। প্রাচ্যবিদদের একটা শ্রেণীর পেশাই হলো বিশেষ কোন একটা ধর্ম অথবা সকল ধর্মের সমালোচনা করা। তাদের কোন কোন তথাকথিত গবেষক হযরত ঈসার অস্তিত্বই অস্বীকার করে বসে আছেন। আর একটি শ্রেণী হযরত ঈসাকে প্রকৃতিস্থ প্রমাণ করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছেন। ধর্ম ও ধর্ম প্রবর্তকদের প্রতি পাশ্চাত্য জগতের এরূপ ঘৃণ্য আচরণের মূলে রয়েছে গির্জা ও রাজ-ক্ষমতার

দ্বন্দ্ব-সংঘাত। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণের উন্মত্ততায় অন্তত পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ব্যক্তিদের এরূপ সীমা অতিক্রম করা শোভা পায় না। পাশ্চাত্যের তথাকথিত জ্ঞানের দাবিদারদের একটি শ্রেণী ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা এবং অপর একটি শ্রেণী নিছক ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ছদ্মাবরণে নিজেদের মতবাদ প্রচারের অপচেষ্টায় নিয়োজিত আছে। ধর্ম সম্পর্কে মুসলমানদের এ ধরনের আচরণের কল্পনা করাও উচিত নয়। শুধু তাই নয়, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের এসব 'গবেষণার' পর্যালোচনাও করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের স্মরণ রাখতে হবে, ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য জগত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছে। আর এসব যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া প্রাচ্যবিদদের অন্তরে এখনো ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে।

আমার মিসরীয় বন্ধু যে ধরনের সমালোচনা করেছেন, তাতে তিনি পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদেরও হারিয়ে দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, আমি 'মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত' রচনায় ইসলাম ও আরবী উৎসকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমিও অকপটে তা স্বীকার করছি, আমি তাই করেছি। অবশ্য এই জাতীয় সমালোচকদের আক্রমণ অর্থহীন করার জন্য বিভিন্ন প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থরাজির প্রতিও দৃষ্টিপাত করেছি। আর প্রমাণপঞ্জিতে সেসব গ্রন্থের নামও উল্লেখ করেছি। তা সত্ত্বেও আমি নির্দিষ্টায় স্বীকার করছি, পবিত্র কোরআন ও আরবী গ্রন্থরাজিই হচ্ছে আমার লেখার মূল ভিত্তি। পাশ্চাত্যের গ্রন্থাবলি আমি দ্বিতীয় পর্যায়ে রেখেছি। তাতে অপরাধ কোথায়? ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে স্বয়ং পাশ্চাত্য লেখকরাও পবিত্র কোরআন ও আরবী গ্রন্থরাজিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। আর মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত লিখতে গিয়ে পবিত্র কোরআনকে প্রধান উৎস হিসাবে গ্রহণ ছাড়া বিকল্প কোনও পথও নেই। বিশেষ করে, যারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিখতে চাইবেন, তাঁদের সামনে এ ছাড়া বিকল্প নির্ভরযোগ্য কোনও উৎস নেই। সত্যি কথা বলতে কি, এই অন্যায়টি নোভেলাদ কীও করেছেন। জোভিলাদও এই অপরাধমুক্ত নন। পূর্ববর্তীরাও তাই করেছেন। স্প্রেংগার এবং উইলিয়াম ম্যুরও মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত লিখতে গিয়ে পবিত্র কোরআনের প্রতিই সবার আগে দৃষ্টিপাত করেছেন। মোটকথা, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে পদ্ধতি প্রাচ্যবিদরা অবলম্বন করেছেন, আমিও এই গ্রন্থ রচনায় তাই গ্রহণ করেছি। শুধু ইসলামী গ্রন্থরাজিই নয়, প্রাচ্যবিদরা ইসলাম সম্পর্কে লিখতে গিয়ে যেসব খৃষ্টান লেখকের গ্রন্থরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকেন, আমিও সেগুলো দেখেছি। অবশ্য তাদের ও আমার দৃষ্টির মধ্যে ফারাক রয়েছে। খৃষ্টান লেখকদের পরিবেশিত তথ্যাবলি আধুনিক গবেষণা পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বেলায় আমি এতটুকু অসচেতনতা প্রদর্শন করিনি। তবে হ্যাঁ, প্রাচ্যবিদদের সাথে কেন আমি অভিন্ন মত পোষণ করলাম না, কেন আমি তাদের তথাকথিত গবেষণালব্ধ অভিমত পরীক্ষা-নিরীক্ষার উর্ধ্বে রাখলাম না, এজন্য সমালোচকরা যদি আমাকে অভিযুক্ত করেন, তাতে আমার বলার কিছু নেই।

উক্ত সমালোচক বন্ধু এমন স্থবির জ্ঞানের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, যা যুক্তি-বুদ্ধির পরিপন্থী এবং তা অজ্ঞতা ও নিচতা বৈ কিছু নয়। এমনকি প্রাচ্যবিদরাও তার সাথে একমত হতে সাহস করবে না। তবে হ্যাঁ, জ্ঞানের জগতে স্থবিরতাই যদি মেনে নিতে হয়, তা হলে ধর্মীয় স্থবিরতাই ভাল। এটা সহ্য করা অনেক সহজ। কিন্তু জ্ঞান ও ধর্ম, কোনও ক্ষেত্রেই আমি

স্থবিরতা মেনে নিতে প্রস্তুত নই। এ ব্যাপারে নিজের ও অন্যদের মধ্যে আমার নিকট কোন পার্থক্য নেই। অন্যদের গবেষণালব্ধ তথ্য আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। আমি মনে করি, এটা আমার ন্যায্য অধিকার। আমার গবেষণামূলক তথ্যাবলির ব্যাপারেও আমি অন্যদের এই অধিকার স্বীকার করি। আমি আশা করব, আমার পরিবেশিত তথ্যাবলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সঠিক পেলেই অন্যরা গ্রহণ করুন, নতুবা নয়। আর যেসব যুবক ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের পরিবেশিত তথ্যাবলি অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, তাদের জন্য উক্ত পদ্ধতি কল্যাণকর বলে আমি মনে করি না। ‘মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত’ গ্রন্থ রচনায় আমি এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছি। তাতে সফল হয়ে থাকলে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে প্রতিদানের প্রত্যাশী। কোনও অধ্যায়ের আলোচনায় ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকলে তার জন্যও আল্লাহ তা‘আলার নিকটই ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রাচ্যবিদ ও ধর্মের নীতিমালা

মিসরীয় প্রবন্ধকার তাঁর লেখায় প্রাচ্যবিদদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, পবিত্র কোরআন বিকৃতি ও পরিবর্তনের অভিযোগমুক্ত নয় যে, তার উপর নির্ভর করা যাবে। মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পর তাতে পরিবর্তন করা হয়েছে। ধর্ম ও রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তাতে কয়েকটি আয়াত সংযোজন করা হয়েছে। আমি সমালোচককে কিছুই বলতাম না যদি না তিনি মুসলমান হতেন। তিনি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করছেন এবং ইসলামের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করছেন। আর ইসলামই পবিত্র কোরআন সম্পর্কে ঘোষণা করছে, لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ “আর কোন ভ্রান্ত বিষয় তার আগে কিংবা পরে কোন দিক থেকেই অনুপ্রবেশ করতে পারে না।” (৪১ : ৪২) প্রকৃতপক্ষে উক্ত সমালোচক তার অভিযোগগুলোতে ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদদের প্রতিধ্বনি করেছেন। তাঁরা তো প্রকাশ্যেই বলে থাকেন, “(পবিত্র) কোরআন (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এরই রচনা। তিনি নিজেও এটাকে আল্লাহর ওহী মনে করে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।”

বাহ্যত দেখা যায়, উক্ত সমালোচক উপরে উল্লিখিত মন্তব্যটি প্রাচ্যবিদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন। নিজেকে তিনি তা থেকে দূরে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। উক্ত মন্তব্যের প্রতিটি অক্ষর পরোক্ষভাবে এ কথাই প্রকাশ করছে যে, তাঁর কোন কোন প্রাচ্যবিদ গুরুর মতো তিনি নিজেও তা সমর্থন করেন। অথচ তিনি আমাদের এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন, যে-কোন বিষয় তিনি অন্যদের প্রভাবমুক্ত হয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। নিশ্চিত না হয়ে কোনও বিষয় মেনে নেয়াটা নাকি তার স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার।

কোরআন বিকৃতির মিথ্যা অভিযোগ

মিসরীয় প্রবন্ধকার সমালোচক তাঁর সমালোচনায় পাশ্চাত্যের অপর একদল গবেষকের অভিমতও ধার করেছেন। তাঁরা বলে থাকেন, মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পর পবিত্র কোরআনের সূরা সফ্ফে একটি আয়াত সংযোজন করা হয়েছে। সেটি হলো, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ “এবং আর একটি সুসংবাদ নিয়ে আমার পরে

একজন রাসূল আসবেন, তাঁর নাম আহমদ।” (৬১ : ৬)’ কিন্তু গবেষণার দাবিদার প্রাচ্যবিদদের পবিত্র কোরআন সম্পর্কে এ ধরনের ডাহা মিথ্যে অভিযোগ উত্থাপনের আগে একটু চিন্তা করা উচিত ছিল। কারণ মহানবী (সা)-এর রিসালাতের স্বীকৃতি তাদের ‘তাওরাত’ ও ‘ইনজীল’ গ্রন্থেও রয়েছে। আর এ দু’টি গ্রন্থ তারা নিজেরাও ‘অবিকৃত’(!) বলে স্বীকার করেন। তাদের মধ্যে যদি এতটুকু ইনসাফ ও নীতিবোধ থাকত, তাহলে তারা তাওরাত ও ইনজীলের মতো কোরআনকেও বিকৃতি থেকে পূত-পবিত্র মনে করতেন। কারণ তাদের এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, পবিত্র কোরআন সংযোজন ও বিকৃতিমুক্ত না হলে তাওরাত ও ইনজীলও এ অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। আর তাই বর্তমান তাওরাত ও ইনজীলকে পবিত্র কোরআন পরিবর্তনের ভিত্তি সাব্যস্ত করার প্রাচ্যবিদদের দাবিও সম্পূর্ণ অমূলক। তাঁরা বলেছেন, মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পর মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নাকি সাহাবীরা পবিত্র কোরআনে একটি আয়াত সংযোজন করেছেন। জ্ঞান ও যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের এই উক্তি উদ্ভট বৈ কিছু নয়।

এমনকি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রাচ্যবিদদের উপরোক্ত দাবি ধোপে টেকে না। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সাহাবীদের কি প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল পবিত্র কোরআনে সংযোজন করার। আর ইনজীলের একটি আয়াত ভিক্ষা করারই বা তাদের কি প্রয়োজন ছিল? এমনিতেই তো তারা বাহুবলে স্বল্প সময়ের মধ্যে ইরান ও রোমান সম্রাটকে তাদের পৈতৃক সিংহাসন থেকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে তা দখল করে নিয়েছিলেন। তাদের সামনে বিভিন্ন দেশের অগণিত খৃষ্টান স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করছিলেন। শুধু খৃষ্টান-শাসিত দেশই নয়, এই সঙ্গে অন্যান্য দেশও মুসলমানরা একটার পর একটা পদানত করছিলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে খৃষ্টানদের উপর মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রাধান্য ঐতিহাসিক দিক থেকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। পক্ষান্তরে তাওরাত ও ইনজীলের অবিকৃতি এবং পবিত্র কোরআনের বিকৃতির দাবির পিছনে কোনও যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ নেই। ইতিহাস থেকেও এ সম্পর্কে কোন প্রমাণ দেখান যাবে না। এমনকি, জ্ঞান-বুদ্ধিও তা সমর্থন করতে পারে না।

পবিত্র কোরআনে সংযোজনের প্রশ্নে খৃষ্টান প্রাচ্যবিদদের মধ্যে দু’টি মত প্রচলিত আছে। একদল অত্যন্ত উগ্রপন্থী। তাদের দাবি হলো, মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের প্রাথমিক যুগের সাহাবীরা পবিত্র কোরআনে সংযোজন করেছেন। প্রাচ্যবিদদের এই দলটির সংখ্যা একেবারে নগণ্য। অপর দলের মতে পবিত্র কোরআনে সংযোজন করা হয়নি। সংখ্যায়

১. এ আয়াতটি গ্রন্থকার পূর্বেও একবার উল্লেখ করেছেন। সে যাই হোক, খৃষ্টান প্রাচ্যবিদরা বলেছেন, “মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পর মুসলমানরা এই আয়াতটি পবিত্র কোরআনে সংযোজন করে দেখাতে চেয়েছেন, ‘ইনজীল’ গ্রন্থেও মহানবী (সা)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। কিন্তু ইনজীলে হযরত ঈসার পর আর একজন নবী আসার কথা থাকলেও তাঁর নাম ‘আহমদ’ হবে-এমন কথা নেই। এটা মুসলমানদের মনগড়া উক্তি।” প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টান প্রাচ্যবিদরাই এক্ষেত্রে মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ মূল ইনজীল গ্রন্থে এই মর্মের একটি বাণী রয়েছে। তাতে হযরত ঈসার পর আগমনকারী রাসূলের নাম ‘কারকালীত’ বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় এই শব্দের তরজমা হলো ‘আহমদ’। স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর ‘আল খোতবাতুল আহমদিয়া’ গ্রন্থে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। - অনুবাদক

তারাই বেশি। এই দলটি প্রকাশ্যেই বলেন, বর্তমানে আমাদের সামনে যে পবিত্র কোরআন রয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সা) জীবিত থাকতেই তা মুসলমানদের সামনে পেশ করেন। অবশ্য এই দলটি পবিত্র কোরআনের আয়াত ও সূরাগুলোর বিন্যাস সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। এটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। এক্ষেত্রে বিতর্কিত বিষয়টি সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের গবেষণালব্ধ অভিমতের সারাংশ উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ উপরে উল্লিখিত মিসরীয় সমালোচক ও তার সমমনারা শুধু প্রাচ্যবিদদের লেখার মাধ্যমেই তৃপ্তি লাভ করে থাকেন।

উইলিয়াম ম্যুরের অভিমত

এ ব্যাপারে প্রাচ্যবিদদের অনেকেই নানা প্রকার মন্তব্য করেছেন। আমরা এক্ষেত্রে স্যার উইলিয়াম ম্যুরের একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করছি। এটি তিনি তাঁর ‘হায়াত-ই-মুহাম্মদ’ নামক গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন। ‘পবিত্র কোরআন বিকৃতি’র ইতিহাসের সাথে যারা নিজেদের সত্তাকেও নিরপেক্ষ রাখতে চান না, তাঁদের জন্য উইলিয়াম ম্যুরের এই প্রতিবেদনটি সান্ত্বনার উপকরণ হতে পারে। উইলিয়াম ম্যুর প্রাচ্যবিদ হওয়া সত্ত্বেও খৃষ্টধর্মের একজন বিরাট প্রচারক ছিলেন। তাঁর লেখা দেখলে মনে হয়, তিনি যদি পারতেন তা হলে সারা বিশ্ববাসীর গলায় শূলচিহ্ন ঝুলিয়ে দিতেন। তিনি ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে সমালোচনার উপকরণ উদ্ভাবন প্রচেষ্টা কখনো পরিত্যাগ করেননি। তা সত্ত্বেও তিনি লিখেছেন :

ইসলামের ‘আরকান’ বা স্তম্ভগুলোর বুনিয়াদ ‘পবিত্র ওহীর’ উপর প্রতিষ্ঠিত। তার কিছু অংশ প্রাত্যহিক প্রতিটি নামাযে পড়া ওয়াজিব। নামাযের কোন কোন ‘রোকন’-এ ‘পবিত্র ওহী’ তিলাওয়াত করা ফরয এবং কোন কোনটিতে সুন্নাত। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই এই বিধানটির ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল। আর এসব বিধান তারা ‘পবিত্র ওহী’ থেকেই লাভ করে।

“নামাযে তেলাওয়াতের প্রয়োজনে প্রাথমিক যুগের প্রতিটি মুসলমান (পবিত্র) কোরআনের কিছু না কিছু অংশ মুখস্থ করে নিত। এটা তারা নিজেদের জীবনের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করত। প্রাক-ইসলামী যুগ থেকেই আরবরা কবিতা, বংশ-তালিকা ও বিভিন্ন বর্ণনা মুখস্থ করায় অভ্যস্ত ছিল। এই অভ্যাস তাদের (পবিত্র) কোরআন মুখস্থ করা আরো সহজ করে দিয়েছিল। তা ছাড়া, আরবরা সাধারণত লিখতে-পড়তে জানত না। (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর শিষ্যদের মধ্যেও এ ধরনের অসংখ্য লোক ছিল। পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো ও সে সবার শানে নুযুল তারা এমনভাবে মুখস্থ করেছিল যে, সেগুলো তারা ইচ্ছা করলেই পুনরাবৃত্তি করতে পারত। আরবদের এই অনন্যসাধারণ মুখস্থ-শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা এ কথা স্বীকার করতে পারি না যে, এই একটি মাত্র শক্তির জোরেই পবিত্র কোরআন সংকলন করা হয়েছিল। আমাদের নিকট একাধিক তথ্য রয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয়, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবিতকালেই তাঁর অনেক সাহাবা পবিত্র কোরআন বিভিন্ন উপায়ে লিখে নিয়েছিল। তাতে করে প্রায় পুরো কোরআনই লিখে ফেলা হয়েছিল।

“তা ছাড়া, প্রাক-নবুয়ত যুগে মক্কাবাসীদের লেখা-পড়া জানার ব্যাপারটিও প্রমাণিত সত্য। বদর যুদ্ধে মক্কার বন্দীদের মধ্যে কিছু লোক মুক্তিপণ আদায়ে অসমর্থ ছিল। কিন্তু তারা

লেখা-পড়া জানত। হযরত মুহাম্মদ (সা) এ ধরনের বন্দীদের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলমানদের লেখা-পড়া শিখানোর বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তিদানের কথা বলা হয়। চুক্তিটি যথাযথ কার্যকরী করা হয়। অসংখ্য মুসলমান অমুসলিম যুদ্ধবন্দীদের নিকট লেখাপড়া করে। মদীনাবাসীদের অধিকাংশ যদিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগেই লিখতে-পড়তে জানত, কিন্তু তাহযীব-তামাদুনের দিক দিয়ে তারা মক্কাবাসীদের অনেক পিছনে ছিল।

“এ ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পবিত্র কোরআনের যেসব সূরা ও আয়াত মুসলমানদের কণ্ঠস্থ ছিল, সেগুলো লিখিতভাবেও সংরক্ষণ করা হতো।” এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণকারী বেদুঈন গোত্রের সদস্যদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য (হযরত) মুহাম্মদ (সা) তাঁর সাহাবীদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে প্রেরণ করত। এ ব্যাপারেও প্রমাণ আছে যে, (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্ম প্রচারকরা ইসলামের বিধি-বিধান লেখা কাগজপত্রও সঙ্গে নিয়ে যেত। আর এসব কাগজপত্রে পবিত্র কোরআনও লেখা থাকত। বিশেষ করে, যেসব আয়াতে ইসলামের রীতি-নীতি, চালচলন সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং যেগুলো নামায়ে পুনরাবৃত্তি করা হতো, সেগুলো তারা লিখে সঙ্গে করে নিয়ে যেত।

“পবিত্র কোরআন নিজেও এ কথা প্রমাণ করছে যে, তা লিখিত আকারে ছিল। জীবন-চরিত বিষয়ক গ্রন্থরাজিতেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। সে সময় পবিত্র কোরআনের সূরা ‘তাহা’ হযরত ওমরের বোনের ঘরে লিখিত আকারে মজুদ ছিল। আর হযরত ওমর (রা) হিজরতের তিন কিংবা চার বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, হিজরতের পূর্বে যখন মুসলমানরা সংখ্যায় ছিল কম এবং জুলুম-নির্যাতনের নির্মম শিকার হচ্ছিল, তখনো পবিত্র কোরআন লেখা প্রচলিত ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে হযরত মুহাম্মদ (সা) যে তাঁর উত্থান ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিনগুলোতে পবিত্র কোরআনের একাধিক কপি লিখিয়েছিলেন, এই তথ্যটি স্বীকার করে নিতে কি আপত্তি থাকতে পারে। বিশেষ করে পবিত্র কোরআনই যেক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আইন ছিল, এমতাবস্থায় এর আয়াতগুলো তিনি লিখিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠাননি, তা কি করে হতে পারে?”

নবী করীম (সা)-এর আমলে লিখিত কোরআন

“হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবিতকালে পবিত্র কোরআন দু’টি অবস্থায় ছিল এবং তাঁর ইন্তেকালের পরও এক বছর পর্যন্ত এমনি অবস্থায় ছিল। তার একটি হলো হাফেজদের বক্ষ এবং অপরটি হলো বিভিন্ন উপায়ে লিখিত। পবিত্র কোরআন সংরক্ষণের এই দু’টি পদ্ধতি দিন দিন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এমতাবস্থায় কি করে মেনে নেয়া যায় যে, উভয় পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল না? অথচ পবিত্র কোরআন ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সবচাইতে প্রিয় সম্পদ। নবী করীমের জীবিতকাল থেকেই মুসলমানরা পবিত্র কোরআন আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করত। পবিত্র কোরআনের আয়াত কিংবা কোন শব্দ সম্পর্কে কারো মনে সন্দেহ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে তারা রাসূলের শরণাপন্ন হতো এবং নিজেদের সন্দেহ দূর করে নিত। এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন হযরত আমর ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত উবাই ইবনে

কাআব (রা) তাঁদের সন্দেহ দূর করেছিলেন। নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর পবিত্র কোরআনের আয়াত নিয়ে মতপার্থক্য হলে সাহাবীরা তিনটি উপায়ে তা সমাধান করতেন। লিখিত অংশগুলোর মাধ্যমে। রাসূলের ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের পারস্পরিক আলোচনাক্রমে এবং ওহী লেখকদের মাধ্যমে।

পবিত্র কোরআনের প্রথম সংকলন

“হযরত আবু বকরের খেলাফতের প্রথম দিকেই ইয়ামামার যুদ্ধে অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অনেক হাফেজ শহীদ হন। এই পরিস্থিতি দেখে হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা)-কে বললেন, আল্লাহ না করুন এমনি অন্য কোন ঘটনায় অবশিষ্ট হাফেজরা শহীদ হয়ে যেতে পারেন। সুতরাং আপনি পুরো কোরআন এক জায়গায় সংকলন করে ফেলুন।” হযরত আবু বকর (রা) হযরত ওমরের এই পরামর্শ গ্রহণ করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশে যারা ওহী লেখার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তাদের সবাইকে এক জায়গায় ডাকা হলো। তাদের মধ্যে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতকে লক্ষ্য করে হযরত আবু বকর (রা) বললেন, “আপনি জ্ঞানী যুবক, আপনার প্রতি আমাদের সবার আস্থা রয়েছে। মহানবী (সা)-এর জীবিতকালে তাঁর নির্দেশে আপনি আল্লাহর ওহী লিখতেন। অনুগ্রহ করে আপনি পবিত্র কোরআন ক্রমানুসারে একত্র করে দিন।”

“কিন্তু হযরত যায়েদ (রা) এ কথা শুনে ঘাবড়ে যান। তিনি ভাবলেন, এ কাজ করা কি আমার উচিত হবে? এরূপ করা কি জায়েয? কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) তো এরূপ করাননি।” কিন্তু হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের পীড়াপীড়িতে হযরত যায়েদ (রা) এ কাজ করতে সম্মত হন। এই বিরাট দায়িত্ব পালনের শুরুতেই তিনি যাদের নিকট কোরআনের বিভিন্ন অংশ ছিল সব এক জায়গায় জমা করেন। এ সময় কয়েক প্রকারে পবিত্র কোরআন সংরক্ষিত ছিল। কিছু ছিল গাছের পাতায় লেখা, কিছু ছিল পাথরে লেখা আর কিছু সংরক্ষিত ছিল হাফেজদের বক্ষে। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী চামড়া এবং হাড়েও লেখা ছিল। হযরত যায়েদ প্রতিটি লেখা সংগ্রহ করেন এবং হাফেজদের সমবেত করেন। দুই কিংবা তিন বছরে তিনি পবিত্র কোরআন একত্রিত করার কাজ সম্পন্ন করেন, যা বর্তমানে আমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। হযরত যায়েদ পবিত্র কোরআন যেভাবে লিখে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সামনে পড়ে শোনাতেন হুবহু সেই ক্রম অনুসারেই বর্তমান সংস্করণটি রয়েছে।

“হযরত যায়েদ সংকলিত এই কপিটি হিফাযতে রাখার উদ্দেশ্যে হযরত ওমর (রা) তাঁর কন্যা ও মহানবী (সা)-এর অন্যতমা স্ত্রী হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট জমা রাখেন। হযরত ওমর (রা) খলীফা হওয়ার পর এই কপিটিই শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ বলে সাব্যস্ত করেন।

ওসমানী সংস্করণ

হযরত যায়েদের সংকলন করার আগে পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াতে গরমিল ছিল। আর এই গরমিল সম্ভবত বাচনভঙ্গি কিংবা কপি করার পার্থক্যের দরুন হয়েছিল। তাতে কিছু কিছু মুসলমানের মনে এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একই কোরআনের মধ্যে এরূপ পার্থক্য হবে কেন। এমনকি হযরত ওসমানের খেলাফত আমলে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের যুদ্ধে

অংশগ্রহণ কালে হযরত হুযায়ফা (রা) দেখতে পেলেন, সিরিয়া ও ইরাকের মুসলমানরা পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াত বিভিন্ন পদ্ধতিতে আবৃত্তি করছে। এ দেখে তিনি অস্থির হয়ে উঠেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি হযরত ওসমানের নিকট আবেদন করেন। তিনি বলেন, এ না করা হলে, আল্লাহ না করুন, ইহুদী-খৃষ্টানদের মতো মুসলমানরাও তাদের ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর হযরত ওসমান (রা) এ ব্যাপারে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতের সহযোগিতা গ্রহণ করেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য হযরত ওসমান (রা) কুরাইশদের মধ্য থেকে আরো দু'জন জ্ঞানী লোককে নিয়োগ করেন। হযরত ওসমান (রা) হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট জমা রাখা কপিটিও হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) ও তাঁর সহযোগীদের নিকট হস্তান্তর করেন।

“দ্বিতীয় দফায় এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাজে উপরোক্ত কুরাইশ আলিমগণ প্রচলিত প্রতিটি আয়াত ও বাচনভঙ্গি পূর্ববর্তী কপির সাথে মিলিয়ে দেখেন। এ ব্যাপারে তিনজনের মধ্যে মতপার্থক্য হলে হযরত যায়েদ (রা)-এর অভিমতই প্রাধান্য দেয়া হতো।

“এই কাজে শুধু কুরাইশদের নিয়োগ করার কারণ ছিল পবিত্র কোরআন তাদের বাচনভঙ্গিতেই নাযিল হয়েছিল। অবশ্য এ কথা প্রচলিত আছে যে, সাতটি বাচনভঙ্গিতে পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে। হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফত আমলেই পবিত্র কোরআন সংকলনে দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। এ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত ওসমান (রা) বিশুদ্ধ সংকলনটির একাধিক কপি করান এবং সেগুলো মুসলিম অধিকৃত বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দেন। এ সঙ্গে তিনি হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট রাখা কপির সাথে গরমিল সকল কপি জ্বালিয়ে দেন। এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল, পরবর্তীকালে যাতে এ নিয়ে কোন প্রকার গোলমাল না হয়।”

“পবিত্র কোরআন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার সমালোচনা সম্পূর্ণ অর্থহীন। বিশেষ করে বনু ওমাইয়া ও হযরত আলী (রা)-এর সমর্থকদের কলহ-বিবাদের প্রতি তাকালে এ জাতীয় আপত্তি একেবারেই ধোপে টেকে না। কারণ ওমাইয়াদের সাথে চরম মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও হযরত আলী (রা)-এর সমর্থকরা পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করতেন। এমনকি পরবর্তীকালে তাঁরাই পবিত্র কোরআনের এই সংকলনকে ‘সহীফা-ই-ওসমানী’ নামে অভিহিত করেন। শুধু তাই নয়, আজো সকল শিয়া সম্প্রদায় পবিত্র কোরআনের সংরক্ষণ ও বিশুদ্ধতার ব্যাপারে অভিন্ন মত পোষণ করে। হযরত আবু বকর ও হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফত আমলে এই কোরআনের উপরই ঐকমত্য ছিল। আর সে সময় হযরত আলীও বর্তমান ছিলেন। তিনি কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেননি। তাছাড়া, পবিত্র কোরআন বিকৃত করায় হযরত ওসমানের কী স্বার্থ থাকতে পারে? বিশেষ করে এরূপ পদক্ষেপ নেয়া হলে তাঁর উপর সকল মুসলমান ক্রুদ্ধ হওয়ার আশংকা ছিল।

“হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফত আমলে পবিত্র কোরআন দ্বিতীয়বার পর্যালোচিত হয়ে প্রকাশিত হওয়ার পর এমন অনেক মুসলমান ছিলেন যারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবিতকালে পবিত্র কোরআন শুনেছেন। তাঁরা দেখেছেন, হযরত ওসমান (রা) যে সংকলন প্রকাশ করেছেন, তা রাসূলের আমলেরই অনুরূপ। তাই তাঁরা কোন প্রকার আপত্তি করেননি।

“হযরত আলীর পবিত্রতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের কোন আয়াত যদি নাযিল হয়ে থাকত, আর তিনি শান্তি-শৃংখলার স্বার্থে নীরব হয়ে গিয়ে থাকেন; কিন্তু তাঁর সমর্থকরা তা

কিছুতেই মেনে নিত না। তারা হযরত ওসমানের এই বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে আপত্তি করত, প্রতিবাদ জানাত।”

“সুতরাং আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের বিচারে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনের কোনও আয়াত বাদ দেয়া হয়নি।”

“হযরত ওসমানের শাহাদাতের পরে হযরত আলী (রা) খলীফা হন। এটা তাঁর শক্তিরই স্পষ্ট প্রমাণ। এরূপ পরিস্থিতিতে কোন্ যুক্তি-বুদ্ধি মেনে নিতে পারে যে, তাঁর সমর্থকরা একটি অসম্পূর্ণ কোরআন নিয়ে ধৈর্য ধারণ করেছেন। তাও আবার কি, হযরত আলীর মর্যাদা সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতটিই ফেলে দেয়া হয়েছে! আর যে কোরআন তাদের বিরোধী এবং তাদের নেতাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করায় অসম্পূর্ণ ছিল, হযরত আলীর ভক্তরা তার ব্যাপারে কেন ঐকমত্য পোষণ করবে! অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, হযরত আলীর বিরোধীরা যে কোরআন পাঠ করত, তাঁর ভক্তরাও সে কোরআনকেই নিজেদের ধর্মগ্রন্থ বিশ্বাসে তেলাওয়াত করত। তারা এ সম্পর্কে কোন প্রকার আপত্তিও করেনি। শুধু তাই নয়, হযরত আলী (রা) তাঁর খেলাফত আমলে সে কোরআনই প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করেন। একাধিক কপি তৈরি করে নিকট ও দূরবর্তী বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন। এমনকি, তিনি নিজেও একাধিক বার পবিত্র কোরআন লেখেন। অবশ্য এই সমালোচনা যথার্থ যে, হযরত ওসমান তাঁর সংকলিত কপি ছাড়া বাকি সবগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। আর এটাকে কেউ হয়তো পক্ষপাতমূলক আচরণ বলতে পারে। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি প্রশ্নও আসে যে, সে যুগে হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে কেউ এই অভিযোগ উত্থাপন করেনি যে, তিনি পবিত্র কোরআনে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছেন। সত্যি যদি হযরত ওসমান (রা) এরূপ কিছু করতেন, তাহলে এই গোপন তথ্য অবশ্যই বেরিয়ে পড়তো। কিন্তু সে আমলে এরূপ কোন অভিযোগ উঠেছে বলে ইতিহাস বলে না। সত্যিকথা বলতে কি, পরবর্তীকালের শিয়ারা তাদের স্বার্থে হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে এই অপবাদটি রটিয়েছে।”

ওসমানী সংস্করণের পরিপূর্ণতা

“এসব যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, যে সংকলনে হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বিভিন্ন বাচনভঙ্গির মধ্যে শুধু কুরাইশদের বাচনভঙ্গি রেখেছেন। তাতে আর মাস্‌হাফে ওসমানীতে মূলত কোন পার্থক্য ছিল না। এরপর আর একটা প্রশ্ন থেকে যায়, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট ওহীর মাধ্যমে যে কোরআন নাযিল হয়েছিল হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা) সংকলিত কপিটি কি হুবহু তাই ছিল? এক কথায় এর জবাব হচ্ছে হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা) সংকলিত কপি অবশ্যই সব দিক থেকে বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ ছিল। এ ব্যাপারে নিম্নের আলোচনা প্রণিধানযোগ্য।

“হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা) পবিত্র কোরআনের এই সংকলনটি হযরত আবু বকর (রা)-এর তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করেন। আর হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভক্ত ও অনুসারী। তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, কোরআন আসমান থেকে অবতীর্ণ পবিত্র কিতাব। তিনি মহানবী (সা)-এর নবুয়তকালে একাধারে বিশ বছর তাঁর

সাথে অতিবাহিত করেছেন। তিনি তাঁর খেলাফত আমলে নির্লোভ ও অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। মানুষের সংশোধন ও কল্যাণের জন্য অত্যন্ত সুনিপুণভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আবু বকর (রা)-এর মধ্যে এসব গুণ থাকার দরুন পবিত্র কোরআন সংকলন করানোর ব্যাপারে তাঁর প্রতি কোনো প্রকার খারাপ ধারণা আসার প্রশ্নই ওঠে না। হযরত আবু বকর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, পবিত্র কোরআন বিশ্ব-স্রষ্টার তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর নিকট নাযিল হয়েছে। পবিত্র কোরআন সংকলন ও বিন্যাস, সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণভাবে হওয়ার ব্যাপারে সর্বাত্মক দৃষ্টি দেয়ার জন্য উক্ত বিশ্বাসই তাঁকে সীমাহীন প্রেরণা দান করে। এই বিশ্বাস হযরত ওমর (রা)-এরও ছিল। আর সে অনুযায়ী পবিত্র কোরআন (বর্তমান আকারে) সংকলিত হয়েছে। পবিত্র কোরআন সংকলিত হওয়ার যুগে প্রতিটি মুসলমানেরই অনুরূপ বিশ্বাস ছিল। প্রতিটি মুসলমান তাদের সাধ্যানুযায়ী পবিত্র কোরআন সংকলকদের সহযোগিতা করেছেন। পবিত্র কোরআন যাদের শুধু কণ্ঠস্থ ছিল তারা উক্ত সংকলক পরিষদের সামনে হাযির হয়ে শুনিতে যেত। যাদের নিকট হাড় কিংবা গাছের পাতায় কোনও আয়াত লেখা ছিল, তারা তা হযরত যায়েদের নিকট দিয়ে যেত। হযরত আবু বকর (রা)-এর মতো এসব মুসলমানেরও আন্তরিক আগ্রহ ছিল, নবী করীম (সা) আল্লাহর বাণী তাদের সামনে যেভাবে আবৃত্তি করেছেন হুবহু সেভাবেই যেন সংকলিত হয়। তাতে যেন বিন্দু পরিমাণ কমবেশি না হয়। তাদের অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, পৃথিবীতে পবিত্র কোরআনের সমতুল্য অন্য কোনো বস্তু নেই। কেননা তারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত, পবিত্র কোরআন আল্লাহর বাণী। আর এই কোরআনই মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, ‘যারা আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যে বানিয়ে বলবে তাদের জন্য আল্লাহ কঠোর শাস্তির বিধান করেছেন।’ এমতাবস্থায় আল্লাহর বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী কোন লোক কিছুতেই তাতে কমবেশি করার সাহস করতে পারে না। এরূপ করা তো বিশ্বাসের পরিপন্থী। “হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ইন্তেকালের দুই কিংবা তিন বছর পর পবিত্র কোরআন সংকলন সম্পন্ন হয়। অনেক সাহাবায়ে কেরাম পবিত্র কোরআনের হাফেজ ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীন এসব হাফেজকে জাতীয় সম্পদ মনে করত। ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য তাঁদের সমগ্র মুসলিম অধিকৃত এলাকায় পাঠাতেন। পবিত্র কোরআন সংকলনের ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর আমলের এসব হাফেজের সাথে হযরত যায়েদের যোগাযোগ হয়নি, এরূপ মনে করার সঙ্গত কোনও কারণ নেই। এই ঐতিহাসিক ব্যাপারে প্রতিটি মুসলমান শুধু নিঃস্বার্থ ও আন্তরিকই ছিলেন না, তাঁদের সকল উপায়-উপকরণ এ কাজে নিয়োজিত করেন। তাতে করে তাঁরা নিজেদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণতার সাথে সংকলন করেন।”

“পবিত্র কোরআনের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতার ব্যাপারে আমাদের সামনে এটাও একটা প্রমাণ যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবিতকালেই তাঁর অনুসারীরা পবিত্র কোরআনের কোন-না-কোনও অংশ লিখে রেখেছিল। আর এসবের অনুলিপি অন্যদের নিকট থাকাও স্বাভাবিক ব্যাপার। এসব কপি সে যুগের অন্যান্য লেখাপড়া জানা মুসলমানের নিকট অবশ্যই ছিল। এই প্রমাণের অপর দিক হলো, পবিত্র কোরআনের এসব অংশ হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) সংকলিত কপিতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। তাতে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, হযরত যায়েদ (রা) সংকলিত কপি সে যুগের পবিত্র কোরআন লিখতে-পড়তে জানা সকল

মুসলমানের অন্তরেই চিত্রিত ছিল। বিভিন্ন বস্তু যেমন হাড়, গাছের পাতা প্রভৃতিতে আগে থেকে লেখা ছিল। আর এজন্যই তাঁর সংকলিত কপির ব্যাপারে সে যুগের সকল লেখাপড়া জানা মুসলমান অভিনু মত প্রকাশ করেছেন। এমনকি, যদি কারো নিকট রাখা পবিত্র কোরআনের লেখা কোনও অংশ জমা না হয়েও থাকে, তিনি যখন হযরত যায়েদ (রা) সংকলিত কপিতে তা অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেয়েছেন, তখন তিনি এটাকেই বিশ্বস্ত জেনে গ্রহণ করেছেন। সাহাবাদের মধ্যে এমন দাবি কেউ করেননি যে, আমাদের নিকট সংরক্ষিত পবিত্র কোরআনের অমুক অংশ কিংবা অমুক আয়াত ও শব্দ হযরত যায়েদ (রা) ও তাঁর সহযোগীরা ছেড়ে দিয়েছেন। এমনকি, হযরত যায়েদ (রা) সংকলিত কপি সম্পর্কে অন্য কোন সাহাবা মতপার্থক্যও প্রকাশ করেননি। কোন প্রকার মতপার্থক্য বা মতবিরোধ থাকলে তা হাদীসের গ্রন্থরাজিতে অবশ্যই উল্লেখ করা হতো। কারণ সেসব গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি বাণী ও কাজ সম্পর্কিত ঘটনাবলিও উল্লেখ করা হয়েছে।

“পবিত্র কোরআনের বিন্যাসই প্রমাণ করছে যে, এর সংকলকরা গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর সূরাগুলো একেবারে সাধারণভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। তাতে গ্রন্থ রচনার রীতিনীতির নামগন্ধও পাওয়া যায় না। তাতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয়, সংকলকদের মধ্যে লেখার রীতিনীতির চাইতে বিশ্বাস ও আন্তরিকতার প্রেরণাই অধিক কার্যকর ছিল। শুধু সূরাই নয়, আয়াতগুলোর বিন্যাসেও ঈমানের প্রেরণায় বলীয়ান ছিলেন বলে তাঁরা কোন প্রকার শৈল্পিক কলা-কৌশল থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পেরেছেন।

পরিশেষে আমরা অত্যন্ত খোলা মনে এ কথা বলতে পারি যে, হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফত আমলে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) কর্তৃক দ্বিতীয় বার সংকলিত পবিত্র কোরআন অক্ষরে অক্ষরে নির্ভুল। এমনকি এ সময় এ ব্যাপারে যেসব উপায়-উপকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সেসবের দৃষ্টিকোণ থেকেও উক্ত সংকলন বিশুদ্ধ বলতে হবে। তাতে অবতীর্ণ কোন আয়াতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়নি এবং কোন আয়াত তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে বাদও দেননি। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সা) পুরো সততা ও সাধুতার সাথে মানুষকে (আল্লাহর যেসব বাণী) শুনিয়েছেন, সেগুলোর নিখুঁত সংকলনই হলো বর্তমানে প্রচলিত পবিত্র কোরআন।”

এখানে স্যার উইলিয়াম ম্যুর-এর ‘হায়াত-ই-মুহাম্মদ (সা)’ শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকা থেকে একটা বিরাট অংশ উদ্ধৃত করা হলো। এরপর পবিত্র কোরআনের বিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতা সম্পর্কে পাদরী লা’ম্যান্স, হোয়ান হামের প্রমুখ প্রাচ্যবিদের অভিমত উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। কারণ তাঁরা সবাই উইলিয়াম ম্যুরের অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, এই কোরআনই হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে লাভ করেছেন বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি অন্যদেরও তাই পাঠ করে শুনিয়েছেন। অবশ্য সামান্যসংখ্যক প্রাচ্যবিদ এর ব্যতিক্রম মত পোষণ করেন। কিন্তু স্যার উইলিয়াম ও অন্যান্য অধিকসংখ্যক প্রাচ্যবিদ ইতিহাস ও মুসলিম চিন্তাবিদদের পরিবেশিত তথ্যের আলোকে বিষয়টি সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং যুক্তিভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ

১. হায়াত-ই-মুহাম্মদ (সা), ১৪-২৫ পৃষ্ঠা, স্যার উইলিয়াম ম্যুর। এই প্রতিবেদনটির অনুবাদে রাসূল ও সাহাবীদের নামের আগে ‘হযরত’ এবং কোরআনের আগে ‘পবিত্র’ শব্দ সংযোজন করা হয়েছে। -অনুবাদক

যেসব প্রমাণ উল্লেখ করেছেন, ভিন্নমত পোষণকারী স্বল্পসংখ্যক প্রাচ্যবিদ সেগুলোর কোনো জওয়াব প্রদান করেননি।

ইসলামের প্রতি আক্রমণ

কিছুসংখ্যক অমুসলিম চিন্তাবিদ, যাদের মন-মানসিকতা এমনিতেই ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তক সম্পর্কে বিদ্বেষাপ্লুত হয়ে আছে, তাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কারণ তারা হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হয়ে এ ধরনের অপবাদ রটিয়েছে। তাদের এসব উক্তির পিছনে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই। এ ধরনের মনগড়া কথাবার্তা দ্বারা তারা সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, কিছু সংখ্যক পথভ্রষ্ট যুবকের মধ্যে এসব কথাবার্তা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অবশ্য এসব যুবক আগে থেকেই মনস্থির করে বসে আছে যে, আধুনিক গবেষণাকে এমন খাতে পরিচালিত করতে হবে, যাতে নিজেদের ধর্মের প্রাচীন স্বীকৃত বিষয়গুলো অতি সহজে অস্বীকার করা যায়। আর তা করতে হবে নিছক মনগড়া প্রমাণাদি ও ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে। তারা মনে করে, স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার মানেই নিজেদের অতীতকে অস্বীকার করতে হবে। সত্য-মিথ্যে, ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে যা সুন্দর ও মনোহর মনে হবে, তাই গ্রহণ করতে হবে। অতীত সম্পর্কে সমালোচনাকারীদের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে হবে, ইতিহাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব সমালোচনা যতই ভিত্তিহীন হোক না কেন। এই হলো আমাদের যুবকদের মন-মানসিকতা।

পবিত্র কোরআনের হেফাজত ও পরিপূর্ণতার ব্যাপারে ইসলামের ইতিহাস ও মুসলিম চিন্তানায়কদের যুক্তি-বুদ্ধি ভিত্তিক প্রমাণাদিও উল্লেখ করা যেতো। সেদিক না গিয়ে আমরা স্যার উইলিয়াম ম্যুর ও অন্যান্য প্রাচ্যবিদের অভিমত উল্লেখ করেছি। উদ্দেশ্য হলো আমাদের যুবকরা যাতে আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গবেষণামূলক অভিমত থেকে সান্ত্বনা ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে। কারণ তারা এসব পণ্ডিতের অভিমতই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে থাকে। অবশ্য গভীর মনোযোগ, অধ্যবসায় ও সং উদ্দেশ্য থাকলে প্রতিটি বিষয়েই সত্য উদঘাটন করা যায়, সত্য পর্যন্ত পৌঁছা যায়। কোন সত্যসন্ধ গবেষক এই দায়িত্ববোধের প্রতি উপেক্ষা বা শিথিলতা প্রদর্শন করতে পারেন না। সকল প্রকার স্বার্থ ও উদ্দেশ্য বিসর্জন দিয়ে এ পথেই তাকে গবেষণা কাজ পরিচালনা করতে হবে। তাতে করে তিনি বাহ্যিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবমুক্ত হয়ে আসল লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবেন। প্রাচ্যবিদরা কোনও কোনও সময় এ পথে সফলতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। আবার কোনও কোনও সময় এদিক-সেদিক পদচারণা করে পথ হারিয়ে বসেন। বিশেষ করে, ইসলামের নবীর জীবন সম্পর্কিত বিষয়গুলোতেই তাঁরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। এগুলো আমি আমার গ্রন্থে গভীর মনোযোগ সহকারে আলোচনা করেছি।

গবেষণার উত্তম পন্থা

এক্ষেত্রে একটা বিষয় পরিষ্কার বলা দরকার যে, কোন বিষয়ে গবেষককে তার ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। নিজের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যেন তার এতটুকু সন্দেহ বা দ্বিধা না থাকে। একজন ঐতিহাসিকেরও অনুরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য

রয়েছে। অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন অনুসন্ধান-গবেষণা করতে হয়, তেমনি ঐতি-
হাসিককেও বিভিন্ন ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ ও বাছাই-ছাঁটাইর বেলায় সকল দিকে লক্ষ্য রেখে
একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আলোচ্য বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থরাজির সাথে মুসলিম আলেমদের
গ্রন্থাবলিও সামনে রাখতে হবে, পড়াশুনা করতে হবে। এসব গ্রন্থ চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা,
রসায়ন প্রভৃতি যে কোন শিরোনামেই হোক না কেন। সত্যানুসন্ধানকারীদের পরম কর্তব্য
হলো, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাদের গবেষণায়ই কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হবে,
তা প্রকাশে কোনরূপ শিথিলতা প্রদর্শন না করা। আর সত্য ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এতটুকু
দ্বিধা না করা। মহানবী (সা)-এর জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে
ঐতিহাসিককে নিছক নকলকারীর ভূমিকা পালন করলে চলবে না, এই সঙ্গে তার উপর
অনুসন্ধান ও বিচার-বিবেচনার দায়িত্বও অর্পিত হয়। তাতে করে এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে
তিনি সত্য উদঘাটন করতে সক্ষম হবেন। কেননা, বিচার-বিবেচনা নির্ভর করে অনুসন্ধানের
উপর। আর অনুসন্ধান ও বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে সত্যিকার জ্ঞান লাভ করা যায়।

পবিত্র কোরআনের বিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতা সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম ম্যুর-এর প্রতিবেদন
উল্লেখ করার সাথে সাথে উপরে উল্লিখিত মিসরীয় মুসলমান ও তাঁর ও সমমনাদের সম্পর্কে
আমার মনে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তা হলো, তারা প্রাচ্যবিদদের মুখে ইসলামের
বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে যদি কোনও কথা শুনতে পায়, সেটায় গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ
করে না। সেটাকে তারা রীতিমতো উপেক্ষা করে। অথচ প্রাচ্যবিদদের লেখায় ইসলামের
বিরুদ্ধে কিছু দেখতে পেলেই আন্তরিকভাবে তা বিশ্বাস করে বসে। তাদের এ ধরনের মনোবৃত্তি
সম্পর্কে আমাদের কী বলার থাকতে পারে। অবশিষ্ট রইল কোন কোন প্রাচ্যবিদের তথাকথিত
গবেষণার কথা। তারা অপবাদ দিয়েছে, পবিত্র কোরআনের আয়াত নাকি বাড়িয়ে দেয়া
হয়েছে। মহানবী (সা)-এর পবিত্র নাম নাকি ‘কসম’ কিংবা ‘কাসামা’ ছিল। এ জাতীয়
অভিযোগ পবিত্র কোরআন পরিবর্তন করার দাবির মতোই কল্পনাপ্রসূত।

এবার আমি উক্ত মিসরীয় মুসলমানের ব্যাকুলতা দূর করার চেষ্টা করছি। তিনি প্রাচ্যবিদদের
মাথায় লবণ রেখে বড়ই খাওয়ার অভিনয় করে বলেছেন :

“হযরত মুহাম্মদ (সা) যেসব কথা আল্লাহর ওহী বলে তাঁর মুসলমান অনুসারীদের হেদায়েত
করতেন, মূলত এগুলো ছিল তার মৃগী রোগেরই বহিঃপ্রকাশ। এই রোগাক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর
কম্পন আরম্ভ হতো। মুখ দিয়ে শ্লেষ্মা বেরুতো। কিন্তু সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর তিনি আল্লাহর
ওহী বলে কিছু কথা শোনাতে। বলতেন, সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এসব আমার নিকট অবতীর্ণ
হয়েছে।”

মৃগীর অভিযোগ

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়াকালীন অবস্থাকে মৃগী রোগ বলা জ্ঞানগত
দৃষ্টিকোণ থেকেই একটা অমার্জনীয় অপরাধ। কারণ মৃগী আক্রান্ত অবস্থায় রোগীর মনে কোন
কিছু উদয় হলেও জ্ঞান ফিরে আসার সাথে সাথে তা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। আর এ সময় মৃগী
রোগীর মুখে কোন কথা উচ্চারিতই হয় না। কারণ রোগাক্রান্ত হওয়ার পর তার বোধ ও চিন্তা
সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী

করীম (সা)-এর ওহী আসার সময়ের অবস্থার সাথে মৃগীর কোনো সাযুজ্যই নেই। পক্ষান্তরে ওহী নাযিল হওয়ার সময় মহানবী (সা)-এর অনুভূতি-শক্তি যেরূপ সচেতন থাকত, অন্য কোনো মানুষের মধ্যে কোনো অবস্থায়ই অনুরূপ কল্পনাও করা যায় না। ওহী নাযিল হওয়াকালীন অবস্থার সব কিছু মহানবী (সা)-এর স্মরণ থাকত। পরে তিনি সেগুলো সাহাবীদের সামনে হুবহু ব্যক্ত করতেন। আর এসবই হলো তাঁর নিকট আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে নাযিলকৃত ওহী।

তা ছাড়া, ওহী নাযিল হওয়ার সকল ক্ষেত্রে তন্দ্রাচ্ছন্নতা অবশ্যম্ভাবী ছিল না। বরং কোন কোন সময় সম্পূর্ণ সচেতন এবং স্বাভাবিক অবস্থায়ও মহানবী (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হতো। যেমন সূরায় ফাত্হ নাযিল হওয়ার ঘটনা। হোদায়বিয়ার সন্ধি শেষে সাহাবীদের নিয়ে মদীনা ফেরার পথে মহানবী (সা)-এর নিকট এই সূরাটি নাযিল হয়।

ওহী নাযিল হওয়ার উপরোক্ত বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, উপরে উল্লিখিত অভিযোগগুলো থেকে মহানবী (সা) সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন প্রাচ্যবিদই এসব মনগড়া ও মিথ্যে অভিযোগ রটিয়েছেন। তারা সব সময়ই এবং যে কোন মূল্যে মিথ্যের বেসাতি ছড়িয়ে সত্যকে লুক্কায়িত রাখতে তৎপর থাকেন। তাদের এই অপকর্মের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের অন্তরে মহানবী (সা)-এর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব খাটো করা এবং আল্লাহর ওহীকে কালিমালিপ্ত করা। বস্তুত আল্লাহর ওহীকে মৃগীর প্রতিক্রিয়া বলে অভিহিত করা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপমান বৈ কিছু নয়।

মুসলমানদের উক্ত দলটির পশ্চিমা মুরব্বীদের মন-মানসিকতা ও উদ্দেশ্য মহৎ ও সৎ হলে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিরোধী এসব কথা তারা মুখেই আনত না। তাদের এসব নির্লজ্জ উক্তির উদ্দেশ্য হলো, তারা জানে, মৃগী রোগের উপকরণ ও পরিণাম সম্পর্কে জনসাধারণের কোনো ধারণা নেই। তারা যা বলবে জনগণ তা-ই সত্য বলে মনে করবে। কারণ আগে থেকে মানুষ তাদের নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের এ ধরনের মন্তব্য করার পর এসব যাচাই করার জন্য মানুষ কোন চিকিৎসক কিংবা চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থরাজির শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন বোধ করবে না। আমরাও এ কথা স্বীকার করছি যে, সাধারণ মানুষের এই সরল বিশ্বাস যদি অনুসন্ধানে অভ্যস্ত হতো, তাহলে পশ্চিমা মুরব্বীদের নির্লজ্জতার আবরণ টুকরো টুকরো করে ফেলত। মৃগী মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে তাকে অচেতন করে ফেলে। এমনকি সে রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্ববর্তী আচরণ আরম্ভ করে। রোগের আক্রমণ তীব্র হলে অন্যদেরও কষ্ট দেয়। ঘুমের মানুষ যেমন জাগার পর ঘুমন্ত অবস্থায় নড়া-চড়া কিংবা কথাবার্তা কিছুই কল্পনা করতে পারে না, মৃগী রোগীরও একই অবস্থা। রোগাক্রান্ত অবস্থায় সে কি করেছে কিছুই অনুভব করতে পারে না। এমনকি চেতনা ফিরে পাওয়ার পরও সে স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু ওহী নাযিল হওয়ার সময়ের অবস্থা এ দুইয়ের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ওহী নাযিল হওয়ার সময় শেষ হওয়ার পর সে সময়ের সব কিছু অন্তরে পুরাপুরি অংকিত হয়ে থাকত। কারণ আল্লাহ তা'আলা যে বিশেষ সময়ে যাদের নিকট ওহী পাঠিয়েছেন, উক্ত অবস্থার সাথে তাঁদের সরাসরি কোন সম্পর্ক ছিল না।

মৃগী মানুষের অনুভূতি-শক্তিকে সম্পূর্ণ বেকার করে দেয়। এই রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে তার যে অবস্থা ছিল, তাও সে ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু ওহী অবতরণকালীন অবস্থা হলো মানবাত্মার একটা বিশেষ উঁচু মর্যাদা বা স্থান। এই মর্যাদার জন্য আল্লাহ তা'আলা শুধু নবী-রাসূলদের

মনোনীত করেছেন। তাঁদের এই মর্যাদায় আসীন করার উদ্দেশ্য ছিল ওহীর মাধ্যমে পাওয়া ধ্রুব সত্যকে তাঁরা যেন অন্যদের নিকট পৌঁছে দিতে পারেন। এ কথাও বিচিত্র নয় যে, কয়েক শতাব্দী পর ওহীর কোন কোন অংশ কিংবা তা নাযিল হওয়ার অবস্থার কোন দিক সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরিমাপ করা যাবে। কিন্তু তার মূল তত্ত্ব আবিষ্কার কেয়ামত না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। তা সত্ত্বেও ওহী বাস্তব সত্য বিষয়। এর খোশবু মু'মিনের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। যাদের অন্তরে গাফলতির সীলমোহর পড়ে গেছে, তারা ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার নয়।

জ্ঞানের ক্রটি-বিচ্যুতি

আমরা জানি উপরে উল্লিখিত প্রাচ্যবিদরা এ কথা বলবেন যে, এ ধরনের কোন বিষয় এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিনি। এজন্য আমরা জ্ঞানগতভাবে ওহীর পরিমাপ করতে অক্ষম। তাহলে তাদের এই ব্যাখ্যার যুক্তিগ্রাহ্য পরিণাম এ দাঁড়ায় যে, জ্ঞানের কোন কোন বিষয় ও দিক যেমন এখনো গবেষণা-অনুসন্ধান সাপেক্ষ বিষয় হয়ে আছে, তেমনি ওহীর মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও আরো কিছু সময়ের দরকার হবে। এমতাবস্থায় জ্ঞানকে অভিযুক্ত করা যায় না। বিশেষ করে, রাত-দিনের উপস্থিতি এবং বিশ্বের আরো কতো অসংখ্য বস্তু আমাদের সামনে রয়েছে। এসবের মূলতত্ত্ব ও গূঢ় রহস্য আমরা এখনো উদ্ঘাটন করতে পারিনি। যেমন চাঁদ, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ প্রভৃতি সম্পর্কে এ পর্যন্ত কতো লেখা হয়েছে, কতো গবেষণা করা হয়েছে এবং তা অব্যাহতভাবে চলছে। কিন্তু এসব সম্পর্কে চিন্তামূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও কাল্পনিক কাহিনী ছাড়া এ পর্যন্ত কোনো বাস্তব সত্য আবিষ্কৃত হয়নি। অথচ আকাশ আমরা দু'চোখ দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে তো দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোন কোন গূঢ় রহস্যও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

অনুরূপ অনেক আবিষ্কার এখন আমাদের সামনে রয়েছে। এসব আমরা বস্তু হিসাবে দেখছি, স্পর্শ করতে পারছি। একশ' বছর আগেও এসব মানুষের রঙীন কল্পনায় লুকিয়ে ছিল। কিন্তু যেসব বিষয় 'ওয়াজ্জদ' বা আত্যন্তিক প্রেম ও ধ্যান-মগ্নতার সাথে সংশ্লিষ্ট, যেসব বিষয়ের অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনে মাথা ঘামিয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন যে, এসব সম্পর্কে কী নীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, তা পরিমাপ ও মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট আলেমদের গ্রন্থরাজিতে আমরা যা দেখতে পেয়েছি, তার সারকথা হলো, ওহীর অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তাঁরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরেছেন। তাঁরা অকপটে স্বীকার করেছেন, জ্ঞানগতভাবে এ বিষয়টির পরিমাপ ও মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে তাঁদের অক্ষমতা প্রকাশে বিম্বিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ বস্তুজগতের অনেক কিছুর অন্তর্নিহিত রহস্য আমরা এখনো উদ্ঘাটন করতে পারিনি। সুতরাং জীবনের প্রতিটি অংশের পরিমাপে যদি আমরা ভুলে থাকি, তাহলে জ্ঞানগতভাবে এই পরিশ্রমের পরিণাম ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

মহানবী (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার যুগে যেসব মুসলমান বর্তমান ছিলেন, পবিত্র কোরআনের প্রত্যেকটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তাদের ঈমানী-শক্তি আরো বৃদ্ধি

১. 'হায়াত-ই-মুহাম্মদ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। সুতরাং প্রাকৃতিক নীলা-বৈচিত্র্য আবিষ্কার সম্পর্কিত লেখকের বক্তব্যটি সে সময়ের আলোকে মূল্যায়ন করতে হবে। -অনুবাদক

পেতো। সে যুগের মুসলমানদের অনেকেই অনন্যসাধারণ দূরদর্শী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। সে যুগে ইহুদী-খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বেশ কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁরা মহানবী (সা)-এর সাথে তর্ক-বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁরা ওহী সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। প্রথম দিকে যেসব কুরাইশ মহানবী (সা)-কে জাদুকর, পাগল ইত্যাদি বলত, অবশেষে তাঁরাও নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুশোচিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলার ওহীর বিরুদ্ধে তাদের মুখ থেকে টু শব্দটিও বেরোয়নি। এসব কিছুর বর্তমানে 'ওহী'কে তার মূল রূপ থেকে সরিয়ে এনে অন্য কিছু নাম দেয়া কিংবা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে রিসালাতের সর্বোচ্চ স্থান থেকে নামিয়ে অন্য কোন স্থানে বসান অন্তত 'জ্ঞান' মেনে নিতে পারে না।

সত্যঅনুসন্ধিৎসু ও নিরপেক্ষ কোনও লেখক বড়জোর এ কথা বলতে পারেন যে, জ্ঞান বস্তুরাজিকে যেভাবে পরিমাপ করতে পারে, ওহীকে তা পারে না। মহানবী (সা)-এর সাহাবাগণ ওহীর যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন এবং ওহী লেখকরা একে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, জ্ঞানের তা অস্বীকার করার সামর্থ্যই নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ওহী অস্বীকার করছে এবং জ্ঞান ও গবেষণার ছত্রছায়ায় ভিত্তিহীন উপায়-উপকরণের সাহায্যে তার দাবি প্রমাণের চেষ্টা করছে, সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, সে মিথ্যেবাদী। জ্ঞান ও মিথ্যের স্থান এক জায়গায় কখনো হতে পারে না।

নবী করীম (সা)-এর দোষ অনুসন্ধান

ইসলামের সমালোচনা না করে মহানবী (সা)-এর সমালোচনা করা ইসলাম-বিদ্বেষীদের একটা ধূর্ততা বৈ কিছু নয়। আর তাদের এই ঘৃণ্য আচরণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর সহজ-সরল ও শাস্ত্রত নীতিমালার প্রতি তাকিয়ে তারা বুঝতে পেরেছে, এর প্রাচীরে সিঁদ বসাতে পারবে না। প্রতারক শত্রুর মতো। তাই তারা এদিক থেকে মহানবী (সা)-এর অভিমুখী হয়েছে। বস্তুত এটা হলো দুর্বল শত্রুরই রণকৌশল। এটা শুধু পণ্ডিতজনদের ভূমিকা-শিষ্টাচার বিরোধীই নয়, মানবজাতির স্বভাবজাত নীতিমালারও পরিপন্থী। মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি হলো, যা তার জন্য লাভজনক ও কল্যাণকর, তাকেই সে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কিন্তু উক্ত লাভজনক বস্তুটির উৎসের অনুসন্ধান নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। এ নিয়ে পণ্ডিত্য করে না। যেমন গাছে একটি ফল দেখে কারো পছন্দ হলো। স্বভাবত সে ফলটিই পেড়ে খাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ফলের স্বাদ যাচাই করার উদ্দেশ্যে সে গাছটি উপড়ে ফেলে শিকড় থেকে তা জানার জন্য পণ্ডিত্য করে না। অথবা এ ধরনের পরিশ্রমের ঝুঁকি নেয় না। অনুরূপ প্ল্যাটো ও তাঁর দর্শন, শেক্সপিয়ার ও তাঁর নাটক এবং রাফায়েল ও তাঁর শিল্প-কলা সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। এসব যুগস্রষ্টা চিন্তাবিদ নিজ নিজ ক্ষেত্রে চরম সফলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আমাদের উল্লিখিত সমালোচকরা নিশ্চয়ই এসব চিন্তাবিদের ব্যক্তিগত সমালোচনার উদ্যোগ নেবে না। কেননা, কোন লেখক বা আবিষ্কারকের ব্যক্তিগত দোষত্রুটি তাঁর লেখা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সমালোচনার কারণ নয়। কোন সমালোচক এ ধরনের দুঃসাহস করে বসলেও নিজের উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবে না, হতে পারে না। অনুরূপ

ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও শত্রুতাকে গবেষণার ছদ্মাবরণে অন্যদের সামনে তুলে ধরার পরিণামও এর ব্যতিক্রম নয়। এই ঘৃণ্য আচরণের মাধ্যমে সে বাস্তব সত্যকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। কিন্তু উক্ত সত্যের ভিতর বিদ্বেষের আবরণ ছিঁড়ে আত্মপ্রকাশের শক্তি ও যোগ্যতা পুরো মাত্রায় রয়েছে।

বলা বাহুল্য, শেষ নবী (সা) সম্পর্কে এই ধরনের বিদ্বেষই এক শ্রেণীর প্রাচ্যবিদের অন্তরে কার্যকর রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির সেরা উক্ত মহান সত্তার বিরুদ্ধে একটি শ্রেণীর সমালোচনা ও বিষোদগারকে কেউই গুরুত্ব দেবে না।

পাশ্চাত্যের এক শ্রেণীর ইসলাম-বিদ্বেষীর পক্ষ থেকে যেসব সমালোচনা ও অভিযোগ করা হয়েছে, আমরা সেগুলোর নীতিগত জবাব প্রদান করেছি। এবার এক শ্রেণীর মুসলমানের মনের ব্যাকুলতা দূর করা দরকার। তাঁরা ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা দানে নিয়োজিত রয়েছেন। 'হায়াত-ই-মুহাম্মদ' বা 'মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁরা নিজেদের মনের এই ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন।

এ সম্পর্কে কিছু বলার আগে একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, এক শ্রেণীর প্রাচ্যবিদের অপবাদ সম্পর্কে এখানে আলোচনাটা একটু দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে। এর অপরিহার্যতাও অস্বীকার করা যায় না। প্রাচ্যবিদরা বলে থাকেন যে, তাদের গ্রন্থরাজির মাধ্যমে তারা স্বদেশীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়কে নিজেদের ধর্মকর্মে অবিচল রাখতে চান। সত্যিকথা বলতে কি, তাদের উদ্দেশ্য ও বাস্তব অবস্থা যদি তা-ই হতো, তাহলে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের সমালোচনা সম্পর্কে আমাদের এতটা মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। বর্তমানে একদিকে বেতার সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে রেখেছে। অপরদিকে রয়েছে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র জগত। অবস্থা এমন যে, ইউরোপ-আমেরিকায় যা ছাপা হয়, কিছুক্ষণের মধ্যে তা সারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পৌঁছে যায়। এই দু'টি মহাদেশের লেখক-চিন্তাবিদদের অনুধাবন করা উচিত যে, তাদের বিদ্বেষপূর্ণ মিথ্যে উক্তি সম্পর্কে অন্য দেশের চিন্তাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা কি মনে করবে। কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই আজ চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতজন রয়েছেন। বস্তুত প্রত্যেক লেখকেরই পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, তিনি যাই কিছু লিখবেন, স্বদেশ, স্বধর্ম ও মতাদর্শের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে তাঁকে লিখতে হবে। এসবের সংকীর্ণতা থেকে তাঁর লেখা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে। তাতে করে সকল মানুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক ময়বুত থাকবে। আর এটাই মানুষের জন্য চরমোৎকর্ষ ও গৌরবজনক।

মুসলমানদের সমালোচনা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কিছুসংখ্যক মুসলমানের আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, মহানবী (সা) সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের সমালোচনার জবাব দানকালে আমি কেন পাশ্চাত্য লেখকদের গ্রন্থরাজির সাহায্য নিলাম না। কেন আমি শুধু বিভিন্ন আরবী গ্রন্থের উপর নির্ভর করলাম। এই অধ্যায়ে ধর্ম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আর এক শ্রেণীর মুসলিম লেখকের অভিযোগ হলো, 'মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত' রচনায় বিভিন্ন হাদীস ও চরিত বিষয়ক গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলো কেন আমি বিনা বাক্যে গ্রহণ করতে ইতস্তত করলাম। তাদের মধ্যে আবার দু'টি দল রয়েছে। একদল তাদের বক্তব্য প্রকাশকালে পবিত্র কোরআনের বাণী, "তাদের সাথে সুন্দরভাবে বিতর্ক করুন", অনুসরণ করেছে। আর এক দল হলো চরম রক্ষণশীল। তারা অত্যন্ত কঠোর ও আপত্তিকর ভাষায়

অভিযোগ করেছে। যাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সামান্য সম্পর্কও রয়েছে, তারা এ ধরনের অজ্ঞতাপ্রসূত আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করতে পারে না।

প্রথম দলের অভিযোগ হলো, জীবন-চরিত ও হাদীস গ্রন্থরাজিতে মহানবী (সা)-এর যেসব মু'জিয়া উদ্ধৃত হয়েছে, আমি আমার গ্রন্থে সেগুলো উল্লেখ করিনি বরং আমি বলেছি, “হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত ছিল সৃষ্টিকূল সেরা মহামানবের জীবন-চরিত। কোন মানব জীবনের পক্ষেই তাঁর সমপর্যায়ে পৌঁছা সম্ভব নয়। মহানবী (সা)-এর আকাঙ্ক্ষা ছিল মুসলমানরা যেন মনে করে, তিনি তাদের মতোই মানুষ। পার্থক্য শুধু এই যে, তাঁর নিকট আল্লাহ তা'আলার ওহী আসে। আল্লাহ তাঁকে ওহীর সম্মানে ভূষিত করেছেন। এমনকি তিনি পবিত্র কোরআন ছাড়া তাঁর সাথে মু'জিয়া বা অলৌকিক কোন ব্যাপার জড়ানোটাও পছন্দ করতেন না। এ বিষয়টি তিনি সাহাবীদের নিকটও স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন।”

অনুরূপ চাঁদ দ্বিখণ্ড করা সম্পর্কে আমি প্রথম সংস্করণে লিখেছিলাম, “প্রাচ্যবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদরা এই অলৌকিক ব্যাপারটি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথাও বলেছেন— মহানবী (সা)-এর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ তাঁদের নবুয়ত ও রিসালাত প্রমাণের জন্য অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কর্মকাণ্ডের মুখাপেক্ষী ছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা) তাঁর রিসালাত প্রমাণ করার জন্য কোন প্রকার মু'জিয়া বা অলৌকিক কাজের প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন না। আর এটা তাঁর মহান জীবন ও কর্ম-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরিপূর্ণতারই পরিচায়ক। এজন্যই মহানবী (সা)-এর জীবনের সাথে জড়ান যুক্তি-জ্ঞান বিরোধী এবং পবিত্র কোরআনের বাণী “আল্লাহ্র বিধানের পরিবর্তন সাধন অসম্ভব”—এর পরিপন্থী ব্যাপারগুলো একদল আরব ঐতিহাসিক ও মুসলমান মেনে নিতে আপত্তি করেছেন। এমনকি পবিত্র কোরআনে মুশরিকদেরও একই ধরনের ভৎসনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, “নিশ্চয়ই তারা বুঝে না। তাদের এমন হৃদয়ই নেই, যার দ্বারা তারা বুঝতে পারে।”

দরুদ ও সালাম

আমার বিরুদ্ধে মুসলিম সমালোচকদের প্রথম দলটি অভিযোগ করেছেন, মহানবী (সা) সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের সমালোচনাগুলো আমি কেন আমার গ্রন্থে উল্লেখ করলাম। কেন আমি সর্বপ্রথম এসব সমালোচনার জবাব লিখলাম। দ্বিতীয় দলটি তো গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ পাঠকসমাজের সামনে আসার আগেই আমার বিরুদ্ধে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। তাঁদের সবচাইতে বড় অভিযোগ হলো, গ্রন্থের শিরোনামে কেন সালাম ও দরুদ লেখা হলো না। প্রকৃতপক্ষে লেখা শুরু করার আগে আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি একাধিকবার দরুদ ও সালাম পাঠ করে আমি ইহকাল-পরকালের কল্যাণ কামনা করেছি। এমনকি টাইটেল পৃষ্ঠায় নিম্নের আয়াতটি লিখে দিয়েছি :

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُحِبُّوْنَ عَلٰى النَّبِیِّ یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا .

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর রহমত পাঠিয়ে থাকেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও সবাই তাঁর প্রতি পরিপূর্ণরূপে দরুদ ও সালাম পাঠাও।” (৩৩ : ৫৬)

এসব সমালোচনাকারীর প্রতি লক্ষ্য করেই গ্রন্থের টাইটেল পৃষ্ঠায় পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াতটি দিয়েছি। আয়াতটি দেখে তাঁরা আমার প্রতি সদয় হবেন। কিন্তু তাদের ক্রোধ আমার প্রতি পুরোপুরি রয়ে গেছে। আসলে এ হচ্ছে ইসলামের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা এবং তাদের মতোই ধ্যান-ধারণার পীর-মোরশেদদের অন্ধ অনুকরণের পরিণতি।

সে যাই হোক, সর্বপ্রথম আমি এই অভিযোগটির ব্যাপারেই আলোকপাত করছি। তাতে এ জাতীয় লেখা সম্পর্কে সমালোচনার দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে আমরা ইসলামের ইমামদের অনুসরণ করেছি। তাঁদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা এ কথা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম শাসনিক বাধ্যবাধকতার উর্ধ্বে। এক্ষেত্রে একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। হাদীসটির সারমর্ম হলো, “ইসলাম একটি বিবেচনাপূর্ণ জীবন পদ্ধতি। তাতে মধ্যপন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।”

গ্রন্থের শুরুতে দরুদ ও সালাম লেখা আরম্ভ হয় আব্বাসীয় আমল থেকে। আবুল বাকা তাঁর ‘কুললিয়াত’ গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন, “গ্রন্থের শুরুতে দরুদ লেখার প্রথা আরম্ভ হয় আব্বাসীয় শাসনামল থেকে। এজন্য ‘বোখারী’ ও সমকালীন অন্যান্য গ্রন্থের শুরুতে দরুদ লেখা দেখতে পাওয়া যায় না।”

অসংখ্য ইসলামী বিশেষজ্ঞের অভিমত হলো, সারা জীবনে একবার দরুদ পড়লেই চলবে। যেমন ইবনে নাজিম তাঁর ‘বাহরুররায়েক’ গ্রন্থে লিখেছেন, “আল্লাহ তা‘আলার বাণী ‘তোমরা দরুদ পড়’ দ্বারা সারা জীবনে একবার দরুদ পড়াই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তা নামাযের ভিতর কিংবা বাইরে যেখানেই হোক। কারণ উক্ত আয়াতে নির্দেশ ক্রিয়া দ্বারা বারবার বোঝায় না। আর এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।”

অবশ্য নামাযের ভিতর দরুদ পড়া ওয়াজিব কি না সে সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ ও অন্যান্য ইমামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদ আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। তা‘ছাড়া, দরুদও এক ধরনের দোয়া। দরুদ পাঠের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা‘আলার দরবারে নবী করীম (সা)-এর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করা। এই হলো, এ ব্যাপারে ইমাম ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্তের সারকথা। কিন্তু যাঁরা বলে থাকেন, যেখানেই মহানবী (সা)-এর পবিত্র নাম উচ্চারিত হবে কিংবা লেখা হবে, সেখানে অবশ্যই দরুদ পড়তে হবে, ইমাম মুজতাহিদ ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতিতে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। বড় বড় হাদীসবিদদের গ্রন্থরাজিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এসব গ্রন্থের শুরুতে দরুদ লেখাই হয়নি।

প্রাচ্যবিদদের সমালোচনা উল্লেখের অভিযোগ

মুসলমানদের একদল আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, ‘আমি মহানবী (সা) সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের সমালোচনা কেন আমার গ্রন্থে উল্লেখ করলাম। এটা মহানবী (সা)-এর মর্যাদা-হানিকর কাজ হয়েছে।’ এই আবেগ-অনুভূতির জন্য তাঁরা অবশ্যই প্রশংসা পাওয়ার দাবি রাখেন। কিন্তু জ্ঞানগত ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের এই ভাবাবেগের কোনও ভিত্তি নেই। কারণ মহানবী (সা) সম্পর্কে মুশরিকদের সমালোচনাগুলোর জবাব দেয়ার জন্য পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে। আর আদব শেখার জন্য পবিত্র কোরআনই হলো সর্বোৎকৃষ্ট

ও সর্বশ্রেষ্ঠ আলোকবর্তিকা। অথচ কুরাইশদের পক্ষ হতে মহানবীকে জাদুকর, পাগল ইত্যাদিও বলা হয়েছে। সেগুলোও পবিত্র কোরআনে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি, কুরাইশরা নিচের মিথ্যে অপবাদটিও রটিয়েছে। সেটা পবিত্র কোরআনেও বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ - لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ
أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ .

“আমি এ কথা জানি, তারা বলছে, একজন লোক তাঁকে শিখিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু যার সম্পর্কে তোমরা ইশারা করছ, তার ভাষা হলো আজমী। আর এ তো প্রাজ্ঞল আরবী ভাষা।” (১৬ : ১০৩)

এ ধরনের আরো অনেক অভিযোগ ও সমালোচনা পবিত্র কোরআনে উদ্ধৃত হয়েছে। বস্তুত জ্ঞানগত দৃষ্টিকোণের বিচারে অভিযোগকারীর অভিযোগ বা সমালোচনা পুরোপুরি উল্লেখ করতে হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা হলো ‘মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত’ গ্রন্থকে জ্ঞানগর্ভ করে পেশ করা। তাতে মুসলমানদের সাথে অমুসলিমরাও এই গ্রন্থে তাদের চিন্তাধারা মূল্যায়নের সুযোগ পাবে। আর এই লক্ষ্য হাসিলের জন্য সত্য যেখানেই পাওয়া যায়, বিনা সংকোচে সেদিকে হাত বাড়াতে হবে।

হাদীস ও জীবন-চরিত বিষয়ক গ্রন্থরাজি

আমার বিরুদ্ধে মুসলিম সমালোচকদের প্রথম দলটির একটি অভিযোগ হলো আমি জীবন-চরিত ও হাদীস গ্রন্থরাজির উদ্ধৃতির উপর কেন বিনাধিধায় নির্ভর করিনি। কেন শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিক ও হাদীসবিদদের প্রকাশভঙ্গি অনুসরণ করিনি। তাঁরা যেভাবে বিভিন্ন ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, আমি সে পদ্ধতি কেন গ্রহণ করিনি। এ অভিযোগ সম্পর্কে আমার জওয়াব হলো, এ গ্রন্থে আমি বিভিন্ন ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণে আধুনিক লেখকদের বর্ণনাধারা অনুসরণ করেছি। আর আধুনিক পদ্ধতিতে কোনও ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ ও যথার্থতা মূল্যায়নে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে কোনও উৎসের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এ পদ্ধতি বর্তমানে শুধু ইতিহাসই নয়, অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং আধুনিক পদ্ধতিতে ‘মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত’ গ্রন্থনা করতে গিয়ে এ ছাড়া বিকল্প কোনও পথ আমার ছিল না। আর প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করাটা আমি পছন্দও করিনি। কারণ বর্তমান যুগে প্রাচীন পদ্ধতি অত্যন্ত দুর্বল বলে বিবেচিত। তাছাড়া, বর্তমান যুগের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আমাদের প্রাচীন গ্রন্থরাজির তথ্যাবলি বিচার-বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাছাই ছাঁটাই করা কি অবৈধ কাজ? সত্যি কথা বলতে কি, সেসব গ্রন্থ একতরফাভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য সামনে রেখেই প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রতিটি যুগে লেখকদের ন্যায়ত এই অধিকার রয়েছে যে, তাঁরা অতীতের যে কোনও বিষয় নতুন করে জ্ঞানগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারেন। আমি আশা করি, এ জাতীয় অভিযোগের জওয়াবে এর অধিক কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

প্রাচীন গ্রন্থরাজির বৈপরীত্য

এক্ষেত্রে একটা বিষয় উল্লেখ না করা হলে এই আলোচনাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর তা হলো, প্রাচীন ও বর্তমান কালের ইসলামী চিন্তাবিদদের সতর্কতা। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগের চাহিদা অনুযায়ী মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত বিষয়ক বিভিন্ন বর্ণনা ও হাদীস সংকলনে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। আর এরূপ সাবধানতার ফলেই এক্ষেত্রে তাঁরা ভুল-ভ্রান্তি থেকে যতটা সম্ভব মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছেন। তা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মহানবী (সা)-এর জন্ম ও ইন্তেকালের তারিখ এবং অলৌকিক ঘটনাবলির ব্যাপারে তাঁরা মতানৈক্য এড়াতে পারেননি। এই মতানৈক্যের বড় একটা কারণ হলো, বিভিন্ন যুগ ও পরিবেশে বিভিন্ন গ্রন্থ সংকলন ও প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন প্রাচীন গ্রন্থরাজিতে পরবর্তী গ্রন্থাবলির তুলনায় মু'জিয়া ও অলৌকিক ঘটনার সংখ্যা অনেক কম দেখা যায়। এমনকি, ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনা পরবর্তীকালে সংকলিত অলৌকিক ঘটনাবলি অপেক্ষা অনেকটা জ্ঞান-বুদ্ধিগ্রাহ্য। প্রাচীনকালে লেখা মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত বিষয়ক গ্রন্থরাজির মধ্যে 'সীরাত-ই-ইবন হিশামে'র নাম উল্লেখ করা যায়। এই গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণনার প্রতি আজো নির্ভর করা যায়। পরবর্তীকালের লেখকদের মধ্যে যেমন আবুল ফিদা তাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থে এবং কাযী আয়ায তাঁর 'কিতাবুশ শিফা' গ্রন্থে যেসব মু'জিয়া উল্লেখ করেছেন, সেগুলো পরবর্তীকালের চরিতকাররাও তাঁদের গ্রন্থরাজিতে উল্লেখ করেছেন। তবে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইবনে হিশামে সেসব অলৌকিক ঘটনা অনেক কম উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীস গ্রন্থরাজির ক্ষেত্রে একই অবস্থা দেখা যায়। কোন কোন হাদীস গ্রন্থে অনেক কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন গ্রন্থে সেসব কাহিনী সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করা হয়েছে। এ কারণে প্রত্যেক বিচার-বিশ্লেষণকারী ও বিশেষজ্ঞেরই অধিকার রয়েছে যে, এ ধরনের সকল বর্ণনা তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর গ্রহণ করতে পারেন, আবার নাও করতে পারেন।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই পূর্ববর্তী ইসলামী বিশেষজ্ঞরা এ জাতীয় কোন কোন ঘটনা গ্রহণ করেছেন। আবার কোন কোনটা গ্রহণ করেননি। সেসবের মধ্যে একটি হলো 'গারানিক' বা দেবতাদের ঘটনা। একদিন মহানবী (সা) কুরাইশদের উপস্থিতিতে পবিত্র কোরআনের সূরা 'নজম' পাঠ করেন। তিনি উক্ত সূরার উনিশ ও বিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলে তার সাথে আল্লাহ তা'আলার ওহী নয় এমন একটি বাক্য জুড়ে দেয়া হয়। উক্ত আয়াত দু'টিতে মুশরিকদের দেবতা 'লাত', 'মানাত' ও 'ওযা'র উল্লেখ ছিল। আর সংযোজিত বাক্যটিতে বলা হয়, তাদের সুপারিশও আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করতে পারেন। পবিত্র কোরআনের আয়াতদুটো হলো :
 "أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ - وَالْمَنْوَةَ الثَّلَاثَةَ الْآخَرَىٰ" "তোমরা কি লাত, ওযা এবং তাদের তৃতীয় সদস্য মানদতকে দেখেছ?" আর সংযোজিত বাক্যটি হলো,
 "تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَأَنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ" "এগুলো হলো শ্রেষ্ঠ দেবতা। তোমরা তাদের সুপারিশও আশা করতে পার।" সে যাই হোক, এ পর্যন্ত পৌঁছার পরই মহানবী (সা) সেজদায় চলে যান। উপস্থিত মুশরিকরাও তাদের দেবতাদের প্রশংসা শুনতে পেয়ে মহানবী (সা)-এর সাথে সেজদায় চলে যায়।

এই ঘটনাটিই কোন কোন ইসলামী বিশেষজ্ঞ কোন প্রকার বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উল্লেখ না করাটাই সঙ্গত মনে করেছেন। ইবনে সাদ তাঁর 'তবাকাত-ই-কোবরা' গ্রন্থে বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। ইবনে ইসহাকও দেবতাদের (গারানিক) ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, "এটি মুশরিকদের বানানো।" প্রখ্যাত তাফসীরকার ইবনে কাসীর তাঁর "আল্বাদায়া ওয়ান নাহায়া" গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন, "কোন কোন গ্রন্থে দেবতাদের কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। বোখারীতেও তা বর্ণিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা এ কাহিনী বারবার উল্লেখ না করাই শ্রেয় মনে করি।" অতঃপর ইবনে কাসীর বোখারীর উক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেছেন, "এই কাহিনীওয়ালা হাদীসটি শুধু বোখারীতে বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলিম এটি উল্লেখ থেকে বিরত রয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করেছেন।"

আমরা বিনা দ্বিধায় এ কাহিনীটি অস্বীকার করছি। আমাদের মতে এ ব্যাপারে ইবনে ইসহাকের অভিমতই সঠিক। তিনি বলেছেন, মুশরিকরাই 'গারানিক' বা দেবতাদের কাহিনী সংযোজন করেছে। এ ব্যাপারে আমাদের নিকট অনেক প্রমাণ রয়েছে। এসব প্রমাণের আলোকে বলতে হয়, এ ধরনের ঘটনার অস্তিত্ব রিসালাতের পবিত্রতারই পরিপন্থী। আর এই পবিত্রতার শক্তি ছাড়া নবী-রাসূলগণ তাঁদের প্রতি ন্যস্ত রিসালাত তথা আল্লাহ তা'আলার বিধান প্রচার-প্রসারের দায়িত্বই পালন করতে পারতেন না। আমরা এ ব্যাপারে মূল গ্রন্থে আধুনিক দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছি।

গ্রন্থ রচনায় যুগের প্রভাব

মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত সম্পর্কিত তথ্যাবলিতে মতপার্থক্য ও মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার পিছনে আর একটা কারণ রয়েছে। সেটা হলো, সময় ও পরিবেশের প্রভাব। প্রথমে এসব তথ্য বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। এক পর্যায়ে এগুলো সংকলন আরম্ভ হয়। যে যুগে ও পরিবেশে এসব একত্র করা হয়, তার ছাপ সেগুলোতে অবশ্যই পড়েছে। আর সেজন্য এসব তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া সামনে অগ্রসর হওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার।

মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের এক শতাব্দী কিংবা তারও কিছু বেশি কাল পর জীবন চরিত বিষয়ক প্রথম গ্রন্থটি প্রণীত হয়। এ সময়ের আগেই মুসলমান রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ-সংঘাত আরম্ভ হয়ে যায়। আর এরূপ অশান্ত ও অস্থির পরিবেশে বিভিন্ন বর্ণনা ও হাদীস সংকলিত হয়। পরবর্তীকালে এই অশান্ত পরিবেশ বৃদ্ধি পেয়েছে বৈত্বাস পায়নি। তার মধ্যেই ইসলামী চিন্তাবিদগণকে হাদীস সংকলন করতে হয়েছে, বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করতে হয়েছে। অবশ্য বিভিন্ন বর্ণনা ও হাদীস সংকলন এবং গ্রন্থ রচনায় সেসব যুগের ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এজন্য তাঁদের হাজারো প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাব থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন, এমন দাবিও করা যায় না। ইমাম বোখারীর কথাই ধরা যাক। ইসলামী রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা দিন দিন বেড়েই চলে। হাদীস বর্ণনাকারিগণও এই সঙ্গে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েন। ফলে হাদীসের বর্ণনা সংগ্রহের জন্য ইমাম বোখারীকে সমকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে হয়। অনেক পরিশ্রম করে তিনি হাদীস সংগ্রহ

করেন। তাঁর বক্তব্য হলো, এ সময় ছ'লক্ষাধিক হাদীস প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে আবার তাঁর বিচারেই মাত্র চার হাজার হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হতে পেরেছেন। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, প্রচলিত প্রতি দেড়শ' হাদীসের মধ্যে মাত্র একটি হাদীস বিশুদ্ধ হিসাবে স্বীকৃত ছিল। অনুরূপ ইমাম আবু দাউদ পাঁচ লাখ হাদীসের মধ্যে মাত্র চার হাজার আটশ' হাদীস তাঁর গ্রন্থ 'সুনানে আবু দাউদে' সংকলন করেন। অবশিষ্ট হাদীসগুলো তিনি বিশুদ্ধ বলে বিবেচনা করেননি। অন্যান্য হাদীস সংকলকরাও অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তারা বহু হাদীস সহীহ বিবেচনা করে নিজেদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন। কিন্তু সেসব হাদীসই আবার অন্যদের দৃষ্টিতে সহীহ বা বিশুদ্ধ বিবেচিত হয়নি।'

গারানিক বা দেবতাদের ঘটনাও এই অবস্থার ব্যতিক্রম নয়। পরবর্তীকালের সংকলকরা এই ঘটনাটি তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংকলকরাই সমালোচনা ও বিতর্ক থেকে মুক্ত নন। এমতাবস্থায় পরবর্তীকালের সংকলকদের অবস্থা কি হতে পারে! বিশেষ করে, জীবন চরিত সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কি করে গ্রহণ করা যায়!

রাজনৈতিক কলহের প্রভাব

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রাথমিক যুগের পর পরই মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক কলহ চরম আকার ধারণ করে। বিভিন্ন বর্ণনা ও হাদীসও এই অপ্রীতিকর অবস্থার প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকতে পারেনি। আর এজন্যই ওমাইয়া শাসনামলের শেষ নাগাদ কোনো হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য ওমাইয়া খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয হাদীস সংকলনের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই আগ্রহ বাস্তবায়িত হয় আব্বাসীয় খলীফা মামুনুর রশীদের শাসনামলে। ইমাম দারে-কুত্নী বলেছেন, “সে যুগে সহীহ হাদীসের সংখ্যা ছিল কালো গাভীর শরীরে বিক্ষিপ্ত কিছু সাদা পশমের মতো।”

হাদীস সংকলনের সূচনা

স্বভাবতই একটা প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কেন হাদীস সংকলন করা হলো না। এর কারণ সম্ভবত এই যে, “মহানবী (সা) বলেছেন, পবিত্র কোরআন ছাড়া অন্য কিছু তোমরা আমার নিকট থেকে লিখবে না। কেউ কিছু লিখে থাকলে তা মুছে ফেলো।” এরূপ পরিস্থিতিতে মহানবী (সা)-এর সকল বাণী মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে সময়ও বিভিন্ন বর্ণনায় মতানৈক্য ছিল।

সর্বপ্রথম হযরত ওমর (রা) হাদীস সংকলনের অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর ধারণা ছিল, মহানবী (সা)-এর বাণী সংকলনের মাধ্যমে বর্ণনারাজির মতানৈক্য দূর করা সম্ভব হবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর শীর্ষস্থানীয় সাহাবাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে সবাই তাঁকে সমর্থনও করেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা) বিষয়টির উল্টোদিকের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন। এরপর তিনি অনবরত একমাস 'এস্তেখারা' করেন। পরিশেষে তিনি

১. গ্রন্থকারের এই ঢালাও মন্তব্য হাদীস সংকলনের ইতিহাসের যথার্থ চিত্র নয়। কারণ খুব নগণ্যসংখ্যক সংকলিত হাদীস সম্পর্কে হাদীসবিদদের এ ধরনের মতপার্থক্য রয়েছে। -অনুবাদক

তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। তিনি জনসাধারণের উদ্দেশে বলেন, “প্রথমে আমি ইচ্ছা করেছিলাম হাদীসও লিপিবদ্ধ করা। কিন্তু এখন এই ইচ্ছা ত্যাগ করেছি। আল্লাহ না করুন, তাতে পবিত্র কোরআনের সাথে হাদীস মিশে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।” এ ঘোষণার পর হযরত ওমর (রা) সকল অধিকৃত রাজ্যে লিখিত ফরমান জারি করেন, “যদি কারো নিকট কোন হাদীস লিখিত অবস্থায় থাকে, তিনি যেন তা মুছে ফেলেন।”

পবিত্র কোরআন ও হাদীস পরস্পরে মিশে যাওয়ার আশংকা দূরীভূত হওয়ার পর হাদীস সংকলন আরম্ভ হয়। অবশ্য তার আগেও হাদীস লিখে রাখা একেবারে বন্ধ ছিল না। সে যাই হোক, এ কাজটি শুরু হয় আব্বাসীয় খলীফা মামুনের রশীদের আমলে। তাতে কোন সন্দেহ নেই যে, সংকলনগণ সহীহ হাদীসগুলো সংকলনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা একাধিক বিধি-বিধান ও নীতিমালা অনুসরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের সহীহ হিসাবে গৃহীত কোন কোন হাদীস সম্পর্কে পরবর্তীকালের হাদীসবিদরা সমালোচনা করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, ইমাম নববী সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন, “হাদীসবিদদের একটি দল বোখারী ও মুসলিমে সংকলিত কিছুসংখ্যক হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে ইমাম বোখারী ও মুসলিম হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের ব্যাপারে যেসব শর্তারোপ করেছেন, এসব হাদীসের সনদে সেগুলো নেই।”

বিশুদ্ধ হাদীসের নিরিখ

বস্তুত সংকলকরা হাদীস গ্রহণের বেলায় দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। এগুলো হলো সনদ বা সূত্রের ধারাবাহিকতা এবং বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা। কিন্তু এ দুটো বিষয়ই যথেষ্ট নয়। আমাদের মতে হাদীসের বিশুদ্ধতা, এমনকি বর্ণনার সুষ্ঠুতা ও সঠিক অবস্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-এর একটি অমর বাণীর প্রতিও তাকাতে হবে। সেটি হলো :

انكم ستخلفون من بعدى ، فمأجاءكم عنى فاعرضوه على كتاب الله
فما وافقه فمنى وما خالفه فليس عنى -

“হে মুসলমানগণ! আমার পর তোমরা নানা ধরনের মতবিরোধিতায় জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু যখনই কোনো হাদীস আমার নামে বর্ণনা করা হবে তোমরা তা আল্লাহর কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখবে। যদি তা কোরআন মোতাবেক হয়, তাহলে মনে করবে আমি তা বলেছি। আর যদি তা কোরআনের বিপরীত হয়, তাহলে সেটা আমার কথা মনে করবে না।”

পূর্ববর্তী (মোতাকাদেমীন) ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ এই নিরিখেই বিভিন্ন বর্ণনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। এই মূলনীতি আজো ইসলামী চিন্তাবিদগণ অনুসরণ করেছেন। যেমন ইবনে খালদুন বলেছেন :

“যেসব হাদীস কিংবা সাহাবীদের বাণী কোরআনের প্রতিবেদনের পরিপন্থী, আমি সেগুলো বিশুদ্ধ বলে বিশ্বাস করি না। এসবের বর্ণনাকারী যতোই নির্ভরযোগ্য হোক না কেন। কারণ কোন কোন বর্ণনাকারীকে তাঁর বাহ্যিক অবস্থার বিচারে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হতো। কিন্তু তাদের অন্তর ভাল ছিল না। সনদের সাথে যদি হাদীসের ভাষাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, তাহলে অনেক হাদীস ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হবে। যেমন ‘উসূলে হাদীস’ বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন,

‘মওযু’ বা ভিত্তিহীন হাদীসের পরিচয় হলো এই যে, তাতে কয়েকটি বিষয়ের কোন না কোনটি অবশ্যই পাওয়া যাবে। সেগুলো হলো, (ক) উক্ত হাদীসটি পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট প্রতিবেদনের পরিপন্থী। (খ) শরীয়ত নির্ধারিত বিধি-বিধানের বিরোধী। (গ) যৌক্তিক প্রমাণাদির বিপরীত। (ঘ) সকল স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের পরিপন্থী।”

বস্তুত মহানবী (সা)-এর বাণী গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে এই নিরিখটিই যথার্থ। এ সম্পর্কে ইবনে খালদুন যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন, তাতে আধুনিক জ্ঞানগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিই পুরোপুরি অভিব্যক্ত হয়েছে।

মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পর মুসলমানদের পারস্পরিক মতবিরোধের ব্যবধান দিন দিন বেড়েই চলে। অনেক লোক নিজ নিজ মত ও পথের সমর্থনে হাদীস বানান আরম্ভ করে। তাতে করে দুই-একটি নয়, অসংখ্য মওযু হাদীস মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। ওদিকে ক্রীতদাস আবু লুলুর হাতে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) শাহাদাত বরণ করেন। হযরত ওসমান (রা) খেলাফত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর খলীফা হওয়ার পর বনু ওমাইয়া ও বনু হাশিমদের প্রাক-ইসলামী যুগের শত্রুতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এমনকি হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। একদিকে হযরত আয়েশা (রা) অপরদিকে তাঁর বিরুদ্ধে হযরত আলী (রা) রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হন। এই অপ্রীতিকর পরিবেশে হাদীস বানানোর প্রবণতাও বেড়েই চলে। এরূপ পরিস্থিতিতে হযরত আলী (রা)-এর একটি উদ্ধৃতি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, “আমার নিকট তোমাদের পড়ে শোনানোর মতো দুটো লেখা ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ নেই। তার একটি হলো পবিত্র কোরআন। অপরটি হলো এই পুস্তিকা। তাতে আমি সাদাকা বা দান-খয়রাত সম্পর্কিত রাসূলের বাণী লিখে রেখেছি।” হযরত আলী (রা)-এর এরূপ ক্রোধ প্রকাশ সত্ত্বেও মনগড়া হাদীস প্রচারকরা বিরত হয়নি। তারা মনগড়া বর্ণনা ছড়িয়েই চলে। কারণ এ ধরনের ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বর্ণনার মাধ্যমেই তারা অন্যদের নিজেদের দলে ভিড়াতো। মনগড়া হাদীস প্রচারের পিছনে আর একটা কারণ হলো, সে যুগে মনে করা হতো এ ধরনের হাদীসের মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর অনুসরণের প্রতি মুসলমানদের অধিকতর আকৃষ্ট করা যাবে। এমনকি ওমাইয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তির যুগে তাদের সমর্থকরা হযরত আলী (রা)-এর দোষ-ত্রুটি বলাটা নেক কাজ বলে মনে করত। অপরদিকে হযরত আলী(রা)-এর ভক্ত ও সমর্থকরাও বসে ছিল না। তারা হযরত আলী (রা) ও নবী-পরিবারের অন্যান্য সদস্যের প্রশংসামূলক বর্ণনা তৈরি আরম্ভ করে। উভয় পক্ষই এসব মনগড়া হাদীস ও বর্ণনা দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়াতে থাকে। এই তৎপরতার একটি ঘটনা ইবনে আসাফের আবু সাআদ ইসমাঈল ইবনে মুসান্না থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে :

“আবু সাআদ দামাশকে ওয়ায করছিলেন। শ্রোতাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আবু সাআদকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহানবী (সা)-এর হাদীস- ‘আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী হচ্ছে তার দরজা’ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? আবু সাআদ কিছুক্ষণ নীরব দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর তিনি বললেন, এই হাদীসটির মূল ভাষ্য প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ছাড়া সঠিকভাবে কেউই জানে না। তা হলো এই যে, ‘আমি হচ্ছে জ্ঞানের শহর। আবু বকর হলো তার বুনিয়াদ

বা ভিত্তি। ওমর তার প্রাচীর, ওসমান তার ছাদ এবং আলী হলো তার দরজা। আবু সাআদের মুখে এই ভাষ্য শুনে উপস্থিত শ্রোতারা অত্যন্ত খুশী হন। তারা এর বর্ণনাকারীদের পরিচয় জানতে চান। কিন্তু আবু সাআদ এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারলেন না। অবশেষে তিনি বসে পড়েন।”

রাজনৈতিক শক্তিমত্তার প্রভাবে এভাবে মনগড়া হাদীস প্রচার লাভ করতে থাকে। তাতে মুসলমানদের হয়রানি বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ এ জাতীয় বর্ণনার বেশির ভাগ ছিল পবিত্র কোরআনের পরিপন্থী। অবশ্য দৃঢ়মনা মুসলমানরা সহীহ ও মওযু হাদীসগুলো চিহ্নিত করার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁরা খুব একটা সফলতা লাভ করতে পারেননি।

মামুনের আমলে হাদীস সংকলন

বনু ওমাইয়াদের পতনের পর বনু আব্বাস শাসনক্ষমতা অধিকার করে। ইতিমধ্যে অসংখ্য মওযু হাদীস মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে। এসবের বর্ণনায় পারস্পরিক সাযুজ্য তো ছিলই না, এমনকি বৈপরীত্যও ছিল। এসব কথা ভাবলেও মন শিউরে ওঠে। এমনি পরিবেশে মহানবী (সা)-এর ইত্তেকালের দু’শতাব্দী পর আব্বাসীয় খলীফা মামুনুর রশীদের আমলে হাদীস সংকলকগণ জীবন-চরিত সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোর সংকলন আরম্ভ করেন। এসব সংকলকের মধ্যে রয়েছেন ওয়াকিদী, ইবনে হিশাম ও মাদাইনী। তাঁরা মামুনের প্রভাবাধীন থেকে নিজ নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শুধু তাঁরাই নন, সে যুগের অন্যান্য বর্ণনা সংকলকেরও সমকালীন খলীফার ইচ্ছার বিরোধিতা করার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং সহীহ হাদীসের নিরিখ একটিই। তা হলো, পবিত্র কোরআনের মোতাবেক হাদীসই মহানবী (সা)-এর বাণী মনে করতে হবে। আর যে বর্ণনা পবিত্র কোরআনের ভাষ্যের পরিপন্থী সেটা হাদীস হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।

হাদীস সংকলনের সময় যদি অনুরূপ গভীর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হতো, তাহলে আমাদের সেকালের ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থরাজির চেহারাই ভিন্নরূপ হতো। হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত আমাদের মূলনীতি আধুনিক জ্ঞানগত গবেষণা পদ্ধতিরও বিরোধী নয়। দুঃখের বিষয়, আমাদের সেকালের ইসলামী চিন্তাবিদগণ সমকালীন পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উক্ত মূলনীতি পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারেননি। অবশ্য কোন কোন

১. গ্রন্থকারের এই প্রতিবেদন সে যুগে হাদীস ও মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত বিষয়ক বর্ণনার ইতিহাসের যথার্থ চিত্র নয়। সংকলকদের কেউ কেউ সমকালীন খলীফার প্রভাব কাটিয়ে না উঠতে পারাটা বিচিত্র নয়। তাই বলে সবার সম্পর্কে এ ধরনের ঢালাও মন্তব্য করা ঠিক নয়। কারণ সে আমলের হাদীস ও জীবন-চরিত বিষয়ে অনেকে তাঁদের গ্রন্থে এমন সব হাদীসও উল্লেখ করেছেন, যা আব্বাসীয় খলীফাদের মনোপূত ছিল না। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, ইমাম বোখারী, ইমাম তিরমিযী প্রমুখ মনীষী আব্বাসীয়দের সবচাইতে বড় শত্রু আমীর মুআবিয়ার প্রশংসাসূচক হাদীস সংকলন করেছেন। মারওয়ানের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। আর তাঁরা এসব সংকলন করেছেন আব্বাসীয় আমলেই। হযরত ইমাম মালেক, হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত ইমাম আবু হানীফা (র) প্রমুখ মনীষীকে আব্বাসীয় খলীফাদের কথা না শোনার জন্য নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। এমনকি হযরত ইমাম আবু হানীফাকে জেলেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। সুতরাং এসব মনীষী তাঁদের গ্রন্থ রচনা, হাদীস ও বর্ণনা সংকলন এক কথায় নিজেদের মতামত প্রকাশে সমকালীন রাজশক্তির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি, বলাটা সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছুই নয়। -অনুবাদক

বিষয়ে তাঁরা উক্ত মূলনীতি অনুসরণ করেছেন। আবার কোন কোন বিষয়ে তা রক্ষা করতে পারেননি। পরবর্তীকালের ইসলামী চিন্তাবিদরা মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত লেখার সময় এ ব্যাপারটির প্রতি খুব একটা দৃষ্টিপাত করেননি। তারা কোন প্রকার বিচার-বিবেচনা ছাড়াই পূর্ববর্তী বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনারাজি গ্রহণ করেছেন। তাঁরা যদি প্রতিটি বর্ণনা পবিত্র কোরআনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নিতেন, কতো ভাল হতো!

অবশ্য ইমামদের মধ্যে অনেকে উক্ত মূলনীতি গ্রহণ করেছেন। তাঁরা পবিত্র কোরআনের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ বর্ণনারাজিই শুধু নিজেদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া অন্য কোনো বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য মনে করেননি। বিভিন্ন যুগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইসলামী চিন্তাবিদও তাঁদের অনুসরণ করেছেন। এই অনুসরণের ধারা বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে আসছে। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান মুহাম্মদ মুস্তফা আল-মারাগী একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, “পবিত্র কোরআনই ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সবচেয়ে বড় মুজিয়া। আর এটা যুক্তির নিরিখেও গ্রহণযোগ্য।”

বোসাইরী বলেছেন, “পবিত্র কোরআন যে একটি মুজিয়া বা অলৌকিক গ্রন্থ, জ্ঞান এ ব্যাপারটা আমাদের সহজেই বলে দিচ্ছে। আর তা মেনে নিতে আমাদের এতটুকু দ্বিধা হয় না।”

মিসরের ‘আল-মিনার’ সাময়িকীর সম্পাদক সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রেযা পবিত্র কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের জবাবদান প্রসঙ্গে বলেছেন, হায়কলের গ্রন্থ সম্পর্কে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমগণ ও সূফী-সাধকদের সবচাইতে বড় অভিযোগ হলো, তিনি তাতে অলৌকিক ঘটনাবলি আলোচনা করেননি। অবশ্য আমি আমার ‘আলওয়াহ্যিউল মুহাম্মদী’ বা ‘হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ওহী’ শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছি যে, পবিত্র কোরআনই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমনকি, অন্যান্য নবী-রাসূলের সত্যতা প্রমাণের জন্য বর্তমানে আমাদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ নেই। আর এই পবিত্র কোরআন তাঁদের সত্যতাও আমাদের নিকট তুলে ধরছে। তা ছাড়া অলৌকিক ঘটনা কোন প্রমাণ নয়। এটাকে একটা আলামত বলা যায়। আর তা অতীতের মতো বর্তমান যুগেও প্রকাশিত হয়ে থাকে। কথায় কথায় অলৌকিকতা অনুসন্ধানের প্রবণতা প্রতিটি যুগে প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়। আমি আমার উক্ত গ্রন্থে অলৌকিকতার প্রতি জনসাধারণের এই আকর্ষণ সম্পর্কে যৌক্তিক ও প্রথাগত উভয় দিক থেকেই আলোচনা করেছি।

শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ তাঁর ‘আল-ইসলাম ওয়াসান্নাসরানিয়াহ্’ বা ‘ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম’ শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, “আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের প্রতি আহবানে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি ও প্রকৃতিগত প্রমাণাদি ছাড়া ইসলাম অন্য কোন কিছুর উপর গুরুত্ব আরোপ করে না। আর বিশ্বজগত ব্যবস্থাই এসব প্রমাণের উৎস—অলৌকিক ঘটনাবলি নয়। যারা অলৌকিক ঘটনাবলির দিকে তাকিয়ে আছে—তারা আসমানী বা ঐশী আহবান শুনতে পায় না। এমনকি, আল্লাহ তা‘আলার এ বিশ্ব চরাচর ব্যবস্থাও তাদের মনে রেখাপাত করে না। এ থেকে তারা শিক্ষালাভও করতে পারে না। কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজ্ঞানহীন লোক ছাড়া পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সচেতন মুসলমান এ ব্যাপারে অভিন্ন মত পোষণ করেন যে, নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আগে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমান আনতে হয়। কারণ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ছাড়া নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে,

আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য নবী-রাসূলদের বাণীর উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে কিংবা তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থরাজি থেকেই জ্ঞান লাভ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপনের আগে তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থে বিশ্বাস স্থাপন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ব্যাপার। অবশ্য আগে থেকে যদি আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি আস্থাবান হয়, তা'হলে তাঁর প্রেরিত রাসূল ও অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন একটা সম্ভব ব্যাপার।

খুব সম্ভব সেকালের ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখকরা যুগের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে মহানবী (সা)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট পবিত্র কোরআন বহির্ভূত অলৌকিক ঘটনাবলি তাঁদের গ্রন্থরাজিতে সংকলন করেছিলেন। বলা চলে, যুগের প্রয়োজনে এ ব্যাপারে তাঁরা অনেকটা মজবুর ছিলেন। পরবর্তীকালের লেখক-চিন্তাবিদরাও এ ব্যাপারে তাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন, এসব অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমান সুদৃঢ় হবে। এমনকি, এসবের পুনরাবৃত্তি করারও তাঁদের ধারণায় উপকার বৈ ক্ষতি ছিল না। তাঁরা যদি এ ধরনের সুধারণা পোষণ না করতেন, তা'হলে অবশ্যই তাঁরা এসব বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতেন। তাঁরা বর্তমানে জীবিত থাকলে দেখতে পেতেন, ইসলামের শত্রুরা এসব অলৌকিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলাম সম্পর্কে কিরূপ জঘন্য সমালোচনা করছে। এসব দেখতে পেলে পবিত্র কোরআন বহির্ভূত অলৌকিক ঘটনাবলি কখনো তাঁরা নিজেদের গ্রন্থরাজিতে উল্লেখ করতেন না। পরবর্তীকালের ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম গায্বালী, মুফতী আবদুহ, আল-মারাগী প্রমুখের সাথে তাঁরাও অভিন্ন মত ব্যক্ত করতেন যে, অলৌকিক ঘটনাবলির বর্ণনা মুসলমানদের ঈমানকে সুদৃঢ় করে না; বরং মনে দুর্ভাবনা ও বিশ্বাসে অসঙ্গতিই সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় সেকালের ইসলামী চিন্তাবিদ লেখকরাও শুধু পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত অলৌকিক ঘটনাবলিই উল্লেখ করতেন।

যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান ও গবেষণা দ্বারা মানব জাতি ও ইসলামের সেবা করতে চান আর এই কর্তব্য ও দায়িত্ব যিনি মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত প্রণয়নের মাধ্যমে সম্পন্ন করার মনস্থ করেন, তাঁকে একটা বিষয়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। সেটা হলো, এ ব্যাপারে জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপন্থী বর্ণনারাজি সম্পর্কে তাঁকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত তাঁকে এমন গবেষণার দৃষ্টি নিয়ে লিখতে হবে, যাতে তা থেকে মানুষ সৎ পথের সন্ধান লাভ করতে পারে। মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত সম্পর্কিত হাদীস ও বর্ণনাগুলো পবিত্র কোরআনের ভাষ্যের সাথে মিলান হলে দেখা যাবে তার সাথে অনেকগুলোরই কোনরূপ সাযুজ্য নেই। এজন্যই গবেষক আলেমরা কোরআনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব হাদীস ও বর্ণনার বিশুদ্ধতা মেনে নিতে পারেননি। আর সে দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোন লোক সেসব ইসলামী চিন্তাবিদের সাথে অভিন্ন মত প্রকাশ করতে বাধ্য হবে।

পবিত্র কোরআন ও মু'জিযা

মক্কাবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসাবে মহানবী (সা)-কে মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা দেখানোর কথা বলে। কিন্তু পবিত্র কোরআন তাদের এই দাবিকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে:

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا . أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ - خَلَّلَهَا تَفْجِيرًا . أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا . أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ - وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ - قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا .

“তারা বললো, আমরা তোমার উপরে আস্থা প্রকাশ করবো না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য মাটির বুকে ঝর্ণাধারা বইয়ে দাও। অথবা তুমি নিজের জন্য খেজুর কিংবা আঙ্গুর বাগানের ব্যবস্থা কর। আর তাতে নহর-নালায় পানির ধারা চালু কর। কিংবা তুমি যে ধরনের কথাবার্তা বলছো, তাতে তুমি যদি আমাদের নিকট আসমানের টুকরো নিয়ে আস। কিংবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের আমাদের সামনে নিয়ে আস। কিংবা তোমার বাসঘর সোনা দিয়ে তৈরি হোক। অথবা তুমি যদি আসমানে উঠে যাও। আর তোমার আসমানে চলে যাওয়াতেও আমরা তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবো না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য এমন কোন গ্রন্থ পাঠাবে, যা আমরা পড়ে দেখবো। তুমি বল, আমার প্রভু পবিত্র মহান! আর আমি একজন মানুষ ও রাসূল বৈ কিছুই নই।” (১৭ : ৯০-৯৩)

পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে :

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا - قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ . وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ . وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ .

“তারা তো আল্লাহর নামে বড় কঠিন রকমের শপথ নেয় যে, তাদের কাছে যদি কোন নিদর্শন পৌঁছায়, তবে তারা অবশ্যই তাতে ঈমান আনবে। তুমি বলো, নিদর্শন তো সবই আল্লাহর কাছে রয়েছে। তাদের নিকট নিদর্শন আসলেও যে তারা ঈমান আনবে না—এটা কিরূপে তোমাদের বোধগম্য করানো যাবে? তারা যেমন প্রথমবারে তাতে ঈমান আনেনি, তেমনি আমিও তাদের অন্তরে ও চোখে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেব। আর আমি তাদের নিকট ফেরেশতা পাঠালেও, মৃতরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সব বস্তু তাদের সামনে হাযির করলেও যদি না আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা করেন তারা ঈমান আনবে না; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।” (৬ : ১০৯-১১১)

১. গ্রন্থকার পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত দুটো ভাষ্য তাঁর অভিমতের সমর্থনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলতে চাইছেন, এই দুটো ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআনের বাইরে মহানবী (সা)-এর কোন

প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা)-এর নবুয়ত ও রিসালাত প্রমাণের জন্য স্বয়ং পবিত্র কোরআনই অতুলনীয় মু'জিয়া। এ ছাড়া উক্ত পবিত্র গ্রন্থে এমন কোন অলৌকিক ব্যাপার নেই, যা সকল যুগে সারা পৃথিবীর জন্য মহানবী (সা)-এর রিসালাত সত্যায়নের উপকরণ হতে পারে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, মহানবী (সা)-এর আগে যেসব নবী-রাসূল আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাদের অনেকের অলৌকিক ঘটনাবলির কথা পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে। অনুরূপ মহানবী (সা)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং তাঁর সাথে সুন্দর সম্বোধনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত মহানবী (সা) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এ ধরনের যা কিছু বলা হয়েছে, তাতে যুক্তি-বুদ্ধি সাযুজ্য-বিরোধী বা অস্বাভাবিক কিছুই নেই।

শ্রেষ্ঠতম মু'জিয়া

বস্তুত পবিত্র কোরআন ও তার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হাদীসগুলো কোরআন ছাড়া মহানবী (সা)-এর অন্যান্য মু'জিয়ার ব্যাপারে অনেকটা নীরব বলা চলে। এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, এমতাবস্থায় পূর্ববর্তীদের থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের মুসলমানরা পর্যন্ত সবাই পবিত্র কোরআন ছাড়া অন্যান্য মু'জিয়ার ব্যাপারে এতটা সোচ্চার কেন। এ প্রশ্নের একটাই জওয়াব হতে পারে। আর তা হলো, মুসলমানরা পবিত্র কোরআনে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের বিভিন্ন মু'জিয়ার কাহিনী দেখতে পাচ্ছে। এসব দেখে তারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তারা মনে করে মহানবী (সা)-এর জন্যও মু'জিয়া থাকা অত্যাবশ্যিক। তাদের ধারণায় জড়ো অলৌকিক ঘটনা

মু'জিয়া ছিল না। এটা কিন্তু তাঁর একান্তই নিজস্ব অভিমত। কারণ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তাফসীরকার উক্ত দুটো ভাষ্যের যে শানে নুযূল, পটভূমি ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তাতে গ্রন্থকারের অভিমতের সমর্থন নেই। বিভিন্ন তাফসীরকারের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, এমনকি খোদ ভাষ্য দুটোর অর্থ থেকেও এ কথাই প্রতিভাত হয় যে, তাতে মক্কার মুশরিকদের কূট উদ্দেশ্যই তুলে ধরা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বাইরে মহানবী (সা)-এর কোন মু'জিয়া নেই, এসব আয়াতে তা বলা হয়নি। ইমাম রাযী তাফসীরে কবীর গ্রন্থে পবিত্র কোরআনের প্রথম ভাষ্যটির পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, একদিন মক্কার মুশরিক সরদাররা বসে গালগল্প করছিল। তারা এক লোক দ্বারা রাসূলকে ডেকে পাঠায়। মহানবী (সা) সেখানে এলে তারা আয়াতে উল্লিখিত প্রশ্নগুলো করে। এসব প্রশ্নের পিছনে তাদের কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। এমনকি মহানবী (সা) তাদের দাবিগুলো বাস্তবায়িত করে দেখালেও তারা ঈমান আনত না। হয়তো তারা আরো হাজারো মু'জিয়া দেখানোর আবদার করে বসত, তাদের দেখাদেখি অন্যরাও এ ধরনের দাবি করত। আর আল্লাহর ধর্ম প্রচার বাদ দিয়ে মহানবী (সা)-কে এসবই করে বেড়াতে হতো। তা'ছাড়া, ঈমান আনার জন্য মু'জিয়া বা অলৌকিক ব্যাপার কোন অবশ্যম্ভাবী বিষয়ও নয়। আর তাই আল্লাহর নির্দেশে মহানবী (সা) মুশরিকদের এসব প্রশ্নের কোন গুরুত্ব দেননি। এসব বাস্তবায়নে তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করেন। সে প্রসঙ্গেই সূরা ইসরার উক্ত ভাষ্যটি নাযিল হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের সূরা আনআমের দ্বিতীয় ভাষ্যটিও এমনি একটি ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার কাফেররা মিথ্যে শপথ করে মহানবী (সা)-কে বলেছিল, আপনি আমাদের প্রস্তাবিত মু'জিয়াগুলোর কিছু যদি বাস্তবায়িত করে দেখান, তা'হলে অবশ্যই আমরা ঈমান আনব। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই দাবি মিথ্যে প্রতিপন্ন করা প্রসঙ্গে উপরোক্ত ভাষ্যটি অবতীর্ণ করেন এবং বলেন, একটা মু'জিয়া প্রকাশের পর আর একটা, সেটার পর আর একটা, এমনি করে প্রকাশের মাধ্যমে কোন শুভফল হতে পারে না। বরং সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার মতো একটি মু'জিয়াই যথেষ্ট। বারবার অলৌকিকতার দাবি নিরর্থক বৈ কিছু নয়।' সুতরাং উক্ত দুটি ভাষ্য দ্বারা এ কথা বোঝানো হয়নি যে, পবিত্র কোরআন ছাড়া মহানবী (সা)-এর অন্য কোন মু'জিয়া ছিল না। -অনুবাদক

ছাড়া রিসালাতই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তারা অলৌকিক ঘটনাবলির ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য মনে করে বসে আছে। এসব বর্ণনার প্রতিবেদন যে পবিত্র কোরআন সমর্থিত নয়, এ দিকটির প্রতি তারা কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ করেনি। তারা ধারণা করেছে, মহানবী (সা)-এর মু'জিয়ার প্রাচুর্য তাঁর রিসালাতের প্রতি মানুষের ঈমান-বিশ্বাসের শক্তি বৃদ্ধির কারণ হবে। অথচ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের সাথে মহানবী (সা)-এর সাদৃশ্য ভিন্নধর্মী বিষয়কে একত্রিতকরণ বৈ কিছু নয়।'

বস্তুত মহানবী (সা) শেষ নবী ও শেষ রাসূল হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বনবীও। অন্য নবী-রাসূলগণ তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়কে হেদায়েত করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা)-কে দেশ, কাল বা সম্প্রদায় বিশেষের জন্য প্রেরণ করেননি। তিনি হলেন কেয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্ব-মানুষের রাসূল—পথ প্রদর্শক। আর তাই তাঁকে আল্লাহ তা'আলা এমন মু'জিয়া দান করেন, যা প্রকৃতি ও বুদ্ধি-জ্ঞান সম্মত। মানুষ ও জিন জাতির সবাই মিলেও অনুরূপ কিছু আবিষ্কার করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত মহানবী (সা)-এর উক্ত মু'জিয়া হলো পবিত্র কোরআন। তা একক বৈশিষ্ট্যময়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনকে অকাট্য প্রমাণ হিসাবে অবতীর্ণ করেন। যাতে মহানবী (সা) তাঁর জীবন পথে এর অলৌকিক শক্তি দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। বাস্তবে তাই হয়েছিল। মহানবী (সা)-এর রিসালাত প্রমাণের সহায়ক হিসাবে যদি কোনো জড়ো মু'জিয়া বা অলৌকিক ব্যাপার থাকত, সেটা আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করতেন। কিন্তু কোনও কোনও মানুষের স্বভাব এমন যে, তারা বুদ্ধিজ্ঞান সম্মত বিষয় ছাড়া অন্য কিছু অনুধাবন করতে পারে না, তাই মহানবী (সা)-এর রিসালাতের যথার্থতা বোঝাবার জন্য একটি একক বৈশিষ্ট্যময় প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যাতে তা তাদের অন্তর ও জ্ঞান-বুদ্ধি সহজে গ্রহণ করতে পারে। সেটা হলো পবিত্র কোরআন, আল্লাহ তা'আলার অকাট্য প্রমাণ এবং মহানবী (সা)-এর জন্য মু'জিয়া বা অলৌকিক বিষয়। আর এই কোরআনকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনের সহায়ক উপকরণ এবং মু'মিনদের ঈমানী শক্তির জন্য অকাট্য প্রমাণ হিসাবে অবতীর্ণ করেন। বস্তুত যে ধর্মের বুনিয়াদ এতটা মযবুত, তার স্বভাবতই এই অধিকার রয়েছে, সে সময়, কাল, দেশ, ভাষা নির্বিশেষে প্রতিটি লোককে কেয়ামত পর্যন্ত তার দিকে আহ্বান জানাতে পারে।

এমনকি আজো যদি কোন অমুসলিম সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং মু'জিয়ার ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআন ছাড়া অন্য কোন কিছু স্বীকার না করে, তা'হলে এজন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে না। তাদের ধর্মবিশ্বাস অসম্পূর্ণ হবে না। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তার এই অধিকার রয়েছে, সে পবিত্র কোরআনের

১. এটা লেখকের নিজস্ব অভিমত। নির্ভরযোগ্য ইসলামী গ্রন্থরাজিতে এই অভিমত স্বীকৃত নয়। কারণ মহানবী (সা) সকল নবী-রাসূলের সরদার এবং সর্বশেষ রাসূল ছিলেন। তাই বলে অন্য নবী-রাসূলদের সাথে তাঁর কোন মিল ছিল না, এমন নয়। যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা) সম্পর্কে বলেছেন, “মুহাম্মদ রাসূল ছাড়া কিছু নয়, তার পূর্বে অনেক রাসূল গত হয়েছে।” (৩ : ১৪৪) সুতরাং অন্য নবী-রাসূলদের জড়ো মু'জিয়া ছিল বলে মহানবী (সা)-এর তা হতে পারে না—এটা কোন যুক্তিগ্রাহ্য কথা নয়। —অনুবাদক

আলোকে মহানবী (সা)-এর অন্যান্য মু'জিয়া বা অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তা-গবেষণা করতে পারে। এরপর যদি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা কোন ব্যাপার প্রমাণিত হয়, তা'হলে বিনাধিধায় তা তাকে মেনে নিতে হবে।' অন্যথায় এ ধরনের লোকের বিরুদ্ধে

১. মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার বর্ণনায় অতীতে বাড়াবাড়ি হয়েছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এই বাড়াবাড়ির ডামাডোলে কিছু কিছু ভিত্তিহীন ঘটনাও তাঁর জীবন-চরিতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর তাই বিভিন্ন যুগে ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকরা নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করে মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত বিষয়ক বর্ণনারাজিকে সে সব বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা অসাধ্য সাধন করেছেন, আশাতীত সফলতা অর্জন করেছেন। সুতরাং মহানবী (সা)-এর জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলি সম্পর্কিত বিশুদ্ধ হাদীস ও বর্ণনাগুলো গ্রহণ করার ব্যাপারে যে কোন সত্যানুসন্ধিৎসুর আপত্তি থাকার সম্ভব কোনও কারণ নেই। কিন্তু এই গ্রন্থের লেখক শুদ্ধাশুদ্ধ নির্বিশেষে সবই এক দৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, পবিত্র কোরআনই মহানবী (সা)-এর একক মু'জিয়া বা অলৌকিক বিষয়। এ ছাড়া অন্য কোন জড়ো অলৌকিক ব্যাপার তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত নন। এমনকি তিনি এ কথাও বলেছেন, যদি রিসালাত প্রমাণের জন্য মহানবী (সা)-এর অন্য কোন মু'জিয়া থাকত, তবে তা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হতো না কেন। শুধু তাই নয়, তিনি মু'জিয়াকে যুক্তি-বুদ্ধির নিরিখে বিচার করতে চাইছেন। তাঁর এসব কথার প্রতি নির্ভরযোগ্য ইসলামী চিন্তাবিদদের সমর্থন পাওয়া যায় না। তা'ছাড়া যুক্তি-বুদ্ধির নিরিখে কিরূপে কোন নবী বা রাসূলের অলৌকিক কর্মকীর্তির বিশুদ্ধতা মূল্যায়ন করা যাবে? কারণ যা অস্বাভাবিক, যা যুক্তি-বুদ্ধির উর্ধ্বে তাই তো মু'জিয়া। আর মহানবী (সা)-এর এ ধরনের একাধিক মু'জিয়ার কথা উল্লেখ করা যায়। মি'রাজ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে পরিষ্কার বলা হয়েছে, “তিনিই পবিত্র ও মহান, যিনি তাঁর বান্দাকে একরাতে কা'বাঘর থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে গেলেন।” (১৭ : ১)

মহানবী (সা)-এর হিজরতও ছিল একটি অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ব্যাপার। তিনি ছিলেন পার্থিব সহায়-সম্বলহীন। অপরদিকে কুরাইশরা ছিল ধনে-জনে বলীয়ান। তারা তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। প্রতিটি গোত্র থেকে একেকজন নাপ্সা তরবারি নিয়ে মহানবী (সা)-কে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের হাত থেকে মহানবী (সা)-কে অলৌকিকভাবে রক্ষা করলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, “কাফেররা যখন তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, যেন তোমাকে তারা বন্দী করতে পারে। কিংবা তোমাকে তারা হত্যা করতে পারে অথবা নির্বাসিত করতে পারে। একদিকে তারা ষড়যন্ত্র করছিল, আর আল্লাহ অপরদিকে নিজের কৌশল কার্যকর করছিলেন। আসলে আল্লাহই কুশলীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।” (৮ : ৩০)

অপর এক জায়গায় হিজরত সম্পর্কে বলা হয়েছে :

“হে মুসলমানগণ! তোমরা যদি তাকে সাহায্য না কর, তা'হলে আল্লাহ তখনো সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাকে নির্বাসিত করেছিল, যখন দু'জন লোকের মধ্যে তিনিই ছিলেন একজন। যখন তাঁরা দু'জন গুহার মধ্যে ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গীকে তিনি বললেন, শোকার্ত হবেন না, আল্লাহ যে আমাদের সাথেই রয়েছেন। তারপর আল্লাহ তাঁর জন্য নিজের দরবার থেকে সান্ত্বনা দান করলেন। তাকে এমন সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করলেন, যা তোমরা দেখতে পাও না। এভাবে আল্লাহ কাফেরদের কথা হয়ে প্রমাণ করলেন। আর আল্লাহর বাণী শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হলো। আল্লাহ তা'আলাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও মহান কুশলী।” (৯ : ৪০) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার বলেছেন, “তাকে এমন সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করলেন, যা তোমরা দেখতে পাও না।” বস্তুত এটাই তো মু'জিয়া বা অলৌকিক ব্যাপার।

অনুরূপ বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ফেরেশতা পাঠিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করার কথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সাহায্য ছিল সম্পূর্ণ অলৌকিক ব্যাপার। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “স্মরণ কর, তোমরা যখন নিজেদের পালনকারীর নিকট ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি

কোনও প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করা উচিত হবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন কোন মু'জিয়া বা অলৌকিক ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়। এমনকি, আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করারও প্রয়োজন নেই। অনুরূপ মহানবী (সা)-এর রিসালাত যা মানবজাতিকে তাদের পালনকর্তার আদেশ নিষেধ মেনে চলার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, তাতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যও পবিত্র কোরআন ছাড়া অন্য কোন মু'জিয়ার স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়। আজো যদি কোন অমুসলিম পবিত্র কোরআন ছাড়া অন্য কোন মু'জিয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তবে তার এই ঈমানকে দুটো অবস্থার যে কোন একটির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ আখ্যায়িত করা যাবে। তার একটি হলো হযরত আবু বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ। তিনি ইসলামের দাওয়াত পেয়েই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-দ্বন্দ্বও ছিল না। আর এক ধরনের মুসলমান হলো যাদের ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের পিছনে এই বিশ্ব-জগত ব্যবস্থা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, যার বিস্তৃতি ও সময়-কালের সীমা-পরিসীমা অনুধাবন আমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সীমাহীন বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বজগতের সব কিছু একটা নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্যকর রয়েছে। বিশ্বজগতের এই চলমান অবস্থা যাদের ঈমানের প্রেরণাশক্তি, তাদের নিকট বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও তার পরিচালন ব্যবস্থা হলো আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার দু'টি অলৌকিক কীর্তি। অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় মুসলিম আলেমের মতে এই দু'টি অলৌকিক কীর্তিই ঈমান সুদৃঢ় হওয়ার কারণ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। আর এক ধরনের ঈমান হলো আল্লাহর শাস্তির ভয় ও সওয়াবের লালসা না করে শুধু আল্লাহর সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাতে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা। বস্তুত মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তো আল্লাহ তা'আলাই এবং তাঁর নিকটই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। পবিত্র কোরআনের ভাষায় : اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ “আমরা সবাই তাঁর মালিকানাধীন এবং আমরা সবাই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।”

রাসূলের আমলের মুসলমান

বর্তমান যুগের মুসলমানরা মু'জিয়া বা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ না করেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাতে অবিচল আছে। প্রথম যুগের মু'মিনদের সাথে এ যুগের মুসলমানদের ঈমানের সাযুজ্য রয়েছে। প্রাথমিক যুগের মুসলমান যারা মহানবী

তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করলেন। আমি এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করব। যারা কাতারবন্দী হয়ে তোমাদের সাহায্যের জন্য আসতে থাকবে।” (৮ : ৯) এমনভাবে বদর প্রান্তরে বৃষ্টির মাধ্যমে মুসলমানদের সাহায্য করার ঘটনাও পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কাফেরদের চোখে মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখানো হয়েছে, যাতে তারা অধিক প্রস্তুতি গ্রহণ না করে। অনুরূপ মুসলমানদের চোখে কাফেরদের কম দেখানো হয়েছে যাতে মুসলমানরা ঘাবড়ে না যান। এমনি মহানবী (সা)-এর জীবনের আরো একাধিক অলৌকিক ঘটনা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব মু'জিয়া বা অলৌকিক ঘটনার প্রেক্ষিতে গ্রন্থকারের দাবি—মহানবী (সা)-এর মু'জিয়া বলতে ছিল পবিত্র কোরআন এবং এ ছাড়া তাঁর অন্য কোন মু'জিয়া পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি—এ মন্তব্য মেনে নেয়া যায় না। আসলে এই বিশ্লেষণ গ্রন্থকারের একান্ত নিজস্ব। মহানবী (সা)-এর নির্ভরযোগ্য কোন জীবন-চরিত গ্রন্থে এ ধরনের উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না।—অনুবাদক

(সা)-এর আমলে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা মু'জিয়া প্রত্যক্ষ করে ঈমান এনেছেন, এরূপ কোন ঘটনা ইতিহাস গ্রন্থরাজিতে উল্লেখ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা দুটো বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। একটি হলো আল্লাহ তা'আলার অকাট্য বাণী ওহীর মাধ্যমে তাঁরা মহানবী (সা)-এর মুখে শুনতে পেয়েছিলেন। অপরটি হলো মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনধারা, যা ছিল একটি উত্তম আদর্শ। তাঁর পবিত্র জীবনের প্রতিটি দিক মানুষকে ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট করেছে।

জীবন-চরিত বিষয়ক সবক'টি গ্রন্থে অভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে, মি'রাজের আগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা একদিন মহানবী (সা)-এর মুখে শুনতে পেলেন যে, একই রাতে মহানবী (সা)-কে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছে এবং সেখানকার পবিত্র স্থানগুলো ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছে। এ কথা শোনার সাথে সাথে একদল মুসলমান তা অবিশ্বাস করে এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে।

সুরাকা ইবনে জু'শুমের ঘটনাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। হিজরতের সময় মহানবী (সা) মদীনার উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করেন। তাঁকে জীবিত কিংবা মৃত ধরে দেয়ার জন্য মক্কাবাসীরা পুরস্কার ঘোষণা করে। সুরাকা ইবনে জু'শুম পুরস্কারের লোভে মহানবী (সা)-কে ধরার জন্য তাঁর পিছনে ধাওয়া করে। সে মহানবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়। এমনকি, কোন কোন জীবন-চরিতকার লিখেছেন, সে মহানবী (সা)-এর নিকট পৌঁছলে অলৌকিকভাবে তার ঘোড়ার খুর মাটিতে দেবে যায়। এ ব্যাপারে আমার প্রশ্ন হলো, এই মু'জিয়া দেখেও সুরাকা কেন ইসলাম গ্রহণ করল না। ফেরআউনের জাদুকররা দেখতে পেলো হযরত মুসা (আ)-এর লাঠি সাপ হয়ে তাদের জাদু দ্বারা সৃষ্ট সব সাপ খেয়ে ফেলছে। লাঠির এই মু'জিয়া দেখে জাদুকররা সবাই ঈমান আনল। অনুরূপ মহানবী (সা)-এর কোন মু'জিয়া প্রত্যক্ষ করে মুশরিকরা কেউ ঈমান এনেছে বলে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়নি।

গারানিক বা প্রতিমা ও তাবূকের ঘটনা

হাদীসে কিংবা জীবন-চরিত বিষয়ক যেসব গ্রন্থে মহানবী (সা)-এর অলৌকিক ঘটনাবলি উল্লেখ করা হয়েছে, সেসবের ভাষা সম্পর্কে হয় মতবিরোধ রয়েছে, নতুবা সেগুলো সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। যেমন প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় আমি 'গারানিক' বা প্রতিমাদের কাহিনী সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছি এবং মূল গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মহানবী (সা)-এর বক্ষ বিদারণের যে ঘটনা বিবি হালিমা হযরত আমেনার নিকট বর্ণনা করেছেন, তাতেও শাদিক মতানৈক্য রয়েছে। বক্ষ বিদারণের সময় মহানবী (সা)-এর বয়স সম্পর্কিত বর্ণনারাজিতেও অভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। হযরত যায়েদ ও উম্মুল মু'মিনিন হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহ বিচ্ছেদের যেসব কারণ বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতেও বৈপরীত্য রয়েছে। এ ব্যাপারে আমি মূল গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাবূকের ঝর্ণার পানির ব্যাপারটিও অনুরূপ। এ সম্পর্কে মুসলিম শরীফে হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে :

عن معاذ بن جبل ان النبي قال لمن سار معه الى تبوك : انكم ستأتون ان شاء الله غدا عين تبوك وانكم لن تأتوها حتى يفحى النهار

فَمِنْ جَاءَ مِنْكُمْ فَلَا يَمْسُصُ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتَى - فَجَثْنَاهَا وَقَدْ سَبَقْنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشَّرَاكِ تَبْخُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ - قَالَ فَسَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَسْتَمَّا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا - قَالَا نَعَمْ فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ - قَالَ ثُمَّ عَرَفُوا أَبَا يَدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ قَالَ وَغَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَّتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مِنْهُمْ أَوْ قَالَ غَزِيرِ شَكِّ أَبِي عَلِيٍّ إِيَّاهُمَا قَالَ حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ - ثُمَّ قَالَ يَوْشَكَ يَامَعَاذَ أَنْ طَالَتْ بِكَ الْحَيَاةُ أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مَلَى جَنَانًا -

“হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, তাবুক প্রান্তর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে নবী করীম (সা) তাঁর সফর সঙ্গীদের উদ্দেশে বলেছেন, আল্লাহ চাহে তো আগামী কাল দুপুরের আগেই (চাশতের সময়) তোমরা তাবুকের ঝর্ণা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। খেয়াল রেখো, আমার পৌঁছার আগে কেউ যেন উক্ত ঝর্ণার পানি স্পর্শ না করে। কিন্তু আমাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি সেখানে পৌঁছেই তড়িঘড়ি করে উক্ত ঝর্ণার পানি ব্যবহার করে। সে সময় তাতে পানির একটা হালকা রেখা ছিল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে পৌঁছান। তিনি ব্যাপারটি জানতে পেরে উক্ত দুই ব্যক্তিকে ভৎসনা করেন। অতঃপর তিনি আমাদের অঞ্জলি ভরে উক্ত ঝর্ণার পানি এক জায়গায় জমা করার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত মাআয বলেন, সংগৃহীত পানি থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এক অঞ্জলি পানি নিজের পবিত্র মুখমণ্ডলে ছিটিয়ে দেন। আর এক অঞ্জলি পানি তিনি ঝর্ণার পানির হালকা রেখায় ঢেলে দেন। দেখতে দেখতে অটেল পানির প্রবাহ আরম্ভ হয়।”

এই হাদীসের বর্ণনাকারী আবু আলী বলেন, মাআয ‘মুন্হামের’ কিংবা ‘গায়ীর’ শব্দ বলছিলেন (অর্থের দিক থেকে উভয় শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই)। যাই হোক, মানুষ উক্ত ঝর্ণা থেকে তৃপ্তিভরে পানি পান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, হে মাআয ! তুমি যদি কিছু দিন জীবিত থাক, তাহলে এই স্থানটি বাগ-বাগিচায় পরিপূর্ণ দেখতে পাবে।

কিন্তু জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থরাজিতে তাবুকের ঘটনাটি যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে মুজিয়ার কাহিনী নেই। এমনকি সহীহ মুসলিমে উল্লিখিত বর্ণনার মতো কোন ইঙ্গিতও নেই। দৃষ্টান্ত হিসাবে এ সম্পর্কে সীরাতে ইবনে হিশামের একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করা যায়। এটি ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ وَلَا مَاءَ مَعَهُمْ - شَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْسَلِ اللَّهُ

سحابة فامطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء - قال ابن اسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من بنى عبد الاشهل قال قلت لمحمود هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم - قال نعم و الله ان كان الرجل ليعرفه من اخيه ومن ابيه ومن عمه وفي عشيرته ثم يلبس بعضهم بعضاً على ذلك ثم قال محمود لقد اخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين معروف نفاقه كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سار فلما كان من امر الماء بالحجر ما كان ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا فارسل الله السحابة فامطرت حتى ارتوى الناس قالوا اقبلنا عليه دنول ويحك هل بعد هذا شيء - قال سحابة مارة -

“দ্বিতীয় দিন পানি না পেয়ে মানুষ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে তাদের এই বিপদের কথা বলে। তিনি আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে দোয়া করেন। এরপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং বৃষ্টি হয়। মানুষ তৃপ্তিভরে পানি পান করে এবং সামনের রাস্তায় ব্যবহারের জন্যও পাত্রাদি ভরে নেয়। ইবনে ইসহাক বলেছেন, আমার নিকট আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদা, তাঁর নিকট মাহমূদ ইবনে লবীদ, তাঁর নিকট বনু আবদে আশহাল গোত্রের কয়েক ব্যক্তি এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আমি তাদের নিকট জিজ্ঞেস করেছি, এই বাহিনীর মধ্যকার মুনাফিকদের কি মানুষ চিনত? মাহমূদ বলেছেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুনাফিকদের আপন ভাই, চাচাত ভাই এবং গোত্রের অন্যান্য লোক তাদের মুনাফিক আত্মীয়-পরিজনদের বেশ ভাল করেই চিনত। অতঃপর মাহমূদ বলেছেন, আমার গোত্রের কোন কোন লোক প্রখ্যাত মুনাফিকদের নামও আমার নিকট উল্লেখ করেছেন। এসব মুনাফিক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছায়ার মতো ঘোরাফেরা করত। যাই হোক, পাথর থেকে পানির প্রবাহ আরম্ভ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন। এরপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। মানুষ তৃপ্তিভরে পানি পান করে। এই ঘটনা বর্ণনাকারীদের আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই বর্ণনার আর কোন কিছু বাকি রয়েছে কি না। তারা বলল, মুষলধারায় এক পসলা বৃষ্টিপাত হয়েছিল।”

কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনাদুটোর বৈপরীত্য সত্যিকার ঘটনা নিরূপণে জ্ঞানগত দিক থেকে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। তাই কোন একটি বর্ণনাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করাই শ্রেয়। কেননা, বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে শুধু কোনটাকে প্রাধান্য দেয়া আর কোনটাকে প্রাধান্য না দেয়ার মাধ্যমে কোন ঘটনার সত্যতা নিরূপণ করা যায় না। এমনকি, অগ্রাধিকারকৃত বর্ণনারাজি যদি কোন বিষয়ের বিশুদ্ধতা উদঘাটনে প্রতিবন্ধক হয়ে

১. গ্রন্থকার যদিও মুসলিম শরীফের বর্ণনার বিপরীতে ইবনে ইসহাকের বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ইসলামী বিশেষজ্ঞ মুসলিম শরীফের বর্ণনাই গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তাবুকের ঘটনার খুঁটিনাটি বিষয়ে ইমাম মুসলিম ও ইবনে ইসহাকের বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য থাকলেও মূল ব্যাপারটি উভয়ের বর্ণনায়ই রয়েছে। তা হলো মহানবী (সা)-এর দোয়ার পর বৃষ্টিপাত। আর এটাই তাঁর মু‘জিযা। -অনুবাদক

দাঁড়ায়, তা'হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে কোন্ পথে গেলে সত্যিকার ব্যাপারটি উদ্ধার করা সম্ভব। নতুবা শুধু ধারণাভিত্তিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে কোন ঘটনার সত্যাসত্য বিচার-বিবেচনা করা কল্যাণকর হবে না।

আমার আলোচনা পদ্ধতি

এই অনুসন্ধান পদ্ধতিতেই আমি 'মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত' গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেছি। প্রণয়নকালে আমি আধুনিক দার্শনিক গবেষণার নীতিমালা অনুসরণ করেছি। এই পদ্ধতি অনুসরণ করার পিছনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তাহকীক বা অনুসন্ধান। প্রথম সংস্করণের ভূমিকার পরিশিষ্টেও আমি এ কথা উল্লেখ করেছি। বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থের প্রতিটি আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে গভীর চিন্তা-গবেষণার পর আলোচনা করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো, গবেষণালব্ধ আলোচনার মাধ্যমে যাতে মানুষ তাদের বিভিন্ন মানবিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের সমাধানে সহায়তা লাভ করতে পারে। বিশ্ব-মানব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছে। বস্তুত মহানবী (সা)-এর বিশাল ব্যক্তিত্ব ও পথ-নির্দেশনার মাধ্যমেই মানবজাতি তার মন্ডিল মকসুদে পৌঁছতে পারে।

সন্দেহাতীতরূপে এ কথা বলা যায় যে, গভীর চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে যদি মহানবী (সা)-এর মহান জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়, তাহলে এর সাহায্যে মানবজাতির অসংখ্য সমস্যার সমাধান হতে পারে। অথচ পণ্ডিত ব্যক্তির এসব সমস্যার সমাধানে আজো ব্যর্থতাই বরণ করে আসছেন। শুধু তাই নয়, সমাধানকৃত এসব বিষয়ের আলোকে আরো এমন সব সমস্যা সমাধানের পথ-নির্দেশ পাওয়া যাবে, যেগুলোর ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট ধারণা এখনো আমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, আধুনিক সভ্যতা যতোই অগ্রগতি সাধন করবে মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিকের মাধ্যমে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরো মজবুত ও সুদৃঢ় হবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, বিদ্যুৎ ও ইথারের মাধ্যমে মানুষ কত অজানা শক্তির সন্ধান লাভ করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবন থেকে মানবজাতি তার চাইতেও অনেক অনেক বেশি লাভ করতে পারবে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত শুধু মুসলমানই নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য মুক্তি ও কল্যাণের নিয়ামক হতে পারে। কেননা, মহানবী (সা)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য শুধু বিশেষ ধর্মের উন্নতি বিধান নয়, যেমন কেউ কেউ এরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন। বরং তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো, তাঁর নির্ধারিত ও প্রদর্শিত পথের মাধ্যমে মানব জীবনের সার্বিক অগ্রগতি সাধন করা। আর এই পথ অনুসরণ ছাড়া কারো পক্ষেই মূল লক্ষ্যে পৌঁছা অসম্ভব ব্যাপার।

বিচক্ষণতা ও হৃদয়ের আলো হলো আধ্যাত্মিকতা ও সঠিক জ্ঞানের উৎস। এই দু'টি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করা ছাড়া যে ব্যক্তি চিন্তা-গবেষণার পথে পা বাড়ায়, তার পক্ষে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। চিন্তার ভিত্তি যদি সঠিক জ্ঞান না হয় এবং জ্ঞানের পথ পরিহার করে যদি ভিন্ন পথে চিন্তা-গবেষণা করা হয়, তা'হলে প্রতিটি পদক্ষেপে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অবশ্যস্বাভাবিক ব্যাপার। আর ইলুমী বা জ্ঞানগত গবেষণা মানুষের মন-মানসিকতার কারণেও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন দু'জন গবেষক-চিন্তাবিদ জ্ঞান ও ন্যায়নিষ্ঠতার দিক থেকে সমমানের হওয়া

সত্ত্বেও মন-মেজাজের দিক থেকে এক ধরনের নয়। এমতাবস্থায় তাঁরা দু'জন যদি কোন একটি অভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করেন, মন-মানসিকতার বিভিন্নতার দরুন তাঁদের গবেষণার ফলাফলও ভিন্ন হবে, অভিন্ন হবে না। এক শ্রেণীর লোক রয়েছে তারা সব ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো করা পছন্দ করে। এ ধরনের স্বভাবের পণ্ডিত লোকদের মনে কোন বিষয় সম্পর্কে প্রথমবারে যা আসে তাই তারা অন্যদের নিকট ব্যক্ত করে ফেলেন। কিন্তু এ ধরনের মতামত কখনো ফলপ্রসূ হয় না। আবার সূফীসাধক কিংবা পৃথিবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ শ্রেণীর লোকদের চিন্তা ও গবেষণার জাহাজ যে কোন্ উপকূলে ভিড়বে তা আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। আর এক শ্রেণীর লোক রয়েছে নিছক জড়বাদী গবেষক। তাদের চিন্তাশক্তি শুধু বস্তুর চারদিকেই ঘুরপাক খেতে থাকে। তারা বস্তুজগতের বাইরে কোন বিষয় সম্পর্কে তাদের চিন্তাশক্তি নিয়োজিত করতেই প্রস্তুত নন। এই চার শ্রেণী ছাড়াও আর এক ধরনের লোক রয়েছে, যারা অন্যান্য দিক থেকে পরস্পর বিভিন্ন মন-মেজাজের অধিকারী। এ জাতীয় গবেষকদের চিন্তাধারায় একাত্মতা কল্পনাই করা যায় না।

অবশ্য বিভিন্নমুখী মন-মানসিকতা আশীর্বাদও বটে। আর তা হচ্ছে আবিষ্কার বা সৃষ্টিধর্মিতার ক্ষেত্রে। বিভিন্নমুখী মন-মানসিকতা ও চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতি হিসাবে নানা ধরনের জিনিস আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। কিন্তু মন-মানসিকতার এই বৈপরীত্য জ্ঞানগত গবেষণার ক্ষেত্রে অধঃপতনও ডেকে আনে। কারণ জ্ঞানগত গবেষণার ক্ষেত্রে অভিন্ন মন-মানসিকতার মাধ্যমেই কোন একটি মতবাদ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু গবেষকদের মন-মেজাজে বৈপরীত্য থাকলে চিন্তাধারায়ও এর অবশ্যস্বাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আর তা ফলশ্রুতিতে একাত্মতা সৃষ্টি হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই ঐতিহাসিক ব্যাপারে গবেষণার জন্য পা বাড়াবার আগেই নিজের ব্যক্তিগত স্বভাবের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। গবেষণার জ্ঞানগত নীতিমালা অনুসরণের ক্ষেত্রে অনমনীয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। নিজের মধ্যে একটা সুদৃঢ় মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে যে, সত্য উদঘাটনের ব্যাপারে উক্ত নীতিমালার বাইরে কোন বস্তুর প্রতি আমি এতটুকু দৃষ্টিপাত করব না।

প্রাচ্যবিদদের আলোচনা পদ্ধতি

কোন কোন মুসলিম লেখক যেমন কোন কিছু লেখার সময় নিজের বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেন না, তেমনি প্রাচ্যবিদদের মধ্যেও অনেক লেখক-গবেষক রয়েছেন, যারা জ্ঞানগত গবেষণার সময় ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না। এই বিপদ আরো চরম রূপ ধারণ করে যখন এ ধরনের গবেষকরা শুদ্ধাশুদ্ধ নির্বিশেষে সকল বর্ণনা সংকলিত গ্রন্থরাজিকে নিজেদের গবেষণার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। এরপর তারা লিখতে বসে শুদ্ধাশুদ্ধের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করেন না। সব কিছুই প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা শুরু করেন। এর পরিণামে ভ্রান্ত বুনিয়াদের উপর নির্মিত ইমারতের স্থানে স্থানে ফাটল ধরে। জ্ঞানগত গবেষণার সময় নিজের ধ্যান-ধারণাকে কখনো হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেয়া উচিত নয়। শুধু তাই নয়, অন্যদের অনির্ভরযোগ্য তথ্যাবলির উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। কারণ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হলো অন্যদের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করা এবং নিজেকে সেই ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখা। এই দৃষ্টিকোণ নিয়ে কোন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা

করা হলে তা ফলপ্রসূ না হয়ে পারে না। এ ব্যাপারটি সম্পর্কে আমি আরো কিছু লিখতে চাই। আশা করি, তাতে এ ব্যাপারে আমার পক্ষ হতে কিছুটা ইনসাফ ও নিরপেক্ষতার দায়িত্ব পালন করা হবে।

ইসলাম সম্পর্কে গবেষণার ব্যাপারে ইউরোপের প্রাচ্যবিদদের আন্তরিকতা ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু এ পথে তাদের সামনে অনেক প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নিরাপদে বেরিয়ে আসা তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। তার একাধিক কারণ রয়েছে। সেগুলো হলো, আরবী ভাষা সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান নেই বললেই চলে। ফলে তারা আরবী ভাষার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না। অপরদিকে ইসলামের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় খৃষ্টানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি। এই গোঁড়ামির জন্য শুধু ইসলামই নয়, পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মের বিরুদ্ধে তারা নাক গলিয়ে থাকে। তা'ছাড়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপীয় জাতিগুলো ধর্ম সম্পর্কেই একটা বিরূপ ধারণা পোষণ করে। তার উপর পোপ ও প্রাচ্যবিদরা এই ধারণার আরো ইন্ধন যুগিয়েছে। অবশ্য প্রতিটি মানুষই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে ইউরোপীয় লেখক-চিন্তাবিদরা শীর্ষস্থানে রয়েছেন। ইসলাম সম্পর্কে কিছু লিখতে বসলেই তাদের মধ্যে বিদ্বেষের উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ফলে বাস্তব ও তাদের গবেষণার মধ্যকার ব্যবধান দূস্তর হতে থাকে।

এরূপ পরিস্থিতিতে যেসব মুসলিম লেখক-চিন্তাবিদ বিভিন্ন মুসলিম দেশে বসবাস করছেন, তারা শুধু ধর্মীয় বিশেষজ্ঞই হোন কিংবা এই সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হোন—তাদের সবার প্রতি এই দায়িত্ব আরোপিত হয় যে, ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে লেখার সময় তাদের অবশ্যই পক্ষপাতিত্ব থেকে দূরে থাকতে হবে। জ্ঞানগত গবেষণার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। আরবী ভাষা ও আরবের সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত মুসলিম লেখকরা যদি গভীর দৃষ্টি সহকারে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন, তা'হলে সবাই না হোক অন্তত কিছুসংখ্যক প্রাচ্যবিদ পাওয়া যাবে, যারা এসব তথ্যের আলোকে নিজেদের চিন্তাধারা সংশোধন করবে। তারা মুসলিম গবেষক-চিন্তাবিদদের গবেষণার ফলশ্রুতিগুলো মেনে নিতে কৃপণতা করবে না। এ বিষয়টি মোটেও অসম্ভব বা সাধ্যাতীত নয়। অবশ্য নিরলস প্রচেষ্টা ও গবেষণা ছাড়া এ ক্ষেত্রে সফলতার আশা করা বাতুলতা বৈ কিছু নয়। মুসলমানদের তরফ থেকে এ ধরনের গবেষণামূলক বই-পুস্তক প্রকাশিত হলে ইসলাম ও মানবতা উভয়ের ভবিষ্যতই উজ্জ্বল হবে।

মুসলমান ও ইসলামী গবেষণা

ইজতিহাদ বা গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অতীত ইতিহাস দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম যুগ হলো ইসলামের সূচনা কাল থেকে হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাত পর্যন্ত। হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাত থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সময়কালকে দ্বিতীয় অধ্যায় বলা যায়। প্রথম অধ্যায়ে মুসলমানরা অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধ ছিল। এ সময়ের খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও প্রথম খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনও মতবিরোধ দেখা দেয়নি। প্রথম খলীফা তাঁর আমলে ধর্মত্যাগীদের

বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধ পরিচালনা করেন, সে সম্পর্কেও মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়নি। এমনকি দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে যেসব বিজয় অভিযান পরিচালিত হয়, এগুলো নিয়েও তাদের ভিতর মতবিরোধ দেখা দেয়নি। কিন্তু হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের সাথে সাথেই মুসলমানরা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ সময়ের সবচাইতে ভয়াবহ ঘটনা হলো হযরত আলী (রা) ও হযরত মুআবিয়া (রা)-এর মধ্যকার যুদ্ধ। পরবর্তীকালে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত গোপন রাজনৈতিক আন্দোলন এবং কোন কোন সময় প্রকাশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ মুসলিম ঐক্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হিসাবে কার্যকর ছিল। এ সময়েই ধর্মের উপর রাজনীতি প্রাধান্য বিস্তার করে। এ সময়ে স্বার্থপরতার রাজনীতি মুসলমানদের মধ্যে কিরূপ অনুপ্রবেশ করেছিল, প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ও আব্বাসীয় বাদশাহ্ মানসূরের উদ্বোধনী ভাষণের প্রতি তাকালেই তা সহজে অনুমান করা যায়। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর প্রথম ভাষণে মুসলমানদের নিকট নিজেকে তাদের একজন খাদেম হিসাবে পেশ করেন। অপরদিকে মানসূর নিজেকে মুসলমানদের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক হিসাবে ঘোষণা করেন।

হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম ভাষণে বলেন : “ভাইসব! আমাকে আপনাদের আমীর বা নেতা নির্বাচিত করা হয়েছে। কিন্তু আপনাদের উপর আমার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আমি যদি ভাল কাজ করি, আপনারা আমার সহযোগিতা করবেন। আমি যদি ভুল-ভ্রান্তি করি আমাকে সঠিক পথে চলতে বাধ্য করবেন। আপনারা মনে রাখবেন, সততা হলো আমানত আর মিথ্যার অপর নাম হচ্ছে ‘খেয়ানত’। আমার নিকট আপনাদের দুর্বল ব্যক্তিটিও শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তার ন্যায্য পাওনা দিতে পারি। আপনাদের শক্তিশালী লোকটিও আমার নিকট অত্যন্ত দুর্বল যতক্ষণ না দুর্বলের পাওনা তার থেকে আদায় করে দিতে পারি। (বন্ধুগণ!) স্মরণ রাখবেন, যে জাতি আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম থেকে সরে পড়ে, আল্লাহ্ সে জাতিকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন। কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ্ তাদের উপর অপ্রত্যাশিত বিপদ অবতীর্ণ করেন। (হে মুসলমানগণ!) যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত থাকি আপনারাও আমার অনুগত থাকবেন। আমি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করি, আমার আনুগত্য থেকে আপনারাও মুক্ত। এখন নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যান। আল্লাহ্ তা’আলা আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।”

হযরত আবু বকর (রা)-এর এক শ’ তেইশ বছর পর আব্বাসীয় শাসক মানসূর রাজ-ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তার উদ্বোধনী ভাষণের প্রতিটি শব্দ মুসলমানদের উপর অস্ত্রের জোরে শাসন করার ইঙ্গিত বহন করছে। তিনি বলেছেন : “হে মানুষ ! আল্লাহ্ পৃথিবীতে আমাকে তোমাদের উপর শাসক নিযুক্ত করেছেন। রাজ-ক্ষমতার দ্বারা আমি তোমাদের সোজা পথে পরিচালিত করতে পারি। আল্লাহ্ আমাকে তাঁর ধন-সম্পদের রক্ষক বানিয়েছেন। আমি তাঁর ইচ্ছামতো তা খরচ করতে পারি। কারণ আল্লাহ্ই আমাকে এই অধিকার দান করেছেন। তিনি যদি চান আমি তাঁর দেয়া ধন-সম্পদ তোমাদের জন্য খরচ করব। আর যদি তাঁর ইচ্ছে না হয়, তা’হলে আমি তা তোমাদের জন্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকব।”

এই দু’টি ভাষণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সহজেই প্রতিভাত হয় যে, দুই শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে কিরূপ পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। খেলাফতে রাশেদার আমলে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ছিল

শোরায়ী বা গণতান্ত্রিক। কিন্তু ওমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে তা সম্পূর্ণ একনায়কত্বে রূপান্তরিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ধাপে ধাপে যে পরিবর্তনের হাওয়া বইছিল, তারই কারণে ইসলামের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অবক্ষয় দেখা দিচ্ছিল।

অবশ্য হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর দুই শ' বছর পর্যন্ত ইসলামের তাহযীব-তামাদুনে খুব একটা ফরক দেখা দেয়নি। তার কিছু পরই অগ্রগতির এক নতুন যুগের সূচনা হয়। মোগল ও সালজুক বংশ অনেক দেশ অধিকার করেন। ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের আয়তন দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইসলামের প্রথম যুগ যা তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমানের শাহাদাতের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে।^১ এ সময় পর্যন্ত মুসলিম সমাজে সত্যিকার ইসলামী নীতিমালা ও ভাবধারা বলবৎ ছিল। এজন্য কোন বিষয়ের সত্যিকার অবস্থা জানার ব্যাপারে কেবল এই যুগটির উপরই ভরসা করা যেতে পারে। পরবর্তী ওমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশাতীত অগ্রগতি সাধিত হয়। মুসলমানরা এসব আহরণ করেছিল ভিন্ন জাতির কাছ থেকে। এগুলো ছিল ইসলামের মূলতত্ত্বের পরিপন্থী। তা'ছাড়া ওমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে অসংখ্য ইহুদী-খৃষ্টান ও অনারব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তারা তাদের পুরনো ধর্মমতের রীতি-নীতি পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মুসলমান হওয়ার পর তারা ইসলামের নামে নতুন নতুন বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি উদ্ভাবন করে। এসব প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্তন করার জন্য তারা মহানবী (সা)-এর নামে অনেক মনগড়া হাদীস তৈরি করে। কোন কোন কথা তারা খোলাফায়ে রাশেদীনের নামেও ছড়ায়। অথচ এসব হাদীস ও বর্ণনার সাথে মহানবী (সা) ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদার সামান্য সম্পর্কও ছিল না। এ সময়ের অধিকাংশ হাদীস ছিল ব্যক্তিগত প্রবণতা ও ধ্যান-ধারণার ফলশ্রুতি। এ জন্য এসব গ্রহণের বেলায় তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না। এ ব্যাপারে সবচাইতে উত্তম পন্থা হলো, যেসব হাদীস পবিত্র কোরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেগুলো প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

পক্ষান্তরে যেসব হাদীস ও বর্ণনা হযরত ওসমান (রা)-এর আমল পর্যন্ত সংরক্ষিত হয়েছে, সেগুলো গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধাম্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এমনকি, পরবর্তীকালের বর্ণনারাজির শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়ের জন্যও প্রথম যুগের বর্ণনারাজিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এই কাজটি যদি মুসলিম সমাজে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায়, তা'হলে ইসলামের সঠিক নীতিমালা ও জীবন ব্যবস্থা উদ্ধার করা সম্ভব হবে। বস্তুত এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই আরবের মরুবাসীরা বিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমরা যদি বিশ্ববাসীর সামনে এই জীবন ব্যবস্থা সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারি, তা'হলে পুনরায় আমরা তাদেরকে এর প্রতি আকৃষ্ট করতে পারব। এ ব্যাপারে আমরা কামিয়াব হলে ইতিহাসের এসব বিরাট ঘটনার মাধ্যমে আমরা বিশ্বমানবকে শিক্ষা দিতে পারব যে, তাদের জন্য এটাই মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র পথ। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মানুষের জীবনমান উন্নত হবে। বিদ্যুৎ ও ইথার থেকে যেমন মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়েছে, এ ব্যবস্থা থেকেও অনুরূপ উপকৃত হবে। এমনকি এ ব্যবস্থা দ্বারা মানুষ তার চাইতেও বেশি উপকৃত হবে। এর দ্বারা মানুষের দেহ ও মন উভয়ই

১. চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলও প্রথম যুগের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তিনিও খোলাফায়ে রাশেদার অন্যতম ছিলেন। রাজনৈতিক বিশৃংখলার জন্য বোধ হয় লেখক হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলকে প্রথম যুগের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেননি। -অনুবাদক

প্রশান্তি লাভ করবে। আমি পুনরাবৃত্তি করছি, মুসলিম লেখক-চিন্তাবিদরা যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তা'হলে আরবের বেদুঈনদের সামনে ইসলামকে যেভাবে পেশ করা হয়েছিল, আজো তেমনি পেশ করতে হবে। আর ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করেই আরবের বেদুঈনরা বিভিন্ন দেশ তাদের করতলগত করেছিল। ইসলামকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারলে পুনরায় আমরা সারা বিশ্বে এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবরা যে মহান দায়িত্ব সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছিল, আমরাও তা সম্পন্ন করতে পারব।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম জ্ঞান-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত প্রণয়ন করা দরকার। তাতে করে তাঁর মহান জীবন পৃথিবীর প্রতিটি সমাজেই আদর্শ হিসাবে প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের একটা বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, তাঁর জীবন-চরিত প্রণয়নের জন্য সবচাইতে উত্তম উৎস হচ্ছে পবিত্র কোরআন। তাতে মিথ্যা ও সন্দেহের লেশ মাত্রও নেই। পবিত্র কোরআনের সত্যতার এটাই জ্বলন্ত প্রমাণ যে, বিগত চৌদ্দশ' বছর থেকে তা পৃথিবীতে রয়েছে। প্রথম দিন থেকে এ পর্যন্ত তার একটা নোক্তাও পরিবর্তন হয়নি। তার এই স্থায়িত্ব ও অপরিবর্তনীয়তা আরো প্রমাণ করছে, যতদিন এই বিশ্ব ব্যবস্থা আছে পবিত্র কোরআনও থাকবে। তার হেফাজতের নিশ্চয়তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ -

“আমিই কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার হেফাজতকারী।” (১৫ : ৯)

পবিত্র কোরআন যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ মু'জিয়া এ কথা পবিত্র কোরআনের শিক্ষাই দিবালোকের মতো প্রমাণ করছে। তার অনুপম ও অলৌকিক বর্ণনাধারা এবং তার সামগ্রিকতা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, যতদিন এই বিশ্বব্যবস্থা টিকে থাকবে পবিত্র কোরআনও থাকবে। এজন্যই মুসলমানদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, পবিত্র কোরআনের আলোকে মহানবী (সা)-এর জীবন চরিত বিশ্ব-মানবের সামনে তুলে ধরা। এক্ষেত্রে মহানবী (সা) সম্পর্কিত যেসব বর্ণনা পবিত্র কোরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেগুলো গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা করা ঠিক হবে না। কিন্তু যেসব বর্ণনা পবিত্র কোরআনের পরিপন্থী, সেগুলো বিনাদ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এই বিষয়টির প্রতি আমি যথাসম্ভব দৃষ্টি রেখেছি। 'হায়াত-ই-মুহাম্মদ' বা 'মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর আমি আল্লাহ তা'আলার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এই দোয়া করেছি যে, হে আল্লাহ! তুমি এই পথে আমাকে আরো গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের তাওফীক দান করো। আর আমার শ্রমের ফল যেন অন্যদের জন্য পথ নির্দেশক হয় এবং তাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে নিরাপদ রাখে।

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ -

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই উপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।” (৬০ : ৪)

মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
الْصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ

فَاتِحَةُ السَّابِعِ

সূরা ফাতিহা

৭ আয়াত, ১রুকু, মক্কী

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু) ॥

১. সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি সারা বিশ্বের
প্রতিপালক
২. অসীম দয়াময়, পরম দয়ালু,
৩. কর্মফল দিবসের মালিক,
৪. আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই
কাছে সাহায্য চাই,
৫. দেখাও আমাদের সরল পথ,
৬. সে সব লোকের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ
করেছ,
৭. যাদের প্রতি তোমার ক্রোধ নিপতিত হয়নি
এবং হয়নি তারা পথভ্রষ্ট।

প্রাক-ইসলামী যুগের আরব

মানব সভ্যতার সূতিকাগার

পৃথিবীর কোন্ অংশে সর্বপ্রথম মানব সভ্যতার সূচনা হয়েছিল—এ বিষয়টি প্রাচীনকাল থেকেই আলোচনার বিষয় হয়ে আছে। এখনো এ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। এ পর্যন্ত শুধু এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, আজ থেকে ছ'হাজার বছরাধিককাল আগে মিসরে সর্বপ্রথম মানব সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। তার পূর্ববর্তী যুগ হলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রান্তসীমা এবং সে যুগ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা মুশকিল। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা ইরাক ও সিরিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। তাঁরা আসিরীয় ও ফিনিশীয় সভ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আবিষ্কারের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা নির্ণয় করার চেষ্টা করছেন ফেরাউনদের আমলের মিসর আসিরীয় ও ফিনিশীয়দের নিকট থেকে সভ্যতার আলোক লাভ করেছে, না কি এ দু'টি জাতি মিসরীয়দের সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। কিন্তু চীন ও দূরপ্রাচ্য সম্পর্কেও যেমন এখনো অধিক কিছু জানা সম্ভব হয়নি, তেমনি প্রাচীন মিসর, ইরাক ও সিরিয়া সম্পর্কেও এখনো অনেক কিছু অনুদ্ধাটিত রয়ে গেছে। আর তাই ইতিহাসের এ অধ্যায় সম্পর্কে চূড়ান্ত কিছু বলা যাবে না। অবশ্য এ যাবত পরিচালিত প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণা দ্বারা একটি কথা অবিসংবাদিতভাবে নির্ণীত হয়েছে যে, মিসরের ফেরাউনীয় সভ্যতা বা ইরাক ও সিরিয়ার আসিরীয় ও ফিনিশীয় সভ্যতার যারাই মানব সভ্যতার সূতিকাগার হোক, তারা ভূমধ্যসাগর উপকূলের নিকটবর্তী এলাকায়ই বসবাস করছিল। এসব জনপদের মধ্যে সভ্যতার সবচাইতে শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল মিসর। এখান থেকেই সভ্যতার আলোক-শিখা গ্রীস ও রোমে বিস্তার লাভ করে। এ কথাও স্বীকৃতি লাভ করেছে যে, বর্তমান বিশ্ব-সভ্যতার উক্ত প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার সাথে একটা যোগসূত্র রয়েছে। তবে দূরপ্রাচ্যের সভ্যতা সম্পর্কে জানা যায় যে, উক্ত সভ্যতার প্রভাব কোন কালেই মিসরীয়, আসিরীয় কিংবা গ্রীক সভ্যতার উপর পড়েনি। ইতিহাস এও বলছে যে, এই এলাকার প্রাচীন সভ্যতা ইসলামী সভ্যতার সাথে মিশে গেছে। প্রথমে উক্ত সভ্যতার কিছু প্রভাব ইসলামী সভ্যতার উপর পড়েছে। পরবর্তীকালে সেসব প্রাচীন সভ্যতা ইসলামী সভ্যতার বশ্যতা স্বীকার করে নিজের পরিচয় বিলীন করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্ব-সভ্যতা সেসব সভ্যতার কথাই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর উপকূল

ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর উপকূল এবং তৎপার্শ্ববর্তী মিসর, মেসোপটেমিয়া ও গ্রীস এলাকায় কয়েক হাজার বছর আগে যে উন্নত সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাদের সে যুগের

জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, অস্ত্র তৈরি ও সমর কৌশলের উৎকর্ষ আজো বিশ্বের উদ্রেক করে। কিন্তু এসব জাতির সভ্যতা ও অগ্রগতির পিছনে ধর্ম এবং ধর্মীয় প্রেরণাই ছিল মূল চালিকাশক্তি। কারণ তাদের সভ্যতা ধর্মীয় প্রভাবে শুধু স্থায়িত্বই লাভ করেনি, ধাপে ধাপে অগ্রগতির সোপানও একের পর এক অতিক্রম করছিল। তারা তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-প্রযুক্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে ধর্মের ফতোয়া বা মতামত গ্রহণ করত।

প্রাচীনকালে মিসরীয়রা তিন সত্তার উপাসনা করত। আর গ্রীকরা করত দেব-দেবীর পূজা। অবশ্য বিভিন্ন যুগে এসব জাতির উপাস্য ও দেব-দেবীর মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন যুগেই এই দুটি দেশের অধিবাসীরা ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি। এমনকি ধর্ম থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তারা কোন কালে চেষ্টাও করেনি। এই তথ্য থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়, যে সভ্যতা মানব জাতিকে অগ্রগতির উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়েছে, তা শুধু ধর্মের কোলেই লালিত-পালিত হয়েছে। এমনকি, আজো সে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার ছত্রছায়ায়ই লালিত হচ্ছে। অবশ্য বর্তমান যুগের মানব সভ্যতা ধর্ম থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টার ফল দেখে মনে হচ্ছে যে, নিষ্কৃতির পরিবর্তে ধর্মের বন্ধন নিজের উপর আরো শক্ত করছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা নিরর্থক হবে না যে, দ্রুত হোক কিংবা বিলম্বে হোক, সভ্যতা নিজ ইচ্ছায়ই ধর্মের সামনে মাথা নত করবে।

কয়েক হাজার বছর আগে পৃথিবীর যে অংশে ধর্মের বুনিয়াদের উপর উপরোক্ত সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেসব দেশে আজকের বিখ্যাত ধর্মসমূহের রাসূলদেরও আবির্ভাব ঘটেছিল। মিসরে আবির্ভাব হয়েছিল হযরত মূসা (আ)-এর। তিনি মিসরের সমকালীন বাদশাহ ফেরাউনের কোলেই লালিত-পালিত হন এবং তার পারিষদদের মধ্যকার জ্যোতির্বিদ ও ধর্ম-বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকেই আল্লাহর একত্ববাদ ও বিশ্ব-সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ)-কে তার কওমের হেদায়েতের জন্য রাসূল মনোনীত করে তাকে তাঁর নবুয়তের দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিলেন, সে তখন ঘোষণা করে বসলো, “আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।” এরপর হযরত মূসা (আ) ও ফেরাউনের মধ্যে দীর্ঘ সংঘাত আরম্ভ হয়। সে বিরাট কাহিনী, অনেক অনেক কথা। অবশেষে হযরত মূসা (আ) ও ফেরাউনের জাদুকরদের মধ্যে ফায়সালাকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এরপর হযরত মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে প্যালেস্টাইনে হিজরত করেন।

অনুরূপ প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাব হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ‘কালেমাতুল্লাহ’ ও ‘রুহুল্লাহ’ খেতাবে ভূষিত করেন। হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথে ধর্ম প্রচার করে যান। এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেন। এরপর হযরত ঈসা (আ)-এর শিষ্যরা তাঁর ধর্ম প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। এর পরিণামে তাঁদেরও নানা প্রকার কঠোর নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

খৃষ্টীয় ও যরথুস্ত্রীয় ধর্ম

রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সাহায্য-সহযোগিতায় খৃষ্টধর্মের বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়। বিভিন্ন দেশে আশাশীত প্রচার-প্রসার লাভ করে। কিন্তু একই সময়ে দূরপ্রাচ্যের

অন্যান্য ধর্ম এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অধ্যাত্ম শান্তির সমর্থনপুষ্ট যরথুস্ত্রীয় ধর্ম ইরানেই সীমাবদ্ধ থাকে। ওদিকে মিসরীয় ও ফিনিশীয় সভ্যতা দীর্ঘকাল ধরে রোমান ও ইরানীদের মধ্যে প্রাচীর হিসাবে অবস্থান করতে থাকে। এই প্রতিবন্ধকতার দরুন রোমান ও ইরানীদের মধ্যে বিশ্বাস-সভ্যতাগত সংঘর্ষ হতে পারেনি। তা'ছাড়া এই দু'টি দেশের অবস্থানগত ব্যবধানও তাদের মধ্যে যুদ্ধ না বাধার একটা কারণ ছিল। তবে মিসরীয় ও ফিনিশীয়রাও খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে ইরান ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যকার প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। ফলে প্রাচ্যের যরথুস্ত্র ধর্ম এবং পাশ্চাত্যের খৃষ্টধর্ম একেবারে মুখোমুখি হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়। উভয় শক্তির মধ্যে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এই যুদ্ধ-বিগ্রহ অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও তারা একে অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিল। কিন্তু খৃষ্টানরা তাদের ধর্ম ইরানীদের সামনে পেশ করত না। ইরানীরাও তাদের যরথুস্ত্রীয় মতাদর্শ রোমান খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচার করত না। উভয় পক্ষের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রচার-প্রসার নিজ রাজ্যসীমার মধ্যেই সীমিত ছিল।

এক পর্যায়ে ইরান রোমানদের উপর বিজয় লাভ করে। ইরানীরা সিরিয়া ও মিসর অধিকার করে কনস্টান্টিনোপলের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু ইরানীরা এবারও বিজিত এলাকায় তাদের যরথুস্ত্র ধর্মমত প্রচার করেনি। শুধু তাই নয়, বিজিত জাতির ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে তারা প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। যুদ্ধের সময় বিজিত এলাকার যেসব উপাসনালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইরানীরা সেগুলো মেরামতে সাহায্য করে। সেগুলোতে বিজিত এলাকার অধিবাসীদের স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মকর্ম করার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এ ব্যাপারে ইরানীদের সবচাইতে প্রশংসনীয় আচরণ হলো, যুদ্ধের সময় খৃষ্টানদের বিশেষ ক্রুশ প্রতীকটি ইরানীদের হস্তগত হয়। কয়েক শতাব্দী থেকে এটি খৃষ্টান জগতের দর্শনীয় বস্তু হিসাবে মর্যাদা পেয়ে আসছিল। ইরানীদের দখলে থাকাকালে তারাও এর প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি। পরে অবশ্য রোমানরা উক্ত ক্রুশ প্রতীকটি ইরানীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। সারকথা, পাশ্চাত্যের ধর্মীয় তৎপরতা পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যের ধর্মীয় প্রচার প্রাচ্যেই সীমিত ছিল। বস্তুগত স্বার্থে উভয় পক্ষের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে কিন্তু কোন পক্ষই অন্য পক্ষের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করেনি।

রোমের উত্তরাধিকারী বাইজেন্টাইন

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে। ইতিমধ্যে বাইজেন্টাইন ও রোমের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হয়ে ওঠে। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকায় বহু কাল রোমের একচ্ছত্র আধিপত্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। রোমান সম্রাট জুলিয়াস সীজারের আমলের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা তারা গর্বভরে স্মরণ করত। এক পর্যায়ে রোমান প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ভাটা পড়তে শুরু হয়। বর্বর ভ্যানডালদের রোমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং শেষ পর্যন্ত মূল রোম নগরী তাদের দখলে চলে গেলে রোমান সাম্রাজ্যের ধর্মীয় ও রাজক্ষমতা এককভাবে বাইজেন্টাইনদের হাতে চলে যায়। যে রোমান রাজক্ষমতার সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় খৃষ্টধর্মের প্রচার-প্রসার হয়েছিল এবং হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীরা যেখানে চরম নিপীড়ন সহ্য ও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, তার পতনের ফলে স্বভাবতই এর প্রতিক্রিয়া খৃষ্টধর্মের উপরও পড়ে।

খৃষ্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্তি

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে খৃষ্টধর্মের অনুসারীদের জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হয়ে যায়। তারা বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। ধর্ম ও ধর্মের মূলনীতি সম্পর্কে এসব ফেরকার অভিমত ও চিন্তাধারা ছিল বিপরীতধর্মী। এসব ফেরকা একে অপরের ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে প্রকাশ্য সমালোচনা ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করত। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তাদের এই মতবিরোধ বেড়েই চলে। তাদের এসব আচরণ ব্যক্তিগত শত্রুতা ও কলহ-বিবাদে রূপান্তরিত হয়। ফলে আত্মিক দুর্বলতা ও চারিত্রিক অবক্ষয়েরই শিকার হয়ে পড়ে। তাদের এক সম্প্রদায় বিশ্বাস করত, হযরত ঈসা (আ)-এর দেহ অন্যান্য মানুষের দেহের মতো ছিল না। তাঁর দেহ ছিল একটি অশরীরী মূর্তি। অপর দল মনে করত, হযরত ঈসার আত্মা ও দেহ ছিল একই পদার্থের মনোহর রূপ। অনেক কষ্ট-কল্লনা ছাড়া তাদের এ অর্থ অনুধাবন করা অসম্ভব। একটি সম্প্রদায় হযরত মরিয়মের ইবাদত করত। অপর একটি ফেরকা মনে করত হযরত ঈসাকে প্রসব করার পর হযরত মরিয়মের কুমারী অবস্থা আর অক্ষত ছিল না। খৃষ্টধর্মের অনুসারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরনের নিরর্থক ও অবাস্তিত তর্ক-বিতর্ক লেগেই থাকত। প্রকৃতপক্ষে কোন জাতির পতন ঘনিয়ে আসলে এরূপ পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয়। শব্দ ও সংখ্যার আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা মানুষের মনোযোগের মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এসব শব্দ ও সংখ্যার চারপাশে মানুষ অর্থ ও ব্যাখ্যার নানান রহস্যময় প্রাচীর দাঁড় করানোর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। সুস্থ জ্ঞান ও যুক্তিবুদ্ধি এসব রহস্যের কল্লনাও করতে পারে না। সেকালের খৃষ্টজগতের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে গিয়ে জনৈক খৃষ্টান ধর্মযাজক লিখেছেন :

“ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে সব সময়ে শহর-জনপদে একটা হৈ-হাঙ্গামা লেগেই থাকত। আড়তদার, স্বর্ণকার ও মুদী দোকানীদের সাথে ব্যবসায়িক কথাবার্তা বলার সময়ও ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা উঠানো হতো। স্বর্ণালংকারের জন্য কোন দোকানে যাওয়া হলো, ব্যবসায়ের আলাপ না করেই স্বর্ণকার প্রথমেই খরিদদারকে জিজ্ঞেস করে বসল, এ পর্যন্ত কোন্ কোন্ জিনিস সৃষ্টি হয়েছে আর কোন্ কোন্ জিনিস হয়নি। রুটির দাম জিজ্ঞেস করা হলো, দোকানী তা না বলে উত্তর দিত, পুত্রের চাইতে পিতা শ্রেষ্ঠ। পুত্রের কর্তব্য হলো পিতার অনুগত থাকা। স্নানাগারে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হলো, গরম পানি আছে কিনা। সেখানে নিযুক্ত কর্মচারীটি জবাব দিত, পুত্রকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে।”

সে যুগে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের উপরোক্ত দল-উপদল সৃষ্টিকারী মতবিরোধ ও তর্ক-বিতর্কের প্রভাব থেকে রোমের রাজক্ষমতা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। বরং প্রজাদের ধর্ম নিয়ে এভাবে ব্যস্ত থাকার দরুন রোম সম্রাটের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দিন দিন মজবুত হতে থাকে। খৃষ্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এসব তর্ক-বিতর্ক যদিও শাসনিক ছিল কিন্তু এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন তারা রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করার ফুরসত পেতো না। প্রজা-সাধারণের রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি উদাসীনতার সুযোগে রোমের রাজতন্ত্র দিন দিন উন্নতি লাভ করতে থাকে। বিভিন্ন সম্প্রদায় কোন কোন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে অনেক সময় বিতর্ক সভারও আয়োজন করত। তবে এ ধরনের সম্মেলন থেকে কোনই ফল পাওয়া যেতো না। কারণ এক পক্ষ অপর পক্ষকে নিজেদের মতে আনতে সক্ষম হতো না। তাদের মধ্যে সংশোধন হওয়া বা

অন্যকে সংশোধন করার মহৎ মনোবৃত্তি ছিল না বললেই চলে। তারা নিজ নিজ অভিমতের প্রতি একগুঁয়ে ছিল।

এসব বিতর্কসভা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়ই অনুষ্ঠিত হতো। ফলে সকল পক্ষ মনে করত, মহামান্য সম্রাট তাদেরই ধর্মমতে বিশ্বাসী। তারা কোন কোন সময় এরূপ ধারণাও করত যে, স্বয়ং সম্রাট তাদের অভিমতের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন।

রোমের খৃষ্টান সম্রাটের ধর্ম-সংশ্লিষ্টতা তার সাম্রাজ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার-প্রসারের সহায়ক হয়। এভাবে রোম অধিকৃত মিসর থেকে স্বাধীন ও রোমের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ আবিসিনিয়া পর্যন্ত খৃষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে। এরূপে লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্যসাগর উপকূলীয় এলাকাগুলোতে, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনসহ ফোরাতে উপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় রোমান সাম্রাজ্যের ও খৃষ্টধর্মের বিস্তৃতি ঘটে। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে তাদের সংস্পর্শে সেখানকার আদিবাসীরাও খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। সিরিয়ার খৃষ্টানদের প্রভাবে হীরা বা ইরাকের অধিবাসীরাও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য হয়। এমন কি আরবের উষর মরুর লু হাওয়ার দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে ফোরাতে উপকূলের উর্বর ভূমিতে বসতি স্থাপনকারী লাখাম ও মানাষেরা গোত্রও খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এসব খৃষ্টান অধিবাসীরা প্রথমে স্বাধীন ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ইরানের অগ্নিপূজারীরা তাদের এলাকা অধিকার করে বসে।

যরথুস্ত্র ধর্মের অবক্ষয়

সে যুগে রোমান রাজতন্ত্রের অধীনস্থ বিভিন্ন রাজ্যের খৃষ্টান অধিবাসীরা যে ধরনের ধর্মীয় উন্মত্ততায় মত্ত ছিল, ইরানীরাও তার ব্যতিক্রমটি ছিল না। ইরানের কল্যাণ ও অকল্যাণের দেবতাদ্বয় (ইয়াজদান ও আহুরেমন)-এর অনুসারী অগ্নি-উপাসকরাও রোমান খৃষ্টানদের মতোই ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত ছিল। ইরানীদের মধ্যেও একাধিক ফেরকা ছিল। তারা পরস্পরে চরম বিরোধী মনোভাব পোষণ করত। রোমানদের মতো ইরানীদের মধ্যেও ধর্ম নিয়ে শাদিক বাহাস-বিতর্ক লেগেই থাকত। রোমান রাজতন্ত্র যেমন প্রজাদের ধর্মীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে দূরে ছিল, ইরানী সিংহাসন বা রাজশক্তিও তেমনি এসব বিবাদ-বিসংবাদে জড়িত হয়নি। শুধু তাই নয়, রোমান রাজতন্ত্রের মতো ইরানী রাজক্ষমতাও প্রজাদের ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়োছিল।

দুই বৃহৎ শক্তির মাঝে আরব উপদ্বীপ

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে আরব উপদ্বীপ দু'টি বৃহৎ সাম্রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। পশ্চিমে ছিল খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী রোমান সাম্রাজ্য আর পূর্বে ছিল অগ্নি-উপাসক পারস্য সাম্রাজ্য। উভয় সাম্রাজ্যই নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসনের পায়রবী করত। রোমান ও পারস্য উভয় সাম্রাজ্যেরই রাজ্যসীমা বাড়ানোর পরিকল্পনা ছিল। অপরদিকে রোমের খৃষ্টান ও ইরানের যরথুস্ত্র ধর্মপ্রচারকরাও তাদের নিজ নিজ ধর্ম প্রচারে অত্যন্ত তৎপর ছিল। এতদসত্ত্বেও আরবভূমি একটি সুরক্ষিত দুর্গের মতো সীমান্তবর্তী কিছু এলাকা ছাড়া গোটা জাতিকে উক্ত দু'টি ধর্মমতের প্রভাব থেকে পুরোপুরি নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়। খৃষ্ট কিংবা যরথুস্ত্র কোনও ধর্মই তারা গ্রহণ করেনি।

এটি ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, রোম ও পারস্যের মতো দু'টি বিশাল সাম্রাজ্য আরব উপদ্বীপের এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কেউই আরবদের বশে আনতে পারেনি। পার্শ্ববর্তী বৃহৎশক্তিদু'টোর ধর্মকর্মও তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে তারা যে ধরনের জীবন যাপন করে আসছিল, কোন বহিঃশক্তিই তাতে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। আরব উপদ্বীপের অবস্থান এবং সেখানকার জীবনযাত্রা, তাদের আচার-আচরণ ও নীতি-নৈতিকতার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত ছাড়া ব্যাপারটি বোধগম্য হবে না।

আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান

আরব উপদ্বীপ একটি অসম আয়তক্ষেত্র। তার উত্তরে রয়েছে ফিলিস্তীন ও সিরিয়ার মরু অঞ্চল। পূর্বে হিরা রাজ্য বা ইরাক, দজলা ও ফোৱাত নদী এবং পারস্য উপসাগর। দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও এডেন উপসাগর এবং পশ্চিমে রয়েছে লোহিত সাগর। দক্ষিণ ও পশ্চিমে সাগর এবং উত্তর ও পূর্বে মরুভূমি ও পারস্য উপসাগর আরব উপদ্বীপের চারদিকে প্রাকৃতিক প্রাচীর নির্মাণ করে রেখেছে।

চারদিকে সাগর আর মরুভূমিই যে কেবল আরব উপদ্বীপকে প্রতিবেশী পরাশক্তির সাম্রাজ্যবাদী আত্মসন আক্রমণ থেকে নিরাপদ রেখেছে তাই নয়, বরং তার ভূ-ভাগের অস্বাভাবিক বিশালতাও এক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ করেছে। এর দৈর্ঘ্য এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি এবং প্রস্থ এক হাজার কিলোমিটারের মতো।^১ উপরন্তু এর অনুর্বরতা এবং বৃক্ষলতাহীনতা একে সাম্রাজ্যবাদীদের কু-নজর থেকে মুক্ত রেখেছে। এই বিরাট ভূ-ভাগে একটি নদীও নেই। ফসলাদি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাতের কোন সুবিদিত মওসুমও নেই। অবশ্য উর্বরতা ও বৃষ্টিপাতের জন্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উপদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত ইয়ামন এর ব্যতিক্রম। অবশিষ্ট পুরো ভূখণ্ডই উষ্ণ মরু, গাছ-পালাহীন শুষ্ক পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা ও বালুকাময়। আর এরূপ ভূভাগ যেমন বসবাসের উপযোগী নয়, তেমনি তামাদুনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও কোন প্রকার কল্যাণবহু নয়। এরূপ এলাকা একমাত্র যাযাবর জীবনধারায় অভ্যস্ত লোকদের জন্য বসবাসের কিছুটা উপযোগী হতে পারে। এ ধরনের বালুময় মরুপ্রান্তরে চলাফেরার একমাত্র বাহন হচ্ছে মরুভূমির জাহাজ উট। এই মরুপ্রান্তরে যাযাবর আরবরা এক জায়গায় কিছুদিনের জন্য ডেরা ফেলে। তাঁরা খাটিয়ে বসবাস করে। সেখানকার চারণভূমির ঘাসপাতা শেষ হয়ে গেলে অন্য চারণভূমির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। আরব উপদ্বীপের এসব চারণভূমি সাধারণত কোন ঝর্ণার আশেপাশে হয়ে থাকে - যা সৃষ্টি হয় বৃষ্টিপাতের পর পাথুরে জমি চুইয়ে চারদিকের পানি জমে। তখন এসব ঝর্ণার চারদিকে ঘাস ও গাছগাছড়ার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের ভূ-ভাগে কোনও প্রকার ফসলাদি আবাদ করা যায় না। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি আমাদের সামনেই রয়েছে। কেউই এ ধরনের ভূ-ভাগে স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে চায় না। যে কেউ এ ধরনের মরুপ্রান্তরে পা রাখে যতটা সম্ভব দ্রুত পাড়ি দিয়ে কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে চায়। আরব উপদ্বীপের হাতে-গোনা কয়েকটি স্থানে গাছগাছড়া জন্মে থাকে। এমতাবস্থায় খুব

১. মাওলানা শিবলী নূ'মানীর মতে তৎকালীন আরব উপদ্বীপের দৈর্ঘ্য দেড় হাজার মাইল এবং প্রস্থ ছ'শ মাইল। আয়তন হচ্ছে ১২ লাখ বর্গমাইল। -সীরাতুন নবী, জিলদ ১, পৃ. ১০৫। -অনুবাদক

কম লোকই এ ধরনের জনমানবহীন উষ্ণ মরুভূমি পাড়ি দেয়ার দুঃসাহস করে। এসব কারণে প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের নিকট একমাত্র ইয়ামন ছাড়া আরবের অন্যান্য এলাকা অপরিজ্ঞাত ছিল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আরব উপদ্বীপের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানই তাকে প্রাচীনকালে বহিঃশক্তির ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। অপরদিকে মানব ইতিহাসের জন্য এটাও একটা সৌভাগ্যের বিষয় যে, এরূপ প্রতিকূল অবস্থায়ও সেখানে কিছু লোক চলাচল করেছে, বসবাস করেছে। প্রাচীনকালে কেউই সমুদ্রে চলাচলের সাহস করত না। এটাকে তারা নিরাপদ মনে করত না। এজন্য বণিক ও পর্যটকরা স্থলপথেই সফর করত। আরবের প্রবাদ বাক্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীনকালে তারা সাগর যাত্রাকে ভয়াবহ মৃত্যু বলে মনে করত। এজন্য মানুষ বাধ্য হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেশ-ভ্রমণের জন্য স্থলপথই বেছে নিত। সেকালে ভারতীয় উপমহাদেশ, বাইজেন্টাইন ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যাপক বাণিজ্য চলত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার এই বাণিজ্য আরবের স্থলপথে চলত। প্রাচ্য থেকে পারস্য উপসাগরের উপকূল দিয়ে যেসব পণ্য-সামগ্রী আসত, সেগুলো আরবের মরুপথে পাশ্চাত্যে যেত।

মরুর শাসক

আরবের যাযাবর অধিবাসীরাই ছিল সে এলাকার মরুভূমির শাসক ও নিয়ন্ত্রক। অনুরূপ পানিপথে নৌ-চলাচল শুরু হওয়ার পর নাবিকরা সাগরের শাসকে পরিণত হয়। তারা যেমন সাগরের বিপদজনক স্থানগুলো এড়িয়ে চলার জন্য নৌযান চলাচলের পথ নির্দিষ্ট করে দেয়, তেমনি মরুর শাসকরাও বিভিন্ন কাফেলার যাতায়াতের জন্য মরুভূমিতে পথ নির্দিষ্ট করে দেয়। এ ব্যাপারে হ্যারন বলেছেন :

“আরবের মরুভূমিতে বাণিজ্য কাফেলাগুলোর চলাচলের রাস্তারও কোনও ঠিক-ঠিকানা ছিল না। প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভরশীল এসব পথ নিজে নিজেই হয়ে যেতো আবার মুছে যেতো। মরুভূমির এই বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করার সময় ক্লান্তি দূর করার জন্য কাফেলার বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। যেখানে মিষ্টি পানির ঝর্ণা আর খেজুর গাছ দৃষ্টিগোচর হতো, যাত্রা বিরতি করত। নিজেরা পানি পান করত এবং বাহনের পশুগুলোকেও পান করাত। এসব বিশ্রামের স্থান ধীরে ধীরে বণিকদের পণ্যসামগ্রী বেচা-কেনার কেন্দ্রে পরিণত হয়। কোন কোন স্থানে বুতখানা ও উপাসনালয়ও স্থাপন করা হয়। সওদাগররা এসব বুতখানায় রাখা প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতির জন্য প্রার্থনা করত। অন্যান্য মুসাফির তাদের সমস্যা সমাধান ও কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা করত।”

বাণিজ্য কাফেলার পথ

আরবের মরুভূমিতে বিভিন্ন কাফেলার যাতায়াতের অনেক পথ ছিল। তার মধ্যে দু'টি পথ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি ছিল পারস্য উপসাগর ও দজলা নদীর উপকূল ঘেঁষে সিরিয়ার

মরুভূমি হয়ে ফিলিস্তীন পর্যন্ত। এই পথটি আরবের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় এটাকে 'তুরিকুশ্শারক' বা প্রাচ্যপথ বলা হতো। অপর রাস্তাটি ছিল লোহিত সাগরের উপকূল ঘেঁষে। এটি আরবের পশ্চিমে অবস্থিত হওয়ায় একে 'তরিকুলগারব' বা পশ্চিমের পথ বলা হতো। সাধারণত এ দু'টি পথেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাশ্চাত্যের শিল্পজাত পণ্য প্রাচ্যে আসত আর প্রাচ্যের পণ্যসামগ্রী পাশ্চাত্যে যেতো। আর এসব পথে যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলার নিকট থেকে আরবের মরুবাসীরাও তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করত।

তা সত্ত্বেও আরব উপদ্বীপ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের জানাশোনা ছিল না। এই এলাকা সম্পর্কে তারা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাদের মধ্যে খুব কম লোকই আরবের উষ্ণ মরু পারাপার হওয়ার কষ্ট স্বীকার করত। কারণ আরবের মরুপ্রান্তর পার হওয়া চাড়াখানি ব্যাপার ছিল না। যাদের শৈশবকাল আরব উপদ্বীপের মরুপ্রান্তরে কেটেছে, কেবল তারাই সেখানকার মরুপথের সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট জয় করে চলাচল করতে পারে। আর যাদের জীবনের প্রতি কোন প্রকার মোহ নেই, মরুভূমির বালিয়াড়ির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত, তারাও এই দুর্গম পথ অতিক্রম করতে পারে, এ পথে চলাচল করতে পারে। যারা নাগরিক জীবনের আরামআয়েশে অভ্যস্ত—তারা এমন একটি এলাকায় যাতায়াতের দুঃখ-কষ্ট কি বরণ করতে পারে—যেখানে রয়েছে পানি ও গাছপালাহীন পাহাড়-পর্বত, দিগন্তহীন বালুময় মরুপ্রান্তর? আর যে এলাকায় যাতায়াতের একমাত্র বাহন হচ্ছে উট। নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত মানুষ কি করে মরুভূমির দুঃখ-কষ্টের জীবন গ্রহণ করতে পারে? এমন জীবনব্যবস্থা তারা কি করে গ্রহণ করতে পারে, যাতে নিয়ম-শৃংখলার বলাই নেই। আরবের মরু এলাকায় যেসব গোত্র, পরিবার ও ব্যক্তি স্থায়ীভাবে বসবাস করত, তাদের মধ্যে রীতি-নীতি বলতে এই ছিল যে, গোত্র কিংবা পরিবারের জন্য তারা জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করত না। পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি তারা যে কোনও মূল্যে রক্ষা করত। প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষার ব্যাপারেও তারা ছিল আপোসহীন। এর ফলে তাদের মধ্যকার একজন দুর্বল মানুষও প্রভাবশালী লোকের সাহায্য-সহায়তা লাভ করত। এটা ছিল তাদের জীবনের মূলনীতি। আইন-কানুন বলতে তাদের মধ্যে একমাত্র এটাই ছিল উল্লেখযোগ্য।

মরুভূমির যাযাবর জীবন আর নাগরিক জীবনের মধ্যে সব সময়ই একটা বিরাট পার্থক্য চলে আসছে। মরুবাসীরা সব সময় খুনের বদলা খুন প্রতিশোধ নিত। তারা শক্তির মাধ্যমে শক্তির মোকাবেলা করত। আর যারা এ ধরনের সমাজ জীবনে অভ্যস্ত সাধারণত সভ্য মানুষেরা তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। তাদের রীতিনীতি সম্পর্কে গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তাও বড় একটা কেউ অনুভব করে না। এসব কারণেই সেকালে আরবদের বিশেষ কোন খ্যাতি কিংবা গুরুত্ব ছিল না। মানব ইতিহাসের এক পর্যায়ে আরব উপদ্বীপে মহানবী (সা)-এর আবির্ভাব হয়। আর তখন থেকে আরবদের সম্পর্কে মানুষ জানার প্রয়োজন অনুভব করে। মনোযোগ সহ তাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া শুরু হয়। বস্তুত মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের পরই বিশ্ববাসী জানতে পারে, আরব কারা এবং তাদের ইতিহাস কি।

ইয়ামন সভ্যতা

সে যুগে যখন সুসভ্য রাষ্ট্রগুলোর তালিকাতেও আরবের নাম ছিল না, তখন ইয়ামন ও পারস্য উপসাগরের আশেপাশের কয়েকটি দেশের বেশ খ্যাতি ছিল। এই খ্যাতি শুধু এজন্য ছিল না যে, এসব দেশ পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগরের আশেপাশে ছিল। মূলত এ খ্যাতির পিছনে একাধিক কারণ ছিল। ইয়ামন আরবের অন্যান্য এলাকার মতো উষ্ণ মরুময় ছিল না যে, বাইরের লোকেরা দেশটি এড়িয়ে চলবে এবং প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশ তার বন্ধুত্বের প্রত্যাশী হবে না। প্রকৃতিগতভাবেই সেকালে ইয়ামন ছিল একটি শস্য-শ্যামল দেশ। বিভিন্ন মওসুমে সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো। সেখানে স্বাভাবিকভাবেই ইয়ামন সভ্যতার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। সে দেশে সুন্দর সুন্দর একাধিক শহর ছিল। সেসব শহরে মনোরম ও আকাশচুম্বী ইমারত ও উপাসনালয় ছিল। ইয়ামনের অধিবাসীদের মধ্যে জ্ঞানে, গুণে ও মেধায় শ্রেষ্ঠ ছিল হিম্যার গোত্র। প্রকৃতি হিম্যার গোত্রকে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছিল। তাদের সবচাইতে কৃতিত্ব ছিল ‘মাআরেব বাঁধ’।^১ এ বাঁধের মাধ্যমে তারা বৃষ্টির পানি আটকে রেখে ফসলের ক্ষেতে সেচ করত। এই বাঁধটি ছিল ‘চার শ’ মিটার লম্বা। দুই পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকায় বাঁধটি নির্মাণ করা হয়েছিল। হিম্যার গোত্রের প্রকৌশলীরা তা নির্মাণ করেন। বাঁধের দুই প্রান্ত দুই পাহাড়ের সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছিল। বাঁধে একটু উপর-নিচ করে দু’টি মুখ বা ছিদ্র রাখা হয়েছিল। প্রয়োজনমত তারা এই মুখদুটো দিয়ে নিজেদের আবাদী জমি ও ফলের বাগানে পানি সেচ করত। এই মাআরেব শহর ও তার প্রখ্যাত বাঁধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এসব ধ্বংসাবশেষে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে অনেক তথ্য উদ্ধার করেছেন। আজো তাদের অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। এসব ধ্বংসাবশেষের শিলালিপি থেকে হিম্যারীদের সভ্যতা ও তাহযীব-তামাদুনের যেসব তথ্য উদঘাটিত হয়েছে, সেসব দেখে আধুনিক বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীরা বিস্মিত হয়েছেন।

ইয়ামনে ইহুদী ও খৃষ্টান

ইয়ামনের উর্বরতা ও তাহযীব-তামাদুন প্রতিবেশী বিভিন্ন জাতিকে তার দিকে আকৃষ্ট করেছে। এই সমৃদ্ধ দেশ কয়েক পুরুষ পর্যন্ত হিম্যার-বংশীয়দের শাসনাধীন ছিল। এদেশের অধিবাসীদের ধর্ম ছিল দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা। এক পর্যায়ে হিম্যার বংশীয় শাসক যুনাওয়াস

১. ইয়ামনে ছিল প্রাচীন সাবা রাজ্য। এই রাজ্যের বিভিন্ন পাহাড়ের উপত্যকায় বড় বড় বাঁধ দিয়ে পানি আটকে রাখা হতো। পরে প্রয়োজনমতো এই পানি আবাদী জমিতে সেচ করা হতো। সেকালে সারা রাজ্যে এ ধরনের অসংখ্য বাঁধ ছিল। সবচাইতে প্রসিদ্ধ ছিল মাআরেব বাঁধ। এটা ছিল সাবার রাজধানী মাতনারেবে। এই শহরের দক্ষিণাংশে আবলাক পাহাড়ের দুটি শৃংগের মাঝখানে রয়েছে আজনিয়া উপত্যকা। তাতে চারদিকের বৃষ্টির পানি জমে নদীর রূপ ধারণ করত। খৃষ্টপূর্ব ৮শ’ অব্দে সাবার অধিপতি উক্ত পর্বত শৃংগদুটির মাঝখানে একটি বাঁধ নির্মাণ করেন। বাঁধ বলতে দেড়শ’ ফুট লম্বা ও পঞ্চাশ ফুট চওড়া একটি প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। এই বাঁধের দুই-তৃতীয়াংশই ধ্বংস হয়ে গেছে। এখনো তার এক-তৃতীয়াংশ প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার বস্তুরূপে অবশিষ্ট রয়েছে। মাআরেব বাঁধ বলতে এটাকেই বোঝান হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সূরা সাবার ষোড়শ আয়াতেও বাঁধের উল্লেখ রয়েছে। —অনুবাদক

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি প্রতিমা পূজা পছন্দ করতেন না। সে সময় কিছু ইহুদী বাহির থেকে এসে ইয়ামনে বসবাস করতে থাকে। বাদশাহ্ যুনাওয়াসও হযরত মূসা (আ)-এর ধর্মে দীক্ষিত হন। পবিত্র কোরআনে ‘আস্হাবে উখদূদ’ বা পরিখাওয়ালাদের ঘটনা সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, তার মূল নায়ক ছিলেন এই যুনাওয়াস। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ . النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ . اذْهَبْ عَلَيْهَا قُعُودٌ . وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ . وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ .

“তাদের পরিখায় ঢুকিয়ে উপর থেকে আগুন লাগিয়ে নির্মূল করা হয়েছিল। এ সময় অগ্নিসংযোগকারীরা তার কিনারায় বসে ছিল এবং তারা মু’মিনদের প্রতি যা করছিল তা দেখছিল। ওরা তাদেরকে দণ্ড দিয়েছিল শুধু এই কারণে যে, তারা পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।” (৮৫ : ৪-৮)

এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত পটভূমি হলো, একজন ন্যাযনিষ্ঠ খৃষ্টান ধর্মযাজক রোমের কিমুন থেকে ইয়ামনের নাজরানে এসে বসতি স্থাপন করে। তাঁর ধর্মপরায়ণতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নাজরানের অধিবাসীরা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। সম্রাট যুনাওয়াস এ খবর শুনে নিজে নাজরানে উপস্থিত হন। সেখানকার নবদীক্ষিত খৃষ্টানদের পুনরায় ইহুদী বা হযরত মূসার ধর্মমত গ্রহণের নির্দেশ দেন। অন্যথায় তাদের হত্যা করা হবে বলে হুমকি প্রদান করেন। কিন্তু তারা সম্রাটের এ নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করে। সম্রাট যুনাওয়াস তাদের শাস্তি দেয়ার জন্য পরিখা খনন করান। তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন। এরপর খৃষ্টানদের ধরে এনে অগ্নি প্রজ্বলিত পরিখায় নিক্ষেপ করা হয়। যারা এই আগুন থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাস গ্রন্থরাজির মাধ্যমে জানা যায়, আগুনে পুড়িয়ে কিংবা হত্যা করে নিধনকৃত খৃষ্টানদের সংখ্যা ন্যূনপক্ষে ২০ হাজার ছিল।

নাজরানের একজন খৃষ্টান কোন প্রকারে এই খৃষ্টান নিধন অভিযান থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। সে পালিয়ে রোমের খৃষ্টান সম্রাট জুস্তিনানের দরবারে গিয়ে হাযির হয়। সে যুনাওয়াসের উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রোম সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করে। এটা ছিল ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। এ সময় নাজ্জাশীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় আবিসিনিয়া অগ্রগতির চরম শিখরে বিরাজ করছিল। তার সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যও বেশ জোরে-শোরে চলছিল। নৌশক্তিবলে সে আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। রোম সাম্রাজ্যের সাথে আবিসিনিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এই হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্কের পরিণামে একদিকে ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় এলাকায় রোমান রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় খৃষ্টধর্মের প্রচার-প্রসার হচ্ছিল, অপরদিকে আবিসিনিয় সম্রাট লোহিত সাগর উপকূলে এই ধর্মের বিজয় কেতন উড়িয়ে রেখেছিলেন।

নাজরানী খৃষ্টানের মুখে সেখানকার খৃষ্টানদের নির্মম হত্যার কাহিনী শুনে রোমান সম্রাট অত্যন্ত মর্মান্বিত হন। কিন্তু ইয়ামন রোম থেকে অনেক দূরে হওয়ায় তিনি প্রতিশোধ নিতে

পারছিলেন না। অগত্যা তিনি আবিসিনিয়ার খৃষ্টান সম্রাটকে এ ব্যাপারে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি ইয়ামনের ইহুদী শাসক যুনাওয়াসের উপর নাজরানের খৃষ্টানদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অনুরোধ জানান। এই পত্র পেয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য নাজ্জাশী রোমান সম্রাটের দূতের সাথে একদল সৈন্য ইয়ামন অভিযানে প্রেরণ করেন। আরইয়াত নামের একজনকে সেনাপতি করা হয়। আবরাহা আশরাম নামক একজন সিপাইও উক্ত বাহিনীতে ছিল। আরইয়াত ইয়ামন জয় করে তা আবিসিনিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিছুদিন পর্যন্ত আরইয়াতই সেখানকার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর আবরাহা আরইয়াতকে হত্যা করে ইয়ামনের শাসন ক্ষমতা দখল করেন। এই আবরাহাই কা'বা ঘর ধ্বংস করার জন্য হস্তী-বাহিনী পাঠিয়েছিল। এই জঘন্য অভিযানে তাকে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আবরাহা'র পর তার ছেলে ইয়ামনের শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তার অত্যাচার-নির্যাতনে ইয়ামনের অধিবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অবশেষে হিম্য়ার গোত্রের প্রভাবশালী সরদার সাইফ ইবনে যীযান রোম সম্রাটের দরবারে পৌঁছান। তিনি সেখানে একজন রোমান শাসক পাঠানোর অনুরোধ করেন। কিন্তু রোম ও আবিসিনিয়ার মধ্যে মৈত্রীচুক্তি ছিল। তাই রোম সম্রাট ইয়ামনে তাঁর প্রতিনিধি পাঠাতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। সাইফ ইবনে যীযান রোম থেকে

১. গ্রন্থের মূল লেখক এক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ টীকা লিখেছেন। তাতে বলা হয়েছে, মূল গ্রন্থের লেখা বর্ণনাটি বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা অর্থাৎ History of the World Historian's এবং প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ মুন্জিম তাঁর “হায়াত-ই-মুহাম্মদ (সা)” শীর্ষক গ্রন্থে হিশাম ইবনে মুহাম্মদ বর্ণিত এবং তারীখ-ই-তাবারী কর্তৃক উদ্ধৃত বর্ণনাটি এই ঘটনার মূল উৎস বলে উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ইয়ামন থেকে পালিয়ে যাওয়া খৃষ্টানটি সর্বপ্রথম আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে। লোকটি বাদশাহকে ইনজীল কিতাবের পোড়ানো পৃষ্ঠা দেখায়। নাজ্জাশী বলেন, নৌবহর ছাড়া এই অভিযান চালানো সম্ভব নয়। আমি রোম সম্রাটের নিকট নৌবহর সাহায্যের জন্য অনুরোধ করছি। অতঃপর নাজ্জাশী রোম সম্রাটের দরবারে পবিত্র ইনজীলের অগ্নিদগ্ধ পৃষ্ঠা পাঠিয়ে দেন এবং সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন। রোম সম্রাট এই অভিযানের জন্য একটি নৌবহর পাঠিয়ে দেন। এই নৌবহরের মাধ্যমে নাজ্জাশী তাঁর সৈন্যবাহিনী ইয়ামনে প্রেরণ করেন। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে আবিসিনিয়া ও ইয়ামনের এই সংঘর্ষের আর একটি কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো আরবে নতুন বসতি স্থাপনকারী, ইয়ামন ও আবিসিনিয়ার মধ্যে সেকালে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তারা একে অপরের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। কিন্তু লোহিত সাগরের বিস্তীর্ণ উপকূল ছিল আবিসিনিয়ার অধিকারে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যে আবিসিনিয়ার পাল্লা ভারি ছিল। ওদিকে রোম সম্রাট দীর্ঘদিন থেকে ইয়ামন অঞ্চল অধিকার করার জন্য লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। এমনকি একবার তিনি মিসরের প্রাদেশিক শাসক ইলিয়াম জালিসকে ইয়ামন অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইলিয়াম নৌবহরের সাহায্যে ইয়ামনের নাজরান আক্রমণ করেন। কিন্তু তার বাহিনী সেখানকার প্রাকৃতিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ইলিয়ামকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। এবার ইয়ামনের উপর আবিসিনিয়ার বাদশাহর দৃষ্টি পড়ে। তিনি ইয়ামনের সাথে এবং আরবের অন্যান্য প্রদেশের সাথেও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেও ব্যর্থতা বরণ করতে হয়। এরপর তিনি ইয়ামন অধিকার করার জন্য ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতবিরোধের সুযোগ গ্রহণ করেন। এক পর্যায়ে সেনাপতি আরইয়াতকে ইয়ামন অভিযানের নির্দেশ দেন। এবার আরইয়াত ইয়ামন অধিকার করতে সক্ষম হন। এরপর আরইয়াত নিজেই ইয়ামনের শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কয়েক বছর পর ইরানীরা আরইয়াতকে বের করে দিয়ে ইয়ামন দখল করে নেয়। -অনুবাদক

বিফল হয়ে ফিরে আসেন। এবার তিনি হীরা ও ইরাকের গভর্নর নো'মান ইবনে মুনযিরের দরবারে গিয়ে একই অনুরোধ করেন। নো'মান পারস্য সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে উক্ত এলাকার শাসক ছিলেন।

ইরানের ইয়ামন অধিকার

হীরা ও ইরাকের গভর্নর নো'মান ইবনে মুনযির পারস্য সম্রাটের নির্দেশ ছাড়া ইয়ামন অভিযানের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। তিনি সাইফ ইবনে যীযানকে সঙ্গে নিয়ে ইরানের রাজধানীতে পৌঁছান। পারস্য সম্রাট খসরু পারভেয তখন ইরানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর দরবার-কক্ষ ছিল অত্যন্ত শান-শওকতময়। পূর্বপুরুষ দারার ঐতিহাসিক সিংহাসন। হীরা-চুন্নি-পান্না দ্বারা তাতে কারুকার্য করা। শীত মওসুমে শীতের তীব্রতা কমানোর জন্য দরবার কক্ষের চারদিকে মূল্যবান চামড়ার পর্দা লাগানো। সম্রাটের মুকুটটি ছিল হীরা-চুন্নি-পান্নার মতো মূল্যবান ধাতু ও সোনা-রূপা দ্বারা মোড়ানো। এটি সিংহাসন ও ছাদের মাঝখানে টানিয়ে রাখা হয়েছিল। সম্রাটের পরনে ছিল স্বর্ণখচিত মূল্যবান পোশাক ও অলংকারপত্র। যে কোনও নবাগত এই অপূর্ণ দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে যেতো। জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলত। সাইফ ইবনে যীযানেরও একই অবস্থা হলো। তিনি কিছুক্ষণ জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে কাঠের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর তিনি কিছুটা স্বাভাবিক হলে সম্রাট তাকে দরবারে উপস্থিতির উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলেন। সাইফ ইবনে যীযান ইয়ামনে আবিসিনীয়দের নির্মম অত্যাচার-নির্যাতনের কল্পণ কাহিনী সম্রাটের নিকট ব্যক্ত করলেন। সাইফ ইবনে যীযানের বক্তব্য শুনে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেয প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করলেন। এরপর সাইফের আবেদন গ্রহণ করলেন। সম্রাট যুবরাজ দাহরিজের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী ইয়ামন অভিযানে পাঠালেন। দাহরিজ শুধু বীরযোদ্ধাই ছিলেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনায় তার সমকক্ষ সে সময় ইরানে দ্বিতীয় কেউ ছিল না। দাহরিজ আবিসিনীয়দের বিতাড়িত করে ইয়ামনে ইরানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। আবিসিনীয়রা ৭২ বছর পর্যন্ত ইয়ামন শাসন করে। এরপর থেকে আরব ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের শাসন কায়েম হওয়ার আগ পর্যন্ত ইয়ামন ইরানের দখলে ছিল।

ইরানে শেরবিয়া শাসন

ইয়ামনের ইরানী গভর্নর কোন সময়ই কেন্দ্রের পুরোপুরি অনুগত ছিলেন না। বিশেষ করে ইরানের বাদশাহ শেরবিয়ার আমলে ইয়ামনের শাসক কেন্দ্রীয় রাজধানী ইরানের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগই রক্ষা করতেন না। শেরবিয়া তাঁর পিতা সম্রাট খসরু পারভেযকে হত্যা করে ইরানের সিংহাসন দখল করেন। তিনি রাজ্যের প্রজাসাধারণের সুখ-দুঃখ ও কল্যাণের প্রতি এতটুকু নজর দিতেন না। তিনি মনে করতেন রাষ্ট্রের ধনাগার একমাত্র তাঁর আরাম-আয়েশ ও আমোদ-প্রমোদের জন্যই। তিনি নিজের আমোদ-প্রমোদে রাষ্ট্রের ধনাগার অকাতরে ব্যয় করতেন। শেরবিয়া রাতদিন আমোদ-প্রমোদেই ডুবে থাকতেন। তিনি খুব শিকারপ্রিয় ছিলেন। অকল্পনীয় শান-শওকতের সাথে তিনি শিকারে যেতেন। তাঁর ডানে-বাঁয়ে থাকত বিশেষ পোশাকে সজ্জিত সুদর্শন যুবক সিপাইদের দল। শাহী সওয়ারীর পিছনে থাকত বরকন্দাজ

বাহিনী। তাদের হাতে থাকত অনেক শিকারী বাজপাখি। তাদের পিছনে থাকত আর একটি বাহিনী। তাদের সাথে থাকত শিকারী চিতাবাঘ। এসব চিতাবাঘের গলায় রেশমী দড়ি লাগানো থাকত। বাদশাহর পিছনে পিছনে চলত বেলোয়ারী পাত্রভর্তি আতর নিয়ে সুন্দরী নারীরা। কিছুক্ষণ পর পর তারা আতর ছিটাত। বাদশাহর সামনে থাকত কোকিলকণ্ঠী গায়িকার দল। তাদের গানের তালে তালে আকাশ-বাতাসও যেন নেচে উঠত। বাদশাহ যে পথ দিয়ে শিকারে যেতেন, সে পথে শীতকালেও বসন্তের পরিবেশ সৃষ্টি করা হতো। সারা পথে কার্পেট বিছানো থাকত। সুগন্ধি ফুলের গাছ আর সুন্দর সুন্দর বৃক্ষরাজি শোভা পেত। তার মাঝে মাঝে থাকত অসংখ্য ঝর্ণা। এভাবে সম্রাট শেরবিয়া ইরানের ধনসম্পদ দু'হাতে বিলাতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইরানের রাজকোষে কোন প্রকার অর্থ-সংকট দেখা দেয়নি। ইরানের সবচাইতে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রোমান সম্রাট। রোমান সাম্রাজ্যের খৃষ্টানরা সম্রাটের ইঙ্গিতে যেকোন মুহূর্তে জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। রোমান সম্রাট ইরানের বাদশাহ শেরবিয়ার এরূপ বল্গাহীন আমোদ-ফুটির কাণ্ড-কারখানা দেখেও কিছু করছিলেন না। তিনি ইরানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে সাহস পাচ্ছিলেন না। তা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শেরবিয়াই ইরানীদের ধ্বংসের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। মুসলমানরা যখন তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তথা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য চারদিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন ইরানের এই দুরবস্থা দেখে তারা ইরানের উপরও আক্রমণ চালান। তাতে করে শত শত বছরের ইরানী সিংহাসনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধূলোয় মিলিয়ে যায়।

মাআরেব বাঁধের ধ্বংস

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর ইয়ামনে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়, আরব উপদ্বীপের ইতিহাসও সে সবে প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। আর এজন্যই ইয়ামনের কিছু বাসিন্দা হিজরত করে আরবে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। সেচ কাজের জন্য হিম্যারীরা যে মাআরেব বাঁধ নির্মাণ করেছিল, এক সর্বনাশা বন্যায় প্লাবিত হয়ে তা সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার দাপটে বিলীন হয়ে যায়। মূলত এই বাঁধ ধ্বংসের কারণ ছিল অব্যাহত যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুন ইয়ামনবাসী বাঁধটি মেরামত করার সুযোগই পায়নি। তাতে অনেক ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল। এসব ফাটল যথাসময়ে মেরামত করা হয়নি। এক পর্যায়ে বন্যা আসলে বাঁধটি পানির চাপ প্রতিরোধ করতে পারেনি। প্রবল স্রোতে বাঁধটি ধ্বংস হয়ে যায়।

কিতপয় ঐতিহাসিকের মতে রোম সম্রাট যখন জানতে পারলেন যে, ইরান ইয়ামন দখল করে নিয়েছে, তাতে রোমের ব্যবসা-বাণিজ্য বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তখন তিনি এক নির্দেশ জারি করেন। তাতে বলা হয়, মিসর এবং দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে লোহিত সাগরে কিছু বাণিজ্য জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব জাহাজের মাধ্যমে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আমদানী করতে হবে। তার এই পকিঙ্গনার উদ্দেশ্য ছিল, স্থলপথে বাণিজ্যের উপর যেন রোমান সাম্রাজ্যকে আর নির্ভর করতে না হয়। রোমান সম্রাটের এই পদক্ষেপ নেয়ার ফলে ইয়ামনের অর্থনৈতিক জীবনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মাআরেব বাঁধের ধ্বংসের ফলেই ইয়ামনবাসীর অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিকরা

সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, ইয়ামনের ইজদী গোত্র দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলে হিজরত করে। কিন্তু হিজরতের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বাণিজ্য-পথ পরিবর্তনের কারণে উপরোক্ত গোত্র দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলে হিজরত করে। আর কারো কারো মতে মাআরেব বাঁধ ধ্বংসের কারণেই তারা হিজরত করেছিল। এই হিজরতের ফলে ইয়ামনের দক্ষিণাঞ্চলের অনেকগুলো শহর বিরান হয়ে যায়। ইয়ামনের অনেক গোত্র আরব উপদ্বীপে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। তারা আরবদের সঙ্গে মিশে যায়। ইয়ামনের এই সব গোত্র আরবের কোন্ কোন্ এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল, ঐতিহাসিকরা তা এখনও নির্ণয় করতে পারেনি।

আরব উপদ্বীপের সমাজ ব্যবস্থা

যে যুগে ইয়ামনের প্রাচীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা বৈদেশিক শক্তির আক্রমণের শিকার হয়ে বরবাদ হচ্ছিল, ইয়ামনের হিম্যারীদের সুবিন্যস্ত শহর-বন্দর রণাঙ্গণে পরিণত হয়েছিল, সে সময় আরবের অন্যান্য এলাকার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সেখানকার অধিবাসীরা রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিল না। আজ আমরা রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা বলতে যা বুঝি, সে সময়ে তেহামা, হিজাজ, নজ্দ ও আরবের অন্যান্য এলাকায় তার বিন্দুমাত্র ছিল না। সে সব এলাকার অধিবাসীরা মরুভূমিতে যাযাবর জীবন যাপন করত। নাগরিক জীবনের সাথে তাদের এতটুকু সম্পর্ক ছিল না। নাগরিক জীবন যাপন করার তাদের কোনও প্রকার সুযোগই ছিল না। গবাদি পশুর চারণভূমির অন্বেষণের তাগিদে তারা এক জায়গায় বেশি দিন বসবাসও করতে পারত না। সুতরাং প্রাচীরঘেরা বসতিতে তারা স্থায়ীভাবে কিরূপে বসবাস করবে।

যাযাবর জীবনধারার নিরাপত্তার তাগিদেই তারা নিজ নিজ গোত্রে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করত। আরবের যাযাবর শ্রেণী যারা আজ এখানে কাল ওখানে বসবাস করত, তাদের নিকট নাগরিক জীবনের সামাজিক আইন-কানূনের কোনও গুরুত্ব ছিল না। তারা এসবের তাৎপর্য বুঝত না। সে যাযাবর আরবদের জীবনধারায় প্রতিটি ব্যক্তিই ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা তাদের নিজ নিজ গোত্র ছাড়া অন্য কারো বশ্যতাও স্বীকার করত না।

নাগরিক জীবনধারায় অভ্যস্ত লোকেরা নিজেদের আরাম-আয়েশের খাতিরে কিছু কিছু ব্যক্তিগত অধিকার ছেড়ে দিয়ে থাকে। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে কিছু কিছু আইন-কানূনের বন্ধনে আবদ্ধ করে। এসব আইন-কানূনের মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্ত রাখে। পক্ষান্তরে যাযাবর গোত্রগুলো জীবনের আরাম-আয়েশের প্রতি এতটুকু তোয়াক্কা করে না। আর তাই তারা কোনও আইন-কানূনের বন্ধনে নিজেদের জড়ানো কোন অবস্থাতেই সহ্য করে না। তারা শুধু একটা বিষয়ই জানে, আর তা হলো, ব্যক্তি ও গোত্রীয় জীবন সমান অধিকারের ভিত্তিতে হতে হবে।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মতো আরব যাযাবরদের জীবনধারায়ও মৌলিক তিনটি বিষয় পরিলক্ষিত হতো। সেগুলো হচ্ছে জীবনের প্রতি মমত্ববোধ, জীবনের নিরাপত্তা এবং বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকার প্রচেষ্টা। এসব বিষয় অর্জনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আইন ও নিয়ম-কানুন মেনে চলা। আর সেটারই অভাব ছিল আরব যাযাবরদের মধ্যে। তাদের মেজাজ এমন ছিল

যে, তারা অন্যদের অন্যায়-অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করতে পারত না। তারা নিজের পুরোশক্তি প্রয়োগ করে তা বন্ধ না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হতো না, স্বস্তিবোধ করত না। তারা যদি অনুভব করত যে, এই ব্যাপারে তারা অপারগ বা তা তাদের শক্তির বাইরে, তখন তারা শুধু স্থানই পরিবর্তন করত না, আরব মরু অঞ্চলই ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেত। এ ধরনের ব্যাপার আপোসে মীমাংসা করা সম্ভব না হলে বিনা দ্বিধায় নাজা তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আর শুরু হতো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ।

যাযাবর রীতি-নীতি

এতদসত্ত্বেও ভদ্রতা, বীরত্ব, স্বাধীনতা, প্রতিবেশীকে সাহায্য করার প্রবণতা, প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য চারিত্রিক গুণ, যা নাগরিক জীবনে বড় একটা দেখা যায় না, সে সময়ই অনেক আরব গোত্রের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। এসব রীতি-নীতি ও গুণাবলির দরুন বাইজেন্টাইন যেমন আরবদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ায় নিজেদের অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক কোন সুবিধা দেখতে পায়নি, তেমনি ইরানও আরবদের নিজের অধীন করায় কোনও প্রকার কল্যাণ অনুভব করেনি। তবে ইয়ামন ছিল অন্যান্য আরব ভূখণ্ডের ব্যতিক্রম। ইয়ামন থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল। আর তাই বাইজেন্টাইন ও ইরান উভয়েই ইয়ামন দখল করার জন্য তৎপর ছিল। তা'ছাড়া ইয়ামন ছাড়া অন্যান্য এলাকার আরব গোত্রগুলো কোনও এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করত না। তারা কারো বশ্যতা স্বীকার করার চাইতে দেশত্যাগকে অগ্রাধিকার প্রদান করত। এরূপ পরিস্থিতিতে যাযাবর আরব গোত্রগুলোকে বশে আনাও চাউখানি ব্যাপার ছিল না।

বাণিজ্য কাফেলার যাতায়াতের পথ হওয়ার দরুন আরবে কয়েকটি শহর গড়ে উঠেছিল। এসব শহরের অধিবাসীরা নিজেদের অমায়িক ব্যবহারের মাধ্যমে বহিরাগতদের মুগ্ধ করে ফেলত। তাই বাইরের বাণিজ্য কাফেলাগুলো তাদের সফরের ক্লান্তি দূর করার জন্য এসব শহরে যাত্রাবিরতি করত। এসব শহরের স্থানীয় বাসিন্দারা বহিরাগত বাণিজ্য কাফেলাগুলোকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করত। তারা স্থানীয় মন্দির ও উপাসনালয়ে গিয়ে মরুভূমির দুর্গমপথের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেবদেবীর সাহায্য প্রার্থনা করত। পবিত্র মক্কা, তায়েফ, ইয়াসরিব বা মদীনা ছিল এসব শহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পাহাড়-পর্বতের ভিতর কিংবা মরুভূমির মাঝখানে খেজুর বাগানকে কেন্দ্র করে এসব শহর গড়ে উঠেছিল। এসব শহরের অধিবাসীরা ধীরে ধীরে যাযাবর জীবনধারা পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এক পর্যায়ে তাদের ও নাগরিক জীবনধারার লোকদের মধ্যকার পার্থক্য উঠে যায়। তা সত্ত্বেও এসব শহরের অধিবাসীদের মন-মানসিকতা ও চরিত্রে যাযাবর জীবনধারার বৈশিষ্ট্যের প্রভাব প্রবল ছিল। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

আরবদের মূর্তিপূজা

পরিবেশের প্রভাব আরবদের চারিত্রিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যেভাবে পড়েছিল, তাদের ধর্মীয় জীবনেও কি পরিবেশ অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল? রোম ও ইরানের সাথে

সম্পর্কের দরুন ইয়ামনের অধিবাসীদের মধ্যে খৃষ্ট ও যরথুস্ত্র ধর্ম যেরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা কি আরবের অন্যান্য এলাকায়ও সম্প্রসারিত হয়েছিল? যে কোন লোকের মনে এসব প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বিশেষ করে আরব গোত্রগুলোর মধ্যে খৃষ্টধর্মের প্রভাব পড়েছিল কিনা, এ প্রশ্নটি যে কোন লোকের মনে উদয় না হয়ে পারে না। কারণ আজকের মতো সেই প্রাচীনকালেও খৃষ্টানরা তাদের ধর্মের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতো। তদুপরি যাযাবর জীবনে ধর্মীয় প্রভাব পড়ার আর একটা কারণ হলো, খোলা আকাশের নিচে অবস্থানকারীরা সহজেই প্রকৃতির সীমাহীন প্রাচুর্য অনুধাবন করার সুযোগ পেয়ে থাকে। চারদিকে তাকালে শুধু প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যই তাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কিন্তু শহুরে জীবন যাপনকারীদের ভাগ্যে এই সুযোগ বড় একটা জোটে না। নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যাবলির সমাধান ও সামাজিক আইন-কানূনের বাধ্যবাধকতা নিয়েই তাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। সমাজের কোন সবল লোক যদি কারো ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে এর প্রতিকারের জন্য তাকে সমাজপতির নিকট বিচারপ্রার্থী হতে হয়। নিজের অধিকার আদায়ের জন্যও নাগরিক জীবন যাপনকারীদের সদা তৎপর থাকতে হয়। কিন্তু যাযাবর জীবন যাপনকারীদের এসব ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয় না। দিগন্তহীন মরু প্রান্তরে অবস্থান করার সুবাদে যাযাবর গোত্রগুলো ওসব বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকে। সামাজিক চাকচিক্য থেকে দূরে থাকার দরুন স্বভাবগতভাবেই তাদের মধ্যে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার উদয় হয়। তারা অনেকটা ধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো, খৃষ্টধর্ম প্রচারকরা আরবেও তাদের ধর্মের প্রচার অভিযান সম্প্রসারিত করেছিল কি না। আরবে ধর্ম প্রচারের যে অনুকূল পরিবেশ ছিল খৃষ্টানরা তার সদ্ব্যবহার করেছিল কি না। মূলত খৃষ্টান ধর্মযাজকরা আরবে ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে এতটুকু শিথিলতা প্রদর্শন করেনি। কিন্তু ইয়ামনসহ সমগ্র আরবে তাদের সফলতার পরিমাণ খুবই সামান্য। আরবের বেশির ভাগ জনগোষ্ঠী তাদের পৈতৃক ধর্ম প্রতিমা পূজাকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছিল।

ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম

এ সময়ে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের উপকূল ভাগে সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার ভরা যৌবনে বিরাজ করছিল। সেসব এলাকায় ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করছিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের অন্তরে সব সময় হিংসা-বিদ্বেষের দাবানল জ্বলছিল। কারণ খৃষ্টানরাই ইহুদীদের বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বের করে দিয়েছিল। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সব সময় তারা অস্থির ছিল। পর্দার আড়ালে তারা সব সময় তৎপর থাকত যাতে খৃষ্টানরা কোথাও প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। আরবেও ইহুদীদের বসতি ছিল। ইয়ামন ও ইয়াসরিব বা মদীনায় তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপরদিকে অগ্নিপূজারীরাও সদা সতর্ক ছিল খৃষ্টধর্ম যাতে ফোরাত নদী অতিক্রম করে ইরান সীমান্তে প্রবেশ করতে না পারে। ইরানীরা খৃষ্টানদের চাইতে আরবদের অধিক ভালবাসত। কারণ আরবরাও ইরানীদের মতো প্রতিমাপূজারী ছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য অবসানের পর সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র কনষ্টান্টিনোপল বা বর্তমান ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত হয়। খৃষ্টধর্মের উপরও এর প্রতিক্রিয়া হয়।

রোমান খৃষ্টানদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়ে যায়। তারা একাধিক দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ধর্মের নানা খুঁটিনাটি ও বাহ্যিক বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে সব সময় তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, তাদের মধ্যে বাহাস চলতো হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের পরও হযরত মরিয়ম কুমারী ছিলেন কিনা। হযরত ঈসা (আ) হযরত মরিয়মের চেয়ে ভাল, না হযরত মরিয়ম হযরত ঈসার চাইতে শ্রেষ্ঠ। এ কথা স্বীকৃত বিষয় যে, কোন ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় ব্যাপারে শাস্তিক তর্ক-বিতর্ক তাদের ধর্ম-বিশ্বাসকেই দুর্বল করে ফেলে। তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ধর্মের মূলতত্ত্ব থেকে তারা অনেক দূরে সরে পড়ে। তারা বাহ্যিককে আসল মনে করে বসে। খৃষ্টানদের মধ্যে সে যুগে এই পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হয়েছিল।

সিরিয়া, হীরা (ইরাক) ও আবিসিনিয়ার খৃষ্টানরা ধর্মীয় নতুন নতুন বিষয় নিয়ে সব সময় তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত থাকত। সেসব দেশে বসবাসকারী ইহুদীরা চাইত খৃষ্টানদের এই আত্মকোন্দল যেন বন্ধ না হয়। কারণ খৃষ্টানদের সম্পর্কে ইহুদীরা অনেক আগে থেকেই হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করত। তারা বরং খৃষ্টানদের আত্মকোন্দল বাড়ানোর ব্যাপারে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে তৎপর থাকত। এদিকে আরবের পৌত্তলিকরা শীত ও গ্রীষ্ম উভয় মণ্ডলসুমেই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া, ইয়ামন ও আবিসিনিয়ায় যাতায়াত করত। তারা সেসব দেশের খৃষ্টানদের ধর্মীয় তর্ক-বিতর্ক প্রত্যক্ষ করত। এসব দেখে নিজেদের পৈতৃক ধর্ম পৌত্তলিকতার প্রতি তাদের বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হতো। কারণ ইহুদী ও খৃষ্টধর্মের মধ্যে কোনটাই আরবদের নিকট প্রাধান্য পাওয়ার ছিল না। অধিকন্তু খৃষ্টানদের ধর্মীয় কোন্দল দেখে স্বভাবতই তাদের মনে এরূপ একটা ধারণা বদ্ধমূল হতো যে, তারা এসব ধর্মীয় কোন্দলে জর্জরিত কিতাবধারীদের চেয়ে অনেক ভাল। ধর্ম নিয়ে কখনো তাদের মধ্যে বাহাস বা তর্ক-বিতর্ক হয় না।

পৌত্তলিকতার প্রতি আরবদের এই দৃঢ়তার পরিণামে তাদের সাথে যেসব ইহুদী-খৃষ্টানদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, তারাও পৌত্তলিকতায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। নাজরান ও ইয়াসরিবের (মদীনার) ইহুদী-খৃষ্টান কিতাবধারীরাও আরব মুশরিকদের মতো মূর্তিপূজা আরম্ভ করল। আরব মুশরিকদের মতো ইহুদী-খৃষ্টানরাও বলতে শুরু করল, “আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসাবে এ সব প্রতিমার পূজা অর্চনা করি।”

এ কথা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল যে, পৌত্তলিকতার প্রতি আরবদের দৃঢ়তাই শুধু প্রতিবেশী ইহুদী-খৃষ্টানদের এদিকে আকৃষ্ট করেছিল কিনা। কারণ খৃষ্টানদের পূর্বপুরুষদের ভিতরও পৌত্তলিকতা ছিল। এমনো হতে পারে যে, আরবে বসবাসকারী খৃষ্টানদের মধ্যে পৌত্তলিকতার প্রচলন তাদের পূর্বপুরুষদের ধ্যান-ধারণার প্রভাবেই ঘটেছিল। আরবের যেসব গোত্র খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের পূর্বপুরুষরাও পৌত্তলিকতার অনুসারী ছিল। এমনকি খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পরও তাদের মধ্যে পৌত্তলিকতার প্রভাব ছিল।

মিসর ও গ্রীসের পৌত্তলিকতার নিদর্শনগুলো তখনো খৃষ্টানদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। বিশেষ করে খৃষ্টানদের যেসব সম্প্রদায় আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক শিক্ষা নিকেতন ও তার দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট ছিল, তাদের মধ্যে পৌত্তলিকতার প্রবণতা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। অবশ্য খৃষ্টধর্মের প্রাথমিক যুগের তুলনায় সে যুগে আলেকজান্দ্রিয়ার পৌত্তলিকতার দর্শন অনেকটা ম্লান হয়ে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও উক্ত দর্শনের প্রভাব তখনো মানুষের মন-মানসিকতায় দিক পরিবর্তন করছিল। সে যুগে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক শিক্ষা নিকেতনটির ধ্যান-ধারণা সাধারণ মানুষকে

প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ করে রাখত। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিই সে যুগে একাধিক স্রষ্টার ধারণার প্রচার-প্রসার করত। আর এসব স্রষ্টার অনেক কথাবার্তাই মানুষের মনের সাথে মিলে যেত। ফলে সে যুগে সহজে মানুষ উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রচারকদের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে যেত। তারা একাধিক খোদার পূজা-অর্চনায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। আমার মতে দুর্বল মানুষকে এই বাতিল ধারণাই মূর্তি পূজার দিকে টেনে নিয়ে যায়। বস্তুত দুর্বল আত্মা অর্থাৎ যেসব মানুষ আধ্যাত্মিকতার নিম্নস্তরে রয়েছে, তারা সব সময় ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার জালে আটকে পড়ে। তারা মনে করে, নিরাকার সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে কোন আকারের মাধ্যম ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। এজন্যই তারা বিভিন্ন নৈসর্গিক বস্তু, চাঁদ, সুরজ, আগুন প্রভৃতির পূজা করে থাকে। তারা এসবকেই তাদের স্রষ্টা বলে মেনে নেয়। একক সত্তা বা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত তত্ত্বাবলির গভীরে পৌঁছার মতো তাদের জ্ঞান বা বোধশক্তিই নেই। মূলত দুর্বল আত্মাই জড় প্রতিমাকে খোদা বলে গ্রহণ করতে পারে। সবল আত্মার পক্ষে এসব প্রতিমাকে আল্লাহ তা'আলার আসনে বসান কিছুতেই সম্ভব নয়। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই চরম অগ্রগতির যুগেও পৌত্তলিকতার নিদর্শন পৃথিবীময় অত্যন্ত পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মানুষ এখনো এসব প্রতিমাকে স্রষ্টার আসনে অধিষ্ঠিত করাকে পুণ্যজ্ঞান করে থাকে।

যারা রোমের সেন্ট পিটার্স গির্জায় গিয়েছেন, তাদের বর্ণনা থেকে জানা গেছে, উক্ত গির্জায় রাখা সেন্ট পিটারের মূর্তিটির পা তার ভক্তদের চুমোর আঘাতে ক্ষয় হয়ে যায়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর উক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত মূর্তিটি সরিয়ে সেখানে পিটারের আর একটি নতুন মূর্তি স্থাপন করা হয়। এমনি করে একটার পর একটা মূর্তি বদল হতে থাকে। খৃস্টান সম্প্রদায়ের এই পদস্থলন বর্তমান যুগেও উপেক্ষণীয় ব্যাপার। কারণ বর্তমানে তাদের মধ্যে তো খাঁটি তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রেরণাই নেই। ভিন্ন ধর্মের অনুসারী খৃস্টানদের প্রতিবেশী যারা তাদের দেখাদেখি পৌত্তলিকতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তারা অবশ্য ক্ষমার যোগ্য। তা'ছাড়া সেকালের পৌত্তলিকতার প্রতি ঘৃণা বা কটাক্ষ করে কিই বা লাভ। কারণ এখনো তো পৃথিবীর কোন না কোন এলাকায় পৌত্তলিকতা প্রচলিত রয়েছে। এমনকি তাওহীদবাদী মুসলমানরাও আজ কোন না কোনভাবে পৌত্তলিকতায় প্রভাবিত। অথচ এই মুসলমানরাই এককালে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জিহাদ করত এবং তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা শুধু এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহরই উপাসনাকারী ছিল।

পৌত্তলিকতা

সেকালে আরবে অসংখ্য ধরনের মূর্তিপূজা হতো। বর্তমানে এসব নির্ণয় করাও সম্ভব নয়। কারণ ইসলামের আবির্ভাবের পর মহানবী (সা) এসব প্রতিমা নির্মূল করে দেন। তাঁর সাহাবাদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেখানে কোন মূর্তি দেখবে শেষ করে দেবে। ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম যুগের মুসলমানরা পৃথিবীকে প্রতিমামুক্ত করার পর এসবের নাম ও কাহিনী বর্ণনা করাও পাপ মনে করত। তাঁরা এসবের আলোচনা থেকে বিরত থাকত। অবশ্য পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াতে এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর কিছু বর্ণনায় প্রতিমার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু যে যুগের বর্ণনায় প্রতিমা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, সে

যুগের মুসলমানদের মধ্যে পৌত্তলিকতার পুনরাগমন ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। আর সেসব বর্ণনায় প্রাক-ইসলামী যুগের প্রতিমা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সে যুগে আরবরা এসব প্রতিমাকে পূত-পবিত্র মনে করত। প্রত্যেক গোত্রের পৃথক পৃথক প্রতিমা ছিল। সাধারণত এসব প্রতিমার তিনটি রূপ ছিল। এগুলো হলো সনম, ওয়াসন ও নোসাব। সনম ছিল মানুষরূপী প্রতিমা। কাঠ কিংবা কোন ধাতু দ্বারা সনম তৈরি করা হতো। ওয়াসন তৈরি হতো পাথরে খোদাই করে। নোসাব ছিল বিশেষ আকৃতির পাথর-টুকরো। অনেকটা চকমকি পাথরের মতো। তাদের বিশ্বাস ছিল, এই পাথর বা প্রতিমা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আরবের প্রতিমাগুলোর মধ্যে ইয়ামনে তৈরি প্রতিমাগুলো ছিল কারিগরি দিক থেকে অনেক উন্নতমানের। তার কারণ হিজায়, নজ্দ ও কুন্দার তুলনায় সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক থেকে ইয়ামন ছিল অনেক উন্নত। আর তাই সেখানকার কারুশিল্পও অতুলনীয় ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যেসব গ্রন্থে আরবের প্রতিমার আলোচনা রয়েছে, সেগুলোতে একমাত্র হোবল ছাড়া অন্য কোন প্রতিমার গঠন-আকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা নেই। মানুষের আকৃতির এই প্রতিমাটি ছিল আকীক পাথরের তৈরি। এটি কা'বা ঘরে রাখা হয়েছিল। একবার হোবল প্রতিমার হাত ভেঙে যায়। কুরাইশরা সোনার তার দিয়ে হাতটি বেঁধে দেয়। হোবলকে আরবের সকল প্রতিমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করা হতো। নিকট ও দূরের সকল এলাকা থেকে মানুষ হোবল প্রতিমা দর্শনে আসত এবং এর সামনে উপাসনার সকল নিয়ম-কানুন পালন করত। হোবল ছাড়া ছোট ছোট আরো কয়েকটি দেব-মূর্তিরও উপাসনা করা হতো। এসব প্রতিমা ঘরেও রাখা হতো। মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় এবং বাইরে থেকে ঘরে ঢুকেই এসব প্রতিমাকে দর্শন দিত। সফরে যাওয়ার সময় এসবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করত। এরপর সঙ্গে করে নিয়ে যেত। এসব প্রতিমা কা'বা ঘরে রাখা হতো। আরবের অন্যান্য শহর এবং বিভিন্ন যাযাবর গোত্রেও এগুলো রাখা হতো। প্রতিমাপূজারীরা সাধারণত বলত, এসব প্রতিমা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম বা উপকরণ মাত্র। কিন্তু আসলে তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভুলে গিয়ে এসব প্রতিমাকেই চরম ও পরম জ্ঞান করে বসেছিল।

মক্কার গুরুত্ব

সভ্যতা-সংস্কৃতি, শস্য-শ্যামলতা ও ব্যাপক সেচ ব্যবস্থার দরুন সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইয়ামন ছিল বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তা সত্ত্বেও আরবের মরুভূমিতে বসবাসকারী যাযাবররা ইয়ামনবাসীর এই সৌভাগ্যের প্রতি এতটুকু ঈর্ষা পোষণ করত না। এমনকি ইয়ামনের আকাশচুম্বী উপাসনালয়গুলো যিয়ারত করার প্রতিও তারা আগ্রহী ছিল না। তাতে তারা কোনও প্রকার গর্বও অনুভব করত না। আরবের গাছপালা তরুলতাহীন উপত্যকার মক্কা নামের জনপদটিই ছিল তাদের তীর্থভূমি। মক্কা জনপদে হযরত ইসমাইল (আ) ও তাঁর পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) হাজীদের যিয়ারতের জন্য যে ঘর নির্মাণ করেছিলেন, সেটাই ছিল তাদের নিকট সবচাইতে প্রিয়। সে ঘর যিয়ারতের জন্য তারা অধীর থাকত। সেখানে পৌঁছার জন্য তারা সব সময় ব্যাকুল থাকত। বিশেষ করে বছরের যে চার মাসে তারা পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ মনে করত এবং এগুলোকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মীয়

১. যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব।

সফরের মাস হিসাবে গণ্য করত, সে সময় তারা মক্কায় পৌঁছার জন্য ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পড়ত। পবিত্র মক্কার এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই আল্লাহ তা'আলা একে মহানবী (সা)-এর জন্মভূমি হিসাবে নির্বাচন করেন। এর পিছনে আল্লাহ তা'আলার এ উদ্দেশ্যও ছিল যে, তাতে এই শহর শুধু আরবদেরই নয়, প্রতিটি দেশের অধিবাসীদের জন্যই আকর্ষণীয় হিসাবে বিরাজ করবে। এই শহরের কা'বা ঘর চিরদিন মানুষের নিকট পবিত্র হয়ে থাকবে। বস্তুত মক্কা নগরী ও পবিত্র কা'বা ঘরের শ্রেষ্ঠত্বের দরুন কুরাইশরাও উঁচু মর্যাদা লাভ করে। অথচ মহানবী (সা)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত কুরাইশদের প্রাচীন সরল জীবনযাপন পদ্ধতি ও যাযাবর জীবনধারার মধ্যে কোনো পার্থক্য সূচিত হয়নি। তখনো তারা যুগ যুগ থেকে চলে আসা প্রাচীন জীবনধারাতেই অভ্যস্ত ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মক্কা, কাবা ও কুরাইশ

মক্কার ভৌগোলিক অবস্থান

লোহিত সাগরের পূর্ব দিকে অবস্থিত মহাসড়কের ধার দিয়ে ইয়ামন ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী এলাকায় ছোট ছোট পর্বতমালা রয়েছে। সাগর থেকে ৮০ কিলোমিটার বা ৫০ মাইল দূরে ইয়ামন, জিদ্দা ও ফিলিস্তিন সড়কপথের সংগমস্থলে সে সব পর্বতমালার একটি উপত্যকা রয়েছে। এই উপত্যকায়ই পবিত্র মক্কা নগরী অবস্থিত। এই জনপদ কবে গড়ে উঠেছিল, সঠিক বলা মুশকিল। আনুমানিক কয়েক হাজার বছর আগে এখানে জনবসতি গড়ে ওঠে। তার আগে ইয়ামন ও ফিলিস্তিনে যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলাগুলো এখানে এসে যাত্রাবিরতি করত। এখানে প্রচুর মিষ্টি ও ঠাণ্ডা পানির ঝর্ণা রয়েছে। আর তাই বিভিন্ন বাণিজ্য কাফেলা এখানে এসে যাত্রা বিরতি করে সফরের ক্লান্তি দূর করত। সবার আগে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ) মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এর আগে পবিত্র মক্কা, ইয়ামন ও ফিলিস্তিনে যাতায়াতকারী বণিকদের পণ্য বিনিময় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

হযরত ইবরাহীম (আ)

হযরত ইসমাইল (আ)-এর স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের আগ পর্যন্ত পবিত্র মক্কার সঠিক ও বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। সম্ভবত তাঁর আসার আগেই এই স্থানটি মানুষের উপাসনা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। হযরত ইসমাইল (আ)-এর মক্কা আগমন সম্পর্কে কিছু বলার আগে তাঁর পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

হযরত ইবরাহীম (আ) ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন মিস্ত্রি বা কারিগর। তিনি কাঠের মূর্তি বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বড় হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) পিতার এই পেশা দেখে বিস্মিত হন। তিনি দেখেন মানুষ তাঁর পিতার তৈরি কাঠের মূর্তিকে ভক্তি-শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। হযরত ইবরাহীম (আ) এসব দেখে ভাবতে থাকেন। তিনি ভাবেন এসব কি হচ্ছে। প্রথমে তিনি পিতাকেই জিজ্ঞেস করে বসেন, আপনি যেসব মূর্তি বানিয়ে বিক্রি করছেন, এগুলো আবার স্রষ্টার মর্যাদা কি করে লাভ করে? পিতা শত বুঝিয়েও এ ব্যাপারে ছেলেকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। এরপর হযরত ইবরাহীম (আ) এসব মূর্তির পূজারীদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তারাও তাঁকে ব্যাপারটা বোঝাতে পারল না। এ অবস্থা দেখে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন। ছেলের এসব কথাবার্তায় তিনি তাঁর কারখানা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলেন। এজন্য তিনি ছেলেকে আরো

বোঝানোর চেষ্টা করেন। এসব কথা বলতে বারণ করেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন নির্ভুল অভিমতের অধিকারী এবং নিজের চিন্তাধারা অন্যদের বোঝানোর যোগ্যতাও তাঁর মধ্যে ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) এক দিন মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে মন্দিরে ঢুকে পড়েন। তিনি মন্দিরের বড় মূর্তিটি ছাড়া সবগুলো তছনছ করে ফেলেন। এই কাজ কে করেছে মানুষ তা সহজেই বুঝতে পেরেছিল। একদিন জনতার সামনে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো : **أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَتْنَا يَا بُرْهِيمُ :** -তুমিই কি আমাদের প্রভুদের সাথে এই ব্যবহার করেছ? (২১ : ৬২)

তিনি বললেন :

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ .

“সে বলল, তাদের এই প্রধানই তো এটা করেছে, তাদের জিজ্ঞেস করে দেখ না, যদি তারা কথা বলতে পারে।” (২১ : ৬৩)

হযরত ইবরাহীম (আ) পৌত্তলিকদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পর উপরোক্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি কি ধরনের চিন্তা-ভাবনা করতেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي . فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأُفْلِينَ .

এরপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল, তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, ‘ইহাই’ আমার প্রতিপালক। এরপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন সে বলল, ‘যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।’ (৬ : ৭৬)

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي . فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ . فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ . فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ . إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

“এরপর যখন সে চাঁদ উদিত হতে দেখল, তখন বলল, ‘ইহা আমার প্রতিপালক। যখন তাও অস্তমিত হলো, তখন সে বলল, ‘আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হব। এরপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল, তখন সে বলল, ‘ইহা আমার প্রতিপালক’; ইহা সবচাইতে বড়’। যখন এটাও অস্তমিত হলো, তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক কর আমি তা থেকে নির্লিপ্ত। ‘আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি-যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।’ (৬ : ৭৭-৭৯)

মিসরে হযরত ইবরাহীম (আ) ও বিবি সারা

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর কওমকে সৎপথে আনতে পারলেন না। উল্টো তারা তাঁর উপর ক্ষেপে যায়। নতুন বা সত্য ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের অপরাধে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কওম তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা আগুনের কুণ্ড তৈরি করে তাতে তাঁকে ফেলে দেয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীমকে এই আগুন থেকে রক্ষা করেন।

হযরত ইবরাহীম (আ) মাতৃভূমি ইরাকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি স্ত্রী সারাকে নিয়ে ফিলিস্তিনের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করেন। সেখান থেকে মিসরে যান। এ সময়ে মিসরের শাসন-ক্ষমতায় ছিল আমালেকা গোত্র। কোনও সুন্দরী মহিলা তাদের পাশবিক অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতো না। তারা প্রজাদের সুন্দরী স্ত্রীদের ছিনিয়ে নিত এবং নিজেদের হেরেমে আটকে রাখত। হযরত ইবরাহীমের স্ত্রী সারা বেশ সুন্দরী ছিলেন। হযরত ইবরাহীম ভাবলেন, আমালেকা-বাদশাহ্ হয়তো আমার সাথেও এমনি ব্যবহার করতে পারে। সারাকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে হত্যা করে ফেলতে পারে। এই আশংকা করে তিনি সারাকে নিজের বোন বলে পরিচয় দিলেন। কিন্তু বাদশাহ্ তাতেও নিজের ঘৃণ্য সংকল্প থেকে বিরত রইলেন না। সারা বিবিকে নিজের মহলে ডেকে পাঠালেন।

বাদশাহ্ সেদিন রাতেই স্বপ্নে দেখেন সারা বিবির স্বামী রয়েছে। তিনি বিবাহিতা। এই স্বপ্ন দেখে বাদশাহ্ ঘাবড়ে যান। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানাপ্রকার উপঢৌকন প্রদান করেন। এসব উপঢৌকনের মধ্যে বাদশাহ্‌র এক মেয়েও ছিলেন। তাঁর নাম ছিল হাজেরা। এদিকে দীর্ঘ দিন হযরত সারার গর্ভে কোনও সন্তান হচ্ছিল না। তিনি স্বামী হযরত ইবরাহীম (আ)-কে অনুরোধ করলেন, আপনি হাজেরাকে বিয়ে করে নিন। হযরত ইবরাহীম প্রথমা স্ত্রী হযরত সারার অনুরোধে হাজেরাকে বিয়ে করেন। হযরত হাজেরার ঘরে হযরত ইসমাইল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলার কী অপার মহিমা! হযরত সারাও গর্ভবতী হন। তাঁর ঘরে হযরত ইসহাক জন্মগ্রহণ করেন।

কোরবানী সম্পর্কে যেসব বর্ণনা রয়েছে, তাতে মতভেদ রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাইল (আ)-কে যে কোরবানী দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, এটা কি হযরত ইসহাকের জন্মের আগে হয়েছিল, না পরে। এই পদক্ষেপ কি ফিলিস্তিনে নেয়া হয়েছিল, না হিজায়ে। ইহুদী ঐতিহাসিকদের মতে কোরবানীর জন্য মনোনীত হয়েছিলেন হযরত ইসহাক। আর এই ঘটনা হিজায়ে নয়, ফিলিস্তিনে সংঘটিত হয়েছিল। অবশ্য এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। তবু সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, শেখ আবদুল ওহাব নাজ্জার তাঁর 'কাসাসুল আশ্বিয়া' শীর্ষক গ্রন্থে হযরত ইসমাইল (আ) কোরবানীর জন্য মনোনীত ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর অভিমতের সমর্থনে তাওরাতের একটি ভাষ্য উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে : “কোরবানীর জন্য মনোনীত ছিলেন হযরত ইবরাহীমের একমাত্র সন্তান।” আর এ কথা স্পষ্ট যে, হযরত ইসহাকের জন্মের আগে হযরত ইসমাইলই ছিলেন হযরত ইবরাহীমের একমাত্র সন্তান। হযরত ইসহাকের জন্ম হয় পরে। সুতরাং তিনি কি করে হযরত ইবরাহীমের 'একমাত্র সন্তান' হতে পারেন? এ সূত্র থেকে এ

কথাই প্রমাণিত হয় যে, কোরবানীর ঘটনার সাথে হযরত ইসমাইলই জড়িত ছিলেন। যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোরবানীর জন্য হযরত ইসহাক মনোনীত ছিলেন, তা'হলে এই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করে নিতে হবে যে, কোরবানীর ঘটনা ফিলিস্তিনে সংঘটিত হয়েছিল। কারণ হযরত ইসহাক তাঁর মায়ের সাথে ফিলিস্তিনে ছিলেন, কখনো সময় হিজাযে আসেননি। আর যদি কোরবানীর স্থান মিনায় স্বীকার করে নেয়া হয়, তা'হলে অবশ্যই হযরত ইসমাইলকে কোরবানীর জন্য মনোনয়ন মেনে নিতে হবে। পবিত্র কোরআনে কোরবানীর জন্য মনোনীতের নাম স্পষ্ট বলা হয়নি। আর তাই ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।”

কোরআনে কোরবানীর ঘটনা

হযরত ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে দেখেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজের ছেলে কোরবানী করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং হযরত ইবরাহীম ছেলে হযরত ইসমাইল (আ)-কে নিয়ে সকালে তাঁরু থেকে বেরিয়ে পড়েন। পবিত্র কোরআনে এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَىٰ اِنِّى اَرَىٰ فِى الْمَنَامِ اَنِّى اَذْبَحُكَ
فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ - قَالَ يَآبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ
الصّٰبِرِيْنَ . فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ . وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّابْرٰهِيْمُ . قَدْ
صَدَّقْتَ الرُّءْىَ يَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ . اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰۤءُ الْمُبِيْنُ .
وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيْمٍ .

“অতঃপর যখন সে তার পিতার সাথে কাজ করার মতো বয়সে পৌঁছল, ইবরাহীম তাকে বলল, ‘বৎস ! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে যবাই করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল।’ সে বলল, ‘হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।’ যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার ছেলেকে যবাই করার জন্য কাত করে শায়িত করল, তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, ‘হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যি পালন করলে। আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা এবং আমি তার পরিবর্তে কোরবানীর জন্য এক হৃষ্টপুষ্ট জন্তু দিলাম।” (৩৭ : ১০২-১০৭)

ঐতিহাসিক বর্ণনার আলোকে কোরবানী

ইতিহাসে এই ঘটনা সম্পর্কে যেসব বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোতে কবি-কল্পনার সাহায্য নেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মক্কাবাসীদের প্রকাশভঙ্গি কখনো এরূপ ছিল না। মূল ঘটনার সাথে এসব বর্ণনার খুব একটা সম্পর্ক নেই বললেই চলে। তবু আমি এখানে সেসব বর্ণনার প্রতি কিছু ইঙ্গিত করছি।

আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নযোগে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর ছেলেকে যবাই করার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর ছেলেকে বলেন, ‘হে বৎস! দড়ি ও ছুরি নিয়ে

চলো। আমরা বনে কাঠ কাটতে যাব। পিতা-পুত্র বনের দিকে যাচ্ছিলেন। শয়তান হযরত ইসমাইল (আ)-এর মায়ের নিকট এসে কাঁদতে শুরু করে এবং বলে, ‘বেগম সাহেব! আপনি কি জানেন, আপনার কলিজার টুকরোকে ইবরাহীম কোথায় নিয়ে গেছেন? হযরত হাজেরা বললেন, “তারা জ্বালানি কাঠ কাটার জন্য বনে গেছেন।” ইবলীস বলল, ‘আপনাকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। ইবরাহীম তো আপনার ছেলেকে যবাই করার জন্য নিয়ে গেছেন।’ হযরত হাজেরা বললেন, “তিনি তো ইসমাইলের দয়ালু পিতা। তিনি এরূপ কাজ করতে পারেন না।’ এবার সে বলল, “ইবরাহীম একটি বিভ্রান্তির শিকার হয়ে এই কাজ করতে গেছেন। সে ধারণা করেছে, আল্লাহ তাঁকে ইসমাইলকে যবাই করার নির্দেশ দিয়েছেন।” হযরত হাজেরা বললেন, “আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ হলে তো তাঁকে তা পালন করতেই হবে।” হযরত হাজেরার এই মন্তব্য শুনে শয়তান বিফল হয়ে ফিরে যায়।

এবার শয়তান হযরত ইসমাইল (আ)-এর পিছনে লাগে। সে তাঁর নিকটও একই ধরনের কথা বলে। হযরত ইসমাইল (আ)-ও শয়তানের কথায় কান দিলেন না। অগত্যা শয়তান হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করে। সে বলে, ‘হযরত! আপনার স্বপ্নাদেশ আল্লাহর তরফ থেকে হয়নি। এটা শয়তানের ওয়াসওয়াসা। আপনার চোখের মণিকে যবাই করার পর আপনাকে অনুতপ্ত হতে হবে। সময় চলে গেলে কিছু করার থাকবে না। এখনো সময় আছে, আপনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন।’ শয়তানের এসব কথা শুনে হযরত ইবরাহীম ‘লা হাওলা’ পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে শয়তান পালিয়ে যায়। পাপিষ্ঠ শয়তান মা, ছেলে ও পিতা কাউকে নিজের ফাঁদে ফেলতে না পেরে ব্যর্থ হয়ে চলে যায়।

এই কবিসুলভ কল্পনার আর একটা অংশ লক্ষ্য করা যায়। তা হলো, ছেলে অনুরোধ করলেন, ‘হে পিতা! যবাই করার সময় আমার হাত-পা বেঁধে নিন। না হয় রক্তছটা আপনার শরীরে লাগতে পারে। তাতে আমার নেকী কমে যাবে। হে আমার দয়ালু পিতা! আপনিও জানেন মৃত্যু অত্যন্ত তিক্ত ব্যাপার। আপনি ছুরিটা খুব ভাল করে ধার দিয়ে নিন, যাতে কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। হে আমার দয়ালু পিতা! পিতার স্নেহ-মমতা পুত্রের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্বল। আর এটা হচ্ছে স্বয়ং পিতার হাতে পুত্রের যবাই। আপনি যবাই করার সময় আমাকে চিত করে শোয়ালে আমার মুখ দেখে হযরত আপনি স্থির থাকতে পারবেন না। তাতে করে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ পালন করা সম্ভব নাও হতে পারে। আপনি আমাকে উপুড় করে শুইয়ে দিন। তখন আর আপনি আমার মুখ দেখতে পাবেন না। আমার জামাটা আমার মাকে দেবেন। এটা আমার স্মৃতি হিসাবে দেখে তিনি সান্ত্বনা লাভ করতে পারবেন।’ ছেলে হযরত ইসমাইল (আ)-এর এসব কথা শুনে হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, ‘হে বৎস! আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য অনুপম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে তুমি আমাকে সাহায্য করছ।’ এরপর হযরত ইবরাহীম (আ) ছেলেকে উপুড় করে শুইয়ে দেন এবং তাঁর গলায় ছুরি রাখেন। অমনি আল্লাহর গায়েবী আওয়ায ধ্বনিত হয়, “হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছ।” এরপর আল্লাহর কুদরতে একটি মোটাতাজা ভেড়া উপস্থিত করা হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) ছেলের পরিবর্তে ভেড়াটি যবাই করেন। এ হলো কোরবানী ও যবাইর ঘটনা। এই ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদে তাঁর প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের শিক্ষা দিয়েছেন।

স্ত্রী-পুত্র নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মক্কা গমন

হযরত ইসমাইল ও ইসহাক (আ)-কে হযরত ইবরাহীম (আ) সমভাবে আদর-যত্ন করতেন। হযরত ইসহাকের আপন মা সারা বিবি এটা সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর সেবিকা হাজেরার ছেলে হচ্ছে হযরত ইসমাইল (আ)। সুতরাং তিনি হযরত ইসহাক (আ)-এর সমান আদর-যত্ন পেতে পারেন না। এরই মধ্যে আবার হযরত ইসমাইল (আ) হযরত ইসহাক (আ)-কে চপেটাঘাত করেন। হযরত সারা আগে থেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই ঘটনার পর সারা বিবি কসম খেয়ে বসেন যে, তিনি হাজেরার সাথে একসঙ্গে বসবাস করবেন না। হযরত ইবরাহীম (আ) পারিবারিক জীবনে এক তিক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তিনি হযরত ইসমাইল ও হাজেরা বিবিকে নিয়ে সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে রওনা দেন। বর্তমান মক্কা উপত্যকায় পৌঁছে তিনি যাত্রাবিরতি করেন। এখানে সে সময় কোনও স্থায়ী জনবসতি ছিল না। ইয়ামন ও সিরিয়ায় যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলাগুলো সফরের ক্লান্তি দূর করার জন্য সাময়িকভাবে কিছু সময় অবস্থান করত। তাদের চলে যাওয়ার পর আবার এই উপত্যকা জনমানবশূন্য হয়ে পড়ত। এখানে হযরত হাজেরা একটি ঝুপড়ি তৈরি করেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁদের জন্য যা কিছু জীবনোপকরণ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলো হযরত হাজেরাকে দিয়ে ফিরে চলে আসেন। এই সামান্য খাদ্যবস্তু ও পানি খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। হযরত হাজেরা খাবার ও পানির সন্ধানে চারদিকে ঘোরাফেরা করেন। এমনকি তিনি উপত্যকার অপর প্রান্তেও চলে যান। তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপত্যকায় সাত বার ছুটাছুটি করেন। কোথাও এক ফোঁটা পানিও দেখা গেল না। অবশেষে নিরাশ হয়ে তিনি তাঁর কচি ছেলেকে দেখার জন্য ফিরে আসেন। ছেলের কাছে ফিরে এসে তিনি দেখতে পান শিশু ইসমাইল (আ) তাঁর পা দিয়ে মাটি ঘষছেন। তাঁর পায়ের গোড়ালি পানিতে ডুবে আছে। আর একটু সামনে এগিয়ে তিনি আরো বেশি পরিমাণ পানি দেখতে পান। তিনি ইসমাইলকে এই পানি পান করান এবং নিজেও পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এরপর পানি যাতে বালুরাশি টেনে নিতে না পারে তার জন্য তিনি জলাধারটির চারদিকে বাঁধ দিয়ে দেন। এ সময় থেকে হযরত হাজেরা এখানে সাময়িক অবস্থানকারী বাণিজ্য কাফেলার নিকট থেকে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে রাখতেন। আর একটি কাফেলা আসা পর্যন্ত তিনি এসব খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করতেন।

আবে যমযম

যমযম কূপ বেরিয়ে পড়ার পর মক্কা উপত্যকা আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আরবের কোন কোন গোত্র এসে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আসে জোরহাম গোত্র। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইসমাইল (আ) ও তাঁর মাতা হাজেরা আসার আগেই জোরহাম গোত্র মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করত। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যমযম কূপ বের হওয়ার পরই জোরহাম গোত্র এখানে আসে এবং স্থায়ী বসবাস গড়ে তোলে।

১. হযরত ইসমাইল (আ) ও তাঁর মা সর্বপ্রথম পবিত্র মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন, না জোরহাম গোত্র -- এ সম্পর্কে বোখারী শরীফের একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। তাতে বলা হয়েছে,

হযরত ইসমাইল (আ)-এর বিবাহ

হযরত ইসমাইল (আ) যুবক হওয়ার পর জোরহাম গোত্রেই বিয়ে করেন। তিনি জোরহাম গোত্রের সাথেই বসবাস করতে থাকেন। তাঁর বাসস্থানের আশেপাশে জনবসতি বাড়তে থাকে। বিভিন্ন এলাকা থেকে আরো একাধিক গোত্র এসে বসতি গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে এই জনপদই মক্কা নামে অভিহিত হয়।

এদিকে হযরত ইবরাহীম (আ) একদিন সারা বিবির কাছে হাজেরা ও পুত্র ইসমাইল (আ)-কে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সারা এ ব্যাপারে বাধা দেয়াটা সঙ্গত মনে করেননি। হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্র ও স্ত্রীকে দেখার জন্য পবিত্র মক্কায় এসে পৌঁছান। এ সময় হযরত ইসমাইল (আ) বাড়িতে ছিলেন না। হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাইল (আ)-এর স্ত্রীর নিকট তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। স্ত্রী বলেন, তাঁর স্বামী তাঁদের খাবার সংগ্রহের জন্য শিকারে গেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁকে কিছু খাবার দেয়ার জন্য হযরত ইসমাইল (আ)-এর স্ত্রীকে বলেন। মহিলা বললেন, “আমাদের ঘরে খাবার জন্য কোনও কিছু নেই।” অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমার স্বামী ঘরে ফিরলে তাঁকে আমার সালাম বলবে। আর বলবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ বদলে ফেলে। ছেলের উদ্দেশে এই উপদেশ দিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) চলে যান। হযরত ইসমাইল (আ) বাড়িতে ফিরলে তাঁর স্ত্রী পুরো ঘটনা খুলে বলেন। সব কথা শুনে ইসমাইল (আ) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন।

এরপর হযরত ইসমাইল (আ) জোরহাম গোত্রেই দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এই স্ত্রী ছিলেন মুযায ইবনে আমরের কন্যা। এই স্ত্রীর আমলে হযরত ইবরাহীম (আ) পুনরায় মক্কায় আগমন করেন। এবারও হযরত ইসমাইল বাড়ি ছিলেন না। হযরত ইবরাহীম এই স্ত্রীর সাথেও অপরিচিতের মতো কথাবার্তা বলেন। হযরত ইসমাইলের স্ত্রী অত্যন্ত সম্মান ও আদর-যত্নের সাথে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে অভ্যর্থনা জানান। তিনি যাওয়ার সময় বলে যান, “তোমার স্বামীকে আমার সালাম দেবে। আর বলবে, এবার যেন তার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখে।” হযরত ইসমাইল (আ) বাড়ি ফিরলে স্ত্রী সব ঘটনা খুলে বললেন। হযরত ইসমাইল (আ) বললেন, তিনি আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) আর তুমি হচ্ছে আমার দরজার চৌকাঠ। আমার পিতা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে আমার স্ত্রী হিসাবে রাখার জন্য।

হযরত ইসমাইল (আ)-এর দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে বারোটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এসব সন্তান তাদের পিতার দিক থেকে বহিরাগত আরব হিসাবে পরিচিত। তাদের মায়ের পূর্বপুরুষ ছিলেন

“হযরত ইসমাইলের মা যখন ছেলেকে নিয়ে মক্কায় বসবাস শুরু করেন, তখন সেখানে কোনও জনবসতি কিংবা পানি ছিল না।” -অনুবাদক

১. বোখারী শরীফের “কিতাবুল আশ্বিয়ায়” বলা হয়েছে : “হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর ছেলের দ্বিতীয় স্ত্রীকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা অত্যন্ত ভাল, সচ্ছল জীবন যাপন করছি। আল্লাহ আমাদের খুব ভাল অবস্থায় রেখেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, খাওয়ার জন্য কি পাওয়া যায়? মহিলা বললেন, মাংস। বললেন, পান করার জন্য? মহিলা বললেন, পানি। এই কথা শুনে হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি তাদের খাবার ও পানিতে বরকত দান কর।”

-অনুবাদক

ইয়ারব ইবনে কাহ্তান। এ দিক থেকে হযরত ইসমাইল (আ)-এর সন্তানরা মূল বা খাঁটি আরব নামেও অভিহিত ছিলেন। হযরত ইসমাইল (আ) মায়ের দিক থেকে মিসরীয় ছিলেন। আর পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) ইরাক ও ফিলিস্তিনের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেন। এদিক থেকে হযরত ইসমাইল (আ)-কে পিতার আবাসভূমির লোক হিসাবেও গণ্য করা যায়।

বর্ণনারাজির বৈপরীত্য

ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর ছেলে হযরত ইসমাইল (আ)-কে নিয়ে মক্কায় এসেছিলেন। এখানে হযরত ইসমাইল (আ) স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ঘটনার খুঁটিনাটি ব্যাপারে গবেষক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। গবেষকরা বলছেন, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর স্ত্রী হাজেরা এবং ছেলে হযরত ইসমাইল (আ)-কে নিয়ে বর্তমান মক্কায় আসেন। এখানে আগে থেকেই কয়েকটি পানির উৎস বা জলাধার ছিল। জোরহাম গোত্রের লোকেরা এসব জলাধারের আশেপাশে বসবাস করছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) সেখানে পৌঁছলে তারা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। তারা হাজেরার সাথে ভাল ব্যবহার করে। হযরত ইসমাইল (আ) যৌবনে পদার্পণ করলে জোরহাম গোত্রের এক মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। এই স্ত্রীর ঘরে হযরত ইসমাইল (আ)-এর কয়েকটি সন্তান হয়। দাদা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দিক থেকে তাদের মধ্যে ছিল ইবরানী বা ইহুদী রক্ত এবং দাদী অর্থাৎ হযরত ইসমাইল (রা)-এর মা ছিলেন মিসরীয়। এদিক থেকে তাদের ধমনীতে মিসরীয় রক্তও প্রবাহিত ছিল। আর হযরত ইসমাইল (আ)-এর আরব স্ত্রীর রক্তের সাথে উক্ত দুই জাতির রক্তের সংমিশ্রণের ফলে তাঁর সন্তানদের চরিত্রে অসাধারণ বীরত্ব, সাহস ও শক্তিমত্তার সমাবেশ ঘটে। হযরত ইসমাইল (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে আরব, ইরানী ও মিসরীয় বৈশিষ্ট্যের এক অভূতপূর্ব সমাহার দেখা যায়। এ গবেষকদের মতে হযরত হাজেরার সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো, যমযম কূপের সন্ধান এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যেসব বর্ণনা রয়েছে এগুলোর কোনও ভিত্তি নেই।

স্যার উইলিয়াম ম্যুরের মতে হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাইল (আ) কখনো হিজায়েই যাননি। তাঁদের হিজায় সফর সম্পর্কিত যেসব বর্ণনা রয়েছে, এগুলো সবই ভিত্তিহীন। ইসলামের আবির্ভাবের কয়েক শ' বছর আগে ইহুদীরা এসব মনগড়া কাহিনী তৈরি করেছে। এসব কাহিনী বানানোর পিছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আরবদের সাথে তাদের রক্তের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ হযরত ইসহাক হচ্ছেন ইহুদীদের পূর্বপুরুষ। তাতে করে আরবদের সাথে ইহুদীদের রক্ত-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এমতাবস্থায় ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক আরবদের নৈতিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। তাতে আরবে ইহুদীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথও সুগম হয়। এই প্রতিবেদনের পর স্যার উইলিয়াম ম্যুর আরো বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপাসনা পদ্ধতি আরবদের উপাসনা পদ্ধতির চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কারণ আরবরা ছিল পৌত্তলিক আর হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন এক আল্লাহর উপাসক।

আমাদের মতে একটি 'ইতিহাস স্বীকৃত' ঘটনাকে এই বলে অস্বীকার করা যায় না যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ)-এর ইন্তেকালের শত শত বছর পর আরবদের পৌত্তলিকে পরিণত হওয়াই প্রমাণ করছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আমলেও

আরবরা পৌত্তলিক ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন হযরত ইসমাইল (আ)-কে নিয়ে হিজাযে আসেন, তখন সেখানকার অধিবাসীরা মূর্তিপূজা করত। তা'ছাড়া এ কথা যদি মেনেও নেয়া হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আমলে আরবরা পৌত্তলিক ছিল, তাতেও এটা স্যার উইলিয়াম ম্যুরের অভিমতের সহায়ক হতে পারে না। কারণ সে আমলে ইরাকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কওমও মূর্তিপূজা করত। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পৌত্তলিকতার পথ থেকে ফিরিয়ে তাওহীদের পথে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথা শোনেনি। অনুরূপ হিজাযে এসেও তিনি একই অবস্থা দেখেন। এখানেও তাদের তাওহীদের প্রতি আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয় না। এমতাবস্থায় এখানে এমন কি তথ্য পাওয়া গেল, যাতে বোঝা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) হিজাযে যাননি ! অধিকন্তু মুক্তবুদ্ধি ও সঠিক বর্ণনারাজি ম্যুরের ধারণা প্রত্যাখ্যান করছে এবং আমাদের অভিমতই সমর্থন করছে।

হযরত ইবরাহীম (আ) ইরাক থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। প্রথমে তিনি ফিলিস্তিন পৌছান। সেখান থেকে মিসরে যান। মিসর থেকে আবার ফিলিস্তিনে আসেন। সেকালে ফিলিস্তিন ও মক্কার মধ্যে বাণিজ্য কাফেলার যাতায়াত ছিল। এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে, তিনি হযরত ইসমাইল ও তাঁর মা হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে কোন বাণিজ্য কাফেলার সাথে মক্কায় পৌছান। তাছাড়া ঐতিহাসিকরাও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মক্কা সফর সম্পর্কে একমত পোষণ করেন। এজন্য শুধু ব্যক্তি বিশেষদের অনুমান ভিত্তিক অভিমত নির্ভর করে এই তথ্য কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

স্যার উইলিয়াম ম্যুর ও তাঁর সমমনারা এ কথাও লিখেছেন যে, “হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাইলের ইন্তেকালের পর তাঁদের বংশধররা ফিলিস্তিন থেকে হিজাযে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাতে করে তাঁদের বংশধরদের মধ্যে হিজায ও ইরাকী রক্তধারার মিশ্রণ ঘটে।”

আমাদের কথা হলো, হযরত ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ)-এর বংশধরদের যদি হিজাযে এসে বসতি স্থাপন করা সম্ভব হয়ে থাকে, তবে তাঁদের আসার পিছনে এমন কী প্রতিবন্ধকতা ছিল ? অথচ ইতিহাসও তাঁদের হিজাযে আসা সম্পর্কে সমর্থন করেছে। পবিত্র কোরআনের সাথে সাথে অন্যান্য আসমানী কিতাবও এই ঘটনার প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর চোখের মণি হযরত ইসমাইল (আ)-কে নিয়ে পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ করেছেন। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ . فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ - وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا .

“মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর তৈরি করা হয়েছিল, তা তো বাক্কায় (মক্কায়), তা আশিসপ্রাপ্ত ও বিশ্বজগতের দিশারী। তাতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, যেমন ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থান এবং যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ।” (৩ : ৯৬-৯৭)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا - وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى - وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ

وَالْعَافِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ . وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا
وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ - قَالَ وَمَنْ
كَفَرَ فَاَمَتُّعْهُ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ - وَبَشِّرِ الْمَصِيْرُ . وَ اِذْ
يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمٰعِيْلُ - رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا - اِنَّكَ اَنْتَ
السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

“এবং সে সময়কে স্মরণ কর যখন কা'বা ঘরকে মানবজাতির মিলনক্ষেত্র ও নিরাপত্তা স্থল করেছিলাম। এবং বলেছিলাম তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।” এবং ইবরাহীম ও ইসমাইলকে আমার ঘরে তাওয়াফকারী, এতেকাফকারী, রুকু ও সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম। স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এটিকে নিরাপদ শহর কর। আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করবে, তাদের পানাহার করতে দাও।’ তিনি বললেন, ‘যে কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করবে, তাকেও কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দেব। অতঃপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব এবং তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম।’ যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল কাবা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিল, তখন তারা বলেছিল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। (২ : ১২৫-১২৭)

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কাবাঘর নির্মাণের পিছনে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, একত্ববাদে বিশ্বাসী মানুষ এই ঘরের ঘিয়ারতে আসবে। তারা এখানে কয়েক দিন অবস্থান করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'আলার এই ঘর কিরূপে পৌত্তলিকতার কেন্দ্রে পরিণত হলো? তাতে কিভাবে প্রকাশ্যে মূর্তিপূজা শুরু হলো? হযরত ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ)-এর ইন্তেকালের পর কাবাঘরে কোন্ পথে এই কুপ্রথার অনুপ্রবেশ ঘটল? দুঃখের বিষয়, এসব প্রশ্নের সমাধানে ইতিহাস আমাদের কোনও সাহায্য করতে পারছে না। কেউ কেউ এই পরিবর্তনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কিছু মনগড়া তথ্য আবিষ্কার করেছেন। আর সেসবের আলোকে এসব প্রশ্নের সমাধান করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন।

আরবে নক্ষত্রপূজা

সেকালে আরবে নক্ষত্রপূজা খুব জোরেশোরে চলছিল। নক্ষত্রপূজার কারণ হিসাবে তারা বলত, ‘আল্লাহর উপাসনাই আমাদের পরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কিন্তু আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের সবচাইতে বড় নিদর্শন হচ্ছে নক্ষত্ররাজি। তাই এসবের সম্মান করা আবশ্যিক। সুতরাং আমরা এসবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছি।’ কিন্তু সাধারণ মানুষ যাদের জ্ঞান ও অনুভূতিশক্তি স্রষ্টার মহাত্ম্য অনুধাবনে সক্ষম ছিল না, তারা ধীরে ধীরে নক্ষত্ররাজিকে আল্লাহর সমতুল্য জ্ঞানে পূজা করা আরম্ভ করে।

পরবর্তীকালে তারা মাঝে-মধ্যে চকমকি পাথর দেখে মনে করত, এসব পাথর আসমানের নক্ষত্ররাজির কাছ থেকে ফেলা হয়েছে। এই ধারণার ফলশ্রুতি হিসাবে তারা নক্ষত্ররাজির পরিবর্তে এবার পাথরপূজা আরম্ভ করে। এরপর তাদের এই ধারণা আরো এগিয়ে যায়। তারা এত দিন কাবাঘরে রাখা কালো পাথরকে সম্মানসূচক চুমো দিত। কিন্তু এখন তারা কাবাঘরের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাথর কুড়িয়ে সাদরে সাথে করে নিয়ে যাওয়া শুরু করে। প্রত্যেক কাজের শুরুতে তারা এসব পাথরের নিকট অনুমতি চাইত। পূজা-অর্চনার যেসব রীতিনীতি এত দিন নক্ষত্ররাজির ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল, ধীরে ধীরে সেগুলো পাথরের মূর্তির উদ্দেশ্যে চালু করা শুরু হল। এমনকি পাথরের মূর্তির সন্তুষ্টি লাভের জন্য নানা ধরনের কোরবানী দেয়াও আরম্ভ হল।

আরবে পৌত্তলিকতার সূচনা ও প্রসার সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা এ ধরনের মনগড়া কাহিনী লিখেছেন। প্রাচীন ঐতিহাসিক হিরোডোটাস আরবে ‘লাত’-এর উপাসনার উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসকার ডিওডোরসেল কাবাঘর প্রসঙ্গে লিখেছেন, আরবরা এই ঘরের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করত। তাদের প্রতিবেদন থেকে এ কথাই প্রকাশ পায় যে, প্রাচীনকাল থেকেই আরব উপদ্বীপে মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের প্রচলন তার পরের ব্যাপার। আর তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

আরবের নবীগণ

সেকালেও আরবে একের পর এক নবীর আবির্ভাব হয়। তাঁরা এক আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানান। আরবের লোকেরা এসব নবীর আহ্বানে সাড়া দেয় না। তারা পৌত্তলিকতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।

এসব নবীর মধ্যে হযরত হুদ (আ) ছিলেন অন্যতম। হাযরামাউতের’ উত্তরে বসবাসকারী আদ কওমে তিনি আবির্ভূত হন। তিনি আদ জাতিকে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু সামান্য কিছু লোক হযরত হুদের আহ্বানে সাড়া দেয়। অধিকাংশ লোক অহমিকাবশত হযরত হুদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। তারা বলে :

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ .

“তারা বলল, হে হুদ! তুমি আমাদের নিকট কোনও স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসনি। তোমার কথায় আমরা আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করার নই এবং তোমার প্রতি আমরা বিশ্বাসীও নই।” (১১ : ৫৩)

১. হাযরামাউত ভারত মহাসাগর উপকূলে অবস্থিত প্রাচীন জনপদ। ইয়ামনের আদিজনক কাহ্তানের বার ছেলের একজনের নাম ছিল হাযরা মাওত। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, হাযরা মাওত ইবনে কাহ্তানই ছিলেন উক্ত ভূ-খণ্ডের প্রথম বাসিন্দা। আর তার নামানুসারে উক্ত ভূ-খণ্ডের নামকরণ করা হয়েছে।

-অনুবাদক

হযরত হুদ (আ)-এর পর আবির্ভাব হয় হযরত সালেহ (আ)-এর। তিনি হিজর নামক স্থানে বসবাসকারী ছামূদ জাতিকে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানান। হিজর' হচ্ছে হিজায় ও সিরিয়ার মাঝখানে আকাবা উপসাগর উপকূলে মাদায়েনের পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি জনপদ। কিন্তু ছামূদ জাতি হযরত সালেহের আহ্বানে সাড়া দেয় না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত শোয়ায়েবকে পাঠান। তিনি মাদায়েনের পাহাড়ী এলাকার বাসিন্দাদের তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু তারাও তাঁর কথা শোনেনি। পরিণামে তাদের পূর্ববর্তী আদ ও ছামূদ জাতির মতো তারাও আল্লাহ তা'আলার গযবের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ আরও নবী পাঠান। পবিত্র কোরআনে অনেক নবী-রাসূলের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সত্য ও ন্যায়ের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানান। কিন্তু এসব নবী যেসব কওমে আবির্ভূত হন, তারা ছিল গর্ব ও অহমিকার শিকার। পৌত্তলিকতা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। পৌত্তলিকতা তাদের এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, কাবাঘরে রাখা প্রতিমা দর্শনের উদ্দেশ্যে তারা আরবের দূর-দূরান্ত অঞ্চল থেকে বছরে একবার মক্কায় আসত। তাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا “আমি কারো নিকট (হেদায়েতের জন্য) রাসূল না পাঠানোর আগে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করি না।” (১৭ : ১৫)

কা'বাঘর ও বিভিন্ন দায়িত্ব

কুসাই ইবনে কিলাবের^১ আমল হচ্ছে খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় (৪৪০ খৃ)। কাবাঘর নির্মাণের পর থেকে তিনিই মক্কার নেতৃত্বের সাথে সাথে আরো কয়েকটি পদমর্যাদা ও দায়িত্ব লাভ করেন। এগুলো হলো— (ক) হিজাবাতে কাবা— কাবাঘরের চাবি রাখার দায়িত্ব। (খ) সিকায়াত— হাজীদের পানাহারের ব্যবস্থা করা। (গ) রিফাদাত— গরীব হাজীদের খাওয়ার দাওয়াত দেয়া এবং প্রত্যাবর্তনকালে রাহা খরচ পেশ করা। (ঘ) সদারত— মক্কাবাসীদের জাতীয় সভা-সমিতি বা বৈঠকে সভাপতিত্ব করা। (ঙ) লেওয়া— এটি সেনাবাহিনীর পতাকা, এটি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার নিদর্শনস্বরূপ বর্শায় বেঁধে স্থাপন করা হতো। (চ) কেয়াদাত— যুদ্ধে নেতৃত্বদান করা।

সেকালেও কাবাঘর ছিল আরবদের কেন্দ্রীয় উপাসনালয়। আর কাবাঘরের শ্রেষ্ঠত্বের ফল হিসাবেই উপরোক্ত পদগুলো সৃষ্টি হয়েছিল। কুসাই ইবন কিলাব অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও উপরে উল্লিখিত পদগুলো তিনি এক সাথে লাভ করেননি। প্রথমটা

১. মূলত ছামূদ জাতির রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল হাজার। এটি হিজায় থেকে সিরিয়া যাওয়ার প্রাচীন সড়কের পাশে অবস্থিত ছিল। এই শহরকে ‘মাদায়েনে সালিহ’ বা সালিহের শহরও বলা হত। -অনুবাদক

২. কুসাই বিন কিলাব ছিলেন মহানবী (সা)-এর পঞ্চম পূর্ব-পুরুষ। হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মান্নাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব। (ইবনে হিশাম)

পাওয়ার পর দ্বিতীয়টা, এরপর তৃতীয়টা। এমনি করে তিনি একের পর এক এসব পদ ও দায়িত্ব লাভ করেছেন। এসব পদের মধ্যে কোনও কোনটা ছিল কাবাঘরের ধর্মীয় মর্যাদার দরুন। আবার কোন কোনটা ছিল ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে। তবে কুসাই ছিলেন কুরাইশদের অবিসংবাদিত নেতা। কুরাইশ বংশ ও মক্কার অন্যান্য সবার পক্ষ থেকে কুসাই ইবনে কিলাবকে এসব পদ ও দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

আমাদের গবেষণা ও অনুসন্ধান অনুযায়ী কাবাঘর নির্মাণের সময় এক সাথে এসব পদ সৃষ্টি হয়নি। বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী এসব সৃষ্টি করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত পদগুলোর মধ্যে কোনটির সাথে কাবাঘরের ধর্মীয় মর্যাদার কোনও সম্পর্ক নেই। তবে মক্কার বাসিন্দাদের মন-মানসিকতার সাথে এসবের অবশ্যই সম্পর্ক রয়েছে।

কুসাইর আগে মক্কার অবস্থা

কাবাঘর নির্মাণের যুগে মক্কার সভ্যতা সমকালীন আরবের প্রখ্যাত গোত্রদ্বয় আমালেকা ও জোরহামকে আকর্ষণ করার মতো ছিল না। এরূপ অবস্থায় হযরত ইসমাইল (আ) মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এরপর এক পর্যায়ে হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাইল (আ) মক্কায় কাবাঘর নির্মাণ করেন। এই দু'টি কারণে মক্কা মানুষের স্থায়ী বসবাসের উপযোগিতা পুনরায় লাভ করে। চারদিক থেকে বিভিন্ন গোত্র এসে এখানে বসবাস করতে শুরু করে। তাতে করে ধীরে ধীরে এই স্থান শহরে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বর্তমানে মক্কার শত্রুরা তিরস্কার করে বলে যে, মক্কার অধিবাসীদের চাল-চলন থেকে এখনও যাযাবরতার স্বভাব দূর হয়নি। আর এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক সমালোচনা করে বলে, অন্তত কুসাই ইবন কিলাবের আমল (৪৪০ খৃ) পর্যন্ত মক্কার অধিবাসীদের মধ্যে যাযাবর স্বভাব পুরো মাত্রায়ই ছিল। কিন্তু তাদের এসব উক্তি যুক্তি-বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। কারণ কাবাঘরের গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রেক্ষিতে মক্কার বাসিন্দাদের চাল-চলনে যাযাবরতা কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না। ইতিহাসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ইসমাইলের পর কাবাঘরের কর্তৃত্ব দীর্ঘকাল জোরহাম গোত্রের হাতে ছিল। তাছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকেও মক্কা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিরাজ করছে। কয়েক শতাব্দী থেকে ইয়ামন, হীরা (ইরাক), সিরিয়া ও নজদে যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলাগুলো মক্কায় পৌঁছে যাত্রা বিরতি করত। তারা এখানে বিশ্রাম নিত। তদুপরি এই জনপদটি লোহিত সাগর উপকূলে হওয়ায় অন্যান্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথেও এর সম্পর্ক ছিল। এরপরও পবিত্র মক্কা নাগরিক জীবনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেনি এবং তাতে যাযাবরতার ছাপ রয়ে গেছে, এ কি করে সম্ভব হতে পারে? অপরদিকে হযরত ইবরাহীম (আ) মক্কার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যে দোয়া করেন তাতেও তিনি মক্কাকে শহর বলে উল্লেখ করেছেন। এসব কারণে আমরা পরিষ্কার বলতে পারি যে, কুসাই ইবনে কিলাবের কয়েক শ' বছর আগেই মক্কা শহরের মর্যাদা লাভ করে।^১

১. খৃষ্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর ছেলে ও স্ত্রীকে মক্কায় রেখে যান। আর কুসাইর আমল ছিল ৪৪০ খৃষ্টাব্দ। এই তথ্য থেকেও বোঝা যায় যে, কুসাইর আমলের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেও মক্কা শহর হিসাবে পরিগণিত ছিল। -অনুবাদক

কুরাইশদের বিজয়

জোরহাম গোত্র আমালেকাদের পরাজিত করে মক্কা দখল করে নেয়। মক্কার উপর তাদের কর্তৃত্ব মুযায ইবনে আমর ইবনে হারেছের আমল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। জোরহামদের আমলে মক্কায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়। তাতে জোরহামরা আরাম-আয়েশের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আবাদের অযোগ্য এই জনপদে যে পরিশ্রম ছাড়া রুটি-রুজির সংস্থান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার, এ কথা তারা ভুলে যায়। আরাম-আয়েশে তারা এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, যমযম কূপ পরিষ্কার করা এবং তা দেখা-শোনার ব্যাপারেও তারা উদাসীন হয়ে পড়ে। তাদের অবহেলায় এক পর্যায়ে যমযম কূপের পানির ধারা বন্ধ হয়ে যায়।

জোরহামদের এই উদাসীনতা ও অযোগ্যতার সুযোগে খোজায়া গোত্র মক্কা নগরীর পরিচালন-ক্ষমতা অধিকারের সিদ্ধান্ত নেয়। এটা আঁচ করে জোরহাম নেতা মুযায তার গোত্রীয় লোকদের সতর্ক করতে থাকে। কিন্তু তারা দলপতি মুযাযের কথায় মোটেও কর্ণপাত করে না। তাতে মুযাযের মনে জোরহামদের অপমানিত ও বিপর্যস্ত হওয়ার অনুভূতি তীব্রতর হতে থাকে। তার মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, মক্কার কর্তৃত্ব এখন খোযাযাদের জন্যই প্রতীক্ষা করছে। তিনি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কা'বাঘরের কিছু মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী এবং উপটৌকন হিসাবে দেয়া দু'টি সোনার হরিণ গোপনে যমযম কূপে লুকিয়ে রাখেন। এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল, মক্কার ক্ষমতায় পুনরায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে এগুলো নিজেদের কাজে ব্যবহার করবেন। এই কাজ সম্পন্ন করার পর মুযায নিজের গোত্র ও হযরত ইসমাইল (আ)-এর বংশধরদের নিয়ে মক্কা নগরীর বাইরে চলে আসেন। এরপর খোযায়া গোত্র মক্কার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে কুসাই ইবনে কিলাবের আমল পর্যন্ত খোযায়া গোত্র মক্কার কর্তৃত্বে সমাসীন থাকে। আর কুসাই ছিলেন মহানবী (সা)-এর পঞ্চম পূর্বপুরুষ।

কুসাই ইবনে কিলাব

কুসাইর মায়ের নাম হচ্ছে ফাতেমা বিনতে সায়া'দ। তার ঘরে দুটি সন্তান হয়। অপরজনের নাম ছিল যোহরা। তিনি কুসাই থেকে বড় ছিলেন। কিলাবের মৃত্যুর সময় কুসাই ছিলেন তার মায়ের কোলে। ফাতেমা রবীআ ইবন হারাম নামের এক ব্যক্তির নিকট পুনরায় বিয়ে করেন। রবীআ মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে সিরিয়ায় এসে বসবাস শুরু করে। এখানে আসার পর রবীআর ঔরসে ফাতেমার ঘরে আর একটি সন্তান হয়। তার নাম রাখা হয় দাররাজ। সিরিয়ায় এসে কুসাই কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন। তিনি রবীআকে তার আসল পিতা জ্ঞান করতে থাকেন। একবার কুসাই ও রবীআর পরিবারের অন্যদের মধ্যে ঝগড়া হয়। তারা তিরস্কার করে কুসাই বলে, 'তুমি হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী। তুমি আমাদের বংশ বা পরিবারের কেউ নও।' কুসাই এই ঘটনা তার মাকে বলেন। কুসাইর মা ফাতেমা বললেন, হে আমার চোখের মণি! তোমার বাবার বংশের দিক থেকে তুমি তাদের চাইতে অনেক সম্মানিত। তোমার পিতা হলেন কিলাব ইবনে মুররা। তোমাদের পরিবার বায়তুল হারামের পাশে বসবাসের সুযোগ লাভ করেছে। মায়ের মুখে এসব কথা শুনে কুসাই পবিত্র মক্কায় চলে আসেন। এখানে তার বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়ার অসাধারণ ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে এ পরিবারের লোকেরা সবাই তাকে সম্মান করে।

খোযায়া গোত্র ও কুসাই

এ সময় কাবাঘরের মোতাওয়ালী ছিলেন খোযায়া গোত্রের হোলাইল ইবন হুশিয়্যা নামের এক ব্যক্তি। হুকা নামী তাঁর এক মেয়ে ছিল। কুসাই তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেন এবং তাদের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর কুসাই বেশ জোরেশোরে ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসা ক্ষেত্রে তিনি বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি বিত্তবানে পরিণত হন। ইতিমধ্যে কুসাইর কয়েকটি সন্তান হয়। সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এদিকে মক্কার মোতাওয়ালী হোলাইল মৃত্যুশয্যায় অসিয়ত করেন, তাঁর মৃত্যুর পর কাবাঘরের চাবি যেন তাঁর মেয়ে হুকার নিকট হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু হুকা এই বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। তিনি স্বেচ্ছায় কাবাঘরের চাবি আবু গিবশান খোযায়ী নামক এক ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করেন। এই লোকটি ছিল অত্যন্ত মদ্যপায়ী। একদিন সে এক ঘটি শরাবের বিনিময়ে এই চাবি কুসাই ইবনে কিলাবের নিকট বিক্রি করে দেয়। খোযায়া গোত্র এ ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত হয়। তারা পরামর্শ করে যে, কুসাই একজন ধনী লোক। তাঁর গোত্র কুরাইশও বেশ সবল। কাবাঘরের চাবি তার হাতে থাকলে মক্কার সকল পদমর্যাদা ও সম্মান তার করায়ত্তে চলে যাবে। এটা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। একদিন তারা কুসাইর নিকট কাবাঘরের চাবি চেয়ে বসে। এই চাবি নিয়ে কুরাইশ ও খোযায়া গোত্রে বিরাট সংঘাত দানা বেঁধে উঠে। কুসাইর গোত্র কুরাইশ তাদের দলপতির সাহায্যে এগিয়ে আসতে এতটুকু দ্বিধা করে না। অন্যান্য গোত্র যারা কুসাইর বুদ্ধিমত্তা ও ন্যায়নিষ্ঠতায় মুগ্ধ ছিল, তারাও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। খোযায়া ও কুরাইশ গোত্রে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে খোযায়া গোত্র পরাজয় বরণ করে। পরিণামে কাবাঘর তথা মক্কার সকল কর্তৃত্ব কুসাই ইবনে কিলাবের হস্তগত হয়।

মক্কায় বাসস্থান নির্মাণ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত হলো, কুসাই ইবনে কিলাবের আমলের আগে মক্কায় কাবাঘর ছাড়া অন্য কোন বাসস্থান ছিল না। জোরহাম ও খোযায়া গোত্র কাবাঘরের আশেপাশে বাসস্থান নির্মাণ করা বেআদবী মনে করত। তাদের অভ্যাস ছিল, রাতে তারা হেরেম বা কাবাঘরের আশপাশের নিষিদ্ধ এলাকায় থাকত না। হেরেম থেকে দূরে গিয়ে রাত যাপন করত। মক্কার শাসন-ক্ষমতা কুসাইর হাতে আসার পর তিনি কুরাইশদের এক বৈঠক ডাকেন। এই বৈঠকে মক্কায় বাসস্থান নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তারা প্রথমে একটি ঘর নির্মাণ করেন। এটাই 'দারুন নদওয়া' হিসাবে অভিহিত হয়। মক্কার বিশিষ্ট লোকেরা বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য দারুন নদওয়ায় একত্রিত হত। কারণ কোন সামাজিক ব্যাপারে তারা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছাড়া পদক্ষেপ নিত না। এমনকি বিয়ে-শাদীর মতো ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপারেও তারা দারুন নদওয়ায় বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

১. উভয় পক্ষ কিছু লোক হতাহত হয়। অবশেষে উভয় পক্ষ ইয়ামার ইবনে আওফ নামের এক ব্যক্তিকে সালিস মানে। তিনি ফায়সালা করেন যে, খোযায়া গোত্রের যে ক'জন লোক নিহত হয়েছে কুসাই তাদের রক্তপাতের মূল্য প্রদান করবে। খোযায়া গোত্র মক্কা শহর ত্যাগ করে বাইরে চলে যাবে। আর কুসাই মক্কা শাসন করবেন। উভয় পক্ষ এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। -অনুবাদক

করত। এই পঞ্চায়েতী ঘর নির্মাণের পর কুসাইর নির্দেশে কাবাঘরের আশেপাশে বাসস্থানও নির্মাণ করা হয়। হাজীদের তাওয়াফ করার জন্য কাবাঘর ও এসব বাসস্থানের মাঝখানে প্রচুর খালি জায়গা রাখা হয়। অনুরূপ কাবাঘরে যাওয়ার জন্য দু'টি বাসস্থানের মাঝখানেও রাস্তা রাখা হয়।

কুসাইর সন্তান

কুসাইর সন্তানদের মধ্যে আবদুদ্দার ছিলেন সবার বড়। সবার ছোট ছিলেন আবদে মান্নাফ। কিন্তু নিজের ও অন্যান্য গোত্রে আবদে মান্নাফ ছিলেন ভাইদের মধ্যে সবচাইতে সম্মানের পাত্র। বৃদ্ধ বয়সে কুসাই অনুভব করলেন যে, এখন আর তাঁর পক্ষে মক্কার নেতৃত্বের দায়িত্ব যথাযথ পালন করা সম্ভব নয়। তিনি বড় ছেলে আবদুদ্দারকে ডেকে তাকে কাবাঘরের চাবি দিয়ে দেন। এই সঙ্গে তিনি অন্যান্য পদ ও দায়িত্বও আবদুদ্দারকে প্রদান করেন। তার মধ্যে রেফাদাত বা সাহায্য করার দায়িত্বটিও ছিল। এই কাজের জন্য সকল কুরাইশ বার্ষিক কর প্রদান করত এবং তা কুসাইর নিকট জমা হত। হজ্জের সময় এই অর্থ দ্বারা গরীব হাজীদের খাওয়ান হত এবং অতিথি হিসাবে তাদের রাহা খরচও দেয়া হত। এই সাহায্যদান কর্মসূচিটি কুসাই-ই শুরু করেছিলেন। খোযায়া গোত্রকে মক্কা থেকে বের করার পর কুসাই কুরাইশদের সমাবেশে ঘোষণা করেছিলেন :

“হে কুরাইশ ভাইসব ! তোমরা আল্লাহর প্রতিবেশী। তাঁর ঘর ও হেরেমের আশেপাশে বসবাসকারী। এখানে আগমনকারী হাজীরা আল্লাহর মেহমান ও তাঁর ঘরের যিয়ারতকারী। অত্যন্ত আদর-যত্নের সাথে তাদের মেহমানদারী করা উচিত। এজন্য তারা যত দিন এখানে থাকবে, তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।”

আবদে মান্নাফের সন্তান-সন্ততি

আবদুদ্দার তাঁর পিতার মতোই অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে সকল দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। আবদুদ্দারদের পর তার ছেলেরা এসব দায়িত্বে নিয়োজিত হন। কুরাইশদের মধ্যে আবদে মান্নাফের ছেলেদেরও বেশ সম্মান ও মর্যাদা ছিল। একবার তাঁরা (হাশিম, আবদে শাম্স, মোত্তালিব ও নওফেল) চাচাত ভাইদের নিকট কাবাঘরের চাবি চেয়ে বসেন। এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে কুরাইশরা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। আবদে মান্নাফের ছেলেরা চাবি আদায়ের জন্য সেকালে প্রচলিত এক বিশেষ পদ্ধতিতে হলফ করে বসে। তারা নিজেদের ঘর থেকে আতর নিয়ে এসে কাবাঘরের সামনে তাতে আঙুল ডুবিয়ে শপথ করে, যে করেই হোক তারা চাবি আদায় করে ছাড়বে। আবদুদ্দারের ছেলেরাও ‘হিলফুল আহলাফ’ বা সর্বশ্রেষ্ঠ শপথ করে বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হলে গোটা কুরাইশ গোত্রই ধ্বংস হয়ে যেতো। কয়েকজন দূরদর্শী কুরাইশ এসে উভয় পক্ষের মাঝখানে দাঁড়ান। তাঁরা আশ্রয় চেষ্টা করে বিষয়টি মীমাংসা করে দেন। এই মীমাংসা অনুযায়ী হাজীদের পানাহার ও সাহায্য দানের দায়িত্ব দেয়া হয় আবদে মান্নাফের ছেলেদের হাতে এবং কাবাঘরের চাবি, পতাকা ও দারুন নদওয়ায় সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব লাভ করেন আবদুদ্দারের সন্তানরা। এই ব্যবস্থা ইসলামের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত বলবত থাকে।

হাশিম ইবনে আবদে মান্নাফ

আবদে মান্নাফের ছেলেদের মধ্যে হাশিম ছিলেন বড়। তাঁর ধন-সম্পদও প্রচুর ছিল। হাজীদের পানাহার ও সাহায্যের দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেন। কুরাইশদের নিকট থেকে হাজীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ প্রসঙ্গে তিনিও তাঁর দাদা কুসাইর মতো বলেছিলেন : “হাজীরা হচ্ছে আল্লাহর ঘরের যিয়ারতকারী। এই হিসাবে তারা আল্লাহর মেহমান। আর আল্লাহর মেহমানদের আতিথেয়তা করা সবচাইতে পুণ্য ও সম্মানের কাজ।” বস্তুত মক্কায় অবস্থানকালে সকল হাজীর পানাহারের দায়-দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতেন।

মক্কার সামাজিক জীবন

হাশিমের বদান্যতা শুধু হাজীদের মধ্যে সীমিত ছিল না, মক্কার গরীব-দুঃখীরাও তাঁর সাহায্য-সহায়তা পেয়ে উপকৃত হতো। একবার মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তিনি মক্কার দুঃস্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে আসেন। তাদের জন্য ‘খরিদ’ বা শুরায় ভিজান রুটির ব্যবস্থা করেন। ফলে অভাবের দিনগুলোতে মক্কার গরীব-দুঃখীদের বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

হাশিমের অভ্যাস ছিল বছরে দু’বার তিনি ভ্রমণে বের হতেন। গরমকালে তিনি ইয়ামন সফর করতেন আর শীত মওসুমে যেতেন সিরিয়ায়। এইরূপে তাঁর পরিচিতি ও মানমর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে মক্কার সামাজিক জীবনও দিন দিন অগ্রগতির নতুন দিগন্তে এগিয়ে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে মক্কার পরিচিতি ও খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র আরবে মক্কা কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভ করে। এই সুবাদে আবদে মান্নাফের ছেলেরা তাদের প্রতিবেশী শাসকদের সাথে বন্ধুত্ব ও নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদন করেন। হাশিম রোমের সম্রাট ও গাসসান গোত্রের শাসকের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির শর্তের মধ্যে তিনি তাদের নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতিও আদায় করেন যে, সেসব দেশ সফরকালে তারা কুরাইশদের জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করবে। হাশিমের ছোট ভাই আবদে শাম্স আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। অপর দুই ভাই নওফেল ও আবদুল মোত্তালিবও পারস্য ও ইয়ামনের শাসকদের সাথে চুক্তি করেন। তাদের চুক্তির ভিত্তিও ছিল প্রধানত বাণিজ্যিক।

এসব চুক্তি সম্পাদনের ফলে মক্কার গুরুত্ব দিন দিন আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। মক্কার অধিবাসীরাও ব্যবসা-বাণিজ্যে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দেশের সওদাগররা পণ্য সামগ্রী নিয়ে মক্কায় বিক্রি করতে আসতে শুরু করে। মক্কার বাইরে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বছরে দুইবার মক্কাবাসীরাও প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য করতে যাতায়াত শুরু করে। তাতে করে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিবেশী দেশগুলোর সওদাগরদের চাইতে অনেক বেশি পারদর্শী হয়ে যায়। কেউ তাদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারে না। তারা বাণিজ্যের নীতিমালার নগদ ও বিনিময়ের লাভ-লোকসান অত্যন্ত দ্রুত রপ্ত করে ফেলে।

বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছা সত্ত্বেও হাশিম মক্কার নেতৃত্ব দিতে থাকেন। মক্কার কেউই তার নিকট থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেয়ার দুঃসাহস করেনি। তবে একবার তাঁর ভাতিজা ওমাইয়া ইবনে আবদে শাম্স হাশিমকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি কামিয়াব হননি। এই ব্যর্থতায় লজ্জিত হয়ে ওমাইয়া সিরিয়ায় চলে যান। সেখানে তিনি দীর্ঘ দশ বছর অতিবাহিত করেন।

হাশিম একবার সিরিয়া থেকে আসার পথে ইয়াসরিব বা মদীনায যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তার নিকট দিয়ে এক সুন্দরী মহিলা যাচ্ছিল। এই মহিলা ছিল খায়রাজ গোত্রের সালমা বিনতে আমর। সালমার পণ্য-সামগ্রী দ্বারা ব্যবসা করে মদীনার কয়েক ব্যক্তি তাদের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করত।

হাশিম এই সুন্দরী মহিলা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, মহিলা পিতা ও মাতা উভয় দিক থেকেই সম্মানিত। তিনি তালাকপ্রাপ্ত। যে ব্যক্তি তাকে তালাকের অধিকার প্রদান করবে এখন তিনি তাকে বিয়ে করতে রাজী আছেন। হাশিম মহিলার এই শর্তে সম্মত হন এবং তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেন। হাশিম ছিলেন অত্যন্ত পরিচিত কুরাইশ নেতা। মহিলার নিকট তাঁর নাম বলতেই তাঁকে তিনি চিনতে পারেন। সালমা বিয়েতে সম্মতি প্রদান করেন। বিয়ের পর সালমা স্বামীর সাথে মক্কায় চলে আসেন। এরপর ফিলিস্তিন থেকে হাশিমের মৃত্যুর খবর মক্কায় পৌঁছেলে সালমা ইয়াসরিব বা মদীনায পিতার বাড়িতে চলে যান। সেখানে তার এক সন্তান হয়। তার নাম রাখা হয় শায়বা। ছেলের দুধ খাওয়ানোর সময়কাল পর্যন্ত সালমা পিতার বাড়িতেই অবস্থান করেন। এমনকি এরপরও বেশ কিছু দিন পর্যন্ত তিনি ইয়াসরিবে অবস্থান করেন।

আবদুল মোত্তালিব (খৃ. ৪৯০)

একবার গরমকালে হাশিম ফিলিস্তিন সফরে যান। সেখানে গাজা শহরে তিনি পরলোকগমন করেন। পিতার সকল পদমর্যাদা ও দায়িত্ব হাশিমের ছোট ভাই মোত্তালিবের উপর অর্পিত হয়। মোত্তালিব অপর ভাই আবদে শামসের ছোট ছিলেন। মোত্তালিব উদারতা ও দানশীলতায় কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মানুষ তাকে 'আল্‌ফয়েয' বা দানশীল বলে ডাকত। আবদে শামসের চাইতে মোত্তালিব বয়সে ছোট হলেও এসব গুণের জন্য মক্কার নেতৃত্ব তাঁরই পাওয়া উচিত ছিল। সেজন্যই তাঁকে তা দেয়া হয়েছিল। নেতৃত্ব লাভের পর তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুনিপুণভাবে পালন করেন, আর মানুষও এমনটিই তাঁর নিকট আশা করেছিল।

একদিন বসে বসে মোত্তালিব তাঁর মৃত ভাই হাশিমের কথা ভাবছিলেন। ভাইয়ের শোকে তিনি অত্যন্ত চিন্তাভিত হয়ে পড়েন। এই চিন্তা হালকা করার জন্য তিনি ইয়াসরিবে যান। সেখানে তাঁর ভাতিজা শায়বা মায়ের সাথে বসবাস করছিল। শায়বা এ সময় কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছিল। মোত্তালিব তাঁর ভাবী সালমাকে অনুরোধ করলেন শায়বাকে তাঁর সাথে মক্কায় নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়ার জন্য। সালমা অনুমতি প্রদান করেন। মোত্তালিব ভাতিজা শায়বাকে নিয়ে মক্কায় রওয়ানা হন। মক্কায় প্রবেশ করার সময় শায়বা মোত্তালিবের সওয়ারীর পিছনে বসা ছিল। মক্কাবাসীরা এই যুবককে মোত্তালিবের ক্রীতদাস মনে করল। তাদের মধ্যে একজন উচ্চকণ্ঠে বলেই বসলো আবদুল মোত্তালিব বা মোত্তালিবের দাস। মোত্তালিব সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভুল শোধরে বললেন, আমার দাস নয়। এ হচ্ছে ইবনে হাশিম। তা সত্ত্বেও শায়বাকে মানুষ আবদুল মোত্তালিব নামেই ডাকতে থাকে। তার আসল নাম যে 'শায়বা' মানুষ তা ভুলে যায়।

শায়বাকে মক্কায় নিয়ে আসার পর মোত্তালিব তার (শায়বার) পিতার সব বিষয়-সম্পত্তি তাকে বুঝিয়ে দেয়ার মনস্থ করলেন। কিন্তু বাধ সাধলো মোত্তালিবের ভাই এবং শায়বার আর এক চাচা নওফেল। অবশেষে শায়বা এ ব্যাপারে তার মায়ের দেশ ইয়াসরিবের সাহায্য চাইলেন। সেখান থেকে তাকে সাহায্য করার জন্য খায়রাজ গোত্রের আশি জন যুবক মক্কায় এসে পৌঁছাল। অবস্থা বেগতিক দেখে নওফেল শায়বা বা আবদুল মোত্তালিবকে তার পিতার সব সম্পত্তি হস্তান্তর করে।

মোত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর সব পদমর্যাদা-দায়িত্ব আবদুল মোত্তালিবের উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু হাজীদের পানাহার ও সাহায্য করার দুটো দায়িত্ব তাঁর একার পক্ষে আনজাম দেয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করার মতো ছিল একমাত্র ছেলে হারিস।

এদিকে মুযায ইবনে আমর জোরহামী যমযম কূপ ভরে ফেলেছিল। সেজন্য কা'বা ঘরের নিকটস্থ কোন জায়গা থেকে মিষ্টি পানি সংগ্রহ করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এজন্য কা'বা ঘর যিয়ারতকারীদের জন্য শহরের আশপাশের কূপ থেকে পানির ব্যবস্থা করতে হতো। সেসব কূপে আগে থেকে পানির ব্যবস্থা করে রাখা হতো। কিন্তু এই কাজ আবদুল মোত্তালিবের জন্য সহজসাধ্য ছিল না। কারণ তাঁর সাহায্যকারী বলতে ছিল একমাত্র ছেলে। আবদুল মোত্তালিব এই সমস্যা নিয়ে সব সময় ভাবনায় থাকতেন। তিনি ভাবতেন যদি কা'বাঘরের অদূরে একটি কূপ খনন করে তাতে পানি জমা করে রাখা যেতো! কিন্তু এ কাজ তাঁর একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদি গোত্রের অন্যান্য লোক তাঁকে সাহায্য করত কিংবা তাঁর যদি অনেক সন্তান থাকত, তা'হলে একটি কূপ খনন করে তিনি এই সমস্যার সমাধান করতে পারতেন। আবদুল মোত্তালিব কা'বাঘরের পাশে একটি কূপ খনন পরিকল্পনা নিয়ে সব সময় ভাবতে লাগলেন।

যমযম কূপ খনন

কাবাঘরের অদূরে অবস্থিত যমযম কূপ কয়েক শতাব্দী আগে মুযায ইবনে আমর জোরহামী বন্ধ করে দিয়েছিল। আরবরা তখনো এই কূপের কথা ভুলেনি। তারা সব সময় কূপটি বের করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত। এই আকাঙ্ক্ষা অন্যদের চাইতে বেশি ছিল আবদুল মোত্তালিবের মধ্যে। কিন্তু যমযমের অবস্থান সম্পর্কে কারো সঠিক ধারণা ছিল না। এক রাতে স্বপ্নে আবদুল মোত্তালিব যমযমের সঠিক অবস্থান সম্পর্ক জ্ঞাত হন। তিনি ছেলে হারিসকে নিয়ে স্বপ্নে দেখা স্থানে মাটি খোদাই করা আরম্ভ করেন। ছেলে ছাড়া কুরাইশদের অন্য কেউ এ কাজে আবদুল মোত্তালিবের সাহায্যকারী ছিল না। খনন কাজের এক পর্যায়ে সোনার হরিণ দু'টি ও মুযাযের সোনার তরবারি বেরিয়ে আসে। এগুলো বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশরা সবাই দৌড়ে আসে। তারা এসবে তাদের অংশ দাবি করে এবং অবশিষ্ট খনন কাজে অংশগ্রহণ করার আশ্রয় প্রকাশ করে। কিন্তু আবদুল মোত্তালিব কুরাইশদের এই প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি তাদের নিকট বিকল্প প্রস্তাব করেন যে, তিনটি নামে দু'টি করে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে লটারী করতে হবে। এই তিনটি নাম হলো কাবাঘর, কুরাইশ ও আবদুল মোত্তালিব। তার মধ্যে যার বা যাদের নামে এসব জিনিস উঠবে, সে বা তারাই তা পাবে।

আবদুল মোত্তালিবের এই প্রস্তাবে কুরাইশরা সম্মতি প্রকাশ করে। এরপর হোবল প্রতিমার সামনে তীর নিক্ষেপ শুরু হয়। কুরাইশদের নামের দু'টি তীর লক্ষ্য ভেদে ব্যর্থ হয়। আবদুল মোত্তালিবের নামে ওঠে সোনার তরবারি। আর কাবাঘরের নামে উঠে সোনার হরিণ দুটো। আবদুল মোত্তালিব তার নামে উঠা তরবারি বিক্রি করে কাবাঘরের দরজা মেরামত করেন। সোনার হরিণদুটো কাবাঘরে সাজিয়ে রাখেন। অপরদিকে যমযম কূপে পানি বেরিয়ে আসায় হাজীদের পানি পান করানোর সমস্যা থেকে আবদুল মোত্তালিব অব্যাহতি পান।

মানত ও তা পূরণ

আবদুল মোত্তালিব তীব্রভাবে অনুভব করেন যে, নিজ গোত্রের মধ্যে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি না হওয়ার প্রধান কারণ হলো তাঁর বেশি সন্তান-সন্ততি নেই। তাঁর মনে সব সময় একটা ধারণা বিরাজ করত যে, যদি তাঁর দশটা ছেলে থাকত, তা'হলে যমযম কূপ খননে তাঁকে এরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো না। এক পর্যায়ে আবদুল মোত্তালিব মানত করেন, তাঁর দশটা ছেলে হলে একটা ছেলে কাবাঘরের সামনে বলি দান করবেন। আল্লাহ তা'আলার কি কুদরত! আবদুল মোত্তালিবের ঘরে দশটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাতে করে আবদুল মোত্তালিবের মনের আশা পূরণ হয়।

একদিন তিনি ছেলেদের কাছে ডেকে পুরো ঘটনা বলেন। তারা পিতার নিকট এই ঘটনা শুনে সবাই একবাক্যে বলে ওঠে, আমরা সবাই আপনার মানত পূরণ করার জন্য প্রস্তুত। আপনি যাকে ইচ্ছা কোরবানী করতে পারেন। আবদুল মোত্তালিব নিজ থেকে কাউকে নির্বাচন না করে লটারীর পথ বেছে নেন। তিনি এক একটি তীরে পৃথক পৃথকভাবে নিজের ও দশ ছেলের নাম লিখে কা'বাঘরের তীরন্দাজ পূজারীর নিকট যান। সেকালে আরবে একটা নিয়ম ছিল, কোন অমীমাংসিত ব্যাপারে মীমাংসা করার জন্য কাবাঘরে রাখা হোবল দেবতার সামনে কোরআহ বা লটারী করা হতো। তীর ছুড়ে দেবতার মতামত নেয়া হতো। এই তীর ছোড়ার জন্য কা'বাঘরে একজন তীরন্দাজ পূজারী থাকত। তার মাধ্যমে এই কাজ করা হতো। আবদুল মোত্তালিবও তাই করলেন। এই বিশেষ পদ্ধতির লটারীতে সবার ছোট আবদুল্লাহর নাম উঠলো। আবদুল্লাহ ছিলেন আবদুল মোত্তালিবের সবচাইতে প্রিয় ছেলে। কিন্তু আবদুল মোত্তালিব তার মানত পূরণ করার ব্যাপারে অনমনীয় ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহর হাত ধরে তাঁকে বধ্যভূমির দিক নিয়ে চললেন। এই বধ্যভূমিটি ছিল যমযম কূপের অদূরে ইসাফ ও নায়েলা দেবতার মধ্যবর্তী স্থানে। সেখানে আরবরা কোরবানীর পশু যবাই করত।

কুরাইশরাও এই ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। তারা আগে থেকেই বধ্যভূমিতে গিয়ে জড়ো হয়েছিল। তারা এই কাজে প্রবল বাধা প্রদান করে। শেষ পর্যন্ত তারা আবদুল মোত্তালিবকে এই সন্তান হত্যা থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। তারা তাঁকে বলল, আপনি হোবল দেবতার সামনে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তাতেই চলবে। হোবল আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু আবদুল মোত্তালিব তাদের এই প্রবোধবাক্যে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি বললেন, তোমরা চিন্তা করে দেখ, এ ছাড়া আর কি পস্থা অবলম্বন করা যায়। যাতে আমি সংকল্প পরিত্যাগ করতে পারি এবং দেবতারাও আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ মাখযুমী

নামের এক ব্যক্তি বলল, জানের বিনিময়ে যদি ধন-সম্পদ দিয়ে কাজ হয়, তা'হলে তোমার তা দিতে হবে না। আমরা সবাই মিলে ব্যবস্থা করব। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, এ ব্যাপারে ইয়াসরিবের প্রখ্যাত জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হতে হবে। তাঁর পরামর্শ নিতে হবে। তারা উক্ত জ্যোতিষীর নিকট গেল এবং তাকে সব ঘটনা খুলে বলল। জ্যোতিষী বলল, তোমরা কাল এসো। দেখি কি করা যায়। পরদিন গেলে জ্যোতিষী তাদের জিজ্ঞাসা করল, মক্কার অধিবাসীদের জানের বদলা দেয়ার আর কি ব্যবস্থা রয়েছে। তারা বলল, আমাদের এখানে জানের বদলা সাধারণত দশটি উটও দেয়া হয়ে থাকে। জ্যোতিষী বলল, আপনারা মক্কায় ফিরে যান। পুনরায় লটারী করুন। এবারের লটারীর পদ্ধতি হবে একদিকে থাকবে দশটি উটের নাম, অপরদিকে থাকবে যে ব্যক্তিকে কোরবানী করার জন্য মানত করা হয়েছিল তার নাম। প্রথম বারের লটারীতে যদি লোকটির নাম না ওঠে, তাহলে আরো দশটি উটের সংখ্যা যোগ করে পুনরায় লটারী করতে হবে এবং প্রতি বারে দশটি করে উটের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। যে সংখ্যায় গিয়ে উটের নাম উঠবে মনে করতে হবে আপনাদের দেবতা লোকটির জানের বিনিময়ে এই পরিমাণ উট কোরবানী করায় সম্মত হয়েছেন।

জ্যোতিষীর নিকট পাঠানো দূত মক্কায় ফিরে আসার পর তার নির্দেশমতো লটারী অনুষ্ঠান শুরু হলো। একদিকে লটারী হচ্ছিল আর অপরদিকে আবদুল মোত্তালিব দুই হাত জোড় করে দেবতার সামনে প্রার্থনা করছিলেন। লটারীতে প্রথম বারে আবদুল্লাহর নামই উঠলো। এমনি করেই উটের সংখ্যা বাড়িয়ে লটারী চলল। প্রতিবারেই আবদুল্লাহর নামই উঠছিল। উটের সংখ্যা একশ' পৌঁছলে লটারীতে আবদুল্লাহর পরিবর্তে উটের নাম উঠলো। উটের নাম উঠতেই উপস্থিত জনতা খুশিতে একবাক্যে বলে ওঠে, হে আবদুল মোত্তালিব, আমাদের দেবতা উট কোরবানীতে সম্মত হয়েছেন। আপনি আবদুল্লাহকে ছেড়ে দিন এবং উটগুলো নিয়ে বধ্যভূমির দিকে চলুন। কিন্তু আবদুল মোত্তালিব তাতে সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। তিনি বললেন, হোবল দেবতার শপথ! লটারীতে তিনবার উটের নাম না ওঠা পর্যন্ত আমি এ সিদ্ধান্ত মেনে নিব না। এরপর আরো দুবার লটারী করা হলো। প্রতিবারই আবদুল্লাহর পরিবর্তে উটের নাম উঠলো। এবার আবদুল মোত্তালিব দেবতার সন্তুষ্টির ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন। তিনি উটগুলো নিয়ে বধ্যভূমিতে গেলেন এবং সবগুলো যবাই করে ফেলে রেখে চলে আসলেন। এভাবে ফেলে আসাটা সেকালের প্রথা ছিল। অতঃপর মানুষ কিংবা জীবজন্তু যে কেউ এসবের গোশত খেতে পারত। কোন প্রকার বাধা দেয়া হতো না।

এই ঘটনা থেকে সেকালে আরবদের আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ও ধর্মবিশ্বাসের একটা স্পষ্ট রূপরেখা পাওয়া যায়। ইতিহাস ও জীবন-চরিত বিষয়ক গ্রন্থরাজিতে এসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে মক্কাবাসীদের অন্তরে কাবাঘরের মর্যাদা এবং তা রক্ষা করার সংকল্প অনুমান করা যায়।

ঐতিহাসিক তাবারী এ ঘটনার সমর্থনে ইসলামী যুগের একটি ফতোয়া উল্লেখ করেছেন। তা হলো এক মুসলিম মহিলা মানত করেন, “যদি আমার অমুক উদ্দেশ্য সফল হয়, আমি আমার ছেলেকে আব্দুল্লাহর রাস্তায় কোরবানী করব।” মহিলার উদ্দেশ্য সফল হলে তিনি এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের শরণাপন্ন হন এবং পুরো ঘটনা বলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, “এই মানত পুরো করতে হবে না।” কিন্তু মহিলা তাতে সন্তুষ্ট

হতে পারেননি। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে ফতোয়া চান। তিনি বললেন, “অন্ধকার যুগে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিবের জানের বিনিময় হিসাবে একশত উট দেয়া হয়েছিল। অনুরূপ তোমাকেও একশত উট দিতে হবে।” সে সময় পবিত্র মদীনার শাসক ছিলেন মারওয়ান। তিনি এই ফতোয়ার কথা শুনে বলেন, “যে মানত করায় পাপ রয়েছে, তা পূরণ করা জায়েয নয়।”

পবিত্র মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকার সরদাররা মক্কার এই মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। তারা ভাবতে শুরু করে কা'বাঘরের জন্যই মক্কার এই বিশেষ মর্যাদা। আমরাও নিজ নিজ দেশে কা'বাঘরের চাইতেও সুন্দর উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারি। আর এই উপাসনালয়ের জাঁকজমকের মাধ্যমে কা'বাঘরের যিয়ারতকারীদের আমাদের দিকে আকৃষ্ট করতে পারি। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে উত্তর আরবের হীরায গাসসান গোত্রের আমীর একটি উপাসনালয় নির্মাণ করেন। অনুরূপ দক্ষিণে ইয়ামনের শাসক আবরাহা নিজ দেশে আকাশচুম্বী একটি উপাসনালয় নির্মাণ করেন। আবরাহা তাঁর উপাসনালয়কে হিরা-মুক্তা দ্বারা সুসজ্জিত করেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম নির্মিত কা'বাঘরের যিয়ারতকারীরা হীরা ও ইয়ামনের উপাসনালয়গুলোর দিকে চোখ তুলেও তাকায় না। এমনকি ইয়ামনের লোকেরাও তাদের শাসক নির্মিত জাঁকজমকপূর্ণ মনোরম উপাসনালয়ের চাইতে হযরত ইবরাহীমের তৈরি অত্যন্ত সাদাসিধে কাবাঘরকেই প্রাধান্য দান করতে থাকে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কাবাঘর ছাড়া অন্য কোথাও হজ্জের সওয়াব পাওয়া যেতে পারে না।

অবশেষ আবরাহা চাইল অত্যন্ত ইয়ামনের লোকেরা তার তৈরি উপাসনালয়ে হজ্জ করুক। কিন্তু তাদেরও তিনি মক্কার কাবাঘর যিয়ারত থেকে বিরত রাখতে পারলেন না। হজ্জের মওসুম আসলে ইয়ামনের হিম্য়ার এবং অন্যান্য গোত্রের লোকেরা হযরত ইবরাহীম কাবার যিয়ারত ও তওয়াফের উদ্দেশ্যে দলে দলে মক্কার দিক রওয়ানা দিত। এই অবস্থা আবরাহাকে আরো ঈর্ষান্বিত করে তুলল। তিনি তাদের দমন করার উদ্দেশ্যে মক্কার কা'বাঘর ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

আমূল ফীল বা হাতির বছর : (খৃ. ৫৭০)

আবরাহা কা'বাঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কা আক্রমণের জন্য এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করেন। একদিন তিনি এই বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিযানে রওয়ানা দেন। বিরাট এক হাতির উপর সওয়ার ছিলেন আবরাহা। তার বাহিনীও হাতিতে সওয়ার হয়ে চলছিল। এ খবর সারা আরবে বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ে। কুরাইশরা এই খবর শুনে অত্যন্ত উদ্বেগ হয়ে পড়ে। একজন আবিসিনীয় কা'বাঘর এবং তাদের প্রতিমাগুলো ধ্বংস করতে আসছে, এ খবর তারা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। এদিকে যানার নামক ইয়ামনের এক ব্যক্তি একদল লোক নিয়ে আবরাহা'র সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে পড়ে। এই দলটির লক্ষ্য ছিল আবরাহাকে কাবাঘর ধ্বংস সাধন থেকে ফিরিয়ে রাখা। কিন্তু তারা আবরাহা'র সঙ্গে যুদ্ধে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। আবরাহা'র বাহিনী তাদেরকে বন্দী করে ফেলে। অনুরূপ নোফায়েল ইবনে হাবীব খাছআমী নামক ইয়ামনের আরেক ব্যক্তি আবরাহা'র বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেন। তিনি তাঁর গোত্রের শাহরান ও নাহিস শাখা দুটোর যুবকদের ঐক্যবদ্ধ করে আবরাহা'র বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। কিন্তু এরাও

আবরাহাৰ সৈন্যবাহিনীৰ সামনে টিকতে পাৰেনি। নোফায়েল ও তাঁৰ সঙ্গীদেৰ আবরাহাৰ বাহিনী বন্দী কৰে। নোফায়েল মৰুভূমিতে আবরাহা বাহিনীৰ বশ্যতাও স্বীকাৰ কৰে।

আবরাহা তাঁৰ বাহিনী নিয়ে তায়েফে পৌঁছেন। সেখানকাৰ বাসিন্দাৰা ভীত-সন্ত্ৰস্ত হয়ে পড়ে যে, কা'বাঘৰেৰ পৰিবৰ্তে তাৰেৰ দেবতা লাতেকেই ধ্বংস কৰে ফেলা হয় কিনা। এই আশংকায় তাৰা আগেভাগে একাটি প্ৰতিনিধিদল আবরাহাৰ নিকট পাঠায়। তাৰা আবরাহাকে কা'বাঘৰ ও তায়েফেৰ পাৰ্থক্য বুঝিয়ে দেয়। এৰপৰ মক্কাৰ পথ দেখানোৰ জন্য নিজেদেৰ একজন লোক আবরাহাৰ সাথে দিয়ে দেয়।

আবরাহা ও কা'বা

আবরাহা তাৰ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মক্কাৰ উপত্যকায় অবস্থান নেন। তিনি মক্কা ও তাৰ আশে-পাশেৰ এলাকাৰ বাসিন্দাদেৰ লুটতৰাজ কৰে ভীত-সন্ত্ৰস্ত কৰাৰ জন্য একদল সৈন্য নিয়োগ কৰেন। আবরাহাৰ সৈন্যৰা অন্যদেৰ সাথে আবদুল মোত্তালিব ইবনে হাশিমেরও একশ' উট তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এই পৰিস্থিতিতে কুরাইশৰা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ জন্য পৰামৰ্শ বৈঠকে মিলিত হয়। কিন্তু আবরাহাৰ সৈন্যদেৰ মোকাবেলা কৰাৰ জন্য তাৰেৰ শক্তি-সামৰ্থ্য ছিল না। শেষ পৰ্যন্ত তাৰা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ইচ্ছা ত্যাগ কৰে।

এই সময় আবরাহাৰ বাহিনীৰ হুনাতা হিম্যারী নামক সিপাই দূত হিসাবে কুরাইশ নেতা আবদুল মোত্তালিবের নিকট আসে। সে আবরাহাৰ একাটি ফৰমান নিয়ে আসে। তাতে বলা হয়, 'আমরা আপনাদেৰ সাথে যুদ্ধ কৰাৰ জন্য আসিনি। আমাদেৰ আসাৰ একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কা'বাঘৰ ধ্বংস কৰা। মক্কাবাসী আমাদেৰ লক্ষ্যপথে প্ৰতিবন্ধকতা সৃষ্টি না কৰলে আমরা তাৰেৰ জানমালেৰ কোন ক্ষতিসাধন কৰব না।' আবদুল মোত্তালিব বললেন, 'আমরাও মোকাবেলা কৰতে চাই না।' এই কথা বলে তিনি তাঁৰ কয়েকজন সন্তান ও মক্কাৰ অপৰ কয়েকজন সৰদাৰকে সঙ্গে নিয়ে দূতের সাথে আবরাহাৰ শিবিরে যান। আবরাহা আবদুল মোত্তালিব ও তাঁৰ সঙ্গীদেৰ অত্যন্ত সন্মান কৰেন। আবদুল মোত্তালিবের সব উট ফিৰিয়ে দেন।

আবদুল মোত্তালিব আবরাহাৰ নিকট প্ৰস্তাব কৰেন, আপনি কা'বাঘৰ ধ্বংস কৰাৰ পৰিকল্পনা ত্যাগ কৰলে আমরা সকল তেহামাবাসী আমাদেৰ ধন-সম্পদেৰ এক-তৃতীয়াংশ আপনাকে ক্ষতিপূৰণ হিসাবে প্ৰদান কৰব। আবরাহা এই প্ৰস্তাব গ্ৰহণ কৰতে অস্বীকাৰ কৰেন। অতঃপৰ আবদুল মোত্তালিব তাঁৰ সঙ্গীদেৰ নিয়ে মক্কাৰ ফিৰে আসেন। তিনি মক্কাৰ পৌঁছে সবাইকে সতৰ্ক কৰে বলেন, তোমরা সবাই আশে-পাশেৰ পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে থাক, যাতে শত্ৰু বাহিনী তোমাদেৰ কোন ক্ষতি কৰতে না পাৰে।

সেদিন ছিল অন্ধকাৰ ৰাত। মানুষ দলে দলে শহৰ ছেড়ে চলে যেতে শুরু কৰে। আবদুল মোত্তালিব তাঁৰ কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে কা'বাঘৰে উপস্থিত হন। তিনি কা'বাঘৰেৰ চৌকাঠে দু'হাত রেখে দেবতাদেৰ নিকট প্ৰাৰ্থনা কৰে বলেন, "আমাদেৰ আবরাহাৰ নিৰ্যাতন থেকে নাজাত দেয়াৰ মতো তোমাদেৰ ছাড়া আৰ কেউ নেই। তোমরাই আমাদেৰ ৰক্ষা কৰতে পাৰ। এৰপৰ তিনিও সঙ্গেৰ কয়েকজনকে নিয়ে শহৰ থেকে বেরিয়ে যান এবং পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন কৰেন। এদিকে আবরাহাও তাৰ কাজ শেষ কৰে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইলেন। হঠাৎ তাৰ

সৈন্যবাহিনীতে গুটি বসন্ত মহামারী আকারে দেখা দেয়।^১ তারা এর আগে কখনো এই রোগ দেখেনি। সম্ভবত সাগরের মওসুমী বায়ুর সাথে এই রোগ এসেছিল। সে যাই হোক, বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবে সবাই ঘাবড়ে যায়। সবাই রোগাক্রান্ত হওয়ার আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। স্বয়ং আবরাহাও আক্রান্ত হয়ে পড়েন। আবরাহা সবাইকে ইয়ামন রওয়ানা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। সৈন্যবাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তা ইতিমধ্যে পালিয়ে গিয়েছিল। ইয়ামন রওয়ানা দেয়ার পরও পথে পথে সৈন্যরা মৃত্যুর শিকার হতে থাকে। সানায় পৌঁছার আগেই আবরাহা বাহিনীর বেশির ভাগ মারা যায়। আবরাহা শরীরও চালনীর মতো ঝাঁজরা হয়ে যায়। তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। তাতে করে তিনি কৃতপাপের পরিণাম ভোগ করেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মক্কাবাসী এই ঘটনাকে ‘আমুল ফিল বা হাতির বছর’ নামে অভিহিত করে থাকে। এই ঘটনা থেকেই মক্কার ধারাবাহিক ইতিহাসের শুরু হয়। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

الْمَ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ . أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ . وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ . تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ .

“তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হস্তী বাহিনীর প্রতি কী করেছিলেন ? তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি ? এবং তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবীল পাখি প্রেরণ করেন, যারা ওদের উপর কংকর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি ওদের ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।” (১০৫ : ১-৫)

হাতির ঘটনার পর মক্কার মর্যাদা

আবরাহা ও তার হস্তী বাহিনীর ব্যর্থতা এবং ধ্বংসের পর মক্কার ধর্মীয় মর্যাদা ও গুরুত্ব কয়েকগুণ বেড়ে যায়। মক্কাবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যও দিন দিন প্রসার লাভ করতে থাকে। তখন তাদের সামনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল নিজেদের শহরকে শত্রুর কোপদৃষ্টি থেকে রক্ষা করা। যদি কোন শত্রু আগমন করেও বসে, জানমাল বাজি রেখে তা প্রতিহত করতে হবে। এই প্রেরণাই মক্কাবাসীকে তাদের শহরের নিরাপত্তা বিধানে উদ্বুদ্ধ করেছে। বস্তুত এই প্রেরণাই ছিল উক্ত শহরের শান্তিপূর্ণ জীবনধারার মূল উৎস।

মক্কার মতো শুষ্ক উপত্যকা যাকে চারদিক উষ্ণ মরু ঘিরে রেখেছে, সেখানে জীবনের ভোগ-বিলাস উপকরণের সংস্থান হওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। শরাব আর খেজুর ছিল মক্কাবাসীদের প্রিয় জিনিস। শরাবের মাদকতা আর খেজুরের নেশা তাদের যৌন জীবনকে বল্গাহীন করে ফেলেছিল। তারা ক্রীতদাস দাসীদের সাথে যৌনস্পৃহা নিবারণ করত। আর এজন্যই তারা নিজেদের শহরের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যে কোন ত্যাগ-স্বীকারে

১. গ্রন্থকার আসহাবুল ফীলের ধ্বংসের কারণ হিসাবে মহামারী আকারে গুটি বসন্ত হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু তাফসীর গ্রন্থসমূহের বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা‘আলা ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবীল পাখি প্রেরণ করে তাদের কংকর নিক্ষেপে আসহাবুল ফীল বা হস্তী বাহিনীকে ধ্বংস করে দেন। -অনুবাদক

এতটুকু ইতস্তত করত না। তারা ভোগ-বিলাসে এরূপ মত্ত হয়ে পড়েছিল যে, কা'বাঘরের চারদিকে বসে মদ পান করত এবং নানা আকথা-কুকথা বলাবলি করত। এ সময় কাবাঘরে তিনশ' বাষট্টিটি প্রতিমা ছিল। এসবের মধ্যে প্রতিটি গোত্রের একটি করে প্রতিমা ছিল। শীর্ষস্থানীয় কুরাইশরা কা'বাঘরের সামনে এসব প্রতিমার অদূরে বসে মরুভূমি, ইয়ামন, হীরা ও সিরিয়া সম্পর্কে তাদের জানা নানা কাহিনী বর্ণনা করত। তা'ছাড়া বিভিন্ন বাণিজ্য কাফেলা থেকে যেসব কাহিনী শুনত, সেগুলোরও আলোচনা হতো। এই সঙ্গে নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের ঘটনাবলিও শোনানো হতো। এসব কাহিনী আবার বিভিন্ন গোত্রে ছড়িয়ে পড়ত। আলোচনা-পুনরালোচনা হতো। এ ব্যাপারে প্রতিটি গোত্র সংবাদ সরবরাহ সংস্থার মতো কাজ করত। কোনও ঘটনা শোনার স্বল্প সময়ের মধ্যে তা চারদিকে এ-কান থেকে সে-কানে ছড়িয়ে পড়ত।

প্রতিমাগুলো স্থবির দৃষ্টি দিয়ে কাবাঘরের সামনে কুরাইশদের এসব রং-তামাশা দেখত। কুরাইশরা মনে করত আমাদের এসব আমোদ-প্রমোদে প্রতিমাদের সমর্থন রয়েছে। কারণ এসব দেখার পরও প্রতিমারা আমাদের কিছু বলছে না, কোন প্রকার বাধা-নিষেধ আরোপ করছে না। এসব পৌত্তলিকের বিশ্বাস ছিল, তাদের অপকর্মে প্রতিমারা অসন্তুষ্ট নয় এবং এসব দেখে তারা খুশী হচ্ছে।

কাবাঘরের দরুন মক্কাবাসীরা তাদের শহরকে 'দারুল আমান' বা 'নিরাপদ স্থান' মনে করত। আর এই ধারণা শুধু মক্কাবাসীই নয়, সেখানে পৌত্তলিকতার জন্যও বেশ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সেখানে কোন কিতাবধারীকে অবাধে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হতো না। তাদের ধর্ম প্রচারেরও কোন সুযোগ দেয়া হতো না। কিতাবধারীরা মক্কায় কাজ করার জন্য আসতে পারত। কিন্তু তাদের এই যাতায়াত ও অবস্থান ছিল সাময়িক। কাজের জন্যও তাদের এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেয়া হতো না। এজন্যই মক্কা নাজরানের মতো খৃষ্টানদের আবাসভূমিতে পরিণত হয়নি। ইয়াসরিব বা মদীনার মতো মক্কায় ইহুদী বসতিও গড়ে ওঠেনি। সেকালেও কাবার মর্যাদা ছিল নিষিদ্ধ ও পবিত্র এলাকার মতো। কাবাঘরে প্রতিমার পূজা চলত। এ জন্য মক্কা অধিকার করার উদ্দেশ্যে কেউ অভিযান চালানোরও সাহস করত না। তাতে করে মক্কা ছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম। আরবের সকল পৌত্তলিক গোত্রগুলোও স্বাধীন ছিল। এসব আরব গোত্র কারো বশ্যতা স্বীকার করত না। এই স্বাধীনতাই ছিল তাদের নিকট সবচাইতে প্রিয় বস্তু। তাদের জীবনের চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষা ছিল, নিজেদের প্রতিমার আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করা। মরুপ্রান্তরে যাযাবর জীবনধারার ভিতর দিয়ে যেসব আচার-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন হয়েছিল, সবাই তা কঠোরভাবে মেনে চলত। তারা বিভিন্ন চারণভূমির দ্বারাও উপকৃত হতো। যদিও তাদের এই জীবনধারা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর, তবু তারা নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের খাতিরে এ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত।

মক্কাবাসীদের ঘরবাড়ি

কাবাঘরের আশেপাশেই মক্কাবাসীদের বাড়িঘর করা হয়েছিল। তবে কার বাড়িঘর কা'বাঘর থেকে কতটুকু নিকটে বা দূরে থাকবে সেটা নির্ধারণ করা হতো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবারের

পদ ও সামাজিক মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে। কাবাঘরের দেখাশোনা, হাজীদের পানাহার ও রাহা খরচ দেয়া প্রভৃতি পদমর্যাদা ও দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল কুরাইশদের উপর। এ জন্য কুরাইশদের বাসস্থান ছিল কাবাঘরের সবচাইতে নিকটে। এসব পদমর্যাদা ও দায়িত্ব গ্রহণকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে সংঘর্ষের আশংকাও বৃদ্ধি পেতো। যেমন আগেই এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে কাবাঘরের প্রতিমাদের সামনে বসে বিভিন্ন পদমর্যাদার নিয়োগ সম্পর্কে একটি দলীল প্রণয়ন করা হয়। দলীলটি কাবাঘরে সংরক্ষণ করা হয়। তাদের ধারণা ছিল, কেউ যদি এই চুক্তিপত্রের বিরোধিতা করে, তা'হলে তার উপর দেবতাদের অভিশাপ পড়বে এবং সে ধ্বংস হয়ে যাবে। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে যারা কুরাইশদের পরবর্তী স্তরে এবং অন্যদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাদের বাসস্থানগুলো ছিল কুরাইশদের পরে। এর পরবর্তী পর্যায়ে ছিল খৃষ্টান-ইহুদী, শ্রমিক ও ক্রীতদাসদের বুপড়িগুলো। এ শ্রেণীর লোকদের বাসস্থানের পেছনে ছিল মরুভূমি। তাদের শহরের বাইরে বসবাস করতে দেয়ার কারণ ছিল, তাদের ধর্মীয় কথাবার্তা যাতে কুরাইশ ও শহরের অন্যান্য গোত্রের লোকেরা শুনতে না পায়। কেননা এসব কথা শুনে ইহুদী ও খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল। অবশ্য ইহুদী ও খৃষ্টধর্মের কথাবার্তা যে কুরাইশ ও অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্র শুনতে পেতো না তা নয়। তারা বিভিন্ন সময় ভ্রমণ কিংবা বাণিজ্যিক সফরে যেতো। এ সময় ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিভিন্ন উপাসনালয়ের নিকট দিয়ে তাদের যাতায়াত করতে হতো। তখন তারা খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্মের কথাবার্তা শুনত। কিন্তু তারা এসবের বিশেষ গুরুত্ব দিত না।

সে সময় একজন পয়গাম্বরের আবির্ভাবের কথাবার্তা আরবে বেশ জোরেশোরে চলছিল। কোন কোন লোক এসব কথাবার্তার প্রতি বেশ মনোযোগ দিচ্ছিল। একদিন উমাইয়া ইবনে আবিস্সালুত এ সম্পর্কে কোন এক পাদরীর বর্ণনা নিয়ে আলোচনা করছিল। আবু সুফিয়ান উমাইয়ার এসব কথা শুনতে পান। তিনি তাকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেন, “আপনি জানেন না, খৃষ্টান পাদরীরা তাদের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত এসব কথাবার্তা বলে থাকে। তারা মনে করে আর একজন নবী আসবেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কে বোঝাবেন। কিন্তু আমাদের নবীর কি প্রয়োজন? আমরা তো আমাদের প্রতিমাদের অনুগত আছি। এসব প্রতিমা আমাদেরকে খোদার নৈকট্য লাভ করিয়ে দেবেন। আর এজন্য নবীর আবির্ভাব সম্পর্কিত কথাবার্তার আমাদের বিরোধিতা করতে হবে।

মক্কা নগরী ও প্রতিমা-প্রীতিতে আবু সুফিয়ান ছিল অন্ধ। আর তাই তার মুখ দিয়ে এ ধরনের কথা বের হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। সে বুঝতে পারছিল না যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের সময় একেবারে দ্বারপ্রান্তে। তাঁর আলোর ছটায় পৌত্তলিকতার অন্ধকার বিদূরিত হবে। শুধু মক্কা আর আরবই নয়, সারা বিশ্বজগত তাঁর আলোতে আলোকিত হবে। সারা পৃথিবীতে তাওহীদের রোশনাই ছড়িয়ে পড়বে। সত্য কলেমার মাধ্যমে মানুষ ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিব

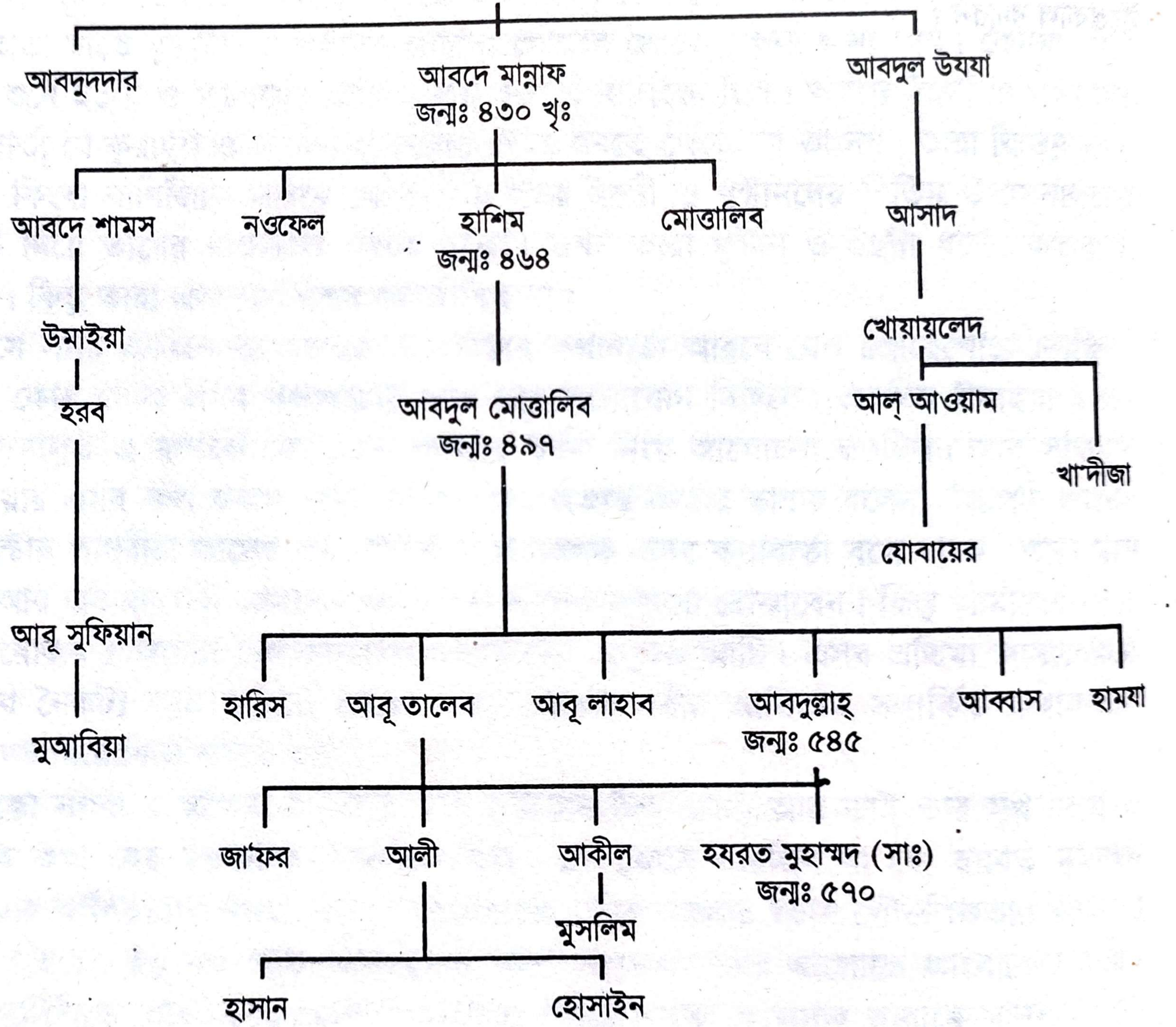
আবদুল্লাহ ছিলেন সুদর্শন পুরুষ। যৌবনে পদার্পণ করার সাথে সাথে মক্কার মহিলা মহলে তাঁর সৌন্দর্য ও অসাধারণ আকর্ষণীয় চেহারার আলোচনা শুরু হয়। বিশেষ করে মক্কার

মহিলারা ভাবত, আমাদের হোবল দেবতার নিকট আবদুল্লাহর জীবন অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কারণ হোবল একশ' উটের কম তার জীবনের বিনিময় গ্রহণ করেননি। এ ঘটনাও মক্কার মহিলাদের মনে আবদুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। তা'ছাড়া তিনি এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের পিতা হওয়া নির্ধারিত ছিল, যার নাম ইতিহাস চিরদিন গর্বের সাথে পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। কুরাইশ বংশের এই নবাগতের মা হওয়ার গৌরব নির্ধারিত ছিল আমেনা বিনতে ওয়াহাবের ভাগ্যে। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় আবদুল্লাহ ও আমেনার মধ্যে বিবাহ সম্পাদিত হয়। বিবাহের কয়েক মাস পরই আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিব অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবার জানের বিনিময়ে কোন সাদাকাও কাজে আসল না। কিছু দিনের মধ্যে আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। আমেনা মহানবী (সা)-এর জন্মগ্রহণ করার পরও জীবিত ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর দিকেও কর্তব্য সম্পাদনের দৃষ্টিপাত করে রেখেছিলেন। মহানবী (সা)-এর শিশুকালে তিনিও ইন্তেকাল করেন।

বংশ তালিকা

কুসাই

সময় : ৪ শ' খৃঃ



Mahirul Islam
01931247286

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ (সা) : জন্ম থেকে বিবাহ

আবদুল্লাহর সাথে আমেনার বিবাহ

ইয়ামনের শাসক আবরাহার মক্কা আক্রমণের সময় আবদুল মোত্তালিবের বয়স ছিল সত্তর বছর। এ সময় আবদুল্লাহর বয়স ছিল চব্বিশ বছর। আবদুল মোত্তালিব তাঁর ছেলের বিয়ের কথা চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে যোহরা গোত্রের আমেনা বিন্তে ওহাব ইবনে আবদে মান্নাফ ইবনে যোহরার প্রতি তাঁর নজর পড়ে। এক শুভ দিনে আবদুল মোত্তালিব তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে যোহরা গোত্রে যান। তিনি সে গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি ওহাব ইবনে আবদে মান্নাফের সাথে সাক্ষাত করেন। আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহর সাথে ওহাবের মেয়ে আমেনার বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এ সময় ওহাব বেঁচে ছিলেন না। তাঁর ভাই উহায়ব ছিলেন আমেনার অভিভাবক। আবদুল মোত্তালিব আমেনার চাচা উহায়বের নিকট এই বিয়ের প্রস্তাব করেন। সে যাই হোক, আবদুল মোত্তালিবের প্রস্তাবে কনে পক্ষ রাযী হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ও আমেনার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। আরবের তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী আবদুল্লাহ বিয়ের পর শ্বশুরালয়ে তিন দিন অবস্থান করেন। চতুর্থ দিন আবদুল্লাহ তাঁর নববধূকে নিয়ে বাড়ি ফিরেন।

আবদুল্লাহ ও আমেনার বিয়ের দিনই আবদুল মোত্তালিব আমেনার চাচাত বোন হালাকে বিয়ে করেন। হালা ছিলেন আমেনার চাচা উহায়বের মেয়ে। এই হালা বিবির গর্ভেই হযরত হামযা (রা) জন্মগ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহর ইন্তেকাল ও তাঁর সম্পদ

বিয়ের কিছুদিন পর আবদুল্লাহ ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া যান। বাণিজ্যিক সফরে যাওয়ার সময় তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী সাইয়েদা আমেনা গর্ভধারণ করেছেন। এ সময় সাইয়েদা আমেনা ছাড়া অপর কোন স্ত্রী ছিল কিনা অথবা অন্য কোন মহিলা আবদুল্লাহকে বিয়ে করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিল কিনা, এ সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। আবদুল্লাহ ছিলেন একজন সুদর্শন যুবক। তাঁর প্রতি মেয়েদের আকৃষ্ট হওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সাইয়েদা আমেনাকে বিয়ে করার সময় আবদুল্লাহর ঘরে অন্য কোন স্ত্রী ছিল বলে ইতিহাসে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এমনও হতে পারে যে, তাঁর সৌন্দর্যে আকৃষ্টা কিছু মহিলা আবদুল্লাহর সিরিয়া সফর থেকে ফেরার পথের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিল।

আবদুল্লাহ্ কিছু দিন ফিলিস্তিনের গাজা এলাকায় অবস্থানের পর বাড়ির পথে রওয়ানা দেন। মদীনায়ে ছিল তাঁর নানার বাড়ি। তিনি সেখানে কয়েকদিন থাকার সিদ্ধান্ত নেন। মদীনায়ে অবস্থানের মাধ্যমে তিনি তাঁর সফরের ক্লান্তিও দূর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর সফর সঙ্গীরা তাঁর জন্য কয়েকদিন মদীনায়ে অপেক্ষা করে। কিন্তু তিনি সুস্থ না হওয়ায় তারা তাঁকে মদীনায়ে রেখেই মক্কায় রওয়ানা দেয়। মক্কায় এসে তারা আবদুল মোত্তালিবকে তাঁর ছেলের অসুখের খবর দেয়। এই খবর শুনে আবদুল মোত্তালিব তাঁর বড় ছেলে হারিসকে মদীনায়ে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সঙ্গীদের মদীনা থেকে চলে যাবার এক মাস পর আবদুল্লাহ্ ইন্তেকাল করেন। হারিস এই মর্মান্তিক খবর শুনে মদীনায়ে বিলম্ব করেননি। তিনি মক্কায় চলে আসেন। সাইয়েদা আমেনা তাঁর স্বামীর প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে দিন গুণছিলেন। কিন্তু এই মর্মান্তিক খবর শুনে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন। পিতা আবদুল মোত্তালিবও ছেলের মৃত্যুখবরে অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়ে পড়েন। কারণ ছেলেদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। আবদুল্লাহ্ ছিলেন আবদুল মোত্তালিবের এক বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী ছেলে। তিনি আবদুল্লাহ্‌র জীবনের বিনিময়ে একশত উট কোরবানী করেছেন। আর এটা ছিল তৎকালীন আরবে এক অদ্বিতীয় ও অনন্যসাধারণ ঘটনা।

আবদুল্লাহ্‌র সম্পদ বলতে ছিল পাঁচটি উট, কিছু ভেড়া ও উম্মে আয়মন নামের একটি দাসী। সাইয়েদা আমেনার মৃত্যুর পর এই দাসীটি মহানবী (সা)-এর সেবা-যত্ন করেন। এই সামান্য সম্পদ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবদুল্লাহ্ ধনী ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু তিনি যে একেবারে গরীব ছিলেন তাও বোঝা যায় না। কারণ সবেমাত্র তিনি সংসার জীবনে পা রেখেছিলেন। তিনি যদি বাঁচতেন, তাহলে হয়তো ব্যবসা-বাণিজ্য করে অনেক ধন-সম্পদের মালিক হতে পারতেন। অপরদিকে পিতার বর্তমানে আবদুল্লাহ্ ইন্তেকাল করেন। ফলে পৈতৃক সম্পত্তি থেকেও তিনি কিছুই লাভ করেননি।

নবী করীমের জন্ম : ৫৭০

গর্ভের সময় যথারীতি অতিবাহিত হওয়ার পর মহানবী (সা) জন্মগ্রহণ করেন। এই দুনিয়ায় তাঁর আবির্ভাবের সাথে সাথে বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু পুলকিত হয়ে ওঠে। এই সুসংবাদ সঙ্গে সঙ্গে দাদা আবদুল মোত্তালিবকে জানানো হয়। তিনি মৃত ছেলে আবদুল্লাহ্‌র পুত্র সন্তান হওয়ার খবর শুনে সীমাহীন আনন্দিত হন। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সাইয়েদা আমেনার ঘরে পৌঁছান। নবজাত নাটিকে দুই হাতে তুলে নিয়ে কাবাঘরে দৌড়ে যান। তিনি তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ (সা)। এই নাম ছিল একেবারে নতুন। এই পবিত্র নামের সাথে আরবরা অত্যন্ত পরিচিত ছিল। কিন্তু এর আগে কারো সন্তানের এই নাম রাখা হয়নি।

মহানবী (সা)-এর জন্মের বছর, মাস ও দিন-তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। অধিকাংশের অভিমত হলো, 'আমুল ফিল' বা হাতির বছর ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (সা) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাসের মতে পবিত্র মক্কায় আবরারাহর হস্তী বাহিনীর অভিযানের দিন মহানবী (সা) জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে হাতির বছরের কয়েক দিন, কয়েক মাস কিংবা কয়েক (তিরিশ থেকে সত্তর) বছর পর মহানবী (সা) এই পৃথিবীতে আগমন করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে রবিউল আউয়াল মাসে তিনি জন্মগ্রহণ

করেন। কেউ কেউ বলেছেন মহররম, সফর, রজব কিংবা রমযান হলো তাঁর জন্মের মাস। প্রথমোক্ত ঐতিহাসিকদের মতে মহানবী (সা)-এর জন্মতারিখ হচ্ছে রবিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয়, অষ্টম কিংবা নবম দিন। কিন্তু অধিকাংশ এ ব্যাপারে একমত যে, মহানবী (সা) বারই রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেছেন। আর এই অভিমতই হলো ইবনে ইসহাক প্রমুখ ঐতিহাসিকের।

অনুরূপ মহানবী (সা)-এর জন্ম দিনের বেলায় হয়েছিল, না রাতে এবং পবিত্র মক্কার কোথায় হয়েছিল, এসব নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কুসান ডি পারসিভাল (Caussin De Perceval) তাঁর 'আরবের ইতিহাস' গ্রন্থে এ সম্পর্কিত একটি অভিমতকে প্রাধান্য দান করেছেন। আর তা হলো, রাসূলে করীম (সা) ৫৭০ খৃষ্টাব্দে হাতির বছর তাঁর পিতামহ আবদুল মোত্তালিবের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

মহানবী (সা)-এর জন্মের সপ্তম দিনে দাদা আবদুল মোত্তালিব একটি উট যবাই করে কুরাইশদের দাওয়াত করেন। আমন্ত্রিতরা নবজাত শিশুর নাম শুনে আবদুল মোত্তালিবকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি পূর্বপুরুষদের নাম উপেক্ষা করে নবজাত শিশুর নাম রেখেছেন মুহাম্মদ (সা)। এই নামে এমন কী সৌন্দর্য দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, পৃথিবী ও আকাশের সর্বত্র থেকে আমার নাতির প্রশংসা করা হবে-এই আশা নিয়ে আমি তাঁর নাম রেখেছি মুহাম্মদ (সা)।

দুগ্ধপান

তৎকালীন আরবের অভিজাত পরিবারে নবজাত শিশুদের দাইদের দ্বারা লালন-পালন করার নিয়ম ছিল। সাধারণত জন্মের সাতদিন পর নবজাত শিশুকে দাইয়ের কাছে দেয়া হতো। আট থেকে দশ বছরের আগে সাধারণত তাদের দাইয়ের নিকট থেকে আনা হতো না। এসব দাই ছিল আরবের বিভিন্ন যাযাবর গোত্রের। তারা প্রতি বছর এই উদ্দেশ্যে একবার পবিত্র মক্কা আসত।

সাইয়েদা আমেনা তাঁর নবজাত শিশুকে দেয়ার জন্য সাআদ গোত্রের কোন দাইয়ের অপেক্ষায় ছিলেন। কারণ এই গোত্রের মহিলারা নবজাত শিশুদের লালন-পালনে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারিণী ছিল। তাদের না আসা পর্যন্ত সাইয়েদা আমেনা তাঁর নবজাত শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য সোয়াইবা নামের এক মহিলাকে নিয়োগ করেন। সোয়াইবা ছিল আবু লাহাবের দাসী। এই মহিলা মহানবী (সা)-এর চাচা হযরত হামযাকেও দুধ পান করিয়েছিলেন। এই দিক থেকে মহানবী (সা) ও হযরত হামযা (রা) ছিলেন দুধভাই। সোয়াইবা মাত্র কয়েক দিন মহানবী (সা)-কে দুধপান করিয়েছিলেন। কিন্তু এ ক'দিনেই নবজাত শিশু হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি মহিলার স্নেহ-প্রীতি অত্যন্ত প্রগাঢ় হয়ে পড়ে। যতদিন মহিলা জীবিত ছিলেন তিনি মহানবী (সা)-কে দেখতে আসতেন। মহানবী (সা)-ও তাঁর সাথে সব সময় অমায়িক ব্যবহার করতেন। সপ্তম হিজরীতে সোয়াইবা ইন্তেকাল করেন। সোয়াইবার ঘরে এক সন্তান হয়। তার নাম ছিল মাসরুহ। তিনি মহানবী (সা)-এর সাথে দুধ পান করেছিলেন। হিজরতের পর এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে সাহায্য করার মনস্থ করেন। এরপর খোঁজ নিয়ে জানা গেল তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

হালিমা সাদিয়া

অবশেষে বনু সাআদ গোত্রের দাই মহিলারা শিশুদের নেয়ার জন্য মক্কা আসে। তারা এতীম শিশুদের লালন-পালনের ভার নিতে চাচ্ছিল না। কারণ এতীম শিশুর মাতা তাদের পারিশ্রমিক দেবে কোথেকে। যেসব শিশুর পিতা ছিল, তারা তাদের খুঁজে বের করে নিয়ে নেয়। সাইয়েদা আমেনার শিশু এতীম হওয়ায় কোনো দাইই তাঁর দিকে চোখে তুলে তাকাচ্ছিল না। এমনকি হালিমা সাদিয়া বিনতে আবু যোয়াইবও একবার শিশু মুহাম্মদকে দেখে যান। কিন্তু তিনি এতীম হওয়ায় হালীমা তাঁকে গ্রহণ করেননি।

হালিমা বিনতে আবু যোয়াইব ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। তাই তিনি কোন শিশু সংগ্রহ করতে পারেননি। কাফেলার অন্যরা মরুভূমির দিকে রওয়ানা দেয়ার জন্য আসবাবপত্র বাঁধছিল। তখনও হালিমা কোন শিশু সংগ্রহ করতে পারেননি। অবশেষে তিনি তাঁর স্বামী হারিস ইবনে আবদুল ওয়্যাকে বললেন, ‘মক্কা থেকে শূন্যহাতে যাওয়া খুবই লজ্জার ব্যাপার। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি হাশিম গোত্রের এতীম শিশুটিকেই নিয়ে নেব।’ হারিস বললেন, ‘তুমি এই শিশুটিকে অবশ্যই নিয়ে যেতে পার। হয়ত আল্লাহ তার মধ্যেই আমাদের জন্য বরকত বা প্রাচুর্য রেখেছেন।’ স্বামীর অনুমতি পেয়ে হালিমা সাইয়েদা আমেনার ঘরে আসেন। তিনি তাঁর এতীম শিশুকে দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সাইয়েদা আমেনাও খুশিমনে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় শিশুকে হালিমার হাতে তুলে দেন। হালিমা এই মহা ভাগ্যবান শিশুকে কোলে নিয়ে কাফেলার সাথে গিয়ে মিলিত হন এবং মরুভূমির দিকে রওয়ানা হয়ে যান। হালিমা সাদিয়া প্রায়ই বলতেন, ‘এই শিশুকে কোলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরকত ও প্রাচুর্য আমার প্রতি অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। ছাগলগুলো মোটাতাজা হয়ে যেতো। তাদের বাঁট থেকে দুধ যেন ফেটে পড়ছিল।’

মহানবী (সা) ঊষর মরুর বুকে হালিমার তত্ত্বাবধানে দু’বছর অতিবাহিত করেন। হালিমা তাঁকে নিজের দুধ খাওয়াতেন। তার মেয়ে শায়মা শিশু মুহাম্মদকে কোলে-কাঁখে নিয়ে পরম সোহাগের সাথে রাখতেন। ঊষর মরুর ধূসর পরিবেশ, তপ্ত বাতাস আর অনাড়ম্বর ও সরল জীবনধারায় শিশু মুহাম্মদ দ্রুত বেড়ে চলেন। মরুর জীবন ব্যবস্থাও তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত অনুকূল বলে বিবেচিত হয়। প্রকৃতির এই মুক্ত পরিবেশে তাঁর শরীরের গঠন-গাঠন দিন দিন সুন্দর থেকে সুন্দরতর হতে থাকে। দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পর হালিমা তাঁকে মা আমেনার নিকট নিয়ে আসেন। স্নেহময়ী মা আমেনা তাঁর প্রাণপ্রিয় ছেলেকে নয়ন ভরে দেখেন। সাইয়েদা আমেনার অনুরোধে হালিমা শিশু মুহাম্মদকে পুনরায় সঙ্গে নিয়ে প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশ দিগন্তহীন মরু প্রান্তরে চলে যান। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হালিমা সাদিয়াই সাইয়েদা আমেনাকে এই অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর এই অনুরোধের উদ্দেশ্য ছিল, শিশু মুহাম্মদ আরো একটু বড় হোন এবং মক্কা শহরের মহামারী থেকে নিরাপদ থাকুন। কারণ এ সময়ে মক্কা মহামারী দেখা দিয়েছিল এবং তাতে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছিল। যাই হোক, পরবর্তী দু’বছরও শিশু মুহাম্মদ দিগন্তহীন মরু প্রান্তরে অতিবাহিত করেন। তাতে তাঁর শক্তি ও সাহস অনেক বৃদ্ধি পায়। কারণ মুক্ত পরিবেশে জীবন যাপন করার ফলে তিনি এ সময় সকল প্রকার জড়ো বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

বক্ষ বিদারণ

মহানবী (সা)-এর বয়স তখন তিন বছর। একদিন তিনি মরুভূমিতে তাঁর দুধভাইয়ের সাথে ভেড়ার পালের মধ্যে খেলা করছিলেন। তাঁর দুধভাই দৌড়ে তাঁবুতে আসে এবং তাদের পিতামাতার নিকট বলে, দুইজন সাদা পোশাকধারী লোক আমার ভাইকে মাটিতে ফেলে পেট চিরে ফেলেছে। এ ব্যাপারে হালিমা ও তার স্বামীর নিজেদের চোখে দেখা বর্ণনা হলো, “আমরা দু’জন দ্রুত সেখানে গিয়ে দেখি, শিশু মুহাম্মদ দাঁড়িয়ে আছেন। তার চোখে-মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব। প্রথমে আমি এবং পরে তাঁর বাবা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করি, আব্বা তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, সাদা পোশাক পরা দু’জন লোক এসেছিল। তাঁরা আমাকে মাটিতে শুইয়ে আমার পেট চিরে ফেলে। আমি জানি না তারা কি যেন আমার পেটে তালাশ করছিল। এরপর হালিমা এবং তার স্বামী শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসেন। তাঁরা আশংকা করেছিলেন, শিশু মুহাম্মদকে জিন আছর করেছিল। তারা তাঁকে মক্কায় সাইয়েদা আমেনার নিকট নিয়ে আসেন। এই বর্ণনাটি ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পরবর্তীকালেরও একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, “রাসূলে করীমকে পবিত্র মক্কায় নিয়ে যাওয়াটা প্রমাণসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু বক্ষ বিদীর্ণ করা মক্কায় নিয়ে যাওয়ার পটভূমি নয়। তার কারণ ছিল অন্য। হালিমা শিশু মুহাম্মদকে মক্কায় নিয়ে গিয়ে সাইয়েদা আমেনাকে বলেছিলেন, শিশু মুহাম্মদকে আমাদের নিকট রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন আবিসিনীয় খৃষ্টানদের একটি কাফেলা আমাদের তাঁবুর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। শিশু মুহাম্মদকে দেখে তারা সবাই থেমে যায়। তাকে গভীরভাবে দেখার পর আমাদের নিকটও তাঁর সম্পর্কে কিছু কথা জানতে চায়। অবশেষে তারা বলে, “এই শিশুটিকে আমাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিন। তার ভবিষ্যত অনেক উজ্জ্বল।”

অনুরূপ ঐতিহাসিক তাবারীও মহানবী (সা)-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনার ভাষা ও পদ্ধতিতেও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি লিখেছেন, “এই ঘটনা মহানবী (সা)-এর জীবনের তৃতীয় বছরের।” পরে তিনি আবার লিখেছেন, “মহানবী (সা)-এর নবুয়ত লাভের কিছু দিন আগে চল্লিশ বছর বয়সের সময় এই ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে।”

প্রাচ্যবিদ ও কোন কোন মুসলিম লেখকের দৃষ্টিতে বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা সন্দেহাতীত নয়। এই দুটি শ্রেণী এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনাকে জঙ্গফ বা দুর্বল মনে করেন। জীবন চরিতবিদরা বলেন, মহানবী (সা)-এর বয়স দুই বছর পার হওয়ার পর শিশুকালেই বক্ষ বিদারণের ঘটনা ঘটে। অপর কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা) পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বনী সাআদ গোত্রে ছিলেন। যদি এই ঘটনা আড়াই বছর বয়সের সময় হয়ে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মক্কায় পৌঁছে দেয়া হয়ে থাকে, তা’হলে উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়। এজন্যই কোন কোন লেখক বলেছেন, হালিমা সাদিয়া তৃতীয়বার মহানবী (সা)-কে মক্কায় নিয়ে আসলে সাইয়েদা আমেনা তাঁকে রাখেননি। দাই-মায়ের সাথে পুনরায় মরুভূমিতে পাঠিয়ে দেন।

স্যার উইলিয়াম ম্যুর দুইজন সাদা পোশাক পরা লোক সম্পর্কে লিখেছেন, “সম্ভবত এটা কোন স্নায়বিক ব্যাধির আকস্মিক আক্রমণ ছিল। তাঁর স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভাল হওয়ায় কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি।”

কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে রিসালাতের জন্য মনোনীত করে সৃষ্টি করেছেন, তখন বক্ষ বিদারণের কী প্রয়োজন ছিল? এমিল দারমিংহাম (Emile Dermenghem) লিখেছেন, মহানবী (সা)-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনার সারাংশ হচ্ছে পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত ভাষ্যের মূলকথা।

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ.

“আমি কি তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি? এবং আমি তোমার ভার লাঘব করেছি, যা তোমার জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল।” (৯৪ : ১-৩)

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত ভাষ্যের সারকথা হলো, আল্লাহ তা‘আলা মহানবী (সা)-এর হৃদয়কে পূত-পবিত্র ও প্রশস্ত করার জন্য অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তাঁর উপর ন্যস্ত রিসালাতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন।

প্রাচ্যবিদ ও কিছুসংখ্যক মুসলিম পণ্ডিত আরো একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বক্ষ বিদারণের ঘটনার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনে অসংখ্য বিপদ-আপদ ও ঘটনাবলির সমাহার হয়েছে এবং তিনি সেগুলো দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করেছেন, সহ্য করেছেন। এ থেকেই সহজে অনুমান করা যায় যে, তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম মানুষ ছিলেন। রিসালাতের দায়িত্ব সম্পাদনের যোগ্যতার পরিচয় দেয়ার জন্য অন্যান্য নবী-রাসূলের মতো মুজিয়া প্রদর্শনের তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। আরব-অনারব মুসলিম ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে একমত যে, মহানবী (সা)-এর জীবন চরিতে নিরপেক্ষ জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপন্থী যেসব ঘটনা প্রচলিত রয়েছে, সেগুলো বিশ্বাস করা উচিত নয়। কারণ তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে যেসব অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনা জড়ানো হয়েছে, সেগুলোর বর্ণনাকারীরা সবাই একমত নন। তা‘ছাড়া এসব ঘটনা পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী। কারণ পবিত্র কোরআন এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, কোন অবস্থায়ই চিন্তা-ভাবনার দ্বার পরিত্যাগ করা উচিত নয়। পবিত্র কোরআনে এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলার বিধানে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন প্রকাশ পায় না। তাতে মুশরিকদের সমালোচনা করে বলা হয়েছে, তারা মন ও মস্তিষ্কে আল্লাহ-প্রদত্ত যোগ্যতার সদ্যবহার করে না। তাদের প্রতিটি কথা ও কাজে অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।’

১. লেখকের ‘বক্ষ বিদারণ’ শীর্ষক প্রতিবেদনটি স্পষ্ট নয়। প্রথমে তিনি বক্ষ বিদারণ করা সম্পর্কে ইবনে ইসহাক ও তাবারী এবং পরে উইলিয়াম ম্যুর ও দারমিংহামের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি নাম উল্লেখ না করে কিছু ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদে অন্নিমিত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লেখক এসব উদ্ধৃতির মধ্যে এমনভাবে হারিয়ে গেছেন যে, মহানবী (সা)-এর বক্ষ বিদারণ সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ চিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন বলা চলে। অধিকন্তু তাঁর বিভিন্ন উদ্ধৃতি, বিশেষ করে উইলিয়াম ম্যুর, দারমিংহাম প্রমুখের ভাষ্যের মাধ্যমে তিনি এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, এ ব্যাপারে তিনি সন্দেহাতীত নন। সোজা কথায় বলতে হয়, মহানবী (সা)-এর বিভিন্ন মুজিয়া সম্পর্কে নাসিকা কুণ্ডলকারী এক শ্রেণীর

মরুভূমিতে হযরত মুহাম্মদ (সা)

মহানবী (সা) জীবনের প্রথম পাঁচটি বছর বনী সাআদ গোত্রের সাথে মরুভূমিতে অতিবাহিত করেন। মরুভূমির মুক্ত বায়ুতে তাঁর শারীরিক গঠন অত্যন্ত মজবুত হয়। বনী সাআদ গোত্রের আরবী ভাষা ছিল অত্যন্ত সুললিত। তিনি এই ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। একবার মহানবী (সা) নিজেও সাহাবাদের উদ্দেশে বলেছেন :

“আমি তোমাদের চাইতে অধিক পরিপূর্ণ আরব। আমার বংশ হচ্ছে কুরাইশ। আর বনী সাআদ গোত্রের পরিবেশে আমি লালিত-পালিত হয়েছি।”

বস্তুত মহানবী (সা)-এর জীবনের প্রথম পাঁচটি বছর দিগন্তহীন মরুর বুকে অবস্থান করার ফলে সেখানকার মুক্ত পরিবেশ তাঁর পবিত্র চরিত্রে অনুপম প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি হালিমা সাদিয়ার ছোট পরিবারকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। একবার পবিত্র মক্কা ও তার আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বিবি হালিমা মহানবী (সা)-এর সাথে দেখা করতে আসেন। এ সময় মহানবী (সা) ছিলেন বিবাহিত। এর এক বছর আগে সাইয়েদা খাদীজা (রা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। মহানবী (সা) তাঁর স্ত্রীর সম্পদ থেকে পানির মশক বোঝাই একটি উট এবং চল্লিশটি ভেড়া বিবি হালিমাকে উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করেন। বিবি হালিমা যখনই মহানবী (সা)-এর সাথে দেখা করতে আসতেন, তিনি নিজের চাদর বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিতেন। মুসলমানদের তায়েফ অবরোধের সময় হাওয়ায়েন গোত্রের সাথে বিবি হালিমার মেয়ে শায়মাও বন্দী হন। তাঁর অনুরোধে মহানবী (সা) তাঁকে সসম্মানে মুক্তি প্রদান করেন এবং তাঁর পরিবারবর্গের নিকট পাঠিয়ে দেন।

বনী সাআদ গোত্রে পাঁচ বছর অবস্থানের পর বিবি হালিমা বালক মুহাম্মদকে তাঁর মাতা সাইয়েদা আমেনার নিকট ফিরিয়ে দেয়ার জন্য মক্কার দিকে রওয়ানা হন। রাস্তায় এক স্থানে বালক মুহাম্মদ হারিয়ে যান। বিবি হালিমা চারদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেন। কিন্তু তিনি তাঁকে কোথাও পান না। অবশেষে বিবি হালিমা মক্কায় এসে আবদুল মোত্তালিবকে এই খবর দেন। আবদুল মোত্তালিব এই খবর পেয়ে বালক মুহাম্মদকে খুঁজে বের করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দেন। অবশেষে ওয়ারাকা ইবনে নওফেল বালক মুহাম্মদকে খুঁজে বের করেন এবং আবদুল মোত্তালিবের নিকট নিয়ে আসেন।

আবদুল মোত্তালিবের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ

আবদুল মোত্তালিব বালক মুহাম্মদকে লালন-পালনের ভার নিজেই গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর প্রতি সব সময় খেয়াল রাখতেন। আবদুল মোত্তালিব ছিলেন কুরাইশদের সরদার ও মক্কার শাসক। কা'বার সামনে তাঁর জন্য একটি ফরাশ বিছানো হত। মাঝখানে তিনি বসতেন।

পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের চুনকো যুক্তির বেড়াজালে লেখক জড়িয়ে পড়েছেন। আমাদের কথা হলো, মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনের যেসব ঘটনা যুক্তি-বুদ্ধির উর্ধ্বে, অস্বাভাবিক ও অলৌকিক তাই তো মু'জিয়া। সুতরাং এসব যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রশ্নই ওঠে না। তা'ছাড়া যারা মহানবী (সা)-এর আদর্শেই বিশ্বাসী নয়, তাদের এসব যুক্তির কী মূল্য থাকতে পারে? সারকথা, নির্ভরযোগ্য ইসলামী ঐতিহাসিক ও জীবন-চরিতকারদের মতে বক্ষ বিদারণ সত্য ঘটনা। তা প্রতিটি মুসলমানকে বিশ্বাস করতে হবে। -অনুবাদক

আশেপাশে বসত তাঁর সন্তানরা। বালক মুহাম্মদ কোন সময় সেখানে গেলে আবদুল মোত্তালিব উঠে গিয়ে তাঁকে এনে নিজের পাশে বসাতেন। আবদুল মোত্তালিব যতদিন জীবিত ছিলেন, সব সময় তিনি তাঁকে এমনি করে আদর-যত্ন করতেন।

সে সময় মহানবী (সা)-এর জীবনে একটি নাজুক পট-পরিবর্তন আসে। এই ঘটনা তাঁকে তাঁর দাদার নিকট আরো স্নেহাস্পদ করে তোলে। সাইয়েদা আমেনা বালক মুহাম্মদকে সাথে নিয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করার জন্য মদীনায়ে রওয়ানা দেন। এই সফরে তাঁদের সাথে উম্মে আয়মন নাম্নী দাসীও ছিলেন। সাইয়েদা আমেনা মদীনা পৌঁছেই বালক মুহাম্মদকে একটি ঘর দেখান। এই ঘরেই তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। এরপর তাঁকে পিতার মাযারে নিয়ে যান। জীবনে এই প্রথম তিনি নিজেকে এতীম বলে অনুভব করেন। অবশ্য এর আগেও সাইয়েদা আমেনা বালক মুহাম্মদকে তাঁর পিতার অবস্থা ও মৃত্যুর ঘটনা শোনাতে। কিন্তু তখন তিনি পিতার অবর্তমানের কথা এতটা তীব্রভাবে অনুভব করেননি। পরবর্তীকালে মহানবী (সা) তাঁর এই প্রথম সফরের বিবরণ সাহাবায়ে কেরামকেও শোনাতে।

সাইয়েদা আমেনার ইন্তেকাল

মদীনায়ে সাইয়েদা আমেনা এক মাস অবস্থান করেন। এরপর তিনি বালক মুহাম্মদকে নিয়ে মক্কায় রওয়ানা দেন। কিন্তু আবওয়া' নামক স্থানে এসে সাইয়েদা আমেনা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুখ থেকে তিনি আর সুস্থ হননি। এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আবওয়াতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এরপর বালক মুহাম্মদের সফরসঙ্গী ছিলেন মাত্র উম্মে আয়মন। তিনি একাই তাঁকে মক্কায় নিয়ে আসেন। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর চোখের সামনেই মাতাকে সমাহিত করা হচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে সে সময় সারা দুনিয়া তাঁর নিকট অন্ধকার মনে হচ্ছিল। আজ থেকে তিনি এতীম হওয়ার বেদনা আরো তীব্রভাবে অনুভব করলেন। এতদিন এই স্নেহময়ী জননীই তাঁকে পিতার মৃত্যুকাহিনী শোনাতে। কিন্তু আজ তিনিও তাঁকে ছেড়ে পরপারে চলে গেলেন। আজ থেকে এতীম হওয়ার দ্বিগুণ বোঝা এসে তাঁর কাঁধে আপতিত হলো।

এই ঘটনার পর আবদুল মোত্তালিবের অন্তরে বালক মুহাম্মদের প্রতি স্নেহ-মমতার আবেগ অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পিতা-মাতার বিয়োগ ব্যথা তাঁর শিশুমন থেকে সহজে মুছে যাওয়ার ছিল না। ধুঁকে ধুঁকে তাঁর মনে পড়ছিল পিতা-মাতার কথা। এই বিপদের দিনগুলোতে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর ব্যাকুল মনে সান্ত্বনার উপকরণ সরবরাহ করেন। এ সময়ের দু'একটি ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ -

“(হে রাসূল!) তিনি কি তোমাকে এতীম অবস্থায় পাননি এবং তোমাকে আশ্রয় দান করেননি? এবং তিনি তোমাকে পান পথহারা, অতপর পথ-নির্দেশ করেন।” (৯৩ : ৬-৭)

১. এই স্থানটি মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে মদীনা ও জোহ্ফার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।
-অনুবাদক

আবদুল মোত্তালিবের ইন্তেকাল

স্বভাবতই এ কথা মনে হচ্ছিল যে, মাতৃবিয়োগের পর অনুগ্রহশীল দাদা আবদুল মোত্তালিব যদি আরও কিছুদিন জীবিত থাকতেন, তাহলে বালক মুহাম্মদের হয়তো মাতৃশোক কাটিয়ে ওঠা কিছুটা সহজ হত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কী মহিমা ! সবেমাত্র বালক মুহাম্মদ জীবনের অষ্টম বসন্তে পদার্পণ করেছেন। দাদা আবদুল মোত্তালিবও এ সময় ৮০ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। পিতামাতার স্নেহ থেকে মুহাম্মদ পূর্বেই বঞ্চিত হয়েছিলেন। পরবর্তী অভিভাবক দাদা থেকেও এবার তিনি বঞ্চিত হলেন। এভাবে কিছুদিন পর পর তাঁর অভিভাবকদের পরিবর্তনের পালা চলতে থাকল।

মহানবী (সা) তাঁর স্নেহময়ী মাতাকে নিজের সামনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দেখেছিলেন। অনুরূপভাবে দেখতে না দেখতে দাদাও তাঁর সামনেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। অথচ তখনও তিনি মায়ের শোকেই চোখের পানি ফেলছিলেন। এবার দাদার বিরহে তাঁর উপর শোকের পাহাড় ভেঙে পড়ল। কিন্তু চোখের পানি ফেলা ছাড়া তাঁর করার কিছুই ছিল না। দাদার লাশের সাথে সাথে তিনি কবরস্থান পর্যন্ত গেলেন। দাদাকে দাফন করা পর্যন্ত স্থির দৃষ্টিতে তিনি লাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আবু তালেবের লালন-পালন

আবদুল মোত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য সন্তান ও উত্তরাধিকারী আবু তালেব বালক মুহাম্মদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আবু তালেবের সীমাহীন স্নেহ-মমতার দরুন দাদার বিয়োগব্যথা ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মহানবী (সা) দাদার শোক কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। দাদার গুণপ্রশংসা সব সময়ই তাঁর মুখে শোনা যেত।

আবু তালেব শুধু বাল্যকালেই মহানবী (সা)-এর লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করেননি, নবুয়ত লাভের প্রাথমিক দিনগুলোতেও তিনি মহানবী (সা)-কে সর্বক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। ভাতিজার প্রতি তাঁর এই স্নেহ-মমতা ও সাহায্য-সহযোগিতা মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এদিকে আবদুল মোত্তালিবের মৃত্যুতে কুরাইশের বনু হাশিম গোত্র অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছিল তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি এক রকম আঘাত স্বরূপ। কারণ তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির উৎস ছিল আবদুল মোত্তালিবের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব। তাঁর মৃত্যুতে বনু হাশিমের দৃষ্টিতে দুনিয়াময় যেন ঘন অমানিশা নেমে আসল। তাদের গর্বের সব ভরসা, সব উপকরণ যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

আবদুল মোত্তালিবের ছেলেদের কারও মধ্যেই পিতার মতো দৃঢ়সংকল্প, প্রজ্ঞা ও দান-দক্ষিণার গুণ ছিল না। আরবদের উপর পিতার ন্যায় কারও নেতৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তিও ছিল না। আবদুল মোত্তালিব দূর-দূরান্ত থেকে মক্কায় আসা হাজীদের আহ্বারের ব্যবস্থা করতেন। তাদের মিষ্টি পানি সরবরাহ করতেন। খোদ মক্কাবাসীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও বদান্যতা ছিল অসামান্য। যে কোন বিপদ-আপদে আবদুল মোত্তালিব তাদের সহযোগিতায় বুক টান করে এগিয়ে যেতেন। ছেলেদের মধ্যে কেউই পিতার যথাযোগ্য উত্তরাধিকারী হওয়ার মতো ছিল

না। তাদের কেউ ছিল গরীব। কেউ কেউ বিত্তবান ছিল। কিন্তু তারা ধন-সম্পদ আরো বাড়ানোর ফিকির-ফন্দীতে ব্যস্ত থাকত। অপরদিকে কুরাইশদের অপর গোত্র বনু উমাইয়া ছিল বনু হাশিমের পারিবারিক প্রতিদ্বন্দ্বী। তারা সব সময় বনু হাশিমদের সামাজিক মর্যাদা ছিনিয়ে নেয়ার চিন্তা-ভাবনায় থাকত। বনু হাশিমদের দুর্বলতা বনু উমাইয়াদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করে দিল। তারাও এই সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করল। তারা বিনা সংঘর্ষ ও রক্তপাতে বনু হাশিমদের দীর্ঘদিনের সামাজিক পদমর্যাদা ও সম্মানজনক দায়িত্বগুলো হস্তগত করে নিল।

আবদুল মোত্তালিবের ছেলেদের মধ্যে আবু তালেব ছিলেন সবার ছোট। তিনি ছিলেন গরীব। কিন্তু তা সত্ত্বেও বড় ভাইয়ের ছেলে আমাদের প্রিয়নবীর লালন-পালনের দায়িত্ব হাসিমুখে গ্রহণ করলেন। ভাইদের মধ্যে হারিস ছিলেন সবার বড়। তার আর্থিক অবস্থা মাঝারি ধরনের ছিল। আব্বাস ছিলেন বিত্তবান ব্যক্তি। কিন্তু তিনি ধন-সম্পদ আরো বাড়ানোর আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি পিতার সামাজিক পদ ও দায়িত্বগুলোর মধ্যে শুধু 'সেকায়েত' বা হাজীদের মিষ্টি পানি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। 'রেফাদাত' বা হাজীদের খাওয়ানোর ব্যাপারটি ছিল ব্যয়বহুল। কিন্তু তিনি তা এড়িয়ে গেলেন।

গরীব হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের নিকট আবু তালেব ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। সম্ভবত এ জন্যই আবদুল মোত্তালিব আমাদের প্রিয়নবীর লালন-পালন ও দেখাশোনা করার দায়িত্ব আবু তালেবের উপর ন্যস্ত করে যান।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে আবু তালেব বুঝতে পারলেন, তাঁর ভতিজা মেধা, ভদ্রতা, নম্রতা, ন্যায়নিষ্ঠতা তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। মহানবী (সা)-এর এসব অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য তাঁকে চাচার স্নেহের পাশে পরিণত করে। আবু তালেব ভতিজাকে নিজের ছেলেদের চেয়েও অধিক ভালবাসতেন।

সিরিয়ায় প্রথম সফর

মহানবী (সা)-এর বয়স তখন বারো বছর। ব্যবসার উদ্দেশ্যে আবু তালেব সিরিয়া সফরের মনস্থ করেন। সফরের দুঃখ-কষ্ট ও মরুভূমি পাড়ি দেয়ার ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে আবু তালেব ভতিজাকে সঙ্গে না নিয়ে যাওয়াটাই সঙ্গত মনে করেন। কিন্তু মহানবী (সা) এই সফরে চাচার সঙ্গী হওয়ার বায়না ধরেন। আবু তালেব ভতিজার মনক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা চিন্তা করে তাকে সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। বাণিজ্য কাফেলার একজন ক্ষুদে সদস্য হিসাবে মহানবী (সা) সিরিয়ার দক্ষিণাংশে অবস্থিত বুসরা পর্যন্ত পৌঁছান।

ইতিহাস গ্রন্থরাজিতে বলা হয়েছে, এই সফরে বাহীরা নামের এক পাদরী মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। খৃষ্টধর্মীয় গ্রন্থে শেষ নবীর যেসব নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে বাহীরা মহানবী (সা)-এর মধ্যে সেসবই দেখতে পান। কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে দেখা যায়, উক্ত পাদরী কাফেলার সদস্যদের অনুরোধ করেছিলেন আপনারা এই বালককে সিরিয়ায় নিয়ে যাবেন না। সেখানকার ইহুদীরা তার মধ্যে নবুয়তের নিদর্শন দেখতে পেলে তার ক্ষতি করতে পারে।

এই সফরে মহানবী (সা) প্রকৃতির অপরূপ বিচিত্র দৃশ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করেন। এই সুদীর্ঘ সফরে তিনি দিনের বেলায় দেখতে পান প্রকৃতির অপার মহিমা দিগন্তহীন তপ্ত মরু প্রান্তর আর স্বচ্ছ নীল আকাশ। আবার রাতের বেলায় সে আকাশেই দেখতে পান মিটমিটে জ্বলজ্বল অসংখ্য তারার মেলা। প্রকৃতির এই দৃশ্যের সাথে তিনি অনেকটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এই দীর্ঘ পথে তিনি মাদায়েন^১, ওয়াদিউল কোরা ও সামূদ জাতির বিধ্বস্ত জনপদ প্রত্যক্ষ করেন। এসব এলাকা অতিক্রমকালে তিনি প্রাচীন জাতিগুলোর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অনেক তথ্য অবগত হন। আর এসব তথ্য তিনি আপন মনের মণি-কোঠায় গুঁথে রাখেন। এই সফরেই তিনি সিরিয়ার শস্যশ্যামল বাগ-বাগিচা দেখেন। এসব বাগানের নিকট হিজাযের তায়েফের বাগানের কোনই গুরুত্ব ছিল না। মক্কার গাছপালাহীন রুক্ষ পর্বতমালা আর আশপাশের তৃণলতাহীন মরুময় বিজন প্রান্তরের তুলনায় সিরিয়ার শস্যশ্যামল নৈসর্গিক দৃশ্যাবলিও মহানবী (সা)-এর নিকট ছিল স্বর্গের মতো। প্রকৃতির এই অপরূপ মহিমা মহানবী (সা)-এর ভুলে যাওয়ার ব্যাপার ছিল না।

সিরিয়ার মাটিতে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের সাথেও মহানবী (সা)-এর সাক্ষাত হয়। যরথুস্ত্র ধর্ম বিশেষজ্ঞদের সাথেও তাঁর কথাবার্তা হয়। তিনি তাদের নিকট আসমানী কিতাব, খৃষ্ট ও যরথুস্ত্র ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু শোনার সুযোগ পান। অবশ্য এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র বারো বছর। তা সত্ত্বেও এ সময় মহানবী (সা)-এর আত্মিক শক্তি, মেধা, প্রজ্ঞা, গভীর দৃষ্টি ও স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। ভবিষ্যত নবী ছাড়া এই বয়সে কোন ব্যক্তির মধ্যে এরূপ পরিপূর্ণভাবে এসব গুণের সমাবেশ ঘটতেই পারে না। এ বয়সেই মহানবী (সা) প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতির মূলতত্ত্ব অনুধাবন করার প্রয়াস পেতেন।

কিছুদিন পর আবু তালেব সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এই বাণিজ্য সফরে তিনি তেমন লাভবান হতে পারেননি। এ জন্য সম্ভবত তিনি এরপর আর সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরে যাননি। মক্কায়ই জীবনযাপন করেন। তাঁর নিকট যে সামান্য ধন-সম্পদ ছিল এর দ্বারাই কোন প্রকারে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। মহানবী (সা) এ সময় চাচার সাথেই ছিলেন। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তিনি চাচাকে পারিবারিক কাজকর্মে সহযোগিতা করতেন। নিষিদ্ধ মাসগুলোতে মহানবী (সা) কোন সময় চাচার ঘরেই অবস্থান করত। আবার কোন কোন সময় পরিবারের অন্যান্য সদস্য যখন শহরের বাইরে কোন মেলায় যেতো তিনিও চাচার সাথে মেলায় বেড়াতে যেতেন। মক্কার আশেপাশে এ ধরনের মেলায় বাজার ছিল তিনটি। সওকুল ওকায। এটি নখলা ও তায়েফ শহরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে ঘিলকাদ মাসের পয়লা তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত মেলা বসত। সওকুল যুলমাজায। আরাফাতের অদূরে কিরকাবের পাশে এটি অবস্থিত। তৃতীয়টি হচ্ছে সওকুল মুজান্না। এটিও মক্কার অদূরেই অবস্থিত। মহানবী (সা) ছোট বেলায়ই মক্কার আশেপাশের এসব বাজারের মওসুমী মেলায় আরবের শীর্ষস্থানীয়

১. মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে মাদায়েন অবস্থিত। এই স্থানকে মাদায়েনে সালেহ বা হযরত সালেহের শহর বলা হয়। এখানে হযরত সালেহ (আ) নবী হিসাবে আগমন করেন। মদীনা থেকে কিছু উত্তর দিকে ওয়াদিউল কোরা বা কোরা প্রান্তর অবস্থিত। এখানে সামূদ জাতি বাস করত। নাফরমানীর জন্য আল্লাহ তা'আলা এই জাতিকে ধ্বংস করেন। এখানে সামূদ জনপদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। -অনুবাদক

কবি ও কাওয়ালদের উন্নতমানের কবিতা ও গাথা শুনতেন। তিনি নিজের আশ্বাদন-ক্ষমতা অনুযায়ী এসবের তুলনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। তিনি এসবের ভালমন্দ দিকেরও বিচার-বিবেচনা করতেন। এ ছাড়া খৃষ্টান ও ইহুদী বক্তাদের বক্তৃতামালাও তিনি এসব মেলায় শুনতেন। এসব বক্তা তাদের বক্তৃতায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা বলতেন। তাঁরা এইসঙ্গে নিজেদের মতবাদের সমর্থনে তাওরাত ও ইন্জীল থেকে উদ্ধৃতি পেশ করতেন। এসব বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল পৌত্তলিক আরবদের নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা। মহানবী (সা) ইহুদী-খৃষ্টানদের বক্তৃতামালার সারকথা বের করে হৃদয়ঙ্গম করে রাখতেন। তিনি পৌত্তলিকতার তুলনায় ইহুদী-খৃষ্টধর্মকে ভাল করে মনে করতেন। কিন্তু এই দু'টি ধর্মের উপরও তাঁর পুরো আস্থা ছিল না। সারকথা, এই পদ্ধতিতে আল্লাহ তা'আলা শিশুকাল থেকেই মহানবী (সা)-কে ভবিষ্যতে রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য তৈরি করছিলেন।

ফুজ্জারের যুদ্ধ

মহানবী (সা) কিশোর বয়সেই চাচার সাথে সিরিয়া যাওয়ার পথে আরবের তৃণলতাহীন উষর মরুপ্রান্তর অতিক্রম করেন। এসব বিজন মরুভূমিতে তাঁকে সীমাহীন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি মক্কার আশেপাশের মওসুমী মেলাগুলোতে আরবের প্রখ্যাত কবি ও কাওয়ালদের কবিতা ও লোকগাথার সাথে পরিচিত হন। অনুরূপভাবে এসব মেলায় তিনি ইহুদী-খৃষ্ট ধর্ম বিশেষজ্ঞদের সুললিত বক্তৃতামালা ও ধর্মীয় ভাষ্যও শোনার সুযোগ পান। অবশেষে যৌবনে পদার্পণের শুরুতে তিনি একটি যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধের একটি পক্ষ ছিল কুরাইশ গোত্র। কোন এক নিষিদ্ধ মাসে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হরবুল ফুজ্জার বা ফুজ্জারের যুদ্ধ শুরু হয়। অথচ আরবদের রীতি ছিল এসব নিষিদ্ধ মাসে তারা কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়াতো না। এই মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা ঝগড়া-ফাসাদ তাদের নিকট ছিল নিষিদ্ধ ব্যাপার। এসব মাসে তারা ওকায, মুজান্না ও যুলমাজাযের মওসুমী মেলায় বেচা-কেনায় ব্যস্ত থাকত কিংবা নিজ নিজ বংশ-গোত্রের গৌরব-গাথা প্রচার করত। এরপর তারা সদলবলে প্রতিমা দর্শনে কাবার যিয়ারত করত। ওকায ছিল আরবের সবচাইতে বড় মেলা। প্রখ্যাত আরব কবিরা তাদের নির্বাচিত কবিতাগুলো এই মেলায় আবৃত্তি করত এবং শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়িয়ে নিজেদের ধন্য মনে করত। তৎকালীন আরবের সেরা বক্তা কুস্সু ইবনে সায়েদা এই মেলায়ই বক্তৃতা প্রদান করতেন। ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকরাও ওকায মেলার শান্তিময় পরিবেশে নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করত। নিষিদ্ধ মাসের সম্মান রক্ষার্থে কোন পক্ষই প্রতিপক্ষের মতবাদ প্রচারে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করত না। নিষিদ্ধ মাসগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলো প্রতিপক্ষের প্রতি অত্যন্ত সংযম ও সহনশীলতা প্রদর্শন করত। কিন্তু বাররায ইবনে কায়েস কিনানী নামের এক ব্যক্তি যুগ যুগ থেকে চলে আসা এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বসে। সে নিষিদ্ধ মাসের সম্মান ও পবিত্রতা চরমভাবে উপেক্ষা করে ওরওয়াতুর রিহাল নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। নিহত ওরওয়াতুর রিহাল ছিল হাওয়াযেন গোত্রের লোক।

এই হত্যাকাণ্ডের পটভূমি ছিল এই যে, গাস্‌সানের শাসনকর্তা নোমান ইবনে মুনযির প্রতি বছর হীরা (বর্তমান ইরাক) থেকে চামড়ার মশকসহ একটি বাণিজ্য কাফেলা ওকাযের মেলায় পাঠাতেন। তাদের বলে দেয়া হত, মেলা থেকে আসার পথে মশকের বিনিময়ে ইয়ামন থেকে

চামড়া, রশি ও স্বর্ণখচিত থান কাপড় নিয়ে আসবে। বাররায কেনানী নোমান ইবনে মুনযিরের নিকট প্রস্তাব করে, আমি আমার গোত্রের মাধ্যমে আপনার কাফেলাকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেব। অপরদিকে ওরওয়া হাওয়াযেনী নিশ্চয়তা প্রদান করে, আমি নজদের পথে কাফেলাকে হিজাযে নিয়ে যাব। কিন্তু বাররায কেনানী তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। সে এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওরওয়াকে অনুসরণ করে। এক স্থানে এসে বাররায ওরওয়াকে হত্যা করে এবং কাফেলার সব মালপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর বশর ইবনে আবু হাযেম নামের এক ব্যক্তি এসে মেলায় কুরাইশদের খবর দেয় যে, হাওয়াযেন গোত্র তাদের কবীলার নিহত সদস্যের প্রতিশোধ নেয়ার কথা চিন্তা-ভাবনা করছে। কুরাইশরা হেরেমে প্রবেশের আগেই তাদের উপর হাওয়াযেনরা আক্রমণ করে বসে। কিন্তু কুরাইশরা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা মুহূর্তে ওকাযের মেলা থেকে বেরিয়ে এসে হেরেমের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। আর হেরেম বা কাবাঘরের চারপাশের একটা নির্দিষ্ট এলাকা ছিল রক্তপাত নিষিদ্ধ নিরাপদ এলাকা। কুরাইশদের হেরেমের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ার ফলে হাওয়াযেনদের আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তারা কুরাইশদের শাসিয়ে যায় যে, আগামী বছর ওকাযের মেলায় এর প্রতিশোধ নেয়া হবে। পরের বছর তাই হয়। এভাবে বছরে কয়েক দিন করে এই যুদ্ধ চার বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবশেষে যাযাবর গোত্রগুলোর প্রচেষ্টায় এই যুদ্ধের অবসান হয়। যুদ্ধ অবসানের শর্ত হিসাবে সাব্যস্ত হয় যে, যুদ্ধে উভয় পক্ষের নিহতদের হিসাব করে দেখতে হবে কোন্ পক্ষে কত লোক নিহত হয়েছে। প্রতিপক্ষকে অতিরিক্ত নিহতদের 'দিয়্যত' বা রক্তপাতের খেসারত দিতে হবে। কুরাইশ ও হাওয়াযেন উভয়ই এই শর্তে সম্মতি জানায়। অতঃপর নিহতদের হিসাব করে দেখা গেল যে, হাওয়াযেনদের বিশজন বেশি নিহত হয়েছে। কুরাইশরা এই বিশজনের দিয়্যত আদায় করে। এই যুদ্ধের সূচনাকারী বাররাযি তখন থেকে দুষ্কর্মের জন্য আরবে প্রবাদে পরিণত হয়। আর এই যুদ্ধে কুরাইশদের প্রতিপক্ষের ধূর্ত আচরণের জন্য এর নাম দেয়া হয় 'হরবুল ফুজ্জার' বা 'ধূর্তদের যুদ্ধ'।

ফুজ্জারের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা)-এর বয়স কত ছিল, ইতিহাসে তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। কেউ বলেন, এ সময় তাঁর বয়স ছিল পনের বছর। আবার কেউ বলেন, মহানবী (সা) এ সময় বিশ বছরের যুবক ছিলেন। মহানবী (সা)-এর বয়স নিয়ে এই মতপার্থক্যের কারণ হলো, এই যুদ্ধ চার বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। যুদ্ধের সূচনাপর্বে তাঁর বয়স ছিল পনের বছর। আর শেষ হওয়ার সময় ছিল উনিশ-কুড়ি বছর।

ফুজ্জারের যুদ্ধে মহানবী (সা)-এর ভূমিকা সম্পর্কেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এক পক্ষের অভিমত হল, যুদ্ধে প্রতিপক্ষ নিষ্কিণ্ত তীরগুলো কুড়িয়ে এনে তিনি চাচাদের দিতেন। অপরপক্ষ বলেছেন, তিনি একজন যোদ্ধা হিসাবে ফুজ্জারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি শত্রুপক্ষকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়েন। উভয় ভাষ্যই বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। কারণ যুদ্ধের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন কিশোর। তাঁর বয়স ছিল মাত্র পনের বছর। তিনি প্রতিপক্ষ নিষ্কিণ্ত তীরগুলো সংগ্রহ করে চাচাদের নিকট হস্তান্তর করতেন। আর শেষ দিকে তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। এ সময় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং তীর চালানটা বিচিত্র কিছু নয়। যেমন নবুয়ত লাভের কয়েক বছর পর ফুজ্জারে যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে মহানবী (সা) নিজেই বলেছেন :

قد حضرته مع عمومى ورمى فيه بأسهم وما احب انى لم اكن
فعلت -

“আমি নিজেও চাচাদের সাথে ফুজ্জারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। নিজে শত্রুদের প্রতি
তীর নিক্ষেপ করেছি। আর এ ব্যাপারে আমি অনুতপ্ত নই।”

হিলফুল ফুযুল

ফুজ্জারের যুদ্ধ অবসানের পর কুরাইশরা অনুভব করে যে, হাশিম ও আবদুল মোত্তালিবের
মৃত্যুর পর তাদের গোত্রীয় সংহতি একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের কোন কোন
লোকের মাথায় উচ্চাভিলাষ ও পদমর্যাদা লাভের ভূত চেপে বসেছে। এই পরিস্থিতিতে আরবের
অন্যান্য গোত্র মক্কা অধিকারের স্বপ্ন দেখছে। অথচ এর আগে আরবের অন্য কোন গোত্র কূট
উদ্দেশ্য নিয়ে মক্কার দিকে চোখ তুলে তাকাবারও দুঃসাহস করত না। কুরাইশদের মধ্যে এই
অনুভূতি জাগার পর তারা গোত্রীয় অনৈক্য দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

আবদুল মোত্তালিবের পুত্র যোবায়রের প্রচেষ্টায় একদিন কুরাইশরা সবাই একত্রিত হয়।
এই সমাবেশে কুরাইশের বনু হাশিম, বনু যোহরা ও বনু তায়মের সব ক’টি শাখা গোত্র
উপস্থিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের ঘরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর
সবাই একবাক্যে শপথ গ্রহণ করে যে, কোন নিপীড়িতের অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত
আমরা তার পাশে দাঁড়াব, তাঁকে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করে যাব। তারা সবাই
মহান স্রষ্টার নাম নিয়ে এই শপথ গ্রহণ করে। আমাদের প্রিয়নবীও এই শপথ অনুষ্ঠানে
অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই হিলফুল ফুযুল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মহানবী
(সা) বলেছেন :

ما احب ان لى بحلف حضرته فى دار ابن جدعان حمر النعم ولو
دعيت به لاجبت .

“ইবনে জুদআনের ঘরে আমি যে শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলাম, একপাল লাল
উটের বিনিময়েও যদি আমাকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হতো, আমি তা গ্রহণ
করতাম না। আজও যদি কোথাও এ ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং আমাকে তাতে
শরীক হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়, আমি তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করব না।”

ফুজ্জারের যুদ্ধ চার বছর স্থায়ী হলেও সারা বছর এই যুদ্ধ চলত না। প্রতি বছর মাত্র
কয়েক দিন এই যুদ্ধ চলত। এই ক’টি দিন ছাড়া সারা বছরই মক্কার লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য
ও কায়কারবার নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আনন্দ-ফুর্তির আসর বসত। শরাব পান চলত অবাধে।
বাঁদী-দাসীদের সাথে ফষ্টি-নষ্টিও চলত পুরোদমে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, এই পরিবেশে আমাদের
প্রিয়নবীও কি পার্থিব আনন্দ-উল্লাসে অংশগ্রহণ করতেন, না চাচা আবু তালেবের অভাব-অনটনের
দরুন দীন-হীনের জীবন যাপন করতেন এবং লোভাতুর দৃষ্টিতে এসব তাকিয়ে দেখতেন।
মূলত তিনি মক্কা ও এই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে থেকেও এসবের সাথে এতটুকু সম্পর্ক
রাখতেন না। তিনি ছিলেন এসব আনন্দ-ফুর্তির অনেক উর্ধ্বে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে,

কুরাইশদের এই আনন্দঘন পরিবেশ থেকে মহানবী (সা)-এর দূরে থাকার কারণ অর্থাভাব ছিল না। কেননা সেকালে মক্কা ও তার আশেপাশে বসবাসকারী অতি সাধারণ গরীব লোকটিও তার আমোদ-ফুর্তি করার উপকরণ যে কোন প্রকারে যোগাড় করে ফেলত। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিত্তবান লোকদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ধনী কুরাইশরাও তাদের সাথে কুলিয়ে উঠত না। মহানবী (সা) ব্যস্ত থাকতেন অন্য কিছু নিয়ে। যেসব ঘটনা ও অবস্থা তিনি জানতে পেতেন, যেসব তিনি দেখতে পেতেন, সেসবের অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটন নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করাতেই তিনি আনন্দ পেতেন। এসব নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকতেন।

কুরাইশদের ধনী ব্যক্তির তাদের সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার যে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, মহানবী (সা) সেসব থেকেও উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাননি। তিনি রাত-দিন শুধু চিন্তা-ভাবনা করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মন-মস্তিষ্কে যে যোগ্যতা দান করেছিলেন, তিনি তার পুরোপুরি সদ্যবহার করতেন। যৌবনে মহানবী (সা)-এর পবিত্র আত্মা উৎকর্ষের স্তর অতিক্রম করছিল। তিনি মক্কাবাসীদের পদস্থলিত আনন্দ-উল্লাসময় জীবনধারার প্রতি কখনো দৃষ্টিপাত করতেন না। বাহ্যিক জীবন আর প্রাকৃতিক দৃশ্যরাজিতে যে দ্যুতির অভিব্যক্তি ঘটত মহানবী (সা) সেসব প্রত্যক্ষ করতেন। সেসব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাই ছিল তাঁর যৌবনের বছরগুলোর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কারণে কিশোর বয়সেই তাঁর ব্যক্তিতে ভদ্রতা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও সাহসিকতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এজন্য মক্কার অহংকারী লোকেরাও তাঁকে 'আল্-আমীন' বলে অভিহিত করে।

চিন্তা-ভাবনার জীবন

প্রাক-নবুয়ত জীবনে যেসব কাজ বা বৃত্তির মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর চিন্তাশক্তি পরিপক্বতা লাভ করে, তার মধ্যে অন্যতম ছিল রাখালের কাজ। তিনি নবুয়ত লাভের পূর্বে জীবনের একটি অধ্যায়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরাইশ ও মক্কার অন্যান্য গোত্রের কিছু লোকের ছাগল চরাতেন। নবুয়ত লাভের পর তিনি তাঁর এই কাজের প্রশংসা করে বলেছেন :

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَاعِيَ غَنَمٍ بَعَثَ مُوسَى وَهُوَ رَاعِيَ غَنَمٍ -

بَعَثَ دَاوُدَ وَهُوَ رَاعِيَ غَنَمٍ بَعَثْتُ وَ أَنَا رَاعِيَ غَنَمٍ أَهْلِي جِيَاد -

“আল্লাহ তা'আলা যাকেই নবী করে পাঠিয়েছেন, তিনি ছাগলও চরিয়েছেন। মূসাকে নবী করে পাঠিয়েছেন। তিনি ছাগল চরিয়েছেন। দাউদকে নবী করে পাঠিয়েছেন। তিনি ছাগল চরিয়েছেন। আমিও আমার বংশের ছাগল চরিয়েছি।”

একজন রাখালের জীবনধারা অনেকটা এরূপ হয়ে থাকে যে, তার দিন অতিবাহিত হয় দিগন্তহীন খোলা আকাশের নিচে। আর রাতের বেলায় সে আকাশে অসংখ্য তারার মেলা দেখতে পায়। প্রকৃতির এই অপরূপ পরিবেশে সে একান্ত মনে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পায়। এই চিন্তা-ভাবনা তাকে সৃষ্টি-রহস্যের গভীরে নিয়ে যায়। সে যদি বুদ্ধিমান ও সচেতন হয়, তাহলে তার মনে এই ধারণা ও প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আমি কি বায়ু থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছি না? বায়ু ছাড়া কি আমার ধ্বংস, আমার মৃত্যু অবধারিত নয়? চাঁদ-সুরজের কিরণ কি

আমার ধমনীতে প্রবেশ করছে না ? আমার অস্তিত্ব পরস্পর সংশ্লিষ্ট আকাশ-বাতাস ও বিশ্ব-জগতের অন্যসব বস্তুর মধ্যে কি কোন সম্পর্ক নেই ? বিজন মরুপ্রান্তরে খোলা আকাশের নিচে বিচরণরত একজন সচেতন রাখালের মনে এ ধরনের একাধিক প্রশ্ন উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

একজন রাখাল যে কোন পরিস্থিতিতে তার গবাদি পশু হেফাজতের ব্যাপারে সব সময় যত্নবান থাকে। যাতে কোন গবাদি পশু মরুভূমিতে হারিয়ে না যায়, বাঘ কিংবা অন্য কোন হিংস্র জন্তু খেয়ে না ফেলে, তার জন্য রাখাল সব সময় সতর্ক থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে বিশ্ব-ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সে যখন গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে, তখন তার মনে এমন একটি চিত্র অংকিত হওয়াই স্বাভাবিক যে, এসবের একজন পরিচালক ও রক্ষক নিশ্চয়ই রয়েছে। আর বিশ্ব-ব্যবস্থায় যাতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ না পায় সেদিকেও উক্ত রক্ষক সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা যে মানুষটির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে, তার নিকট ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী ও তার আনন্দ-উল্লাসের কোনই গুরুত্ব থাকে না। তার মধ্যে যখন এই বাস্তব সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে কোনই সৌন্দর্য নেই, তখন তার পবিত্র আত্মা মহাশূন্যে বিচরণ করে। তার মধ্যে উর্ধ্বলোকে ভ্রমণের এক অনুপম শক্তির সৃষ্টি হয়। তিনি এই শক্তি আয়ত্ত্ব করে ফেলেন। এসব কারণেই মহানবী (সা) প্রাক-নবুয়ত জীবনে ন্যায়নিষ্ঠতার পরিপন্থী কোন কাজ করেননি। আর এজন্যই তাঁর জীবনের সে অধ্যায়েও মক্কার লোকেরা তাঁকে ‘আল আমীন’ বলে অভিহিত করত।

এই রাখাল জীবনের একটি ঘটনা সম্পর্কে মহানবী (সা) পরবর্তীকালে বলেছেন :

“এক রাতে মক্কার আনন্দ-উল্লাসের কথা আমার মনে পড়ল। অন্য রাখালদের আমি বললাম, আমি শহরে (মক্কা) যেতে চাই। রাতে সেখানেই থাকব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার ছাগলের পাল দেখে-শুনে রাখবে। মক্কায পৌঁছে দেখি এক জায়গায় বিয়ের উৎসব চলছে। আমি এই উৎসব দেখার জন্য থেমে গেলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার চোখে ঘুম চাপল। আমি সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। উৎসবের কিছুই দেখতে পেলাম না। অনুরূপ অপর এক রাতে একই উদ্দেশ্যে শহরে গেলাম। সে রাতে এক জায়গায় গানের আসর বসেছিল। গানের সুললিত ধ্বনি শুনে মনে হচ্ছিল, আকাশের রাগ-রাগিণীরা যেন মর্তে এসে আসর জমিয়েছে। এদিনও হঠাৎ আমার চোখে ঘুম চেপে বসে। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ভোর না হওয়া পর্যন্ত আমার চোখ খোলেনি।”

তৎকালীন মক্কার ভোগ-বিলাসের জীবনধারা মহানবী (সা)-এর মন-মানসিকতার উপর এতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। কারণ তাঁর পবিত্র আত্মার খোরাক ছিল প্রগাঢ় চিন্তা-ভাবনা আর ধ্যান। এতেই তিনি তাঁর আত্মার সজীবতা ও প্রশান্তি লাভ করতেন। মহানবী (সা) তো দূরের কথা, অনেক নিম্নস্তরের লোকের মধ্যেও সেকালের মক্কার জৌলুসময় জীবনধারা কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার ভাবী রাসূল এসবের প্রতি কি করে আকৃষ্ট হবেন ? আর এজন্যই যৌবনে তিনি সকল প্রকার ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-উল্লাস থেকে অনেক অনেক দূরে ছিলেন। এসবের প্রতি তাঁর মন মোটেও যেতো না। চিন্তা-ভাবনা আর ধ্যানই ছিল তাঁর পবিত্র অভ্যাস।

ছাগল চরানো আর চিন্তা-ভাবনা করা বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন মানুষের জন্য লাভজনক বিষয় নয়। মহানবী (সা) এ বিষয়টির ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকা সত্ত্বেও

তাতে অবিচল ছিলেন। বস্তুত তাঁর নিকট বৈষয়িক দিকের কোন গুরুত্বই ছিল না। পৃথিবীর বৈষয়িক উপকরণের সাথে মহানবী (সা)-এর সত্যিকার অর্থে কোন সম্পর্কই ছিল না। ধন-সম্পদ উপার্জনের দিকে মহানবী (সা) কখনো মনোযোগ দেননি। একাকিত্ব ও পরহেযগারীর সাথে তাঁর স্বভাবজাত সম্পর্ক ছিল। জীবন ধারণের পরিমাণ ছাড়া ধন-সম্পদ থেকে সব সময় তিনি দূরে রয়েছেন। নবুয়ত জীবনে কোন এক উপলক্ষে মহানবী (সা) বলেছেন :

“অত্যন্ত ক্ষুধা অনুভব না করা পর্যন্ত যারা খাবার-দাবার স্পর্শ করে না, আমরা হচ্ছি সে শ্রেণীর লোক। পেটে ক্ষুধা থাকতেই আমরা খাওয়া থেকে উঠে পড়ি।”

সারা জীবন তিনি অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টের জীবন যাপন করেছেন। অন্যদেরও তিনি অনুরূপ জীবন যাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। আরাম-আয়েশের জীবন যাপনের প্রবল আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে ধন-সম্পদ অর্জনের প্রত্যাশী করে তোলে। কিন্তু মহানবী (সা) এ ধরনের জীবনধারার আকাঙ্ক্ষা করতেন না। তিনি ছিলেন এরূপ ধারণা থেকে অনেক দূরে। তাঁর মন-মানসিকতা ছিল ধ্যান ও চিন্তা-গবেষণায় পরিপূর্ণ। এটা এক অনুপম আধ্যাত্মিক আনন্দ। এর ফলশ্রুতিতে মানুষ বিশ্বজগত রহস্যের মূলতত্ত্ব লাভ করে। অধিকাংশ মানুষের নিকটই এই আনন্দ সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই আনন্দ লাভের জন্য পার্থিব সম্পদের প্রয়োজন হয় না। এরূপ মহামানবের পক্ষে পার্থিব সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করারও সময় থাকে না। তাঁর সম্পদ, তাঁর ব্যক্তিত্বের গর্ব হলো পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস থেকে মুখ ফিরিয়ে মানবতার উঁচু স্তরগুলো অতিক্রম করা।

জীবনের শুরু থেকেই মহানবী (সা)-এর চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধিৎসার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ তিনি আজন্ম সঙ্গে নিয়ে আসেন। মহানবী (সা) পৃথিবীতে পদার্পণ করার আগেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। মায়ের মুখে তিনি পিতার ইন্তেকালের মর্মান্তিক ঘটনা শুনতে পান। পিতার বিয়োগব্যথার ঘটনাবলি তখনো তিনি মায়ের মুখে শুনছিলেন। হঠাৎ মা সাইয়েদা আমেনাও দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়ে যান। এই ঘটনার পর দাদা আবদুল মোত্তালিব নাতির লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছু দিন পর তিনিও কবরে চিরশয্যা গ্রহণ করেন।

পরপর এসব হৃদয়বিদারক ঘটনা ও বিপদ-আপদে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা মহানবী (সা)-এর আত্মাকে অনেকটা সুদৃঢ় করে তোলে। দুনিয়ার অপবিত্র সাধ-আহলাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ার পথে তাঁর সংকল্পে দৃঢ়তা বৃদ্ধি করতে থাকে। প্রথম জীবনে এসব ঘটনা তাঁর মন-মানসিকতাকে এমনভাবে গড়ে তোলে যে, ধন-সম্পদ তাঁর দৃষ্টিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তাতে করে পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের মতো তিনিও নিজেকে ছাগল চরানোর মতো অতি সাধারণ কাজে নিয়োগ করেন। বস্তুত এরূপ মহামানবদের মধ্যেই পৃথিবীর সবচাইতে অমূল্য সম্পদের সমাবেশ হয়ে থাকে। তারাই মর্তবাসীকে মুক্তি ও নাজাতের পথ প্রদর্শন করেন।

বিবি খাদীজার ব্যবসায়ে মহানবী (সা)

মহানবী (সা)-এর চাচা আবু তালেবের অনেক সন্তান-সন্ততি ছিল। তাঁর আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। তিনি দেখলেন ভাতিজা যুবক হয়ে গেছে। তাঁর মধ্যে বহুমুখী প্রতিভা ও যোগ্যতা রয়েছে। অপরদিকে ছাগল চরানো জীবন যাপনের মতো লাভজনক কাজ নয়। তিনি

তাকে ছাগল চরানোর চেয়ে লাভজনক কোন কাজে নিয়োগ করার মনস্থ করলেন। খুয়ায়লেদের কন্যা বিবি খাদীজা কুরাইশের কোন কোন লোককে তাঁর ব্যবসার প্রতিনিধি হিসেবে ভিন্ন দেশে পাঠাতেন। তিনি ছিলেন একজন শরীফ ও ধনাঢ্য মহিলা। বংশগত দিক থেকে তিনি কুরাইশের আসাদ গোত্রের ছিলেন। তিনি পরপর দুই ব্যক্তির পাণি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর উভয় স্বামী মারা যায়। তারা উভয়ে ছিল বনু মাখযুম গোত্রের। তিনি স্বামীদের রেখে যাওয়া অটেল সম্পদের মালিক হন। তিনি পিতা খুয়ায়লেদ ও কুরাইশ বংশের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কুরাইশ তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বিবি খাদীজা কারো প্রস্তাবই গ্রহণ করেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন, সম্পদের লোভেই তারা তাঁকে বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করছে। তিনি ব্যবসার প্রতিই পুরোপুরি মনোযোগ প্রদান করেন।

আবু তালেব শুনতে পান যে, বিবি খাদীজা কিছু লোককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বাণিজ্যপণ্যসহ সিরিয়া পাঠাচ্ছেন। একদিন তিনি মহানবী (সা)-কে ডেকে বললেন, ভাতিজা! তুমি তো জান আমার পুঁজি নেই। অভাব-অনটন ও প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে সময় কাটছে। আমি জানতে পেরেছি, প্রত্যেককে দুটো করে উট পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করে বিবি খাদীজা কিছু লোককে বাণিজ্য-পণ্যসহ সিরিয়া পাঠাচ্ছে। তুমি যদি এই কাজ করতে চাও, আমি খাদীজার সাথে আলাপ করব। তবে আমি তোমার জন্য এত অল্প পারিশ্রমিকে রাজি হবো না। মহানবী (সা) বললেন, চাচাজান, আপনি আমার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, যা ভাল মনে করেন আমি তাতেই রাজি আছি।

আবু তালেব বিবি খাদীজার নিকট যান। সব খুলে বলেন। তিনি আরো বলেন, অন্যদের মতো আমরা দুই উটের বিনিময়ে কাজ করতে পারব না। তুমি আমার ভাতিজাকে চার উট দিবে। বিবি খাদীজা বললেন, “হে কুরাইশ নেতা! আপনি এমন এক ব্যক্তির জন্য বলছেন, যিনি আমাদেরই গোত্রের লোক এবং সবার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আপনি যদি অন্য গোত্রের আমার কোন শত্রুর ব্যাপারেও এই প্রস্তাব করতেন, আমি আনন্দের সাথে তা মেনে নিতাম।” অতঃপর আবু তালেব বাসায় এসে মহানবী (সা)-কে সব ঘটনা বললেন। তিনি আরো বললেন, তোমাকে এই কাজ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই দান করেছেন।

সফরে যাত্রা

মহানবী (সা) বিবি খাদীজার বাণিজ্য পণ্য নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন। খাদীজা নিজের ক্রীতদাস মাইসারাকে মহানবী (সা)-এর সাথে দেন। আবু তালেবও মহানবী (সা) সম্পর্কে মাইসারাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দেন। সিরিয়ার উষর মরু প্রান্তর, ওয়াদিউল কোরা, মাদায়েন, সামূদ জাতির বিধ্বস্ত জনপদ প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থান হয়ে বাণিজ্য কাফেলাটি এগিয়ে চলে। মহানবী (সা) কিশোর বয়সে একবার চাচা আবু তালেবের সাথে এই পথেই সিরিয়া সফর করেছিলেন। সেই সফরের চিত্র তাঁর পবিত্র স্মৃতিতে হুবহু অংকিত ছিল। সেবারের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি সিরিয়ার দিকে এগিয়ে চলেন। এই সঙ্গে তাঁর স্মৃতিপটে জাগরিত ছিল মক্কার মওসুমী মেলাগুলোর কাব্য ও সাহিত্যের আসর, ইহুদী-খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের ধর্মীয় উপদেশ, মক্কা ও সিরিয়াবাসীদের ধর্ম-বিশ্বাস ও উপাসনার বৈপরীত্য। মোটকথা মক্কা ও

সিরিয়ায় এ পর্যন্ত তিনি যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং যা কিছু শুনেছিলেন সবই তাঁর স্মৃতিপটে আবর্তিত হচ্ছিল।

বুসরায় পৌঁছে তিনি সেখানকার খৃষ্টানদের সংস্রবে যাওয়ার সুযোগ পান। তাদের ধর্মযাজকদের সাথে তাঁর আলাপ-আলোচনা হয়। অগ্নিপূজারীদের একজন বিশেষজ্ঞের সাথেও তাঁর আলাপ হয়। এ সফরে তাঁর ধর্ম সম্পর্কে বিতর্কের ব্যাপারটি ইতিহাস খ্যাত। সম্ভবত এই অগ্নিপূজক ধর্ম বিশেষজ্ঞের সাথেই তাঁর বাহাস হয়েছিল। কারো কারো মতে মহানবী (সা)-এর এই বাহাস একজন খৃষ্টান ধর্মযাজকের সাথে হয়েছিল। এ ব্যাপারটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এবারের সফরে মহানবী (সা) তিন ধরনের মুনাফা অর্জন করেন। প্রথম আর্থিক। বিবি খাদীজার পূর্ববর্তী এবং তাঁর সঙ্গী যে কোন বাণিজ্য প্রতিনিধির তুলনায় তিনি অনেক বেশি লাভ করেন। মহানবী (সা)-এর অমায়িক চারিত্রিক গুণাবলি মাইসারার মনে রেখাপাত করে। তার মনে মহানবী (সা)-এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। সর্বশেষ মুনাফাটি ছিল, এই সফরে অধিক মুনাফা হওয়ায় বিবি খাদীজা মহানবী (সা)-এর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন।

সিরিয়া থেকে ফেরার পথে মহানবী (সা) সেখানকার অনেক পছন্দনীয় বাণিজ্য পণ্য বিবি খাদীজার জন্য কিনে নিয়ে আসেন। বাণিজ্য কাফেলাটি মক্কা শহরের অদূরে মাররাযযাহরানে পৌঁছলে মাইসারা মহানবী (সা)-কে পরামর্শ দেন যে, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আপনি বিবি খাদীজার সাথে সাক্ষাত করবেন। ব্যবসার মুনাফা সম্পর্কে তাঁকে বলবেন। তিনি ব্যবসার খবরাখবর জানার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন। মাইসারার এই পরামর্শ অনুযায়ী মহানবী (সা) দুপুরের তপ্ত রোদের মধ্যেই খাদীজার বাসায় রওয়ানা হন। এদিকে বিবি খাদীজাও বাণিজ্য কাফেলার প্রতীক্ষায় বালাখানার বারান্দায় বসে ছিলেন। তিনি কাফেলার পথ পানে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন মহানবী (সা) উটের উপর সওয়ার হয়ে তাঁর বাসার দিকে আসছেন। খাদীজা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে মহানবী (সা)-কে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর পণ্যের মুনাফার কথা শোনার প্রতীক্ষায় ছিলেন। মহানবী (সা) তাঁর সফরের বিস্তারিত বিবরণ ও সিরিয়ায় অবস্থানকালে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার একটা চমৎকার বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় খাদীজার নিকট ব্যক্ত করেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এসব শুনেছিলেন। ইতিমধ্যে মাইসারাও এসে উপস্থিত হয়। সেও মহানবী (সা)-এর সুন্দর চরিত্র, সূক্ষ্মানুভূতি এবং ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় অনুধাবনে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে খাদীজাকে অবহিত করেন। এসব শুনে খাদীজা মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফ হন।

খাদীজার সাথে বিবাহ

মহানবী (সা)-এর প্রতি বিবি খাদীজার এই সন্তুষ্টি ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। তিন মাস পর্যন্ত এই চল্লিশবর্ষিয়া মহিলার মনের ইচ্ছা মনেই থেকে যায়। তিনি মুখে তা প্রকাশ করতে পারেননি। তাঁর দুইজন স্বামী মারা গেছে। কুরাইশের কয়েকজন প্রভাবশালী লোকের বিয়ের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত, ভদ্র ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এক যুবকের প্রতি। শেষ পর্যন্ত তিনি মনের ইচ্ছা প্রকাশ করার

সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি আপন বোন, অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী ঘনিষ্ঠ বান্ধবী নাফিসার নিকট মনের অব্যক্ত ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নাফিসা তার বান্ধবীর প্রস্তাব নিয়ে মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বিয়ে করছেন না কেন। তিনি বললেন, বিয়ে-শাদী করার জন্য ধন-সম্পদ আমার নিকট নেই। নাফিসা বললেন, যদি কোন শরীফবাদী সব খরচ বহন করার শর্তে আপনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে, আপনি তাতে সম্মত কিনা। মহানবী (সা) বললেন, তিনি কে? নাফিসা বললেন, খাদীজা। মহানবী (সা) বললেন, তিনি কেন আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন। নাফিসা বললেন, আমি খাদীজার দায়িত্ব গ্রহণ করছি। আপনি রাজি আছেন তো? মহানবী (সা) সম্মতি জানালেন।

মহানবী (সা) নিজেও মনে মনে এরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করেননি। কারণ তিনি জানতেন, খাদীজা কয়েকজন প্রভাবশালী কুরাইশের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এরপর খাদীজার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব আসে যে, অমুক দিন অমুক সময় আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে আসবেন। আমার আত্মীয়-স্বজনরাও সে সময় উপস্থিত থাকবে। আর সে মজলিসেই আমাদের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হবে।

বিবি খাদীজার পিতা খুয়ায়েদ ফুজ্জারের যুদ্ধে মারা যান। এজন্য বিয়েতে বিবি খাদীজার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন তাঁর চাচা আমর ইবনে আসাদ। বিবি খাদীজার পিতা সম্পর্কে একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে তিনি এই বিয়েতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এজন্য খাদীজা পিতাকে প্রচুর মদ খাইয়ে নেশাতুর অবস্থায় সম্মতি আদায় করেন। নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরাজিতে এই বর্ণনার কোনও সমর্থন নেই।

বিবি খাদীজার সাথে বিয়ের পর মহানবী (সা)-এর জীবনে এক নতুন দিকের সূচনা হয়। তাঁর পবিত্র জীবনে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়।

১. সেকালের আরব নারীদের স্বাধীনতা ছিল যে, তারা নিজেরাই পছন্দমত বর নির্বাচন করতে পারত। বিয়ের সব লেনদেন নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারত। আর এজন্যই বিবি খাদীজা চাচা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও নিজের বিয়ের সব কিছু নিজেই ঠিক করে নেন। -অনুবাদক

দাম্পত্য জীবন থেকে নবুয়ত লাভ

মহানবী (সা)-এর সাথে হযরত খাদীজার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সেকালে সম্ভ্রান্ত আরবদের রীতি অনুযায়ী বিশটি উট বিয়ের মোহর ধার্য হয়। হযরত খাদীজার অনুরোধে মহানবী (সা) স্ত্রীর বাড়িতেই অবস্থান করেন। ২৫ বছর বয়সে মহানবী (সা) তাঁর পূত-পবিত্র যৌবন হযরত খাদীজার নিকট সমর্পণ করেন। হযরত খাদীজার ঘরে মহানবী (সা)-এর ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলে কাসেম ও আবদুল্লাহ শিশুকালেই মারা যান। তাঁদেরকে তৈয়্যব ও তাহের উপনামেও ডাকা হতো। হযরত খাদীজার গর্ভে চার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা মহানবী (সা)-এর সীমাহীন স্নেহ-মমতা লাভ করেন।

দেহাকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

দেহাকৃতির দিক থেকে মহানবী (সা) আকর্ষণীয় সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তিনি বেঁটে কিংবা খুব লম্বা ছিলেন না। তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির। পবিত্র শির পরিমাণ মতো বড় ছিল। মাথার চুল ছিল কালো এবং কোঁকড়ানো। প্রশস্ত ললাট এবং কেশভর্তি ভ্রু ছিল। ভ্রুর ভিতরের উভয় দিক মিলিত ছিল। তাঁর পবিত্র চক্ষুদ্বয় ছিল কালো ও ডাগর। চোখের সাদা অংশ ছিল অত্যন্ত ফরসা। সাদা অংশের চারদিকে ঘুরান লাল রেখা ছিল। এই রেখা মহানবী (সা)-কে আরো আকর্ষণীয় করেছিল। যেকোন বিষয় দ্রুত বুঝে নেয়ার নিদর্শন তাঁর পবিত্র চক্ষুদ্বয়ে পরিস্ফুট ছিল। চোখের পাতা ছিল কালো ও লম্বা। খাড়া নাক, হালকা রেখাবিশিষ্ট দাঁত, ঘন দাড়ি, লম্বা অথচ সুন্দর ঘাড়, প্রশস্ত বক্ষ, হাত-পায়ের তালু নরম তুলতুলে এবং পবিত্র শরীরের রং ছিল উজ্জ্বল। তিনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দ্রুত চলতেন। চলার সময় এক অতুলনীয় ভঙ্গিতে মাটিতে পা ফেলে চলতেন। তাঁকে দেখলে মনে হতো চিন্তা-ভাবনার নিদর্শন যেন পবিত্র চেহারা থেকে টপকে পড়ছে। তাঁর দৃষ্টিতে এক বিস্ময়কর আকর্ষণ ছিল। যেকোন লোক এই দৃশ্য দেখলে অনুগত হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যেতো। এমন দেহ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মহানবী (সা)-কে বিয়ের পর হযরত খাদীজা যদি তাঁর ব্যবসার দায়িত্বভার চাপিয়ে না থাকেন এবং তাঁকে (সা) চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান করার নিরুপদ্রব সুযোগ করে দিয়ে থাকেন, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

মহানবী (সা) বংশগত দিক থেকে মক্কায শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। হযরত খাদীজার সাথে বিয়ের পর আর্থিক সচ্ছলতাও তাঁর পদচুম্বন করে। মক্কাবাসীরা আগেও তাঁকে ঈর্ষা ও সম্মানের

১. অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে হযরত খাদীজার ঘরে মহানবী (সা)-এর পুত্র সন্তান ছিলেন দু'জন।

কারো কারো মতে তিনজন। -অনুবাদক

দৃষ্টিতে দেখত। এবার এই সম্মান আরো বৃদ্ধি পেলো। কিন্তু মহানবী (সা)-এর নিকট এই আর্থিক সচ্ছলতা ও সম্মান গর্বের বিষয় ছিল না। আল্লাহর কৃপায় তিনি ছিলেন এসবের প্রতি সম্পূর্ণ মোহমুক্ত। তিনি যে কোন লোকের সাথে মেলামেশা ও ওঠা-বসা করতে দ্বিধা বা ইতস্তত করতেন না। সবার সাথে হাসিমুখে মেলামেশা করতেন। এই অমায়িক ব্যবহারে মক্কাবাসীদের নিকট তাঁর প্রভাব ও মর্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। তা সত্ত্বেও তিনি সবার সাথে অত্যন্ত বিনয় ও উদার মন নিয়ে মিশতেন। সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তিনি বলতেন কম। শুনতেন বেশি। অনেক সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক কথা তিনি শুনতেন। কখনো তাঁকে অবাস্তব কোন কথা বলতে শোনা যায়নি। হাসার সময় অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সামনের পবিত্র দাঁত প্রকাশ পেতো। কিন্তু রাগ হলে তার বহিঃপ্রকাশ বড় একটা দেখা যেতো না। শুধু পবিত্র কপাল ঘর্মাক্ত হতো। রাগান্বিত অবস্থায়ও তিনি কোন প্রকার অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতেন না। তাঁর মধ্যে রাগ হজম করার অসাধারণ শক্তি ছিল। বিপদে ধৈর্য ধারণ করতেন। অমায়িক ব্যবহার দ্বারা যুলুম-নিপীড়নের জবাব দিতেন। দৃঢ়সংকল্প ও অমায়িক ব্যবহার ছিল তাঁর চরিত্রে স্বভাবজাত, প্রকৃতি প্রদত্ত। তাঁর এই অনুপম চরিত্র মাধুর্য পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট স্বীকৃত ব্যাপার ছিল। সবাই তাঁকে নিয়ে গর্ব করত। প্রতিটি লোক তাঁকে সম্মান করত। তাঁর সাথে যে কোন লোকের মেলা-মেশার সুযোগ ঘটত, সে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়ত। মহানবী (সা)-এর এই চরিত্র মাধুর্য, গুণাবলি ও অনুসরণীয় স্বভাব সবচাইতে রেখাপাত করেছিল জীবনসঙ্গিনী হযরত খাদীজার মনে। তিনি মহানবী (সা)-এর প্রতি বিশেষভাবে প্রীত ছিলেন।

কা'বার পুনর্নির্মাণ

মহানবী (সা) সামাজিক জীবনে মক্কার অন্যান্য অধিবাসীদের সাথে মিলেমিশে চলতেন। কোন কোন সময় পবিত্র কা'বাঘর ও এর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করতেন। কারণ কা'বাঘরের চারদিকে বেষ্টনী প্রাচীর ছিল না। এজন্য কা'বাঘরের প্রাচীরে সামনের পাহাড় থেকে নেমে আসা বৃষ্টির পানির ধাক্কা লাগত। তাতে প্রাচীরের বাইরের দিকের বেশ ক্ষতি হয়। অনেক স্থানে ফাটল দেখা দেয়। কা'বাঘরের এরূপ ক্ষতি হওয়ার সাথে সাথে তাতে রাখা মূল্যবান সামগ্রী চুরি হয়ে যাওয়ার আশংকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর আগেও মক্কার অধিবাসীরা কা'বাঘর সংস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাতে কা'বার প্রভু রুষ্ট হয়ে শাস্তি দেন কিনা, এই আশংকায় তারা কা'বাঘর মেরামত থেকে বিরত থাকে। মূলত এটা ছিল আইয়ামে জাহিলিয়াতে কুসংস্কারের ফল। সেকালে একটা কল্পকাহিনী প্রচলিত ছিল যে, কা'বাঘর মেরামতের উদ্যোগ নেয়া হলে আসমানী বালা বা মুসীবতের শিকার হতে হবে। কিন্তু আকস্মিক বন্যার ফলে কা'বাঘরে বিরাট ফাটল দেখা দেয়। দ্রুত মেরামত না করা হলে ঘরটি যে কোন সময় ধসে যাওয়ার প্রবল আশংকা ছিল। এজন্য আল্লাহর শাস্তির ভয় থাকা সত্ত্বেও মক্কাবাসীকে কা'বাঘর রক্ষার জন্য উদ্যোগ নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে কা'বাঘর পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হয়।

হঠাৎ পবিত্র মক্কায় এ কথা ছড়িয়ে পড়ে, জিদার নিকট ঝড়ের কবলে পড়ে একটি জাহাজ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এই জাহাজটি ছিল বাকুম নামক এক রোমান বণিকের। নির্মাণকাজে

বাকুমের বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি একজন কাঠমিস্ত্রিও ছিলেন। মক্কাবাসীরা এই বিধ্বস্ত জাহাজটি কেনার সিদ্ধান্ত নেন। তারা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার নেতৃত্বে কয়েকজনকে জিদ্দায় বাকুমের নিকট পাঠান। বাকুমকে মক্কায় গিয়ে কা'বাঘর মেরামত ও পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে সম্মত করেন। তাকে সাহায্য করার জন্য মক্কায় অবস্থানরত এক মিসরীয় কিবতীকে সম্মত করা হয়। এই কিবতী কাঠ ও নির্মাণকাজে বেশ অভিজ্ঞ ছিল।

হাজারে আসওয়াদ স্থাপন

কুরাইশের বিভিন্ন গোত্র কা'বাঘরের সীমানা একাধিক ভাগে বিভক্ত করে নেয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, কা'বাঘরের একেক দিকের প্রাচীর একেকটি গোত্র ভাঙবে। কিন্তু কোন গোত্রই দেয়াল ভাঙা শুরু করার সাহস পাচ্ছিল না। অবশেষে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ভয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে এগিয়ে যান। তিনি বিভিন্ন দেব-দেবীর নাম নিয়ে রোকনে ইয়ামনীর একটি অংশ ভেঙে ফেলেন। প্রকৃতি ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাকে কি শাস্তি প্রদান করেন, তার আশংকায় কুরাইশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অত্যন্ত ভয়-ভীতির ভিতরে সারা রাত কাটালো। সকালে উঠে তারা দেখতে পেলো, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার কিছুই হয়নি। এরপর তাদের সব ভয়ভীতি কেটে গেলো। তারা কা'বাঘরের দেয়াল ভাঙা শুরু করল। মহানবী (সা)-ও এই কাজে অংশগ্রহণ করেন। দরজার দেয়াল ভাঙার পর একটি বিরাট পাথর পাওয়া গেল। তাতে কোদাল চালিয়েও কিছু করা সম্ভব হলো না। অবশেষে এটাকে পুনর্নির্মাণের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হলো। আশপাশের পাহাড় থেকে নীলাভ পাথর সংগ্রহ করে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। কা'বাঘরের দেয়াল মাথার সমান উঁচু করার পর হাজারে আসওয়াদ বা কালো পাথরটি পুরনো জায়গায় স্থাপনের পালা এলো। কিন্তু কোন্ গোত্র এই পাথর স্থাপনের গৌরব নেবে, এ নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। এই বিবাদ দীর্ঘায়িত হলো। এক পর্যায়ে বনী আবদুদ্দার ও বনী আদি গোত্র শপথ গ্রহণ করল, তারা অন্য কোন গোত্রকে হাজারে আসওয়াদ স্থাপন করতে দেবে না। বনী আবদুদ্দার শুধু মৌখিকই শপথ করল না, তারা এক বাসন রক্ত নিয়ে এসে তাতে হাত ডুবিয়ে নিজেদের শপথকে সুদৃঢ় করল। এই ঘটনার পর বনী আবদুদ্দারকে 'লাআকাতুদ্-দাম্ম' বা রক্ত লেপনকারী উপাধি দেয়া হলো।

আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরা মাখ্যুমী কুরাইশদের মধ্যে একজন প্রবীণ ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। কুরাইশদের এই বিবাদের কথা শুনে তিনি এগিয়ে এলেন। এ সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি প্রস্তাব করলেন, আগামীকাল ভোরে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি সাফার দিকের দরজা দিয়ে কা'বাঘরে প্রবেশ করবেন, তাকেই সালিস মানতে হবে। তিনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন সবাইকে তা মেনে নিতে হবে। কুরাইশদের সবক'টি গোত্র আবু উমাইয়ার এই প্রস্তাব গ্রহণ করল। পর দিন আমাদের প্রিয়নবী (সা) সবার আগে উক্ত দরজা দিয়ে কা'বাঘরে প্রবেশ করেন। তাঁকে দেখে সবাই একবাক্যে বলে উঠল, "ইনি হচ্ছেন আমীন বা বিশ্বাসী। আমরা সবাই তাঁর ফায়সালা মেনে নিতে রাজি আছি।"

এ কথার পর কুরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা মহানবী (সা)-এর নিকট গেলেন। তাঁরা মহানবী (সা)-এর নিকট ঘটনা খুলে বললেন। মানুষের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তাদের

ইচ্ছা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত না হলে তারা তা মেনে নেবে না। তারা তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মহানবী (সা) পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করে বললেন, একটি চাদর নিয়ে আস। চাদর নিয়ে আসা হলো। তিনি নিজের হাতে হাজারে আসওয়াদটি উঠিয়ে চাদরের মাঝখানে রাখলেন। এরপর বললেন, প্রত্যেক গোত্র থেকে আপনারা কয়েকজন চাদরের বিভিন্ন প্রান্ত ধরে নিয়ে যান। এভাবে নিয়ে যাওয়া হলে মহানবী (সা) পুনরায় নিজ হাতে পাথরটি উঠিয়ে যথাস্থানে রেখে দেন। তাঁর এই সুন্দর মীমাংসার মাধ্যমে একটা বিরাট সংঘর্ষ ও রক্তপাত বন্ধ করা সম্ভব হলো এবং কা'বাঘর নির্মাণ কাজে প্রতিবন্ধকতাও দূর হলো। কিছুদিনের মধ্যেই কুরাইশরা কা'বাঘরের পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করল। এবারের নির্মাণে কা'বাঘরের প্রতিটি দেয়াল আঠারো গজ উঁচু করা হলো। আর দরজাটি বেশ উঁচুতে করা হলো। এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল, কা'বাঘরে প্রবেশকারীদের প্রতি যেন লক্ষ্য রাখা যায় এবং যাকে ইচ্ছা প্রবেশ থেকে যেন বিরত রাখা যায়। কা'বাঘরের ভিতরে দুই সারিতে ছয়টি স্তম্ভ তৈরি করা হলো। আর রোকনে শামীর দিকে ভিতরে কয়েকটি সিঁড়ি নির্মাণ করা হলো। এসব সিঁড়ির মাধ্যমে সহজে ছাদে ওঠার ব্যবস্থা করা হলো। হোবল প্রতিমা ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু চুরি হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। এগুলো কা'বাঘরে সযত্নে সংরক্ষণ করা হলো।

কা'বাঘর পুনর্নির্মাণ ও হাজারে আসওয়াদ স্থাপনের সময় মহানবী (সা)-এর বয়স সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর। ইবনে ইসহাক বলেছেন, তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর। এ সময় মহানবী (সা)-এর বয়স যাই হোক না কেন, তবে এ কথা সত্য যে, হাজারে আসওয়াদ নিয়ে ঝগড়া মীমাংসার জন্য কুরাইশরা মহানবী (সা)-কে সালিস মেনেছিল। এই দায়িত্ব ন্যস্ত করার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, প্রাক-নবুয়ত জীবনেও কুরাইশদের নিকট মহানবী (সা)-এর স্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। তারা তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখত। তিনি তাদের নিকট অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

কুরাইশ নেতৃবর্গ ও মূর্তিপূজা

হাজারে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে মতভেদ, বনু আবদুদ্দারের রক্তমাখা শপথ এবং মহানবী (সা)-এর সালিসীর মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, সে সময় মক্কাবাসী, বিশেষ করে কুরাইশদের ঐক্য-সংহতি বলতে কিছুই ছিল না। আগের মতো কোন এক ব্যক্তির হাতে এই শহরের নেতৃত্ব সুসংহত ছিল না। তাদের পূর্বপুরুষ কুসাইর শ্রেষ্ঠত্ব, হাশিমের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং আবদুল মোত্তালিবের শান-শওকত এক এক করে সবই বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আবদুল মোত্তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশদের বিশৃংখলা আরো চরম আকার ধারণ করে। বনু উমাইয়া ও বনু হাশিম নিজ নিজ শক্তি বাড়ানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তাতে করে মক্কার নিরাপত্তাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। কুরাইশদের নিজেদের মধ্যে এই বিশৃংখলার সুযোগে আরবের যে কোন গোত্র মক্কা নগরী দখল করে নিতে পারত। কিন্তু সেকালে আরবের প্রতিটি গোত্রের নিকট মক্কানগরী ছিল অত্যন্ত পূত-পবিত্র স্থান। তাই তারা মক্কানগরী দখলের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার আক্রমণাত্মক অভিযান থেকে বিরত থাকে।

ইহুদী ও খৃষ্টানরা কুরাইশদের পারস্পরিক বিশৃংখলার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে। মক্কায় তাদের ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। তারা তাদের ধর্মীয় মতবাদ প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি

শব্দও উচ্চারণ করতে পারত না। কুরাইশদের বিশৃংখলার সুযোগে ইহুদী-খৃষ্টানরা প্রকাশ্যে পৌত্তলিকতার সমালোচনা আরম্ভ করল। তাতে মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য বাসিন্দাদের অনেক লোক ইহুদী ও খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে প্রতিমার প্রতি চরম ঘৃণার সৃষ্টি হয়। এ সময় পৌত্তলিকতা আঁকড়ে থাকার প্রধান কারণ হলো, সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রাখার এটা ছিল একমাত্র উপায়। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মীয় দিক থেকে মক্কানগরীর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার মাধ্যমও ছিল এই পৌত্তলিকতা। কারণ ভৌগোলিক অবস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে সে যুগে মক্কানগরী ছিল কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী। এজন্য এ নগরীর অধিবাসীরা সচ্ছল জীবন যাপন করছিল। পবিত্র মক্কানগরীর কেন্দ্রীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলে এখানকার বাসিন্দাদের সচ্ছল জীবনধারা ব্যাহত হওয়ার আশংকা ছিল। এসব কিছু সত্ত্বেও পৌত্তলিকতার প্রতি মক্কানগরীর বাসিন্দাদের বিশ্বাসের ভিত্তি অনেকটা নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল।

কুরাইশদের ধর্ম-বিশ্বাসের এই পরিবর্তন সম্পর্কে একটি ঘটনা ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়্যা দেবতার উৎসব উপলক্ষে নখলা নামক স্থানে একবার কুরাইশরা সমবেত হয়। এক পর্যায়ে এই সমাবেশ থেকে চার ব্যক্তি আলাদা হয়ে অন্যত্র গিয়ে বসে। এই চারজন হলো য়ায়েদ ইবনে আমর, ওসমান ইবনে হুয়ায়রিস, উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশ ও ওয়ারাকা ইবনে নওফল। তারা প্রত্যেকে নিজেদের ধর্মমত সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে। তাদের একজন বলে :

“আমরা কী ‘অজ্ঞতায় পড়ে’ আছি। আমরা যেসব পাথরের তাওয়াফ করছি, এগুলোর কোনও কথা শোনারও শক্তি নেই এবং দেখারও শক্তি নেই। এসব কারো কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না। অথচ এসব আমাদের বলি দেয়া পশুর রক্তে সাঁতার কাটতে থাকে। চল আমরা সবাই মিলে অন্য কোনও ধর্মের শরণাপন্ন হই।”

এই চারজনের মধ্যে ওয়ারাকা ইবনে নওফল খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। বলা হয়ে থাকে তিনি ইন্জীল বা বাইবেলের একটা অংশ আরবী ভাষায় রূপান্তর করেন। ওবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশ মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। ইসলামের আবির্ভাবের পর তিনি এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি অন্যান্য মুসলমানের সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে গিয়ে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। খৃষ্টান অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান ইসলাম ধর্মেই অবিচল থাকেন। পরবর্তীতে মহানবী (সা) তাঁকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন। য়ায়েদ ইবনে আমর স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে কিছু দিনের জন্য মক্কার বাইরে চলে যান। ইরাক ও সিরিয়ার বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ান। কিন্তু ইহুদী কিংবা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেননি। এমন কি পৈতৃক ধর্ম পৌত্তলিকতা থেকেও সরে দাঁড়ান। অবশেষে মক্কায় ফিরে আসেন। একবার তিনি কা'বাঘরের প্রাচীরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ফরিয়াদ করে বলেছিলেন :

“হে আল্লাহ! আমি যদি জানতে পারি, তুমি অমুক ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট, তা হলে আমি সে ধর্মই গ্রহণ করে তোমার ইবাদত করব। কিন্তু আমি জানি না, তুমি কোন্ ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট।”

অবশিষ্ট ছিল ওসমান ইবনে হুয়ায়রিস। এই লোক হযরত খাদীজার আত্মীয় ছিল। সে কোসতান্তানিয়া বা কনস্টান্টিনোপলে চলে যায়। সেখানে সে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। ধীরে ধীরে সে রোমান সম্রাটের দরবারে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। মক্কাতে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সে সম্রাটকে পরামর্শ দান করে। তাকে মক্কায় সম্রাটের গভর্নর নিয়োগ

করার জন্যও অনুরোধ করে। তার এই অনুরোধ রক্ষা করা হয়। সে মক্কায় গভর্নর হয়ে আসলে মক্কাবাসীরা তাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং মক্কা থেকে বের করে দেয়। সে সিরিয়ার হীরায়ে (বর্তমান ইরাকে) গাস্‌সানের শাসকের নিকট চলে যায়। এখানে সে মক্কাগামী বাণিজ্য কাফেলার যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য গাস্‌সান শাসককে পরামর্শ দেয়। মক্কার অধিবাসীরা এই খবর জানতে পেরে অনেক উপটৌকনের বিনিময়ে গাস্‌সান শাসককে বাধ্য করে ফেলে। আর গাস্‌সানীদের মাধ্যমেই বিষ খাইয়ে ওসমানকে হত্যা করা হয়।

মহানবী (সা)-এর সন্তান-সন্ততি

মহানবী (সা) অত্যন্ত সুখে-শান্তিতে পারিবারিক জীবন যাপন করছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) একজন অনুগত স্ত্রী হিসাবে নিজের স্বামীর সেবা-যত্ন করছিলেন। মহানবী (সা)-এর সেবা-যত্ন ও আনুগত্যে যাতে এতটুকু ত্রুটি না হয় হযরত খাদীজা (রা) তার জন্য আত্মাণ চেষ্টা করতেন। হযরত খাদীজা (রা)-এর ঘরে মহানবী (সা)-এর দুই পুত্র সন্তান — আবদুল্লাহ ও কাসেম (তাইয়েব ও তাহের উভয়ের উপনাম) এবং চার কন্যা সন্তান — যয়নব, রোকেয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা জন্মগ্রহণ করেন। কাসেম ও আবদুল্লাহ সম্পর্কে শুধু এই জানা যায় যে, তারা আইয়্যামে জাহিলিয়াত বা অজ্ঞতার যুগে শিশুকালে ইন্তেকাল করেন। তাঁদের মৃত্যুতে পিতামাতা অত্যন্ত দুঃখ পান। বিশেষ করে মাতা হযরত খাদীজা (রা) ছেলেদের মৃত্যুতে খুবই ব্যথিত হন। তাদের অসুস্থ অবস্থায় তিনি দেব-দেবীদের উদ্দেশে বলতেন, “তোমরা তাদের প্রতি কেন সদয় হচ্ছে না। কেন তোমরা আমাকে বিরহ-বেদনাবিধুর করতে চাচ্ছ।” মহানবী (সা)-ও তাঁর ছেলেদের মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখ পান। তিনি তাঁদের ভুলতে পারছিলেন না। হযরত খাদীজা (রা)-এর চেহারায়ে সন্তানদের বিয়োগ ব্যথার চিহ্ন দেখলেই মহানবী (সা)-এর মনও দুঃখ ভরাক্রান্ত হয়ে উঠত।

সে যুগে আরব দেশে মেয়ে সন্তান হলে অনেকে জ্যাক্ত কবর দিয়ে ফেলত। এরূপ পরিবেশে সহজে অনুমান করা যায় যে, কাসেম ও আবদুল্লাহর মৃত্যুতে মহানবী (সা) ও হযরত খাদীজা (রা) কিরূপ ব্যথিত হয়েছিলেন। মহানবী (সা) ও হযরত খাদীজার অত্যন্ত ব্যথিত হওয়ার এবং সন্তানের আকাঙ্ক্ষা হওয়ার আর একটি স্পষ্ট প্রমাণ হল, হযরত য়ায়েদ ইবনে হারেসার ঘটনা। হযরত য়ায়েদকে দাস হিসাবে বিক্রির জন্য নিয়ে আসা হয়। মহানবী (সা) হযরত খাদীজা (রা)-কে বললেন, একে কিনে নাও। স্বামীর অনুরোধে হযরত খাদীজা য়ায়েদকে কিনে নিলেন। এরপর মহানবী (সা) য়ায়েদকে মুক্ত করেন এবং নিজের পালক ছেলের মর্যাদা দান করেন। তিনি মানুষের নিকট য়ায়েদ ইবনে হারেসার পরিবর্তে য়ায়েদ ইবনে মুহাম্মদ (সা) হিসাবে পরিচিত হন। ইসলামের আবির্ভাবের পর হযরত য়ায়েদ (রা) মহানবী (সা)-এর অন্যতম প্রিয়তম সাহাবী হিসাবে পরিগণিত হন।

ইসলামের আবির্ভাবের পর আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে কন্যা সন্তানদের জ্যাক্ত কবর দেয়ার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। মহানবী (সা) নিজেও কোনও

১. হযরত খাদীজা (রা)-এর এই মন্তব্য নির্ভরযোগ্য কোনও ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তিনি মূর্তিপূজা করেছেন কিনা, তারও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। এমনকি সীরাতে ইবনে হিশামে এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। লেখকের এই মন্তব্য অনেকটা কল্পনাপ্রসূত বলা যায়। -অনুবাদক

এক প্রসঙ্গে বলেছেন, “বেহেশত তোমাদের মায়েদের পায়ের নিচে।” এই ঘোষণার দরুন ইসলামে নারীরা আরো উঁচু মর্যাদায় স্বীকৃত হয়।

মহানবী (সা) তাঁর তৃতীয় সন্তান ইবরাহীমের মৃত্যুতেও অত্যন্ত মর্মান্বিত হন। ছেলে সন্তানদের ইন্তেকালে মহানবী (সা)-এর অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হওয়ার ব্যাপারটি একটি স্বীকৃত বিষয়। এই তিনটি ঘটনায় মহানবী (সা)-এর জীবনে খুবই প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি এও দেখেছেন যে, প্রাক-ইসলামী যুগে কাসেম ও আবদুল্লাহর অসুস্থতার দিনগুলোতে হযরত খাদীজা (রা) সন্তানদের আরোগ্য কামনা করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে একাধিক বলিদান করেছেন। কিন্তু তাতে কোন উপকার হয়নি। এসব মানত ও বলি দেয়া সত্ত্বেও সন্তানদের বাঁচানো সম্ভব হয়নি। দেবতারা সন্তানদের জীবন রক্ষা করতে পারেনি। এসব ঘটনার অসারতা মহানবী (সা)-এর সুষ্ঠু চিন্তাশক্তিকে আরো সুদৃঢ় করে তোলে।

মহানবী (সা)-এর কন্যা সন্তান

মহানবী (সা) বংশমর্যাদার দিক থেকে সমপর্যায়ের পরিবারের পাত্রদের নিকট তাঁর কন্যাদের বিয়ে দেন। হযরত যয়নব ছিলেন কন্যাদের মধ্যে সবার বড়। আবুল আস ইবনে রবী'র সাথে হযরত যয়নবের বিয়ে হয়। আবুল আস ছিলেন হযরত খাদীজার বোনের ছেলে। সফল ব্যবসায়ী ও ধনী হিসাবে তিনি নিজ গোত্রে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সব দিক থেকে এই সম্বন্ধ উপযুক্ত ছিল। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর হযরত যয়নব মদীনাতে হিজরত করার ইচ্ছা করেন। তাতে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। হযরত রোকেয়ার বিয়ে উতবার সাথে এবং উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয় ওতায়বার সাথে। তারা উভয়ে ছিল আবু লাহাবের ছেলে। ইসলামের আবির্ভাবের পর আবু লাহাব তার ছেলেদের তাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে বাধ্য করে। শেষ পর্যন্ত আবু লাহাবের ইচ্ছাই কার্যকর হয়। তালাক দেয়ার পর হযরত উসমান প্রথমে হযরত রোকেয়াকে বিয়ে করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন। সে সময় হযরত ফাতেমা ছোট ছিলেন। ইসলামের আবির্ভাবের পর হযরত আলীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

নির্জন হিরা গুহায় ধ্যান

মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনের প্রাক-নবুয়তের এই অধ্যায়টি বেশ সুখে-শান্তিতে কাটছিল। যদি কাসেম ও আবদুল্লাহর বিয়োগ ব্যথা না হতো, হযরত খাদীজা (রা)-এর প্রগাঢ় ভালবাসা ও আনুগত্য মহানবী (সা)-এর অন্তরে এতটুকু দুঃখ-ব্যথা আসতে দিত না। এই সুখ-শান্তিময় অবস্থায় মহানবী (সা)-এর গভীর চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধিৎসা পুরাদস্তুর অব্যাহত ছিল। তিনি প্রতিটি ব্যাপারেই গভীর চিন্তা-ভাবনা করতেন। তাঁর আশেপাশের লোকেরা দেব-দেবীদের মহান স্রষ্টার সমতুল্য মনে করত। মহানবী (সা) এসব লোকের মুখে দেব-দেবীর প্রশংসাকীর্তন শুনতেন। পক্ষান্তরে এসব দেব-দেবীর বিরুদ্ধে ইহুদী-খৃষ্টানদের কঠোর সমালোচনার সাথেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজের বিশেষ পদ্ধতিতে এসব নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করত। তিনি সব সময়ই এসব রহস্য উদঘাটনের চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার পরম উদ্দেশ্য ছিল, মহানবী (সা)-কে ওহী ধারণের পূর্ণ ক্ষমতাবান করে গড়ে তোলা। আর এই ওহী বা বাণীর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীকে আকর্ষণ-নিমজ্জিত

পাপ-পংকিল ও পথভ্রষ্টতার অভিশাপমুক্ত করার মনস্থ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা)-এর উপর ন্যস্ত দায়িত্বের মতো এত বড় দায়িত্ব অতীতেও আল্লাহ তা'আলা কাউকে দান করেননি এবং ভবিষ্যতেও কাউকে তা দান করবেন না। আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা)-কে ওহী ধারণ করার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা দান করেছিলেন। অনুরূপ যোগ্যতা, মানসিক ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর আর কোন বান্দাকে দান করেননি। এ জন্যই মহানবী (সা) অন্যদের মতো নিজের ভাগ্য ও ভবিষ্যত ঘটনাবলি জানার জন্য কোন গণকের নিকট যেতেন না। এমনকি তিনি প্রাক-নবুয়ত জীবনে সমকালীন কোন জ্ঞানী-গুণীর সাথে মত বিনিময় ও পরামর্শও করতেন না। অথচ সে সময় খোদ মক্কাতেই ওয়ারাকা ইবনে নওফলের মতো প্রখ্যাত জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মহানবী (সা) সত্যের সন্ধানে সব সময় একাকী গভীর চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন থাকতেন। নিজের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও অবস্থা সম্পর্কে তিনি কখনও আকার-ইঙ্গিতেও কাউকে কিছু বলতেন না।

সে যুগে একটা রীতি ছিল, চিন্তাশীল ব্যক্তির বহরের একটা নির্দিষ্ট সময় জনপদ থেকে দূরে কোথাও গিয়ে একাকী উপাসনায় নিমগ্ন হতেন। এসব করার উদ্দেশ্য ছিল দেব-দেবীর নৈকট্য লাভ করা। এরূপ উপাসনাকারীরা মনে করত, এই পদ্ধতিতে তিনি দেবতাদের অনুগ্রহ লাভের অধিকারী হন। এরূপ পদ্ধতিতে উপাসনা করাকে বলা হত তাহানুছ বা 'নির্জনবাস'। মহানবী (সা) এ ধরনের নির্জনবাসকে গভীর চিন্তা ও ধ্যানের উত্তম মাধ্যম হিসাবে মনে করতেন। এরূপ নির্জন ধ্যানে মহানবী (সা)-এর আত্মা প্রশান্তি লাভ করত। তিনি সব সময় মহাসত্যের সন্ধানে ব্যাকুল থাকতেন। তাঁর এই অনুসন্ধিৎসা দিন দিন উন্নতি লাভ করতে থাকে।

পবিত্র মক্কা থেকে দুই মাইল দূরে হিরা গুহা ছিল নির্মল ধ্যানের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত স্থান। মহানবী (সা) ধ্যানের জন্য এই স্থানটি বেছে নেন। তিনি প্রতি বছর পবিত্র রমযান মাস হিরা গুহায় অতিবাহিত করতেন। সেখানে যাওয়ার সময় তিনি সারা মাসের জন্য বাসা থেকে কিছু খাদ্যবস্তু সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এই হিরা গুহায় তিনি বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একাধি চিন্তে গভীর চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর ধ্যানে নিমগ্নতা এত প্রগাঢ় হত যে, খাওয়া-দাওয়া, এমনকি নিজের সম্পর্কেও কোন প্রকার চেতনা থাকত না। নির্জন হিরা গুহায় তাঁর সামনে ভেসে উঠত সত্যের উপর যেন কৃত্রিমতার অন্ধকার আবরণ পড়ে আছে। গভীর ধ্যানের মাধ্যমে তাঁর সামনে এই সত্য স্পষ্টতর হয়ে উঠত যে, মানুষ কল্পনার কানুন দ্বারা সত্যকে ঢেকে রেখেছে।

প্রাক-নবুয়ত জীবনে মহানবী (সা) ছিলেন সত্যের সন্ধানী। তিনি ইহুদী-খৃষ্টানদের গ্রন্থরাজির প্রতি চোখ তুলেও তাকাতেন না। বিশ্বজগত, নির্মল আকাশ, উজ্জ্বল তারকারাজি, চাঁদ-সুরজ, দিগন্তহীন মরুপ্রান্তর (যেখানে দিনের বেলা সূর্যের আগুনে কিরণ পড়ে এবং রাতে চাঁদ তার মিষ্টি আলোর পসরা নিয়ে নেমে আসে), সাগর ও তার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা এবং একক সত্তার অস্তিত্বের নিদর্শন ও অন্যান্য বস্তু ছিল মহানবী (সা)-এর চিন্তা-গবেষণা ও ধ্যানের বিষয়বস্তু। নির্জন হিরা গুহায় মহানবী (সা)-এর চোখের সামনের সকল পর্দা, সকল আবরণ দূর হয়ে যেত। তাঁর পবিত্র আত্মার দর্পণে বিশ্বজগত সৃষ্টি-রহস্যের পুরো চিত্র ভেসে উঠত। মানুষ যে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে, এ বিষয়টি মহানবী (সা)-এর দিব্য দৃষ্টির সামনে লুক্কায়িত ছিল না। এ ব্যাপারটি অনুধাবন করতে তাঁর বড় একটা চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন পড়ত না। দৃষ্টান্ত হিসাবে

উল্লেখ করা যায়, নিম্নের বিষয়গুলো মহানবী (সা) প্রাক-নবুয়ত জীবনে যথাযথভাবে অনুধাবন করেছিলেন।

প্রতিমা কি? এসব কারও উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে না। কাউকে সৃষ্টি করারও এসবের সামর্থ্য নেই। এসব কারো জীবিকার সংস্থান করতে পারে না। মোটকথা, কোন কিছু করারই এসবের ক্ষমতা নেই। হোবল, লাত, ওয়যা ও অন্য যেসব প্রতিমা কা'বাঘরের ভিতরে ও বাইরে চারদিকে রয়েছে, এগুলো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না। এই যেসব প্রতিমার অবস্থা, তারা মক্কার অধিবাসীদের কী উপকার করতে পারে?

সত্য কি? এই সুবিশাল বিশ্বজগত, পৃথিবী, আকাশ এবং চাঁদ-সুরুজ-তারকারাজির মধ্যে সত্য কোথায় লুকিয়ে আছে? আমরা এর সন্ধান কোথায় করব? আলো আর উত্তাপের উৎস চাঁদ-সুরুজ ও তারকারাজির মধ্যে কি সত্য লুকিয়ে রয়েছে? এসব গ্রহ-উপগ্রহ কি আমাদের পৃথিবীর মতো ঘূর্ণায়মান? আকাশের স্তরের অনেক অনেক উর্ধ্বে মহাশূন্যে কি সত্য লুকিয়ে আছে?

মহাশূন্য কি? আমাদের জীবনের মতো কি মহাশূন্য ক্ষণস্থায়ী? মহাশূন্য কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে? পৃথিবী কি কোন আকস্মিক ঘটনার পরিণতিতে অস্তিত্ব লাভ করেছে? কিন্তু আমাদের জীবন ধারা ও পৃথিবীতে একটা সুষ্ঠু পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। আর আকস্মিক ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা কোন আইনের মাধ্যমে হয় না। মানুষ যেসব খারাপ ও ভাল কাজ করছে, এসব কাজে কি তারা স্বাধীন? এসব কি তারা নিজ ইচ্ছায় করছে, না প্রকৃতির ইচ্ছায় করে চলেছে? মহানবী (সা) হিরা গুহায় সাধারণত এ ধরনের প্রশ্নাবলি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা ও ধ্যান করতেন। তাঁর এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল সত্যের সন্ধান করা, সত্য লাভ করা এবং মানব জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করা। মহানবী (সা) হিরা গুহায় এসব সমস্যা নিয়ে এমনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে পড়তেন যে, কখন সকাল হলো, কখন দিন শেষে সন্ধ্যার নিকট কালো আঁধার নেমে আসল, তা তিনি টেরও পেতেন না। পবিত্র রমযান শেষে মহানবী (সা) বাড়ি ফিরে আসতেন। তখনও তাঁর পবিত্র চোখে-মুখে গভীর চিন্তার প্রভাব পরিস্ফুট থাকত। কোন কোন সময় হযরত খাদীজা মহানবী (সা)-এর মন-মানসিকতার স্বাভাবিকতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়তেন। তিনি তাঁর কুশলাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন।

মহানবী (সা)-এর প্রাক-নবুয়ত জীবনে হিরা গুহায় ধ্যান, সাধনা ও ইবাদতের পদ্ধতি সম্পর্কে আলেম সমাজের একাধিক অভিমত রয়েছে। ইবনে কাসীর তাঁর ইতিহাস (আল-বেদায়া ওয়ান্নেহায়া) গ্রন্থে কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেছেন, এই সময়ে মহানবী (সা) হযরত নূহ (আ)-এর শরীয়তের অনুসারী ছিলেন। কেউ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ), কেউ বলেছেন, হযরত মূসা (আ) আবার কেউ কেউ বলেছেন, হযরত ঈসা (আ)-এর শরীয়তের অনুসারী ছিলেন। একদল আলেমের অভিমত হল, যে শরীয়ত মহানবী (সা)-এর গভীর ধ্যান ও দিব্যদৃষ্টিতে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল, তিনি তারই অনুসরণ করতেন। আলেমদের এই অভিমতটিই বাস্তব ও যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। মহানবী (সা)-এর ধ্যান ও অনুসন্ধিৎসার সাথেও এই অভিমতটি অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ।

সত্য স্বপ্ন

মহানবী (সা) প্রতি বছর রমযান মাসের শুরুতে হিরা গুহার নির্জনতায় চলে যেতেন। সেখানে তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হতেন। এভাবে কয়েক বছর তিনি হিরা গুহায় যাতায়াত

করেন। ইতিমধ্যে তাঁর চিন্তাশক্তি সুদৃঢ়তা লাভ করে। অবশেষে তা উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছায়। তাঁর মন-মানসিকতায় মহাসত্য উদভাসিত হয়। এর আলোকে তিনি উপলব্ধি করেন, পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। এখানকার ধনৈশ্বর্য, শান-শওকত সবই তুচ্ছ। এসবের কোন মূল্য নেই। এ সময় তাঁর নিকট এও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মক্কার মানুষ অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার চোরাবালিতে ফেঁসে গেছে। পৌত্তলিকতা তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন একেবারে ধ্বংস করে ফেলেছে। এ সময় এ কথাও মহানবী (সা)-এর নিকট অস্পষ্ট ছিল না যে, ইহুদী-খৃষ্টানদের ধর্মীয় আবেদন মানুষকে সৎপথে আনতে পারবে না। কারণ তাদের ধর্মের আবেদন এককালে পূত-পবিত্র ও নির্ভেজাল থাকলেও এখন তা পৌত্তলিকতা প্রভাবিত। মহাসত্য বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে উক্ত দু'টি ধর্মীয় আবেদনের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর চিন্তাশক্তি এ সময় এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তিনি উপলব্ধি করেন, মহাশক্তি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। তিনি রহমান, তিনি রহীম। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক। মানুষ তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে থাকে। যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ ভাল কাজও করে, সে তার শুভফল লাভ করে। যে পাপ করে, সে অবশ্যই তার শাস্তি ভোগ করে। বেহেশত-দোযখ বাস্তব সত্য। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুই ইবাদত করে, তার ঠিকানা হবে দোযখে।

মহানবী (সা) চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন। হিরা গুহায় তাঁর ধ্যান যথারীতি চলে। সেখানে তিনি স্বপ্নে যা কিছু দেখতে পেতেন তাতে তাঁর ঈমানের সুদৃঢ়তা আরো গভীর হতো। বাতিল বিষয় তাঁর নিকট পূর্বের চাইতে ঘৃণ্যতর হিসাবে প্রতীয়মান হয়। এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা)-এর অন্তরকে শাস্বত ও চিরন্তন সত্যের দিকে আকৃষ্ট করেন। তাঁর মন-মস্তিষ্কের যোগ্যতা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। হঠাৎ আল্লাহ তা'আলার দিকে মহানবী (সা)-এর ধ্যানের গতি পরিবর্তিত হয়। এ পর্যায়ে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজের কওমের পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। এ অবস্থায় তিনি রাতের পর রাত বিন্দি কাটিয়ে দিতেন। দিনের পর দিন রোযা রাখতেন। এভাবে তিনি নিজের চিন্তাশক্তির প্রসারতা ঘটাতে থাকেন। কখনও কখনও তিনি হিরা গুহা থেকে মরুভূমিতে পায়চারি করতেন। আবার গুহায় প্রবেশ করতেন। যেসব বিষয় মনে এসেছে কিংবা যা কিছু স্বপ্নে দেখেছেন, সেসব নিয়ে গভীর ধ্যানমগ্ন হতেন, তন্ময় হয়ে ভাবতেন আর ভাবতেন। এভাবে তিনি হিরা গুহায় ছ'মাস কাটিয়ে দেন। এক পর্যায়ে নিজের এই কর্মধারার পরিণাম ভেবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি বাড়ি চলে আসেন। এবারের দীর্ঘ সময় হিরা গুহায় অবস্থানকালীন সব ঘটনা হযরত খাদীজার নিকট খুলে বলেন। তিনি আরও বলেন, 'ভয় হচ্ছে আমার উপর জিন আছর করে বসে কিনা।' অনুগতা স্ত্রী হযরত খাদীজা মহানবী (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "আপনি আমীন বা বিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব। জিন আপনার নিকট আসার সাহস করবে না।" কিন্তু এ সময় তাঁদের দু'জনের কারো কল্পনাও হয়নি যে, এরূপ আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর শ্রেষ্ঠ বান্দাকে রিসালাতের মতো সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী করে তুলছেন।

ওহীর সূচনা

একদিন মহানবী (সা) হিরা গুহায় ঘুমিয়ে আছেন। এ সময় একটি লেখা পাতা হাতে করে এক ফেরেশতা আসেন। তিনি সেটি মহানবী (সা)-এর সামনে ধরে বলেন, 'পড়ুন'। মহানবী

(সা) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলেন, ‘আমি কি পড়ব।’ তিনি অনুভব করেন, উক্ত ফেরেশতা তাঁকে সজোরে আলিঙ্গন করে বলছেন, ‘পড়ুন’। তিনি পুনরায় জবাব দেন, ‘আমি কি পড়ব।’ এরপর ফেরেশতা মহানবীকে আবার আলিঙ্গন করে বলেন, ‘পড়ুন’। এবার তিনি রীতিমত ভয় পান। আশংকা করেন, আবারও তাঁকে আলিঙ্গন করা হবে। তবু তিনি এবারও জবাব দেন, ‘তাতে আমি কি পড়ব।’ ফেরেশতা বলেন :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

“পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন — সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পড়, তোমার প্রতিপালক মহিমাম্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন — শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।”

মহানবী (সা) ফেরেশতার সাথে সাথে এসব বাক্য উচ্চারণ করেন। ফেরেশতা চলে যাওয়ার আগেই এগুলো মহানবী (সা)-এর অন্তরে অঙ্কিত হয়ে যায়। এ স্বপ্ন শেষ হতেই মহানবী (সা)-এর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি বিস্মিত হয়ে ভাবেন, আমি এসব কি দেখলাম। চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, এখানে কোন জিন আছে কিনা। কিন্তু এমন কিছু তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো না। মুহূর্তে তাঁর শরীর কাঁপা শুরু হল। হিরা গুহার প্রতিও তাঁর মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়। এখান থেকে সরে পড়াই কল্যাণকর মনে করেন। তিনি দ্রুত বাড়ির দিক রওয়ানা দেন। পথে বারবার তাঁর মনে পড়ছিল, যিনি আমাকে পড়ার জন্য বাধ্য করলেন, তিনি কে ছিলেন। এসব কথা চিন্তা করে তিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভয়-ভীতির মধ্য দিয়ে পথ চলছিলেন। তার আগে আধ্যাত্মিক সাধনার ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরে মহাসত্য উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশদের পৌত্তলিকতার ভিতর যে অন্ধকার আবরণ ছিল মহানবী (সা)-এর সামনে থেকে তা বিদূরিত হয়ে গিয়েছিল। বিস্তৃত দিগন্ত পর্যন্ত তিনি শুধু আলো দেখতে পাচ্ছিলেন। এই পবিত্র আলোর উজ্জ্বল আভায়ে প্রতিমারা অন্ধকার সলজ্জ চেহারা নিয়ে কেটে পড়েছিল। এই নূর বা আলো যে মহাসত্তার সন্ধান দিচ্ছিল, তা ছিল এক ও অদ্বিতীয় মহান স্রষ্টার নূরের দ্যুতি। বস্তুত তিনিই মহানবী (সা)-কে সৎ পথের সন্ধান দিচ্ছিলেন। মহানবী (সা)-এর চিন্তাশক্তি এ পর্যন্ত এসে আবার গতি পরিবর্তন করে। তিনি ভাবেন, সে ব্যক্তি কে ছিলেন, যিনি আমাকে বললেন, আল্লাহর স্মরণ সজীব রেখ। “আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে কলমের মাধ্যমে যেসব কথা শিখিয়েছেন তা তারা আগে জানত না।” ভাবনার এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে তিনি পাহাড়ের মাঝখানে এসে পড়েছেন। হঠাৎ তিনি তাঁকে ডাকার আওয়ায শুনতে পেলেন। এই ধ্বনি শুনে মহানবী (সা) আরও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি আকাশের দিকে তাকান। তিনি দেখেন, এক সুদর্শন মানুষরূপী ফেরেশতা তাঁকে ডাকছেন। তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে যান। ফেরেশতার দিক

১. প্রাথমিক যুগের চরিতবিদ এবং হাদীসবিদদেরও একটি শ্রেণী বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা)-এর স্বপ্নে ওহীর সূচনা হয়েছিল। লেখক তাঁর গ্রন্থে এই অভিমতটি উদ্ধৃত করেছেন। এ অভিমত পোষণকারীদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে ইসহাক, ইবনে কাসীর, আবু নাসিম ইসফাহানী প্রমুখ। কিন্তু হাদীসবিদদের অপর একটি শ্রেণীর অভিমত হলো, প্রথম ওহীর ঘটনা মহানবী (সা)-এর জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল। এ সম্পর্কে বুখারী শরীফে একটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। -অনুবাদক

থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। কিন্তু তিনি যে দিকেই তাকান দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ফেরেশতাকে দেখতে পান। তিনি একবার সামনে বাড়েন আবার পিছনে যান। কিন্তু ফেরেশতার সুন্দর আকৃতি কিছুতেই দৃষ্টির আড়াল করতে পারছিলেন না। বেশ কিছু সময় সেখানেই তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন।

হযরত খাদীজা মহানবী (সা)-কে খোঁজ করার জন্য এক দাসীকে হিরা গুহায় পাঠিয়ে দেন। সন্ধানকারী মহানবী (সা)-কে সেখানে না পেয়ে ফিরে আসে। এদিকে ফেরেশতার আকৃতি বিলীন হওয়ার পর মহানবী (সা) ভীত-সন্ত্রস্ত ও অস্থির অবস্থায় বাড়ি পৌঁছান। ঘরে ঢুকেই তিনি হযরত খাদীজাকে বলেন, ‘তাড়াতাড়ি আমাকে কাপড় জড়িয়ে দাও।’ হযরত খাদীজা মহানবী (সা)-কে একটি কম্বল দ্বারা ঢেকে দেন। এ সময় তিনি জ্বরাক্রান্তের মতো ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। এই অস্থির ভাব কিছুটা প্রশমিত হওয়ার পর তিনি হযরত খাদীজাকে জিজ্ঞেস করলেন, বল তো আমার কী হয়েছে? তিনি পুরো ঘটনা স্ত্রীকে খুলে বলেন। সবশেষে বলেন, “খাদীজা! আমার ভয় হচ্ছে আমি কোন অন্যায় করে বসেছি কিনা। অথবা কোন শত্রু আমাকে জাদু করেছে কিনা।” হযরত খাদীজা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পন্থায় মহানবী (সা)-কে সান্ত্বনা প্রদান করলেন। তিনি অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে বললেন :

“হে আমার চাচাতো ভাই!” আপনার জন্য এসব শুভ সংবাদ। আপনি দীর্ঘজীবী হোন! যার হাতে আমার জীবন আমি সে মহাসত্তার শপথ করে বলছি, আমি আশা করি আপনাকে এই উম্মতের নবুয়তের মহান দায়িত্ব প্রদান করা হবে। আল্লাহর শপথ! আপনি কখনও ব্যর্থ হবেন না। কারণ আপনি মানুষের সাথে সত্য কথা বলেন। আপনি মেহমানদের খাতির-যত্ন করেন। অন্যদের জন্য দুঃখ-কষ্ট বরণ করা আপনার পবিত্র অভ্যাস।”

হযরত খাদীজার উপরোক্ত সান্ত্বনা বাণীতে মহানবী (সা)-এর ভয়-ভীতি ও অস্থিরতা কেটে যায়। তিনি হযরত খাদীজার দিকে ধন্যবাদ ও স্নেহ-ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকান। এরপর ক্লাস্তি দূর করার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা) কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর এই ঘুম ছিল ভবিষ্যত জীবনের অগ্রদূত। এই পবিত্র জীবনে তিনি যুগপতভাবে আধ্যাত্মিকতায় চরম উৎকর্ষ লাভ করবেন। এর সাহায্যে নবুয়ত ও রিসালাতের মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করবেন। এই সঙ্গে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হবেন এবং মানবতার অগ্রগতি ও স্থায়িত্বের দায়িত্ব পালন করবেন। সত্যের প্রতি আহ্বানই তাঁর পবিত্র জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। রিসালাতের প্রচার ও প্রসার তিনি এমন সুন্দরভাবে করবেন যে, মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাতে এতটুকু ত্রুটি থাকবে না।

وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ -

“এবং আল্লাহ তাঁর নূর বা আলো পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন- যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।” (৬১: ৮)

নবুয়ত থেকে হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

এ সময় মহানবী (সা) গভীর ঘুমে ছিলেন। হযরত খাদীজা পাশে বসে বেশ কিছুক্ষণ ভালবাসার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। এরপর দেখলেন, মহানবী (সা) ঘুমিয়ে পড়েছেন। হযরত খাদীজা সেখান থেকে উঠে বাইরে চলে আসেন। তিনি অত্যন্ত মানসিক দ্বন্দ্ব পড়ে যান। একদিকে আশাবিত্ত হচ্ছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁর স্বামী রিসালাতের মর্যাদা লাভ করবেন। তাঁর মাধ্যমে পথভ্রষ্ট জাতি সৎপথের সন্ধান পাবে। অপরদিকে শংকিত হচ্ছিলেন যে, এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ স্বামী বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন কিনা। মহানবী (সা) হযরত খাদীজাকে যেসব ঘটনা শুনিয়েছিলেন, এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভিতর তিনি সেসব স্মরণ করছিলেন। এই সঙ্গে সে ফেরেশতার কথাও কল্পনা করেন, যিনি রিসালাতের বাণী পৌছানোর পর বেশ কিছুক্ষণ আকাশে বিরাজ করছিলেন। পবিত্র কোরআনের যে কটি বাক্য মহানবী (সা) হযরত খাদীজাকে শুনিয়েছিলেন, সেগুলোও তাঁর মনে পড়ে। এসব চিন্তা-ভাবনার ভিতর দিয়ে কখনও তাঁর চোখে-মুখে আনন্দময় দৃশ্য ফুটে উঠত, আবার কখনও ভবিষ্যত শংকার এক ভীতিজনক রূপ পরিগ্রহ করত। এই আশা ও শংকার দ্বন্দ্ব হযরত খাদীজা বেশ ক্লান্ত ও হযরান হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে তিনি এ ব্যাপারে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেয়ার মনস্থ করেন।

হযরত খাদীজা ও ওয়ারাকা ইবনে নওফেল

এই সমস্যার সমাধান লাভের উদ্দেশ্যে হযরত খাদীজা তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের শরণাপন্ন হন। ওয়ারাকা ইবনে নওফেল কিছু দিন আগে পৌত্তলিকতা ছেড়ে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইন্জীল কিতাবের কিছু অংশ আরবীতে অনুবাদ করেন। হযরত খাদীজা পুরো ব্যাপারটা ওয়ারাকার নিকট খুলে বলেন। তিনি সবকিছু গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনেন। অবশেষে বলেন :

“যে মহাসত্তার নিকট আমার জীবন, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, হে খাদীজা! তুমি যা বলছ যদি সেভাবেই এসে থাকেন, তা হলে হযরত মূসা (আ)-এর নিকট যিনি এসেছিলেন তিনি সেই ফেরেশতা। তিনি (মহানবী) এই উম্মতের নবী। তাঁকে বলে দাও, তিনি যেন বিপদ-আপদে ঘাবড়ে না যান। তিনি যেন অটল থাকেন।”

হযরত খাদীজা ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের নিকট আশার বাণী শুনে ঘরে ফিরে আসেন। মহানবী (সা) তখনো ঘুমিয়ে ছিলেন। হযরত খাদীজা স্বামীর পাশে বসে পড়েন। প্রীতিময় দৃষ্টিতে মহানবী (সা)-কে দেখছিলেন। ইতিমধ্যে মহানবী (সা)-এর পবিত্র শরীর কাঁপা শুরু

হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়। পবিত্র কপাল ঘর্মসিক্ত হয়ে ওঠে। হঠাৎ মহানবী (সা) জেগে ওঠেন। এটা ছিল তাঁর নিকট ওহী নাযিল হওয়ার সময়ের বিশেষ অবস্থা। এ সময় ফেরেশতা নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতটি নিয়ে আসেন :

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنْذِرْ - وَرَبُّكَ فَكْبَرُ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ - وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ .

“হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! ওঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। আর তোমার ভূষণ পবিত্র কর। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। আর অধিক পাওয়ার আশায় অন্যকে কিছু দিও না। এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর।”
(৭৪ : ১-৭)

হযরত খাদীজা মহানবী (সা)-এর বিশেষ অবস্থা দেখতে পেয়ে খুশীতে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন এবং আরাম করুন। মহানবী (সা) তাঁর সহধর্মিণীকে বললেন, ‘খাদীজা! ঘুম ও আরাম করার দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন জিবরাঈল (আ) আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। মানুষকে তাঁর ইবাদত করার আহ্বান জানানোর জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। কিন্তু খাদীজা, আমি কিভাবে এই আহ্বান জানাবো। কে আমার এই আহ্বানে সাড়া দেবে।’

এ কথা শুনে হযরত খাদীজা মহানবী (সা)-কে সান্ত্বনা দান করে বললেন, আপনি অটল থাকুন। এই সঙ্গে তিনি ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের সাথে তাঁর আলাপ-আলোচনার কথাও মহানবী (সা)-কে বললেন। এরপর হযরত খাদীজা বললেন, ‘আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।’

মহানবী (সা)-এর নবুয়তের প্রতি হযরত খাদীজা (রা)-এর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ দীর্ঘ দশ বছর থেকে তিনি মহানবী (সা)-এর সহধর্মিণী হিসাবে জীবন যাপন করছেন। এই দীর্ঘ সময় মহানবী (সা)-এর সাহচর্যে থেকে হযরত খাদীজা (রা)-এর নিকট এ সত্য প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, সততা, আমানতদারী, তাকওয়া ও ন্যায়নিষ্ঠতার মতো গুণাবলি মহানবী (সা)-এর মধ্যে পুরোপুরি রয়েছে। তিনি অধিকাংশ সময় মহানবী (সা)-কে গভীর চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন দেখতে পেয়েছেন। তাঁর এ কথা জানা ছিল যে, মহানবী (সা)-এর চিন্তা-গবেষণা ও ধ্যানের পরম লক্ষ্য ছিল সত্যের সন্ধান। তাঁর এও জানা ছিল যে, তিনি পৌত্তলিকদের বাতিল ধ্যান-ধারণাকে বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব প্রদান করেন না। হিরা গুহা থেকে প্রত্যাবর্তন ও ওহীর সূচনা লগ্নে হযরত খাদীজা (রা) এই বিষয়টিও পুরোপুরি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, এই বিরাট দায়িত্ব মহানবী (সা)-কে কিরূপ ব্যাকুল ও চিন্তাশ্রিত করে তুলেছে।

এক পর্যায়ে হযরত খাদীজা (রা) ফেরেশতাকে দেখার আশ্রয় প্রকাশ করেন। একবার ফেরেশতা আসলে মহানবী (সা) হযরত খাদীজা (রা)-কে প্রথমে বামদিকে, এরপর ডান দিকে এবং সর্বশেষে সামনে বসিয়ে রাখেন। এই তিন অবস্থায়ই ফেরেশতা মহানবী (সা)-এর নিকট অবস্থান করেন। কিন্তু হযরত খাদীজার কাপড় মাথা থেকে পড়ে গেলে ফেরেশতা লুকিয়ে

যান। তাতে হযরত খাদীজার প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আমার স্বামীর নিকট যিনি ওহী নিয়ে আসেন, তিনি অবশ্যই ফেরেশতা, শয়তান নন।

ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের সাক্ষাৎ

একদিন মহানবী (সা) কা'বাঘর তওয়াফ করার জন্য যান। কা'বাঘরের নিকটে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের সাথে মহানবী (সা)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁর সব ঘটনা ওয়ারাকা ইবনে নওফেলকে সবিস্তারে বলেন। ওয়ারাকা এসব ঘটনা শুনে মন্তব্য করেন :

“আল্লাহর শপথ! আপনি এই উম্মতের রাসূল। যে নামুস বা জিবরাঈল ফেরেশতা মূসার নিকট এসেছিলেন, তিনিই আপনার নিকট এসেছেন। মানুষ আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। কষ্ট দেবে। এই শহর থেকে নির্বাসন করবে। আপনার সাথে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে। আমি যদি সে সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে সত্যের সহায়তা করব।”

এসব কথা বলার পর ওয়ারাকা ইবনে নওফেল মহানবী (সা)-এর দিকে এগিয়ে যান এবং তাঁর পবিত্র ললাটে চুমো দেন। ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের এসব কথা শুনে মহানবী (সা) অনুধাবন করেন যে, তাতে সত্যতা রয়েছে। তিনি বুঝতে পারেন যে, সত্যি তাঁর উপর এক বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। এবার তিনি মহাভাবনায় পড়েন, কুরাইশদের কিভাবে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানানো হবে। মহানবী (সা)-এর অন্তরে এই ধারণা এজন্য সৃষ্টি হয়েছিল যে, কুরাইশরা তাদের বাতিল বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ়সংকল্প ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে তাদের কোন নতুন ধর্মের প্রতি আহ্বান জানানোর অর্থ হলো, তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। মহানবী (সা) কুরাইশদের সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বানের জন্য একটি চিত্র মনে মনে ঠিক করে নিলেন। তিনি ভাবলেন, তারা সম্পূর্ণ পথভ্রষ্ট। আর আমি যে মহান স্রষ্টার প্রতি তাদের আহ্বান জানাবো, তিনি সত্য, তিনি চিরন্তন। সুতরাং যে করেই হোক, সত্য ও চিরন্তনের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করতে হবে। তাদের অন্তর অপবিত্র ও বাতিল ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত করতে হবে। এরপর মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আমি তাদের বলব, ‘অন্তর থেকে প্রতিমার শ্রেষ্ঠত্ব ঝেড়ে ফেলে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর। বংশ-মর্যাদা নয়, ভাল কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার জন্য আমি তাদের শিক্ষা দিব। তাদের বলব, গরীব-দুঃখীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। পাথরের প্রতিমা তৈরি করে এসবের পূজার মাধ্যমে মুক্তির আশা ত্যাগ কর। কারণ পাথরের মূর্তির উপাসনা মানুষের অন্তরকে পাথরের চেয়েও কঠিন করে তোলে। আমি তাদের সুদ খাওয়া এবং ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ থেকে দূরে থাকার জন্য অনুরোধ করব। আকাশ-পৃথিবী ও আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য সৃষ্ট জীব ও বস্তু সম্পর্কে অনুসন্ধান ও চিন্তা-গবেষণা করার জন্য আমি তাদের অনুপ্রাণিত করব। তাতে তাদের অন্তর বলিষ্ঠ হবে। তারা মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে। দেবদেবীর পূজা-অর্চনা থেকে নিজেদের পূত-পবিত্র রাখতে সক্ষম হবে। নিজেদের অতীত কর্মের জন্য অনুশোচিত হবে।

মহানবী (সা) আরো ভাবলেন, উপরোক্ত আহ্বান জানানোর জন্যই আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিয়োগ করেছেন। কিন্তু আফসোস! কঠোর প্রকৃতির মক্কাবাসী তাদের পূর্বপুরুষের অনুসরণে দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা আঁকড়ে ধরে বসে আছে। তারা মনে করছে, এ পথই

তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতির পথ। এসব দেব-দেবীর আকর্ষণেই আরবের বিভিন্ন এলাকার হাজীরা মক্কায় এসে থাকে। হে আল্লাহ্! তারা কি তাদের পূর্বপুরুষের পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করবে? বাহ্যত দেব-দেবীর কারণে তাদের শহরের যে কেন্দ্রীয় মর্যাদা রয়েছে, তারা কি তা তাওহীদের বিনিময়ে ত্যাগ করবে? অপবিত্র জৈবিকতা যাদের দেহ-মন ছেয়ে আছে, যারা পশুর মতো খোলাখুলি যৌন কেলিতে মেতে থাকে, তাদের অন্তর কি পবিত্র হবে? তাদের পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করা হলে, কামোন্মাদনা ও পৌত্তলিকতা থেকে দূরে থাকার কথা বলা হলে তারা যদি না শোনে, তারা যদি একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তাহলে আমার পরিণাম কি হবে? অতঃপর আমি কোন্ পস্থা অবলম্বন করব? এটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ওহীর বিরতি

মহানবী (সা) ওহী নাযিল হওয়ার প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, ওহীর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি মানুষকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানানোর কর্মপস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কি মহিমা! এ সময় ওহী আসা বন্ধ হয়ে যায়। হযরত জিবরাঈল (আ) কোন পয়গাম বা খবর নিয়ে আসেননি। এজন্য মহানবী (সা) নীরবতা অবলম্বন করেন। তিনি মানুষের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেন। তাঁর মন-মানসিকতায় অনেকটা ওহী নাযিল হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরে আসে। হযরত খাদীজা (রা)-এর একটি বাক্যে মহানবী (সা)-এর মানসিক দ্বন্দ্ব আরো বেড়ে যায়। হযরত খাদীজা (রা) মহানবী (সা)-এর অস্থির অবস্থা দেখে বললেন, “আপনি কি মনে করছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে ভুলে গেছেন?” হযরত খাদীজার মুখে এ কথা শুনে মহানবী (সা) পুনরায় হিরা গুহায় চলে যান। সেখানে তিনি অত্যন্ত বিনয়বনত চিত্তে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ করে বলেন, “হে আল্লাহ্! রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করে কি তুমি আমাকে ভুলে গেছ?”

এদিকে এ ঘটনায় হযরত খাদীজা (রা)-ও অনেকটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তিনি ঘরে বসে নানা চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। এই দিনগুলোতে মহানবী (সা) কখনো কখনো মৃত্যুও কামনা করতেন। পুনরায় তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা মনে করে আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে মনোনিবেশ করতেন। একটি বর্ণনা রয়েছে যে, মহানবী (সা) এ সময় অত্যন্ত হতাশ হয়ে হিরা কিংবা আবু কোবায়েস পর্বত চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করারও ইচ্ছা করেছিলেন। কারণ এমন নিয়ামত পেয়ে বঞ্চিত হলে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়?

ওহী নাযিল পুনরারম্ভ

মহানবী (সা)-এর এই মানসিক দ্বন্দ্ব ও হতাশার অবসান হলো। আবার ওহী নাযিল হওয়া শুরু হলো। এ সময়ে মহানবী (সা)-এর নিকট সূরা ‘দুহা’ নাযিল হয় :

وَالضُّحَى - وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى - وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى - أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى .

১. এ বর্ণনাটি নবী-রাসূলদের মর্যাদার পরিপন্থী। কারণ আত্মহত্যা কবীরা গুনাহ। আর নবী-রাসূলগণ সৃষ্টিগতভাবেই নিষ্পাপ। সুতরাং নিষ্পাপ মনে এরূপ কোন ধারণা আসতেই পারে না। -অনুবাদক

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ - وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ - فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ - وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ - وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ .

“এবং পূর্বাহ্নের শপথ, এবং রাত যখন নিঝুম হয় তার শপথ, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। তোমার জন্য পরকাল তো ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। তোমার প্রতিপালক তো তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেনই এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে। তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি এবং তোমাকে আশ্রয়দান করেননি? তিনি তোমাকে পথহারা পান, অতঃপর পথ-নির্দেশ করেন।”

এই সময়ে ওহী নাযিল পুনরারম্ভের চাইতে খুশীর বিষয় মহানবী (সা)-এর নিকট স্বভাবতই আর কিছু ছিল না। তাঁর অন্তরে প্রশান্তি আর মুখে হাসি ফুটে উঠে। তাঁর সব ভয়-ভীতি ও হতাশা কেটে যায়। দেহমন আনন্দে ভরে উঠে। পবিত্র রসনা আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসায় স্পন্দিত হয়। পবিত্র দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরা মহান স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে। হযরত খাদীজা (রা) আল্লাহ তা‘আলার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁরা উভয়ে আন্তরিক স্বস্তি বোধ করেন। তাঁদের উভয়ের নিকট এই সত্য উদ্ভাসিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রতি অসন্তুষ্ট নন। বরং আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহে ধন্য করেছেন।

ইসলামের প্রতি আহ্বান ও প্রচার

পুনরায় ওহী নাযিল হওয়ার পর মহানবী (সা) মৃত্যু কামনা পরিত্যাগ করেন। তাঁর মনে আশা-আকাঙ্ক্ষার এক নতুন স্পন্দন উদ্বেলিত হয়। মানুষকে মহান স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানানোর জন্য বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষী হয়ে পড়েন। কারণ মহান স্রষ্টাই এক ও অদ্বিতীয়। তাঁকে ছাড়া অপর কোন উপাস্য নেই। তিনিই মানবাত্মার প্রত্যাশার একমাত্র সত্তা। মানবাত্মাকে স্থান-কালের বন্ধনমুক্ত হয়ে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির সাহায্যে এক ও অদ্বিতীয় মহান সত্তার সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। অবশ্যই যে দুনিয়া বস্তুজগতের অনেক উর্ধ্বে, সে দুনিয়ায় পৌঁছলে বস্তুজগতের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। যেখানে বংশ-মর্যাদার সকল বাধা নিরাবরণ হয়ে পড়ে। যেখানে রাত-দিন, আলো-অন্ধকার, আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত সব একাকার হয়ে যায়। যেসব পবিত্র আত্মা মানবীয় উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছায়, সেগুলোই উক্ত জগতের রহস্যময় আকাশে উড়ে বেড়ায়। এই অপরিসর ও কোলাহলময় পৃথিবীর প্রতিটি আত্মারই সে জগতের সকল সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়া উচিত। বস্তুত সে জগতই সত্য। তা ছাড়া সব কিছুরই মূলে রয়েছে বাতিল ধ্যান-ধারণা। এই মহাসত্য উপলব্ধির প্রতিচ্ছবিই মহানবী (সা)-এর পবিত্র আত্মাকে সম্ভাবনাময় করে তোলে। তাঁর অন্তরকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। আর এই দাওয়াত বা আহ্বান জানানোর জন্য নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ অবশ্যই পাপমুক্ত রাখতে হবে। অন্যায় থেকে বেঁচে থাকাও উক্ত দাওয়াত বা আহ্বান জানানোর অন্যতম পূর্বশর্ত। সত্যের প্রতি আহ্বান জানানোর ব্যাপারে কারো উপর অনুগ্রহের গর্ব করা যাবে না। রহস্যময় ও আধ্যাত্মিকতার সকল পথ মানুষের নিকট স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। কোন

অসহায় ও ভিক্ষুকের সাথে দুর্ব্যবহার করা চলবে না। কোন ইয়াতীমের সাথে খারাপ ব্যবহারও করা যাবে না। মহানবী (সা)-এর এই অনুগ্রহই যথেষ্ট ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রাসূল, শ্রেষ্ঠতম রাসূলের মর্যাদা দান করেছেন। তিনি ইয়াতীম ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আবদুল মোত্তালিব ও আবু তালেবের মাধ্যমে তাঁকে লালন-পালন করেছেন। তিনি সর্বহারা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সহধর্মিণী হযরত খাদীজা (রা)-এর সম্পদ দ্বারা মহানবীর অভাব-অনটন দূর করেছেন। শুধু তাই নয়, হযরত খাদীজা (রা)-কে অত্যন্ত অনুগত স্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। মহানবী (সা)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলার এসব অনুগ্রহ অসামান্য। সুতরাং নিজের প্রতি আল্লাহ তা'আলার এসব অনুগ্রহের কথা স্মরণ রেখে মানুষকে সত্যের প্রতি আহবান জানাতে হবে। আর এসব ফরমানই আল্লাহ তা'আলা সূরা দুহার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর উপর নাযিল করেছেন।

নামায

এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নামায পড়ার নির্দেশ প্রদান করেন। মহানবী (সা) তাঁর সহধর্মিণী হযরত খাদীজা (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে নামায পড়া শুরু করেন। মহানবী (সা)-এর চাচাতো ভাই কিশোর আলী ইবনে আবু তালেবও তাঁর সঙ্গেই থাকতেন। তিনি তাঁর ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন। এ সময়ে কুরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্যে চরম মন্দা বিরাজ করছিল। আবু তালেবের অনেক সন্তান-সন্ততি ছিল। অর্থ সংকটের দরুন তিনি সুষ্ঠুভাবে তাঁর সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ করতে পারছিলেন না। কুরাইশের বনু হাশিম গোত্রে মহানবী (সা)-এর অন্যতম চাচা হযরত আব্বাস (রা) ছিলেন একজন বিত্তবান লোক। চাচা আবু তালেবের সংসারে অভাব-অনটন দেখে মহানবী (সা) একদিন হযরত আব্বাস (রা)-কে বললেন, “চাচা, আপনার ভাই আবু তালেবের অনেক সন্তান-সন্ততি রয়েছে। অপর দিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা খুবই খারাপ। চলুন আমরা আবু তালেবের নিকট যাই এবং তাঁর বোঝা কিছুটা হালকা করার প্রস্তাব করি। তাঁর সন্তানদের একজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব এবং একজনের দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করবেন।” এরপর তাঁরা উভয়ে আবু তালেবের নিকট যান। হযরত আব্বাস (রা) জা'ফর ইবনে আবু তালেবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মহানবী (সা) নিয়ে আসেন কিশোর আলী ইবনে আবু তালেবকে। এ সময় থেকে তিনি মহানবী (সা)-এর পরিবারের সদস্য হিসেবে থাকতেন। একদিন কিশোর আলী (রা) বাইরে থেকে ঘরে এসে দেখেন মহানবী (সা) ও হযরত খাদীজা (রা) নামায আদায় করছেন। তাঁদের রুকু-সিজদা ও কেরআত পড়তে দেখে হযরত আলী (রা) বিস্মিত হন। তিনি সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। নামায শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন, আপনারা কার উদ্দেশ্যে সেজদা করছেন?

মহানবী (সা) বললেন, “আলী! আমরা মহান স্রষ্টার উদ্দেশ্যে সেজদা করছি। তিনি আমাকে নবুয়ত দান করেছেন। তাঁর দিকে মানুষকে আহবান জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন।” মহানবী (সা) হযরত আলী (রা)-কে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, “হে আলী! তুমি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর। আমার নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। লাত, মানাত ও অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করো না।” এই সঙ্গে মহানবী (সা) পবিত্র কোরআনের

কিছু আয়াত হযরত আলী (রা)-কে আবৃত্তি করে শোনালেন। হযরত আলী (রা) তাতে অত্যন্ত প্রভাবিত হন। তিনি বললেন, ‘আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করার অনুমতি দিন।’

হযরত আলী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আলী (রা) সারা রাত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অতিবাহিত করেন। সকালে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেন যে, এ ব্যাপারে পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আমার সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা আবু তালেবের পরামর্শ গ্রহণ করেননি। সুতরাং এই মহান আল্লাহর উপাসনার ব্যাপারে কেন আমি আবু তালেবের মতামত গ্রহণ করব?” তাতে করে পুরুষদের মধ্যে হযরত আলী (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পর হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা ছিলেন হযরত খাদীজা (রা)-এর ক্রীতদাস। তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এ সময়ে সারা বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র চারজন। মহানবী (সা) নিজে, হযরত খাদীজা (রা), হযরত আলী (রা) ও হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা)। এবার মহানবী (সা)-এর সামনে বিরাট ভাবনা, তিনি কুরাইশদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের সূচনা কিভাবে করবেন। কারণ তাঁর আশংকা ছিল তারা পিতৃপুরুষের পৌত্তলিকতা সহজে ত্যাগ করবে না।

হযরত আবু বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবু বকর ইবনে আবু কোহাফা তাইমী ছিলেন মহানবী (সা)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মহানবী (সা)-এর ন্যায়নিষ্ঠতা, আমানতদারী ও সত্যবাদিতার প্রতি হযরত আবু বকর (রা)-এর গভীর আস্থা ছিল। তাঁর সততা ও আন্তরিকতার প্রতিও মহানবী (সা)-এর পুরোপুরি ভরসা ছিল। এসব দিক বিবেচনা করে মহানবী (সা) ঘরের বাইরে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। মহানবী (সা) নবুয়ত লাভ ও ওহী নাযিল হওয়ার বিভিন্ন ঘটনাও তিনি বন্ধু হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট খুলে বলেন। হযরত আবু বকর (রা) বিনা-দ্বিধায় মহানবী (সা)-এর কথা বিশ্বাস করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। বস্তুত একজন সত্যসন্ধানী লোকের সামনে সত্য উদ্ভাসিত হলে তিনি তা গ্রহণ না করে পারেন না। এমন কি এ ব্যাপারে তিনি ইতস্ততও করেন না। বিশেষ করে এমন এক সত্যের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল যার বুনিয়াদ হচ্ছে পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা, হৃদয়ের পবিত্রতা ও অসহায়-ইয়াতীমদের সহায়তা। সর্বোপরি নানা দেব-দেবী ও জড় পদার্থের পরিবর্তে এক ও অদ্বিতীয় মহান স্রষ্টার সামনে মাথা নত করা। সুতরাং দূরদর্শী ও অসাধারণ প্রজ্ঞাময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হযরত আবু বকর (রা)-এর বেলায়ও তার ব্যতিক্রমটি ঘটেনি। তিনি বিনা দ্বিধায় সত্যের আহ্বানে সাড়া দেন। পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন সৎ চরিত্রবান, অমায়িক ও একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। কুরাইশদের আচার-ব্যবহার ও মন-মানসিকতা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা) বেশ অবহিত ছিলেন। মানুষের মধ্যেও একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে হযরত আবু বকর (রা)-এর খ্যাতি ছিল। এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য মানুষ তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করত। ইসলাম গ্রহণের পর

তিনি বন্ধু মহলে তাবলীগ আরম্ভ করেন। আস্থাভাজন বন্ধু-বান্ধবকে তিনি ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তাঁর এই প্রচারের মাধ্যমে হযরত ওসমান, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ, হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস এবং হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তার কিছু দিন পর হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ ইসলামে দীক্ষিত হন। হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রচারের মাধ্যমে মক্কার বাইরেও বেশ কিছু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

প্রাথমিক মুসলমান

পবিত্র মক্কায যারা ইসলাম গ্রহণ করতেন, তাঁরা সবাই মহানবী (সা)-এর নিকট এসে তাঁদের ঈমান আনার কথা প্রকাশ করতেন। তাঁরা মহানবী (সা)-এর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় বিধান ও নির্দেশ জেনে নিতেন। কিন্তু অত্যাচার-নির্যাতনের ভয়ে তাঁরা নতুন ধর্ম গ্রহণের কথা কুরাইশদের নিকট প্রকাশ করতেন না। তাঁরা নামায আদায়ের জন্য পাহাড়ের নির্জন স্থানে চলে যেতেন। সেখানে চুপে চুপে নামায আদায় করতেন। এভাবে তিন বছর অতিবাহিত হয়। মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলে। এ সময়ের মধ্যে পবিত্র কোরআনের যেসব আয়াত নাযিল হয়, তাতে নবদীক্ষিত মুসলমানদের ঈমানের সুদৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। ইসলামের প্রচার-প্রসারে মহানবী (সা)-এর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অমায়িক ব্যবহার জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে। তিনি সবার সাথে অমায়িক ব্যবহার করতেন। তাঁর চরিত্র মাধুর্য প্রত্যেক সাক্ষাতকারীকে আকৃষ্ট করত। এই আকর্ষণ ও প্রভাব এত গভীর ছিল যে, ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর সাথে সাথে মানুষ তা গ্রহণ করত। মহানবী (সা) ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ, উদার, অমায়িক, সাহসী, সদালাপী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রত্যেককে ইসলামের আহ্বান জানাতেন। দুর্বল, ইয়াতীম, অসহায় ও বিত্তহীনদের সাথে পিতৃসুলভ ব্যবহার করতেন। বিনিদ্র রজনী যাপন করতেন। গভীর রাতে মক্কাবাসী যখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন মহানবী (সা) তখন ইবাদত ও সাধনায় মগ্ন হতেন। নিজের নিকট নাযিল হওয়া পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কে গভীর চিন্তা-গবেষণা করতেন। কখনো কখনো সীমাহীন আকাশ ও পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে এসবের মহান স্রষ্টার কথা ভাবতেন। এভাবে তিনি বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। নিজের জীবনকে মহান ব্রতে কামিয়াব করার জন্য মোনাজাতে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ প্রার্থনা করতেন। মহানবী (সা)-এর এই অনুপম চরিত্র মাধুর্য ও গভীর সাধনা নব মুসলিমদের ঈমানী শক্তি ও মনোবল আরো সুদৃঢ় করে তোলে। পৌত্তলিকতা ছেড়ে দেয়ার দরুন অত্যাচার-নির্যাতনের আশংকাও তাদের তাওহীদী প্রেরণায় এতটুকু বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি। এমনকি মক্কার বণিক, শরীফ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সাথে বেশ কিছু সংখ্যক গরীব ও বিত্তহীন লোকও ইসলামের মহান শিক্ষায় দীক্ষা লাভ করেন। তাতে করে তাঁরা প্রথম যারা মুসলমান হয়েছিলেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

মুসলমান ও কুরাইশ

এই পর্যায়ে মক্কার ঘরে ঘরে মহানবী (সা)-এর আলোচনা শুরু হয়। মক্কার যেসব লোকের অন্তর পাপের মোহরাংকিত হয়ে গিয়েছিল, তাদের বৈঠকেও মহানবী (সা) সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকে। তারা প্রথম প্রথম ইসলামের প্রচারের প্রতি বড় একটা গুরুত্ব প্রদান করেনি। তারা

ভাবে, এ ধর্মের প্রভাবও কুসুসু উমাইয়া ও ওয়ারাকার চাইতে বেশি কিছু হবে না। খৃস্টান-ইহুদী ধর্মযাজকদের যেমন এখন বড় একটা দেখা যায় না, মুসলমানদের অবস্থাও তার ব্যতিক্রম হবে না। কিছু দিনের মধ্যে এসব নবদীক্ষিত মুসলমান তাদের পিতৃপুরুষের মতবাদে ফিরে আসবে। হোবলের মতো ভয়ংকর দেবতা, লাভ ও ওয়্যার মতো অহংকারী দেবী, সর্বোপরি আসফ ও নায়েলার মতো ক্রুদ্ধ দেবী যাদের কোরবানীর রক্তে সাঁতার কাটতে দেখা যায়, তারা এসব মুসলমানকে এমনি ছেড়ে দেবে না। এ কিছুতেই হতে পারে না। তারা এসব মুসলমানকে অবশ্যই শাস্তি দেবে। অদূর ভবিষ্যতে এসব দেব-দেবী তাদের পদতলে মুসলমানদের মাথা নত করতে বাধ্য করবে। কিন্তু মক্কাবাসীরা এ কথা জানত না যে, তাওহীদী ঈমানী শক্তির উপর কোন শক্তিই জয়লাভ করতে পারে না। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা কামিয়াবী সত্য ধর্মের পক্ষেই নির্ধারিত করে রেখেছিলেন।

আত্মীয়দের ইসলামের দাওয়াত

তিন বছর পর্যন্ত ইসলামের প্রচার অনেকটা গোপনেই চলতে থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সত্য ধর্মের দাওয়াত ব্যাপক করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশে প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচারের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের প্রতি ওহী নাযিল করেন :

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ .

“(হে রাসূল!) তুমি তোমার আত্মীয়দের (পরকালের শাস্তি সম্পর্কে) সতর্ক করে দাও। আর মু'মিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুগত হয়েছে, তাদের প্রতি বিনয়ী হও। তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে, তুমি বলে দাও, ‘তোমরা যা কর তার জন্য আমি দায়ী নই’।” (২৬ : ২১৪-২১৬)

এ সম্পর্কে অপর একটি আয়াত নাযিল হয়। তাতে বলা হয়েছে :

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ .

“অতএব যে বিষয়ে তুমি আদিষ্ট হয়েছে, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর।” (১৫ : ৯৪)

ইসলামের প্রকাশ্য প্রচার উপলক্ষে মহানবী (সা) নিজের বাড়িতে এক ভোজানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাতে আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত করেন। তারা উপস্থিত হলে সবাইকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানান। মহানবী (সা) তাঁর বক্তব্য শেষ না করতেই চাচা আবু লাহাব অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। সে নানা কথা বলা শুরু করে এবং মানুষকে ফুসলিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায়। মহানবী (সা) এ ধরনের আর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সমবেত লোকেরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করলে তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন :

“আরবদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কেউ তোমাদের জন্য আমার চাইতে উত্তম পয়গাম নিয়ে আসেনি। এই পয়গাম বা বাণী ইহকাল ও পরকালের আলোকবর্তিকা। তাতে আল্লাহ তা'আলা

আপনাদের তাঁর দিকে আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আপনাদের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমার এই পয়গাম গ্রহণ করছেন।”

এ কথা বলার সাথে সাথে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজ নিজ বাসার পথ ধরে। এই মজলিসে আলী ইবনে আবু তালেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখনো ছিলেন কিশোর। কিন্তু সাহসের সাথে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাহায্যকারী। আমি আপনার বন্ধুদের বন্ধু এবং আপনার শত্রুদের শত্রু।” হযরত আলী (রা)-এর এই বীরদর্প ঘোষণায় বনু হাশিমের লোকেরা অবজ্ঞা করে হেসে উঠে। তারা একবার হযরত আলী (রা)-এর মুখের দিকে তাকায় আবার তাঁর পিতা আবু তালেবের দিকে তাকায়। এভাবে হো হো করে হাসতে হাসতে তারা যার যার বাড়ি চলে যায়।

এই মজলিসের পর মহানবী (সা) মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। একদিন তিনি সাফা পাহাড়ে উঠে উপকণ্ঠে কুরাইশদের আহ্বান করেন। তারা মহানবী (সা)-এর কণ্ঠধ্বনি শুনে চারদিক থেকে দৌড়ে এসে সমবেত হয় এবং এভাবে ডাকার কারণ জিজ্ঞেস করে। তিনি বললেন, “হে কুরাইশ! আমি যদি বলি, এই পাহাড়ের পিছনে এক দুর্ধর্ষ বাহিনী লুকিয়ে আছে, তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?” তারা সবাই বলল, “অবশ্যই আমরা তা বিশ্বাস করব। কারণ এ পর্যন্ত আমরা কখনো আপনার মুখে মিথ্যে কথা শুনিনি।” এরপর মহানবী (সা) সমবেতদের উদ্দেশ্যে বলেন :

“(হে বন্ধুগণ!) আমি তোমাদের কণ্ঠের শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করছি। হে বনু আবদুল মোত্তালিব, হে বনু আবদে মান্নাফ, হে বনু যোহরা, হে বনু তাইম, হে বনু মাখযুম, হে আসাদের বংশধর! আমার বংশধরদের পরকালের শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা যদি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত না কর, আমার আত্মীয়তা তোমাদের কোন কল্যাণে আসবে না।”

আবু লাহাব ছিল কট্টর পৌত্তলিক ও রগচটা লোক। সে মহানবী (সা)-এর উপরোক্ত ভাষণ শুনে রাগে গড় গড় করে দাঁড়ায় এবং উচ্চকণ্ঠে বলে উঠে, “তোমার ধ্বংস হোক। এজন্য তুমি আমাদের একত্রিত করেছ?” তার মুখে এরূপ অশালীন কথা শুনে মহানবী (সা) অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং নীরব থাকেন। এর কিছুদিন পর ওহী নাযিল হয় :

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ - مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ - سَيَصْلَىٰ

نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ .

“(হে রাসূল!) আবু লাহাবের হাত দুটো ভেংগে যাক, আর সে ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ আর যা কিছু সে কামাই করেছে—সে সব তার কোনো কাজে আসবে না। সে তো শিগগিরই জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। (১১১ : ১-৩)

ইসলামের প্রচার

আবু লাহাবের হিংসা-বিদ্বেষ ও তার সহগামী কুরাইশদের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র মক্কাবাসীদের ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। প্রতিদিনই কেউ না কেউ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতেন। শান্তি ও নিরাপত্তার এই দুর্গে প্রবেশের সাথে সাথে তাদের নিকট

পৃথিবীর সব কিছু আকর্ষণহীন বস্তুতে পরিণত হতো। তাঁরা ইসলামের প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়তেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, বেচা-কেনা ও অন্যসব ব্যস্ততা আল্লাহ তা'আলার বিধান পালন থেকে তাঁদের বিরত রাখতে পারত না। মহানবী (সা)-এর প্রতিটি নির্দেশ পালন করা তাঁরা তাঁদের জীবনের মহান ব্রত হিসাবে মনে করতেন। বস্তুত মহানবী (সা)-এর বন্ধুরা তাঁদের নেতাকে পুরোপুরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিয়েছিলেন। তাঁরা বেশ ভাল করে জানতেন স্ত্রীর ধন-সম্পদের প্রতি যেমন মহানবী (সা)-এর কোন মোহ নেই, তেমনি নিজের ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের প্রতিও তাঁর কোন লোভ নেই। বস্তুত মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করা, হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং মানুষের দোষ-ত্রুটির প্রতি না তাকানোই ছিল মহানবী (সা)-এর সবচাইতে বড় সম্পদ। আর এই সম্পদই ছিল ইসলাম প্রচারের মূলভিত্তি। তা'ছাড়া ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা)-কে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, অধিক সম্পদ আত্মার জন্য এক প্রকার অভিশাপ :

الْهٰكُمْ التَّكَاثُرُ - حَتّٰى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ - كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ - ثُمَّ كَلَّا
سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ - كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ - لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ - ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا
عَيْنَ الْيَقِيْنِ - ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ .

“প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত মোহাচ্ছন্ন রাখে। এটা সঙ্গত নয়, তোমরা শীগগিরই তা জানতে পারবে। আবার বলি, এটা সঙ্গত নয়, তোমরা শীগগিরই তা জানতে পারবে। তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না। তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই। আবার বলি, তোমরা তো তা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে। এরপর অবশ্যই তোমাদেরকে আল্লাহর অবদানের ভোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে।” (১০২ : ১-৮)

মহানবী (সা) এক চিরন্তন সম্পদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই সম্পদের চাইতে পার্থিব কোন সম্পদই উত্তম হতে পারে না। সে চিরন্তন মহা সম্পদ হলো স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতা ছিল আরবদের সম্মান, মর্যাদা ও স্থায়িত্বের স্বাধীনতা। অস্তিত্বের স্বাধীনতা। মহানবী (সা)-এর আহ্বানে সাড়া দানকারী আরবরাও জানত যে, এই স্বাধীনতায় কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তারা এও জানত যে, পৌত্তলিকতা, অগ্নিপূজা ও গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা মানবজাতিকে বাতিল ধ্যান-ধারণায় শৃংখলাবদ্ধ করে রেখেছে। মহানবী (সা) তাদের এই শৃংখলমুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মহানবী (সা)-এর শিক্ষার সারকথা হলো, মহান স্রষ্টা আর তাঁর সৃষ্টি মানব জাতির মধ্যে হোবল, লাত, মানাত, ওয়্যা, আগুন, সূর্য, তারকা, ফেরেশতা প্রভৃতি কোন প্রতিবন্ধকতা হতে পারে না। স্রষ্টার দরবারে মানুষের ভাল-মন্দ কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সেখানে কাজ ছাড়া অন্য কোন সুপারিশকারীরও প্রয়োজন হবে না। প্রতিদান দেয়ার সময় পরকালে শুধু মানুষের কাজেরই মূল্যায়ন করা হবে। প্রকৃতপক্ষে এর চাইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট স্বাধীনতা আর কী হতে পারে। মহানবী (সা) মানবজাতির এই স্বাধীনতাই নিশ্চিত করতে চাইছিলেন। অপরদিকে আবু লাহাব ও তার সহযোগীরা কি মানুষকে এ ধরনের শিক্ষা দিতে চাইত? তারা তো চাইত মানুষ যেন সব সময়

অশ্লীলতার ফাঁদে আবদ্ধ থাকে। বস্তুত এই অশ্লীলতাই তো মানুষ আর তার মহান স্রষ্টার মাঝখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কুরাইশ কবি

আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কুরাইশরা অনুভব করল মহানবী (সা)-এর নতুন ধর্ম প্রচারের ফলে তাদের মান-মর্যাদা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তারা প্রমাদ গুণলো যে, মহানবী (সা)-এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে নেতৃত্ব, ধন-সম্পদ ও সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদ থেকে তাদের বিদায় নিতে হবে। এই আশংকায় তারা সিদ্ধান্ত নিল, এখন থেকে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর কুৎসা রটাতে হবে। তাতে তার নবুয়ত ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে। এই সিদ্ধান্তের পর তারা সমকালীন প্রখ্যাত কবিদের এই ঘৃণ্য কাজে নিয়োগ করে। এসব কবি বিভিন্ন সভা-সমিতি ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মহানবী (সা) সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপাত্মক কবিতা আবৃত্তি শুরু করে। এসব কবির মধ্যে ছিল আবু সুফিয়ান, আমর ইবনে আস, আবদুল্লাহ ইবনে যাবআরী প্রমুখ। তারা তাদের অনলবর্ষী বক্তৃতা ও মোহনীয় কাব্য দ্বারা মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করত। মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত। এদিকে কিছু মুসলমান কবিও কাব্যের ভাষায় এসবের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া শুরু করেন। কিন্তু মহানবী (সা) এ ধরনের প্রতি-উত্তর পছন্দ করতেন না।

মু'জিয়ার দাবি

এ সময়ে কিছু লোক মহানবী (সা)-এর নিকট আসে। হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) থেকে যেসব মু'জিয়া বা অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ পেয়েছিল, তারা মহানবী (সা)-এর নিকটও অনুরূপ মু'জিয়া দেখানোর দাবি জানায়। কেউ বলল, আপনি সাফা ও মারওয়া পাহাড় দু'টি স্বর্গে রূপান্তরিত করে দিন। কেউ কেউ প্রশ্ন করল, কোরআনের আয়াত লিখিত আকারে কেন নাযিল হয় না। জিবরাঈল অন্যদের দৃষ্টিগোচরে কেন আসে না। আপনি মৃতদের কেন জীবিত করেন না। পাহাড় আপনার নির্দেশে কেন নড়াচড়া করে না। মক্কার চারদিকে যে পাহাড় রয়েছে, এগুলো দূরে কোথাও নিক্ষেপ করুন। তাতে মক্কার অধিবাসীরা মুক্ত বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতে পারবে। আপনার নিকট মক্কাবাসীদের এটাও একটা অনুরোধ যে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এখানে তীব্র পানিসংকট রয়েছে। এই সংকট নিরসনের জন্য আপনি যমযমের মতো উন্নত একটি মিষ্টি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করুন। মুশরিকদের দাবি ও প্রশ্নবাণের এখানেই শেষ নয়। তারা এও বলেছিল যে, আল্লাহ আপনাকে শস্যের মূল্য আগে থেকে কেন জানিয়ে দেয় না। এরূপ করা হলে তো আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর মুনাফা করতে পারতাম। মক্কাবাসীদের এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রোপের জবাবদান প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ - وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ - وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ - إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“বল (হে রাসূল!) আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম, তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু মু‘মিনদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।” (৭ : ১৮৮)

আল্লাহ্ তা‘আলা মহানবী (সা)-কে সতর্ক করা ও সুসংবাদ দেয়ার জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মক্কার অধিবাসীরা তাঁর নিকট এমন সব দাবি-দাওয়া করে বসল যেগুলোর যথার্থতা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। পুরোপুরি অবাস্তব। আল্লাহ্ তা‘আলা ওহীর মাধ্যমে যে পরিমাণ অবহিত করতেন, তাঁর পক্ষে তাই মানুষের নিকট প্রকাশ করা সম্ভবপর ছিল। আর তিনি তাই করতেন। পক্ষান্তরে মহানবী (সা) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট যা চেয়েছিলেন, তা ছিল যুক্তিভিত্তিক। মোহমুক্ত ও নিরপেক্ষ যুক্তি-বুদ্ধি তা সমর্থন করত। এমনকি, প্রশ্নকারীদের নিরপেক্ষ মন-মানসিকতাও মহানবী (সা)-এর দাবির যৌক্তিকতা অস্বীকার করত না। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, হেদায়েত বা পথ-নির্দেশের বাস্তব প্রতিচ্ছবি পবিত্র কোরআনের বাণী থাকা সত্ত্বেও তারা মহানবী (সা)-এর নিকট মু‘জিয়া বা অলৌকিক কাজের দাবি জানালো। তারা পবিত্র কোরআনের বাণীর প্রতি চোখ তুলেও তাকালো না। অথচ পবিত্র কোরআনই তো সর্বশ্রেষ্ঠ মু‘জিয়া। মূলত মহানবী (সা)-এর রিসালাতের যথার্থতা প্রমাণের জন্য মু‘জিয়া প্রদর্শনের দাবি তাদের একগুয়েমি হটকারিতা ছাড়া কিছুই ছিল না। এই দাবি পূরণ করা হলেও তাদের হটকারিতার অবসান হতো না। তারা এসব মু‘জিয়ার সত্যতা অস্বীকার করার জন্য অন্য কোন বাহানার আশ্রয় নিত।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, এসব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের কল্পিত উপাস্যদের স্বীকার করে নেয়ার সময় কোন্ মু‘জিয়া প্রত্যক্ষ করেছিল। যেসব প্রতিমাকে তারা সকল শক্তির আঁধার মনে করছে, এগুলো তো তারা নিজেরাই কাঠ আর পাথর খোদাই করে তৈরি করেছে। এসব পাথর মরুভূমিতে পড়েছিল, তারা এগুলো কুড়িয়ে এনে পূজামণ্ডপে উপাস্যের আসনে বসিয়েছে। এসবের পূজা করছে। এই পূজা-অর্চনা শুরু করার আগে কি তারা এসবের নিকট মু‘জিয়া প্রদর্শনের দাবি জানিয়েছিল? নিশ্চয়ই জানায়নি। আমরা স্বীকার করছি যে, প্রতিমাদের নিকট এ ধরনের দাবি জানানো ঠিক হতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যদি এসবের নিকট লাখো বারও দাবি জানাতো, তাদের দাবি পূরণ হতো না। কারণ এসব শুকনো কাঠ আর জড়ো পাথর তো প্রাণহীন, স্পন্দনহীন। তারা অন্যদের কল্যাণ-অকল্যাণ করা তো দূরের কথা, নিজেদের উপর কোন বিপদ আপত্তি হলে তাও প্রতিরোধ করতে পারবে না। এই যাদের অবস্থা তারা আবার নিজেদের উপাস্য হওয়ার প্রমাণ কিভাবে দেবে? অথচ এসবকেই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা নিজেদের উপাস্যের আসনে বসিয়ে রেখেছে।

প্রতিমাদের নিন্দা

ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে মহানবী (সা) প্রতিমাদের সম্পর্কে কিছু বলতেন না। কিন্তু এখন থেকে তিনি প্রকাশ্যে এসবের সমালোচনা শুরু করেন। তাতে কুরাইশরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে। তারা মহানবী (সা)-কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে। অবশ্য এর

আগে থেকেই মক্কার কাফেররা তাঁকে ঠাটা-বিদ্রূপ করে আসছিল। কখনো ‘দারুনন্দওয়া’য় আবার কখনো কা’বাঘরের আশেপাশে বসে মহানবী (সা) সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। তাঁকে যেতে দেখলে সজোরে হো হো করে হাসত। মহানবী (সা) লাত, ওয়্যা, হোবল ও অন্যান্য দেবদেবী ও প্রতিমার নিন্দা শুরু করলে পরিস্থিতি আরো গভীর রূপ পরিগ্রহ করে। কাফেরদের মুখে মহানবী (সা)-এর নিন্দাবাদ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আরো বেড়ে যায়। এই সঙ্গে তারা আরো শংকিত হয়ে পড়ে যে, মহানবী (সা) যদি মক্কার অধিবাসীদের কুরাইশদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে কিংবা তাঁর (সা) প্রভাবে যদি মক্কার উপকণ্ঠে বসবাসকারীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বসে এবং পৌত্তলিকতা ছেড়ে দেয়, তাহলে মক্কার ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, সেরূপ পরিস্থিতিতে কুরাইশদের বহির্বাণিজ্য এবং মক্কার বিরাট বাজার নষ্ট হয়ে যাবে।

কুরাইশরা এ বিষয়টি নিয়ে তিনবার বৈঠকে মিলিত হয়। তারা প্রতিবার দল বেঁধে গিয়ে আবু তালেবের নিকট মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। আবু তালেব মহানবী (সা)-কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও তিনি মহানবী (সা)-কে সর্বাঙ্গিক সমর্থন ও সহযোগিতা করতেন। কুরাইশরাও এ কথা বেশ ভাল করেই জানত। কুরাইশদের প্রথম দলটি আবু সুফিয়ান ইবনে হরবের নেতৃত্বে আবু তালেবের নিকট আসে। তারা মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে :

“হে আমাদের নেতা! আপনার ভাতিজা আমাদের বিরুদ্ধে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করে তুলেছে। আমাদের প্রতিমাদের অবজ্ঞা করা, এদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কুৎসা বলা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনা থেকে সে কখনো নিজেকে বিরত রাখে না। আমাদের পূর্বপুরুষদের নিন্দা করা সে তার পরম কর্তব্য বলে মনে করে। তাদের সে প্রকাশ্যে অজ্ঞ ও মূর্খ বলে বেড়ায়। এমনকি আমাদের নেতৃবৃন্দকে সে পথভ্রষ্ট বলতেও দ্বিধা করে না। হে আমাদের সম্প্রদায়ের নেতা! (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর এসব কথায় আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আপনার নিকট আমাদের অনুরোধ, আপনি তাকে বারণ করুন। অথবা তাকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকুন। এরপর আমরা নিজেরাই তার সাথে বোঝাপড়া করব। আরো খুশীর বিষয় যে, আপনি আমাদের মতবাদের অনুসারী।” আবু তালেব এসব অভিযোগের সঙ্গত জবাব প্রদান করে তাদের বিদায় করেন। এদিকে মহানবী (সা) বেশ সক্রিয়ভাবে ইসলামের প্রচার তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। এই সঙ্গে পৌত্তলিকতার অসারতাও মানুষকে বোঝাতে থাকেন। তাতে মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে কাফেরদের অসন্তুষ্টিও গভীরতর হতে থাকে।

দ্রুত কুরাইশরা পুনরায় পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হয়। আর একটি প্রতিনিধিদল আবু তালেবের নিকট যায়। এবার তারা কুরাইশ যুবক ওমারা ইবনে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাকে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে যেমন সাহসী ছিল, তেমনি দেখতেও অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী ছিল। তারা আবু তালেবকে অনুরোধ করে, “(হযরত) মহানবী (সা)-কে আমাদের নিকট হস্তান্তর করুন। তার বিনিময়ে ওমারাকে আপনার ছেলে হিসাবে গ্রহণ করুন।” কিন্তু আবু তালেব তাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। মহানবী (সা) তাঁর প্রচার কাজ পুরাদস্তুর চালিয়ে যান।

কুরাইশরা পুনরায় এ বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করে। তারা তৃতীয়বার আবু তালেবের সাথে সাক্ষাত করে দাবি জানায় :

“হে আবু তালেব! আপনি আমাদের মধ্যে শুধু বয়োজ্যেষ্ঠই নন, মর্যাদার দিক থেকেও আপনি কুরাইশদের মধ্যে সবার উপরে। আমরা ইতিপূর্বেও বলেছি, আপনি আপনার ভাতিজাকে আমাদের শত্রুতা থেকে বিরত রাখুন। কিন্তু আপনি এখনো তাকে তার তৎপরতা থেকে বিরত রাখেননি। হে আমাদের কওমের নেতা! এখন আর আমরা সংযত থাকতে পারছি না। আপনার ভাতিজা আমাদের নেতৃস্থানীয়দের কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের অবজ্ঞা করে চলেছে। অনুরূপভাবে আমাদের প্রতিমাদের নিন্দাবাদ তার মুখে লেগেই আছে। এখনো যদি আপনি তাকে এসব থেকে বিরত না করেন, আমরা আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য হবো। তাতে করে ব্যাপারটার একটা কিছু সমাধান হবে।”

আজকের আলোচনায় আবু তালেব কুরাইশদের শত্রুতা গভীরভাবে অনুভব করেন। এ ব্যাপারে কি করা যায়, তিনি চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। আবু তালেব ভাতিজার ধর্মে দীক্ষিত হননি। কিন্তু আপন ভাতিজা অপমানিত হোক, তাও তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। আবু তালেব মহানবী (সা)-কে ডেকে এনে সব ঘটনা বিস্তারিত বললেন। এরপর বলেন, “হে ভাতিজা! আমার এবং তোমার নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কথা স্মরণ রেখো। আমাকে এমন কোন বিপদে ফেলো না, যা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।”

ইতিহাসের দু'ধারা

আবু তালেবের উপদেশ শোনার পর মহানবী (সা) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। এ সময় ভবিষ্যত ইতিহাসের দু'টি ধারা তাঁর পবিত্র অন্তরে ভেসে উঠে। একটি ছিল সফলতার আর অপরটি ব্যর্থতার। মানুষ কি পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে সত্যিকার মানুষ হিসাবে জীবন যাপন করবে, না সৎ পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে? পৃথিবী কি অন্ধকারাচ্ছন্নই থাকবে? অগ্নিপূজা, বিকৃত ইহুদী-খৃষ্টান মতবাদ ও পৌত্তলিকতার অধিকারে কি সারা দুনিয়া থাকবে? না তাওহীদের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বাতিল ধ্যান-ধারণার অভিশাপমুক্ত হবে? অতঃপর এর মাধ্যমে মানবাত্মা সকল অশ্লীলতা ও কুসংস্কারের নাগপাশমুক্ত হয়ে মহান স্রষ্টার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করবে? এ সময় ভবিষ্যত ইতিহাসের এই দু'টি চিত্র মহানবী (সা)-এর দিব্য দৃষ্টিতে ভেসে উঠেছিল। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন আবু তালেব তাঁর (সা) সহায়তা করতে পারছিলেন না। মুসলমানরাও কাফেরদের সাথে সংঘর্ষে যাওয়ার মতো শক্তিশালী ছিল না। অপরদিকে কুরাইশরা ছিল ধনে-জনে সমৃদ্ধ। এরূপ পরিস্থিতিতে ঈমানী শক্তি ছাড়া মহানবী (সা)-এর সামনে আর কোন উপায় বা অবলম্বন ছিল না। এই একটি মাত্র শক্তি ছিল যার সামনে কোন মুশকিলই মুশকিল বলে মনে হতো না। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম ব্যর্থতা বরণের চাইতে অনেক উত্তম। এর জন্য যে কোন পরিস্থিতিতে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইসলামের প্রতি মানুষকে আহবানের তৎপরতা পুরোদমে চালিয়ে যেতে হবে। সত্যের পথে জীবন বিসর্জন দেয়া যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের চাইতে উত্তম কাজ। মহানবী (সা) মনে মনে এসব উত্থান-পতন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করলেন। এরপর তিনি দৃঢ়-সংকল্প নিয়ে চাচাকে বললেন :

“হে চাচা! এসব লোক যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাঁ হাতে চাঁদ রেখেও বলে যে, তুমি তোমার মিশন থেকে বিরত থাক। আমি তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করব না। এ পথে যদি আমার ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়, আমি পিছপা হবো না।”

সত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও ঈমানের প্রেরণার কিরূপ প্রভাব! নির্মল মন-মানসিকতার অধিকারী মহানবী (সা)-এর এই জবাব শুনে আবু তালেব কেঁপে উঠেন। তিনি মহানবী (সা)-এর দৃঢ়সংকল্প ও অনমনীয় মনোভাব দেখে বিস্মিত হন, বিমুগ্ধ হন। এরপর মহানবী (সা) চাচার কাছ থেকে বাইরে চলে আসেন। আবু তালেব মুহূর্তের জন্য দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পড়ে যান। কুরাইশরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। অপরদিকে মহানবী (সা) ছিলেন নিজ সংকল্পে অটল। একটু পরই তিনি মহানবী (সা)-কে ডাকেন। তিনি (সা) তাঁর নিকট আসেন। এরপর আবু তালেব বলেন, “ভাতিজা! তুমি মানুষকে যা বলতে চাও বল। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্টের শিকার হতে দেব না।”

বনু হাশিমের সমর্থন

আবু তালেব বনু হাশিম ও বনু আবদুল মোত্তালিবের সকল সদস্যকে নিজের বাড়িতে একত্রিত করেন। তিনি তাদের নিকট মহানবী (সা)-এর চিন্তাভাবনা খুলে বলেন। তাঁর সাথে মহানবী (সা)-এর যেসব কথাবার্তা হয়েছে, সে সবও তাদের নিকট ব্যক্ত করেন। কথাবার্তার সময় মহানবী (সা)-এর মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, তাও তিনি গোত্রের লোকদের নিকট প্রকাশ করেন। সবকিছু বলার পর আবু তালেব বলেন, “যে কোন অবস্থায় হোক কুরাইশের অপরাপর গোত্রের বিরুদ্ধে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে আমাদের সমর্থন করতে হবে।” সবাই আবু তালেবের অনুরোধ মেনে নেয়। কিন্তু বেঁকে বসে আবু লাহাব। সে প্রকাশ্যে বিরোধিতা শুরু করে এবং শত্রুদের সাথে হাত মিলায়। এ দিকে বনু হাশিম শর্তহীনভাবে মহানবী (সা)-এর সমর্থন ঘোষণা করে। এই সমর্থনের পিছনে গোত্রীয় বিদ্বেষ ও বনু উমাইয়াদের সাথে বনু হাশিমের পুরনো শত্রুতাও অনেকটা কার্যকর ছিল। তা সত্ত্বেও গোত্রীয় বিদ্বেষ ও পুরনো শত্রুতা বনু হাশিমকে পুরো কুরাইশের প্রতিপক্ষে দাঁড় করানো সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে এরূপ অবস্থায় যখন তারা দেখতে পাচ্ছিল, নতুন ধর্ম তাদেরই পৈতৃক ধর্মের অপমান ও অসম্মান করছে। তবু তারা মহানবী (সা)-কে সমর্থনের আহবানে সাড়া দিয়েছিল। তার কারণ তারা মনে করেছিল, এর আগে উমাইয়া ইবনে আবিস্ সালত, ওয়ারাকা ইবনে নওফেল প্রমুখকে যেমন তাদের মতবাদ প্রচারের সুযোগ দেয়া হয়েছে, তেমনি (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কেও দেয়া হোক। তাঁর মতবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে বনু হাশিমও এর সুফল থেকে বঞ্চিত হবে না। মহানবী (সা)-এর মান-মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অংশীদার তারাও হবে। আর যদি এই মতবাদ সত্য না হয়, পূর্ববর্তী মতবাদ প্রচারকদের মতো (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীরাও অদূর ভবিষ্যতে কেটে পড়বে। তাদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বনু হাশিমদের নিকট মহানবী (সা)-এর ধর্ম প্রচার এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যে, পুরনো শত্রুতা ও গোত্রীয় বিদ্বেষ উপেক্ষা করে তাঁকে শত্রুদের হাতে তুলে দিতে হবে। এসব দিক বিবেচনা করেই বনু হাশিম মহানবী (সা)-কে সমর্থনের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। মূলত তখনো তারা তাদের পৈতৃক ধর্ম পৌত্তলিকতারই অনুসারী ছিল।

কুরাইশদের নির্যাতন

তখনো মহানবী (সা) নিজ গোত্রের ছত্রছায়ায় কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে নিরাপদ ছিলেন। ঘরে হযরত খাদীজা (রা)-এর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মহানবী (সা)-এর জন্য অনেকটা মানসিক প্রশান্তি ছিল। বাইরে কোন শত্রুর বিরোধিতা ও দুর্ব্যবহারে মহানবী (সা) মনক্ষুণ্ণ হলেও ঘরে আসার পর তা দূর হয়ে যেতো। হযরত খাদীজা (রা) স্ত্রীসুলভ প্রীতিময় ব্যবহারের মাধ্যমে তা ভুলিয়ে দিতেন। ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে এ সময়ে কুরাইশদের উদাসীনতা কেটে যায়। তারা মুসলমানদের অত্যাচার-নির্যাতন আরম্ভ করে। অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে তারা মুসলমানদের সত্য ধর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। কুরাইশদের এক ব্যক্তি তার ক্রীতদাস হযরত বিলাল (রা)-কে উত্তপ্ত রোদে চিৎ করে শুইয়ে বুকে পাথর-চাপা দিয়ে রাখত। এরূপ অসহনীয় অত্যাচার-নির্যাতনের ভিতরও হযরত বিলাল (রা) 'আহাদ', 'আহাদ' বলতে থাকতেন। তিনি পাপিষ্ঠ মনিবের অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতনেও আল্লাহর নামে ধৈর্য ধারণ করতেন। হযরত বিলালের উপর একদিন এমনি নির্যাতন চলছিল। হযরত আবু বকর (রা) সে পথে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি হযরত বিলাল (রা)-এর উপর অকথ্য নির্যাতনের মর্মভূদ দৃশ্য দেখে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না। তিনি হযরত বিলাল (রা)-কে তাঁর মালিক থেকে কিনে মুক্ত করে দিলেন। আরো কিছু ক্রীতদাস ইসলাম গ্রহণের দরুন তাদের মনিবদের অকথ্য অত্যাচারের শিকার হচ্ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) তাদেরও কিনে মুক্ত করে দেন। তিনি হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একটি বাঁদীও খরিদ করে মুক্ত করে দেন। সে সময় এক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। কুরাইশরা তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। তাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তবু তিনি পবিত্র ইসলাম ত্যাগ করে তার পৈতৃক ধর্মে ফিরে যেতে সম্মত হননি।

স্বাধীন মুসলমানদের উপরও কুরাইশরা অত্যাচার-নির্যাতন চালায়। এমনকি মহানবী (সা) বনু হাশিম ও বনু আবদুল মোত্তালিবের ছত্রছায়ায় থাকা সত্ত্বেও কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে রেহাই পাননি। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল তার ঘরের সব ময়লা-আবর্জনা মহানবী (সা)-এর দিকে ছুঁড়ে মারত। তাঁর যাতায়াতের পথে ফেলে রাখত। মহানবী (সা) কিছুই বলতেন না। রাস্তার ময়লা একদিকে সরিয়ে তিনি চলে যেতেন।

একদিন মহানবী (সা) কা'বাঘরের সামনে নামায পড়ছিলেন। আবু জাহেল বধ্যভূমি থেকে একটি ছাগলের নাড়িভুঁড়ি কুড়িয়ে এনে মহানবী (সা)-এর উপর নিক্ষেপ করেন। এ সময় তিনি সেজদারত অবস্থায় ছিলেন। আবু জাহেলের এই অমানবিক আচরণের জবাবে মহানবী (সা) কিছুই বললেন না। তিনি বাড়ি চলে আসেন। তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা) কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করেন। রাস্তা-ঘাটে চলাফেরার সময় প্রায়ই বিরোধীদের কটুকথা ও গালমন্দ মুসলমানদের শুনতে হতো। কিন্তু কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতনের এই ঘৃণ্য পদ্ধতি মুসলমানদের তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ধর্মের পথে এসব দুঃখ-কষ্ট মুসলমানদের ঈমানের শক্তি আরো সুদৃঢ় করে তোলে। মহানবী (সা)-এর সাহাবীরা তাঁদের ঈমানের হেফাজতের জন্য যে কোন ত্যাগ হাসিমুখে বরণ করতেন। তাতে তাঁরা অনেকটা আনন্দ অনুভব করতেন।

প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা)-এর জীবনের এই অধ্যায়টি ছিল মানব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ও অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

শত্রুর নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ

মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীরা ধন-সম্পদের আকাজক্ষী ছিলেন না। সত্যের প্রতি ছিল তাঁদের প্রবল আকর্ষণ এবং ঈমানের সাথে ছিল সুগভীর সম্পর্ক। ঈমান বা আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস তাঁদের এত অমূল্য সম্পদ ছিল যে, যারা সাহাবীদের কষ্ট দিত, নির্যাতন চালাত, তাদেরও তাঁরা ইসলামে দীক্ষিত করার চেষ্টা করতেন। নির্যাতনকারীদের পৌত্তলিকতার অভিশাপমুক্ত দেখায় তাঁরা আনন্দবোধ করতেন। কারণ পৌত্তলিকতায় মানব-আত্মা সব সময় অবমানিত হয়। আর মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীদের কাছে মানবাত্মার অবমাননা ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য ব্যাপার। বিশ্বয়কর ব্যাপার হলো, যাদের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য মহানবী (সা) বিরাট দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন, তারাই তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের নানাভাবে কষ্ট দিতে শুরু করে। তাদের কবিরাজি ভাষায় মহানবী (সা)-এর নিন্দাবাদ করে। মহানবী (সা)-কে কা'বাঘরের সামনে হত্যা করার জন্য কুরাইশরা এক ব্যক্তিকে প্ররোচিত করে। কোন কোন বিরোধী চুপে চুপে গিয়ে মহানবী (সা)-এর বাড়িতে পাথরের টিল ছুঁড়ত। তাঁর অনুসারী, এমনকি সমর্থকদের জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এসব বিপদাপদের ঝড়-ঝঞ্ঝায়ও মহানবী (সা)-এর মনোবল বিন্দু পরিমাণও হ্রাস পায়নি। দিন দিন তাঁর সাহস ও দৃঢ়তা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর অনুসারীরাও ধৈর্যহারা হননি। তাঁদের অন্তরে মহানবী (সা)-এর একটি বাণী অসম সাহস সঞ্চার করছিল। তাঁর সে বাণীটি হলো, “আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে বলছি, যদি মক্কার অধিবাসীরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র রেখেও রিসালাতের প্রচার ত্যাগ করতে বলে, তবু আমি তা ত্যাগ করব না। আল্লাহর দীনের প্রচারে যদি আমার মৃত্যুও হয়, তবু আমি পিছপা হবো না।” মহানবী (সা)-এর এই বলিষ্ঠ উক্তি নতুন দীক্ষিত মুসলমানদের মনোবলও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টে তাঁরা আনন্দবোধ করতেন। তাঁদের পবিত্র অন্তর থেকে মৃত্যুর ভয়-ভীতি কেটে গিয়েছিল। একদিকে কুরাইশরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাত, অপরদিকে অত্যাচারিতরাই অত্যাচারীদের তাওহীদের তাৎপর্য শোনাতে। কী অভূতপূর্ব দৃশ্য।

হয়তো কেউ কেউ বিস্মিত হবেন যে, তখনো ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের মাত্র কয়েকটি সূরা নাযিল হয়েছে। এরূপ অবস্থায় মুসলমানদের ঈমানে এত প্রেরণা, বিশ্বাসে এত সুদৃঢ়তা কিভাবে সূচিত হলো। সম্ভবত কেউ কেউ বলবেন, মুসলমানদের এরূপ আত্মত্যাগী মনোভাব আর দৃঢ় বিশ্বাসের মূলে ছিল মহানবী (সা)-এর চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও সত্যানুরাগিতা। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুসলমানদের এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের পিছনে মহানবী (সা)-এর বলিষ্ঠ চরিত্রের বিরাট প্রভাব ছিল। কিন্তু এ ছাড়া এর পিছনে আরো কিছু প্রেক্ষাপট ছিল।

মহানবী (সা) যে সামাজিক পরিবেশে জীবন যাপন করছিলেন, সেটা ছিল অনেকটা গণতান্ত্রিক। উক্ত পরিবেশে তাঁর ব্যক্তিগত সামাজিক মর্যাদাও কম ছিল না। অর্থনৈতিক দিক

থেকে তিনি ছিলেন সচ্ছল জীবনের অধিকারী। পারিবারিক দিক দিয়েও তাঁর উঁচু বংশমর্যাদা ছিল। কুরাইশ বংশ সমকালীন আরবে শীর্ষস্থানীয় ছিল। কুরাইশদের মধ্যেও মহানবী (সা) ছিলেন বনু হাশিম গোত্রের। এই গোত্রের হাতেই কা'বাঘরের দেখাশোনা ও হাজীদের পানি সরবরাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এদিক থেকে নবুয়ত ছাড়াও উক্ত সমাজ ও পরিবেশে মহানবী (সা)-এর বিশেষ মর্যাদা ছিল। অতীতে অনেক নবী-রাসূলেরই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ ছিল ভিন্ন ধরনের।

দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে মিসরে রাসূল হিসাবে পাঠান। সেখানকার অধিবাসীদের ফেরাউনকে বাধ্যতামূলকভাবে খোদা স্বীকার করতে হতো। ফেরাউন তাদেরকে মেকি খোদায়ীর চক্ররে আবদ্ধ রেখেছিল। তৎকালীন মিসরের জাদুকর ও কায়েমী স্বার্থবাদীরাও তাদের বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষার মোহে ফেরাউনের সমর্থক ছিল। একরূপ পরিবেশে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে একত্ববাদ প্রচারের জন্য রাসূল করে পাঠান। হযরত মূসা (আ)-এর প্রচারের বৈপ্লবিক ধারা অনেকটা রাজনৈতিক। তিনি চাচ্ছিলেন ফেরাউন ও গরীব বাসিন্দারা সবাই একইভাবে মহান স্রষ্টার সামনে শির নত করুক। কিন্তু সে দেশে ফেরাউনের খোদায়ী দাবির কানুন ছিলুভিন্ন না করা পর্যন্ত বিত্তবান ও সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করা সম্ভব হচ্ছিল না। আর এজন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। মিসরের তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে এই রাজনৈতিক বিপ্লব ছাড়া গরীব ও আমীরের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর ছিল না। এই বিপ্লবের প্রবল ঝড় থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য ফেরাউন হযরত মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে তার সর্বশক্তি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু হযরত মূসা (আ)-এর পক্ষে সামরিক পদ্ধতিতে ফেরাউনকে পাল্টা আঘাত করা সম্ভবপর ছিল না। হযরত মূসা (আ) একজন রাসূল হিসাবে মানুষকে নিজের পক্ষে আনার জন্য মু'জিয়া প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফেরাউনও রাজ্যের সেরা জাদুকরদের মাধ্যমে হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিয়ার জবাব দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফেরাউনের জাদুকররা অনেক রশি সাপে রূপান্তরিত করে ছেড়ে দেয়। হযরত মূসা (আ) তাঁর হাতের লাঠিটি মাটিতে ফেলে দেন। আল্লাহ্র কুদরতে এটি একটি বিরাট অজগর সাপে পরিণত হয়। জাদুকরদের সব সাপ খেয়ে ফেলে। কিন্তু তাতেও মিসরে ফেরাউনের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ)-এর প্রচার ফলপ্রসূ হয়নি। তিনি শেষ পর্যন্ত মিসর থেকে হিজরত করতে বাধ্য হন। হিজরতের পথেও হযরত মূসার একটি মু'জিয়া প্রকাশিত হয়। লোহিত সাগরের একটি রেখা হযরত মূসা (আ) ও তাঁর সকল সঙ্গীদের জন্য পায়ে হাঁটা পথে রূপান্তরিত হয়। এ পথ দিয়ে তাঁরা পার হয়ে আসেন।

হযরত মূসা (আ)-এর পর ফিলিস্তিনের এক এলাকায় হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাব হয়। তাঁর জন্মস্থানের নাম নাসেরা। এ সময় ফিলিস্তিন ছিল রোমান সম্রাটের অধীন। রাজকীয় আমলারা ফিলিস্তিনীদের উপর সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতন চালাতো। হযরত ঈসা (আ) রাজ-কর্মচারীদের অত্যাচার-নির্যাতনে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দিতেন। তিনি মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কৃত পাপের ক্ষমা এবং তাঁর নিয়ামতের প্রাচুর্যের জন্য দোয়া করার প্রেরণা দান করতেন। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী ও তাদের কর্মচারীরা মু'মিনদের মধ্যে এতটুকু পরিবর্তনও নিজেদের রাজনীতি ও ক্ষমতার জন্য ক্ষতির মনে করে। হযরত ঈসা (আ) মানুষকে তাঁর শিক্ষায় কায়েম

রাখার জন্য একাধিক মু'জিয়া প্রদর্শন করেন। কোথাও মৃতদের জীবিত করেন। কোথাও মৃতপ্রায় লোকদের সুস্থ করে তোলেন। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তিনি আরো কিছু মু'জিয়া প্রদর্শন করেন।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ) এবং সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শিক্ষার মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য খুঁটিনাটি দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। তবে সেগুলো বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। কিন্তু তাঁদের দাওয়াত বা আহ্বানে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই আহ্বানের প্রেক্ষাপটেও ভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর আহ্বানের ভূমিকায় ছিল রাজনৈতিক বিপ্লব। অপরদিকে মহানবী (সা)-এর আহ্বানের ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিকতায় বিপ্লব সাধন। তাঁর আহ্বানের প্রতিটি দিকে ছিল অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের চিত্তাকর্ষক প্রতিচ্ছবি। এজন্যই মক্কাবাসীদের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে মহানবী (সা)-এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সরাসরি সংঘাত ছিল না।

আহ্বানের সারকথা

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকেও মহানবী (সা)-এর আহ্বান বা ইসলাম প্রচারের ফলশ্রুতি ছিল অভূতপূর্ব। এটা সত্যি এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি হলো, কোন বিষয়ে গবেষণা করার সময় এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য সব বিষয় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হয়। এরপর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে উক্ত বিষয় সম্পর্কে গবেষণা শুরু করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যায়ন করা হয়। এরপর মূল্যায়নলব্ধ ধারণাগুলো দার্শনিক পদ্ধতিতে সাজান হয়। শেষ পর্যায়ে এই সাজান ভূমিকা থেকে ফলাফল বের করা হয়। এই পদ্ধতিতে জ্ঞানগত গবেষণার আলোকে যে ফলাফল বের হবে তা নির্ভরযোগ্য ও সঠিক বলে গণ্য করা হবে, যতক্ষণ না অন্য কোন গবেষণার মাধ্যমে তা ভুল প্রমাণিত হবে। বস্তুত এটাই হচ্ছে মানবীয় চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে প্রকাশের পদ্ধতি। মহানবী (সা)-এর সত্যের প্রতি আহ্বানের বুনিয়াদ অনুসন্ধানের জন্য এই পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে মহানবী (সা)-এর আহ্বানে তাঁর অনুসারীদের সাড়া দেয়ার কারণ কি ছিল, তাঁরা কেন তাঁদের পুরনো ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করলেন। তখন আরবে প্রতিটি গোত্রের পৃথক পৃথক প্রতিমা ছিল। এসবের মধ্যে কোথাও সত্যতা ছিল কিনা। আরব এবং প্রতিবেশী বিভিন্ন রাষ্ট্রে সে সময় নক্ষত্রপূজা, অগ্নিপূজা ও সূর্যপূজার প্রচলন ছিল। এসবের কোনটিকে সত্য বলে গণ্য করা যায় কিনা--মহানবী (সা)-এর আহ্বানের যথার্থতা অনুধাবনের গবেষণায় সর্বপ্রথম এসব কিছু থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে হবে। এরপর নিজের সকল প্রকার ধ্যান-ধারণা ও কল্পনামুক্ত হয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টি নিয়ে দেখতে হবে সত্য কোথায় নিহিত!

১. লেখকের এই বিশ্লেষণের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করা যায় না। কারণ ইসলামের বৈপ্লবিক শিক্ষা ও মতবাদ মক্কাবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, এক কথায় সকল ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। এজন্যই তারা মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল।

এ বিষয়টি একটা স্বীকৃত সত্য যে, পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু গোলাকৃতির শিকলের ন্যায় একে অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট। মানবজাতি ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। এদের সম্পর্ক রয়েছে উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের সাথে। আর এসব কিছু সম্পর্ক রয়েছে মাটি বা পৃথিবীর সাথে। আবার চাঁদ, সুরজ, গ্রহ-নক্ষত্র ও পৃথিবী নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে। এসবের মধ্যে একের পরিমণ্ডলে অপরের যে প্রভাব বা ক্রিয়া রয়েছে তা তারা সম্পাদন করতে বাধ্য। এসব গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে যদি কোন একটি তার কাজে বিন্দু পরিমাণও কম বা বেশি করে তা'হলে বিশ্বজগতের পুরো ব্যবস্থাই এলোমেলো হয়ে যাবে। যেমন সূর্য যদি তার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী পৃথিবীতে তাপ ও আলো না পৌঁছায়, তা'হলে আকাশ ও পৃথিবীর চিত্রই পাল্টে যাবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বজগতের সবকিছুই নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনে তৎপর। আর এজন্যই বিশ্বজগত ব্যবস্থায় কোন প্রকার গোলমাল দেখা দেয় না।

অনুরূপ এ সত্যও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মহাবিশ্বের প্রতিটি গ্রহ, উপগ্রহ, এক কথায় প্রতিটি বস্তুর যেমন পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি এসব কিছুর আবার এক মহা শক্তির সাথে সম্পর্ক রয়েছে। এই মহাশক্তি এসব কিছু শুধু নিয়ন্ত্রণই করছেন না, রক্ষণাবেক্ষণও করছেন। আর এই মহাশক্তির কৃপা দৃষ্টিতেই মহাবিশ্বের সবকিছু অস্তিত্ব লাভ করেছে। এক সময়ে মহাশক্তির ইঙ্গিতে বিলীন হয়ে যাবে। বারিবিন্দু যেমন সাগরে পড়ে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়, তেমনি মহাবিশ্বের সবকিছুই উক্ত মহাশক্তির দ্যুতিতে বিলীন হয়ে যাবে। সুতরাং মানব জাতির কর্তব্য হচ্ছে উক্ত চিরন্তন-শাস্বত ও অনাদি-অনন্ত মহাশক্তিরই উপাসনা করা। কারণ সকল মাখলুক বা সৃষ্ট বস্তু তাঁরই সামনে সেজদাবনত থাকে। মানুষ ও মহাবিশ্বের অন্যসব কিছুতে আকৃতি-প্রকৃতির দিক থেকে যদিও ভিন্নতা রয়েছে, কিন্তু সৃষ্টিগত দিক থেকে এসবের মধ্যে একটা সম্বন্ধ রয়েছে আর সেই চিরন্তন মহাশক্তিই তাদের এই সম্বন্ধের মূল উৎস। এজন্য সেই অনাদি-অনন্ত মহাশক্তিই সকল উপাসনা, সকল প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। মানুষের মন ও মস্তিষ্কে যেসব যোগ্যতা রয়েছে, তাও সেই মহাশক্তিরই অনুগ্রহ। বিশ্বজগত ও তার বাস্তবতা সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে আমাদের সামনে এই সত্য উদ্ভাসিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া প্রতিমা, রাজা-বাদশাহ, আগুন, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি যেসবকে মানুষ উপাস্যের আসনে স্থান দিয়েছে, এগুলো সবই বাতিল। এসবের উপাসনা করা মানবতার শ্রেষ্ঠত্বের স্পষ্ট অবমাননা। সঠিক জ্ঞান-বুদ্ধি এসবের উপাসনার কোন গুরুত্ব দেয় না।

মহানবী (সা)-এর ইসলামের প্রতি আহবানের এটাই ছিল তাৎপর্য যা মক্কার সৌভাগ্যবান লোকেরা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন। তাতে করে তাঁরা ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে মুসলমান হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন। বস্তুত এই তাৎপর্যকে আল্লাহ তা'আলা ওহীর ভাষায় মহানবী (সা)-এর মাধ্যমে অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গিতে ব্যক্ত করেন। এই আহবানের ভাষা ও ভাব অনুপম ও অতুলনীয়। এ ছিল মু'জিয়া, অন্য কারো পক্ষেই এরূপ ভাষা ও ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই আহবানে মক্কার অধিবাসীরা সত্যতার এক অভূতপূর্ব প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ফলে আন্তরিকভাবে তারা তা গ্রহণ করেন। মহানবী (সা) মক্কার অধিবাসীদের নিকট অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই সত্য তুলে ধরেছিলেন যে,

একমাত্র পুণ্য ও পূত-পবিত্রতার মাধ্যমেই উক্ত মহাশক্তি বা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা যায়। যারা মহানবী (সা)-এর প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি তাঁদের নিকট এই সত্যও প্রকাশ করেছেন যে, তাঁরা আন্তরিকভাবে এই পথে কায়েম থাকলে ইহকালে সুফল ভোগ করবেন এবং পরকালে যখন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে, সেখানেও তারা সুফল লাভ করবেন। এ কথাই পবিত্র কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

“কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে তা সে দেখবে আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলেও তা সে দেখবে।” (৯৯ : ৭-৮)

মানবাত্মার অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর চাইতে উঁচু স্থান আর কী হতে পারে? যুগ যুগ থেকে মানবজাতি যেসব ভারি শৃংখলে জড়িয়ে আছে, তা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য এর চাইতে মোক্ষম পদ্ধতি আর কী হতে পারে? বস্তুত ইসলামের শিক্ষা উপলব্ধি করা, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা মানবের নিজের জন্যই কল্যাণকর। শরীয়ত বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদর্শিত পথই হচ্ছে মানবতার চরম উৎকর্ষের একমাত্র পথ, একমাত্র উপায়। তবে এ পথের প্রাথমিক স্তর নিষ্কটক নয়। তাতে সমস্যা রয়েছে, দুঃখ-কষ্ট রয়েছে। কিন্তু ফলশ্রুতির তুলনায় এসব সমস্যা ও দুঃখ-কষ্টও আনন্দদায়ক।

হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণ

মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের দৃঢ়তা দেখে বনু হাশেম ও বনু আবদুল মোত্তালিবের মধ্যে তাঁদের (মুসলমানদের) সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা করার প্রেরণা আরো বৃদ্ধি পায়। একদিন আবু জাহেল অত্যন্ত অশালীন ভাষায় মহানবী (সা)-কে অপমান করে। তিনি আবু জাহেলের এ সব অশালীন কথাবার্তার কোন প্রতি-উত্তর না দিয়ে নীরবে সেখান থেকে চলে আসেন। হযরত হামযা (রা) ছিলেন মহানবী (সা)-এর চাচা এবং তিনি দুধভাইও ছিলেন। হযরত হামযা (রা)-এর শিকারের প্রতি বেশ ঝোঁক ছিল। তাঁর অভ্যাস ছিল, শিকার থেকে বাড়ি ফেরার পথে কা'বাঘর তাওয়াফ করে আসতেন। সেদিন হযরত হামযা (রা) শিকার থেকে ফিরছিলেন। পথে কেউ হযরত হামযা (রা)-কে মহানবী (সা)-এর সাথে আবু জাহেলের বাড়ি বাড়ির কথা বলেন। এ কথা শুনে হযরত হামযা (রা) কোন দিক না তাকিয়ে সোজা কা'বাঘরে পৌঁছেন। এখানে আবু জাহেলও উপস্থিত ছিল। হযরত হামযা (রা) ধনুক দ্বারা আবু জাহেলের মাথায় আঘাত করেন। তার মাথা কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ে। আবু জাহেলের গোত্র বনু মাখযুমের কিছু লোক তাদের নেতার সমর্থনে এগিয়ে আসে। আবু জাহেল তাদের বারণ করে বলে, এই অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত আমার পক্ষ থেকেই হয়েছিল। আমিই (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে দুর্ব্যবহার করেছি। এরপর হযরত হামযা (রা) প্রকাশ্যে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। তিনি মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আজ থেকে আমি আপনার সর্বাত্মক সহযোগিতা করব। আল্লাহ তা'আলার পথে জীবন দিতেও আমি দ্বিধা করব না।

উতবা ইবনে রবীআর বার্তা

মহানবী (সা)-এর দৃঢ়তা ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি দেখে কুরাইশরা শংকিত হয়ে পড়ে। তারা ভাবে এত কিছু অত্যাচার-নির্যাতন সত্ত্বেও (হযরত) মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীরা ইসলাম ত্যাগ করছে না। তারা আমাদের সামনেই প্রকাশ্যে বিনা দ্বিধায় নামায আদায় করছে। তারা এই পরিস্থিতি দেখে মহানবী (সা)-কে ইসলাম থেকে বিরত রাখার জন্য এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তাদের ধারণা ছিল এই পরিকল্পনার মাধ্যমে মহানবী (সা)-কে তাঁর মিশন থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু তাদের এ কথা জানা ছিল না যে, মহানবী (সা)-এর রিসালাতের আহবানের একটা স্পষ্ট লক্ষ্য রয়েছে, একটা কল্যাণকর উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে মানবতার চরম উৎকর্ষ সাধন। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সামনে রাজনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থের বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব নেই।

একদিন কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা কা'বাঘরে একত্রিত হয়ে এ ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করল। তাদের মধ্যে উতবা ইবনে রবীআও ছিল। সে সমকালীন আরবে একজন বিত্তবান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল। উক্ত সমাবেশে উতবা কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলল, আমি এ ব্যাপারে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সরাসরি আলাপ করতে চাই। আমি তাঁর সামনে কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করব। সম্ভবত তিনি এসবের কোন একটিতে সম্মতি প্রকাশ করবেন। তিনি যা পছন্দ করবেন তা তাকে দেয়া হবে। তাতে করে কুরাইশরা এই আত্মঘাতী সংঘাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে।

এ সময় মহানবী (সা)-ও কা'বাঘরে ছিলেন। তিনি এক কোণে একা বসে ইবাদতে মশগুল ছিলেন। উতবা মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলে, “ভাতিজা! বংশ-কুলের দিক থেকে আপনার স্থান অনেক উঁচুতে। কিন্তু আপনার ভূমিকায় সারা জাতির মধ্যে মারাত্মক বিশৃংখলা ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। আপনার নিকট আমি কিছু প্রস্তাব রাখছি। আশা করি আপনি তার মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করবেন।

১. আপনার ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য যদি ধন-সম্পদ উপার্জন হয়, তা'হলে আমরা আপনাকে অটেল ধন-সম্পদ প্রদান করব। আপনি আরবের শ্রেষ্ঠতম ধনী হিসাবে পরিগণিত হবেন।

২. এর দ্বারা আপনি যদি নেতৃত্ব লাভ করতে চান, আমরা আপনাকে নেতা হিসাবে বরণ করে নিচ্ছি। কোন কাজ আপনার সাথে পরামর্শ করা ছাড়া এবং আপনার মতামত নেয়া ছাড়া করা হবে না।

৩. আপনি বাদশাহী চাইলে আমরা আপনাকে বাদশাহ হিসাবে মেনে নিতে প্রস্তুত।

৪. আপনি যদি প্রেতাত্মার শিকার হয়ে থাকেন এবং এর চিকিৎসা করতে আপনি অপারগ হলে আমাদেরকে বলুন, আমরা নিজেরা আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।

এ পর্যন্ত বলার পর উতবা নীরব হয়ে যায়। মহানবী (সা) তাকে বললেন, উতবা! তোমার আর কিছু বলার আছে? সে জবাব দিল, না, এ পর্যন্তই। এরপর মহানবী (সা) ‘বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ বলে সূরা ‘হা-মীম সিজদার’ প্রথম চৌদ্দটি আয়াত তেলাওয়াত করেন। এদিকে উতবা গভীর মনোযোগ সহকারে মহানবী (সা)-এর তেলাওয়াত শুনছিল। ইতিমধ্যে তার নিকট এই সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহানবী (সা) এক অসাধারণ ব্যক্তি। ধন-সম্পদ,

পদ-মর্যাদা কিংবা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের প্রতি তাঁর এতটুকু মোহ নেই। এমনকি তিনি কোন প্রকার রোগগ্রস্তও নন। তিনি যা বলেন তাতে অন্তর্নিহিত সত্য রয়েছে। পুণ্যের প্রতি আহ্বান এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতি সমর্থন জানানো তার স্বভাবজাত ব্যাপার। তাঁর তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোতে ভাষার অলংকারের অনুপম উৎকর্ষ রয়েছে। এসবের সাথে মানব রচিত কোন সাহিত্যেরই তুলনা হয় না। এসব অলৌকিক বাণী ছাড়া কিছু নয়।

মহানবী (সা) উত্বাকে বললেন, আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রস্তাবের এটাই জবাব। এরপর মহানবী (সা) অন্যদিকে চলে যান। উত্বা তার সমমনাদের নিকট ফিরে আসে। মহানবীকে উপলব্ধি এবং পবিত্র কোরআনের অলৌকিকতার দ্যুতিতে এ সময় সে বেশ খুশি ছিল। সে কুরাইশদের উদ্দেশে বলল :

“(হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে আমাদের সময় দেয়া উচিত। আরবরা তাকে পরাজিত করলে আমরা এমনিতেই তার থেকে নিষ্কৃতি পাব। আর যদি আরবরা তার অনুগত হয়ে যায়, তাহলে কুরাইশরাও এই গৌরবের অংশীদার হবে।”

কিন্তু কুরাইশরা উত্বার এই পরামর্শ মেনে নিল না। তাদের শত্রুতা বৃদ্ধি পেলো। মহানবী (সা) ও তাঁর সাথীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের অভিযান তারা আরো বৃদ্ধি করল। অবশ্য মহানবী (সা)-এর চাচা আবু তালেবের প্রভাব-প্রতিপত্তির দরুন রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর পরিবার এসব অত্যাচার-নির্যাতন থেকে অনেকটা নিরাপদ ছিলেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

মুসলমানদের উপর কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন অত্যন্ত বেড়ে যায়। তারা যাকে ইচ্ছা মারধর করত। যাকে ইচ্ছা হত্যা করতেও ইতস্তত করত না। এ সময়ে মক্কায় অবস্থান করা মুসলমানদের জীবনের জন্য ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে মহানবী (সা) মুসলমানদের অন্য দেশে হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন। সাহাবীরা মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোথায় হিজরত করবো হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কোন্ দেশ আশ্রয় দিতে পারে? তিনি বললেন, আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান শাসক একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। তোমরা সেখানে হিজরত করতে পার। তিনি আরো বললেন : “আবিসিনিয়ায় মানুষের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালান হয় না। সে রাজ্য হচ্ছে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতার কেন্দ্রভূমি। মক্কার অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আবিসিনিয়ায় থাকবে।” এরপর মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় দুইবার হিজরত করেন। প্রথমবার ১৫ সদস্যের একটি দল গোপনে মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তাদের মধ্যে ১১ জন ছিলেন পুরুষ এবং ৪ জন ছিলেন মহিলা। তারা সেখানে সুখ-শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করছিলেন। কিছু দিন পর তাঁরা সেখানে গুনতে পান, মক্কায় কুরাইশরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধ করে দিয়েছে। এই সংবাদ শুনে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানরা মক্কায় ফিরে আসেন। (এ সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে) কিন্তু স্বদেশে ফিরে এসে তাঁরা দেখেন মুসলমানদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন পূর্বের চাইতে কয়েকগুণ বেশি করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতি দেখে তাঁরা পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এবারে হিজরতকারীদের দলে নারী ও শিশু ছাড়া

আশিজন পুরুষ ছিলেন। মদীনায হিজরতের আগ পর্যন্ত তাঁরা সেখানেই বসবাস করেন। মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণকে 'প্রথম হিজরত' নামে অভিহিত করা হয়।

যে ব্যক্তি মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণ করেন, তাঁর মনে স্বভাবতই এ প্রশ্ন জাগবে যে, মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দেয়ার পিছনে কি তাৎপর্য নিহিত ছিল। তিনি কি শুধু কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্যই তাদের হিজরত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, না এর পিছনে তাঁর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল? মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবন-চরিত অধ্যয়নের মাধ্যমে এই বিষয়টি পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, তিনি শুধু আল্লাহর রাসূল ও শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্মবিদই ছিলেন না, তিনি একজন বিচক্ষণ-চিন্তাবিদ ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদও ছিলেন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাকে রিসালাতের দায়িত্ব পালনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরোপুরি সদ্যবহার করেছেন। এদিক থেকে আমরা মহানবী (সা) কর্তৃক মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের সম্মতিদানের তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করতে পারি। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

নাজ্জাশীর দরবারে কুরাইশ দূত

মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেও স্বস্তি পাননি। কুরাইশরা তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা সেখানে দু'জন দূত পাঠায়। আবিসিনিয়া থেকে মুসলমানদের ফিরিয়ে আনার জন্য কুরাইশদের দূত পাঠানোর পটভূমির কয়েকটি দিক রয়েছে। এসবের মধ্যে একটা হলো মুসলমানদের জন্মভূমি ত্যাগ করার পর কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন চালানোর উন্মাদনা প্রশমিত হচ্ছিল না। তাই তারা মূল্যবান উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধিদল সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে পাঠায়। তারা মনে করে তাতে নাজ্জাশী খুশি হয়ে মুসলমানদের কুরাইশদের নিকট হস্তান্তর করতে সম্মত হবেন। দেশে ফিরিয়ে এনে তারা মুসলমানদের উপর অত্যাচারের স্তীমরোলার চালাবে।

আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী ও তাঁর প্রজারা ছিলেন খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। সম্ভবত কুরাইশরা আশংকা করছিল যে, মুসলমানদের নিকট ইসলামের মহান বাণী শুনে নাজ্জাশী ও তাঁর প্রজারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফেলতে পারেন। তাই তারা মুসলমানদের ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অথবা কুরাইশরা এমন আশংকাও করে থাকতে পারে যে, মুসলমানদের আবিসিনিয়া থেকে দ্রুত ফিরিয়ে না আনলে তারা সেখানে শক্তি সঞ্চয় করবে। এক পর্যায়ে ধন-সম্পদ, জনবল নিয়ে দেশে ফিরে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর সমর্থনে কুরাইশদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

উপরোক্ত কোন একটি আশংকা করেই কুরাইশরা মুসলমানদের আবিসিনিয়া থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। এই প্রতিনিধি দলে কুরাইশদের দুই জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল। একজন হলো আমর ইবনে আস এবং অপরজন আবদুল্লাহ ইবনে রবীআ। তারা আবিসিনিয়ার রাজধানীতে পৌঁছে প্রথমে বাদশাহ ও তাঁর পদস্থ অমাত্যদের উপঢৌকনগুলো আলাদা করে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে। এরপর তারা রাজ-দরবারে উপস্থিত হয় এবং বাদশাহর নিকট প্রার্থনা করে :

“হে সম্রাট! আমাদের কয়েকজন ফেরার যুবক নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম ত্যাগ করে আপনার রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারা যদি আপনার ধর্ম গ্রহণ করে ফেলত, তাহলে সেটা ছিল সৌভাগ্যের ব্যাপার। তারা এক নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছে। সে ধর্ম আমাদের এবং আপনাদের সবার বোধগম্যের বাইরে। হে পৃথিবীর সম্রাট! মক্কার কুরাইশ জ্ঞানী-গুণীরা এসব যুবকের কুমতলব সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত আছেন। মক্কার নেতৃবৃন্দ এসব যুবককে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আমাদেরকে আপনার দরবারে পাঠিয়েছেন।”

এ প্রতিনিধিদল আগেই উপহার-উপঢৌকন দিয়ে রাজ-দরবারের অমাত্যদের বাধ্য করে নিয়েছিল। তারা রাজ-অমাত্যবর্গ থেকে পূর্বাঙ্কে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল যে, মুহাজির মুসলমানদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেয়া হবে না। কিন্তু নাজ্জাশী এভাবে মুসলমানদের কুরাইশদের নিকট হস্তান্তর করতে সম্মত হলেন না। তিনি একজন দূত পাঠিয়ে মুহাজিরদের দরবারে ডেকে আনলেন। তারা উপস্থিত হলে সম্রাট বললেন, “আপনাদের কি ধর্ম। আপনাদের যদি ধর্ম ত্যাগই করতে হলো খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন না কেন। অথবা পুরনো অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করলেন না কেন।”

সম্রাট নাজ্জাশীর প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য মুসলিম মুহাজিরদের পক্ষ থেকে হযরত জা'ফর তাইয়ার (রা) উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন :

“হে সম্রাট! আমরা অজ্ঞতার যুগের ঘৃণ্যতম নিদর্শন। আমরা মহান স্রষ্টাকে ভুলে গিয়ে নানা দেবদেবী ও এসবের প্রতীক নিজেদের হাতে তৈরি পাথরের প্রতিমার পূজা করতাম। মৃত জন্তুর মাংস খাওয়া, প্রকাশ্যে ব্যভিচার, হত্যা, রাহাজানি, লুটতরাজ প্রভৃতি ছিল আমাদের নিত্য দিনের কাজ। রক্তের বন্ধন বা আত্মীয় প্রতিবেশীদের অধিকার থেকে আমরা দূরে থাকতাম। দুর্বলের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ আমাদের প্রত্যেকের নিকট অত্যন্ত গর্বের ব্যাপার। আমাদের এই মানবতা বিবর্জিত জীবনধারা কয়েক শতাব্দী থেকে চলে আসছে। হঠাৎ আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে নবী করে পাঠান। পারিবারিক শ্রেষ্ঠত্ব, সততা ও আমানতদারীর ব্যাপারে তিনি প্রাক-নবুয়ত জীবনেই আমাদের মধ্যে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেন। তিনি এক অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্য আমাদের আহ্বান জানান। আমরা তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দেই। আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষের পৌত্তলিকতা ছেড়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত শুরু করি। তিনি আমাদের সত্য বলা শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা তা গ্রহণ করেছি। তিনি আমাদের আমানত রক্ষা করা, আত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে ইনসাফ ও ন্যায্যনীতি অবলম্বন এবং একে অপরের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর এসব নির্দেশ পালন করছি। তিনি বলেছেন, একে অপরকে অপমান করা, হত্যা করা অবৈধ কাজ। আমরা এসব ঘৃণ্য কাজ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নিয়েছি। অশ্লীল কথাবার্তা ও মিথ্যে বলাকে ঘৃণ্যতম বলেছেন। আমরা এসব থেকে নিজেদের বিরত রাখছি। সতি-সাক্ষী মহিলাদের সম্পর্কে অপবাদ রটাতে তিনি বারণ করেছেন। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের মুখ সংযত করেছি। অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের সম্পদ ভোগ করা তিনি অবৈধ বলেছেন। আমরা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ গচ্ছিত ধন-সম্পদের চাইতেও প্রিয়তর মনে করে এসবের দেখা-শোনা করছি। মহান আল্লাহ তা'আলার ইবাদত নামায,

ধন-সম্পদের যাকাত এবং রোযা তিনি আমাদের উপর বাধ্যতামূলক করেছেন। আমরা তাঁর নির্দেশ অত্যন্ত যত্নের সাথে পালন করছি।

“হে সম্রাট! আমরা উক্ত রাসূলকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তিনি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আমাদের যা কিছু বলছেন, আমরা সেসব পালন করছি। এ হচ্ছে আমাদের অপরাধ! এই অপরাধের জন্য আমাদের শহরের অধিবাসীরা আমাদের সাথে যেসব ব্যবহার করেছে, তার ইতিহাস অনেক দীর্ঘ, অনেক করুণ। তারা আমাদের উপর নানা ধরনের অকথ্য নির্যাতন চালাতো। তাদের এসব অত্যাচার-নির্যাতনের লক্ষ্য ছিল, আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করি। মহান স্রষ্টার ইবাদত থেকে বিরত থাকি। তাদের মতো আমরাও নানা দেবদেবী ও নিজ হাতে তৈরি প্রতিমার পূজা করি। আমরা পূর্বের মতো লজ্জা-শরম ত্যাগ করে অশ্লীল জীবনধারায় নিমগ্ন হই। কিন্তু আমরা আমাদের রাসূলের শিক্ষা ত্যাগ করিনি। তারাও আমাদের নিষ্কৃতি দেয়নি। তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন সীমা ছাড়িয়ে গেলে আমরা প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। হিজরত করাকে অগ্রাধিকার প্রদান করি। হিজরতের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আমরা আশেপাশের সবক’টি দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু আপনাকে ছাড়া আশ্রয় নেয়ার মতো অন্য কোন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। হে সম্রাট! আমরা আশা করি আপনার রাজ্যে আমাদের উপর জুলুম করা হবে না।”

হযরত জা‘ফর (রা)-এর ভাষণ শোনার পর সম্রাট নাজ্জাশী বললেন, আপনার রাসূল আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের নিকট যেসব বিধান প্রচার করেন, যদি সম্ভব হয়, তা থেকে আমাকে কিছু শোনান। হযরত জাফর (রা) বললেন, সেসব বাণীর অনেক কিছু আমার স্মরণ আছে। এ কথা বলে তিনি ‘সূরা মরিয়মের’ প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত আবৃত্তি করেন :

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ - قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا . قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا - وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا . وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا - وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا .

“অতঃপর মরিয়ম ইঙ্গিত করে সন্তানকে দেখালো। তারা বলল, যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব।’ সে বলল, ‘আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে আশিসভাজন করেছেন। তিনি আমাকে আজীবন সালাত ও যাকাত আদায় করতে ও আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি আমাকে উদ্ধৃত ও হতভাগ্য করেননি। আমার প্রতি ছিল শান্তি যে দিন আমি জন্মলাভ করেছি ও শান্তি থাকবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো।” (১৯ : ২৯-৩৩)

নাজ্জাশী ও অমাত্যদের জবাব

সম্রাট নাজ্জাশী তখনো নীরব ছিলেন। অমাত্যরা একবাক্যে বলে উঠেন, আল্লাহর শপথ! হযরত ঈসার বাণী আর এসব বাক্য একই স্থান থেকে নাযিল হয়েছে। নাজ্জাশী বললেন, ‘নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হযরত মুসা (আ) ও তাঁর পরবর্তী দুই সহযোগীর ওহী একই নূর বা আলো থেকে নাযিল হয়েছে।’ এরপর সম্রাট নাজ্জাশী আমার ইবনে আসকে বললেন, আপনি এখান থেকে যেতে পারেন। এমন লোকদের আমি আপনাদের নিকট সোপর্দ করতে পারি না। কিন্তু পরদিন আমার ইবনে আস পুনরায় সম্রাটের দরবারে হাযির হয়ে বলল, ‘হে সম্রাট! এরা হযরত ঈসা সম্পর্কে অনেক অশালীন কথাবার্তা বলে থাকে।’ সম্রাট হযরত জা‘ফর (রা)-কে তৎক্ষণাৎ ডেকে এনে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। হযরত জা‘ফর (রা) বললেন, আমাদের রাসূল (সা) হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে যা বলেছেন আমরাও তাই বলে থাকি। তিনি বলেছেন, ‘ঈসা আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তিনি ‘আল্লাহর রুহ’ ও ‘আল্লাহর কলেমা’। হযরত মরিয়মের কুমারী অবস্থায় তা তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।’ এ কথা শুনে সম্রাট নাজ্জাশী অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি নিজের হাতের লাঠি দ্বারা মাটিতে একটি রেখা টানেন। এরপর হযরত জাফরকে লক্ষ্য করে বলেন,

“হে জা‘ফর! আপনার এবং আমার ধর্মের মধ্যে শুধু এই সরল রেখাটি পরিমাণ পার্থক্য রয়েছে।” এই আলোচনার পর সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুসলমানরা হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর ধর্মের কথা স্বীকার করে এবং তাঁরাও এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা‘আলার উপাসক। এই ঘটনার পর মুসলমানরা সম্রাট নাজ্জাশীর রাজ্যে শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করতে থাকেন। মুসলমানদের প্রথম হিজরতের দিনগুলোতে এই ঘটনা ঘটে। এরপর মুসলমানদের নিকট খবর পৌঁছে যে, ‘এখন আর মক্কায় মুসলমানদের অত্যাচার-নির্যাতন করা হয় না।’ এই খবর পেয়ে তাঁরা মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁরা ফিরে এসে দেখেন যে, পূর্বের চাইতেও বেশি অত্যাচার-নির্যাতন করা হচ্ছে। এই অবস্থা দেখে তাঁরা পুনরায় আবিসিনিয়ায় চলে যান। এবারের হিজরতকারীদের মধ্যে নারী শিশু ছাড়া বয়স্ক পুরুষ ছিলেন আশি জন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দুইবার মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি ছিল। কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে নিরাপদ থাকার জন্যই কি মহানবী (সা) তাঁর অনুসারীদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিয়েছিলেন, না এর গভীরে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল?

মুসলমান ও খ্রিস্টধর্ম

এক্ষেত্রে আরো একটি প্রশ্ন উঠে, মহানবী (সা) কি করে নিশ্চিত হতে পারলেন যে, আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের উপর খ্রিস্টধর্মের কোন প্রভাব পড়বে না। অথচ সে সময় সেখানে রাজধর্ম হিসাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচলিত ছিল। ইসলামও হযরত ঈসার নবুয়তের প্রতি স্বীকৃতি জানিয়েছিল। তা‘ছাড়া আরবের শুষ্ক পাহাড় আর ধূসর মরুভূমির তুলনায় আবিসিনিয়া ছিল অপেক্ষাকৃত শস্য-শ্যামল। অপরদিকে কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতনের আশংকাও সেখানে ছিল না। এরূপ অনুকূল পরিবেশের প্রভাব যে মুসলমানদের উপর পড়বে না, তার কি নিশ্চয়তা

ছিল। এমনকি হিজরতকারী একজন মুসলমান সেখানে গিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। এদিক থেকে অন্য মুসলমানদেরও ধর্মান্তরিত হওয়ার আশংকাই প্রবল ছিল। তদুপরি শত্রুদের তুলনায় শিষ্যদের সাহায্য করার মতো প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও মহানবী (সা)-এর ছিল না। মহানবী (সা)-এর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও অন্য গুণাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ কথা সহজেই বলা যায়, এসব আশংকা সম্ভবত তাঁর অন্তরেও জেগে থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে মহানবী (সা) সুদৃঢ় আস্থা পোষণ করতেন। ফলে এসব আশংকা তাঁর মধ্যে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তা'ছাড়া সে সময় ইসলাম ধর্ম ছিল ভোরের হাওয়ায় সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো। কোন প্রকার অনুপ্রবেশ থেকে এই ধর্ম সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র ছিল। ওদিকে আবিসিনিয়ায় খ্রিস্টধর্মের অবস্থাও খুব একটা ভাল ছিল না। নাজরান ও ইয়াসরিবের (মদীনার) খ্রিস্টানদের মতো আবিসিনিয়ায়ও ধর্মীয় কলহ-কোন্দল লেগেই ছিল। সেখানকার একদল খ্রিস্টান হযরত মরিয়মকে খোদা বলে বিশ্বাস করত। অপর দল হযরত ঈসাকে আল্লাহর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে রিসালাতে মুহাম্মদিয়ার ঋণাধারায় অবগাহনকারী কোন মুসলমানের পক্ষে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়াটা ছিল সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ব্যাপার। আর তাই মহানবী (সা) নিশ্চিত ছিলেন যে, ঝগড়া-কলহে বিধ্বস্ত খ্রিস্টধর্মের প্রভাব মুসলমানদের উপর কিছুতেই পড়তে পারে না।

সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবীতে অধিকাংশ ধর্মে নানান বাতিল ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটে। তাতে করে অনেক ধর্ম তার মৌলিকতা ও আসল রূপ হারিয়ে ফেলে। এক পর্যায়ে পৌত্তলিকতা প্রভাব বিস্তার করে বসে। অবশ্য সেকালে যদিও সবক'টি ধর্মে আরবদের মতো প্রকাশ্য পৌত্তলিকতা ছিল না, কিন্তু প্রতিটি ধর্মেই পৌত্তলিকতার প্রবণতা পরিষ্কার অনুভূত হচ্ছিল। পক্ষান্তরে ইসলাম বাহ্যিক ও লুক্কায়িত উভয় পদ্ধতির পৌত্তলিকতারই চরম বিরোধী ছিল। এমনকি সেকালে ইসলাম তো দস্তুরমতো পৌত্তলিকতার সাথে সংগ্রামেই অবতীর্ণ হয়েছিল। ইতিহাস এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, সেকালে খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের ধর্মযাজকদের স্থান এমন উঁচুতে নিয়ে গিয়েছিল, যা পৌত্তলিকতারই একটা রূপ বলা যায়। কিন্তু ইসলামে এ ধরনের ব্যক্তিপূজার কোন স্থান নেই। ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবাত্মাকে সকল প্রকার বাতিল ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারের শৃংখলমুক্ত করে মানবতার উচ্চতম আসনে প্রতিষ্ঠিত করা।

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব

ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, মানুষ আর মহান স্রষ্টার মাঝখানে, ন্যাযনিষ্ঠতা ও পরহেযগারী ছাড়া অন্য কোন মাধ্যম নেই। ইসলাম দেব-দেবী, জ্যোতির্বিদ ও গায়েবের খবরদাতাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছে। বস্তুত মানব-আত্মা ও মহান স্রষ্টার মাঝখানে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তু প্রতিবন্ধক বা মাধ্যম হতেই পারে না। আত্মা হচ্ছে নূর বা আলো। এজন্য স্থান-কালের বাধ্যবাধকতা আত্মাকে ঘিরে রাখতে পারে না। কোন লোক পুণ্যবান হলে এই পুণ্যই তার ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সেতুবন্ধন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তিই মানুষের উপর সর্ব-নিয়ন্ত্রা ও সর্বাধিনায়ক হতে পারে না। সৎকর্মই মানবাত্মা ও মহান স্রষ্টার মধ্যকার ব্যবধান দূর করে দেয়। মানবাত্মা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের গৌরব লাভ করে। আর এটা

একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই কাজ। তিনিই মানবাত্মাকে সে পর্যন্ত নিয়ে যান। এক্ষেত্রে কোন ওলী, ধর্মযাজক কিংবা সংসারত্যাগীর কোন অধিকার নেই।

পৌত্তলিকতা কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন পথের অনুসারী ধনাঢ্য ব্যক্তি কিংবা কোন শক্তিদর ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ ও শক্তির মদমত্ততায় বড় জোর এতটুকু করতে পারে যে, সে শরীরকে ভোগ-বিলাস থেকে দূরে রাখতে পারে। কিংবা অন্য কোন উপায়ে শরীরকে কষ্ট দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত সে শরীরের ধ্বংস সাধনও করতে পারে। কিন্তু ধন-সম্পদ কিংবা শক্তির জোরে সে আত্মার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আত্মা তার কর্তৃত্বের অনেক উর্ধ্বে। প্রকৃতপক্ষে মানবাত্মার প্রভু ও স্রষ্টার উদ্দেশ্য হলো, তা জড় পরিবেশ ও স্থান-কালের বন্ধনমুক্ত হয়ে মহান স্রষ্টার সত্তায় বিলীন হওয়া। তবে এই পৃথিবীতে মানুষ যা করবে তার প্রতিদান সে পরকালে অবশ্যই পাবে। সেদিন পিতা কিংবা পুত্র কেউ কারো উপকার করতে পারবে না। পরজীবনে ধন-সম্পদ, শক্তি এবং কথা বলার নিপুণতা দ্বারা কিছু লাভ করা যাবে না। তবে পুণ্যবানের পুণ্যের প্রতিদান এবং পাপীর পাপের শাস্তি অবশ্যই দেয়া হবে। সেদিন সকল মানুষকে একত্র করা হবে। সেদিন হবে ন্যায়বিচার ও হিসাব-কিতাবের দিন। কারো উপর অবিচার করা হবে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ কৃতকর্মের পরিণাম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে।

মহানবী (সা) তাঁর সাহাবীদের উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত করেছিলেন। তা'ছাড়া মহানবী (সা)-এর আদর্শ ব্যক্তিত্ব ও ঈমানী শক্তি সব সময় মুসলমানদের জীবনপথের আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করত। ঈমান, প্রজ্ঞা, ন্যায়পরায়ণতা, পরহেযগারী, সততা প্রভৃতি যেসব গুণ মহানবী (সা)-এর মহান ব্যক্তিত্বের ভূষণ ছিল, সেগুলোর আলোকে তাঁর সাহাবীরা তাঁদের নিজেদের সৎপথে প্রতিষ্ঠিত রাখতেন। এ কারণেই মহানবী (সা) তাঁর সাহাবীদের ব্যাপারে অত্যন্ত আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আবিসিনিয়ার উর্বর মাটি আর সেখানকার প্রচলিত ধর্মের প্রভাব তাদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। সে জন্যই তিনি তাঁদের সেখানে হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন।

সম্রাট নাজ্জাশীর দেশে মুসলমানদের ধর্মকর্ম করার পুরোপুরি স্বাধীনতা ছিল। তারা সেখানে অত্যন্ত সুখ-শান্তি ও নিরাপদে জীবন যাপন করছিলেন। কুরাইশরা এ কথা জানতে পেরে অনুতপ্ত হয়। তারা ভাবে, স্বদেশ ও স্বজাতি হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় আমরা তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার-নিপীড়ন চালিয়েছি। অথচ ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন জাতির মধ্যে তারা নিরাপদে জীবন যাপন করছে। সেখানকার অধিবাসীরা তাদের কোন প্রকার কষ্ট দিচ্ছে না। মক্কায় কুরাইশদের মধ্যে এই মনোভাবের সৃষ্টি হওয়ার পর মুসলমানদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা হ্রাস পেতে থাকে। অপরদিকে সেকালে মুসলমানরা বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টে শুধু ধৈর্যই ধারণ করতেন না, তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, এই ধৈর্য ধারণই আল্লাহ তা'আলার দরবারে নৈকট্য লাভের উপায়।

হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

ইসলামের আবির্ভাবের সময় হযরত ওমর (রা)-এর বয়স ছিল ৩৫ বছর। এই বয়সে তিনি শরাব পান করতেন, অন্যান্য আমোদ-প্রমোদেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী, দৃঢ় সংকল্পমণ্ডিত ও কড়া মেজাজের লোক। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি

তিনি বেশ সদয় ছিলেন। এ সময়ে যারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাতো তিনি ছিলেন তাদের একজন। কিন্তু মুসলমানদের একটি দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করায় তাদের অসহায়তার কথা চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। এরপর হযরত ওমর (রা) কুরাইশদের মধ্যে এই বিরোধের মূল উৎপাতন করে ফেলার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হন। একদিন মহানবী (সা) সাফা পাহাড়ের অদূরে এক বাড়িতে (দারে আরকাম) কয়েকজন সাহাবীসহ বসা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত হামযা (রা), হযরত আলী (রা) ও হযরত আবু বকর (রা)। এই বৈঠকের খবর হযরত ওমর (রা)-কে আরো উত্তেজিত করে তোলে। তিনি মহানবী (সা)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মনে মনে ভাবেন, “এই কাজ করতে পারলে কুরাইশদের পারস্পরিক মতবিরোধের অবসান হবে। তারা আমার প্রতি সীমাহীন কৃতার্থ হবে। কারণ (হযরত) মুহাম্মদ (সা) আমাদের প্রতিমাদের নিন্দা করেন। তিনি আমাদেরই কয়েকজন অঙ্কে গোমরাহ্ করে রেখেছেন। তাঁকে হত্যা করা হলে মানুষকে বিপথগামী করার দ্বার চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।” হযরত ওমর (রা) মনে মনে এসব কথা ভাবেন এবং উন্মুক্ত তরবারি হাতে দ্রুতপদে দারে আরকামের দিকে এগিয়ে চলেন। পথে হযরত নাসিম ইবনে আবদুল্লাহর সাথে হযরত ওমরের সাক্ষাত হয়। তিনি ছিলেন হযরত ওমরেরই গোত্রের লোক। হযরত নাসিম (রা) হযরত ওমরের হাবভাব দেখেই ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলেন। তিনি হযরত ওমরকে জিজ্ঞেস করেন, হে ওমর! এভাবে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন। হযরত ওমর (রা) হযরত নাসিমের নিকট তাঁর উদ্দেশ্য পরিষ্কার বলে দেন। তিনি বললেন, হে ওমর! আপনি এক ভয়াবহ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। যদি (হযরত) মুহাম্মদ (সা) আপনার হাতে নিহত হন, তাহলে আবদে মান্নাফের বংশ আপনাকে জীবিত রাখবে না। তা ছাড়া প্রথমে নিজ পরিবারের খোঁজখবর নিন। দেখুন, তাদের মধ্যে কারা মুসলমান হয়ে গেছে। প্রথমে নিজের আত্মীয়-পরিজনদের এ পথ থেকে সরিয়ে নিন না কেন।

হযরত নাসিম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ কথা তখনো কারো নিকট প্রকাশ করেননি। ইতিমধ্যে হযরত ওমরের বোন হযরত ফাতেমা বিনতে খাত্তাব ও তাঁর স্বামী হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদও ইসলামে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। হযরত নাসিমের মুখে হযরত ওমর (রা) এ খবর শুনে ভগ্নীপতির বাড়ির দিকে রওয়ানা দেন। সে সময় এই বাড়িতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা হচ্ছিল। হযরত ওমর (রা)-এর পায়ের আওয়ায শুনেই তেলাওয়াত বন্ধ করে দেয়া হয়। হযরত ফাতেমা (রা) পবিত্র কোরআনের আয়াত লেখা ফলকগুলো লুকিয়ে ফেলেন। হযরত ওমর (রা) ঘরে ঢুকেই কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, এখানে কি পড়া হচ্ছিল? হযরত ফাতেমা (রা) ও হযরত সাঈদ (রা) বললেন, কোথায়, না তো? এখানে তো কিছু পড়া হচ্ছিল না! হযরত ওমর (রা) বললেন, আমি জানতে পেরেছি, তোমরা (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্ম গ্রহণ করেছ। এ কথা বলেই তিনি হযরত সাঈদের উপর ঝাঁপিড়ে পড়েন। হযরত ফাতেমা (রা) স্বামীকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেলে তিনি তাঁকেও বেদম মারধর করেন। তাঁর শরীর থেকে রক্ত পড়তে থাকে। অবশেষে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বেপরোয়া হয়ে বলে উঠলেন, ‘আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি, আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন।’ এ সময়ে বোনের পবিত্র শরীর থেকে রক্ত পড়ছিল। এই মর্মান্তিক দৃশ্য হযরত ওমরের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাঁর মন স্নেহ-মমতায় বিচলিত হয়ে উঠে। তিনি

বোনকে বলেন, আচ্ছা তোমরা যা কিছু পড়ছিলে আমাকে একটু দেখাও। হযরত ফাতেমা (রা) পবিত্র কোরআনের আয়াত লেখা ফলকগুলো হযরত ওমরকে দেখান। আয়াতগুলো পড়ার সাথে সাথে হযরত ওমরের চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি বোন ও ভগ্নীপতির সাথে কৃত আচরণের জন্য অত্যন্ত অনুশোচিত হন। পবিত্র কোরআনের আয়াত তাঁর মন-মানসিকতাই পাণ্টে দেয়। তাঁর শরীর কেঁপে ওঠে। তাঁর অন্তরে ভাল কাজ করার উপলব্ধি প্রবল হয়ে ওঠে। বোন ও ভগ্নীপতির প্রতি গভীর সমবেদনা ও অনুশোচনা প্রকাশ করে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন। এ সময় তাঁর অন্তরে এক বিশেষ অবস্থা বিরাজ করছিল। মহানবী (সা) তাঁর ক'জন সাহাবী নিয়ে যে ঘরে বসা ছিলেন হযরত ওমর (রা) সেখানে এসে পৌঁছান। তিনি মহানবী (সা)-এর সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হয়। মহানবী (সা)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এরপর তিনি নিজেই মক্কার অলিগলিতে তাঁর এই সুসংবাদ প্রচার করেন।

হযরত হামযা (রা)-এর পর হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমানদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। এই ঘটনার পর কুরাইশদের বাহু ভেঙে যায়। বস্তুত এই দিন থেকেই কুরাইশ ও মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তনের সূচনা হয়। একদিকে কুরাইশদের রাজনৈতিক ক্ষমতা পতনের আশংকা ঘনীভূত হতে থাকে। অপরদিকে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তির নতুন দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বরং এ কথা বলা যায় যে, মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানরা যে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ থেকেই তার শুভ সূচনা হয়।

প্রতিমাদের ঘটনা

আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানরা সেখানে তিন মাস অবস্থান করেন। এই সময়ে হযরত ওমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, মক্কায় কুরাইশরা মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধ করে দিয়েছে। এই খবর শোনার পর হিজরতকারী কয়েকজন মুসলমান এবং কোন কোন বর্ণনানুযায়ী সবাই মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু তারা এখানে পৌঁছে দেখতে পান কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন অতীতের চেয়েও কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। এই পরিস্থিতি দেখে মুহাজিরদের একটি দল শহরে পা না দিয়েই আবিসিনিয়ায় ফিরে যান। কিছু সংখ্যক লুকিয়ে লুকিয়ে মক্কায় অবস্থান করতে থাকেন। আবার কেউ কেউ কোন কাজকর্মের হেফাজতে প্রকাশ্যেই পুনরায় মক্কায় বসবাস শুরু করেন। যারা আবিসিনিয়ায় ফিরে যান তাদের সাথে মক্কা থেকে আরো কিছু মুসলমান নতুন করে হিজরত করেন। মদীনাতে হিজরত শুরু না হওয়া পর্যন্ত তারা আবিসিনিয়ায়ই অবস্থান করেন। এরপর তারা আবিসিনিয়া থেকে সরাসরি মদীনাতে চলে আসেন।

প্রশ্ন হলো, মুহাজিরদের আবিসিনিয়ায় তিন মাস অবস্থান করার পর মক্কায় ফিরে আসার পটভূমি কি ছিল? ইবনে সাআদ তাঁর 'তাবাকাত' এবং তাবারী তাঁর 'তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক' গ্রন্থে মুসলমানদের এই প্রত্যাবর্তনের পটভূমি হিসাবে 'ওয়াকেয়ায়ে গারানিক' বা প্রতিমাদের ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য মুসলিম তাফসীরকার ও চরিত্রবিদও এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তাদের গ্রন্থরাজি থেকে নকল করে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা এই ঘটনাটি আরো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তিলকে তাল বানিয়েছেন। এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মহানবী (সা) দেখলেন, তাঁর প্রতি ও তাঁর অনুগামীদের প্রতি কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুসলমানদের মুক্ত করার জন্য তিনি কুরাইশদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি তাদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করা শুরু করলেন। কুরাইশরাও কিছুটা নমনীয় হলো। মুসলমানদের প্রতি তাদের অত্যাচার-নির্যাতন কিছুটা হ্রাস পেলো। একদিন কা'বাঘরের সামনে মহানবী (সা) কাফেরদের সাথে বসে ছিলেন। তিনি তাদেরকে পবিত্র কোরআনের সূরা নজম আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিলেন। তিনি নিচের আয়াত পর্যন্ত পাঠ করেন:

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَّ وَالْعُزَّىٰ - وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْآخَرَىٰ -

“তোমরা কি ভেবে দেখেছ ‘লাত’ ও ‘ওযযা’ সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি ‘মানাত’ সম্বন্ধে?” (৫৩ : ১৯-২০)

সূরা নজমের উপরোক্ত আয়াতের ‘আল্‌উখরা’ শব্দ পর্যন্ত পৌছার পর মহানবী (সা)-এর মুখ থেকে পবিত্র কোরআনের ভাষার মতোই আর একটি বাক্য বেরিয়ে আসে। সেটি হলো, **تِلْكَ الْغُرَانِيُّ الْعُلَاوَانُ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى**—“এসব হচ্ছে সুন্দর ও উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিমা এবং এসবের মাধ্যমে (আল্লাহর নিকট) সুপারিশের আশা করা যায়”। এই বাক্যটির পর মহানবী (সা) উক্ত বৈঠকে সূরা নজমের শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। এরপর তিনি সেজদা করেন। তাঁর সাথে মুশরিকরাও সেজদায় অংশগ্রহণ করে। সেজদা শেষে কুরাইশরা মহানবী (সা)-এর নিকট বলে, ‘সত্যি আল্লাহ তা‘আলা জীবন ও মৃত্যু দানকারী, স্রষ্টা এবং রিযিকদাতা। কিন্তু এসব দেবতা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করে থাকে। হে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)! আজ আপনি আমাদের দেবতাদের সুপারিশের প্রতি স্বীকৃতি জানিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে আপনার সাথে আমাদের মেলামেশায় কোন বাধা নেই।’

এই ঘটনার পর মহানবী (সা)-এর সাথে কাফেরদের ঝগড়া-ফাসাদের সাময়িক অবসান হয়। এই সংবাদ সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে। আবিসিনিয়ায়ও মুহাজির মুসলমানদের নিকট এ খবর পৌছায়। এই সংবাদ পেয়ে তারা বলাবলি শুরু করে যে, মক্কায় আত্মীয়-স্বজন ও গোত্রীয় লোকদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমাদের মন ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। চল আমরা সবাই মক্কায় ফিরে যাই। এরপর তারা সবাই মক্কার উদ্দেশে আবিসিনিয়া থেকে রওয়ানা দেয়। মক্কার কয়েক মাইল দূরে পৌছার পর মরুভূমিতে কেনানার একটি বাণিজ্য কাফেলার সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। তাদেরকে মক্কার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলে, “নিশ্চয়ই তোমাদের নবী আমাদের দেবতাদের প্রশংসা করেছিলেন। এজন্য কুরাইশরাও তাঁর সাথে ঝগড়া-ফাসাদ মিটিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু তিনি তাঁর কথা থেকে ফিরে যান। পূর্বের মতো পুনরায় প্রতিমাদের নিন্দাবাদ শুরু করেন। ফলে মক্কাবাসীরাও তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়ে পড়েছে। তারা পূর্বের মতোই মুসলমানদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন আরম্ভ করেছে।” এসব কথা শুনে মুহাজির মুসলমানরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনদের দেখে তাঁরা আবিসিনিয়ায় ফিরে যাবেন। এরপর তাঁরা মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন।

মহানবী (সা)-এর প্রতিমা সম্পর্কিত এই ঘটনাটি বিভিন্ন বর্ণনায় নানাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরাইশরা মহানবী (সা)-কে বলল, “আপনি আমাদের দেবতাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং আমরাও আপনার সাথে রয়েছি।” তাদের এই মন্তব্যে মহানবী (সা) দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যান। তিনি সেদিন বাসায়ই কাটিয়ে দেন। রাতে হযরত জিবরাঈল (আ) আসেন। মহানবী (সা) তাঁকে পুরো সূরা নজম আবৃত্তি করে শোনান। **تِلْكَ الْغُرَانِيُّ** এসব সুন্দর ও উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন দেবতা ; নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তাদের সুপারিশের আশা করা যায়—বাক্যটি আবৃত্তি করলে হযরত জিবরাঈল (আ) বলেন, ‘এই বাক্য তো আমি নিয়ে আসিনি।’ রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এই বাক্যটি কি করে যেন আমার মুখ থেকেই বেরিয়ে পড়েছিল। এই ঘটনার পর নিম্নের আয়াতগুলো নাযিল হয় :

وَأَنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا
لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا . وَلَوْ لَا أَنْ تَبَيَّنَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا .
إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا .

“আমি তোমার প্রতি যা ওহী নাযিল করেছি তা থেকে তোমার পদস্বলন ঘটাবার জন্য ওরা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে, যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন করো। সফল হলে ওরা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি ওদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকে পড়তে। তুমি ঝুঁকে পড়লে অবশ্যই তোমাকে ইহ জীবনে ও পর-জীবনে দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করাতাম। তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পেতে না।” (১৭ : ৭৩-৭৫)

এসব আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী (সা) পুনরায় কুরাইশদের প্রতিমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু করেন। কুরাইশরাও আবার নতুন করে মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্রতিমাদের ঘটনার মূলকথা

প্রতিমাদের সম্পর্কিত এই ঘটনাটি মুসলিম তাফসীরকার ও চরিতবিদগণ তাঁদের নিজ নিজ স্টাইলে নানাভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের এসব বর্ণনা প্রাচ্যবিদরাও লুফে নিয়েছে। তারা তাদের কলমের জোর ও ভাষার অলংকার দ্বারা এই ঘটনাটিকে আরো বর্ণাঢ্য করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘটনাটি অত্যন্ত অগোছালো ও অস্পষ্ট। একটু চিন্তা করলেই এর ভিত্তিহীনতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তা’ছাড়া এই ঘটনা পবিত্র কোরআনের ঘোষণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে। সবচাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, মুসলিম তাফসীরকার ও চরিতবিদগণও এই কাহিনীটির গুরুত্ব প্রদান করেছেন। অথচ এটা মহানবী (সা)-এর শানে রিসালাতের পরিপন্থী। অবশ্য এই কাহিনী সম্পর্কে ইবনে ইসহাককে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বিনা দ্বিধায় বলেন, ‘এটা বিধর্মীদের মনগড়া কাহিনী। কিন্তু যারা উক্ত কাহিনী সত্য বলে মনে করেন, তারা তাদের অভিমতের সমর্থনে পবিত্র কোরআনের আর একটি আয়াত উল্লেখ করেন। সেটি হলো :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ
فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ أَيْتَهُ - وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ . لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ - وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ .

“আমি তোমার পূর্বে যেসব রাসূল কিংবা নবী পাঠিয়েছি, তারা যখনই কিছু আবৃত্তি করেছে, তখনই শয়তান তাদের আবৃত্তিতে কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা দূর করেন। অতঃপর তাঁর আয়াতগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এটা এজন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি তাকে পরীক্ষা স্বরূপ

করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যারা পাষণ্ড হৃদয়। সীমালংঘনকারীরা অশেষ মতভেদে রয়েছে।” (২২ : ৫২-৫৩)

কোন কোন তাফসীরকার ‘তামান্না’ শব্দের ‘কারাআ’ বা ‘পড়েছে’ অর্থ করেছেন। কারো কারো ধারণায় এক্ষেত্রে ‘তামান্না’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘ইচ্ছা করেছে’ (অর্থাৎ রাসূল কিংবা নবীগণ যখন কিছু আবৃত্তি করেছেন, তখনই তাঁর ভাষ্যের ভিতরে শয়তান তার কোন বাক্য ঢুকিয়ে দিয়েছে)। বস্তুত প্রাচ্যবিদরাও এক শ্রেণীর মুসলিম তাফসীরকার ও চরিতবিদের এ ধরনের আজগুবি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পুরোপুরি সদ্যবহার করেছেন। তাঁরা বলেছেন :

“মক্কার মুশরিকদের অত্যাচার-নির্যাতন মুসলমানদের উপর দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল। তারা মুসলমানদের যাকে ইচ্ছা হত্যা করত ; যাকে ইচ্ছা আগুনে রোদে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে শুইয়ে রাখত। হযরত বিলালকে তো এভাবে শুইয়ে বুকে পাথরচাপা দিয়ে রাখত। এ ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভের জন্য কিছু সংখ্যক মুসলমান বাস্তুভিটা ত্যাগ করে সুদূর আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কুরাইশদের সৎপথে আসা এবং পৌত্তলিকতার অভিশাপমুক্ত করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে কাফেরদের ঘনিষ্ঠ করার জন্য তিনি সূরা নজমে দু’টি বাক্য (تلك الغرانيق العلا وان شفاعتھن لترتجى) সংযোজন করে দিয়েছিলেন। আর এজন্যই সূরাটি পাঠ করার পর তিনি সেজদারত হলে মুশরিকরাও তাঁকে অনুসরণ করে সেজদাবনত হয়ে পড়ে। কারণ মহানবী (সা) আল্লাহ তা’আলার সাথে তাদের প্রতিমাদের নৈকট্যের প্রতি স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।”

প্রাচ্যবিদদের কর্মধারা

ওয়াকেয়ায়ে গারানিক বা প্রতিমাদের ঘটনার সমর্থনে এক শ্রেণীর মুসলিম তাফসীরকার ও চরিতবিদ যে প্রতিবেদন পরিবেশন করেছেন, স্যার উইলিয়াম ম্যুর তা সমর্থন করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে একটি প্রমাণও উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায় এই প্রমাণের প্রেক্ষিতে উক্ত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সকল প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায়। তাঁর প্রমাণটি হলো, মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় সম্রাট নাজ্জাশীর পৃষ্ঠপোষকতায় সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করছিলেন। তাঁদের হিজরতের তিন মাসও অতিক্রান্ত হয়নি। এরূপ অবস্থায় তারা মহানবী (সা) ও কুরাইশদের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার সংবাদ না পেলে শুধু আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিতেন না। কারণ মুসলমানদের প্রতিপক্ষ কুরাইশরা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। আর মুসলমানরা মহানবী (সা)-এর জন্য যে কোন মুহূর্তে জীবন দিতে প্রস্তুত থাকলেও কুরাইশদের অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করার মতো শক্তি-সামর্থ্য তাদের ছিল না। এজন্য স্বীকার করতেই হয় যে, মহানবী (সা) নিজেই কুরাইশদের সাথে একটা মীমাংসা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আর এটাই হচ্ছে প্রতিমাদের ঘটনার কারণ বা পটভূমি।

অভিযোগ খণ্ডন

যারা প্রতিমাদের ঘটনা সঠিক বলে অভিমত পোষণ করেন, তাদের সপক্ষে সব কটি প্রমাণই ভিত্তিহীন। স্যার উইলিয়াম ম্যুরের প্রমাণ ও অভিযোগ খণ্ডন প্রসঙ্গে এই বলা যায় যে, আবিসিনিয়া থেকে মুসলমানদের ফিরে আসার পিছনে দু’টি কারণ কার্যকর ছিল।

প্রথমত, মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর হযরত ওমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও স্পষ্টভাষী। তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটিও গোপন রাখেননি। তিনি শত্রু-বন্ধু নির্বিশেষে সবার সামনে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা দৃষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করেন। যারা তাঁর পথে বাদ সাধবে তিনি তাদের সাথে সংগ্রাম করার জন্যও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত, মক্কার অন্য মুসলমানরাও তাঁর সাহসিকতার সহযোগিতা করেন। হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত মুসলমানরা দূরে কোথাও গিয়ে নামায পড়তেন। এখন তাঁরা কা'বাঘরের অদূরেই নামায পড়া শুরু করেন। মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান শক্তি-সামর্থ্য ও সংহতি দেখে কুরাইশরা অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলামে দীক্ষা লাভ করে ফেলে। এরূপ পরিস্থিতিতে তাদের উপর অত্যাচারের খড়গ কৃপাণ চালানো হলে সংশ্লিষ্ট গোত্রগুলো ধর্মীয় বিরোধ ভুলে গিয়ে গোত্রীয় সম্পর্কের দরুন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবল আশংকা ছিল। এই পরিস্থিতিতে মহানবী (সা)-এর সাথে বোঝাপড়ার জন্য কুরাইশরা অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ একটা পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এ সময়ে তারা মুসলিম নির্যাতন বন্ধ করে দেয়। আবিসিনিয়ার মুসলিম মুহাজিররা এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে মক্কায ফিরে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আবিসিনিয়ায় বিদ্রোহ

উপরোক্ত অনুকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশ সত্ত্বেও মুসলমানদের আবিসিনিয়া থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে ধীরগতিতে সিদ্ধান্ত নেয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সে সময় আবিসিনিয়ায় একটি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এজন্য মুহাজিরদের সেখান থেকে স্বদেশে ফিরে আসা জরুরী হয়ে পড়ে। সমগ্র আবিসিনিয়ায় সে সময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। এই বিদ্রোহের পিছনে অনেক কারণ ছিল। তার মধ্যে একটি কারণ হলো, বিদ্রোহীদের একটি দল নাজ্জাশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল, তিনি মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতার অন্তরালে নিজ ধর্মের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন। মুসলমানদের আন্তরিক আকাজক্ষা ছিল নাজ্জাশী বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হোন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন আবিসিনিয়ায় নবাগত। এজন্য বিদ্রোহ দমনে রাজশক্তিকে সাহায্য করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা মহানবী (সা)-এর সাথে বিরোধ মিটিয়ে ফেলেছে, তখন তাঁরা বিদ্রোহের অগ্নিশিখা থেকে আত্মরক্ষা করে মক্কায ফিরে আসাই কল্যাণকর মনে করলেন। এসব কারণে মুহাজিরদের সবাই কিংবা তাঁদের একটা অংশ মক্কার উদ্দেশে আবিসিনিয়া ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁরা মক্কায না পৌঁছতেই কুরাইশরা সিদ্ধান্ত নিল, আমরা আর (হযরত) মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখব না। কুরাইশরা এই সাথে এও শপথ গ্রহণ করে যে, আমরা বনু হাশেমের সাথে সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করব। তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করব। এ ব্যাপারে তারা একটি চুক্তিনামা সম্পাদন করে। তাতে লেখা ছিল, “আমরা বনু হাশেমের সাথে বিয়েশাদী করব না। কোন প্রকার বাণিজ্যিক লেনদেন করব না।” কুরাইশদের এই পদক্ষেপ ছিল অতীতের চেয়ে অনেক কঠিন। আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাগত মুসলিম মুহাজিররা মক্কায এই পরিস্থিতি দেখে পুনরায় সেখানে ফিরে যান। শুধু তাঁরাই নয়, মক্কার

আরো অনেক মুসলমান তাঁদের সাথে আবিসিনিয়া রওনা দেন। এবার ফিরে যাওয়ার সময় কুরাইশরা বাধা দেয়। এজন্য কুরাইশদের হাতে মুহাজিরদের অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়।

উপরোক্ত বিভিন্ন কারণ থেকে সহজে এ কথা বলা যায় যে, মহানবী (সা)-এর সাথে কুরাইশদের মীমাংসাই আবিসিনিয়া থেকে মুসলমানদের ফিরে আসার একক কারণ ছিল না। অথচ স্যার উইলিয়াম ম্যুর এটাকেই একমাত্র কারণ হিসাবে ধরে বসে আছেন। বস্তুত এটা ছিল একটা সাময়িক ব্যাপার।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, প্রতিমাদের ঘটনা সঠিক প্রমাণ করার জন্য আবিসিনিয়া থেকে মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

ভিত্তিহীন প্রমাণাদি

যেসব মুসলিম গ্রন্থকার ও তাফসীরকার উপরে উল্লিখিত পবিত্র কোরআনের আয়াত দুটো দ্বারা প্রতিমাদের ঘটনার যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, তাদের প্রতিবেদন উইলিয়াম ম্যুরের তথ্য-প্রমাণের চেয়েও দুর্বল। প্রথমে উল্লিখিত আয়াতে^১ বলা হয়েছে, “আমি যদি আপনাকে অবিচল না রাখতাম, তাহলে আপনার তাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এরূপ অবস্থায় আমি আপনাকে ইহকাল ও পরকালের দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করাতাম।” এই আয়াতের সারমর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, যে উদ্দেশ্যে এটি প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আয়াতের অর্থ দ্বারা তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। কারণ প্রতিমাদের ঘটনার সারকথা হলো, “মহানবী (সা) কুরাইশদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। কুরাইশরা তাঁকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে দিয়েছিল। তিনি তাদের সন্তুষ্টির জন্য ‘এসব প্রতিমা’ (তিল্কাল্ গারানিকু) বাক্য দুটি সূরা নজমের অংশ হিসাবে আবৃত্তি করেছিলেন। অথচ এগুলো আল্লাহ তা‘আলার বাণী ছিল না।” অপরদিকে তাদের প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা মহানবীকে পদস্থলন থেকে নিরাপদ রাখেন, অবিচল রাখেন। তিনি কুরাইশদের প্রতারণার কাছে পা দেন না। যদি বলা হয়, কোন কোন তাফসীর গ্রন্থে উক্ত আয়াতের যে শানে নুযূল বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে প্রতিমাদের ঘটনার যথার্থতার প্রতি অনেকটা ইঙ্গিত বহন করে। এরূপ পরিস্থিতিতেও এ কথা স্বীকার করতে হবে, নবী-রাসূলদের নিষ্পাপ হওয়ার নামে যে বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই, যে বিষয় মহানবী (সা)-এর মান ও মর্যাদার পরিপন্থী, সে বিষয়ের প্রমাণ হিসাবে পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতটি উল্লেখ করাই সঙ্গত নয়।

মুসলিম গ্রন্থকার ও তাফসীরকারদের প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত দ্বিতীয় আয়াতটির^২ সাথেও ‘প্রতিমাদের ঘটনার’ কোন সম্পর্ক নেই। কারণ উক্ত আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, “শয়তান যেসব কুখারণা অন্তরে প্রক্ষিপ্ত করতে চায়, আল্লাহ তা‘আলা সেগুলো মিটিয়ে দেন। আর সেগুলো তিনি পীড়িত আত্মা ও কঠিন হৃদয়ের মানুষের পরীক্ষার উপকরণে রূপান্তরিত করেন।

১. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ.....

২. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ..... فِي أُمْنِيَّتِهِ.....

আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়াতকে সুদৃঢ় করেন এবং সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।” বস্তুত এই আয়াতে প্রতিমা বা দেবদেবী সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয়নি।

প্রতিমাদের ঘটনার পর্যালোচনা

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার আলোকে পর্যালোচনা করা হলেও দেখা যাবে, প্রতিমাদের ঘটনার কোন ভিত্তি নেই। এই ঘটনার ভিত্তিহীনতার একটা প্রমাণ হলো, এ সম্পর্কিত যেসব বাক্য মহানবী (সা)-এর মুখে প্রকাশ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলোতেও ভিন্নতা রয়েছে। একেক বর্ণনায় একেক ধরনের শব্দমালা উল্লেখ করা হয়েছে। এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, শব্দগুলো হচ্ছে **تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَا** **اِنْ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى**, কোন কোন বর্ণনানুযায়ী শব্দগুলো হচ্ছে, **اَلْغَرَانِقَةُ الْعُلَا** **وَ اِنْ شَفَاعَتُهُنَّ تُرْتَجَى**, এক বর্ণনায় রয়েছে **تِلْكَ الْغَرَانِيقُ** কিংবা **اِنْ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى** এই বর্ণনায় **وَاِنَّهَا لَهِيَ** **وَاِنَّهُنَّ الْغَرَانِيقُ الْعُلَا** **وَ اِنْ** **اَلْغَرَانِيقُ الْعُلَا** **اِنْ شَفَاعَتُهُنَّ لَهِيَ** **الَّتِي تُرْتَجَى** কোন কোন হাদীসগ্রন্থে উপরোক্ত শব্দরাশি ছাড়া আরো বিভিন্ন ধরনের শব্দমালা রয়েছে। বর্ণনা ও শব্দরাজির ভিন্নতা থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিমাদের ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসটিই মাওযু বা ভিত্তিহীন। যেমন ইবনে ইসহাক বলেছেন, ‘প্রতিমাদের ঘটনা’ সম্পর্কিত হাদীসটি বিধর্মীরা নিজেদের থেকে বানিয়ে প্রচার করেছে। আর এই হাদীসটি তৈরি করে বিধর্মীদের প্রচারের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হলো, মহানবী (সা)-এর রিসালাত ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ তা'আলার বাণী সম্পর্কে মানুষের মনে বিভ্রান্তি ও সন্দেহ সৃষ্টি করা।

সূরা নজমের পূর্বাপর ভাষ্য

প্রতিমাদের ঘটনার ভিত্তিহীনতার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হলো সূরা নজমের পূর্বাপর ভাষ্য। সূরা নজমের যে স্থানে প্রতিমাদের সম্পর্কিত বাক্য দুটো সংযোজনের কথা বলা হয়েছে, তার আগের এবং পরের আয়াতগুলো হলো :

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى . أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَّ وَالْعُزَّى . وَمَنْوَةَ
الثَّالِثَةَ الْآخِرَى . أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى . تِلْكَ إِذَا قَسَمَةٌ ضِيزَى . اِنْ
هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَّتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ - اِنْ
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ - وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى .

“সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলি অবশ্যই দেখেছিল। তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওয্যা সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আর একটি মানাত সম্বন্ধে? তোমরা কি মনে কর পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্য? এরূপ বণ্টন তো অসংগত বণ্টন। এসব হচ্ছে কতকগুলো নামমাত্র যা তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ ও তোমরা রেখেছ যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল পাঠাননি। তোমরা তো অনুমান এবং তোমাদের

প্রবৃত্তিরই অনুসরণ কর—যদিও তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে। (৫৩ : ১৮-২৩)

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত ভাষ্যে এ কথা পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, লাত ও ওয়্যা শুধু নাম বই কিছু নয়। মোনাফেক ও তাদের পূর্ব-পুরুষরা নিজেরাই এসব নাম রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য কোন স্বীকৃতি বাণী নাযিল করেননি। পবিত্র কোরআনের যেসব আয়াতে প্রতিমাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে, সেসব আয়াতের মাঝখানে মহানবী (সা) এগুলোরই প্রশংসাসূচক দু'টি বাক্য সংযোজন করে বসবেন, এটা কি করে বিশ্বাস করা যায়। কিরূপে মেনে নেয়া যায় যে, তিনি উক্ত বাক্য দু'টি সূরা নজমের আয়াতগুলোর মাঝখানে সংযোজন করে কাফেরদের সামনে পাঠ করবেন :

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ . وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ . (وَ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ
الْعُلَا إِن شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ) - أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ . تِلْكَ إِذَا قُسِمَةُ
ضِيْرَىٰ . إِن هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَّتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
سُلْطَنٍ - إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ - وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ
الْهُدَىٰ .

এ ধরনের সংযোজন মহানবী (সা) তো দূরের কথা কোন সুস্থ বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, শুরুতে মহানবী (সা) লাত, ওয়্যা ও মানাতের প্রশংসা করেছেন। আবার পরবর্তী আয়াতেই এসবের নিন্দা করেছেন। সূরা নজমের বিভিন্ন আয়াতের পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে তাকালে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, মধ্যবর্তী বাক্য দুটির সাথে পূর্বাপরের কোন সম্পর্ক নেই। প্রতিমাদের প্রশংসা বিষয়ক বাক্য দু'টি মনগড়া। বিধর্মীরা তাদের স্বার্থে এই দু'টি বাক্য তৈরি করেছেন। যারা যুক্তিজ্ঞান বিরোধী বিশ্বয়কর কথাবার্তা বিশ্বাস করে থাকে কেবল তারাই উক্ত দু'টি বাক্য সঠিক বলে স্বীকার করে নিতে পারে। অন্য কারো পক্ষে তা সঠিক বলে মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

মিসরের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুফতী শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 'প্রতিমাদের ঘটনা' প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, আরবী গদ্য কিংবা পদ্যে কোথাও 'প্রতিমা' অর্থে 'গারানিক' শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। এমন কি আরবে কেউ নিজেদের দেবদেবীদের বোঝানোর জন্যও 'গারানিক' শব্দ ব্যবহার করেনি। আরবী ভাষায় সাদা-কালো পাখিকে 'গারনুক' কিংবা 'গারনীক' বলা হয়ে থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ফরসা ও সুদর্শন যুবককেও 'গারনুক' কিংবা 'গারনীক' বলা হয়। কিন্তু দেব-দেবীর সাথে এই শব্দের কোন সম্পর্ক নেই।

মহানবী (সা)-এর সত্যবাদিতা

প্রতিমাদের ঘটনার ভিত্তিহীনতার প্রমাণ মহানবী (সা)-এর অনুপম জীবনাদর্শ থেকেও গ্রহণ করা যায়। সত্যবাদিতা ছিল মহানবী (সা)-এর জীবনের চিরসঙ্গী। প্রাক-নবুয়ত জীবনে

শিশু-কিশোর, এমনকি যৌবন বয়সেও কখনও তিনি মিথ্যে কথা বলেননি। আর এজন্যই পঁচিশ বছর বয়সে পদার্পণ করতেই মক্কাবাসীরা তাঁকে ‘আল-আমীন’ বা ‘সত্যবাদী’ উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রাক-নবুয়ত জীবনে মহানবী (সা)-এর সত্যবাদিতা মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার নিকট স্বীকৃত ব্যাপার ছিল। এমনকি নবুয়ত লাভের পর তিনি একদিন সাফা পাহাড়ের পাদদেশে কুরাইশদের সমবেত করে প্রশ্ন রেখেছিলেন, “হে কুরাইশ! আমি যদি বলি এই পাহাড়ের অপর পাশে একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী তোমাদের আক্রমণ করার জন্য লুকিয়ে আছে, তোমরা কি আমার এ কথা বিশ্বাস করবে? কুরাইশ মহানবী (সা)-এর এই প্রশ্নের প্রতি-উত্তরে বলেছিল, হে মুহাম্মদ! কেন আমরা আপনার এ কথা বিশ্বাস করব না। আমরা অবশ্যই তা বিশ্বাস করব। কারণ আমরা এ পর্যন্ত আপনাকে কখনও মিথ্যে কথা বলতে শুনিনি।” এক মহান ব্যক্তিত্ব যিনি প্রাক-নবুয়ত জীবনেও সর্বজনস্বীকৃত সত্যবাদী ছিলেন, নবুয়ত জীবনে মানুষের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর কালামের সাথে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলবেন, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে? মহানবী (সা)-এর ব্যক্তিত্ব ও আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে যারা সামান্যতম জ্ঞান রাখেন, তাঁরা এ ধরনের ব্যাপার কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। কিছুতেই তাঁরা এই অবাস্তব ব্যাপার বিশ্বাস করতে পারেন না।

এটা কি করে সম্ভব হতে পারে, যে মহান ব্যক্তি দৃষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, “সূর্য আমার ডান হাতে এবং চাঁদ আমার বাঁ হাতে রেখে দেয়া হলেও আমি সত্যের প্রতি আহ্বান থেকে বিরত হব না।” -তিনিই আবার আল্লাহ তা‘আলার বাণীর সাথে মিলিয়ে এমন কথা বলে বসবেন, যা ধর্মের বুনিয়াদকেই নড়বড়ে করে দেবে? এ কিছুতেই হতে পারে না।

প্রতিমাদের ঘটনার সারকথা হলো, “মহানবী (সা) কুরাইশদের সাথে একটা সমঝোতায় পৌঁছান। তিনি তাদের প্রতিমাদের প্রশংসা করেন।” আর এই ঘটনার সময়কাল বলা হয় মহানবী (সা)-এর নবুয়ত লাভের দুই বছর পরের। অথচ এ সময়ে নবী করীম (সা) ও তাঁর সাহাবীদের উপর থেকে কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতনের অমানিশা প্রায় কেটে গিয়েছিল। হযরত হামযা (রা) ও পরে হযরত ওমর ফারুকের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল। এ সময়ে মুসলমানরা সব দিক থেকেই কুরাইশদের সাথে বোঝাপড়া করার মতো শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করে ফেলে। আরব ছাড়া আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া ও অন্যান্য দেশেও ইসলামের আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ে। মহানবী (সা)-এর দৃঢ়তা ও তাঁর সাহাবীদের ত্যাগ-তিতিষ্কার ফলশ্রুতি এ সময়ে প্রকাশ হওয়া শুরু হয়। এরূপ সম্ভাবনাময় পরিস্থিতিতে এটা কি যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে যে, মহানবী (সা) নিজেই নিজের গড়া ইমারতের ভিত্তি নড়বড়ে করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন? তিনি পৌত্তলিকদের সাথে সমঝোতা করেছেন? যদি ধরে নেয়া যায় যে, এটাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি তাঁর প্রতিমাদের নিন্দা করবেন না এবং কুরাইশদের সাথে সমঝোতা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়াবেন! এরূপ ক্ষেত্রেও স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, তিনি প্রথম থেকেই এই ভূমিকা গ্রহণ করলেন না কেন। তা হলে তো তাঁর অনুসারীদের দুর্বিষহ অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হতে হতো না। এমনকি নিজেও কাফেরদের অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে নিরাপদ থাকতেন। মূলত প্রতিমাদের ঘটনাটাই ভিত্তিহীন ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এই ঘটনার অবাস্তবতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যারা এই মিথ্যে কাহিনীটি সাজিয়েছে, তারা নিজেরাও জানত যে, এটা টিকানো যাবে না। অচিরেই এর স্বরূপ ফাঁস হয়ে যাবে। তাই

তারা তাদের এই জালিয়াতি ধামাচাপা দেয়ার জন্য আর একটি মিথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা নিজেরাই রটিয়ে দেয় যে, (হযরত) মুহাম্মদ (সা) কুরাইশদের দেবদেবীর সুপারিশের অধিকার স্বীকার করে নেন। তাঁর এই ভূমিকায় কুরাইশরা আনন্দিত হয়। কিন্তু তাদের এই আনন্দ-উল্লাসে (হযরত) মুহাম্মদ (সা) বিরক্তিবোধ করেন। তিনি কা'বাঘর থেকে উঠে নিজের বাড়িতে চলে আসেন। নিজের এই ভূমিকার জন্য অনুশোচিত হন। তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে তওবা করেন। এরপর হযরত জিবরাঈল (আ) এসে উপস্থিত হন। জিবরাঈলের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি পুনরায় প্রতিমাদের সমালোচনা শুরু করেন।

ইসলামের শত্রুরা প্রতিবাদের ঘটনার মান রক্ষার জন্যই আর একটি মিথ্যের আশ্রয় নেয়। তারা হযরত জিবরাঈলের উপস্থিতির ঘটনাটি বানিয়ে প্রচার করে। কিন্তু তাতে বরং প্রথম ঘটনা আরও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সত্যি যদি কুরাইশরা আনন্দ প্রকাশ করে থাকত এবং এটা মহানবী (সা)-এর নিকট বিরক্তিকর মনে হতো, তা হলে তিনি ঘটনাস্থলেই ওহী ও ইলহামের জন্য প্রতীক্ষা করলেন না কেন। আর কেনই বা সে সময় তাঁর নিকট ওহী নাযিল হল না। তাহলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ধরনের একটা ঘটনার কথা কেউ কল্পনাও করেননি। পরবর্তীকালে ইসলামের শত্রুরা এই ঘটনাটি বানিয়ে প্রচার করেছে। তাতে করে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের মনের বিদ্বেষ প্রকাশ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে।

তাওহীদের প্রতি মিথ্যা আরোপ

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এই ঘটনা রটনাকারীরা ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহীদের প্রতি আক্রমণের ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে। বস্তুত তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রচার-প্রসারের জন্যই আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা)-কে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। আর এই মহান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনে বিন্দুমাত্র অমনোযোগিতাও প্রকাশ পায়নি। কুরাইশরা মহানবী (সা)-কে এই পবিত্র দায়িত্ব থেকে বিরত রাখার জন্য ধন-সম্পদ, সুন্দরী নারী ও নেতৃত্বের প্রলোভন দেখিয়েছে। কিন্তু এসব প্রলোভন সত্ত্বেও মহানবী (সা)-এর কর্তব্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তায় এতটুকু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। সে দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা মাত্র ক'জন। বিরোধীরা তাদের উপর সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতন চালাত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা)-এর দৃঢ়সংকল্পে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসেনি। তাঁর পূত-পবিত্র চরিত্র ও মহান জীবনাদর্শ থেকে এই সত্য প্রতিভাত হয় যে, তিনি তাওহীদের প্রচার-প্রসারে কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করেননি। এরূপ পরিস্থিতিতে যারা প্রতিমাদের ঘটনা রটিয়েছে, তাদের এই ব্যর্থ প্রয়াস সত্যি বিস্ময়কর। অপরদিকে যারা এই ঘটনার যথার্থতা মেনে নিয়েছে তাদের এই মনোভাবও চরম বিভ্রান্তিকর বলতে হবে।

বস্তুত প্রতিমাদের ঘটনা সম্পূর্ণ সাজানো একটি ঘটনা। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আবিসিনিয়া থেকে মুসলিম মুহাজিরদের মক্কায় ফিরে আসার সাথে এই সাজানো ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। মূলত তাঁদের ফিরে আসার পিছনে অন্য কয়েকটি কারণ ছিল। আর সেগুলো পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত ওমর (রা) প্রকাশ্যে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। তিনি মুসলমানদের সর্বাঙ্গিক সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এই সময়ে কুরাইশরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়। এই সংবাদ

পেয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানরা মক্কায় ফিরে আসেন। আবিসিনিয়া থেকে মুহাজিরদের ফিরে আসার পর কুরাইশরা আবার মুসলমানদের অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু করে। এ সময়ে কুরাইশরা আশংকা করে যে, মহানবী (সা) আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাগত মুহাজির মুসলমানদের সাহায্যে তাঁর তৎপরতা আরও জোরদার করবেন। এই আশংকায় কুরাইশরা এক বৈঠকে মিলিত হয়। তারা এ ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে একটি দলীল সম্পাদন করে। তাতে বনু হাশিমের সাথে বিয়ে-শাদী, বেচা-কেনা, লেনদেন ও ওঠাবসা নিষিদ্ধ করা হয়। তারা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, যদি সম্ভব হয় (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করতে হবে। তাতে করে কুরাইশদের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন নিশ্চিত হবে।

এই বৈঠকে কুরাইশরা একটি দলীল সম্পাদন করে। তাতে বনু হাশিমের সাথে বিয়ে-শাদী, বেচা-কেনা, লেনদেন ও ওঠাবসা নিষিদ্ধ করা হয়। তারা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, যদি সম্ভব হয় (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করতে হবে। তাতে করে কুরাইশদের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন নিশ্চিত হবে।

কুরাইশদের নতুন ষড়যন্ত্র

হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে কুরাইশদের শক্তি অনেকটা খর্ব হয়ে পড়ে। হযরত ওমর (রা) ইসলাম গ্রহণের আগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার ছিলেন, মুসলমান হওয়ার পর ইসলামের সমর্থনেও তিনি অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেননি। এ ব্যাপারে তিনি অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের এক সমাবেশে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, “আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি।” যদি কেউ কখনো এ ব্যাপারে তাঁর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, তিনি তার সমুচিত জওয়াব দিয়েছেন। এমনকি অস্ত্র চালাতেও তিনি দ্বিধা করেননি। হযরত ওমর (রা) অন্যান্য মুসলমানকেও তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতে বারণ করেছেন। এতদিন মুসলমানরা মক্কা শহরের বাইরে পাহাড়ের নির্জন স্থানে গিয়ে গোপনে নামায আদায় করতেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমানরা বেশ শক্তি সঞ্চয় করেন। এখন থেকে তারা কা'বাঘরের সামনে প্রকাশ্যে নামায পড়া শুরু করেন। এই অবস্থা দেখে কুরাইশরা ভাবে, পূর্বের মতো এখনো যদি আমরা (হযরত) মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন অব্যাহত রাখি, তা হলে আমরা জনসমর্থন হারিয়ে ফেলব। আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ শুরু করবে। (হযরত) হামযা ও (হযরত) ওমর (রা)-এর মতো দুঃসাহসী বীর যুবকরা তরবারি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। খুব সম্ভব তারা আবিসিনিয়া থেকেও সাহায্য লাভ করবে। এও বিচিত্র নয় যে, মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

মক্কার মুশরিকরা সবাই একমত হয়ে একটি দলীল সম্পাদন করে। এই চুক্তি অনুযায়ী বনু হাশেম ও বনু আবদুল মোত্তালিবের সাথে সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। তাদের সাথে বিয়ে-শাদী ও বাণিজ্যিক লেন-দেন মওকুফ করা হয়। মুশরিকরা এই লিখিত দলীল বা চুক্তিনামা কা'বাঘরের দরজায় টানিয়ে দেয়। কুরাইশরা ভাবে যে, মহানবী (সা)-এর অনুসারীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের চেয়ে এই নেতিবাচক রাজনৈতিক অস্ত্র অধিক কার্যকর হবে। কিন্তু অত্যাচার-নিপীড়ন তখনও বন্ধ হয়নি। কোন-না-কোনভাবে তা চলতেই থাকে। কুরাইশদের এই সামাজিক বয়কট দুই কিংবা তিন বছর অব্যাহত থাকে। এ সময়ে তারা মনে করত, এই বয়কটে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী (সা)-এর অনুসারীরা তাঁর নিকট থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে। কিন্তু এর ফল হল উল্টো। এ সময়ে মহানবী (সা) তাঁর প্রচার কাজ আরও জোরদার করেন। তাঁর অনুসারী, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরা সত্য ধর্মের অনুসরণে ও মহানবী (সা)-এর সাহায্য-সহায়তায় আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইসলামের প্রভাববলয় দিন

দিন বেড়েই চলে। এমনকি মক্কার বাইরেও তা বিস্তার লাভ করে। ইসলামের প্রচার-প্রসার এত দিন মক্কার অলিগলিতে সীমিত ছিল। এবার তা মক্কার পর্বতমালার গণ্ডি পেরিয়ে আরবের অন্যান্য গোত্রের বিস্তার লাভ করে। তারা ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর অমৃত সুধার সাথে পরিচিত হয়। আরবের বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের সুশীতল ছায়া থেকে দূরে রাখার জন্য কুরাইশরা চিন্তা-ভাবনা করতে লাগল। এ নিয়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কারণ তাদের আশংকা ছিল, যদি আরবের বিভিন্ন গোত্র ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে কুরাইশদের বিশেষ মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বাণিজ্য বিপন্ন হয়ে পড়বে।

বিরোধী প্রচারণা

কাফের কুরাইশরা মহানবী (সা)-এর বিরোধিতায় যেসব ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। মহানবী (সা)-কে নানাভাবে অপমান করেছে। তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছে। মোটকথা, মুসলমানদের নিপীড়নের ব্যাপারে কুরাইশরা এতটুকু গাফলতি প্রদর্শন করেনি। এরপর তারা দেখল বিরোধিতা করে, এমনকি অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না। এবার তারা মহানবী (সা)-কে সত্যের প্রতি আহ্বান থেকে বিরত রাখার জন্য ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করল। তারা তাঁকে প্রলোভন দেখাতে লাগল। অটল ধন-সম্পদ, সুন্দরী নারী ও পদমর্যাদার লোভ দেখিয়ে বাগে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের এসব কৌশলের কোনটাই কাজে আসল না। মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের বাস্তবতা ত্যাগ করতে বলল। তাদের সাথে লড়াই করার হুমকিও দেয়া হল। এই পদক্ষেপেও ব্যর্থতা বরণ করতে হল। এরপর কুরাইশরা মুসলমানদের অবরোধ করল। তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা হল। কুরাইশরা ভেবেছিল, মুসলমানদের উপর এই অস্ত্র প্রয়োগ করা হলে তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মারা যাবে কিংবা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এতসব বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীরা হতাশ হলেন না। তাঁদের সংকল্প আরও সুদৃঢ় হল। মহানবী (সা) ইম্পাতকঠিন সংকল্প নিয়ে মানুষকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বানের দায়িত্ব পালন করে যেতে লাগলেন। তিনি মহান স্রষ্টার ইবাদত করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার হল, মহানবী (সা)-এর এরূপ প্রাণান্তকর প্রচারণায় কুরাইশরা কি সাড়া দিয়েছিল? তারা কি ঝগড়া-ফাসাদ ত্যাগ করে মহানবী (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল? মহানবী (সা) 'আল-আমীন', তিনি সত্যবাদী, জীবনে কখনও মিথ্যের আশ্রয় নেননি। এই নির্জলা সত্য কুরাইশদেরও অজানা ছিল না। মহানবী (সা)-এর এই বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে তারা কি তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান এনেছিল? না মহানবী (সা)-এর উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য, নিজেদের দেবদেবীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, সর্বোপরি মক্কার কেন্দ্রীয় গুরুত্ব অটুট রাখার জন্য প্রচারণার অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করল? এসব প্রশ্নের জবাবে পরিষ্কার বলা চলে যে, দলবদ্ধভাবে ইসলাম গ্রহণের মন-মানসিকতা থেকে কুরাইশরা তখনও বেশ দূরে ছিল। তাদের মুসলিম নির্যাতন নীতিতে তখনও কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। তারা এ ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত ছিল যে, মহানবী (সা)-এর দাওয়াত মক্কার বাইরেও কেন বিস্তার লাভ করেছে। মহানবী (সা)-এর বিরোধিতার জন্য কুরাইশদের নিকট আর একটি অস্ত্র ছিল। এই

অস্ত্রটি তারা আগে থেকেই ব্যবহার করে আসছিল। তাদের দৃঢ় আস্থা ছিল, এই অস্ত্রটি অবশ্যই কার্যকর হবে। আর এটি ছিল পাল্টা প্রচারের অস্ত্র।

সেকালে বাহাস বা বিতর্ক সভা শত্রু সম্পর্কে অপমানকর খবরাদি এবং তাদের মতবাদ খণ্ডনমূলক প্রমাণাদির প্রচার শত্রুর উপর জয়লাভের জন্য শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে গণ্য করা হতো। আরবের বিভিন্ন গোত্রে ইসলামের বিস্তার রোধ করার জন্য কুরাইশরাও এই প্রচার বা অপপ্রচারের কৌশল অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, মুসলিম নির্যাতন ও মুসলিম নিধন কর্মসূচি বড়জোর মক্কা নগরীতে কার্যকর হতে পারে। কিন্তু মক্কার বাইরের হাজার হাজার লোক যারা প্রতি বছর ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায়ে এসে থাকে, তাদের মধ্যে উক্ত কৌশল কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করবে না। এই দিক লক্ষ্য করে কুরাইশরা সিদ্ধান্ত নিল, মহানবী (সা) বহিরাগত যিয়ারতকারীদের মধ্যে তাঁর ধর্ম প্রচার শুরু করলে তারাও তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান আরম্ভ করবে।

নবুয়ত লাভের কয়েক বছর পর মহানবী (সা) কা'বায় যিয়ারতকারীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কারণ নবুয়ত লাভের পর আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা)-কে সর্বপ্রথম তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানানোর নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ মোতাবেক মহানবী (সা) কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সৌভাগ্যবান মহানবী (সা)-এর আহ্বানে সাড়া দেন। অবশিষ্টরা কুফরীকে আঁকড়ে ধরে থাকে। এরপর মহানবী (সা) সমগ্র আরববাসীকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা)-কে সারাবিশ্বের জন্য রাসূল মনোনীত করে পাঠিয়েছিলেন। সারা বিশ্বমানবকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আহ্বান জানানোই ছিল তাঁর মহান ব্রত। সর্বপ্রথম নিজ বংশধর ও আরববাসীকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো ছিল উক্ত বৃহত্তর দায়িত্বের ভূমিকা স্বরূপ। কুরাইশদের পর মহানবী (সা) কা'বার যিয়ারতে আগত বিভিন্ন আরব গোত্রকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সংবাদ জানতে পেরে কুরাইশদের একটি দল ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার নিকট আসেন। ওয়ালীদ ছিল সে সময়ে মক্কায়ে সেরা কূটবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। তারা ওয়ালীদের নিকট প্রস্তাব করে যে, 'আমাদেরকেও মক্কায়ে বহিরাগতদের মধ্যে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালাতে হবে। তবে আমাদের প্রচারের বুনিয়াদ অভিন্ন হতে হবে। আমাদের একেকজন একেক কথা বললে, তা মানুষের মধ্যে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করবে না। তাদের কেউ কেউ প্রস্তাব পেশ করল, 'আমরা সবাই (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে গণক বলে প্রচার করব।' ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এই প্রস্তাবে সাড়া দিল না। সে বলল, '(হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর কথাবার্তা আর গণকদের কথাবার্তায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে।' কেউ কেউ বলল, '(হযরত) মুহাম্মদকে পাগল বলে প্রচার করতে হবে।' এ প্রস্তাবও ওয়ালীদের মনোপূত হল না। সে বলল, 'তাঁর (সা) আচার-আচরণ ও স্বভাবে পাগলামি প্রকাশ পায় না।' তাদের মধ্যে কেউ বলল, 'আমরা তাঁকে জাদুকর বলতে পারি।' ওয়ালীদ বলল, 'তিনি জাদুকর নন। তিনি কোন প্রকার জাদু প্রদর্শন করেন না। আমরা তাকে কি করে জাদুকর বলে প্রমাণ করব।'

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা নিজেই প্রস্তাব করল, কা'বাঘরের যিয়ারতকারীদের মাথায় এ কথা ঢুকিয়ে দিতে হবে যে, তাঁর ভাষা ও বর্ণনায় জাদু রয়েছে। তাঁর কথায় পিতা থেকে পুত্র পৃথক হয়ে পড়েছে। ভাইয়ে-ভাইয়ে, স্বামী-স্ত্রীতে এবং গোত্রে গোত্রে ঝগড়া-ফাসাদ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে। ওয়ালীদ সবাইকে পরামর্শ দিল, এই দাবির সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে মক্কাবাসীদের অবস্থা তুলে ধরতে হবে। বলতে হবে, “আপনারা জানেন, মক্কাবাসীদের একতা ও সংহতি সারা আরবে প্রবাদ হিসাবে উল্লেখ করা হত। কিন্তু এই ব্যক্তির জাদুময় কথাবার্তার দরুন বর্তমানে শহরবাসীদের অবস্থা এমন হয়ে পড়েছে যে, একে অপরকে সুযোগমতো পেলে হত্যা করতে দ্বিধা করে না।”

অবশেষে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার প্রস্তাব গৃহীত হল। এরপর কুরাইশরা বহিরাগত হাজীদের তাঁবুতে যাতায়াত শুরু করল। তারা মহানবী (সা)-এর বর্ণনাধারা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করতে লাগল। তারা এ ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল যে, মহানবী (সা)-এর দাওয়াত মক্কাবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে তাদের প্রতিমাদের বিরুদ্ধে সমগ্র আরবে দাবানল জ্বলে উঠবে। এই আশংকায় তারা তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে হাজীদের বলতে লাগল, “তোমরা (হযরত) মহানবী (সা)-এর কথাবার্তায় কর্ণপাত করো না। নতুবা তোমরাও তার জাদুময় বর্ণনার শিকার হবে। তাতে করে সারা আরবে বিশৃংখলার আগুন জ্বলে উঠবে।

নযর ইবনে হারেস

মহানবী (সা) সম্পর্কে কুরাইশদের এই প্রচারণা ছিল অনেকটা শিশুসুলভ। মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের এই অপপ্রচার খুব একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারছিল না। তারা নিজেরাই মহানবী (সা)-এর বর্ণনাকে জাদুময় বলে মানুষের নিকট প্রচার করে বেড়াতো। সত্য প্রকাশের ধারা যদি জাদুময় হয়, তাহলে তা গ্রহণের ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। তা'ছাড়া যে প্রচারণায় নিজের অক্ষমতা ও প্রতিপক্ষের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি থাকে, তা কার্যকর ও হৃদয়গ্রাহী হবে কি করে। এজন্য তারা অনুভব করল যে, ইসলাম বিরোধী প্রচারের জন্য অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এবার কুরাইশরা নযর ইবনে হারেস নামের এক ব্যক্তির শরণাপন্ন হল। নযর ছিল একজন সুচতুর ব্যক্তি। এই লোকটি ছিল কুরাইশদের মধ্যে ইবলীস শয়তান। সে কিছু দিন হীরা বা বর্তমান ইরাকে অবস্থান করেছিল। সেখানে অবস্থানকালে সে ইরানী নৃপতি, তাদের পূজা-অর্চনার রীতি-নীতি ও গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছিল। মহানবী (সা) কোথাও গিয়ে কুরাইশদের মধ্যে ইসলামের মাহাত্ম্য ও পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংসের কারণ বর্ণনা শুরু করলে নযরও সেখানে উপস্থিত হতো। সেও বলা শুরু করত, “আমার ও (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর কথাবার্তার মধ্যে কি পার্থক্য থাকতে পারে? তিনিও তো আমার মতোই পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। তাকে অনুসরণ করে কুরাইশরাও এসব কথা অন্যান্য লোকদের মধ্যে ছবছ বর্ণনা করত।

খ্রিস্টান জাবর

মক্কায় সাফা পাহাড়ের পাদদেশে জাবর নামক এক খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ক্রীতদাসের বাড়ি ছিল। এই লোকটি ছিল আজমী বা অনারব। মহানবী (সা) মাঝে-মধ্যে জাবরের

বাড়িতে যেতেন। মহানবী (সা)-কে সেখানে যাতায়াত করতে দেখে কুরাইশরা অপপ্রচার আরম্ভ করল, “(হযরত) মুহাম্মদ (সা) যা কিছু বলছেন, এগুলো তিনি জাবরের নিকট শিখে বলছেন।” তারা আরও বলত, “আমাদের যদি পূর্বপুরুষের ধর্ম ছেড়েই দিতে হয়, আমরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করব। এই ধর্ম গ্রহণ করাই আমাদের জন্য শ্রেয়। আমরা কখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব না।” কুরাইশদের এসব কথা বলার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা নিচের আয়াতটি নাযিল করেন :

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ - لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ
أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ .

“আমি তো জানি, তারা বলে, ‘তাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ। ওরা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয় ; কিন্তু কোরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা।’ (১৬ : ১০৩)

এভাবে কুরাইশরা নতুন কৌশলে মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান শুরু করে। কিছু দিনের মধ্যে তাদের এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, মুসলমানদের অত্যাচার-নির্যাতনের চেয়ে বিরোধিতার নতুন কৌশলই অধিক কার্যকর। কিন্তু মহানবী (সা)-এর কথাবার্তায় যে সরল-সহজ ও উজ্জ্বলময় বাস্তব সত্য নিহিত ছিল, তার দ্যুতি কাফেরদের সকল প্রচার-প্রপাগান্ডার প্রভাব ম্লান করে দিচ্ছিল। অপরদিকে ইসলামের প্রভাববলয় দিন দিন বেড়েই চলে।

তোফায়েল ইবনে আমর দোসী

তোফায়েল ইবনে আমর দোসী ছিলেন একজন বিজ্ঞ, ভদ্র ও কবি। তিনি মক্কায় আসেন। কুরাইশরা তাদের প্রচারের কৌশল হিসাবে শহরের বাইরে গিয়ে তোফায়েলকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে। তারা তাকে মহানবী (সা) ও ইসলাম সম্পর্কে সতর্ক করে বলে, “তাঁর কথায় বিশ্বয়কর সম্মোহনী শক্তি রয়েছে। তাঁর কথাবার্তা মানুষকে আত্মীয়-স্বজন, এমনকি নিজ থেকেও বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আপনি তাঁর নিকট যাবেন না, তাঁর কথা শুনবেন না। যদি তাঁর কথায় কর্ণপাত করেন, তাহলে আমাদের মক্কাবাসীদের মতো আপনার কওমেও বিশৃংখলা দেখা দিবে। এরূপ অবস্থায় তার নিকট না যাওয়া এবং তাঁর কথাবার্তা না শোনাই আপনার জন্য কল্যাণকর হবে।

একদিন তোফায়েল ইবনে আমর দোসী কা‘বাঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে মহানবী (সা) উপস্থিত ছিলেন। তোফায়েল মহানবী (সা)-এর কিছু কথা শুনলেন। এসব কথা তাঁর মনে রেখাপাত করে। তোফায়েল মনে মনে বললেন, আমি একজন সচেতন লোক। কাব্যচর্চায়ও আমার বেশ দখল রয়েছে। ভাল-মন্দ কথার পার্থক্য বোঝারও আমার যোগ্যতা ও জ্ঞান রয়েছে। এই লোকটির কথা শুনতে আমার কি বিপদ থাকতে পারে? প্রভাব বিস্তার করবে না। তাদের কেউ কেউ প্রস্তাব করে তা না হলে চলে আসবে। এসব কথা মনে মনে ভেবে তোফায়েল মহানবী (সা)-এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কা‘বাঘর থেকে বেরুলে তোফায়েল মহানবী (সা)-এর পিছনে পিছনে তাঁর বাসায় গেলেন।

এখানে এসে তিনি তাঁর মনের ইচ্ছা মহানবী (সা)-এর নিকট ব্যক্ত করেন। এমনকি তিনি মনে মনে যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন তাও মহানবী (সা)-এর নিকট প্রকাশ করেন। মহানবী (সা) তোফায়েলকে পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে শোনান। তিনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণীতে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর হযরত তোফায়েল ইবনে আমর (রা) নিজের দোস গোত্রে ফিরে যান এবং সেখানে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নিকট ইসলামের মাহাত্ম্য শুনে দোস গোত্রের কিছু লোক সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আর কিছু লোক এ ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। হযরত তোফায়েল (রা) কয়েক বছর নিরলসভাবে ইসলামের প্রচার কাজ চালিয়ে যান। তাতে করে দোস গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণের গৌরব লাভ করেন। এসব লোক মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। বস্তুত মক্কা বিজয়ের পরই ইসলামের রাজনৈতিক অবস্থা একটা নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে।

ইসলামের আবির্ভাবের প্রাথমিক দিনগুলোতে শুধু হযরত তোফায়েল (রা)-ই মক্কার বাইরে ইসলাম প্রচার করেননি, আরও অনেকে এই দায়িত্ব পালন করেছেন। আর শুধু মক্কার পৌত্তলিকরাই ইসলাম গ্রহণ করেননি, অনেক কিতাবধারী বা ইহুদী-খৃষ্টানও এ সময়ে ইসলাম গ্রহণের গৌরব লাভ করেন। এ সময়ে ইয়ামন থেকে কুড়ি সদস্যবিশিষ্ট একটি খৃষ্টান প্রতিনিধি দল মক্কা আসেন। মহানবী (সা)-এর ইসলাম প্রচার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য তাদের সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাদেরকে মক্কা পাঠানো হয়। তাঁরা কতকগুলো বিষয় সম্পর্কে মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন। আল্লাহর রাসূলের নিকট এসব বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব পেয়ে তাঁরা উক্ত বৈঠকেই ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এ খবর শুনে কুরাইশরা অত্যন্ত ব্যথিত ও রুষ্ট হয়। তারা ইয়ামনের নতুন মুসলমানদের নিকট এসে বলে, “তোমরা তো অত্যন্ত খারাপ লোক। তোমাদের কওম এই লোকটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য তোমাদের পাঠিয়েছে। আর তোমরা প্রথম সাক্ষাতেই নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে এই লোকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বসেছ।”

এসব নতুন মুসলমানের উপর কুরাইশদের কটুক্তির এতটুকু প্রতিক্রিয়া হল না। বরং এসব কথায় তাঁদের ঈমান আরও সুদৃঢ় হল। কারণ ইসলাম গ্রহণের আগেও তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতেন। দেবদেবীর পূজা করতেন না। এদিক থেকে পৌত্তলিকদের তুলনায় ইসলামের সাথে এসব নও-মুসলিমের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ছিল।

আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল ও আখনাস

কুরাইশদের শত চেষ্টা-তদবীর সত্ত্বেও মহানবী (সা)-এর ইসলাম প্রচারের পরিধি দিন দিন বেড়েই চলল। এই অবস্থা দেখে কুরাইশদের মধ্যে ইসলামের নামকরা শত্রুরাও মনে মনে ভাবতে লাগল, (হযরত) মুহাম্মদ (সা) যেসব বিষয় সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করছেন, ভয় দেখাচ্ছেন এবং যেসব বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, এসব কি সত্য? এসব প্রশ্ন সচেতন ও নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের ভাবিয়ে তুলল। তিন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল ও আখনাস রাতের অন্ধকারে গোপনে আড়ি পেতে মহানবী (সা)-এর কথাবার্তা শোনার মনস্থ

করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ একে অপরের মনোভাব সম্পর্কে ঘূণাক্ষরেও জানত না। এক রাতে ঘটনাচক্রে তিনজনই পৃথক পৃথকভাবে মহানবী (সা)-এর ঘরের পাশে লুকিয়ে আড়ি পেতে রইল। মহানবী (সা) সে রাতের বেশির ভাগ বিনিদ্র কাটিয়েছেন। তিনি নামায পড়েন এবং তাতে অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন। উক্ত তিন কুরাইশ নেতা গোপন স্থান থেকে রাতভর তেলাওয়াত শুনে। কিন্তু তাদের কারও সাথে কারও কোন যোগাযোগ ছিল না। অতিপ্রত্যুষে সবাই গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে নিজ নিজ বাসার দিকে রওয়ানা দেয়। পথে তিনজনেরই সাক্ষাত হয়ে যায়। সারা রাত তারা প্রত্যেকে কোথায় কাটিয়েছে, এ কথা আর মুখে বলার প্রয়োজন হয় না। এমনিতেই একে অপরের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। একবাক্যে তারা সবাই রাতে কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। এরপর সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নেয় যে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। আগামীতে কেউ আর এভাবে আড়ি পাতার জন্য আসবে না। কারণ নিজেদের সম্প্রদায়ের কোন অজ্ঞ লোক দেখে ফেললে সে দল ছেড়ে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর জামাআতে গিয়ে शामिल হবে।

উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় রাত আসার সাথে সাথে আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল ও আখনাসকে কি এক অব্যক্ত আকর্ষণ অস্থির করে তোলে। মহানবী (সা)-এর কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য তাদের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে পড়ে। গত রাতের মতো আজো তারা পরস্পরকে না জানিয়ে লুকিয়ে গিয়ে মহানবী (সা)-এর ঘরের অদূরে নিজ নিজ গোপন স্থানে আড়ি পেতে বসে। সারা রাত তারা মহানবী (সা)-এর কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত শোনে। ফজরের সময় তারা নিজ নিজ বাড়ির দিক রওয়ানা দেয়। গতকালের মতো আজো একই স্থানে তাদের একে অপরের সাথে সাক্ষাত হয়। আজো তারা এজন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে। একে অপরকে সতর্ক করে বলে, এখন থেকে এদিকে আর কখনো আসা যাবে না। কিন্তু তৃতীয় রাতেও তারা পূর্বের মতো এক অজানা আকর্ষণে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের অবচেতন মনেই পূর্ব দুই রাতের গোপন স্থানে গিয়ে বসে। সারারাত তারা স্বয়ং ইসলামের নবীর কণ্ঠে পবিত্র কোরআনের সুমধুর বাণী শুনে তন্ময় হয়ে কাটিয়ে দেয়। ফজরের সময় বাড়ি ফেরার পথে আবার একই স্থানে তিনজনের সাক্ষাত হয়। আজও তারা এদিকে আর কখনো না আসার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু এই তিন রাত পবিত্র কোরআনের বাণী শোনার পর তাদের মন-মানসিকতায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা ইসলামের বিজয়ের ভবিষ্যত চিত্র পরিষ্কার দেখতে পায়। তাতে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। তারা পরিষ্কার দেখতে পায় মহানবী (সা)-এর প্রতিপক্ষ হিসাবে তাদের কোনই অস্তিত্ব থাকবে না। একদিন না একদিন তাদের পরাজয় অবধারিত। এরপর সমগ্র আরব জাহান মহানবী (সা)-কে অনুসরণ করবে। আরববাসী ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের ধন্য মনে করবে।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন হলো, মহানবী (সা)-এর অনুসরণ করার পথে তাদের কী প্রতিবন্ধকতা ছিল। তিনি তো তাদের নিকট ধন-সম্পদ কিংবা নেতৃত্ব চাননি। শাসক হওয়ার এতটুকু ইচ্ছাও কোন দিন তাঁর পবিত্র মনে স্থান পায়নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন অমায়িক স্বভাবের লোক। নিজ কণ্ঠের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা ছিল। সবার সাথে সবিনয় আচরণ ছিল তাঁর পবিত্র অভ্যাস। তিনি সবাইকে অত্যন্ত নম্র ভাষায় ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাতেন। অপরদিকে নিজের আত্মাকে সব সময় তিনি কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। তিনি কারো সাথে

কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করতেন না। বরং কেউ তাঁর সাথে বাড়াবাড়ি করলেও তিনি তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। আর এসব কাজে পরম আনন্দ লাভ করতেন। একদিন অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতুম মহানবী (সা)-এর এক আচরণে কিছুটা মনক্ষুণ্ণ হন। তাতে মহানবী (সা) অত্যন্ত ব্যথিত হন। ঘটনাটি ছিল, একদিন মহানবী (সা) কুরাইশ সরদার ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার সাথে ইসলাম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। এ সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (অন্ধ) সেখানে উপস্থিত হন। তিনি মহানবী (সা)-কে পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াত আবৃত্তি করে শোনাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তাঁর এই পীড়াপীড়ি মহানবী (সা) পছন্দ করেননি। কারণ তিনি ওয়ালীদকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহর পীড়াপীড়িতে মহানবী (সা)-এর প্রয়াস ব্যাহত হয়। ওয়ালীদ ও মহানবী (সা)-এর মধ্যকার আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি আবদুল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং সেখান থেকে উঠে বাড়ি চলে আসেন। বাড়ি এসে তাঁর ধারণা হয়, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের সাথে এরূপ ব্যবহার করাটা বোধ হয় তাঁর ঠিক হয়নি। ব্যাপারটা সম্পর্কে তিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন। এ সময়ে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

عَبَسَ وَتَوَلَّى . أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى . وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى . أَوْ يَذْكُرُ
فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى . أَمَّا مَنْ اسْتَفْنَى . فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى . وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا
يَزَكَّى . وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْفَى . وَهُوَ يَخْشَى . فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى . كَلَّا
إِنهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ - فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ . مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ .
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ . كِرَامٍ بَرَرَةٍ .

“সে (রাসূল) অকুণ্ঠিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ তার নিকট এক অন্ধ আসল। কে তোমাকে ওর সম্বন্ধে জ্ঞান দিল? সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো, অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশ দ্বারা উপকৃত হতো। কিন্তু যে পরোয়া করে না, তুমি তার দিকে মনোযোগী, সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন অপরাধ নেই, আর যে তোমার কাছে দৌড়ে ও সশংকচিত্তে এল, তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে। এরূপ আচরণ অনুচিত, এটি উপদেশ বাণী, যে ইচ্ছা করবে সে তা স্মরণ রাখবে। তা আছে মহান, উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন, পবিত্র গ্রন্থে, মহান, পূত-চরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।” (৮০ : ১-১৬)

মহানবী (সা) একজন বিত্তবান ও নেতৃস্থানীয় লোককে হেদায়েত করার আকাঙ্ক্ষায় একজন অন্ধ লোকের অনুরোধের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেননি। উপরোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা মহানবী (সা)-এর এই আচরণের প্রতি আপত্তি করেছেন। পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত ভাষ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ইসলাম মানব জাতিকে সাম্য ও মৈত্রীর শিক্ষা দিয়েছে। ইসলাম উঁচু-নিচু, ছোট-বড় ও আমীর-গরীবের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য সৃষ্টি করেনি। তাছাড়া ইসলামের প্রবর্তক মহানবী (সা) সাধারণ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ-প্রীতি প্রদর্শন করতেন। সবার সাথে অমায়িক ব্যবহার করতেন। এরপরও মহানবী (সা)-এর অনুসরণে কুরাইশদের জন্য কী বাধা ছিল। কেন তারা মহানবী (সা)-এর আহবানে

সাড়া দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। কেন তারা ইসলামের প্রচার-প্রসারে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিল! অথচ তাদের অন্তরও অনেকটা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। সময়ের অতিবাহনে কুরাইশরা রক্ষণশীলতা ও পুরনো আচার-অনুষ্ঠান অনেকটা ভুলে গিয়েছিল। অধিকন্তু তারা এও উপলব্ধি করেছিল যে, মহানবী (সা) যে ধর্মমতের প্রতি তাদের আহ্বান জানাচ্ছেন, তা সত্যি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সময়ের বিবর্তন ও অতিবাহনের সাথে সাথে স্থবিরতা ও পুরনো রীতি-নীতি মানুষের মন থেকে দূরীভূত হয় কিনা। অবশ্যই হয়, তবে তা সবার বেলা নয়। সত্যসন্ধ জ্ঞানী মানুষ যারা চরমোৎকর্ষের সন্ধানে সব সময় তৎপর, তারা স্থবিরতা ও কুসংস্কারের অভিষাপমুক্ত থাকে। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে স্থবিরতা, কুসংস্কার ও পুরনো সকল প্রকার রীতিনীতি তাদের মন-মানসিকতা থেকে বিলীন হয়ে যায়। সময়ের বিবর্তনের ফলে তাদের মনে কুসংস্কারের যেসব জং পড়ে প্রত্যক্ষকৃত বাস্তবতার কষ্টিপাথরের সাহায্যে তারা সেগুলো দূর করতে সক্ষম হয়। এ ধরনের মানুষের অন্তর ও অনুভূতিকে সোনা-রূপা গলিয়ে খাঁটি করার পাত্র ও পদ্ধতির সাথে তুলনা করা যায়। সোনা-রূপা আগুনে গলিয়ে যেমন খাদ বের করে খাঁটি করা হয়, তেমনি এসব লোকও তাদের অন্তরের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করে প্রতিটি বস্তু থেকে ময়লা-আবর্জনা ও কৃত্রিমতাকে ঝেড়ে ফেলে খাঁটি ও আসল বস্তুটি গ্রহণ করে। এসব লোক সত্যের সন্ধানে প্রতিটি বস্তুকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। তারা এই অনুসন্ধান তৎপরতায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি কথায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শব্দমালার প্রভাব আত্মস্থ করার জন্য সব সময় অধীর থাকে, ব্যাকুল থাকে। এ ধরনের মনীষা প্রতিটি যুগে প্রতিটি সম্প্রদায়ে জন্মলাভ করে থাকে। অবশ্য তাদের সংখ্যা হয় খুব কম।

কিন্তু বিত্তবান ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা উপরোক্ত শ্রেণীর ক্ষণজন্মা মনীষীদের তাদের পথের বাধা হিসাবে গণ্য করে থাকে। আর তাই উভয় শ্রেণীর মধ্যে বোঝাপড়ার লড়াই লেগেই থাকে। এই বোঝাপড়া ও সংঘাতের কারণ হলো, বিত্তবান ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা আশংকা করে, সাধারণ মানুষ যদি ক্ষণজন্মা মনীষীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহলে এর প্রথম আঘাত আসবে কয়েক পুরুষ থেকে হস্তগত তাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার উপর। তারা প্রমাদ গুণে, নতুন চিন্তাধারা ও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের পুরনো সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদই ভেঙে চুরমার করে দেবে। আর এই বিপ্লবের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার আঘাতে তাদেরও সাধারণ মানুষের কাতারে এসে স্থান নিতে হবে। তাদের এই আশংকার মূল কারণ হলো, পৃথিবীতে তারা যে ধন-সম্পদ ও মর্যাদা লাভ করেছে, এসব ছাড়া তাদের নিকট অন্য কিছুই কোন গুরুত্ব নেই। পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকে তারা নিজেদের পদমর্যাদা ও ধন-সম্পদের দৃষ্টিতে বিচার-বিবেচনা করে থাকে। কোন কারণে যদি তাদের ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তাদের চোখে সেটাই উজ্জ্বল বাস্তব। যদি কোন কারণে তাদের কায়েমী স্বার্থে বিঘ্ন সৃষ্টির আশংকা হয়, তাহলে সে কারণটি বাস্তব সত্য হলেও তাদের নিকট সেটা অবাস্তব কল্পনা বই কিছু নয়। এসব স্বার্থান্বেষী ধন-সম্পদকে যেকোন ধর্ম বা আদর্শের ফলশ্রুতি মনে করে থাকে। যেপথে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তাদের নিকট সে পথই অনুপম আদর্শের পথ, বাস্তব সত্য পথ। কোন বাস্তব সত্য ও আদর্শ গ্রহণের মাধ্যমে যদি ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হয়, তবে তা যতই বাস্তবানুগ হোক না কেন, তাদের নিকট সেটা সম্পূর্ণ অবাস্তব কল্পনা। অনুরূপভাবে যে

ধর্মে কায়েমী স্বার্থবাদীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ও স্বার্থ রক্ষার অবকাশ আছে, তাদের নিকট সে ধর্ম হচ্ছে অত্যন্ত বাস্তবানুগ। এর সাথে অন্য কোন কিছুই তুলনা হয় না। কিন্তু কোন ধর্ম যদি তাদের ও তাদের স্বার্থের মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তারা এই ধর্মের ধারেকাছেও যেতে চায় না। তারা একে বাতিল ও অবাস্তব কল্পনা মনে করে। পদমর্যাদা ও ক্ষমতাবান লোকেরাও বিত্তবানদের ব্যতিক্রম নয়। তারা নতুন চিন্তাধারা ও মতবাদকে নিজের স্বার্থের নিরিখে বিচার-বিবেচনা ও মূল্যায়ন করে থাকে। তারা নিজেদের অধীনস্থ অঙ্গ জনসাধারণকে নতুন মতবাদ ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। অপরদিকে নিজেদের স্বার্থরক্ষাকারী পুরনো ও বাতিল ধ্যান-ধারণাকে নতুন রূপ দেয়ার চেষ্টা করে। এভাবে তারা একদিকে নতুন মতবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে তোলে, অপরদিকে তাদের মনে এই ধারণা দেয়ার প্রয়াস দেয় যে, সত্য আমাদের পুরনো ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কিন্তু সত্য যে কবে পুরনো ধ্যান-ধারণা ছেড়ে চলে গেছে, সাধারণ মানুষ এ কথা বুঝতেই পারে না। অবশ্য কিছু কুসংস্কার ও বাতিল ধ্যান-ধারণাকে তারা সত্যরূপে চালিয়ে দিয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষরা বাতিল ধ্যান-ধারণা যাচাই-বাছাই করতে পারে না। নিজেদের চাহিদা ও প্রয়োজনের তাগিদে সাধারণ মানুষ সব সময় বিত্তবানদের দিকে তাকিয়ে থাকে। সব সময় তারা পুঁজিপতিদের তোষামোদিতে ব্যস্ত থাকে। সত্য যে প্রতিমা ও পূজামণ্ডপের চার দেয়ালের ভিতর বন্দী থাকতে পারে না, সাধারণ মানুষ এ বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করারই ফুরসত পায় না। বস্তুত সত্য মানবাত্মার মতই মুক্ত। সে মানুষের ধারণ-ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার আলো বিস্তারে সব সময় উদার। সত্যের উদারতা ও বদান্যতা স্বাধীন-পরাধীন নির্বিশেষে সকল মানবাত্মার জন্যই সমান। সূর্য যেমন পৃথিবীতে তার আলো বিতরণে সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ ও ভাল-মন্দের ভেদাভেদ করে না, তেমনি সত্যও মানবাত্মাকে আলোকিত করার ব্যাপারে কোনরূপ বৈষম্য করে না। সবাই নিজ নিজ ধারণ-ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সত্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে। আর কোন বস্তুই সত্য বিকাশের পথ রোধ করতে পারে না। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সে তার পথে এগিয়ে চলে।

গ্রহণ থেকে বিরত থাকা

এরূপ পরিস্থিতিতে যারা পবিত্র কোরআন শোনার জন্য রাতের অন্ধকারে মহানবী (সা)-এর বাসস্থানের অদূরে গিয়ে আড়ি পেতে বসত, তাদের পক্ষে নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা মোটেই সম্ভব ছিল না। কারণ তারা বেশ ভাল করেই জানত, পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে তাদের অনেক কাজকর্মই বাতিল গণ্য হবে। তারা জানত ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের কায়েমী স্বার্থ ও সামাজিক পদমর্যাদার বুনিয়াদ নড়বড়ে হয়ে যাবে। কারণ পবিত্র কোরআন ইতিমধ্যে মানুষে মানুষে কৃত্রিম বৈষম্যের প্রতি বলিষ্ঠ ভাষায় অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন পরিষ্কার ঘোষণা করেছিল : **انْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتْقَاكُمْ** : “তোমাদের মধ্যে যারা সবচাইতে পরহেযগার, তারাই আল্লাহর নিকট সবচাইতে সম্মানিত।।” (৪৯ : ১৩)

আবু সুফিয়ান ও তার সমমনারা তাদের পিতৃ-পুরুষের ধর্ম আঁকড়ে থাকার কারণ এই ছিল না যে, তারা তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত। কিংবা উক্ত ধর্মের গভীরে তারা কোন সত্য লুক্কায়িত

দেখতে পেয়েছিল। তাদের উক্ত ধর্ম ত্যাগ না করার জন্য কারণ ছিল। মূলত তাদের পিতৃ-পুরুষের ধর্মের মাধ্যমেই তারা অটেল ধন-সম্পদ ও উঁচু সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছিল। তারা এ কথা ধারণা করেছিল, যদি ধন-সম্পদই বিসর্জন দিতে হয়, সামাজিক পদমর্যাদাই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তা'হলে আমাদের জীবনে আর কোনরূপ আকর্ষণই অবশিষ্ট থাকে না। তাই তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। শুধু তাই নয়, তারা মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের সাথে ঝগড়া-ফাসাদের পথ বেছে নেয়।

হিংসা-বিদ্বেষ ও ঈর্ষা

মহানবী (সা)-এর নবুয়ত লাভের পর ধন-সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদার আকর্ষণ ছাড়াও কুরাইশরা হিংসা-বিদ্বেষ ও ঈর্ষায় ফেটে পড়ে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণকে তারা নিজেদের জন্য অপমানকর মনে করে। আর এজন্যই তখনো তারা ইসলামে দীক্ষিত হতে পারছিল না। মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে যারা আরবে কোন রাসূল আগমন সম্পর্কে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করত উমাইয়া ইবনে আবিস্সালত ছিল তাদের অন্যতম। ধীরে ধীরে তার মধ্যে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, সে ভাবতে থাকে অদূর ভবিষ্যতে যে নবীর আবির্ভাব হচ্ছে আমিই বোধ হয় সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি। কিন্তু মহানবী (সা)-এর আবির্ভাব হওয়ার সাথে সাথে তাঁর অন্তরে হিংসার দাবানল জ্বলে ওঠে। উমাইয়া ইবনে আবিস্সালত ছিল সমকালের একজন উঁচুদরের কবি। সে অত্যন্ত উন্নতমানের কবিতা রচনা করত। কিন্তু সে মহানবী (সা)-কে রাসূল হিসাবে গ্রহণ করেনি। তাঁকে সে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত। এরপর উমাইয়া ইবনে আবিস্সালতের কিছু কবিতা মহানবী (সা)-এর সামনে আবৃত্তি করা হয়। তিনি বললেন, উমাইয়ার কবিতা তো মুসলমান হয়ে গেছে। কিন্তু সে নিজে এখনো কাফের রয়ে গেছে। ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা বলত, “কুরাইশের নেতা হচ্ছে আমি। আর তায়েফের বনু সাকিফের নেতা হচ্ছে আবু মাসউদ আমর ইবনে উমায়ের সাকারী। আমাদের উভয়ের বর্তমানে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি কি করে ওহী নাযিল হতে পারে?” পবিত্র কোরআনে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে :

وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ . أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ - نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا -

“এবং তারা বলে, কোরআন কেন নাযিল হলো না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? তারা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বণ্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে।” (৪৩ : ৩১-৩২)

আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান ও আখনাস পরপর তিন রাত মহানবী (সা)-এর বাসস্থানের পাশে আড়ি পেতে পবিত্র কোরআনের আয়াত শোনে। এ কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনার পর একদিন আখনাস আবু জেহেলের বাড়ি যায়। সে আবু জেহেলকে বলে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর মুখে যা শুনলে এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? আবু জেহেল বলল, আমার আবার কি অভিমত হবে? তবে শোন, নেতৃত্ব নিয়ে আবদে মান্নাফের সাথে আমাদের

দীর্ঘ দিন থেকে বিবাদ-বিসংবাদ চলে আসছে। তারা মক্কার নেতৃত্ব কুক্ষিগত রাখার জন্য অতিথিপরায়ণতা ব্যাপকভাবে শুরু করে। আমরাও তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষকে মেহমানদারী শুরু করি। যুদ্ধের ময়দানে তারা বীরত্ব দেখালে আমরাও এ ব্যাপারে তাদের চেয়ে পিছনে থাকি না। তারা যদি বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, আমরাও তাই করেছি। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা ও আমরা 'কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান' তালে চলে এসেছি। আমাদের দু'টি গোত্র যেন দ্রুতগামী দু'টি ঘোড়ার মতো সমান সমান চলে আসছে। এক পর্যায়ে আবদে মান্নাফ বলছে, তাদের মধ্যে একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর নিকট আসমান থেকে ওহী নাযিল হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছনে পড়ে গেছি। কারণ আমরা নিজেদের গোত্রে নবী জন্ম দিতে পারিনি। হে আখনাস! এখন আমরা তাদের নবীর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না এবং তার স্বীকৃতির ব্যাপারে মুখ খুলে কিছু বলতেও পারি না।

বস্তুত আরবের বেদুইনদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রবণতা ছিল অত্যন্ত তীব্র। তাদের সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করার সময় যদি তাদের এই প্রবণতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করা হয়, তাহলে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব না। আর নীচ প্রবণতা শুধু বেদুইন নয়, পৃথিবীর অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কমবেশি দেখতে পাওয়া যায়। আত্মশুদ্ধি ছাড়া এই প্রবণতার অভিশাপমুক্ত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। আর আত্মশুদ্ধিও দীর্ঘ অনুশীলন ছাড়া সম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে আত্মার চাওয়া-পাওয়ার ফায়সালা অবশ্যই জ্ঞানের শক্তির মাধ্যমে করতে হবে। নিজের মধ্যে এমন যোগ্যতা সঞ্চয় করতে হবে, শত্রুও যদি সত্য ও ন্যায় প্রকাশ করে, তাকে বিনা দ্বিধায় বন্ধু বলে মনে করতে হবে। মূলত সত্যের তুলনায় কারুনের ধন-সম্পদ, আলেকজান্ডারের প্রভাব-প্রতিপত্তি, এমনকি রোমান সাম্রাজ্যও একেবারে নগণ্য বস্তু। যার অন্তর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্য গ্রহণের জন্য নিবেদিত, কেবল এ ধরনের লোকেরাই চরমোৎকর্ষের উক্ত পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়। কিন্তু যারা ধন-সম্পদ লাভের নেশায়, জীবনের বাজি রাখতেও দ্বিধা করে না, তারা মানবতার উপরোক্ত স্তরে পৌঁছতে পারে না। তারা ক্ষণস্থায়ী প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রাচুর্যকে চিরন্তন মনে করে সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসবকে চিরন্তন মনে করে তারা এগুলো লাভের নেশায় নিজেকে যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়াতেও দ্বিধা করে না। তাদের এই প্রবণতা ও মন-মানসিকতা তাদেরকে মানবতার উঁচুস্তর লাভ থেকে বঞ্চিত করে। এ কথাও ঠিক যে, সত্য অনুসন্ধানের তাগিদ এ জাতীয় লোকদের ব্যাকুল করে তোলে। কিন্তু আত্মস্বার্থ যখন তাদের এই অনুসন্ধানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন তারা সত্যের প্রতি কোন প্রকার গুরুত্ব প্রদান করে না। কুরাইশরাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল যে, মহানবী (সা)-এর অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাদের প্রবল আশংকা ছিল, মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীরা একদিন তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। সমগ্র আরব মুসলমানদের প্রভাবাধীন চলে যাবে। এই আশংকার প্রেক্ষিতে কুরাইশরা মহানবী (সা) ও তাঁর সত্য ধর্মের প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য নানা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। তারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালানোর ব্যাপারে কোন প্রকার দ্রুতি করেনি। তারা মহানবী (সা) ও বনু হাশিমের সাথে সকল প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাঁদের নয়রবন্দী করে রাখে। এমনকি মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে অশোভন প্রচার-প্রপাগান্ডা করতেও ইতস্তত করেনি।

পরকাল ও হিসাব-নিকাশের ভয়

মক্কার কাফেররা পরকাল, শেষ বিচারের দিন এবং দোযখের শাস্তির ভয়েও ইসলাম গ্রহণ থেকে দূরে সরে থাকত। কারণ তারা সারা জীবন ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-উল্লাসে ডুবে থাকত। অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য ও চক্রবৃদ্ধি সুদের কারবারের মাধ্যমে ধন-সম্পদ বাড়ানো তাদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল। সম্পদ লাভের ঘৃণ্যতম পন্থাটিকেও তারা পরম সুযোগ বলে মনে করত। ধর্মীয় দিক থেকে তারা মনে করত, প্রতিমা ও দেব-দেবীর নৈকট্য লাভই হচ্ছে যে কোন পাপাচার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। হোবল দেবতার প্রতিকৃতির সামনে তারা লটারী করত। এই লটারীর ফলাফলকে তারা হোবলের নির্দেশ হিসাবে গণ্য করত। তারা পাপ মোচনের জন্য প্রতিমাদের সামনে কাফ্ফারা স্বরূপ পশু কোরবানী করত। হত্যা, ডাকাতি, রাহাজানি ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কাজ করে তারা প্রতিমাদের উপর ভরসা করত। তারা মনে করত, প্রতিমারাই তাদের সকল প্রকার পাপাচারের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। এভাবে তারা পাপ কাজ করেও নিজেদের নিষ্পাপ মনে করত।

মহানবী (সা) মক্কার কাফেরদের এসব ভ্রান্ত ও উদ্ভট ধারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তিনি তাদের পাপের শাস্তি সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো পাঠ করে শোনাতেন। এসব আয়াত শুনে পরকালের ভয়ে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যেতো। মহানবী (সা) মক্কার কাফেরদের পরকাল সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনের যেসব আয়াত পাঠ করে শোনাতেন, তার মধ্যে কয়েকটি আয়াত হলো :

وَقَالُوا ۖ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ۖ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا . قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا . أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ - فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا - قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ .

“ওরা বলে, ‘আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো ? বল, ‘তোমরা পাথর অথবা লোহা হয়ে যাও, অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন। ‘তারা বলবে, ‘কে আমাদের পুনরুত্থিত করবে ?’ বল, তিনিই, যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।” (১৭ : ৪৯-৫১)

পরকালে অন্য কারো সুপারিশ কাজে আসবে না। শুধুমাত্র মানুষের আমল বা নেক কাজই তার জন্য আল্লাহ তা‘আলার দরবারে সুপারিশ করবে :

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ .

“ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ ওদের কোন কাজে আসবে না।” (৭৪ : ৪৮)

হাশর-নশর, হিসাব-কিতাব, শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ভাষা উল্লেখ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেছেন :

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ . يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ . لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ . وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ

مُسْفَرَةٌ ضَاكَّةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ . وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ . تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ . أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ .

“যেদিন কেয়ামত উপস্থিত হবে, মানুষ পরিহার করবে তার ভাই, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের। সেদিন ওদের প্রত্যেকে অপরের চিন্তা না করে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। অনেকের মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল হবে এবং অনেকের মুখমণ্ডল সেদিন ধূলিধূসর ও কালিমাচ্ছন্ন হবে। এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও দুষ্টকারী।” (৮০ : ৩৩-৪২)

পাঠকবৃন্দ! আপনারা হয়তো এর আগেও এসব ভীতিপ্রদ আয়াত পাঠ করেছেন। পড়ে না থাকলে অন্তত শোনারও সুযোগ হয়েছে। পড়ে থাকুন আর শুনে থাকুন, এসব আয়াতের মাধ্যমে কি আপনাদের অন্তরে ভয়ের সৃষ্টি হয়নি? তাতে কি আপনাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে নি? নিশ্চয়ই উঠেছে। বস্তুত মহানবী (সা) কুরাইশদের সামনে পবিত্র কোরআনের যেসব আয়াতের মাধ্যমে কেয়ামতের যে ভয়াবহ রূপ তুলে ধরেছেন, উপরোক্ত আয়াতগুলো হচ্ছে তার একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন ভাষ্যে জাহান্নামের যে ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে, তা কি আপনারা কল্পনার চোখে আয়ত্ত্ব করতে পেরেছেন? নিশ্চয়ই পারেননি। মহানবী (সা) কুরাইশদের সামনে জাহান্নামের বিবরণ উল্লেখ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের ভাষ্য উদ্ধৃত করে বলেছেন :

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ .

“স্মরণ কর সে দিনের কথা, যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, ‘তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ, জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি?’ (৫০ : ৩০)

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا .

“যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে, তখনই আমি তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করব যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (৪ : ৫৬)

পাঠকবৃন্দ! আপনারা যারা মুসলমান, ঈমান ও পরকালের পাথেয় থাকা সত্ত্বেও কেয়ামত ও জাহান্নামের ভয়াবহতার কথা শুনে আপনাদের অন্তরাত্মা কীরূপ কেঁপে উঠেছে! অপরদিকে মক্কার কুরাইশ ও তাদের সরদাররা পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার আগে নানা দেব-দেবীর ছত্রছায়ায় নিজেদের পরকালীন হিসাব-কিতাব থেকে মুক্ত মনে করত। তারা যা ইচ্ছা তাই করত। এরূপ অবস্থায় পরকাল সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন বাণী যখন তাদের সামনে পাঠ করা হতো এবং তারা নিজ কানে সেসব শুনত, তখন তাদের মনে কীরূপ ভয়-ভীতি সৃষ্টি হতো তা কল্পনাও করা যায় না। বস্তুত এসব অপরিণামদর্শী ও স্বার্থান্ধ কাফের মহানবী (সা)-এর মুখে পবিত্র কোরআনের এসব আয়াত শুনে আরো ত্রুণ হয়ে পড়ত। তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করত।

কুরাইশরা পরকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। পরকালের ভয়াবহতা সম্পর্কেও তাদের কোন ধারণা ছিল না। এমনকি ইহজগতে কৃতকর্মের প্রতিফল পরকালে ভোগ করার অমোঘ ব্যাপারটিও তাদের নিকট অজানা ছিল। তারা নিজেদের অসুখ-বিসুখ, সন্তান-সন্ততিদের বিপদ-আপদ, মান-সম্মান ও ধন-সম্পদ হ্রাস হওয়ার আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। তাদের নিকট ইহজীবনই ছিল সবকিছু। তারা পার্থিব স্বার্থের চিন্তায় সব সময় নিমগ্ন থাকত। যেসব কারণে তাদের পার্থিব স্বার্থে আঘাত আসতে পারে, তারা সে সবার প্রতিকারে সব সময় ব্যস্ত থাকত। যদি তাদের কোন সময় এরূপ ধারণা হতো, আমরা যেসব পাপ কাজ করেছি বা করছি হয়তো তার জন্য পরবর্তীতে শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে, তখন তারা এই আশংকা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করত। তারা তীর নিক্ষেপ করে, পাথর ছুঁড়ে কিংবা পাখিদের মাধ্যমে 'ফাল' বা পূর্বলক্ষণ জেনে নিত। পাখিদের থেকে পূর্বলক্ষণ জানার পদ্ধতি হলো, তারা পাখির বাসায় পাথর ছুঁড়তো কিংবা চিৎকার করে পাখিটি বাসা থেকে উড়িয়ে দিত। পাখিটি ডান দিকে উড়ে গেলে শুভ লক্ষণ মনে করা হতো আর বাঁ দিকে গেলে মনে করা হতো কুলক্ষণ। এরপর তারা ভবিষ্যতের বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য নানা প্রতিমা ও দেব-দেবীর নামে পশু বলি দিত। তাতে করে তারা নিজেদের মুক্ত ও নিরাপদ মনে করত। মৃত্যুর পর হাশর-নশর, হিসাব-কিতাব, শাস্তি ও পুরস্কারের প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিল না। আল্লাহ তা'আলা পরহেযগারের সাথে যে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, দোযখের শাস্তি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে যেসব সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, মক্কার কাফেরদের সেসবের প্রতি কোন আস্থা ছিল না।

কুরাইশ ও বেহেশত-দোযখ

কুরাইশরা ইহুদী-খৃষ্টানদের নিকটও শুনে আসছিল যে, ইহজীবনে পাপ করলে পরজীবনে দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু মহানবী (সা) যেরূপ কঠোরভাবে আল্লাহ তা'আলার ওহীর ভাষায় এ ব্যাপারটি প্রকাশ করেছেন, ইহুদী-খৃষ্টানদের অভিব্যক্তিতে সে কঠোরতা ছিল না। মহানবী (সা) অত্যন্ত পরিস্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন, যদি কেউ যৌন পাপাচারে লিপ্ত হয়, কেউ যদি দুর্বলদের উপর শোষণ-নিপীড়নের মাধ্যমে সম্পদ সঞ্চয় করে, ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে, গরীবদের দুঃখ-কষ্টে সাহায্য-সহযোগিতা না করে কিংবা সুদখোরীতে সারা জীবন লিপ্ত থাকে, তাহলে তাকে এসবের যে কোন একটি পাপ কাজের জন্য হাবিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। এই দোযখের কল্পনা করলেও দেহ-মন কেঁপে ওঠে। এই দোযখ এত নিকটে যে, ইহজীবন শেষে পা বাড়ানো মাত্রই তা সামনে পড়ে। আর ইহজীবনে তা বাহ্যিক বা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় না। কিন্তু দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা সব সময় তা প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা পরকালে পরহেযগারদের জন্য যে বেহেশতের শুভ সংবাদ দান করেছেন, তার আকার আকাশ ও পৃথিবী থেকে অনেক বড়। সেখানে কোন প্রকার আজেবাজে কথাবার্তা হবে না। কারো ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না। যা দেখা বা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা হবে, তা সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করা হবে। অজ্ঞ ও ভাগ্যাহত কুরাইশরা বেহেশত ও সেখানকার প্রাচুর্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত। তাদের এই সন্দেহের ভিত্তি ছিল পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী প্রাচুর্যের প্রতি

লোভ-লালসা। তারা এই পৃথিবীতে বেহেশতের প্রাচুর্য ও সুখ-শান্তি ভোগ করার প্রত্যাশী ছিল। তারা এসব ভোগ করার জন্য কেয়ামত ও পরকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষার পক্ষপাতী ছিল না। মূলত পরকাল ও হিসাব-কিতাবের প্রতি তাদের বিশ্বাসই ছিল না।

কল্যাণ ও অকল্যাণের ধারণা

বিশ্বয়কর ব্যাপার হলো, তৎকালীন আরবে কেয়ামত ও পরকালের হিসাব-নিকাশের ধারণা কেন ছিল না। অথচ পৃথিবীতে কল্যাণ-অকল্যাণের ধারণা যে প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। কোনকালেই এর ব্যতিক্রমটি দেখা যায়নি। মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের কয়েক হাজার বছর আগে প্রাচীন মিসরবাসী পরকালে বিশ্বাস করত। তারা মৃতদের সাথে পরকালের পাথেয় দিয়ে দিত। মৃতদের কাফনের উপর নানা ধরনের দোয়া ও গান লিখে দিত। মিসরীয়রা তাদের উপাসনালয়ের দরজায় পাল্লা, হিসাব-কিতাব, তওবা ও শাস্তির কাল্পনিক ছবি খোদাই করে রাখত। হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল এবং এখনো আছে, পুণ্যবানদের আত্মা নির্বাণ লাভ করে থাকে। আর পাপীদের আত্মা পরজন্মে নিকৃষ্ট প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। তাতে করে হাজার হাজার বছর শাস্তি ভোগের পর পবিত্রতা লাভ করে। এরপর নির্বাণ লাভের জন্য পুণ্যের কাজ করে থাকে। যরথুস্ত্র ধর্মের অনুসারীরাও কল্যাণ-অকল্যাণের ধারণা পোষণ করে তারা ইয়াজ্জদান ও আহরমান নামের দুই মহা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাদের মতে এই পুণ্য ও পাপের দুই মহাশক্তি একে অপরকে পরাভূত করার জন্য সব সময় সংঘাতমুখর। ইহুদী খৃষ্টানরাও ইহজীবনের পর চিরন্তন পরজীবনে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও দয়ায় বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে, এই জীবনে ভাল কাজ করলে পরজীবনে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও পুরস্কার লাভ করবে। আর যারা খারাপ কাজ করবে, তাদের জন্য মহান স্রষ্টার তরফ থেকে পরজীবনে শাস্তি অবধারিত।

সেকালে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আরবরা বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করত। তারা বিভিন্ন জাতির নানা ধরনের লোকের সাথে মেলামেশা করত। এরূপ পরিস্থিতিতে এটা কি করে ধারণা করা যেতে পারে যে, তারা সে জাতির ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে কোনই খবর রাখত না। পরকাল ও পরজীবন সম্পর্কে তারা কিছুই শুনতে পায়নি, এটাই বা কি করে মেনে নেয়া যায়? মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কে তারা কোন চিন্তা-ভাবনা করেনি, এ কথাও মেনে নেয়া যায় না। মরুচারী ও যাযাবর আরবরা স্বভাবগতভাবেই বিশ্বজগতের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার অসীম সত্তার ধারণার অনেকটা নিকটতর ছিল। কারণ তারা দিগন্তহীন মরুভূমিতে যাযাবর জীবন যাপন করত। সেখানে দিনের বেলায় অসহনীয় রোদ আর রাতের বেলায় তমসাস্ফন্ন অন্ধকার বিরাজ করত। এরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে সম্ভবত তারা অদৃশ্য কোনো সত্তাকে কল্যাণকর আর কোনটাকে অকল্যাণকর ধারণা করেছিল। ব্যতিক্রম এতটুকু বলা যায় যে, তারা ধারণা করত কল্যাণ আর অকল্যাণকর সত্তা তাদের প্রতিমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আর এসব প্রতিমাকে তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসাবে গণ্য করত। এ ধরনের মন-মানসিকতার অধিকারী লোকদের মধ্যে কর্মফলের ধারণার প্রভাব সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু কুরাইশরা ছিল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। তারা তাৎক্ষণিক লাভ-লোকসানকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করত। সেকালের আরবে মদ্যপান ও ভোগ-বিলাস ব্যাপক ছিল। এসব কারণে তারা কেয়ামত, পরকালের হিসাব-নিকাশ ও বিচার-আচার স্বীকার করত না। তারা মনে করত

ইহজীবনে যেসব কল্যাণ-অকল্যাণ প্রত্যক্ষ করছি, এগুলোই হচ্ছে কর্মের শাস্তি ও পুরস্কার। ইহজীবনে দুঃখ-কষ্ট কিংবা আরাম-আয়েশ ভোগ করার পর পরজীবনে হিসাব-কিতাব ও শাস্তি কিংবা পুরস্কারের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। আর এজন্যই পবিত্র কোরআনের শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কিত অধিকাংশ আয়াত মক্কায়ে নাযিল হয়। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, মহানবী (সা) যাতে পথভ্রষ্ট কুরাইশদের সৎপথে আনতে পারেন। পৌত্তলিকতার অভিশাপমুক্ত করে যাতে তাদেরকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করতে পারেন।

কুরাইশ ও তাদের সমমনাদের গোমরাহীর শৃংখলমুক্ত করার মহান লক্ষ্যে ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের অনেক প্রতিকূলতার মোকাবেলা করতে হয়েছে। প্রথম দিকে কুরাইশদের শারীরিক নির্যাতনও তাঁদেরকে সহ্য করতে হয়েছে। আপনজনরা শত্রুতা করেছে। এমনকি কোন কোন মুসলমানকে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে সুদূর আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে হয়েছে। সে সময়ের ঘটনাবলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কুরাইশরা মহানবী (সা)-কে যত বেশি দুঃখ-কষ্ট দিত তিনি তার চাইতেও অধিক উদ্যম ও দৃঢ়তা নিয়ে তাদের সৎপথে আনার চেষ্টা করতেন। তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল কুরাইশরা পৌত্তলিকতা ছেড়ে দিক, অশ্লীল আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকুক। তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচিত হোক এবং কেয়ামত ও পরকালের হিসাব-কিতাবের প্রতি আস্থা স্থাপন করুক। এজন্যই মহানবী (সা)-এর নবুয়ত জীবনের প্রথম ক'বছরে নাযিলকৃত পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরকাল ও শেষ বিচার দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু কুরাইশরা বরাবরই এসব সতর্কবাণী শুনে না শোনার ভান করেছে, অস্বীকার করে চলেছে। এ কারণে মহানবী (সা) ও কুরাইশদের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব-কলহ ও সংঘাত লেগেই ছিল। এসবের ভিতর দিয়েই ইসলাম বিজয় লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা সকল বাতিল ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ কথা প্রতি ইঙ্গিত করেই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .

“মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সব ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথ-নির্দেশ ও সত্য ধর্মসহ তাঁর রাসূল পাঠিয়েছেন।” (৯ : ৩৩)

অষ্টম অধ্যায়

চুক্তিপত্র বিনষ্ট থেকে মি'রাজ

বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের প্রতি আহ্বান

কুরাইশদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা), তাঁর অনুসারী ও বনু হাশিমের প্রতি সামাজিক বয়কট তিন বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মুসলমানদের জন্য এ সময়টা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। মক্কার বাইরে এক উপত্যকায় তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত সেখানে তাঁরা নানা ধরনের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের ভিতর দিনাতিপাত করছিলেন। অন্যদের তাঁদের সাথে কথা বলাও নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য নিষিদ্ধ চারটি মাসে (রজব, যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম) আরবদের সকল প্রকার বাহ্যিক শত্রুতার অবসান ঘটত। এই চার মাসের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে আরবের প্রতিটি লোক হত্যা, ডাকাতি, রাহাজানি ও অত্যাচার-নির্যাতন থেকে বিরত থাকত। এই সুযোগে মানুষ নির্ভয়ে দূর-দূরান্ত থেকে হজ্জ ও কা'বাঘর যিয়ারতের জন্য পবিত্র মক্কায় সমবেত হতো। এ সময়ে মহানবী (সা) নযরবন্দীর দুর্গ থেকে বেরিয়ে বহিরাগতদের মধ্যে প্রচার কাজ চালাতেন। তিনি তাদের বেহেশতের শুভসংবাদ ও দোযখের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করতেন। এসব বহিরাগত স্থানীয় লোকজনের মুখে মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের উপর কুরাইশদের নির্মম অত্যাচার-নির্যাতনের কাহিনী শুনত। তাতে তারা সমবেদনশীল হতো এবং রাসূলুল্লাহর প্রতি আরো আকৃষ্ট হতো। এভাবে অনেক বহিরাগত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। নযরবন্দী জীবনে মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীরা যে অসাধারণ ত্যাগ-তিতিষ্কার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, অনেক মক্কাবাসীর মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া হয়। আবু জেহেল ও আবু লাহাবের চাইতে অপেক্ষাকৃত কম নিষ্ঠুর লোকদের মনে এসব ঘটনা বেশ রেখাপাত করে। তারা মহানবী (সা) ও মুসলমানদের ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় হয়ে পড়ে।

শেয়াবে আবু তালেবে নযরবন্দী জীবন

শেয়াবে আবু তালেবে নযরবন্দী মুসলমানরা মক্কাবাসীদের অনাত্মীয় বা দূরের ছিল না। এসব মুসলমানের প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে কুরাইশদের আত্মীয়-স্বজন ছিল। তার উপর দীর্ঘ তিন বছর মুসলমানদের এই নযরবন্দী জীবনে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। মক্কার কিছু লোকের শুরু থেকেই মুসলমানদের এই দুর্বিষহ অবস্থার উপলব্ধি ছিল। কুরাইশদের মধ্য থেকে কিছু লোকের যদি সেই উপলব্ধি না থাকত, তা'হলে মুসলমানদের সেখানে খেতে না পেয়ে নিদারুণ মৃত্যুবরণ করতে হতো। এসব উদারমনা লোকদের কেউ কেউ মুসলমানদের নানাভাবে কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দিত। হিশাম ইবনে আমর ছিলেন

তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মুসলমানদের এই চরম দুর্দিনে অত্যন্ত সহৃদয়তার পরিচয় দেন। রাতে তিনি রান্নাকরা খাবার শেয়াবে আবু তালেবে বন্দী মুসলমানদের পৌঁছে দিতেন। এমনকি কোন কোন সময় তিনি গমভর্তি বস্তা উটের পিঠে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে গিরিপথে ঢুকিয়ে দিতেন। বন্দীরা এসব গমের বস্তা নামিয়ে রেখে উটটি ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে মুসলমানরা নযরবন্দী জীবনের দুর্বিষহ দিনগুলোতে কিছু না কিছু খাবার পেয়ে যেতেন।

হিশাম ইবনে আমর মুসলমানদের প্রতি উপরোক্ত সহানুভূতি প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হননি। মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের নযরবন্দী দীর্ঘায়িত হওয়ায় হিশাম অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তিনি মুসলমানদের মুক্ত করার সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যোহাইর ইবনে আবু উমাইয়ার সাথে দেখা করেন। যোহাইর ছিলেন আবদুল মোত্তালিবের কন্যা সাইয়েদা আতিকার ছেলে। এই দিক থেকে যোহাইর মহানবী (সা)-এর ফুফাতো ভাই ছিলেন। হিশাম যোহাইরকে বললেন :

“হে যোহাইর! এটা কি ধরনের ইন্সারফের কথা, আপনি নিজে পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া করছেন। পছন্দ মতো কাপড়-চোপড় পরছেন। আমোদ-প্রমোদ করার সকল প্রকার উপকরণও আপনার ঘরে রয়েছে। অপরদিকে আপনারই আত্মীয়-স্বজনরা বন্দীদশায় অত্যন্ত দুর্বিষহ জীবন যাপন করছেন। কোন প্রকার বেচাকেনা করতে পারছেন না। এমনকি তাঁরা পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি থেকেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে পড়েছেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ ধরনের ব্যবহার আবু জেহেলের ভাইদের সাথে করা হলে সে কিছুতেই তা মেনে নিত না। আপনার সাথে একমত হতো না।”

এই আলোচনার পর তারা উভয়ে একমত হয় যে, মুসলমানদের ব্যাপারে নির্যাতনের চুক্তিনামাটি নষ্ট করে দিতে হবে। তারা আরো সিদ্ধান্ত নেয় যে, এ ব্যাপারে আরো কিছু লোককে দলে ভিড়াতে হবে। প্রয়োজন হলে তারা যাতে আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। মুতইম ইবনে আদি, আবুল বখতরী ইবনে হিশাম এবং যামআ ইবনে আসওয়াদও এ ব্যাপারে উপরোক্ত দুই ব্যক্তির সাথে ঐকমত্যে পৌঁছায়। তারা পাঁচজন মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, যে করেই হোক, কুখ্যাত চুক্তিনামাটি ছিঁড়ে ফেলতে হবে। দ্বিতীয় দিন যোহাইর ইবনে আবু উমাইয়া কা'বাঘরে আসেন। পবিত্র কা'বাঘর সাতবার তওয়াফ করার পর যোহাইর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন :

“হে মক্কাবাসী! এটা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার যে, আমরা পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া করব। রং-বেরঙের কাপড় পরে নিজেরা সেজেগুজে চলব। অপরদিকে বনু হাশিম ক্ষুধাতুর থাকবে। পরার জন্য এক টুকরো কাপড়ও তাদের জুটবে না। এমনকি তাদের সাথে আমাদের কোন প্রকার লেনদেনও চলবে না। এটা কিছুতেই হতে পারে না। তোমরা পরিস্কার শুনে রাখ, এই নির্যাতনমূলক চুক্তিনামা টুকরো টুকরো না করা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হবো না।”

সেখানে আবু জেহেলও উপস্থিত ছিল। সে যোহাইরের মন্তব্য শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। সেও চিৎকার করে বলে ওঠে, ‘হে যোহাইর! আপনি চুক্তিনামা নষ্ট করতে পারেন না।

আপনি মিথ্যে বলছেন।" এ কথা শুনতেই মুতইম ইবনে আদি আবু জেহেলকে শাসান। অপর দিক থেকে আবুল বখতরী বলে ওঠেন, "আবু জেহেল মিথ্যে বলছে।" তৃতীয় দিক থেকে হিশাম ইবনে আমর আবু জেহেলকে গালিগালাজ করেন। জামআ ইবনে আসওয়াদও আবু জেহেলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এই অবস্থা দেখে আবু জেহেল সতর্ক হয়ে যায়। সে ভাবে, তাদের আচরণ পূর্ব-পরিকল্পিত। তর্ক-বিতর্ক ব্যাপক সংঘর্ষে রূপান্তরিত হওয়ার আশংকায় সে থেমে যায়। এদিকে মুতইম ইবনে আদি চুক্তিনামাটি ছিঁড়ে ফেলার জন্য এগিয়ে যায়। সে হাত বাড়িয়ে দেখে চুক্তিনামার প্রথম বাক্য 'লাক্বাইকা আল্লাহু' বা 'হে আল্লাহ! আমরা উপস্থিত হয়েছি' ছাড়া সব লেখা উই পোকা খেয়ে ফেলেছে।

চুক্তিনামাটি নষ্ট করার পর মহানবী (সা), তাঁর অনুসারী ও বনু হাশিম গোত্রের সকল নযরবন্দী শেয়াবে আবু তালের থেকে বেরিয়ে আসেন। তারা নিজ নিজ বাড়িঘরে চলে যান। সামাজিক বয়কট অবসান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি। তাদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষ পুরোপুরি ছিল। তাঁরা সব সময় মুসলমানদের কাবু করার ষড়যন্ত্রে লেগে থাকত। মুসলমানরাও কুরাইশদের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার জন্য সব সময় সতর্ক থাকতেন।

কুরাইশদের সম্পাদিত চুক্তিনামাটি ছিঁড়ে ফেলার ব্যাপারে চরিতবিদ ও তাফসীরকাররা দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কোন কোন চরিতবিদ বলেছেন, যারা মুসলমান ও বনু হাশিমদের সাথে কুরাইশদের সামাজিক বয়কটের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের কয়েকজন মহানবী (সা)-এর নিকট গিয়ে প্রস্তাব করেন, "আপনি আমাদের প্রতিমাদের কিছু অধিকার স্বীকার করে নিন। অন্তত অঙ্গুলির ইশারায় প্রতিমাদের তওয়াফ করুন। কুরাইশদের অন্যায় আচরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে এতটুকু করা আপনাদের জন্য কল্যাণকর হবে।" তাদের এ ধরনের অনুরোধ-উপরোধে মহানবী (সা) কিছুটা আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি মনে মনে ভাবেন, "তাদের সাথে এতটুকু একতা প্রকাশ করা হলে কি আসবে-যাবে। কারণ আমার উদ্দেশ্য তো মহৎ। আর আল্লাহ তা'আলাও তা ভাল করে জানেন।"

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, হিশাম ইবনে আমর প্রমুখ কুরাইশের সামাজিক বয়কটের চুক্তিনামাটি নষ্ট করার আগের দিন রাতে আরো কয়েকজন কুরাইশকে সঙ্গে নিয়ে মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। তাঁরা কুরাইশদের সাথে একটা মীমাংসায় পৌছার ব্যাপারে ভোর পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করেন। এক পর্যায়ে তাঁরা অত্যন্ত সম্মানের সাথে বলেন, "আপনি আমাদের প্রভু, আমাদের নেতা।" তাদের পীড়াপীড়িতে মহানবী (সা) তাদের কিছু কিছু শর্ত মেনে নেয়ার ব্যাপারে বেশ নমনীয় মনোভাব প্রকাশ করেন। এই পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে ওহী নাযিল হয়:

وَأَنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا . وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا . إِذَا لَتَذَقْنَكَ الْحَيَاةَ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا .

“আমি তোমার প্রতি যা ওহী নাযিল করেছি, তা থেকে তোমার পদস্থলন ঘটাবার জন্য ওরা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে, যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন কর। সফল হলে ওরা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি ওদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে। তুমি ঝুঁকে পড়লে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করাতাম তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পেতে না।” (১৭ : ৭৩-৭৫)

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কারো কারো নিকট পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াতটি গারানিক বা প্রতিমাদের ঘটনা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। কিন্তু হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়র ও হযরত কাতাদা (রা) বলেছেন, উক্ত আয়াতটি কুরাইশদের বয়কটের চুক্তিনামা বিনষ্ট করা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আতা (তাবেয়ী) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আয়াতটির শানে নুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, “তায়েফের বনু সাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে কয়েকটি বিষয় দাবি করে। তার মধ্যে একটি ছিল, মক্কার মতো তায়েফ উপত্যকাকেও হেরেম বা নিষিদ্ধ অঞ্চল ঘোষণা করতে হবে। মক্কার গাছ-গাছালি, পশু-পাখি প্রভৃতির ন্যায় তায়েফের বৃক্ষরাজি, পশু-পাখি প্রভৃতিকে পূত-পবিত্র ও নিষিদ্ধ গণ্য করতে হবে। তায়েফের এসব বন্ধ কিংবা নষ্ট করা চলবে না। মহানবী (সা) বনু সাকীফ প্রতিনিধিদলের এসব দাবি-দাওয়ার কথা শুনে কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। এ সময়ে পবিত্র কোরআনের উপরে উল্লিখিত আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াতটির শানে নুযূল যাই হোক না কেন, এর দ্বারা মহানবী (সা)-এর আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব, আন্তরিকতা ও আত্মিক পূত-পবিত্রতাই প্রমাণিত হয়। সূরা আবাসায়ও মহানবী (সা)-এর এসব অনুপম বৈশিষ্ট্য অন্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে কেন্দ্র করে। অধিকন্তু মহানবী (সা)-এর আদর্শ চরিত্র থেকেও তাঁর শ্রেষ্ঠতম মানব ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মানুষকে পরিষ্কার ভাষায় বলতেন, “আমি তোমাদের মতোই মানুষ। তবে মানুষকে হেদায়েত ও সৎপথ দেখানোর জন্য আমার নিকট আল্লাহ তা‘আলার ওহী নাযিল হয়।” তিনি এ কথাও স্পষ্ট ভাষায় বলতেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাকে রক্ষা না করলে মানুষ হওয়ার দরুন আর পাঁচজন মানুষের মতো আমার থেকেও মানবীয় ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার আশংকা রয়েছে।’

বস্তুত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের সাথে মহানবী (সা) এমন ঘটনারই সম্মুখীন হতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তা‘আলা মহানবী (সা)-কে মানবীয় ভুল থেকে রক্ষা করেন। মহানবী (সা) ছিলেন শ্রেষ্ঠতম বলিষ্ঠ চরিত্র ও মন-মানসিকতার অধিকারী। সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা আবাসা কিংবা অন্য যে সব আয়াতে মহানবী (সা)-এর ভুল-ভ্রান্তির সম্মুখীন হওয়া এবং আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক তাঁকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো তিনি অত্যন্ত সততার সাথে মানুষের সামনে অকপটে প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের চাইতে মহানবী (সা) ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাঁরা নিজেদের বিরুদ্ধে কোন কথা কখনো নিজেরা প্রকাশ করেন না। সকল প্রকার অত্যাচার-নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করেন, তবু নিজেদের দুর্বলতা মানুষের নিকট প্রকাশ করেন না।

আবার তাঁরা মানুষের প্রতারণা থেকেও আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। তাঁরা অত্যন্ত সুনিপুণভাবে নিজেদের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখেন। এ ধরনের লোকেরা অত্যন্ত দূরদর্শী হলে, নিজেকে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তিরও শিকার হতে দেন না। কিন্তু মহানবী (সা)-এর মহান চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ছিল বিশ্বের আর পাঁচজন বিরাট ব্যক্তিত্বের চাইতে আলাদা। তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁদের মতো এমনটি করেননি। আল্লাহ তা'আলার বাণী প্রচার-প্রসারের পথে নানা ধরনের দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছেন। এমনকি নিজের ভুল-ভ্রান্তি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে শুধরে দেয়া হলে তিনি তা অকপটে মানুষের নিকট প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার প্রতি তিনি মোটেও দৃষ্টিপাত বা তোয়াক্কা করেননি। বস্তুত সত্যসন্ধ মানুষরা এমন মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করে পারে না। তারা তাঁকে নবুয়ত ও রিসালাতের চাইতে কম মর্যাদার অধিকারী বলে ভাববারই সাহস পায় না।

কুরাইশদের সামাজিক বয়কটের চুক্তিনামা বিনষ্ট হওয়ার পর মহানবী (সা) তাঁর পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদের নিয়ে মক্কায় ফিরে এসে পুনরায় ইসলামের প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মক্কার স্থায়ী বাসিন্দাদের ছাড়াও নিষিদ্ধ মাসগুলোতে কা'বাঘরের বহিরাগত যিয়ারতকারীদের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছাতেন। তাদের সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাতেন। এ সময়ে মহানবী (সা)-এর নবুয়তের আলোচনা সারা আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা তখনো মক্কার বাইরে খুব বেশি ছিল না। কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে পুনরায় কঠোরতা আরম্ভ করে। এ সময়ও তারা কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে নিরাপদ ছিল না।

আবু তালেব ও হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তেকাল

শেয়াবে আবু তালেবে বন্দী জীবন থেকে বাড়িঘরে ফিরে আসার পর একই বছর মহানবী (সা) দু'টি মর্মান্তিক ঘটনার সম্মুখীন হন। এই দু'টি ঘটনায় তিনি অত্যন্ত মর্মান্ত হন। এর একটি ছিল নশ্বর পৃথিবী থেকে আবু তালেবের চিরবিদায়। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছরেরও কিছু বেশি। আবু তালেবের শারীরিক অবস্থা খারাপ দেখে কুরাইশরা প্রমাদ গোণে যে, এরপর হয়তো তাদের ও মহানবী (সা)-এর অনুসারীদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। বিশেষ করে হযরত হামযা (রা) ও হযরত ওমরের মতো বীরদের শৌর্যবীর্যে কুরাইশরা রীতিমতো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের একটি প্রতিনিধিদল এসে আবু তালেবের সাথে দেখা করে। তারা তাঁকে বলে :

“হে আবু তালেব! আমরা আপনাকে কিরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা করি, তা নিশ্চয়ই আপনি অবগত আছেন। আজ আমরা আপনাকে জীবন সায়াহে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ও আপনার ভাতিজার মধ্যকার মতবিরোধ আপনার নিকট লুকায়িত কিছু নয়। আমরা আশংকা করছি, আপনার মৃত্যুর পর এই বিরোধ আরো চরম আকার ধারণ করবে। আপনি তাঁকে ডেকে আমাদের সাথে ভবিষ্যতের জন্য চুক্তি করিয়ে দিন। তাতে তিনি ও আমরা একে অপরের দিক থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত থাকতে পারব। ব্যাপারটা বিরাট কিছু নয়। তিনি আমাদেরকে

স্বধর্ম থেকে ফিরানোর চেষ্টা করবেন না। আমরাও তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদের তাঁদের ধর্মচ্যুত করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকব।”

ইতিমধ্যে মহানবী (সা) নিজেই সেখানে উপস্থিত হন। তাঁর নিকট কুরাইশদের প্রস্তাব পেশ করা হয়। তিনি তাদের প্রস্তাবের ধরন সম্পর্কে অবগত হয়ে বলেন:

“তোমরা শুধু একটি কথায় আমার সাথে একমত হও। দেখবে, আরব-অনারব সবাই তোমাদের অধীন হয়ে যাবে।”

মহানবী (সা)-এর এ কথা শুনে আবু জেহেল বলল, একটি নয়--দশটি কথা হলেও আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তবে সে কথাটি কি!

মহানবী (সা) বললেন, “তোমরা স্বীকার কর, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। আর তোমরা পৌত্তলিকতা ছেড়ে দাও।”

এ কথা শুনে উপস্থিত কুরাইশদের একজন বলল, আপনি আমাদের অসংখ্য দেবদেবীর পূজা অর্চনা ত্যাগ করে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য বলছেন। আমরা আপনার এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না। কুরাইশরা আরো বলে যে, এই ব্যক্তি আমাদের কোন শর্তই গ্রহণ করবে না। এ কথা বলে তারা সবাই সেখান থেকে চলে যায়। এই ঘটনার পরই আবু তালেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কুরাইশরা মহানবী (সা)-এর সাথে আরো কঠোর আচার-আচরণ শুরু করে। মুসলমানদের উপর নেমে আসে অত্যাচারের স্তীমরোলার।

আবু তালেবের মৃত্যুর কিছুদিন পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-ও ইন্তেকাল করেন। হযরত খাদীজা (রা) সারা জীবন নিজের ভালবাসা, সততা, অমায়িক ব্যবহার ও ঈমানী শক্তি দ্বারা মহানবী (সা)-এর মহান ব্রতে সহযোগিতা করেছেন। কোন কোন সময় নানা জটিল সমস্যায় পড়ে মহানবী (সা)-এর পবিত্র চেহারায় ভাবনা-চিন্তা ও হতাশার রেখা ভেসে উঠত। এরূপ মুহূর্তগুলোতে হযরত খাদীজা (রা)-এর সঠিক পরামর্শে মহানবী (সা) নতুন কর্ম-প্রেরণা ও উদ্যম লাভ করতেন। এমনকি নানা প্রতিকূল পরিবেশ থেকে মহানবী (সা) যখন ঘরে ফিরে হযরত খাদীজা (রা)-এর চোখে-মুখে ঈমান ও আনুগত্যের সজীবতা প্রত্যক্ষ করতেন, তখন তাঁর মনের সকল হতাশা ও বিরক্তি কেটে যেতো। তিনি তাঁর মহান মিশনে নতুন প্রেরণা ও শক্তি লাভ করতেন। কিন্তু আল্লাহর কি মহিমা, আবু তালেবের পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খাদীজা (রা)-কেও দুনিয়া থেকে নিয়ে গেলেন।

পরপর এই দুটি হৃদয়বিদারক ঘটনায় মহানবী (সা)-এর মন-মানসিকতায় কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুত এ ধরনের বিরাট ঘটনায় পৃথিবীর যে কোন অসাধারণ ব্যক্তির নিকট দুনিয়া অন্ধকারময় হয়ে পড়ে।

কুরাইশদের নিপীড়ন বৃদ্ধি

আবু তালেব ও হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তেকালের পর মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন আরো বেড়ে যায়। এই অত্যাচার-নিপীড়নের একটা সাধারণ ঘটনা হলো, একদিন মহানবী (সা) পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক পাপী কুরাইশ যুবক মহানবী (সা)-এর পবিত্র

চোখেমুখে ও মাথায় ধুলাবালি ছুঁড়ে মারে। মহানবী (সা) যুবকটিকে কিছুই বলেননি। তিনি বাড়ি চলে আসেন। হযরত ফাতেমা (রা) মহান পিতার এই অবস্থা দেখে কেঁদে উঠেন। তিনি দ্রুত পানি এনে ধুলা-ময়লা ধুয়ে দেন। সন্তান-সন্ততি, বিশেষ করে কন্যা সন্তানদের কান্না প্রত্যেক পিতার অন্তরেই মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মেয়েদের চোখের প্রতিটি ফোঁটা প্রত্যেক পিতার অন্তরে একটা অগ্নিস্থলিঙ্গের রূপ নেয়। মেয়ের চোখে পানি দেখলে কোন পিতাই নিজেকে সংবরণ করতে পারেন না। তাদের চোখেও অশ্রুবন্যা নেমে আসে। মহানবী (সা)-ও আর পাঁচজন পিতার ব্যতিক্রম ছিলেন না। বরং তিনি তাঁর কন্যাদের প্রতি পৃথিবীর সকল পিতার চাইতে অনেক বেশি স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তিনি তাঁর মাতৃহীনা কন্যার চোখে অশ্রু দেখে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার প্রতি আরো আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। সফলতার উজ্জ্বল আভা তাঁর সামনে আরো উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। তিনি হযরত ফাতেমা (রা)-কে বলেন, 'মা তুমি কেঁদো না। আল্লাহ তা'আলা তোমার পিতাকে হেফাজত করবেন।' মহানবী (সা) কয়েকবার এই বাক্যটি উচ্চারণের পর বললেন, 'আমার দয়ালু চাচা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পর আমার সাথে এরূপ ব্যবহার করা হলো। তিনি জীবিত থাকলে কেউ এরূপ করার সাহস পেতো না।'

তায়েফ সফর

আবু তালেব ও হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তেকালের পর মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন চরম রূপ ধারণ করে। তারা মহানবী (সা)-এর জীবনধারা দুর্বিষহ করে তোলে। একদিন তিনি কাউকে কিছু না বলে তায়েফে চলে যান। সেখানে পৌঁছে তিনি বনী সাকীফ গোত্রকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। তারা মহানবী (সা)-এর আহ্বানে কোন সাড়া দেয় না। তাদের এই অনীহা দেখে তিনি বললেন, "আমাদের এখানে আসা এবং ইসলামের প্রতি তোমাদের আহ্বান করার ব্যাপারটি তোমরা প্রকাশ করো না। কারণ কুরাইশরা ব্যাপারটা জেনে ফেললে আমাকে তিরস্কার করবে।" কিন্তু বনী সাকীফ গোত্রের লোকেরা মহানবী (সা)-এর এই অনুরোধ রক্ষা করেনি। শুধু তাই নয়, তারা মহানবী (সা)-এর প্রতি শহরের গুপ্তা লেলিয়ে দেয়। তারা মহানবী (সা)-কে গালিগালাজ করে এবং তাঁর প্রতি পাথর ছোঁড়ে। তাতে মহানবী (সা) আহত হন এবং তাঁর পবিত্র শরীরের বিভিন্ন স্থান রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। তিনি সেখান থেকে চলে আসেন এবং একটি খেজুর বাগানে আশ্রয় নেন। কিছু সময় বিশ্রাম নেয়ার পর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ করে বলেন:

"হে আল্লাহ! আমার অসহায়তা, ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনা সম্পর্কে তোমার দরবারে ফরিয়াদ করছি। হে রাহমানুর রাহীম! তুমি দুর্বলদের প্রতিপালক। তুমি আমারও প্রতিপালক। তুমি আমাকে কাদের হাতে তুলে দিচ্ছ। তারা তো আমাকে আরো দুর্বল করে দেবে। তুমি কি আমাকে শত্রুদের হাতে তুলে দিচ্ছ? হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার এই অবস্থায়ও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও, তাতেই আমি নিরাপদ মনে করছি। তোমার অনুগ্রহ অসীম! হে আল্লাহ! তোমার যে আলো অন্ধকারকে আলোকিত করেছে, যে আলোতে ইহকাল ও পরকাল নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা লাভ করেছে, আমি সে আলোতে অবস্থান

করার প্রবল প্রত্যাশী। হে পরম করুণাময়! তুমি আমাকে তোমার অভিশাপ ও অসন্তোষ থেকে নিরাপদ রাখ।”

খৃষ্টান ক্রীতদাস আদাস

এ সময়ে মক্কার কুরাইশ সরদার রবীআর ছেলে উতবা ও শায়বা তায়েফে উপস্থিত ছিল। তারা মহানবী (সা)-এর এই দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করছিল। ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও তাদের মনে সহানুভূতির উদ্রেক হয়। তারা দূর থেকে তাদের খৃষ্টান দাস আদাসকে কিছু আংগুরসহ মহানবী (সা)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দেয়। তিনি তাদের এ উপঢৌকন গ্রহণ করেন। ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ বলে আংগুর খাওয়ার জন্য হাত বাড়ান। বিসমিল্লাহ শুনে আদাস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘এই বাক্যটি কি? এটা তো এখানকার বাসিন্দাদের কারো মুখে কখনো শোনা যায়নি? মহানবী (সা) আদাসকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার বাড়ি কোথায় এবং তুমি কোন্ ধর্মের অনুসারী। সে বলল, আমার জন্মস্থান নিনুয়ায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “যে নিনুয়ায় ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষ ইউনুস ইবনে মাত্তা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেখানে তোমার বাড়ি?” আদাস বলল, আপনি ইউনুসকে কি করে চিনেন? মহানবী (সা) বললেন, তিনি আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন এবং আমিও নবী।’ এ কথা শুনে আদাস মহানবী (সা)-এর হাত ও পা চুম্বন করল। রবীআর ছেলেরা দূর থেকে আদাসের এসব আচরণ দেখে আনন্দিত হচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করতে পারেনি। আদাস ফিরে গেলে তারা বলল, হে আদাস! লোকটি তোমাকে ধর্মচ্যুত করে ফেলতে পারে। তোমার ধর্ম এ লোকের ধর্ম থেকে অনেক ভাল।

বনী সাকীফ গোত্রের দুষ্ট লোকদের হাতে মহানবী (সা)-এর অপমান ও লাঞ্ছনা দেখে তায়েফের অনেকে ব্যথিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। নিজ ধর্মেই তারা অটল থাকে।

এদিকে মক্কায় এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ে। মহানবী (সা)-এর মিশনের ব্যর্থতায় কুরাইশরা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তাদের পক্ষ থেকে অত্যাচার-নির্যাতন পূর্বের তুলনায় আরো অনেক বেড়ে যায়।

আরবের বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের প্রতি আহ্বান

মহানবী (সা) আরবের বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের প্রতি আহ্বান অব্যাহত রাখেন। হজ্জের সময় তারা মক্কায় আসত। রাসূল (সা) তাদের নিকট ইসলামের বাণী নিয়ে যেতেন। তাদের বলতেন, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে রাসূল মনোনীত করেছেন। তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ কর। এভাবে তিনি কা‘বায় যিয়ারতে আগত বিভিন্ন আরব গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ করতেন। কিন্তু তাঁর চাচা আবু লাহাব মহানবী (সা)-এর পিছনে ছায়ার মতো লেগে থাকত। তাঁর ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানোর সময় আবু লাহাব চিৎকার করে বলতো, তোমরা এই লোকের কথা শুনবে না। কিন্তু আবু লাহাবের এই উৎপাত সত্ত্বেও মহানবী (সা) তাঁর প্রচার কাজ বন্ধ করেননি। তিনি ঘুরে ঘুরে প্রতিটি গোত্রের

লোকদের নিকট যেতেন। তাদের তাঁবুতে গিয়ে তিনি ইসলাম প্রচার করতেন। তাদের মধ্যে একটি গোত্র ভদ্রতার সাথেই মহানবী (সা)-এর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। বনু হানীফা গোত্র মহানবী (সা)-এর সাথে বেআদবী করে। বনু আমের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে শর্তারোপ করে। তারা বলে, আপনার পর খিলাফতের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দেয়া হলে আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মহানবী (সা) বলেন, এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার ইখতিয়ারে। তিনি যাদের যোগ্য মনে করেন, তাদের উপরই এই মহান দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন। এ কথা শুনে বনু আমের গোত্র ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মক্কার কুরাইশ গোত্র, মক্কার উপকণ্ঠে আদিবাসী ও অন্যান্য যাযাবর আরবরা ইসলামের বিরোধিতায় কেন এরূপ অনমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাদের এই ইসলাম-বিদ্বেষের পিছনে কী সব কারণ কার্যকর ছিল। এ ব্যাপারে প্রথমেই কুরাইশদের কথা উল্লেখ করতে হয়। কুরাইশদের ইসলাম-বিদ্বেষের কারণগুলো পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বনু আমেরের কথাও ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তারা মহানবী (সা)-এর পর রাষ্ট্র-ক্ষমতা দাবি করেছিল। কিন্তু মহানবী (সা) তা আল্লাহ তা'আলার ইখতিয়ারের কথা বলে তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এজন্য তারাও ইসলাম গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তায়েফ হচ্ছে শস্য-শ্যামল ও স্বাস্থ্যকর এলাকা। তা সত্ত্বেও বনু সাকীফ গোত্র দাবি করেছিল তায়েফকে মক্কার সম-মর্যাদা দান করতে হবে। প্রতিমাদের কারণে মক্কাতে যেমন পবিত্র মনে করা হতো, তেমনি লাভ প্রতিমার দরুন তায়েফের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। তায়েফের অধিবাসীদের আশংকা ছিল, ইসলাম গ্রহণ করা হলে, মহানবী (সা)-এর নেতৃত্ব মেনে নেয়া হলে তায়েফে অবস্থিত লাভ প্রতিমার শ্রেষ্ঠত্ব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। অপরদিকে প্রতিমা ছাড়া ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবেও প্রথম থেকেই মক্কার একটা আলাদা মর্যাদা ছিল। এখন আবার নতুন ধর্মের কেন্দ্র হিসাবেও মক্কানগরী একটা নতুন মর্যাদা লাভ করতে যাচ্ছে। আর এসব কিছুর মাধ্যমে কুরাইশদের শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করে নেয়া হবে। তার উপর ছিল বংশগত আচার-অনুষ্ঠান ও নিজেদের দেব-দেবীর শ্রেষ্ঠত্বের আকর্ষণ। এসব কারণে তায়েফবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছিল। আরবের অন্যান্য গোত্রের ইসলাম গ্রহণের পেছনেও এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছিল। তারা নিজেদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং স্থানীয় কিংবা বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ থেকে দূরে সরে থাকত।

হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে বিবাহ

বিভিন্ন আরব গোত্রের ঔদ্ধত্য এবং কুরাইশদের মুসলিম নির্যাতনের ফলে মহানবী (সা) অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এদিকে হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তেকালের দরুন পারিবারিক জীবনে তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। এই নিঃসঙ্গ জীবন মহানবী (সা)-এর হতাশা ও দুশ্চিন্তাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। কারণ হযরত খাদীজা (রা) বিপদ-আপদে মহানবী (সা)-কে অনুপ্রেরণা যোগাতেন। কিন্তু পবিত্র সহধর্মিণীর ইন্তেকালের পর মহানবী (সা)-এর এই অবলম্বনটুকুরও পরিসমাপ্তি ঘটে। হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তেকালের দরুন মহানবী (সা)-এর পারিবারিক জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তিনি তা পূরণ করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিয়ে করার মনস্থ করেন।

তিনি ভাবলেন, একজন সহধর্মিণী গ্রহণ করা হলে হয়তো তাঁর হতাশা কিছুটা লাঘব হবে। তিনি কিছুটা মানসিক প্রশান্তি লাভ করবেন। এ ব্যাপারে তিনি আরো চিন্তা করেছিলেন, যেসব পরিবারের ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে, তিনি তাদের ভিতর কোন পরিবারে বিয়ে করবেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মহানবী (সা) হযরত আবু বকর (রা)-এর কন্যা হযরত আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল তখন মাত্র সাত বছর। এই জন্য বিয়ের পর ন' বছর বয়স পর্যন্ত তিনি পিত্রালয়ে অবস্থান করেন। এ সময়ে মহানবী (সা) বিধবা মুসলিম মহিলা হযরত সওদা (রা)-কে বিয়ে করেন। হযরত সওদা (রা)-এর পূর্ব স্বামী ইথিওপিয়া থেকে ফিরে এসে মক্কায় ইন্তেকাল করেছিলেন। মহানবী (সা)-এর এই দুটি বিয়ের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করলে সহজে অনুমান করা যাবে যে, তাঁর অন্যান্য বিয়ের পিছনে কি ধরনের কারণ ছিল।

মি'রাজ

এ সময়ে (৬২১ খৃস্টাব্দে) মহানবী (সা) মি'রাজে গমন করেন। মি'রাজের রাতে তিনি তাঁর চাচাতো বোন আবু তালেবের কন্যা হযরত হিন্দ ওরফে উম্মে হানী (রা)-এর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। এই ঘটনা সম্পর্কে হযরত উম্মে হানী (রা) বলেছেন, এ দিন সন্ধ্যায় মহানবী (সা) আমাদের ঘরে ছিলেন। এশার নামাযের পর তিনি শয্যা গ্রহণ করেন। আমরাও শুয়ে পড়ি। ফজরের সময় তিনি আমাদের সবাইকে ডেকে ওঠান। আমরা সবাই একই স্থানে ফজরের নামায আদায় করি। নামায অন্তে তিনি বলেন, “উম্মে হানী! এশার নামায তো আমি তোমাদের সবার সাথে এই ঘরেই আদায় করেছি। কিন্তু এরপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছি। সেখানেও নামায আদায় করেছি। সেখান থেকে ফিরে এসে এইমাত্র আমি তোমাদের সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম। মহানবী (সা)-এর এই বাণী শুনে হযরত উম্মে হানী (রা) বললেন, “আপনি কারো নিকট এ কথা প্রকাশ করবেন না। কারণ এ কথা শুনলে মানুষ আপনাকে মিথ্যেবাদী ঠাওরাবে এবং দুঃখ-কষ্ট দেবে।” মহানবী (সা) বললেন, “আল্লাহর শপথ! আমি তা অবশ্যই প্রকাশ করব।”

মি'রাজ আত্মিক না শারীরিক

মহানবী (সা)-এর মি'রাজ ছিল আত্মিক, এই অভিমত পোষণকারীর উপরে উল্লিখিত হযরত উম্মে হানী (রা)-এর হাদীসটি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি বর্ণনাও তাঁরা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে উদ্ধৃত করে থাকেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেছেন, “মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র শরীর অদৃশ্য হয়নি। আল্লাহ তা'আলা শুধু তাঁর আত্মাকে ভ্রমণ করিয়েছেন।” মি'রাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত মুআবিয়া (রা) বলেছেন, “এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে একটি সত্য স্বপ্ন।” আত্মিক মি'রাজের অভিমত পোষণকারীরা পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতও প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করে থাকেন। আয়াতটি হলো:

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ -

“হে নবী! আমি যে স্বপ্ন তোমাকে দেখিয়েছি, তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য।” (১৭ : ৬০)

কেউ কেউ বলেছেন, মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত মহানবী (সা)-এর ভ্রমণ ছিল সশরীরে। মহানবী (সা) মরুভূমি অতিক্রমকালে যেসব ব্যাপার দেখার কথা বলেছেন, এসবকে তারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন (এসব ব্যাপার পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)। তবে মহানবী (সা)-এর আসমানী মি'রাজ বা উর্ধ্বলোকে ভ্রমণ ছিল আত্মিক। কিন্তু অপর একদলের মতে মহানবী (সা)-এর বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ ও আসমানী মি'রাজ উভয়টিই ছিল সশরীরে। এ ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা অনেক বাদানুবাদ করেছেন, যা কয়েক হাজার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। এ সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারা সবার চেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী। আমাদের অনুরূপ অভিমত ইতিপূর্বে কেউ প্রকাশ করেছেন কিনা বলা মুশকিল। কিন্তু নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করার আগে চরিত গ্রন্থরাজিতে এ সম্পর্কে বর্ণিত পুরো চিত্রটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরাটা জরুরী মনে করছি।

সীরাত গ্রন্থাবলিতে বিধৃত মি'রাজের চিত্র

প্রখ্যাত খৃষ্টান প্রাচ্যবিদ দারমিংহাম বিভিন্ন জীবন-চরিত বিষয়ক গ্রন্থ থেকে চয়ন করে মি'রাজের ঘটনা চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এখানে তার অনুবাদ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

রাতের প্রথমার্ধ শেষ হয়েছে। সারা বিশ্বে নেমে এসেছে গভীর নিস্তব্ধতা। পশু-পাখি নিজ নিজ আস্তানায় নীরব নিস্তব্ধ। বাতাসের শনশন রব আর বর্ণাধারার পানির কলকল ধ্বনিও অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। এরূপ এক নীরব সময়ে উঠ উঠ ধ্বনিতে মহানবী (সা)-এর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি উঠে বসলেন। তিনি দেখলেন, হযরত জিবরাঈল (রা) এসেছেন। তার তুষার শুভ্র ললাট জ্বলজ্বল করছে। তাঁর মাথায় কোঁকড়ানো চুল। পরনে হীরা-মুক্তা-পান্না খচিত পোশাক। তাঁর দেহের সাথে দুলাচ্ছে রঙ-বেরঙের অপরূপ অনেক পাখা। তাঁর সাথে ছিল একটি অদ্ভুত ধরনের বাহন--বুরাক। বুরাকের দুই বাহুতেও শকুনের মতো পাখা ছিল। মহানবী (সা)-কে দেখেই বুরাকটি ঝুঁকে গেল। এভাবে সে মহানবী (সা)-কে আরোহণের ইঙ্গিত করছিল। তিনি তাতে আরোহণ করলেন। বুরাক তীরবেগে বায়ুতে উত্তর দিকে উড়ে চলল। বুরাকের সাথে সাথে হযরত জিবরাঈল (আ)-ও উড়ে চললেন। বুরাক চোখের পলকে মক্কার পর্বতমালা আর মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে আল্লাহ তা'আলা সিনাইর যে স্থানে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলছিলেন, সেখানে যাত্রা বিরতি করল। এরপর পৌছাল হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থান বেতেলহামে। সেখান থেকে বুরাক হাওয়ায় উড়ে চলে। এ সময় মহানবী (সা) কিছু অদৃশ্য ধ্বনি শুনতে পান। এসব অস্পষ্ট আওয়াযের মাধ্যমে মহানবী (সা)-কে সফর থেকে বিরত হওয়ার ইঙ্গিত করা হয়। কিন্তু তিনি তখন রিসালাতের এমন উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত যে, বুরাক থামবার কল্পনাও করেননি। তখন তাঁর ধারণা ছিল, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারোরই তাঁর এ বুরাককে থামাবার অধিকার নেই। একমাত্র তিনি যেখানে চাইবেন সেখানে গিয়েই বুরাক থামবে। বুরাক বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছে থেমে যায়।

মহানবী (সা) নিচে অবতরণ করেন এবং বুরাকটিকে একটি পাথরের সাথে বেঁধে রাখেন। “বায়তুল মুকাদ্দাসে তিনি হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা এবং হযরত ঈসা (আ)-এর হায়কলে সুলায়মানীর ধ্বংসাবশেষের উপর নামায আদায় করেন। এরপর তিনি হযরত ইয়াকুব (আ)-এর পাথরে উপবেশন করেন। এবার বুরাক তাঁকে নিয়ে দ্রুতবেগে আসমানের দিকে রওয়ানা দেয়। মহানবী (সা) প্রথম আসমানে পৌঁছান। প্রথম আসমান খাঁটি রূপোর। তারকারাজি সোনার হালকা রশি দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আসমানের দরজায় প্রহরারত ফেরেশতা দাঁড়ানো। যাতে শয়তান উপরে উঠতে না পারে কিংবা কোন জিন যাতে আসমানের গোপনীয় আলাপ-আলোচনা শুনতে না পারে। এই আসমানে হযরত আদম (আ)-এর সাথে মহানবী (সা)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে সালাম দেন। এখানে তিনি অসংখ্য মাখলুককে আল্লাহর তাসবীহ পাঠে মশগুল দেখতে পান। এখান থেকে তিনি অন্য ছয় আসমানে পদার্পণ করেন এবং হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত দাউদ, হযরত সুলায়মান, হযরত ইদরীস, হযরত ইয়াহইয়া, হযরত হারুন এবং হযরত মূসা (আ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। এই আসমানেই তিনি মৃত্যুদূত হযরত আজরাঈল (আ)-কে দেখতে পান। তিনি অত্যন্ত ভয়ংকর আকৃতির। তাঁর দুই চোখের মাঝখানের ব্যবধান হচ্ছে সত্তর হাজার দিনের পথ। তাঁর অধীনে এক লাখ ফেরেশতা রয়েছেন। তাঁরা সবাই এক বিশাল খাতায় জন্মগ্রহণকারী ও মৃত্যুবরণকারীর নাম লিখছিলেন।

“মহানবী (সা) অশ্রুর ফেরেশতাকে দেখতে পান, তিনি সব মানুষের পাপ-তাপ সম্পর্কে কান্না-কাটি করছেন এবং আযাবের ফেরেশতাকে দেখেন, তাঁর মুখমণ্ডল তামার। তিনি একটি আগুনের আসনে বসে আছেন। আগুন তাঁর নিয়ন্ত্রণে। মহানবী (সা) আর একজন ফেরেশতাকে দেখেন, তাঁর অর্ধেক আগুনের তৈরি এবং অপর অর্ধেক বরফের। কিছু সংখ্যক ফেরেশতা তাঁর চারদিকে বসে আল্লাহ তা‘আলার যিকিরে রত ছিলেন। তাঁরা আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি আগুন ও বরফকে একই স্থানে জড়ো করেছ। তোমার সমস্ত বান্দাদেরকে তোমার আনুগত্য বন্ধনে আবদ্ধ করেছ। সপ্তম আসমান হচ্ছে ন্যায়পতি ফেরেশতার নিবাসস্থল। পৃথিবীর চেয়ে বিরাটকায় ঐ ফেরেশতার বিরাট দেহে সত্তর হাজার মাথা রয়েছে। প্রতিটি মাথায় সত্তর হাজার মুখ রয়েছে। প্রতিটি মুখে সত্তর হাজার মুখগহ্বর রয়েছে। প্রতিটি মুখগহ্বরে সত্তর হাজার রসনা এবং প্রতিটি রসনায় সত্তর হাজার ভাষা। প্রতিটি ভাষায় সত্তর হাজার রকমের ধ্বনি এবং প্রতিটি ধ্বনিতে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা ছাড়া অন্য কিছুই উচ্চারিত হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ তা‘আলার এসব কুদরত দেখতে দেখতে সিদরাতুল মুনতাহার শীর্ষদেশ পর্যন্ত পৌঁছান। আর ‘সিদরাতুল মুনতাহা’ আরশের ডান দিকে অবস্থিত। আরশের উপর লাখ লাখ ফেরেশতার ছায়া পড়ছিল। এখান থেকে মহানবী (সা) আরো উপরের দিকে উড়ে চলেন। বিরাট এক সাগর দেখতে পান। সাগরের পরে দেখেন আলো ও অন্ধকারময় মহাশূন্য। এরপর আগুন, পানি ও বাতাসের স্তর পার হয়ে এগিয়ে চলেন। প্রতিটি স্তরের মধ্যবর্তী ব্যবধান হচ্ছে পাঁচশ’ বছরের পথ। কিন্তু মহানবী (সা) আল্লাহর কুদরতে এসব কিছু চোখের পলকে অতিক্রম করেন। এরপর জামালিয়ত, কামালিয়ত, সির, জালালিয়ত ও ওয়াহ্‌দানিয়তের স্তর অতিক্রমকালে মহানবী (সা) সত্তর হাজার ফেরেশতাকে সেজদাবনত অবস্থায় দেখতে পান। তাদের নড়াচড়ার শক্তি নেই। বাকশক্তিও রহিত। এখানে এসে পরম

করুণাময়ের অবস্থান খুবই নিকটে বলে আঁচ করতে পেরে মহানবী (সা) ভয়ে কেঁপে উঠেন। মর্ত্য ও আকাশ যেন তাঁর নিকট একাকার হয়ে আসে। এসব যেন মহাশূন্যের সীমাহীন অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছিল। সমগ্র বিশ্বকে বিরাট শস্যক্ষেত্রে ছিঁটানো একটি তিল-বীজের মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। এ সময় তিনি আরো অনুভব করেন, মানুষেরও আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফেরেশতাদের মতো অনুগত সেজদাবনত থাকা উচিত।

“এরপর মহানবী (সা) আরশের দিকে এগিয়ে যান। আরশ থেকে দুই ধনুক কিংবা তার চেয়েও নিকটে পৌঁছান। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার নূর প্রত্যক্ষ করেন। এ সময় তিনি এমন অবস্থা অনুভব করেন যা প্রকাশের অতীত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক হাত মহানবী (সা)-এর বুকে ও অপর হাত তাঁর কাঁধে রাখেন। তাতে তিনি অত্যন্ত শীতলতা অনুভব করেন। মনে হলো তাঁর পিঠে যেন বরফ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। তাতে তিনি প্রশান্তি অনুভব করেন। মুহূর্তের জন্য নিজেকে আল্লাহতে বিলীন মনে করেন। পারস্পরিক কথোপকথন হয়। কিন্তু এই আলাপ-আলোচনার যথার্থতা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরাজিতে কোন মন্তব্য করা হয়নি। এ সময় আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। এই বিধান নিয়ে মহানবী (সা) আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে ফিরে আসেন। ফেরার পথে নিচের আসমানে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। এই বিধানের কথা শুনে তিনি মহানবী (সা)-কে সাবধান করেন। হযরত মূসা (আ) বলেন, ‘আপনি কি আশা করতে পারেন যে, আপনার অনুসারীরা দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারবে? আমি এ ব্যাপারে বনী ইসরাঈলদের পরীক্ষা করেছি। তারা পারেনি। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি ফিরে যান এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে নামায কমিয়ে আনুন।’ মহানবী (সা) ফিরে যান এবং তাঁর অনুরোধে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ ওয়াক্তে নামিয়ে দেন। হযরত মূসা (আ) আরো কম করার জন্য মহানবী (সা)-কে আল্লাহ তা'আলার দরবারে পাঠান। এভাবে মহানবী (সা) কয়েকবার আল্লাহ তা'আলার দরবারে যাতায়াত করেন এবং নামাযের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে পাঁচ ওয়াক্ত হয়।

এরপর হযরত জিবরাঈল (আ) মহানবী (সা)-কে বেহেশতের দিকে নিয়ে যান, যা মুত্তাকী বান্দাদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। বেহেশত ভ্রমণ শেষে পৃথিবীর দিকে নিয়ে আসেন। বুরাক খুলে মহানবী (সা) তাতে আরোহণ করেন এবং এ ডানাবিশিষ্ট বাহনে করে প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসে এবং পরে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ইবনে হিশামের বর্ণনা

আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, মি'রাজ সম্পর্কিত উপরোক্ত ভাষ্য হচ্ছে দারমিহামের। তিনি তা বিভিন্ন চরিত গ্রন্থ থেকে সংকলন করেছেন। এসব ঘটনা কম-বেশি সব চরিত গ্রন্থেই রয়েছে, কিন্তু উপরোক্ত সংকলনে ইবনে হিশামের একটি বর্ণনা বাদ পড়ে গেছে। তিনি প্রথমে আসমানে হযরত আদম (আ)-এর সাথে মহানবী (সা)-এর সাক্ষাত সম্পর্কে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে :

মহানবী (সা) বলেছেন, “প্রথম আসমানে হযরত আদমের সাথে সাক্ষাতের সময় সেখানে আমি কিছু লোক দেখতে পেলাম। উটের মুখাকৃতির সাথে তাদের মুখাবয়বের বেশ সাদৃশ্য

রয়েছে। তাদের হাতে রয়েছে অঙ্গার। তারা এসব অঙ্গার খাচ্ছে। আর তাদের মলদ্বার দিয়ে তা বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকারী। এরপর আরো কিছু লোককে দেখলাম, যাদের মতো লোক আমি কখনো দেখিনি। তাদের পেট ছিল বিরাট। মানুষ যখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় পাগলা উটের মতো তাদের পেট মাড়িয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা তা সরিয়ে নিতে সমর্থ হচ্ছিল না। জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা হচ্ছে সুদখোর। আর একদল লোককে দেখলাম তাদের সামনে চমৎকার টাটকা গোশত ও শুকনো দুর্গন্ধময় গোশত পাশাপাশি রাখা হয়েছে। কিন্তু তারা টাটকা তরতাজা গোশত না খেয়ে দুর্গন্ধময় গোশত খাচ্ছে। জিবরাঈল (আ) বললেন, এসব লোক নিজের হালাল দ্বী ছেড়ে যাদেরকে আল্লাহ তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন সেসব মেয়ে লোকের কাছে গমন করে। এরপর আমি কিছু মেয়েলোক দেখলাম তাদের স্তনদ্বয় বেঁধে লটকিয়ে রাখা হয়েছে। জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এসব মেয়েলোক তাদের অবৈধ সন্তানকে নিজের স্বামীর ঔরসজাত বলে পরিচয় দিত। এরপর জিবরাঈল (আ) আমাকে বেহেশতে নিয়ে যান। সেখানে এক অপরূপ সুন্দরী বালিকা দেখতে পেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার জন্যে হে? সে বলল, আমি যায়েদ ইবনে হারিসার জন্যে। রাসূলুল্লাহ (সা) মি'রাজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যায়েদকে এই সুসংবাদ প্রদান করেন।

মি'রাজ সম্পর্কে সীরাতে ইবনে হিশাম ছাড়া অন্যান্য চরিত ও তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থরাজিতেও অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঐতিহাসিকদের প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা করার অধিকার রয়েছে। তাঁরা মূল্যায়ন করে দেখতে পারেন কোন্টি সঠিক আর কোন্টি সুধারণার বশবর্তী হয়ে তৈরি করা হয়েছে। এখানে এ ব্যাপারে অধিক গবেষণা করা বা এর সবকিছু বর্ণনার অবকাশ নেই। তাই 'ইসরা' বা বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ এবং মি'রাজ বা উর্ধ্বলোকে গমন কি আত্মিক ছিল, না শারীরিক ছিল, নাকি মি'রাজ ছিল আত্মিক এবং ইসরা ছিল শারীরিক এ সবার মূল্যায়নের আমাদের উপায় নেই। কারণ এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ইসলামী গবেষক-চিন্তাবিদদের মধ্যে একাধিক অভিমত রয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের অভিমতের সমর্থনেই প্রমাণাদি রয়েছে। আমরা এসব অভিমতের একটি সমর্থন এবং অপরটি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। কারণ যারা ইসরা ও মি'রাজ উভয়টিই আত্মিক বলেন, তাদের নিকটও একাধিক প্রমাণ রয়েছে। পূর্বে তাদের কিছু প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া পবিত্র কোরআনের এবং মহানবী (সা)-এর পবিত্র যবানে উক্ত নিম্নোক্ত আয়াতটিও তাঁরা প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করে থাকেন :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔

“(হে রাসূল!) বল, আমি তোমাদের মতই মানুষ, (পার্থক্য শুধু এই যে,) আমার নিকট ওহী নাযিল হয়, নিশ্চয়ই তোমাদের মাবুদ একমাত্র আল্লাহ।” (১৮ : ১১০)

তাঁরা আরো বলেন, পবিত্র কোরআনই হচ্ছে মহানবী (সা)-এর একক মু'জিয়া। এরপর আর অন্য কোন মু'জিয়ার প্রয়োজনই নেই :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ -

“আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।” (৪ : ৪৮)

যারা পবিত্র কোরআন ছাড়া মহানবী (সা)-এর অন্য কোন মু‘জিয়ার কথা অস্বীকার করেন, তাদের নিকট বিরাট দায়িত্ব হচ্ছে ইসরা ও মি‘রাজের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা। এই সঙ্গে তাদের নিজেদের অভিমতের যথার্থতাও প্রমাণ করতে হবে। বস্তুত এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা আমাদের অভিমতের ব্যাখ্যা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। ইতিপূর্বে অন্য কেউ এ অভিমত প্রকাশ করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই।

মি‘রাজ ও অদ্বিতীয় সত্তা

মহানবী (সা)-এর আত্মিক মি‘রাজের মর্যাদা শারীরিক মি‘রাজের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। ন্যায়নিষ্ঠ যুক্তিবাদীদের প্রমাণাদির সাহায্যে মূল্যায়ন করা হলে তা উপলব্ধি করা যাবে। বস্তুত ইসরা ও মি‘রাজে মহানবী (সা)-এর পবিত্র আত্মা জড়জগতের বন্ধনমুক্ত হয়ে একত্ববাদের সত্তায় বিলীন হয়ে যায়। এরপর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বজগতের সবকিছু মহানবী (সা)-এর পবিত্র আত্মার দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। এই দর্পণে তিনি প্রত্যক্ষ করেন, পুণ্য ও সত্য মানুষকে চরমোৎকর্ষের দিকে নিয়ে যায়। অপরদিকে পাপ ও অন্যায়-অসত্য অধঃপতনের দিকে টেনে নেয়। আর বাতিল ও অসত্যের উপর কল্যাণ ও সত্য প্রাধান্য লাভ করে। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের এই অনুধাবন-শক্তি দান করেছেন, কেবল তাঁরাই তা উপলব্ধি করতে পারেন। সাধারণ মানুষদের পক্ষে সে স্তরে পৌঁছা সম্ভব নয়। এজন্য মহানবী (সা)-এর অনুসারীদের মধ্যে যারা সে স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হননি, তাদের ব্যাপারে বিম্বিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ চিন্তার স্তর ও উপলব্ধি-শক্তির ক্ষেত্রে সব মানুষ সমান নয়। প্রত্যেক মানুষই কেবল তার স্বভাবজাত যোগ্যতা ও উপলব্ধি-শক্তি অনুযায়ী সফলতা লাভ করতে পারে।

এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য আমরা অন্ধের হাতি দেখার কাহিনী উল্লেখ করতে পারি। যদিও আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে উক্ত কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই, তবু নিছক দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করাতে কোন ক্ষতি নেই। কাহিনীটি হলো, একদল অন্ধ একটি হাতির আশেপাশে জড়ো হয়। তাদের মধ্যে যাদের হাতে হাতির লেজ পড়েছে, তারা বলেছে হাতি হচ্ছে রশির মতো। যাদের হাত হাঁটুতে পড়েছে, তাদের মতে হাতি হচ্ছে গাছের কাণ্ডের মতো। যাদের হাত দাঁতে পড়েছে তারা বলেছে, হাতি হচ্ছে বর্শার মতো। শুঁড়ে যাদের হাত পড়েছে, তাদের অভিমত হলো, হাতি হচ্ছে কম্পমান সুন্দর স্তম্ভের মতো। মি‘রাজ সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনেকটা অন্ধদের হাতি দেখার মতো। প্রকৃতপক্ষে আমরা মি‘রাজের সত্যিকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নই করতে পারিনি।

মহানবী (সা) মি‘রাজে আল্লাহ্ তা‘আলার সত্তার সাথে পরিচিত হন। তিনি স্থান-কালের ব্যবধান চোখের পলকে অতিক্রম করেন। আদি ও অন্ত তাঁর নিকট খুবই সামান্য ব্যবধান হিসাবে প্রতিভাত হয়। স্থানের বন্ধনমুক্ত হয়ে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পৌঁছান। সেখান

থেকে পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করেন। ফলে পৃথিবীর কোন বস্তুই তাঁর দৃষ্টি থেকে লুক্কায়িত থাকে না। মি'রাজের ঘটনায় এই বিরাট গুপ্ত রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু মহানবী (সা) ছাড়া অন্যরা মি'রাজের তাৎপর্য সম্পর্কে নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টির আলোকে চিন্তা-গবেষণা করেছেন। ফলে তারা মি'রাজের অন্তর্নিহিত রহস্যে পৌঁছতে সক্ষম হননি। মি'রাজের তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-এর উপলব্ধি আর অন্যদের উপলব্ধিকে একটি বিরাট দেহ ও তার মধ্যকার একটি অতি ক্ষুদ্র বস্তুর সাথে তুলনা করা যায়। আর এটা স্বীকৃত ব্যাপার যে, বিরাট দেহের সাথে তারই ভিতরের অতি ক্ষুদ্র বস্তুর কোন তুলনাই হয় না। যে দৃষ্টি শুধু কোন ক্ষুদ্র বস্তুকে উপলব্ধিবলয়ে আনতে পারে, সে বিরাট দেহ উপলব্ধিকারীকে কিভাবে মূল্যায়ন করবে?

আত্মিক ভ্রমণও মূলত আত্মিক মি'রাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর দ্বারাও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার অন্তর্নিহিত সত্তার উপলব্ধি যা কিনা অনাদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত একই পদ্ধতিতে চলমান। আর মহানবী (সা)-এর সিনাইতে হযরত মূসা (আ)-এর আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথনের স্থান ও হযরত ঈসার জন্মস্থান বায়তুল লাহাম অতিক্রম এবং হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা (আ) প্রমুখের সাথে সাক্ষাত ছিল সকল ধর্মের অভিনুতার নিদর্শন। কারণ তাঁদের সবার ধর্মীয় নীতিমালার উপাদান এমন এক পদার্থ, যা সফলতা ও পরিপূর্ণতার আলোকবর্তিকা।

মি'রাজ ও আধুনিক জ্ঞান

বর্তমান যুগের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও আত্মিক ইসরা ও মি'রাজের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। কেননা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সুষ্ঠু শক্তি যত কার্যকর হবে সত্য ও অজানা তথ্য তত প্রকাশিত হবে। বৈজ্ঞানিক মারকানীর আবিষ্কার এক্ষেত্রে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিশ্বের অনাবিষ্কৃত শক্তিই তাঁকে তাঁর আবিষ্কারের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছে, পথপ্রদর্শন করেছে। তিনি বন্দরে নোঙ্গর করা জাহাজে সংযুক্ত বৈদ্যুতিক তারের অপর অংশ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী সিডনীতে স্থাপন করেন। ইথারের তরঙ্গমালার শক্তিতে সিডনীতে স্থাপিত বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। তাতে করে সিডনী শহর আলোকিত হয়। বর্তমানে রেডিওর মাধ্যমে ইথারে ভেসে আসা আওয়ায শোনা যায়। এমনকি লেখা এবং বক্তৃতার সাথে বক্তার ছবিও দেখা যায়। অথচ কিছুদিন আগ পর্যন্ত বিজ্ঞানের এসব আবিষ্কার ছিল কল্পনাভিত ব্যাপার। ভবিষ্যতের বিশ্বের এসব লুক্কায়িত শক্তির মাধ্যমে আমরা আরো অনেক অজানাকে জানতে পারব। আমাদের জ্ঞান আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে। আধুনিক বিজ্ঞান আরো প্রমাণ করেছে, অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বস্তুজগতের মতো চিন্তাজগতেও অগ্রগতি হয়ে থাকে।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এসব আবিষ্কারের প্রেক্ষিতে এই তথ্য অযৌক্তিক নয় যে, মহানবী (সা)-এর পবিত্র আত্মা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করেন। এক রাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করান। পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতেও এই তথ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে, “আমি রাসূল (সা)-কে আমার নিদর্শনাবলি দেখিয়েছি।” (১৭ : ১) আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে যেমন উপরে উল্লিখিত বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলো স্বীকার করে, তেমনি

মহানবী (সা)-এর ইসরা ও মি'রাজের বাস্তবতাও স্বীকার করে। এসব স্বীকার না করার পিছনে সঙ্গত কোন যুক্তি নেই। তবে ইসরা ও মি'রাজের যথার্থতা অনুধাবনের জন্য বিশ্ব-তত্ত্বকে স্থান-কালের বন্ধনমুক্ত গণ্য করতে হবে। ক্ষণস্থায়ী যৌবনের মরীচিকা থেকে নিজেকে মুক্ত করে মূলতত্ত্ব বা পরম সত্যের সাথে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা হতে হবে। কেবলমাত্র তখনই কোন মানুষের জন্য পরম সত্য অনুধাবন করা সহজ হতে পারে।

কুরাইশদের ভূমিকা

তৎকালীন অশিক্ষিত আরবদের মি'রাজের তাৎপর্য অনুধাবন করার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যাপারটি প্রকাশ করলে তারা নিজেদের বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী এর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। এমনকি অনেকে যারা প্রথম থেকে মহানবী (সা)-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাসী ছিল, এই ঘটনা শুনে দ্বিধাশ্রিত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ বলাবলি শুরু করে, মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছতে এক মাস সময় লাগে। ফিরে আসতেও সমপরিমাণ সময়ের প্রয়োজন হয়। এরূপ অবস্থায় মহানবী (সা) একই রাতে কি করে বায়তুল মুকাদ্দাস গেলেন এবং ফিরেও আসলেন। এটা সত্যি বিস্ময়কর ব্যাপার। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে কোন কোন মুসলমান ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। একদল হযরত আবু বকরের নিকট গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করে এর সত্যতা জানতে চায়। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, তোমরা কি মি'রাজকে মিথ্যা মনে করছ? তারা বলল, অবশ্যই। আপনি আমাদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট চলুন। তিনি এখন মসজিদেই রয়েছেন। আপনি তাঁকে নিজে জিজ্ঞেস করুন। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, 'আল্লাহর শপথ! যদি রাসূলুল্লাহ (সা) বলে থাকেন, তবে তাই হবে। দিন-রাতের কোন সময়ে তিনি ওহী নাযিল হওয়ার কথা বললে আমি নির্দিধায় তা বিশ্বাস করি। কিন্তু সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মি'রাজের ব্যাপারে তোমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্যি বিস্ময়কর ব্যাপার।'

অবশেষে হযরত আবু বকর (রা) মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। এ সময়ে তিনি মি'রাজের রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস সফরের আলোচনা করছিলেন। মহানবী (সা) মসজিদে আকসা ও এর ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করার সাথে সাথে হযরত আবু বকর (রা) বলে উঠলেন, 'হে রাসূল! আপনি সত্য বলেছেন।' এই দিন থেকে মহানবী (সা) হযরত আবু বকরকে 'সিদ্দীক' বা সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করেন।

শারীরিক মি'রাজ

যেসব লোক মহানবী (সা)-এর সশরীরে বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ সমর্থন করেন, তাঁরা দলীল হিসেবে বলে থাকেন, মি'রাজের ঘটনা বর্ণনার পর কুরাইশরা এবং কিছুসংখ্যক মুসলমানও মহানবী (সা)-এর নিকট সফরের নিদর্শন জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ তারা এত দীর্ঘ পথ এরূপ দ্রুত সফর করার ঘটনা আর কখনও শোনেননি। মহানবী (সা) তাদের দ্বিধা দূর করার জন্য বললেন, "পথে আমি একটি কাফেলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির উট হারিয়ে গিয়েছিল। আমি সেটির সন্ধান বলে দিয়েছিলাম।

অপর একটি বাণিজ্য কাফেলার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের নিকট পানি চেয়ে পান করেছি এবং পানির পাত্রটি ঢেকে দিয়েছি।” এ ঘটনা শোনার পর কুরাইশরা বেশ খোঁজাখুঁজি করে কাফেলা দু’টি বের করে এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। তারা দুটো ঘটনাই স্বীকার করে।

মহানবী (সা)-এর বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ যদি আত্মিক ধরে নেয়া হয়, তাতেও উক্ত ঘটনা দুটো অসম্ভব কিছু নয়। কেননা, স্বপ্নেও মানুষ দূর-দূরান্তের বিভিন্ন স্থান ও সেখানকার ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করে থাকে। আর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা সম্ভব হলে সারা বিশ্ব জগত ভ্রমণকারী মহানবী (সা)-এর পবিত্র আত্মার বেলায় তা বিস্ময়কর কিছু নয়।

মহানবী (সা)-এর বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ যদি আত্মিক ধরে নেয়া হয়, তাতেও উক্ত ঘটনা দুটো অসম্ভব কিছু নয়। কেননা, স্বপ্নেও মানুষ দূর-দূরান্তের বিভিন্ন স্থান ও সেখানকার ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করে থাকে। আর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা সম্ভব হলে সারা বিশ্ব জগত ভ্রমণকারী মহানবী (সা)-এর পবিত্র আত্মার বেলায় তা বিস্ময়কর কিছু নয়।

মহানবী (সা)-এর বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ যদি আত্মিক ধরে নেয়া হয়, তাতেও উক্ত ঘটনা দুটো অসম্ভব কিছু নয়। কেননা, স্বপ্নেও মানুষ দূর-দূরান্তের বিভিন্ন স্থান ও সেখানকার ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করে থাকে। আর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা সম্ভব হলে সারা বিশ্ব জগত ভ্রমণকারী মহানবী (সা)-এর পবিত্র আত্মার বেলায় তা বিস্ময়কর কিছু নয়।

মহানবী (সা)-এর বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ যদি আত্মিক ধরে নেয়া হয়, তাতেও উক্ত ঘটনা দুটো অসম্ভব কিছু নয়। কেননা, স্বপ্নেও মানুষ দূর-দূরান্তের বিভিন্ন স্থান ও সেখানকার ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করে থাকে। আর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা সম্ভব হলে সারা বিশ্ব জগত ভ্রমণকারী মহানবী (সা)-এর পবিত্র আত্মার বেলায় তা বিস্ময়কর কিছু নয়।

আকাবায় দুটো চুক্তি

মি'রাজের প্রতিক্রিয়া

মি'রাজের সত্যতা সম্পর্কে শুধু কুরাইশদেরই সন্দেহ ছিল না, অনেক মুসলমানও গভীরে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। এসব মুসলমানের মধ্যে অনেকে বেশ কিছুদিন আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মহানবী (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মি'রাজকে কেন্দ্র করে তারা মোরতাদ হয়ে যায়। তাদের ধর্মচ্যুতির ফলে কুরাইশদের পক্ষ থেকে মুসলিম নির্যাতন আরও বেড়ে যায়। এদিকে আরবের অন্যান্য গোত্র থেকেও মহানবী (সা)-এর সাহায্য-সহায়তা লাভের কোন প্রকার আশা ছিল না। কারণ তাদের মধ্যে অনেককে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান হয়। কিন্তু তারা এই আমন্ত্রণে সাড়া দেয়নি। মহানবী (সা)-এর তায়েফবাসীর দুর্ব্যবহারের প্রভাব তখনও কাটেনি। তার উপর তায়েফ থেকে ফিরে আসলে হজ্জের মওসুমে কিন্দা, বনু আমের ও বনু হানীফা গোত্র মহানবী (সা)-এর সাথে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যবহার করে। এসব ঘটনার দরুন মহানবী (সা) কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন।

যেসব লোক ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে মক্কায় আসত, তারাও দেখত মহানবী (সা) অত্যন্ত অসহায় জীবন যাপন করছেন। মুষ্টিমেয় ক'জন মুসলমানের উপর দুর্বিষহ অত্যাচার-নির্যাতন দেখে বাইরের কোন লোক ব্যথিত হয়ে সাহায্য-সহায়তা করলে কুরাইশরা তাদেরও ছেড়ে দিত না। এ জন্য আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরাও মুসলমানদের এড়িয়ে চলত। অপরদিকে হযরত হামযা ও হযরত ওমর (রা)-এর মতো বীর পুরুষরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বনু আবদুল মোত্তালিব ও বনু হাশিম গোত্রীয় বন্ধনের দরুন ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও মুসলমানদের সহায়তা করছিল। এতকিছু সত্ত্বেও মক্কায় কুরাইশদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি-সামর্থ্য ছিল একেবারে নগণ্য। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সহায়তা ছাড়া তাদের কোন কিছু করার শক্তিই ছিল না। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের ঘাবড়ে গিয়ে পুরনো ধর্মে ফিরে যাওয়া বিচিত্র ছিল না। এই নাজুক অবস্থা সম্পর্কে মহানবী (সা) গভীর চিন্তা-ভাবনা করতেন। তিনি নিঃসঙ্গ ও নির্জনে সময় কাটাতেন। এই সঙ্গে কুরাইশদের নির্যাতন বেড়েই চলছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই নিঃসঙ্গতা ও কুরাইশদের নির্যাতন কি মহানবী (সা)-এর দৃঢ়তায় কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল?

বস্তুত দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদে পড়ে অনেক বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকও সাহস হারিয়ে ফেলে, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মহানবী (সা) ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের ব্যাপারে অনমনীয় মনোবলের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দৃঢ় আশা ছিল যে, আল্লাহ

তা'আলা অবশ্যই এ ব্যাপারে তাঁকে সহায়তা করবেন। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে একদিন ইসলাম সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য লাভ করবে। আর তাই কুরাইশদের শত অত্যাচার-নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি নিজের মুখ্য উদ্দেশ্য থেকে এক পাও পিছনে হটেননি। এমন কি পিছনে হটার কল্পনাও করেননি। এরূপ নাজুক পরিস্থিতিতেও তিনি এ সময় পুরো এক বছর পর্যন্ত মক্কার বাইরে যাননি। এ সময় হযরত খাদীজা (রা)-এর রেখে যাওয়া এবং নিজের সব ধন-সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের প্রত্যাশী ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর অটল আস্থা ছিল। তিনি দৃঢ় আশা পোষণ করতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন। আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা হজ্জের মওসুমে মক্কার আসত। মহানবী (সা) এসব নবাগতের নিকট নিজের রিসালাত ও ইসলামের আমন্ত্রণ জানাতেন। এই আমন্ত্রণে তাদের সাড়া দেয়া-না দেয়া সম্পর্কে তিনি কোন প্রকার চিন্তাই করতেন না। তিনি মনে করতেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে মানুষের নিকট সত্যের বাণী পৌঁছে দেয়া। এর পরবর্তী পরিণাম তিনি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিতেন। কুরাইশদের দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা এ সময়ে তাঁর পিছনে লেগে থাকত। তারা সর্বত্র মহানবী (সা)-কে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গাত্মক উক্তি করে নিজেদের নীচতার পরিচয় দিত। কিন্তু তিনি এসব দুষ্ট লোকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রতি মোটেও আমল দিতেন না। তাঁর দৃঢ় আস্থা ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। সুতরাং এই কাজে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন, মানুষের নিকট ধর্মের বাণী প্রচার করার সময় তাদের সাথে অমায়িক ব্যবহার করতে হবে। তাতে সাধারণ মানুষের মনে রেখাপাত করে। মানুষকে সহজে প্রভাবিত করা যায়। মানুষের সাথে অমায়িক ব্যবহার করা হলে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়, চরম বিদ্বেষীও কল্যাণকামীতে রূপান্তরিত হয়। আর তাই আল্লাহ্ তা'আলা মহানবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন :

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔

“(হে রাসূল!) সুন্দরভাবে জবাব প্রদান কর। তাতে শত্রুও তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হবে।”

বস্তুত ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা)-কে শিক্ষা দান করেন যে, নরম ভাষায় মানুষের সাথে কথাবার্তা বলুন। তাতে তাদের মনে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আকর্ষণ ও ভয়-ভীতির সৃষ্টি হবে। তা'ছাড়া মানুষ অত্যাচার-নির্যাতন করলে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কারণ পরিণামে ধৈর্যধারণকারীই বিজয় লাভ করে থাকে।

ইয়াসরিব থেকে সাহায্য

মক্কার কয়েক বছর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও প্রতীক্ষার পর ইয়াসরিবের দিক থেকে মহানবী (সা)-এর সাহায্য-সহযোগিতার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইয়াসরিবের সাথে মহানবী (সা)-এর কোন প্রকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল না। সেখানে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ছিল। বনু নাজ্জার গোত্র ছিল মহানবী (সা)-এর আত্মীয়। তাঁরা ছিল মহানবী (সা)-এর পিতামহ আবদুল মোত্তালিবের মামার বংশ। আর ছিল একটি মাযার। এটি ছিল মহানবী (সা)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল

মোত্তালিবের মাযার। মহানবী (সা)-এর মাতা হযরত আমেনা তাঁর স্বামীর মাযার যিয়ারত করার জন্য ইয়াসরিব আসতেন। মহানবী (সা) ছ' বছর বয়সে মাযের সাথে ইয়াসরিবে যান। সেখানে পিতার মাযার যিয়ারতের পর তিনি মাযের সাথে মক্কায় ফিরছিলেন। মক্কা ও ইয়াসরিব বা মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে আবওয়া নামক মন্ডিলে পৌঁছে তাঁর মাতা হযরত আমেনা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবওয়ায় তিনি ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং ইয়াসরিব থেকে মহানবী (সা)-এর জন্য সাহায্য আসাটা বিচিত্র বা অসম্ভব কিছু ছিল না। মূলত ইয়াসরিবের সাথে মহানবী (সা)-এর একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল। এ কারণেই মক্কায় অবস্থানকালে বায়তুল মুকাদাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার সময় স্বভাবতই ইয়াসরিবের কথাও মহানবী (সা)-এর স্মরণ হতো। ইয়াসরিবও তাঁকে আকৃষ্ট করত। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াসরিবকেই মহানবী (সা)-এর বিজয়, সাহায্য ও ইসলামের প্রচার-প্রসারের কেন্দ্র হিসাবে মনোনীত করেন।

আওস ও খায়রাজ

প্রাচীনকালে ইয়াসরিবের আওস ও খায়রাজ গোত্র আরবের আর পাঁচটা গোত্রের মতোই পৌত্তলিক ছিল। তারা সেখানকার ইহুদীদের প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করত। কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্ক ভাল ছিল না। কখনও কখনও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বেঁধে যেত।

ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সেকালে বাইজেন্টাইন সম্রাট-শাসিত সিরিয়ার খৃষ্টানদের দৃষ্টিতে ইহুদীরা চরম শত্রু ছিল। তারা মনে করত এই ইহুদী সম্প্রদায়ই হযরত ঈসা (আ)-এর অপমান করেছে। তাঁকে শূলে চড়িয়েছে। এই আক্রোশে সিরিয়ার খৃষ্টানরা প্রতিশোধ নেয়ার জয়বায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইয়াসরিবের ইহুদীদের আক্রমণ করে বসে। কিন্তু তারা ইহুদীদের পরাজিত করতে পারেনি। অবশেষে খৃষ্টানরা ইয়াসরিবের আওস ও খায়রাজ গোত্রকেও নিজেদের দলে টেনে নেয়। এবার তারা ইহুদীদের উপর ইচ্ছামতো প্রতিশোধ নেয়। এবারের আক্রমণে অসংখ্য ইহুদী নিহত হয়। এই ঘটনার পর ইয়াসরিবে ইহুদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আওস ও খায়রাজ গোত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। অথচ এত দিন তাদের শুধু পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। এবার আওস ও খায়রাজরা আরও আগে বাড়ার মনস্থ করল। তারা ইহুদীদের পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে তাদের বিষয়-সম্পত্তি হস্তগত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যুদ্ধ শুরু করার আগেই আওস ও খায়রাজরা অনেকটা সফলতা অর্জন করল। ইহুদীদেরও তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল। তারা আওস ও খায়রাজদের শাসন-শোষণ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য নানা ষড়যন্ত্র শুরু করল। তারা ভাবল, সংঘর্ষে অবতীর্ণ হলে হযরত মূসা (আ)-এর মুষ্টিমেয় অনুসারী ইহুদীরা ইয়াসরিবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কারণ যুদ্ধ শুরু হলে আরবের অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্র আওস ও খায়রাজদের সমর্থনে এগিয়ে আসবে। এরূপ পরিস্থিতি ইহুদীদের নির্ঘাত ধ্বংস ডেকে আনবে। তাই তারা ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিল, যাতে সংঘর্ষও এড়ানো যায় এবং পৌত্তলিকদের উপর নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও টিকিয়ে রাখা যায়। তারা আওস ও খায়রাজ গোত্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়। তাতে এই দুটি পৌত্তলিক গোত্র একে অপরের রক্তপিপাসুর ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সুযোগে ইহুদীরা নিজেদের ভবিষ্যত শংকামুক্ত হয়ে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যে

আত্মনিয়োগ করে। তাতে করে তারা নিজেদের হারানো প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করে। তাদের যেসব বিষয়-সম্পত্তি আওস-খায়রাজরা দখল করে নিয়েছিল, সেগুলো পুনরায় হস্তগত করে।

ইহুদীদের সংস্রবের প্রভাব

ইয়াসরিবে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে সংঘাতমূলক সম্পর্কের কারণ শুধু ক্ষমতা ও পুঁজিই ছিল না, এর পিছনে আর একটা ব্যাপারও কার্যকর ছিল। এক্ষেত্রে শুধু ইয়াসরিবের আওস ও খায়রাজ গোত্রই নয়, সমগ্র আরবের অধিবাসীরা ইহুদীদের সামনে পশ্চাদপদ ছিল। ইহুদীরা ছিল আহলে কিতাব বা কিতাবধারী। এজন্য তারা ধর্মীয় দিক থেকেও আরবের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করত। ইহুদীরা ছিল একত্ববাদী। অপরদিকে তাদের প্রতিবেশী আরবরা ছিল পৌত্তলিক। তারা মনে করত বিভিন্ন দেবদেবী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায়। এজন্য আরবরা তাদের দেবদেবী নিয়ে গর্ব করত। ইহুদীরা আরবদের সাবধান করত, অচিরেই একজন নবী আসবেন। তাঁর মাধ্যমেও ইহুদী ধর্মের প্রচার-প্রসার হবে। কিন্তু দু'টি কারণে আরবদের মধ্যে ইহুদী ধর্মমত প্রসার লাভ করছিল না।

প্রথমত, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে সেকালে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই ছিল। এ কারণেই নিজেদের নিরাপত্তা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা নিয়েই ইহুদীরা সন্তুষ্ট থাকতে চাইত। তারা আরবদের ইহুদী ধর্মমতে দীক্ষিত করার পক্ষপাতী ছিল না। দ্বিতীয়ত, ইহুদী নিজেদের আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্মমতের অনুসারী মনে করত। তারা অন্যদের এই মর্যাদার অংশীদার মনে করা সমীচীন মনে করত না। অপরদিকে ধর্মীয় ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও ইয়াসরিবের আওস ও খায়রাজ গোত্র ইহুদীদের প্রতিবেশী ছিল। তাদের পরস্পরে ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল না। একে অপরের সাথে আলাপ-আলোচনা ও উঠাবসা করত। এসব কাজের মাধ্যমে আওস ও খায়রাজরা ইহুদীদের নিকট তাদের ধর্মীয় আলোচনা শোনার সুযোগ পেত। কিন্তু আরবের অন্যান্য পৌত্তলিকের ইহুদীদের সাথে মেলামেশা করার এরূপ সুযোগ ছিল না। এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, আরবের অন্যান্য পৌত্তলিকের তুলনায় ইয়াসরিবের আওস ও খায়রাজ পৌত্তলিকরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অধিক উপযোগী ছিল। বাস্তবেও দেখা গেছে, ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে অন্যদের তুলনায় তারাই অধিক পরিমাণে ইসলাম গ্রহণের গৌরব লাভ করেছে।

সোয়াইদ ইবনে সামেতের ঘটনা

সোয়াইদ ইবনে সামেত ছিলেন ইয়াসরিবের আওস গোত্রের সদস্য। ভদ্রতা, কবিতা রচনা ও বীরত্বের জন্য তিনি নিজ সম্প্রদায়ে 'কামিল' উপাধি লাভ করেন। সোয়াইদ ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে একবার কা'বাঘরের যিয়ারতের উদ্দেশে মক্কায় আসেন। মহানবী (সা) তাঁর প্রচার-কৌশল অনুযায়ী সোয়াইদকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। সোয়াইদ বললেন, 'আমার নিকট আগে থেকে যে জিনিস আছে, সম্ভবত আপনার নিকটও তাই রয়েছে।' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'তোমার নিকট কি বস্তু আছে।' সোয়াইদ বললেন, 'আমার নিকট লোকমানের উপদেশবাণী রয়েছে।' মহানবী (সা) সেসব কথার কিছু কিছু শোনলেন এবং বললেন, 'কিন্তু আমার নিকট এসবের চাইতেও উত্তম কালাম রয়েছে। আর এসব বাণী আল্লাহ তা'আলা মানুষকে হেদায়েত করার জন্য আমার প্রতি নাযিল করেছেন। এসব বাণী মানুষের

জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এ কথা বলে তিনি পবিত্র কোরআনের একটি সূরা তেলাওয়াত করলেন। এরপর তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানলেন।

পবিত্র কোরআনের এসব আয়াত সোয়াইদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তিনি বললেন, এই বাণী সত্যি উত্তম। ইয়াসরিব বা মদীনায প্রত্যাবর্তনের পর সোয়াইদের মনে পবিত্র কোরআনের বাণী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সোয়াইদ খায়রাজদের হাতে নিহত হন। তাঁর সম্প্রদায় বলেছে, তিনি ইসলামে দীক্ষিত অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।

আয়াস ইবনে মুআয

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদীদের কূটনীতির ফলে ইয়াসরিবের আওস ও খায়রাজ গোত্রের মধ্যে চরম শত্রুতার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে, এই দুটি গোত্র আরবের অন্যান্য গোত্রকে নিজ নিজ পক্ষে টানার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। ইয়াসরিবের খায়রাজ গোত্রের আনাস ইবনে রাফে (আবুল হায়সার) নামক এক ব্যক্তি একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে মক্কায় আসে। এই প্রতিনিধিদলে আয়াস ইবনে মুআয নামের এক ব্যক্তি ছিলেন। তাদের মক্কায় আসার উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের খায়রাজ গোত্রের মিত্র গোত্রে পরিণত করা। রাসূলুল্লাহ (সা) এই প্রতিনিধি দলটি আসার খবর শুনে তাদের নিকট যান। তিনি তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অনুরোধ করেন। মহানবী (সা) তাদের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে শোনান। আয়াস যৌবনকালে একজন ডাকাত ছিলেন। পবিত্র কোরআনের বাণী শুনে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি দলের অন্যান্যকে লক্ষ্য করে বলেন, ‘তোমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তার চেয়ে এই বস্তু অনেক উত্তম।’ কিন্তু দলের অন্যদের মনে কুরাইশদের নিজ পক্ষে নেয়ার চিন্তাই প্রবল ছিল। কারণ তারা ‘বুয়াছ’ যুদ্ধ সম্পর্কে অত্যন্ত শংকিত ছিল। এজন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে তারা চিন্তা-ভাবনা করা কিংবা মনোযোগ দেয়ার বিশেষ সুযোগ পায়নি। তাদের মধ্যে শুধু আয়াস ইবনে মুআযই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইয়াসরিবে ফিরে যান। তবে ইসলামের মাধুর্য তাদের মনেও কিছু না কিছু রেখাপাত করেছিল।

বুয়াছের যুদ্ধ

ইহুদীরা তাদের ষড়যন্ত্রে সফল হয়। আনাস ও তার সাথীদের ইয়াসরিবে ফিরে যাওয়ার কিছু দিন পরই আওস ও খায়রাজ গোত্রে বুয়াছ যুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠে। এক গোত্র অপর গোত্রের নাম-নিশানা নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রতিটি হামলার পরই তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, প্রতিপক্ষের আর কেউ বেঁচে আছে কিনা। যদি জানতে পারত যে, এখনও কিছু জীবিত রয়ে গেছে, তখন আগের চেয়ে আরও প্রবল প্রস্তুতি নিয়ে হামলা চালাতো।

আবু উসায়দ হোযায়র নামের এক ব্যক্তি আওস গোত্রের নেতৃত্ব করছিল। এই লোকটি চরম খায়রাজ-বিদ্বেষী ছিল। যুদ্ধে আওসরা পরাজয় বরণ করে। নিরুপায় হয়ে তারা নজদের দিকে পালাতে শুরু করে। কিন্তু খায়রাজরা পলায়নপর আওসদের পিছনে ধাওয়া করে। পলায়নরত আওসদের মধ্যে আবু উসায়দও ছিল। এক পর্যায়ে সে সওয়ারী থেকে নেমে পড়ে এবং নিজের উরুতে নিজ হাতে একটা বর্শা বসিয়ে দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে। সে চিৎকার করে

বলতে থাকে, “আমি এখান থেকে এক পাও পিছনে যাব না। তোমরা হয় আমাকে হত্যা কর নতুবা খায়রাজদের হাতে তুলে দাও।”

আওসরা তাদের সেনাপতির এই দৃষ্ট ঘোষণা শুনে ফিরে দাঁড়ায়। তারা উল্টো খায়রাজদের উপর প্রচণ্ড বেগে হামলা চালায়। এবার খায়রাজরাই ইয়াসরিবের দিকে পালাতে শুরু করে। আওসরা খায়রাজদের বাড়ি পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে নিয়ে যায়। তাদের বাগ-বাগিচাগুলো ধ্বংস করে এবং বাড়িঘর জ্বালানো শুরু করে। অবস্থা বেগতিক দেখে খায়রাজরা আওস সরদার সাআদ ইবনে মুআয আশহালীর আশ্রয় নেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও উসায়দ ঘোষণা করে, খায়রাজদের প্রতিটি ঘর জ্বালিয়ে দাও। তাদের বাগ-বাগিচায় যেন একটি চারা গাছও অবশিষ্ট না থাকে। কিন্তু আওস গোত্রের আবু কায়েস ইবনে আসলাত নামক এক ব্যক্তি এগিয়ে গিয়ে বলে, “আপন লোকদের ধ্বংস করো না। খায়রাজরা তোমাদেরই ভাই। প্রতিবেশী হিসাবে তারা ইহুদীদের চেয়ে অনেক ভাল।” এ কথা শুনে আওসরা হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করে।

আওস ও খায়রাজরা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সুযোগে ইহুদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা পূর্বের মতো পুনরায় ইয়াসরিবের নেতৃত্ব লাভ করে। কিন্তু আওস ও খায়রাজরা এই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত অনুশোচিত হয়। তাদের নেতৃত্ব বনী ইসরাঈলের হাতে চলে যাওয়ায় তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়। তারা উভয় গোত্র নিজেদের মধ্যে একজন নেতা নির্বাচনের জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু করে। অবশেষে উভয় গোত্র এক ব্যক্তিকে নেতা মনোনীত করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। যুদ্ধে পরাজিত খায়রাজ গোত্রের আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করা হয়। এই লোকটি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন।

ইয়াসরিবে ইসলামের সূচনা

হজ্জের মওসুমে খায়রাজ গোত্রের একটি কাফেলা কাবাঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের নিকট যান। তিনি তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তারা ইহুদীদের সাথে মেলামেশা করছে। ইয়াসরিবে কোন সময় ইহুদী ও তাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হলে ইহুদীরা এই বলে তাদের ভয় দেখাতো যে, “একটু অপেক্ষা কর। একজন নবীর আবির্ভাবের সময় এসে গেছে। তোমাদের আগেই আমরা তাঁর অনুসারী হব। নতুন নবীর অনুসারী হয়ে আমরা তোমাদের নিশ্চিহ্ন করব।”

মহানবী (সা) ইয়াসরিবের এই কাফেলাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানান। মহানবী (সা)-এর এই আমন্ত্রণ শুনে তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে বলে, “আল্লাহর শপথ! ইহুদীরা যে নবী সম্পর্কে আমাদের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করত, তিনি তো সেই নবী! ইহুদীরা আমাদের আগে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলতে পারে। চল আমরা তাদের আগেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করি।” এ কথা বলে তারা মহানবী (সা)-এর আহবানে সাড়া দেয় এবং ইসলাম গ্রহণের গৌরব লাভ করে। তারা মহানবী (সা)-এর খেদমতে আরম্ভ করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের (আওস ও খায়রাজ) কওমের লোকদের মধ্যে চরম শত্রুতা বিরাজ করছে। আমরা আশা করি আল্লাহ তা‘আলা আপনার শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের ভিতরের এই শত্রুতা দূরীভূত করবেন। যদি এরূপ হয়, তাহলে আমাদের উভয় গোত্রের নিকট আপনার চেয়ে সম্মানিত ও প্রিয় ব্যক্তি আর

কেউ হবে না। এই কাফেলায় ইয়াসরিবের বনু নাজ্জার গোত্রের দুইজন লোক ছিলেন। তারা ছিলেন মহানবী (সা)-এর পিতামহ আবদুল মোত্তালিবের আত্মীয়।

ইয়াসরিবে পৌঁছে তারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট প্রকাশ করেন। এই খবর শুনে ইয়াসরিবে আওস ও খায়রাজদের ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। প্রতিটি পরিবারে মহানবী (সা) সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। প্রতিটি পরিবারেই দুই একজন করে ইসলাম গ্রহণের গৌরব লাভ করে। তারা এই ভেবে গর্ববোধ করত যে, তারা এখন আর পৌত্তলিক নেই। ইহুদীদের মতো তারাও একত্ববাদী। এমনকি ইহুদীদের চেয়ে উত্তম ধর্মের অনুসারী।

আকাবায় প্রথম বায়'আত

পরবর্তী বছর হজ্জের মওসুমে বারজন ভাগ্যবান ইয়াসরিব থেকে কা'বাঘর যিয়ারতের জন্য মক্কায় আসেন। মক্কার আকাবা নামক স্থানে তাঁদের সাথে মহানবী (সা)-এর সাক্ষাৎ হয়। এখানে তাঁরা সবাই মহানবী (সা)-এর নিকট বায়'আত হন, ইসলাম গ্রহণ করেন। এই ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে 'আকাবায় প্রথম বায়'আত' নামে খ্যাত। এখানে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কতকগুলো বিষয়ে মহানবী (সা)-এর নিকট প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এগুলো হল, "আমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করব না। চুরি, ব্যভিচার থেকে বিরত থাকব। নিজেদের সন্তানদের হত্যা করব না। কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেব না। বৈধ ও ভাল কাজে আন্তরিকভাবে মহানবী (সা)-এর নির্দেশের অনুসরণ করব।" মহানবী (সা) তাদের উদ্দেশে বলেন, এসব শর্ত পূরণ করা হলে প্রতিদান হিসেবে পরকালে বেহেশত লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। অন্যথা করলে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করবেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার জন্য হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরকে তাঁদের সাথে পাঠিয়ে দেন। তিনি তাঁদের পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিতেন, ইসলামের বিভিন্ন বিধান ও ধর্মের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁদের বোঝাতেন। আকাবায় প্রথম বায়'আতের পর ইয়াসরিবে দিন দিন ইসলামের প্রচার-প্রসার হতে থাকে। হযরত মুসআবও যথাযথভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। ইয়াসরিবের আওস ও খায়রাজরা আন্তরিকভাবে হযরত মুসআবের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিলেন। এই অবস্থা দেখে হযরত মুসআব (রা) অত্যন্ত আনন্দিত হন। পরবর্তী বছর রজব মাসে তিনি মক্কায় আসেন। ইয়াসরিবে ইসলামের প্রচার-প্রসার সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করেন। এই সঙ্গে হযরত মুসআব (রা) আরও বলেন, ইয়াসরিবের মুসলমানরা অত্যন্ত সুসংহত ও সাহসী। এবার সেখান থেকে অনেক মুসলমান মক্কায় হজ্জব্রত পালনের জন্য আসবেন।

হিজরত প্রসঙ্গে

হযরত মুসআবের নিকট ইয়াসরিবের অবস্থা শুনে মহানবী (সা) মনে মনে ভাবেন, 'সেখানে আল্লাহ্র অনুগ্রহে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সেখানকার মুসলমানরা ইহুদীদের নির্যাতন থেকে মুক্ত। মক্কার মুসলমানরা সব সময় কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার

হচ্ছে। কিন্তু ইয়াসরিবে মুশরিকরাও মুসলমানদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার-উৎপীড়ন করে না। মক্কার তুলনায় ইয়াসরিবে জীবনোপকরণ অনেক বেশি। সেখানকার ভূমি আবাদযোগ্য। খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান ছড়িয়ে আছে ইয়াসরিবের সর্বত্র। অবশেষে মহানবী (সা) ভাবলেন, মক্কার মুসলমানরা যদি হিজরত করে ইয়াসরিবে তাদের মুসলিম ভাইদের নিকট চলে যায় তাহলে সেখানে তারা শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে। তাতে করে তারা কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকেও নিষ্কৃতি পাবে। ধর্মের জন্য তাদের আর লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হতে হবে না। মহানবী (সা) মনে মনে এসব কথা চিন্তা করছিলেন। এই সঙ্গে তাঁর আর একটা ব্যাপার মনে পড়ে। ইয়াসরিবের প্রথম কাফেলাটি ইসলাম গ্রহণের সময় মহানবী (সা)-কে বলেছিলেন, ইয়াসরিবে আওস ও খায়রাজ গোত্রের মধ্যে চরম শত্রুতা বিরাজ করছে। আপনার মাধ্যমে যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যকার পারস্পরিক শত্রুতা দূর করে দেন, আমাদের মধ্যে হৃদয়তামূলক সম্পর্ক স্থাপন করে দেন, তাহলে আমাদের নিকট আপনার চেয়ে প্রিয় ও সম্মানিত ব্যক্তি আর কেউ হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি ইয়াসরিবে হিজরত করি, তাহলে এটা কল্যাণকর হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আমার মাধ্যমে উক্ত দু'টি গোত্রের মধ্যে অনৈক্য দূর করে দিতে পারেন। পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ার জন্য মক্কায় আমি আর কত দিন অপেক্ষা করব। মক্কায় কুরাইশদের তুলনায় আমি তো অত্যন্ত দুর্বল। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দূরের কথা, আত্মরক্ষা করার শক্তি-সামর্থ্যও আমার নেই। অতঃপর তাঁর মনে এই ধারণা জাগে যে, বনু হাশিম ও বনু আবদুল মোত্তালিব বড়জোর আমাকে কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু আমি যদি কোন নিপীড়িতের প্রতিকারে এগিয়ে যাই, তা'হলে এ ব্যাপারে তারা আমাকে কোন প্রকার সাহায্য-সহায়তা করতে পারবে না। তা'ছাড়া আমার নিজেকে কুরাইশদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করাই যথেষ্ট নয়, আমার অনুসারীরা রয়েছে। আমার গোত্র তাদের কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে পারছে না।

ঈমানী শক্তি প্রত্যেক মু'মিনকে তার চলার পথের সকল সমস্যার সমাধান করে দেয়। ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান মু'মিন তার বিশ্বাসের পথের সকল বাধা যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে দূর করে। এই পথে তারা ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তি, স্বাধীনতা, এমনকি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না। কেননা, এ পথের দুঃখ-কষ্ট বরণের ভিতর দিয়ে ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তা সত্ত্বেও বিরামহীন ও দীর্ঘায়িত দুঃখ-কষ্ট মন-মানসিকতাকে দুর্বল করে তোলে, মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সত্য অনুসন্ধানের জন্য মানুষ নিজেকে একাগ্রভাবে নিয়োজিত করতে পারে না।

এর আগে মহানবী (সা) তাঁর অনুসারীদের ইথিওপিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেখানকার শাসক খৃষ্টান হলেও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি ভাবলেন, ইথিওপিয়ার চেয়ে মুসলমানদের ইয়াসরিবে হিজরত করাই উত্তম। কারণ ইয়াসরিবের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে মুসলমানও রয়েছে। তারা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে হিজরতকারী মুসলিম ভাইদের সাহায্য করতে পারবে। তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারবে। তা'ছাড়া ইয়াসরিবে স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মকর্মই করা যাবে না, অন্যদের নিকটও ইসলামের মাহাত্ম্য তুলে ধরার সুযোগ পাওয়া যাবে।

আকাবায় দ্বিতীয় বায়'আত

এ বছর (৬২২ খৃ) ইয়াসরিব থেকে মুসলমানদের ৭২ সদস্যবিশিষ্ট একটি কাফেলা কা'বাঘর যিয়ারতের জন্য মক্কায় রওয়ানা হন। তাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন মহিলা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের রওনা দেয়ার খবর শুনে বায়'আত নেয়ার ব্যাপারে আর একটু অগ্রসর চিন্তা-ভাবনা করেন। তিনি ভাবেন, ইসলাম প্রবর্তনের দীর্ঘ ১৩ বছর পরও শুধু নম্রতা ও ধৈর্য ধারণের নীতির উপর নির্ভর করা ইসলামের জন্য কল্যাণজনক হবে না। মুসলমানরা আর কতকাল অন্যদের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হতে থাকবে। এখন থেকে অত্যাচার-নির্যাতন প্রতিহত করতে হবে। সে যা হোক, মুসলমানরা ইয়াসরিব থেকে মক্কায় পৌঁছান। মহানবী (সা) তাদের সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁদের ঈমানী শক্তি পরিমাপ করে তাঁদের সাথে সিদ্ধান্ত নেন যে, হজ্জ ও যিয়ারতের পর তাশরীকের দিনগুলোতে আকাবায়ই তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। নির্দিষ্ট তারিখের শেষ রাতে সবাই সেখানে সমবেত হবেন। ইয়াসরিব থেকে সেবার মুসলমানদের সাথে কিছু মুশরিকও যিয়ারত করার জন্য মক্কায় এসেছিল। কিন্তু মুসলমানরা মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটি মুশরিকদের নিকট গোপন রাখেন। এমনকি সাক্ষাতের দিন নির্ধারিত সময়ে মুসলমানরা এক এক করে কাফেলা থেকে বেরিয়ে আকাবায় এসে জড়ো হন। মহিলা সদস্যদ্বয়ও বৈঠকে উপস্থিত হন। মূলত তাঁরা মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই ইয়াসরিব থেকে মক্কায় এসেছিলেন।

নির্ধারিত সময়ে মহানবী (সা) এসে উপস্থিত হন। মহানবী (সা)-এর সাথে তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিবও ছিলেন। তিনি তখনো কুরাইশদের নীতির সমর্থক ছিলেন। কিন্তু গোত্রীয় বন্ধনের প্রেক্ষিতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন। তাঁর আশংকা ছিল, ইয়াসরিববাসীর কারণে হয়তো কুরাইশরা বনু হাশিমের সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে বসতে পারে। সেরূপ পরিস্থিতিতে ইয়াসরিবের মুসলমানরা আমাদের পক্ষ সমর্থন নাও করতে পারে। এ ব্যাপারটি পরিষ্কার করা এবং ইয়াসরিববাসীর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়ার জন্য হযরত আব্বাস (রা) উক্ত বৈঠকে উপস্থিত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করেন। তিনি নিজেই কথা শুরু করেন এবং খায়রাজদের উদ্দেশে বলেন :

“হে খায়রাজী বন্ধুগণ! আপনারা জানেন, (হযরত) মুহাম্মদ (সা) বনু হাশিম গোত্রের কত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এখনো আমরা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করিনি। আমরা কুরাইশদের প্রচলিত ধর্মেই এখনো অধিষ্ঠিত আছি। তা সত্ত্বেও (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর সমর্থন-সহযোগিতায় আমরা এতটুকু ত্রুটি করিনি। তিনি নিজ গোত্রে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব এবং নিজ শহরেও সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু এখন তিনি আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। আপনাদের শহরে গিয়ে তিনি আপনাদের মধ্যে জীবন যাপন করতে চান। আপনারা যদি তাঁর বোঝা বহন করতে পারেন, প্রয়োজন মুহূর্তে তাঁকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন, তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আর যদি তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়ে শত্রুর নিকট হস্তান্তর করা হয়, তবে আমরা তাঁর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করব না। এরূপ কোন আশংকা থাকলে আপনারা তাঁকে মক্কাতেই থাকতে দিন।”

ইয়াসরিবের লোকেরা বললেন, “হে আব্বাস ! আপনি যা বললেন, আমরা সেসব শুনেছি।”

এরপর মহানবী (সা)-কে লক্ষ্য করে তাঁরা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিজের ব্যাপারে এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে যে কোন প্রতিশ্রুতি আমাদের নিকট থেকে নিতে পারেন। আমরা এর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

মহানবী (সা) পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর তাঁদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দান প্রসঙ্গে বলেন, “আমি তোমাদের নিকট এই শর্তে বায়'আত নিচ্ছি যে, তোমরা নিজেদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মতো আমার হেফাজত বা নিরাপত্তা বিধান করবে।”

বায়'আতের প্রাক্কালে আলোচনা

বারা' ইবনে মার্কুর ইয়াসরিবে তাঁর গোত্রের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম আকাবার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বাঘরের দিক হয়ে নামায পড়তেন। এ ব্যাপারে অন্যান্য মুসলমানের সাথে তাঁর মতবিরোধ ছিল। মক্কায় পৌঁছার পর ইয়াসরিবের মুসলমানরা ব্যাপারটির প্রতি মহানবী (সা)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বারাকে মসজিদে আকসার দিক হয়ে নামায পড়ার নির্দেশ প্রদান করেন। বারা তখন থেকে মহানবী (সা)-এর নির্দেশ পালন শুরু করেন। মহানবী (সা)-এর ভাষণের পরই বারা সামনে এগিয়ে মহানবী (সা)-এর খেদমতে আরয করেন, “হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনি যা কিছু চাচ্ছেন তাতেই আমরা আপনার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছি। আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহের ভিতরেই বড় হয়েছি। হাতিয়ার হচ্ছে আমাদের খেলার উপকরণ। আর এসব আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি।” বারার আলোচনা শেষ না হতেই আবুল হায়ছম ইবনে তাযহান নামের অপর একজন মুসলমান বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদীদের সাথে আমাদের যে চুক্তি হয়েছে, আমরা তা নবায়ন করব না। কিন্তু শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হওয়ার পর আপনি যদি আমাদের নিঃসঙ্গ ফেলে আপনার মক্কার ভাইদের সাথে গিয়ে মলিত হন?” এ কথা শুনে মহানবী (সা) মৃদু হাসলেন এবং বললেন, “যেখানে তোমাদের রক্তপাত হবে, সেখানে আমার রক্তও প্রবাহিত হবে। আমি তোমাদেরই একজন এবং তোমরা আমারই সম্প্রদায়। তোমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করবে, আমিও তাতে অংশগ্রহণ করব। তোমরা যাদের সাথে সন্ধি করবে আমিও তাদের মিত্র হবো।”

মহানবী (সা)-এর মুখে এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবাই বায়'আত হওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়ে। এ সময় তাদের মধ্য থেকে আব্বাস ইবনে উবাদাহ নামের এক ব্যক্তি এগিয়ে আসেন। তিনি সমবেত ইয়াসরিববাসীকে বুঝিয়ে বলেন :

“হে খায়রাজ ভাইসব! তোমরা মহানবী (সা)-এর সাথে অঙ্গীকার করছ, তাঁর বিরোধীদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যদি তোমরা নিজেদের জানমালের ধ্বংস দেখে রাসূলুল্লাহকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে চাও, তাহলে তোমাদের বায়'আত করার কোন অর্থ নেই। তাতে তোমরা ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে অপমানিত হবে। আর যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হও যে, তোমরা যে কোন মূল্যে অঙ্গীকার রক্ষা করবে, মহানবী (সা)-এর সমর্থনে নিজেদের জানমাল সব কিছু উৎসর্গ করতে একটুকু দ্বিধা করবে না, তাহলে তোমরা বায়'আত করতে পার। এই পথে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হবে।”

আব্বাস ইবনে উবাদার বক্তৃতা শুনে সবাই মহানবী (সা)-এর উদ্দেশে বললেন, “আমরা আপনার সমর্থনে জানমাল সবকিছুই কোরবান করব। কিন্তু হে রাসূল! এসবের বিনিময়ে আমাদের কি দেয়া হবে?” মহানবী (সা) বললেন, বেহেশত। এই আলোচনার পর সমবেত ইয়াসরিববাসী বায়‘আতের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। এদিক থেকে মহানবী (সা)-ও নিজের পবিত্র হাত বাড়িয়ে দেন। বায়‘আত পর্ব শেষে মহানবী (সা) বললেন :

“তোমাদের দল থেকে বারজনকে প্রতিনিধি নির্বাচিত কর। তারা তোমাদের দেখা-শোনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আর আমি আমার (মক্কার মুসলমান) জামাআতের পক্ষ থেকে তাদের দেখা-শোনার দায়িত্ব গ্রহণ করছি।”

ইয়াসরিববাসীরা খায়রাজ গোত্র থেকে ন’জন এবং আওস থেকে তিনজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে পেশ করেন। তিনি তাঁদের লক্ষ্য করে বলেন, ‘তোমরা তোমাদের কওমের জন্য ঈসা ইবনে মরিয়মের হাওয়ারী বা প্রতিনিধিদের মতো। আর আমি আমার কওমের পক্ষ থেকে তোমাদের সামনে জওয়াবদিহি করব।’

এরপর বায়আতকারীরা আরো কিছু বিষয়ে অঙ্গীকার করে। তারা বলে, ‘আমরা শপথ করছি যে, সুখ-দুঃখ ও শান্তি-অশান্তি এক কথায় সকল অবস্থায় আমরা আপনার অনুগত থাকব, আপনার নির্দেশ পালন করব। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, মানুষের ব্যঙ্গ-বিদ্বেষের তোয়াক্কা না করে সত্য প্রচার করব।’

গভীর রাতে মক্কার জনপদ থেকে দূরে আকাবা উপত্যকায় এই বায়আত অনুষ্ঠিত হয়। সবার ধারণা ছিল, এ সম্পর্কে মক্কার কেউ কিছুই জানতে পারেনি। কিন্তু বায়আত অনুষ্ঠান শেষে উপত্যকা থেকে বেরুতেই এক ব্যক্তি বলিষ্ঠ কণ্ঠে কুরাইশদের উদ্দেশে বলতে লাগল, ‘সর্বনাশ হয়েছে। (হযরত) মুহাম্মদ ও তাঁর বিধর্মী সাথীরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করেছে।’ লোকটি ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজনে শহর থেকে এখানে এসেছিল। ঘটনাচক্রে সে ব্যাপারটা জেনে ফেলে। সে মুসলমানদের এই পরিকল্পনা বানচাল করার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, সে ইয়াসরিবের মুসলমানদের ভয় দেখিয়ে সম্পাদিত অঙ্গীকার বাতিল ঘোষণার জন্য প্ররোচিত করে। কিন্তু খায়রাজ ও আওসরা লোকটির অশুভ তৎপরতায় মোটেও প্রভাবিত হয়নি। এমনকি তাদের মধ্য থেকে হযরত আব্বাস ইবনে উবাদাহ (রা) এগিয়ে গিয়ে বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! যে মহান সত্তা আপনাকে সত্যবাদী রাসূল করে পাঠিয়েছেন আমরা তাঁর শপথ করে বলছি, আপনি যদি নির্দেশ দেন, তা’হলে সকাল হতেই আমরা মক্কাবাসীর উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাবো।’ মহানবী (সা) বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়নি। এখন আপনারা নিজেদের শিবিরে চলে যান।’ তারা সবাই রাসূলুল্লাহর এই নির্দেশ পালন করেন এবং সকাল পর্যন্ত নিজ নিজ তাঁবুতে আরাম করেন।

কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া

ভোর হওয়ার সাথে সাথে মক্কায় আকাবার বায়আতের কথা ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার পরিণতি সম্পর্কে কুরাইশরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। তাদের কয়েকজন খায়রাজদের শিবিরে গিয়ে বলে, “আমরা তো আপনাদের সাথে যুদ্ধ করার আশা করি না। কিন্তু আপনারা কেন (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি সম্পাদন করেছেন?” ইয়াসরিব থেকে

খায়রাজ গোত্রের যেসব মুশরিক এসেছিল, তারা এই চুক্তি সম্পর্কে কিছুই জানত না। তারা কুরাইশদের সাথে শপথ করে এই চুক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করে। এদিকে মুসলমানরা দেখল, কুরাইশরা শুধু ইয়াসরিবের মুশরিকদের সাথেই এ সম্পর্কে কথা বলছে। তারা এ ব্যাপারে কোন কথা বলল না। নীরব থাকাই সংগত মনে করল। ঘটনার যথার্থতা সম্পর্কে কুরাইশরা দ্বিধাবিহীন হয়ে পড়ল। কিন্তু তারা খোঁজ-খবর নেয়া অব্যাহত রেখেছিল। ইয়াসরিববাসীরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। কুরাইশরা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠার আগেই তারা নিজ নিজ সওয়ারীতে আরোহণ করে ইয়াসরিবের রাস্তা ধরেন। বেশ কিছুক্ষণ পর কুরাইশরা ঘটনার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হয়। তারা ইয়াসরিববাসী মুসলমানদের পিছু ধাওয়া করে। শুধু একজনকে কুরাইশরা আটক করতে সক্ষম হয়। তিনি হলেন হযরত সাআদ ইবনে উবাদা (রা)। কিন্তু মক্কায় জোবায়ের ইবন মুতইম ও হারেস ইবনে উমাইয়া হযরত সাআদের পক্ষপাতিত্ব করে এবং তাঁকে মুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই দুই ব্যক্তি হযরত সাআদকে সমর্থন করার কারণ হলো তারা সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যাওয়ার পথে ইয়াসরিবে হযরত সাআদের আশ্রয়ে থাকত।

ইয়াসরিবে মুসলমানরা মহানবী (সা)-এর সমর্থনে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করেছে। তাতেও কুরাইশরা খুব একটা ভয় পায়নি। কিন্তু এই ঘটনার পর তারা ভবিষ্যতের কথা ভেবে আঁতকে উঠেছে। তারা দীর্ঘ ১৩ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইসলাম প্রচারের বিরোধিতা করে এসেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের ব্যর্থতা এবং মহানবী (সা)-এর দৃঢ়তা ও সফলতাই দেখে এসেছে। তারা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু অত্যন্ত সুনিপুণভাবে রিসালাতের প্রচার করে চলেছেন। অসংখ্য বিপদ-আপদ সত্ত্বেও তিনি কোন প্রকার হতাশা বা ক্লান্তি অনুভব করেননি। তাঁকে কত ধরনের বিপদ-আপদে ফেলা হয়েছে। তাঁর সাথে তাঁর সহযোগীদেরও জীবন যাপন সংকীর্ণ ও দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছে। তাদের অনবরত তিন বছর পর্বত উপত্যকায় নযরবন্দী করে রাখা হয়েছে। এমনকি মক্কাবাসীদেরও নযরবন্দীদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদর্শন করতে দেয়া হয়নি। এখন হিসাব-নিকাশ করে দেখে যে, তাদের সব তীর ছোঁড়া হয়ে গেছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীরা নযরবন্দী জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে ধরা দেবে। নতুন ধর্মকে দূর থেকে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে পৌত্তলিকতায় মিশে যাবে।

কিন্তু না, তা হলো না। তারা বুঝতে পারল, বাতাসের গতি পাণ্টে গেছে। মহানবী (সা) ও ইয়াসরিববাসীদের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি বাতাসের গতিকে এভাবে পরিবর্তন করেছে। আর এই পরিবর্তন কুরাইশদের জন্য স্থায়ী বিপদ এবং মুসলমানদের সফলতার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। কুরাইশরা আশংকা করল, মুসলমানরা হয়তো তাদের শত্রুর (কুরাইশদের) উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, তাদের আক্রমণ করে বসবে। বর্তমান পর্যায়ে আক্রমণ না করলেও তারা বেপরোয়াভাবে আমাদের প্রতিমাদের সমালোচনা করবে। ইয়াসরিবের মুসলমানরা মক্কায় মুসলমানদের সর্বাঙ্গিক সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তাদের সাহায্যে মক্কার মুসলমানরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মকর্ম পালন করবে। অন্যদেরও এই ধর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাবে। তাদের এই ধর্ম আরবে কতটুকু অগ্রগতি সাধন করবে, এখনই কেউ সঠিক বলতে পারবে না। এই বিপ্লব সূচনাতেই দমন করা না হলে ভবিষ্যতে এর প্রবল স্রোতে আমরাও ভেসে যাব। (হযরত) মুহাম্মদ (সা) নিজের বন্ধু-বান্ধব ও সহযোগীদের সাহায্যে আমাদের কারু করে ফেলবেন।

সারকথা, একদিকে কুরাইশরা মহানবী (সা)-এর তাবলীগ বা ধর্মপ্রচার বন্ধ করার জন্য ব্যাকুল ছিল। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও ভাবছিলেন যে, ইয়াসরিবকে কামিয়াবীর ভিত্তিভূমিতে পরিণত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে এখন ইসলামের সফলতা শনৈ শনৈ রবে এগিয়ে যাবে। কিন্তু এই সঙ্গে কুরাইশদের সাথেও আমাদের একটা চরম বোঝাপড়ায় অবতীর্ণ হতে হবে। তাতে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। অবশ্য এই সংঘর্ষ হবে উভয় পক্ষের জন্য জীবন-মরণ সংঘর্ষ। আর সত্যের অনুসারী পক্ষই এই সংঘর্ষে বিজয় লাভ করবে। সুতরাং ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে আমাকে উদাসীন হলে চলবে না। এই কঠিন চলার পথে আল্লাহ তা'আলার সহানুভূতির উপর নির্ভর করতে হবে। মহানবী (সা) মনে মনে আশা পোষণ করলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের ষড়যন্ত্র অতীতের চেয়ে এবার আরো ব্যর্থ করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তবে এই চলায় অত্যন্ত সতর্কতা ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। অন্যদের সাথে অমায়িক ব্যবহার করতে হবে। কারণ অতীতের যে কোন অবস্থা ও পরিস্থিতির তুলনায় এবারের পরিস্থিতি অনেক নায়ুক।

হিজরত ও কুরাইশ

মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীদেরকে কুরাইশদের দৃষ্টি এড়িয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ইয়াসরিবে হিজরত করার সাধারণ অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। কারণ কুরাইশরা জানতে পারলে মুসলমানদের দেশ ত্যাগে বাধা দিতে পারে। মুসলমানরাও মহানবী (সা)-এর নির্দেশ মোতাবেক বিক্ষিপ্তভাবে কিংবা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে হিজরত শুরু করেন। এক পর্যায়ে কুরাইশরা ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলে। তারাও মুসলমানদের অনুসরণ শুরু করে। কোন কোন মুসলমানকে তারা রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে আসে। অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে তাদের ধর্মচ্যুত করার চেষ্টা করে। এমনকি কোন হিজরতকারী মুসলমানের স্ত্রী কুরাইশ বংশীয়া হলে স্বামীর সাথে তাকে যেতে দেয়া হতো না। কিন্তু কোন মুসলমান এই সিদ্ধান্ত না মানলে তার উপর নেমে আসত অত্যাচারের স্টীমরোলার। তাঁকে বন্দী করে রাখা হতো। তবে এ সময়ে কুরাইশরা কোন মুসলমানকে হত্যা করার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেনি। কারণ তারা ভয় করত কোন মুসলমানকে হত্যা করলে গোত্রে গোত্রে গৃহযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। এই আশংকায় তারা কাউকে হত্যার পদক্ষেপ নিত না। এ ছাড়া আর সব রকম অত্যাচারই চালাতো। কিন্তু এত কিছু করেও মুসলমানদের হিজরত বন্ধ করতে পারছিল না। সুযোগ পেলেই মুসলমানরা ইয়াসরিবে হিজরত করতে থাকে।

কিন্তু মহানবী (সা) মক্কায়ই অবস্থান করতে থাকেন। তিনি হিজরত করতে চান, না মক্কায়ই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন এ কথা কেউ জানত না। এর আগে মহানবী (সা) মুসলমানদের ইথিওপিয়ায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু নিজে মক্কায়ই থেকে যান। এখানে অবস্থান করে তিনি ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। এ ব্যাপারটাও মানুষ বিস্মৃত হয়নি। অবশেষে একদিন হযরত আবু বকর (রা) ইয়াসরিবে হিজরত করার জন্য মহানবী (সা)-এর অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহানবী (সা) বললেন, “আবু বকর! তাড়াহুড়ো করবেন না। সম্ভবত এই সফরে আপনি একজন সাথী লাভ করতে পারেন।” হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন মহানবী (সা)-এর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাহাবী। তিনি মহানবী (সা)-এর অনেক গোপন তথ্য জানতেন। মহানবী (সা)-এর মন্তব্য শুনে তিনি নীরব হয়ে যান।

তা সত্ত্বেও মহানবী (সা)-এর সম্ভাব্য হিজরত সম্পর্কে কুরাইশরা অত্যন্ত শংকিত ছিল। ইয়াসরিবে মুসলমানদের সংখ্যাও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে সেখানকার শাসন-ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে চলে আসার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। মক্কার মুসলমানরা হিজরত করে ইয়াসরিবে বসতি স্থাপন করছিল। তাতে সেখানকার স্থানীয় (আনসার) মুসলমানদের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়েই চলছিল। কুরাইশরা ভয় করছিল এরূপ পরিস্থিতিতে যদি মহানবী (সা)-ও ইয়াসরিবে চলে যান, তাহলে অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। মুসলমানরা মক্কা আক্রমণ করে বসতে পারে। কিংবা মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য পথ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। তখন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে কিছুই থাকবে না। না খেয়ে মরার উপক্রম হতে পারে। ইতিপূর্বে কুরাইশরাও মুসলমানদের এরূপ ভয়াবহ অবস্থায় ফেলেছিল। তারা মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারী-সহযোগীদের বয়কট করেছিল। তাঁরা দীর্ঘ তিন বছর শেয়াবে আবু তালেবে অবরুদ্ধ অবস্থায় দিনাতিপাত করতে বাধ্য হন।

কুরাইশরা আশংকা করছিল, (হযরত) মুহাম্মদ (সা) যদি মক্কায় অবস্থান করেন এবং আমরা তাঁকে হিজরত থেকে বিরত রাখি, তাহলে ইয়াসরিববাসী তাদের রাসূলকে উদ্ধারের জন্য মক্কানগরী আক্রমণ করে বসতে পারে। এজন্য তারা মহানবী (সা)-কে হত্যা করে এই বিপদ থেকে নিষ্কৃতির চিন্তা-ভাবনা করে। তাতে আবার আশংকা ছিল, বনী হাশিম ও বনী আবদুল মোত্তালিব মহানবী (সা)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এগিয়ে আসবে। এরূপে মক্কায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। কুরাইশরা এই ব্যাপারটা নিয়ে অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিল না। অবশেষে এ সম্পর্কে পরামর্শ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 'দারুন নদওয়া'য় কুরাইশদের বৈঠক বসল। এক ব্যক্তি পরামর্শ দিল, (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে হাত-পা বেঁধে কারারুদ্ধ করে দরজা বন্ধ করে ফেলে রাখা হোক। তাতে প্রাচীন কবি যোহায়ের ও নাবেগার মতো ভয়ে মারা যাবে। কিন্তু এই পরামর্শ কেউ মেনে নেয়নি। এক ব্যক্তি বলল, তাকে নির্বাসন দেয়া হোক। কিন্তু তাতে আশংকা ছিল, তিনি সহজে ইয়াসরিব চলে যাবেন। সেখান থেকে তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মক্কা আক্রমণ করে বসবেন।

সবশেষে প্রস্তাব করা হয় যে, প্রতিটি গোত্র-উপগোত্রের যুবকরা একত্রিত হয়ে সমবেতভাবে আক্রমণ করে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করবে। তাতে তাঁকে হত্যার দায়িত্ব সব গোত্রের উপর বর্তাবে। বনী আবদে মান্নাফ সবার সাথে একই সময়ে যুদ্ধ করতে সাহস করবে না। অবশেষে হত্যার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে সম্মত হবে। আর কুরাইশরা সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে।

এই প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এই জঘন্য কাজের জন্য কুরাইশরা যুবকদের মনোনীত করে। 'দারুন নদওয়া'র এই সিদ্ধান্তের পর কুরাইশরা মনে করত, এবার আমাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার দিন ঘনিয়ে এসেছে। অচিরেই আমরা (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে আমাদের চোখের সামনে থেকে চিরদিনের জন্য দূর করতে সক্ষম হবো। শুধু তাই নয়, তারা আরো আশা করেছিল, মহানবী (সা)-কে হত্যা করার পর তাঁর ধর্মের প্রতি আহবানও শেষ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে ইয়াসরিবে যারা হিজরত করেছিল, তারা ফিরে আসবে। পুনরায় পূর্বপুরুষের ধর্ম গ্রহণ করবে। তা'ছাড়া কুরাইশদের সংহতির নড়বড়ে ভিত্তিও পুনরায় সুদৃঢ় হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজরত

হিজরতের অনুমতি

কুরাইশদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মহানবী (সা) জেনে ফেলেন। তিনি এও জানতে পারেন, তারা 'দারুন নদওয়া'য় বসে তাঁকে হত্যার নীল-নকশা তৈরি করেছে। তিনি ইয়াসরিবে হিজরত করার পর কুরাইশরা কি ধরনের বিপদে পড়তে পারে, এমনকি খোদা মক্কায় তাদের উপর কি ধরনের বিপদ নেমে আসতে পারে মহানবী (সা)-এর এসব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল। মহানবী (সা)-এর হিজরতের পর কুরাইশদের সিরিয়ার বাণিজ্য পথ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকায় তারা কিরূপ শংকিত ছিল, তিনি (সা) সে খবরও জেনে ফেলেন।

অপরদিকে কুরাইশদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, (হযরত) মুহাম্মদ (সা) সুযোগ পাওয়া মাত্র ইয়াসরিবে হিজরত করবেন। কিন্তু মহানবী (সা) এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। এমনকি স্বয়ং হযরত আবু বকর (রা)-ও মহানবী (সা)-এর হিজরতের দিন-তারিখ ও সময় জানতেন না। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রা) দু'টি উটের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এমনকি তিনি নিজে হিজরত করার জন্য মহানবী (সা)-এর অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহানবী (সা) বলেন :

“হে আবু বকর! তাড়াহুড়ো করবেন না। সম্ভবত এই সফরে আপনি কোন সঙ্গী পেয়ে যাবেন।” অবশ্য মহানবী (সা)-এর বিভিন্ন বাণী থেকে হযরত আবু বকর (রা) বুঝতে পেরেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজরত অবধারিত। কিন্তু দিন-ক্ষণ সম্পর্কে তিনি কোন প্রকার অনুমান করতে পারেননি।

সারকথা, কুরাইশ কর্তৃক হত্যা ষড়যন্ত্র জানা সত্ত্বেও মহানবী (সা) যথারীতি মক্কায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় হিজরতের জন্য শুধু ওহীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ওহীও নাযিল হলো। মহানবী (সা) হযরত আবু বকর (রা)-এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাঁকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করলেন। হযরত আবু বকর (রা) সফরসঙ্গী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর এই আবেদন মন্যুর করেন।

হযরত আলী (রা)-এর জীবন বাজি

এ সময়ে এক বিরল ঘটনা প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাস অনুরূপ আর একটা ঘটনা পেশ করতে পারবে না। বস্তুত এই ঘটনা ছিল সত্যতা ও বিশ্বস্ততার এক অনুপম দৃষ্টান্ত। হযরত আবু বকর (রা) সফরের বাহন হিসাবে দুটো উট আবদুল্লাহ ইবনে উরায়কেত নামের

এক ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে রেখেছিলেন। এই লোকটি মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর (রা)-কে ইয়াসরিব পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নেয়ার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিল। এ কাজের জন্য সে বিনিময় গ্রহণ করেছিল।^১ মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর (রা) উভয়ে জানতেন, মক্কা থেকে বের হওয়ার পর তাঁদের পশ্চাদ্ধাবনের ব্যাপারে কুরাইশরা এতটুকু অবহেলা করবে না। আর এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহানবী (সা) দুটো কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন বোধ করেন। প্রথমটি হলো রাজপথ ছেড়ে ভিন্ন পথে চলা। অপরটি হলো চলাচলের সাধারণ সময় পরিহার করে অন্য সময়ে সফর করা।

মহানবী (সা)-কে হত্যার জন্য নিয়োজিত কুরাইশ যুবকরা নাজ্জা তরবারি হাতে আল্লাহর রাসূলের বাসস্থান অবরোধ করে রেখেছিল। শিকার যাতে হাতছাড়া না হয়, তার জন্য তারা সব সময় সতর্ক ছিল। এদিকে মহানবী (সা) তাঁর চাচাত ভাই হযরত আলী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, তুমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়ো। আমি যে সবুজ চাদরটি রাতে গায়ে দেই, সেটি জড়িয়ে নাও। তিনি হযরত আলী (রা)-কে আরো বললেন, ‘মক্কাবাসীর আমানত রাখা যে সব জিনিস রয়েছে, আমার পর তুমি তাদের সেগুলো ফিরিয়ে দিবে।’

সশস্ত্র কুরাইশ যুবকরা মনে করল মহানবী (সা) তাঁর বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন। তারা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। মূলত মহানবী (সা) তখনো বিছানায় আরাম করছিলেন। রাত তিন ভাগের এক ভাগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি বিছানা থেকে উঠেন এবং নিরাপদে হযরত আবু বকর (রা)-এর বাসস্থানে চলে আসেন। এখানে তিনিও মহানবী (সা)-এর জন্য পথপানে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। মহানবী (সা) হযরত আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তাঁরা শহরের দক্ষিণ দিকে চলতে থাকেন। তাঁরা গারে ছোর গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহানবী (সা)-এর শহর থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে যাওয়াটা ছিল কুরাইশদের নিকট কল্পনাভীত ব্যাপার।

ছোর গুহায়

এ ব্যাপারটি শুধু হযরত আবু বকর (রা)-এর পরিবারের সদস্যরাই জানতেন। হযরত আবু বকর (রা)-এর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রা), দুই কন্যা হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত আসমা (রা) এবং ক্রীতদাস আমের ইবনে ফোহায়রা (রা) ছাড়া অন্য কেউ এই ব্যাপারটি জানত না। হযরত আবদুল্লাহ (রা)-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তিনি সারা দিন শহরে ঘুরে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং সন্ধ্যার দিকে ছোর গুহায় গিয়ে এসব মহানবী (সা)-কে জানিয়ে আসবেন। ক্রীতদাস আমের ইবনে ফোহায়রা (রা) ছোর গুহার আশেপাশে বকরী চরাবেন এবং গোধূলি লগ্নে তাজা দুধ ও বকরীর ভূনা মাংস মহানবী (সা)-এর খেদমতে পেশ করবেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) ছোর গুহা থেকে শহরে ফেরার পর তাঁর পায়ে চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য সে পথেই বকরীর পাল নিয়ে আসা হতো।

মহানবী (সা) হযরত আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে তিনদিন ছোর গুহায় আত্মগোপন করে থাকেন। কুরাইশরা হন্যে হয়ে চারদিকে মহানবী (সা)-কে খুঁজতে থাকে। কুরাইশরা

১. ইবনে হিশাম পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী আবদুল্লাহ ইবনে উরায়কেত প্রাচীন ধর্মের অনুসারী ছিল।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা ভাবে (হযরত) মুহাম্মদ (সা) ইয়াসরিবে পৌঁছতে সক্ষম হলে তাদের পরিণতি অত্যন্ত খারাপ হবে। ছওর গুহায় মহানবী (সা) সকল প্রকার চিন্তামুক্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার যিকিরে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি নিজের বন্দী কিংবা মুক্তির ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেন। আর হযরত আবু বকর (রা) সব সময় বাইরের দিকে শ্রবণশক্তি নিয়োজিত রেখেছিলেন। কুরাইশদের কেউ গর্তের ভিতরে ঢুকে তাঁদের তালাশ করে কিনা সেদিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন।

এরই মধ্যে একদল সশস্ত্র কুরাইশ যুবক অনুসন্ধান অভিযান চালিয়ে ছওর গুহার মুখে এসে উপস্থিত হয়। অদূরে এক রাখাল মেষ চরাচ্ছিল। তারা মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর (রা) সম্পর্কে উক্ত রাখালকে জিজ্ঞেস করে। সে জবাব দিল, হয়তো এই গর্তে থাকতে পারে। কিন্তু আমি নিজ চোখে কাউকে এখানে দেখিনি। হযরত আবু বকর (রা) এসব কথা শুনছিলেন। মেষপালক রাখালের জবাব শুনে তাঁর শরীর ঘর্মসিক্ত হয়ে ওঠে। ভয়ে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। তিনি আল্লাহ তা'আলার উপর পুরো ব্যাপারটা সঁপে দিয়ে বসে পড়েন। এক কুরাইশ যুবক গুহার একেবারে নিকট এসে পড়ে। কিন্তু সে গুহার ভিতরে না তাকিয়েই ফিরে যায়। তার সাথীরা জিজ্ঞেস করে, গুহার মুখে পৌঁছেও তুমি ভিতরে দেখলে না কেন? যুবকটি বলল, আমি কিরূপে তাকাবো। গুহার মুখে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মেরও আগে থেকে মাকড়সা জাল বুনে রেখেছে। দুটো বুনো কবুতর তাদের বাসা বানিয়েছে। গর্তের মুখের অভ্যন্তর অংশে শুকনো ঘাস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এসব দেখে আমার মনে হয়েছে গর্তের ভিতরে কোন মানুষ থাকতে পারে না। আর তাই আমি ভিতরে না তাকিয়েই ফিরে এসেছি।

এই নাজুক মুহূর্তেও মহানবী (সা) আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনারত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) এ সময় অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি নিজেকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র দেহের অত্যন্ত নিকটে নিয়ে আসেন। যদি হামলা হয় তা যেন নিজের উপর দিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) যেন নিরাপদ থাকেন। এ সময় মহানবী (সা) হযরত আবু বকর (রা)-কে কানে কানে বলেন, “আপনি ঘাবড়াবেন না, আমরা একা নই। আমাদের সাথে আল্লাহ তা'আলাও রয়েছেন।”

কোন কোন হাদীস গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা) অনুভব করলেন, অনুসন্ধানকারী কুরাইশ যুবকরা গুহার নিকট চলে এসেছে। তিনি ধীরকণ্ঠে মহানবী (সা)-কে বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের কেউ নিচের দিকে তাকালেই আমাদের দেখে ফেলবে!” হযরত আবু বকর (রা)-এর মুখে এ কথা শুনে মহানবী (সা) বললেন, “আবু বকর! ঘাবড়াবেন না। আমাদের দু'জনের সাথে আমাদের তৃতীয় সাথী আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন।”

কুরাইশ যুবকরা দেখল, ছওর গুহার মুখে গাছের ডাল ছড়িয়ে আছে। এসব ডাল কাটা ছাড়া কারো পক্ষেই ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তাতে তারা বিশ্বাস করে যে, গুহার ভিতরে কোন লোক নেই। এরপর তারা ফিরে চলে যায়। তাদের ফিরে যাওয়ার পদধ্বনি শুনতে পেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হযরত আবু বকরের ঈমান ও বিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। মহানবী (সা) শব্দ করে ‘আল্‌হামদুলিল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’ বলে উঠেন।

গুহার অলৌকিক ঘটনা

গুহার মুখে মাকড়সার জাল, বুনো কবুতরের বাসা এবং গাছের ডাল ছড়িয়ে থাকাকে চরিতবিদগণ মু'জিয়া বা অলৌকিক ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যা হলো, উক্ত গর্তে রাসূলুল্লাহ (সা) আশ্রয় নেয়ার আগে উল্লিখিত একটি বস্তুও সেখানে ছিল না। আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর সাথীকে নিয়ে তাতে প্রবেশের পরই মাকড়সা জাল বুনে, দুটো বুনো কবুতর এসে বাসা বাঁধে এবং তাতে দুটো ডিম রেখে দেয়। গর্তের মুখে পাথর থেকে একটি গাছ গজিয়ে ওঠে। মুহূর্তে গাছটির ডাল-পল্লবে গুহার মুখ ঢেকে যায়। দেখতে অনেকটা ঢাকনার মতো মনে হয়েছে। এই অলৌকিক ব্যাপারগুলো সম্পর্কে খৃষ্টান প্রাচ্যবিদ ডরমিংহাম লিখেছেন, “ইসলামের ইতিহাসে শুধু এই তিনটি বিষয়ই মু'জিয়া হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ গর্তের মুখে মাকড়সার জাল, বুনো কবুতরের বাসা ও একটি গাছের ডাল-পল্লব ছড়ানো। আর এসব জিনিস তো প্রকৃতিগতভাবেই প্রতিদিন প্রকাশিত হয়ে থাকে।”^১

মু'জিয়া ও জীবন-চরিত গ্রন্থরাজি

ইবনে হিশাম তাঁর ‘সীরাত’ গ্রন্থে এসব মু'জিয়া উল্লেখ করেননি। ছওর গুহার ঘটনা উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

“রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সফরসঙ্গী হযরত আবু বকর (রা) ছওর গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে একটি বিশেষ দায়িত্বে নিয়োগ করেন। তিনি সারা দিন শহরে ঘুরে খবর সংগ্রহ করবেন। রাতে গুহায় এসে এসব খবর তাঁদের শোনাবেন। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর মুক্ত দাস আমের ইবনে ফোহায়রাকে বলেন, তুমি সারা দিন আশে-পাশে মেঘপাল চরাবে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে গুহার মুখে নিয়ে আসবে। মহানবী (সা)-কে তাজা দুধ পান করাবে। হযরত আবু বকর (রা)-এর কন্যা হযরত আসমা (রা) রাতে খাবার নিয়ে আসতেন। মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর (রা) তিন দিন পর্যন্ত ছওর গুহায় লুকিয়ে থাকেন। কুরাইশরা তাঁদের খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা ঘোষণা করে, যে ব্যক্তি (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে, তাকে পুরস্কার হিসেবে একশ' উট দেয়া হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা) এই পুরস্কারের কথাও মহানবী (সা)-কে অবহিত করেন। হযরত আবু বকর (রা)-এর দাস আমের ইবনে ফোহায়রা সন্ধ্যার দিকে বকরী নিয়ে গর্তের নিকট পৌঁছতেন। মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর (রা) এসব বকরীর দুধ পান করতেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) সারা দিন সংগৃহীত সকল খবর মহানবী (সা)-কে শোনাবার পর রাতেই শহরে ফিরে যেতেন। যে পথ দিয়ে তিনি যেতেন, সে পথেই আমের বকরীর পাল নিয়ে যেতেন। তাতে হযরত আবদুল্লাহর পায়ের সব চিহ্ন মুছে যেতো। মহানবী (সা) ও তাঁর সফরসঙ্গী হযরত আবু বকর (রা) দীর্ঘ তিন দিন উক্ত গুহায় আত্মগোপন করে থাকেন। এরপর কুরাইশদের প্রতিশোধস্পৃহায় কিছুটা ভাটা পড়ে। এর আগে

১. ডরমিংহাম একজন খৃষ্টান চিন্তাবিদ। এদিক থেকে ইসলামের নবী সম্পর্কে তাঁর এই উক্তি আমাদের নিকট কোন গুরুত্ব বহন করে না। মনে হয় লেখক নিছক প্রতিবেদন হিসাবেই উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেছেন।

মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর (রা) যে ব্যক্তিকে পথ দেখানোর জন্য মনোনীত করেছিলেন, সে তিনটি উট নিয়ে এলো। দু'টি ছিল মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকরের জন্য। অপরটি ছিল সে লোকটির নিজের জন্য।”

ইবনে হিশাম এ ঘটনা সম্পর্কে অধিক কিছু বর্ণনা করেননি। তবে কুরাইশরা মহানবী (সা)-এর পশ্চাদ্ধাবন ও তাঁকে হত্যার ঘোষণা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নিচের আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে :

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ - وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ .

“স্মরণ করো! কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা কিংবা নির্বাসিত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে, আর আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ।” (৮ : ৩০)

এ সম্পর্কিত অপর আয়াত হচ্ছে :

إِذْ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا
فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا - فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى - وَكَلِمَةُ
اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا - وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

“যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না করো, তবে স্মরণ করো, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাকে বের করে দিয়েছিল এবং সে ছিল দু'জনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল। সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার উপর তাঁর দয়া বর্ষণ করেন যাতে তার চিন্তা প্রশান্ত হয় এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা, যা তোমরা দেখনি। আর তিনি কাফেরদের কথা হেয় করেন, আল্লাহর কথাই সবার উপরে এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (৯ : ৪০)

ইয়াসরিবের পথে

তৃতীয় দিন মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর (রা) জানতে পারেন, কুরাইশদের প্রতিশোধ নেয়ার আক্রোশ কিছুটা দমে এসেছে। এ কথা জানতে পেয়ে তাঁরা সফর শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পথ-প্রদর্শক আবদুল্লাহ ইবনে উরায়কেত তিনটি উট নিয়ে উপস্থিত হন। ওদিকে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) কিছু রসদপত্র নিয়ে আসেন। তাঁরা প্রত্যেকে নির্ধারিত উটে আরোহণ করেন। কিন্তু রসদের বস্তা হাওদার সাথে বাঁধার জন্য রশি পাওয়া যাচ্ছিল না। অগত্যা হযরত আসমা (রা) তাঁর কোমরবন্ধনী খুলে দুই টুকরো করেন। তিনি এক

টুকরো বস্তা বাঁধার জন্য মহানবী (সা)-এর হাতে তুলে দেন এবং অপর টুকরো নিজের কোমরবন্ধনী হিসেবে ব্যবহার করেন। হযরত আসমা (রা) এই উপস্থিত বুদ্ধি ও ত্যাগ মহানবী (সা) অত্যন্ত পছন্দ করেন। তিনি তাঁকে ‘যাতুন নেতাকাইন’ বা দুই কোমরবন্ধনীওয়ালী উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন থেকে হযরত আসমা (রা) এই উপাধিতে খ্যাতি লাভ করেন। মহানবী (সা) কোমরবন্ধনীর উক্ত টুকরো দ্বারা রসদের বস্তা উটের হাওদার সাথে বেঁধে নেন। এরপর তাঁরা ইয়াসরিবের উদ্দেশে রওয়ানা দেন। হযরত আবু বকরের নিকট পাঁচ হাজার দিরহামও ছিল। এই ছিল তাঁর পুরো পুঁজি। মক্কা থেকে ছওর গুহার উদ্দেশে বের হওয়ার সময় তিনি এই অর্থ নিয়ে আসেন।

ছওর গুহায় থাকার সময় মহানবী (সা) বারবার খবর পাচ্ছিলেন যে, কুরাইশরা মহানবী (সা)-কে বের করার জন্য মক্কা শহর ও আশেপাশের আনাচে-কানাচে তন্নতন্ন করে খুঁজছে। এখনো মানুষ পুরস্কারের লোভে তাঁদের অনুসন্ধানে রয়েছে। পরিস্থিতির নায়কতা উপলব্ধি করে রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। তাঁরা খুব হিসাব-কিতাব করে পথ চলা শুরু করেন। রাজপথ ছেড়ে তাঁরা অপরিচিত পথে চলতে থাকেন। তাদের পথ-প্রদর্শক আবদুল্লাহ ইবনে উরায়কেত এই পথ সম্পর্কে অবহিত ছিল। মক্কার দক্ষিণে নিচু এলাকা হয়ে তেহামা প্রান্তর মুখে লোহিত সাগর উপকূলের অদূর দিয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেত। রাজপথ পুরোপুরি পেরিয়ে আসার পর তাঁরা সাগর উপকূল থেকে একটু দূরে সরে চলতে থাকেন। এই পথটি সাধারণ মানুষের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। সারা রাত এবং দিনেরও প্রথম অংশের বেশ কিছু সময় তাঁরা পথ চলতেন। পথ চলার দুঃখ-কষ্ট ও ক্লান্তি ভুলে গিয়ে তাঁরা একের পর এক মন্ডিল অতিক্রম করছিলেন। আর এসব দুঃখ-কষ্ট তাদের মধ্যে এতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। কারণ একদিকে তাদের মধ্যে কুরাইশদের ভয় ছিল, অপরদিকে ছিল আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টিলাভের উদগ্র বাসনা। এই দ্বিবিধ কারণেই তাঁরা জীবন হাতে নিয়ে মক্কানগরী থেকে বেরিয়েছিলেন। অবশ্য এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আল্লাহ তা‘আলার সাহায্যের প্রতি মহানবী (সা)-এর পুরোপুরি ভরসা ছিল। এই সঙ্গে নিজেদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার প্রতিও তাঁদের লক্ষ্য ছিল। এ কথাই পবিত্র কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ -

“তোমরা অযথা নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দিবে না।”

এই সঙ্গে তাঁরা আর একটা ব্যাপারেও উদাসীন ছিলেন। আর তা হলো, যারা নিজের জন্য এবং নিজের ভাইয়ের জন্য আল্লাহ তা‘আলার দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করে থাকেন।”

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর (রা) নিরাপদে ছওর গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু কুরাইশদের মূল্যবান পুরস্কার ঘোষণার প্রেক্ষিতে যাযাবর আরবরা মহানবী (সা) ও তাঁর সফরসঙ্গীর পশ্চাদ্ধাবন এবং তাঁদের গ্রেফতার করার জন্য অত্যন্ত তৎপর ছিল। আর কেনই বা তৎপর থাকবে না। কারণ এসব আরম্ভ ছিল

অত্যন্ত লোভী। তারা সামান্য সম্পদের লোভে বিরাট বিরাট অপরাধ করতেও ইতস্তত করত না। তাছাড়া কুরাইশ ও অন্যান্য মুশরিক আরব মহানবী (সা)-কে তাদের চরম শত্রু বলে মনে করত। যাযাবর পরিবেশের প্রভাবে তারা প্রত্যেকেই খুন-খারাবীপ্রিয় ছিল। এমনকি প্রতিপক্ষ নিরস্ত্র হলেও তাঁকে হত্যা না করা পর্যন্ত তাদের ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত হতো না। এসব কারণে মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পথ চলছিলেন। পথ চলার সময় তাঁদের চোখ, কান, হৃদয় সব কিছুই নিরাপত্তার প্রতি অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে নিয়োজিত ছিল।

সুরাকা ইবনে জু'শুমের ঘটনা

মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকরের এই সতর্কতা অযথা ছিল না। এত সতর্কতা সত্ত্বেও একজন পথিক মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের খবর দিল, আমি এই মাত্র দেখে এলাম অমুক রাস্তা দিয়ে তিনজন উষ্ট্রারোহী যাচ্ছে। সম্ভবত তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সফরসঙ্গী হবেন। সেখানে সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'শুমও ছিল। এই খবর শুনেই তাকে পুরস্কারের লোভে পেয়ে বসে। সে মনে মনে কূটবুদ্ধি আঁটে। সে অন্যদের প্রতারিত করার মতলবে বলে, আমিও সেদিক থেকে এসেছি। তারা হচ্ছে অমুক গোত্রের পথিক। নিজের উক্ত তথ্য সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্য সে কিছুক্ষণ সেখানে বসে থাকে। এরপর সেখান থেকে বাড়ি ফিরে আসে এবং অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিজের দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে। সে উক্ত পথিকের বর্ণিত দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। এক স্থানে মহানবী (সা) ও তাঁর সফরসঙ্গীদ্বয় যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তাঁরা ক্লান্তি দূর করা এবং খাওয়ার জন্য একটি পাথরের ছায়ায় বসেন। এ সময় সূর্য পশ্চিম আকাশের দিকে ধেয়ে চলছিল। মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর (রা) রওয়ানা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁরা বেশ দূরে সুরাকাকে দেখতে পান। সে দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে আসছিল। অবশ্য কিছুক্ষণ আগে তার ঘোড়া দু'বার রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে পুরস্কারের মোহে ঘোড়ার হোঁচট খাওয়ার ব্যাপারটির প্রতি কোন প্রকার গুরুত্ব প্রদান করেনি। সে কামিয়াবীর আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবে, কিছুক্ষণের মধ্যে সে মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর (রা)-কে গ্রেফতার করবে এবং মক্কায় নিয়ে যাবে। যদি তাঁরা মোকাবিলা করার দুঃসাহস করেন, তা'হলে তাঁদের হত্যা করা হবে। এই আনন্দে সুরাকা ইতিপূর্বে ঘোড়ার দু'বার ঘোড়ার হোঁচট খাওয়ার কথা ভুলেই যায়। সে ঘোড়াকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘোড়াটি এমনভাবে লাফিয়ে ওঠে যে, সুরাকা ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে যায়। এবার প্রথম দু'বার হোঁচট খাওয়ার কথাও তার মনে পড়ে। সে মনে করে এসব শুভ লক্ষণ নয়। শিকারের উপর আক্রমণ করাটা আমার দেবতারা পছন্দ করছেন না। তার মনে প্রশ্ন দেখা দেয়, তাঁদের উপর হাত বাড়ানো হলে আমার জীবনও শেষ হতে পারে। এরপর সে সামনে চলমান উষ্ট্রারোহীদের উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে বলে ওঠে, “হে আরোহীরা! আমার দিকে তাকান। আমি সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম। আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন। আমি শপথ করে বলছি, আপনাদের কোন প্রকার প্রতারণায় ফেলা আমার উদ্দেশ্য নয়। এমনকি আমি আপনাদের কোন প্রকার ক্ষতিও করতে চাই না।”

সুরাকাকে দেখে মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর (রা) দাঁড়িয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে কঁথা বলার সুযোগ দান করেন। অতঃপর সুরাকা বলে, “আমাকে ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্য কিছু লিখে দিন। এটা আমি নিদর্শন হিসাবে রেখে দেব।”

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে হযরত আবু বকর (রা) চামড়া কিংবা হাড়ে কিছু লিখে সুরাকাকে প্রদান করেন। সে উক্ত লেখা নিয়ে ফিরে চলে যায়। রাস্তায় যেসব লোক মহানবী (সা)-কে ধরার জন্য ধেয়ে আসছিল, সুরাকা তাদেরও বুঝিয়ে-শুনিয়ে নিজের সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

রাস্তায় দুর্বিষহ গরম

মহানবী (সা) ও তাঁর সফরসঙ্গীরা শ্বাসরুদ্ধকর গরমের ভিতর দিয়ে তেহামা মরুভূমির একে একটি মন্থিল অতিক্রম করছিলেন। প্রচণ্ড রোদের উত্তাপে মরুভূমির বালিরাশি আগুনের ফুলকায় পরিণত হয়েছিল। উঁচু-নিচু এই দীর্ঘ পথে মাথা গোঁজার মতো কোথাও কোন ছায়াদার বস্তু দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। শত্রুর আকস্মিক আক্রমণ থেকে রক্ষাকারী কোন আশ্রয়দানকারীও ছিল না। এই দীর্ঘ বন্ধুর মরুপথে তাঁদের একমাত্র ভরসা ছিল ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, আল্লাহ তা‘আলাকে সন্তুষ্টি লাভের উদগ্র আশা কিংবা ঈমানের অজেয় শক্তি। আর মহানবী (সা) তা লাভ করেছিলেন আল্লাহ তা‘আলার নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে। এরূপ দুর্বিষহ পরিবেশে মহানবী (সা) ও তাঁর সফরসঙ্গীরা সাত দিন অনবরত চলতে থাকেন। দিনের বেলা প্রখর রোদে পথ চলা অসম্ভব হয়ে পড়লে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রাবিরতি করতেন। সূর্যের উত্তাপ কিছুটা ভাটা পড়ার সাথে সাথে আবার রওয়ানা দিতেন। রাতে মরুভূমির নির্জনতা আর আকাশের অসংখ্য ঝলমল তারকারাজি মিলিয়ে যে মনোরম পরিবেশ ফুটে উঠতো, তা থেকে মহানবী (সা) ও তাঁর সঙ্গীরা প্রশান্তি লাভ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আকাশের মুক্তোমালার মতো থরে থরে সাজানো তারকারাজির দিকে তাকিয়ে ভাবতেন, আমার দাওয়াত বা সত্যের প্রতি আহ্বানও একদিন পৃথিবীময় এমনি করে ছড়িয়ে পড়বে। তাতে বিভ্রান্ত মানুষ পথের দিশা পাবে।

এভাবে দুর্গম মরু পাড়ি দিয়ে মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর (রা) বনী সাহম কবীলার শিবিরের অদূরে গিয়ে পৌঁছান। গোত্র সরদার বুয়ায়দা সাহ্মী নবাগতদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়। তাতে মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর (রা) অনেকটা স্বস্তিবোধ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নিশ্চিত হন যে, আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাদের সাহায্য এসেছে। এ সময় তাঁরা ইয়াসরিবের অনেকটা নিকটে এসে গেছেন। সেখান থেকে ইয়াসরিব বেশি দূরে নয়।

ইয়াসরিবে মুসলমানদের প্রতীক্ষা

এ ক’দিন মহানবী (সা)-এর হিজরত সম্পর্কে ইয়াসরিবের মুসলমানদের নিকট নানা ধরনের উদ্বেগজনক খবর পৌঁছেছিল। মহানবী (সা)-কে গ্রেফতার ও হত্যা করার জন্য কুরাইশরা যেসব ষড়যন্ত্র করেছিল, সেগুলো সবই ইয়াসরিবে জানাজানি হয়ে যায়। তাতে মুসলমানরা অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়ে। তাদের প্রতীক্ষার প্রহর যেন আর শেষ

হতে চায় না। প্রতিটি লোক মহানবী (সা)-এর সাক্ষাৎ লাভ ও একটু কথা বলার জন্য অধীর আগ্রহে পথপানে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই তখনো মহানবী (সা)-কে দেখার গৌরব লাভ করেননি। তাঁরা শুধু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহান জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা শুনেছেন। সাহাবাদের প্রচারে বিমুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা)-কে দেখার জন্য এসব লোক যে কিরূপ আগ্রহী ছিলেন, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। একদিন হযরত সাআদ ইবনে যুরারাহ ও হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রা) কয়েকজন মুসলমান নিয়ে বনু যাকারের একটি বাগানে বসা ছিলেন। সাআদ ইবনে মুআয ও উসায়দ ইবনে হুযায়ের মুসলমানদের এই বৈঠকের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা ছিলেন নিজ নিজ গোত্র সরদার। সাআদ উসায়দকে বললেন, “এই দু’জন মুসলমান আমাদের দুর্বলমনা লোকদের ধর্মচ্যুত করে চলেছে। সাআদ ইবনে যুরারাহ আমার খালাত ভাই। আত্মীয়তার দরুন আমি তাকে কিছু বলতে পারছি না। আপনি সেখানে গিয়ে তাকে বুঝান। সে এ কাজ থেকে বিরত না হলে তার পরিণাম ভাল হবে না।” উসায়দ তাই করলেন। মুসআব বললেন, হে উসায়দ ! আপনি কিছুক্ষণ আমাদের এখানে বসুন। তাদের আমি যেসব বিষয় বোঝাচ্ছি আপনিও শুনুন। পছন্দ হলে গ্রহণ করবেন। আপনি ব্যতিক্রমও করতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনার পুরো স্বাধীনতা রয়েছে। উসায়দ বললেন, আপনি যথার্থ বলেছেন। এ কথা বলার পর তিনি নিজের হাতের লাঠি মাটিতে রেখে অদূরে বসে পড়লেন। তিনি মুসআব ইবনে উমায়েরের ইসলাম সম্পর্কিত আলোচনা মনোযোগ সহকারে শোনেন। এই আলোচনা তাঁর মনে রেখাপাত করে। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি অপর সরদার সাআদ ইবনে মুআযের নিকট ফিরে যান। সাআদ এ খবর শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং নিজে মুসলমানদের নিকট আসেন। কিন্তু মুসআব ইবনে উমায়েরের আলোচনা শুনে তিনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সাআদ (রা) নিজ গোত্রে যান। তিনি তাদের সমবেতভাবে জিজ্ঞেস করেন, “হে আবদুল আশহাল গোত্র ! তোমরা আমাকে কিধরনের লোক মনে করছো ?” তারা বলল, ‘আপনি আমাদের নেতা। আমাদের দেখাশোনা-কারী। আপনার অভিমত আমাদের অভিমতের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’ এরপর হযরত সাআদ ইবনে মুআয (রা) বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে কথাও বলব না।’ নিজেদের গোত্রীয় সরদারের মুখে এ কথা শুনে বনী আবদুল আশহাল গোত্রের লোকেরা নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

ইয়াসরিবে ইসলাম প্রচার

মহানবী (সা)-এর হিজরতের আগেই ইয়াসরিবে ইসলাম বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেখানে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মক্কার কুরাইশরা ইসলাম ও মুসলমানদের এই অগ্রগতি সম্পর্কে কল্পনাও করতে

পারেনি। সে সময় ইয়াসরিবে মুসলিম যুবকরা তাদের মুশরিক আত্মীয়-স্বজনের প্রতিমা নিয়ে ঠাটা-বিদ্রপও করতেন। বনু সালামা গোত্রের সরদার আমর ইবনে জামূহ মানাত দেবতার একটি কাঠের প্রতিকৃতি বানিয়ে ঘরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। সে গোত্রের মুসলিম যুবকরা রাতের বেলা প্রতিমাটি সরিয়ে নিয়ে আসেন। তারা এটি ময়লা-আবর্জনাময় স্থানে নিয়ে উপুড় করে ফেলে রাখেন। সকালে আমর অন্যান্য দিনের মতো প্রতিমাকে ভোগ দিতে যান। তিনি দেখেন, সেখানে প্রতিমাটি নেই। এরপর অনেক খোঁজাখুঁজি করে তিনি ময়লা-আবর্জনাময় স্থান থেকে প্রতিমাটি উদ্ধার করেন। তিনি এটাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে যথাস্থানে স্থাপন করেন। যারা এ কাজ করেছেন সারা দিন তিনি তাদের গালিগালাজ করেন। দ্বিতীয় রাতেও যুবকরা আমরের মূর্তিটি চুরি করে নিয়ে গতকালের স্থানেই ফেলে রাখেন। আজো আমর প্রতিমাটি সেখান থেকে উঠিয়ে এনে পরিষ্কার করার পর নির্ধারিত স্থানে রেখে দেন। কিন্তু যুবকরা আবার নিয়ে গিয়ে একই স্থানে ফেলে দেন। এভাবে কয়েকদিন পর্যন্ত আনা-নেয়া চলে। যুবকদের এই আচরণে আমর ইবনে জামূহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। অবশেষে আমর একদিন প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, “যদি তোমার কোন প্রকার শক্তি থাকে, তাহলে যারা তোমার সাথে এ ধরনের আচরণ করছে, তাদের শায়েস্তা করো। আমি এই তরবারি তোমার গলায় ঝুলিয়ে রেখে যাচ্ছি।” আমর সকালে গিয়ে দেখে মানাত ও তরবারি কিছুই নেই। আজ মানাতের প্রতিমূর্তিটি কূপের মধ্যে একটি মৃত কুকুরের সাথে উপুড় করে ফেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু তরবারির নাম-নিশানাও নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে অনেক লোক জড়ো হয়। মুসলমানরা আমরকে বোঝান এবং তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরত আমর ইবনে জামূহ (রা) উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, পৌত্তলিকতা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। পৌত্তলিকতার প্রভাবে মানুষ মানবিক মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে পড়ে।

এসব ঘটনা থেকে সহজে অনুমান করা যায়, ইয়াসরিবে ইসলাম কিরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং সেখানকার মুসলমানরা কীরূপ অধীর আগ্রহে মহানবী (সা)-এর আগমনের প্রতীক্ষা করছিল। তারা যখন জানতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াসরিবে হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেছেন, তখন তাঁকে এক নয়র দেখার জন্য তাঁদের ব্যাকুলতা আরো বেড়ে যায়। প্রতিদিন ফজর নামাযের পর তারা শহর থেকে বেরিয়ে কোন উঁচু স্থানে উঠে মহানবী (সা)-এর আসার পথের দিকে তাকিয়ে থাকত। রোদের উত্তাপ অসহনীয় হয়ে পড়লে বাধ্য হয়ে বাড়ি চলে আসত।

কোবা ইয়াসরিব থেকে ছ'মাইল দূরে আলাদা একটি জনপদ। মহানবী (সা) তাঁর সফরসঙ্গী হযরত আবু বকরকে নিয়ে কোবায় এসে উপস্থিত হন। এখানে তিনি চারদিন অবস্থান করেন। এ সময় মহানবী (সা) এখানে একটি মসজিদের বুনিয়াদ স্থাপন করেন। কোবায় অবস্থানকালে হযরত আলী (রা)-ও মহানবী (সা)-এর সাথে এসে মিলিত হন। হযরত আলী (রা) মক্কায় মহানবী (সা)-এর কাছে গচ্ছিত রাখা সব আমানত মালিকদের নিকট পৌঁছানোর পর ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। তিনি দু'সপ্তাহে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন। সারা রাত পথ চলতেন। দিনের বেলা কোথাও লুকিয়ে থাকতেন। মহানবী (সা) যে

পথে এসেছেন, হযরত আলী (রা)-ও সে পথ অনুসরণ করেছেন। এভাবে তিনি কোবায় এসে মহানবী (সা)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন।

ইয়াসরিবে মহানবী (সা)-এর প্রবেশ

একদিন ইয়াসরিবের মুসলমানরা যথারীতি মহানবী (সা)-এর আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন। সর্বপ্রথম একজন ইহুদী মুসলমানদের মহানবী (সা)-এর শুভাগমনের সংবাদ প্রদান করে। সে চিৎকার করে বলতে থাকে, “হে বনী কায়লা!” তোমাদের নেতা এসে গেছেন।” শুক্রবার দিন মহানবী (সা) ইয়াসরিবে প্রবেশ করেন। রানুনা উপত্যকার মসজিদে তিনি জুমার নামায আদায় করেন। ইয়াসরিববাসী তাঁদের প্রিয়নবীকে এক নয়র দেখার জন্য চারদিক থেকে ছুটে আসেন। এত দিন তাঁরা মহানবী (সা)-কে না দেখেই তাঁর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেন। প্রত্যেক নামাযে প্রিয়নবী (সা) দরুদ ও সালাত পাঠ করেছেন। আজ ইয়াসরিবের মুসলমানদের শহরে সে মহান ব্যক্তি তশরীফ এনেছেন। তাঁকে দু’চোখে দেখার সুযোগ এসেছে। এ যে ইয়াসরিবের মুসলমানদের জন্য কীরূপ খুশি ও আনন্দের বিষয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

মহানবী (সা)-কে দেখার জন্য চারদিক থেকে জনসমুদ্র নেমে আসে। ইয়াসরিবের প্রতিটি মুসলমান তাঁদের প্রিয় রাসূলকে নিজ ঘরে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। মহানবী (সা) এসব আবদার রক্ষার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “আমার বাহন উট আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে যেখানে বসে পড়বে, আমি সে ভূমির মালিকের আতিথেয়তা গ্রহণ করব। মহানবী (সা) তাঁর ‘হোসাবা’ নামের উটের নাকের দড়ি তার ঘাড়ে রেখে দিলেন। হোসাবা এক বিশেষ ভঙ্গিতে ইয়াসরিবের অলিগলিতে চলতে শুরু করে। মুসলমানরা চারদিক থেকে উটটি ঘিরে রেখেছিল। উটকে অবাধে চলার পথ করে দিচ্ছিল।

ইয়াসরিবের ইহুদী ও মুশরিকরা তাদের শহরের একটি শ্রেণীর ‘নতুন জীবনের’ এই ভূমিকা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়। তারা আরো বিস্মিত হয় এজন্য যে, ইয়াসরিবের আওস ও খায়রাজ গোত্র কাল পর্যন্ত একে অপরের রক্তপিপাসু ছিল। কিন্তু আজ একজন মুহাজিরের (মহানবী) আগমানে তারা তাদের পুরনো শত্রুতা সব ভুলে গিয়েছে। তারা পরস্পরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেই মুহাজির ব্যক্তির সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিবেদিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সবচাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, ইয়াসরিবের এসব বঞ্চিত ইহুদী-মুশরিক এত কিছু প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। তারা বুঝতে পারেনি, আজ থেকে বিশ্ব-ইতিহাসে সভ্যতা ও অগ্রগতির এক নতুন অধ্যায় সংযোজনের সূচনা হয়েছে। এই সংযোজনায় তাদের শহর ইয়াসরিবের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বও বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীর শেষ দিনটি পর্যন্ত এই শহরের খ্যাতি বিশ্ব-ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে।

১. বনী কায়লা আওস ও খায়রাজ গোত্রের মিলিত উপাধি। অতীতে উভয় গোত্র একই গোত্রের ছিল। তখন তাদের গোত্রের উপাধি ছিল ‘বনী কায়লা’। -অনুবাদক

মহানবী (সা)-এর উট হোসাবা তার ইচ্ছামত এগিয়ে চলে। অবশেষে একটি পতিত জমিতে এসে উট থেমে যায়। এই জমির মালিক ছিল বনু নাজ্জার গোত্রের দুজন এতিম ছেলে। উটটি বসে পড়লে মহানবী (সা) অবতরণ করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এই জমির মালিক কে? হযরত মাআয ইবনে আফরা (রা) বললেন, সাহল ও সুহায়ল নামের দুজন এতিম এই জমির মালিক। তাদের পিতা ছিল আমর। আমাদের ইচ্ছা এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হোক। আমরা তাদের এ ব্যাপারে সম্মত করাবো। মহানবী (সা) এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, 'এখানে মসজিদ এবং আমার বাসস্থানও নির্মিত হবে।'

মদীনায় প্রাথমিক দিনগুলো

প্রাণঢালা সংবর্ধনা

মদীনার বাসিন্দারা এ কথা জানত যে, মহানবী (সা) কীরূপ পরিস্থিতিতে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন। কুরাইশরা তাঁকে অনুসরণ করছিল। তাঁর সামনে ছিল তেহামার মতো একটি গাছপালা ও তৃণলতাহীন ধূলিধূসর মরুপ্রান্তর। এই মরুভূমির আগুনে পাথর আর প্রচণ্ড রোদে উত্তপ্ত বালিয়াড়ির উপর দিয়ে পথচলা এক কল্পনাভীত দুর্বিষহ ব্যাপার ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি এসব পাড়ি দিয়ে মদীনায় এসে পৌঁছান। মদীনার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক বিরাট জনসমুদ্র তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য সমবেত হতে থাকে। মহানবী (সা)-কে মদীনার বাসিন্দাদের প্রাণঢালা সংবর্ধনা দেয়ার পিছনে একাধিক কারণ ছিল। একটা শ্রেণীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল মহানবী (সা)-কে একনয়র দেখা। আর একটা শ্রেণী এসেছিল এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের জয়ধ্বনি সারা আরবে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিটি মজলিস ও অনুষ্ঠানে আলোচনা হচ্ছিল যে, মহানবী (সা) প্রবর্তিত ধর্ম আরবদের পুরনো ধর্মের বুনিয়াদ ধ্বংস করে দিবে। সুতরাং এই লোকটিকে একবার দেখা দরকার। এসব কারণ ছাড়া একটি বিশেষ কারণও ছিল এই অভূতপূর্ব সংবর্ধনার পিছনে। তা হলো, মহানবী (সা) মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। প্রতিটি গোত্র তা থেকে নানা ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক ফলশ্রুতি গ্রহণ করছিল। প্রতিটি লোক প্রত্যাশী ছিল, সে নিজের ধারণা ও কল্পনা অনুযায়ী যা কিছু আশা করেছে, তা যেন মহানবী (সা)-এর সংবর্ধনার মাধ্যমে পূরণ হয়। মহানবী (সা)-এর হিজরতের বরকতে মদীনার সামাজিক জীবনে যেন কল্যাণকর পরিবর্তন সূচিত হয়। অনেকে আবার শুধু এ কারণে মহানবী (সা)-কে দেখা প্রয়োজন মনে করেছে যে, তাঁর রিসালাত ও অন্যান্য নিদর্শন সরাসরি প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কিত পূর্ব ধারণা কতটুকু সঠিক তা মূল্যায়ন করা যাবে। আর এসব কারণে মহানবী (সা)-এর সংবর্ধনায় শুধু মুসলমানই নয়, ইহুদী-মুশরিকরাও দলে দলে যোগদান করেছিল। যদিও তাদের ধারণায় অভিনুতা ছিল না, তবু সবার মধ্যে এই প্রত্যাশা ছিল, যে, মহানবী (সা)-কে যে করেই হোক নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। তাদের মধ্যে যারা মহানবী (সা)-এর অনুসারী ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি হচ্ছেন মানবকুল-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাথেই ইয়াসরিবের বাসিন্দারা আকাবায় চুক্তি সম্পাদন করেছে। ইসলামের প্রচার-প্রসার ও একত্ববাদ ঘোষণার অভিযোগে দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত তিনি নিজ কওমের অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। এখন তিনি নিজ কওম ও মাতৃভূমির মায়া বিসর্জন দিয়ে মদীনায় এসেছেন। এসব ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁকে একনয়র দেখার জন্য

মদীনায় জনসমুদ্র ভেঙে পড়ে। ভিড় ক্রমশ বেড়েই চলছিল। তাতে কোন প্রকার শৃংখলা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। প্রত্যেকে নিজ নিজ মর্জি-মাফিক চারদিক থেকে চলে আসছিল। তাদের প্রত্যেকের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, যে করেই হোক নিজেদের সর্বাধিক সম্মানিত মেহমানকে নিকট থেকে দেখতে হবে।

মসজিদে নববী ও রাসুলের বাসস্থান নির্মাণ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী (সা)-এর উট দুই এতিমের পতিত জমিতে এসে বসে পড়ে। এই জমি তিনি খরিদ করেন এবং তাতে মসজিদে নববী ও বাসস্থান নির্মাণ শুরু করেন। মসজিদ নির্মাণের পাথর ও নির্মাণ মসলা মহানবী (সা) নিজে বহন করেন। সাহাবীরাও তাঁকে অনুসরণ করেন। এইরূপে মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। এরপর মহানবী (সা)-এর বাসস্থান নির্মাণ শুরু হয়। মসজিদ ও মহানবী (সা)-এর বাসস্থান অত্যন্ত সাদামাঠা নির্মাণ করা হয়। তাতে কোন প্রকার শৈল্পিক কারুকার্য ছিল না। মসজিদ ছিল বেশ প্রশস্ত। প্রাচীর ইট দ্বারা তৈরি করা হলেও এক অংশের ছাদ তৈরি করা হয় খেজুর পাতা দ্বারা। অপর অংশ মুক্ত রাখা হয়। মসজিদের এক অংশ নিরাশ্রয় মুসলমানদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। এশার নামাযের সময় খেজুর পাতা পুড়িয়ে মসজিদে আলোর ব্যবস্থা করা হতো। কয়েক বছর পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলে। অবশেষে খেজুর গাছের কাণ্ড দ্বারা তৈরি স্তম্ভগুলোতে কয়েকটি প্রদীপ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মহানবী (সা)-এর বাসস্থানের নির্মাণও মসজিদে নববীর চেয়ে উন্নত ছিল না। পার্থক্য শুধু এতটুকু ছিল যে, তাতে পরদার দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল।

মসজিদে নববী ও আবাসগৃহ নির্মাণের পর মহানবী (সা) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা)-এর বাসস্থান থেকে নিজের বাসগৃহে চলে আসেন।

মহানবী (সা) মদীনায় আসার পর তাঁর রিসালাতের তথা ইসলাম প্রচার-প্রসারের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মদীনার পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি তাঁর মিশনের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এখানকার অধিবাসী ও মক্কার কুরাইশদের মন-মানসিকতায় কিছুটা বৈপরীত্য তিনি লক্ষ্য করেন। মক্কার বাসিন্দাদের মধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্য ছিল না। কিন্তু মদীনার বাসিন্দাদের মধ্যে তিনি এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন। তাছাড়া মদীনার মুসলিম গোত্রগুলো ছিল শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রত্যাশী। কোন ঘটনা যাতে তাদের শান্তিপূর্ণ জীবনধারায় প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, সেদিকে তাদের সচেতন দৃষ্টি ছিল। তাদের অতীতের যুদ্ধ-বিগ্রহের ভয়াবহতা সম্পর্কেও তারা ভীত ও শংকিত ছিল। মদীনার মুসলমানরা এই সঙ্গে মক্কার তুলনায় তাদের শহর মদীনার অধিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশী ছিল। কিন্তু মহানবী (সা) তাঁর কর্মতৎপরতায় মদীনার মর্যাদার প্রশ্নটি বড়জোর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখতে চাইছিলেন। মদীনার মুসলমানদের ইচ্ছানুযায়ী তিনি তা অগ্রাধিকার দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তাঁর প্রধান ও পরম লক্ষ্য ছিল রিসালাতের প্রচার। এ কাজে তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই দায়িত্ব পালনের জন্যই তিনি নবুয়ত লাভের পর থেকে দীর্ঘ তের বছর মক্কার স্বদেশবাসীর অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। পিছপা হননি। কিন্তু সেখানকার অধিকাংশ সাধারণ মানুষ অত্যাচার-উৎপীড়নের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি। বস্তুত ঈমানের ধর্মও তাই। সে যদি কারো অন্তরে পুরোপুরি স্থান করে

নিতে না পারে, তা'হলে অতি সাধারণ দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরাভূত করা যায়।

চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা

মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের অধিকার নিশ্চিত হওয়া উচিত। মুসলমানদের মাধ্যমে সবার নিকট এ কথা প্রকাশিত হওয়া উচিত, যে ব্যক্তি সত্যের অনুসরণ করে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্মে দীক্ষিত হবে, সে সকল প্রকার অত্যাচার-নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। এই অধিকার নিশ্চিত হলে একদিকে মুসলমানদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং সুদৃঢ় হবে। অপরদিকে যেসব লোক তখনো ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে কিংবা ভয় পাচ্ছে অথবা দুর্বলতার শিকার হয়ে আছে তারা এসব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার জীবনের প্রাথমিক দিনগুলোতে এ ব্যাপারে বেশ চিন্তা-ভাবনা করেন। এ বিষয়টিই ছিল তাঁর ভবিষ্যত রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। মহানবী (সা)-এর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তাগিদে আমাদেরও এ বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-গবেষণা করা প্রয়োজন।

এ কথা কারো পক্ষে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সাম্রাজ্য, পদমর্যাদা ও ধন-সম্পদের প্রতি মহানবী (সা)-এর কোন প্রকার আসক্তি ছিল না। অবশ্য তিনি মুসলমানদের সচ্ছল জীবন-যাপনের প্রত্যাশী ছিলেন। তাতে অন্যদের মতো মুসলমানরা স্বাধীনভাবে তাদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। তিনি চাইতেন, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান--সবাই এই স্বাধীনতা সমভাবে ভোগ করুক। অমুসলিম সম্প্রদায় যেমন তাদের চিন্তাধারার প্রতি অন্যদের আহবানের অধিকার ভোগ করছে, অনুরূপ মুসলমানরাও এই অধিকার দ্বারা উপকৃত হোক। কারণ স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারাই সত্য জয়লাভ করে থাকে। আর এর ফলে সারা বিশ্ব অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। অপরদিকে কঠোরতা ও চাপ দ্বারা অসত্য ও বাতিল ধ্যান-ধারণা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে থাকে। এই চাপের দ্বারা অন্ধকারের ঘনঘটা মানবাত্মার নূর বা আলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। স্বাধীনতা হচ্ছে মানুষের স্বভাবজাত অধিকার। এর মাধ্যমে মানুষ অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এই চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা হচ্ছে মানুষের মিলন, সম্প্রীতি তথা পূর্ণতা লাভের মাধ্যম। যুদ্ধ-বিগ্রহ, গণহত্যা কিংবা হিংসা-বিদ্বেষের সাথে এই স্বাধীনতার সামান্যতম সম্পর্ক নেই।

যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা

এই চিন্তাধারাই মহানবী (সা)-কে সন্ধি ও বন্ধুত্বের প্রতি আকৃষ্ট করে। যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে তাঁর মনে ঘৃণাভাব জাগিয়ে তোলে। তবে হ্যাঁ, অন্যদের মতো মুসলমানদের মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে তখন বাধ্য হয়ে সংগ্রামের পথ বেছে নিতে হয়েছে। আর এজন্যই দেখা গেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) যথাসম্ভব যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জোর-জবরদস্তির পথ এড়িয়ে চলেছেন। যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, আকাবায় দ্বিতীয় বায়'আতের পর মক্কার কোন একজন লোক তা জেনে ফেলে। সে এ ব্যাপারে কুরাইশদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। লোকটির এই তৎপরতা দেখে বায়'আতকারীদের নেতা হযরত আব্বাস ইবনে উবাদা (রা) মহানবী (সা)-এর খেদমতে

আরম্ভ করেছিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! যে মহাশক্তি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আপনি নির্দেশ দিলে আমরা এখনই মক্কাবাসীর উপর সশস্ত্র অভিযান চালাবো।” মহানবী (সা) তাদের বারণ করে বললেন, “আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে আমাদের এই নির্দেশ দেয়া হয়নি।”

মুসলমানদের উপর জেহাদের প্রথম নির্দেশে আত্মরক্ষার কথা বলা হয়েছে। আক্রমণের অনুমতি দেয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে নাযিলকৃত পবিত্র কোরআনের আয়াতটি হচ্ছে :

أَن لِّلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا . وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ .

“যারা আক্রান্ত হয়েছে, তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাদের সাহায্যদানে পুরোপুরি সক্ষম।” (২২ : ৩৯)

এরপর আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ প্রসঙ্গে অপর একটি আয়াত নাযিল হয়েছে :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

“এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা (অত্যাচার) বন্ধ হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি তারা বিরত হয়, তবে তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।” (৮ : ৩৯)

আল্লাহ তা‘আলার উপরোক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর অনুসারীদের অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রত্যাশী ও আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এমনকি এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যুদ্ধ করারও অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, অমুসলিমরা যাতে মহানবী (সা)-এর অনুসারীদের তাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে বিরত রাখতে সক্ষম না হয়।

মদীনাবাসীদের ধ্যান-ধারণা

মহানবী (সা) হিজরতের পর মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর এই হিজরতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনভাবে এখানে ইসলাম প্রচার করা। এখানে আসার পর মদীনার সকল শ্রেণীর লোক তাঁকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মদীনার অধিবাসীরা অভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী ছিল না। এ সময় মদীনার লোকেরা কয়েকটি দল-উপদলে বিভক্ত ছিল। মুসলমানদের মধ্যে ছিল মুহাজির ও আনসার। আওস ও খায়রাজদের মধ্যে মুশরিক ও পৌত্তলিক ছিল। এই দুটি গোত্র একে অপরের শত্রু ছিল। তাদের ছাড়া ছিল ইহুদী। তারা আবার চার ভাগে বিভক্ত ছিল। মদীনার ভিতরে ছিল বনী কায়নুকা। ফাদাকে বনু কোরায়যা। শহরের উপকণ্ঠে ছিল বনু নায়ীর। আর মদীনার উত্তরে খায়বার নামক স্থানে বাস করত অন্যান্য ইহুদী। মদীনার মুহাজির ও আনসাররা নতুন ধর্মের অনুসারী হিসেবে পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত ছিলেন না। কারণ তাদের মধ্যে পুরনো শত্রুতা যে কোন সময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠার আশংকা ছিল। একবার তা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। মুশরিক আওস ও খায়রাজরা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা মুসলমান ও ইহুদীদের মাঝখানে ভারসাম্য শক্তি হিসাবে বিরাজ করছিল।

তারা মুসলমান ও ইহুদীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে নিজেদের সুখ স্বপ্ন দেখছিল। অপরদিকে ইহুদীদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা)-কে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্য ছিল, তারা তাঁকে মিত্র বানিয়ে আরবের খৃষ্টানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। কারণ খৃষ্টানরা তাদের ফিলিস্তিন থেকে বের করে দিয়েছিল। মহানবী (সা)-এর হিজরতের পিছনে মদীনার প্রতিটি সম্প্রদায় এভাবে নিজ নিজ স্বার্থের কথা চিন্তা করছিল।

এ সময়ে মহানবী (সা)-এর সংগ্রামময় জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই জীবনধারা অন্যান্য নবী-রাসূলের জীবনালেখ্যে পাওয়া যায় না। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র জীবনের এই অধ্যায়টি ছিল রাজনৈতিক। তিনি তাঁর জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে অনন্য সাধারণ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তাতে যে-কোন যুগে যে-কোন মানুষ মহানবী (সা)-এর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি স্বীকৃতি জানাতে বাধ্য। মহানবী (সা) তাঁর নতুন আবাসভূমির বাসিন্দাদের মধ্যে একতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করেন। আর এই একতা ছিল আরবদের নিকট কল্পনাভীত ব্যাপার। অবশ্য দূর অতীতে একবার ইয়ামনে এ ধরনের একতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর উপদেষ্টা হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর সাথে পরামর্শ করেন। তাঁদের তিনি মন্ত্রী বা উপদেষ্টা বলেই ডাকতেন। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম তিনি জন্মভূমি ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাতে করে তাদের পুরনো শত্রুতার অবসান হবে।

মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক

মহানবী (সা) আনসার ও মুহাজিরদের জড়ো করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একজন মুসলমানের সাথে অপর একজন মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। এ ব্যাপারে সবার আগে তিনি হযরত আলী (রা)-কে নিজের ভাই হিসাবে বরণ করেন। অবশ্য আগেও হযরত আলী (রা)-এর সাথে মহানবী (সা)-এর এই সম্পর্ক ছিল। হযরত হামযা (রা) ও তাঁর দাস যায়েদ ইবনে হারেসার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করা হয়। হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে হযরত খারেজা (রা), ইবনে যায়েদের এবং হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের সাথে হযরত ইবনে মালেক খাসরাজি (রা)-এর ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সম্পর্ককে রক্ত সম্পর্কের ভাইয়ের সমপর্যায়ের গণ্য করা হয়। তাতে করে মুসলমানদের মধ্যে এক দুর্লভ ঐক্য ও সংহতি গড়ে ওঠে।

মদীনার আনসাররা তাঁদের মুহাজির ভাইদের সাথে নযীরবিহীন সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন। মুহাজিররা অনেক সময় পরিস্থিতির চাপে তা গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। কিন্তু এই সঙ্গে তারা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন আমরা যদি আনসার ভাইদের এই বদান্যতার প্রতিদান দিতে পারতাম! কারণ তাঁরাও সমকালীন বিশ্বের অন্যতম উন্নত শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁদের অনেকেই মক্কায অবস্থানকালে বিত্তবান ছিলেন। কিন্তু মদীনায আসেন তাঁরা একেবারে নিঃস্ব অবস্থায়। তাঁরা এখানে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন। মুহাজিরদের মধ্যে হযরত ওসমান (রা) বেশ কিছু ধন-সম্পদ নিয়ে এসেছিলেন। আবার মহানবী (সা)-এর চাচা হযরত হামযা (রা) একেবারে খালি হাতে মদীনায আসেন। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট

এসে বললেন, “জীবন বাঁচানোর জন্যও আমার নিকট কিছু নেই। আমাকে কিছু সাহায্য করুন।”

মুহাজিরদের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা হয়েছিল বিত্তবান আনসার হযরত সা'দ ইবনে রবী (রা)-এর সাথে। হযরত সা'দ তাঁর সম্পত্তির অর্ধাংশ হযরত আবদুর রহমানকে গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি এই সম্পদ গ্রহণ না করে তাঁকে বাজারের পথ দেখিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেন। তিনি বাজারে গিয়ে পনির ও মাখনের ব্যবসা শুরু করেন। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে হযরত আবদুর রহমান অল্প কিছুদিনের মধ্যে বেশ ধন-সম্পদের মালিক হন। তাঁর পণ্যবাহী উটের বহর দেশের বিভিন্ন অংশে যেতো। সেসব স্থান থেকে পুনরায় পণ্য বোঝাই হয়ে মদীনায়ে আসত। হযরত আবদুর রহমান (রা) মদীনায়ে এক মহিলার পাণি গ্রহণ করেন। তাঁকে ছাড়া আরো কয়েকজন মুহাজিরও মদীনায়ে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন। মুহাজিররা ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ দক্ষতার পরিচয় দেন। একজন মুহাজির এরূপ দক্ষতার পরিচয় দেন যে, তাঁর সম্পর্কে বলা হতো, “তিনি মরুভূমির বালুও সোনায়ে পরিণত করতে পারেন।”

যেসব মুহাজির ব্যবসা-বাণিজ্য করেননি, তাঁরা মদীনায়ে আনসারদের জমিতে বর্গার ভিত্তিতে চাষাবাদ শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত আলী (রা) প্রমুখ। তাঁদের ক্রীতদাসরাও তাঁদের সাহায্য করতেন। এভাবে তাঁরা কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

মুহাজিরদের আর একটি শ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা চাষাবাদ কোনটায়ই অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁরা অত্যন্ত অভাব-অনটনে জীবন যাপন করছিলেন। কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সচেতন ছিলেন। নিজেদের অভাব-অনটনের কথা কারো নিকট প্রকাশ করতেন না। তাঁরা শারীরিক পরিশ্রম করে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করতেন। কিন্তু তাতেও তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ মক্কায়ে তাঁদের অনেক বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হতো। মদীনায়ে তাঁরা মক্কার তুলনায় শতগুণ নিরাপদ ও শান্তিতে জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করেছিলেন। এখানে ধর্মবিশ্বাসের জন্য তাঁদের কারো জিজ্ঞাসাবাদ বা চোখ রাঙানোর সম্মুখীন হতে হতো না। এই নিরাপত্তার জন্য তাঁরা অভাব-অনটন সত্ত্বেও অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন।

মদীনায়ে মুসলমানদের আর একটি শ্রেণী ছিলেন। তাঁরা আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে ইসলাম গ্রহণের পর মদীনায়ে চলে আসেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মদীনায়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন দরিদ্র ও নিঃস্ব। মাথা গোঁজার মতো ঠিকানাও তাঁদের ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের থাকার জন্য মসজিদে নববীর একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দেন। মসজিদের যে অংশে ছাদ ছিল উক্ত অংশের নাম ছিল সুফ্যা। এজন্য সেখানে অবস্থানকারীরা আসহাবে সুফ্যা নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁরা সেখানে শয্যা গ্রহণ করতেন।

ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ও তা সুদৃঢ় হওয়ার পর মহানবী (সা) আনসার ও মুহাজিরদের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কারণ মদীনায় মুনাফিকরা আওস ও খায়রাজ গোত্রীয় মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও মতানৈক্য সৃষ্টির জন্য সব সময় তৎপর ছিল। কিন্তু মহানবী (সা)-এর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন পদক্ষেপ তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও তৎপরতা নস্যাৎ করে দেয়। এই দিক থেকে বিবেচনা

করলেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্ত পদক্ষেপের সীমাহীন গুরুত্ব ও তাৎপর্য অস্বীকার করার উপায় নেই। সত্যি আল্লাহর রাসূল অনুপম প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার অধিকারী ছিলেন।

ইহুদীদের সাথে চুক্তি

মহানবী (সা) মদীনায় ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কারণ তারা ছিল কিতাবধারী ও একত্ববাদী। এজন্য তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি তাদের এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন যে, কোন এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ইহুদীরা রোযা রাখে। তাদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য মহানবী (সা)-ও রোযা রাখেন। তার আগে নামাযে মহানবী (সা) ও মুসলমানদের কেবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। আর বায়তুল মুকাদ্দাস ইহুদীদেরও পূত-পবিত্র ভূমি। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইহুদীরা একে অপরের ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে থাকেন। মহানবী (সা) অত্যন্ত অমায়িক ও মিষ্ট চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সবার প্রতি দয়া ছিল তাঁর মহান চরিত্রের এক অনুপম দিক। অমায়িক ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি মদীনায় অধিবাসীদের মন জয় করে ফেলেন। দলমত নির্বিশেষে সবার নিকট তাঁর মর্যাদা ও সম্মান অত্যন্ত বেড়ে যায়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষ একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য অনুপ্রাণিত হয়। এই চুক্তিতে পরস্পরের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিটি হচ্ছে মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সনদ।

মহানবী (সা) এবং অন্যান্য নবী-রাসূলের ধর্মপ্রচার পদ্ধতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হলে উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রচার-পদ্ধতি ছিল পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের চাইতে ব্যতিক্রমধর্মী। যেমন হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) এবং তাঁদের পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের ধর্ম প্রচারের দুটো পদ্ধতি ছিল। এগুলো হলো, বিরোধীদের সাথে বাহাছ-বিতর্ক এবং অলৌকিক ঘটনাবলি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁরা ধর্ম প্রচার করতেন। তাঁরা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সময় তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহচরদের জন্য ধর্মপ্রচার পদ্ধতি নির্ধারণ করে যেতেন। পরবর্তীরা তাঁদের নবী-রাসূলদের নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধর্মপ্রচার করতেন। তাঁরা নিজেদের ধর্ম প্রচারের জন্য রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করতেন। এমনকি নিজেদের মতবাদ সংরক্ষণের জন্য রক্তপাত করতেও দ্বিধা করতেন না। হযরত ঈসা (আ)-এর পর তাঁর 'হাওয়ারী' বা সহচররা ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে নানা ধরনের দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছেন। এক পর্যায়ে রোমান খৃষ্টান সম্রাট খ্রিষ্টধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় সমকালীন বিশ্বে খৃষ্টধর্ম বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করে। এভাবেই সেকালে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের প্রচার-প্রসার হতো। প্রতিটি ধর্মই কোন-না-কোন শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে মহানবী (সা) ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা এককভাবে তাঁর প্রিয় রাসূলের উপরই ন্যস্ত করেন। তাঁর মাধ্যমেই সমকালীন পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটে। এদিক থেকে মহানবী (সা) ছিলেন আল্লাহর রাসূল, একজন দূরদর্শী রাজনীতিক এবং একজন মুজাহিদ ও বিজয়ীও ছিলেন তিনি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ধর্মপ্রচার তথা সত্যবাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠান। এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য যেসব গুণাবলি থাকা প্রয়োজন মহানবী (সা)-এর

মহান ব্যক্তিতে সেগুলো পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজেই এ কথার বাস্তব প্রমাণ রয়েছে।

বস্তুত মহানবী (সা) তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এই দায়িত্বকে সুষ্ঠুভাবে পালন করার লক্ষ্যেই তিনি মদীনার মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি প্রণয়ন করেন। ইতিহাসে এটি মদীনার সনদ নামে খ্যাত। এই চুক্তিতে তিনি মদীনার ইহুদীদেরও অন্তর্ভুক্ত করেন। এই চুক্তিতে তাঁদের নিজেদের ধর্ম-কর্ম করার পুরোপুরি নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। তাদের প্রত্যেকের বিষয়-সম্পত্তির নিরাপত্তার দায়িত্বও পরস্পরের উপর ন্যস্ত করা হয়।

চুক্তির বিবরণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এই চুক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত শ্রেণী ও গোত্রগুলোর মধ্যে সম্পাদিত হলো। চুক্তির অন্তর্ভুক্ত গোত্র ও সম্প্রদায়গুলো হল মক্কার কুরাইশ মুসলিম মুহাজির, মদীনার মুসলিম আনসার এবং তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অমুসলিম সম্প্রদায় ও গোত্র। চুক্তির শর্তগুলো হচ্ছে:

মুহাজির ও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত অন্য সবাইকে একই জাতি হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে।

কুরাইশ মুহাজিররা তাঁদের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি নিয়ে বসবাস করবে। তাদের কারো উপর 'দিয়্যত' বা রক্তপাতের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হলে সবাই মিলে তা পরিশোধ করবে। নিজেদের বন্দীদের উদ্ধার মূল্যও সবাই যৌথভাবে প্রদান করবে। মদীনায় অবস্থানকারী আওফ গোত্র পূর্বে যেসব অধিকার ভোগ করছিল এখনো তা অব্যাহত থাকবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের রক্তপাতের ক্ষতিপূরণ নেয়া ও দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা চলবে না। [এক্ষেত্রে মহানবী (সা) মদীনার প্রতিটি আনসার গোত্র ও উপগোত্রের নাম চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করান। যেমন বনী হারিস, বনী সায়েদা, বনী জুশাম, বনী নাজ্জার, বনী আমর ইবনে আওফ, বনী নাবীত প্রমুখ।] রক্তপাতের ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারে মুসলমানরা নিজেদের বোঝা হালকা করার জন্য অন্য কোন অজুহাত বের করতে পারবে না। কোন মু'মিন অন্য কোন মু'মিনের ক্রীতদাস দখল করতে পারবে না। যদি কোন মুসলমান অপর কারো উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে সকল মুসলমানকে মিলে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করতে হবে। এই কাজ করা তাদের প্রতি বাধ্যতামূলক করা হলো। অপরাধীকে শাস্তি প্রদানকারীদের মধ্যে কারো সন্তান হলেও ব্যতিক্রম করা চলবে না। কোন কাফেরের সমর্থনে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে হত্যা করতে পারবে না। এমনকি কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন কাফেরকে সাহায্যও করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব সবার জন্য সমান। মুসলমান সবাই পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং একে অপরের সাহায্য থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা আমাদের এই চুক্তি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে, আমাদের সাহায্য তাদের জন্যও অব্যাহত থাকবে। তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় আমরা তাদের পক্ষে অংশগ্রহণ করব।

মুসলমানদের মধ্যে সবার মর্যাদা সমান। যুদ্ধক্ষেত্রে কোন মুসলমান শত্রুদের সাথে সন্ধি করলে সকল মুসলমান তা গ্রহণ করবে। কিন্তু কোন মুসলমান ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে কাফেরদের সাথে সন্ধি করতে পারবে না।

অমুসলিমদের যারা আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, তারা পর্যায়ক্রমে মোরচা বা আত্মরক্ষা ব্যুহে আসবে। কাফেরদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে মুসলমানরা একে অপরের সাহায্য করবে। মদীনার মুশরিকদের যারা এই চুক্তিতে শরীক থাকবে, তারা মক্কার কুরাইশদের কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে না কিংবা তাদের কারো ধন-সম্পদ দেখাশোনা করতে পারবে না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার কোন কুরাইশকে সাহায্যও করতে পারবে না। অন্যায়ভাবে যদি কেউ কোন মুসলমানকে হত্যা করে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা যদি হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা যায়, তা'হলে হত্যাকারীর শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। তবে নিহতের উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিলে কিংবা রক্তপাতের ক্ষতিপূরণ গ্রহণে সম্মত হলে তার মৃত্যুদণ্ড রহিত করা হবে।

সকল মুসলমানের সম্মতিক্রমে এই চুক্তি সম্পাদন করা হলো। এখন থেকে এর কোন ধারা কোন মুসলমান অমান্য বা অস্বীকার করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রতিটি মুসলমান এই চুক্তি অবশ্যই মেনে চলবে।

কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয়া কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয়। যদি কেউ এই অন্যায় কাজ করে কেয়ামতের দিন তার উপর আল্লাহ তা'আলার গযব পড়বে। তার কোন পুণ্য কবুল করা হবে না। এই গোনাহ ক্ষমাও করা হবে না। মুসলমানদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এ ব্যাপারে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মুসলমানরা যুদ্ধে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করলে এই সঙ্গে ইহুদীদেরও নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে।

বনী আওফ-এর ইহুদীরাও এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। যদিও মুসলমান ও ইহুদীদের নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম করার অধিকার রয়েছে, কিন্তু যৌথ উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনায় উভয় সম্প্রদায়কে একই দলভুক্ত হিসাবে গণ্য করা হবে। মুসলমান ও ইহুদীদের ক্রীতদাসরাও তাদের প্রভুদের মতো এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

চুক্তিভুক্ত যে কোন ব্যক্তি চুক্তির কোন ধারা লংঘন করবে, তার জন্য সে তার নিজের এবং নিজ বাড়িঘরের ক্ষতির দায়িত্ব নিজেই বহন করবে। বনী আওফের ইহুদী এবং মুসলমানদের মতো বনী নাজ্জার, বনী হারিস, বনী সায়েদা, বনী জুশাম, বনী আওস, বনী ছা'লাবা, বনী জুফনা, বনী শাবাতায় প্রমুখ গোত্রের ইহুদীরাও এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত কোন লোককে মহানবী (সা)-এর অনুমতি ছাড়া চুক্তি থেকে বের করা যাবে না।

প্রত্যেক হত্যাকারীকে শাস্তি দিতে হবে। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে কাউকে হত্যা করবে এর দায়-দায়িত্ব হত্যাকারীকেই বহন করতে হবে। সে যদি পালিয়ে যায়, তাহলে তার উত্তরাধিকারীদের থেকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যদি কেউ কোন মজলুম বা নিপীড়িতের হাতে নিহত হয়, তাহলে এই হত্যার বিধান ভিন্নরূপ হবে। অর্থাৎ হত্যার ক্ষতিপূরণ কম করা যাবে অথবা মাফও করে দেয়া যাবে।

কোন ব্যক্তিকে তার মিত্রের অপরাধের জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু মজলুমের ফরিয়াদে যে কোন অবস্থায়ই সাড়া দিতে হবে। মুসলমানদের সামরিক অভিযানের সময় ইহুদীদেরকেও মুসলমানদের আর্থিক সাহায্য করতে হবে। কেননা বন্ধুর পক্ষ থেকে কোনরূপ ক্ষতি না হওয়া পর্যন্ত কিংবা সে কোন প্রকার অন্যায় না করা পর্যন্ত নিজের প্রাণ এবং ধন-সম্পদের মতো বন্ধু ও তার ধন-সম্পদ রক্ষা করা পবিত্র দায়িত্ব। বন্ধু বা মিত্রের সমস্যাবলি সমাধানের জন্য অপর বন্ধুকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে।

এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত কোন সম্প্রদায় কিংবা ব্যক্তি যদি চুক্তির কোন ধারা লংঘন করে কিংবা তার দ্বারা যদি চুক্তি বিপন্ন হয়ে ওঠে, তাহলে তাকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুলের নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

এই চুক্তি অনুযায়ী কেউ কুরাইশদের আশ্রয় দিতে পারবে না। এমনকি তাদের সাহায্যকারীদেরও আশ্রয় দিতে পারবে না। যদি কোন জাতি মদীনা আক্রমণ করে, তাহলে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সবাইকে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করতে হবে। যদি মদীনার উপর হানাদার কোন শক্তি মুসলমানদের সাথে সন্ধি করতে চায়, তাহলে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সবাইকে একমত হয়ে সন্ধি করতে হবে। অনুরূপ যদি মুসলমান ছাড়া চুক্তির অন্য কোন শরীক আক্রান্ত হয় এবং সে আক্রমণকারীর সঙ্গে সন্ধি করতে চায়, তাহলে মুসলমানদেরও এই সন্ধি মেনে চলতে হবে। তবে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত কোন গোত্র বা সদস্যের ধর্মীয় মতবাদের উপর আক্রমণ করা হলে অপর শরীক এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে না।

চুক্তির অন্তর্ভুক্ত কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি তাদের সম্পর্কে চুক্তিপত্রে যে সব সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করা হয়েছে কেবলমাত্র তাই ভোগ করতে পারবে। আওস গোত্রের ইহুদী এবং তাদের ক্রীতদাসদেরকে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত অন্যদের উপর কোন প্রকার অগ্রাধিকার দেয়া হবে না। এসব লোকের মধ্যে যে ব্যক্তি ন্যায়নিষ্ঠার সাথে চুক্তি অনুসরণ করবে, আল্লাহ তা'আলার নিকট সে-ই উত্তম বলে বিবেচিত হবে। এই চুক্তি কোন অত্যাচারী এবং অপরাধীকে সহায়তা করবে না।

চুক্তিবদ্ধ কোন সদস্য মদীনা কিংবা মদীনার বাইরে নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। কোন অপরাধ ছাড়া তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। যে ব্যক্তি ভাল কাজ করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি শান্তি রয়েছে।

রাজনৈতিক বিজয়

মদীনার এই সনদ বা চুক্তি একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক কীর্তি। এটি আজ থেকে চৌদ্দ শ' বছর আগে মহানবী (সা) সম্পাদন করেন। এই চুক্তির ভিত্তিতে মদীনায় মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা স্বীকৃতি লাভ করে। এর মাধ্যমে মানব জীবনের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। মদীনার অধিবাসীদের ধন-সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। অপরাধীদের শাস্তি বিধানের জন্য ছিল এটি একটি মহাসনদ। এই চুক্তির ফলে মদীনায় বসবাসকারীদের জন্য উক্ত শহর একটি শান্তিময় জনপদে পরিণত হয়। সে যুগে চারদিকে জুলুম-অত্যাচার, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও জোর-জবরদস্তি পুরোদমে চলছিল। আর এরূপ কলুষময় রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে মহানবী (সা) উক্ত ঐতিহাসিক চুক্তিটি সম্পাদন করেন। বস্তুত উক্ত চুক্তির মাধ্যমে মদীনার অধিবাসীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন অত্যন্ত উন্নতি লাভ করে।

প্রথমদিকে মদীনার ইহুদীদের মধ্যে বনু কোরায়যা, বনু নযীর ও বনু কায়নুকা গোত্র উক্ত চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু কিছুদিন পরই এই তিনটি গোত্র নিজেদেরকে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। চুক্তি অনুসরণের ফলশ্রুতি হিসাবে মদীনা শহর ও আশপাশের এলাকা সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সবার মধ্যে এই উপলব্ধি হয় যে, মদীনা শহর আক্রান্ত হলে যে-কোন মূল্যে শহরের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে। এজন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করা চলবে না। এ ধরনের প্রতিটি ব্যাপারে একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে যেতে হবে। তাতে করে এই শহরের সম্মান ও মর্যাদায় কোন প্রকার আঘাত আসবে না।

রাসূল (সা)-এর গৃহে হযরত আয়েশা (রা)-এর আগমন

মদীনার সনদ বা চুক্তি সম্পাদনের পর মহানবী (সা) কিছুটা স্বস্তি বোধ করেন। মুসলমানরাও নিজেদের অনেকটা নিরাপদ মনে করেন। যে ইবাদত যে পদ্ধতিতে আদায় করা ফরয করা হয়েছে মুসলমানরা সেভাবে সেসব ইবাদত আদায় করার স্বাধীনতা লাভ করে। এখন আর কোন বিরোধী তাদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার-নির্যাতন কিংবা চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না। তাতে মুসলমানরা নিজেদের মদীনায় বেশ নিরাপদ ভাবতে থাকে। তাতে করে চুক্তি সম্পাদনের পর মদীনায় বিভিন্ন মতাবলম্বীর মধ্যে একটা হৃদয়তামূলক পরিবেশ গড়ে ওঠে।

মদীনায় এরূপ একটা সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠার পর মহানবী (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে উঠিয়ে আনার মনস্থ করেন। তার আগে হযরত আয়েশার সাথে মহানবী (সা)-এর আকদ হয়েছিল। এ সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর বয়স হয়েছিল দশ কিংবা এগারো বছর। তাঁর শারীরিক গঠনও বয়স অনুপাতে হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা)-কে মহানবী (সা)-এর ঘরে উঠিয়ে আনা হয়। কম বয়সের দরুন তখনও তাঁর খেলাধুলার মোহ কাটেনি। মহানবী (সা) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। পিত্রালয়ের মতো এখানেও তাঁকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি হাঁড়ি-পাতিল ও অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম নিয়ে প্রায়ই ব্যস্ত থাকতেন। মহানবী (সা) তাতে এতটুকু বিরক্তিবোধ করতেন না। এমনকি তাঁর খেলাধুলায় কখনও হস্তক্ষেপও করতেন না। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা)-ও মক্কা থেকে মদীনায় তশরীফ এনেছিলেন। হযরত আয়েশাকে তাঁরই কক্ষে উঠানো হয়। এই কক্ষটি ছিল মসজিদে নববীর খুবই নিকটে।

যাকাত ও রোযার বিধান

এ সময়ে মুসলমানরা মদীনায় বেশ শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি শরীয়তের তিনটি বিধান ফরয বা বাধ্যতামূলক করেন। এগুলো হচ্ছে-যাকাত, রোযা ও হুদুদ বা শাস্তি। এসময়ে মদীনায় ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তির সূচনা হয়।

আযান প্রবর্তন

মহানবী (সা) মদীনায় আসার পরও নামায আদায়ের জন্য কোন ঘোষণা বা ধ্বনি দেওয়া হতো না। নামাযের সময় হয়ে আসলে মুসলমানরা সবাই মসজিদে এসে জড়ো হতেন এবং

নামায আদায় করা হতো। এক পর্যায়ে মহানবী (সা) ভাবলেন, ইহুদীদের মতো আমরাও শিঙ্গার মাধ্যমে মুসলমানদের নামাযের জন্য উপস্থিত হওয়ার আহবান জানাতে পারি। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি এই ধারণা ত্যাগ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন, খ্রিস্টানদের মতো শঙ্খ বাজিয়ে নামাযের জন্য আহবান করা যেতে পারে। কিন্তু হযরত ওমর (রা) ও অন্যান্য মুসলমানের পরামর্শ অনুযায়ী মহানবী (সা) এই প্রস্তাবও পরিবর্তন করেন। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার ওহীর ইঙ্গিতে শঙ্খ বাজানোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অবশেষে আযান দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মহানবী (সা) এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে ছা'লাবাকে নির্দেশ প্রদান করেন, “হে আবদুল্লাহ! বিলালকে আযান দেয়ার জন্য বলো। তুমিও তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আযানের বাক্যগুলো উচ্চারণ করবে। কারণ তোমার আওয়াযের চাইতে বিলালের কণ্ঠস্বর অনেক জোরাল।”

মসজিদে নববীর সঙ্গেই বনু নাজ্জার গোত্রের এক মহিলার বাড়ি ছিল। এ বাড়িটি ছিল মসজিদে নববীর চাইতে উঁচু। হযরত বিলাল (রা) উক্ত বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। এভাবে মদীনার বাসিন্দারা প্রত্যেক ফজরের নামাযের সময় আযান-এর বাক্যগুলোর মাধ্যমে ইসলামের আহবান শুনত। তারা শুনতে পেত, এক ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে মিষ্টি সুরে থেমে থেমে আযানের বাক্যগুলো উচ্চারণ করছেন। তাঁর কণ্ঠধ্বনি মদীনার আকাশে-বাতাসে নিনাদিত হচ্ছে। আযানের প্রতিটি বাক্য শূন্যে ঘূর্ণায়মান বায়ুতরঙ্গ মদীনায় বসবাসকারী প্রতিটি লোকের কর্ণকুহরে পৌঁছে দিচ্ছে। আযানের এসব বাক্য আজও মুসলিম বিশ্বের আনাচে-কানাচে প্রতিদিন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আযানের বাক্যগুলো হলো :

الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر - اشهد ان لا اله الا الله اشهد
ان لا اله الا الله - اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول
الله - حي على الصلوة حي على الصلوة - حي على الفلاح حي على
الفلاح - الله اكبر الله اكبر - لا اله الا الله -

এই আযান প্রথা প্রবর্তনের ফলে মুসলমানদের মন থেকে ভয়-ভীতি চলে যায়। তাদের জীবনধারা শান্তিময় হয়ে ওঠে। তাতে করে ইয়াসরিব মদীনাতুর রাসূল বা রাসূলের শহর হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। শহরের অমুসলিম বাসিন্দাদের মনে এই প্রত্যয় জন্মে যে, ইয়াসরিব বা মদীনার মুসলমানরা একটি শক্তিশালী জাতি। তাদের শক্তির উৎস হচ্ছে তাদের ঈমান। এই ঈমান রক্ষার জন্য তাঁরা যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তাদের উপর জয়লাভ করা আমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাছাড়া তারা অতীতেও প্রাক-হিজরত জীবনে তাদের ঈমান রক্ষার জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে, অনেক প্রতিকূলতার মোকাবেলা করেছে। আজ প্রকৃতি তাদের এই অসাধারণ ধৈর্য ধারণের পুরস্কার প্রদান করেছে। তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মকর্ম করার শক্তি লাভ করেছে। মুসলমানদের মনেও এই চিত্র অংকিত হয়েছিল যে, মানুষ মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। এক মানুষের উপর অন্য মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। ইবাদত বা উপাসনা শুধু একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার জন্যই নিবেদিত। সকল মানুষ একমাত্র তাঁরই দরবারে

কান্নাকাটি করবে। নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করবে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের ভাল কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান করবেন এবং খারাপ কাজের জন্য শাস্তিও প্রদান করবেন।

এই পর্যায়ে মহানবী (সা) অবোধে তাঁর শিক্ষা ও মতাদর্শ প্রচার প্রসারের সুযোগ লাভ করেন। বিশেষ করে তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে কথার বাস্তবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাতে করে ইসলামী তামাদুনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামী তামাদুনের বুনিয়াদ

মহানবী (সা) সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে ইসলামী তামাদুনের ভিত্তি হিসাবে সাব্যস্ত করেন। তিনি বলেছেন : لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه “তোমাদের মধ্য থেকে কারো ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপর ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে।” এমনকি তিনি এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রেরণার ভিত্তিতেই মানুষের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শনের শিক্ষা দান করেন। এই দয়া ও সহানুভূতি এমন হবে, মানুষ তাতে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট অনুভব করবে না। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, “ইসলামের উৎকৃষ্ট আমল বা কাজ কোন্টি।” মহানবী (সা) বললেন : “تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف”-“মানুষকে খাওয়াবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সবাইকে সালাম করবে।”

মহানবী (সা) মদীনায সর্বপ্রথম ভাষণদান প্রসঙ্গে বলেছেন :

من استطاع ان يقى وجهه من النار ولو بشقة من تمر فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فان بها تجزى الحسنة عشر امثالها -

“কেউ ইচ্ছা করলে অর্ধেক খেজুর কাউকে দান করে জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। এটা সম্ভব না হলে মিষ্টি কথা দ্বারাও দোষখের আগুন থেকে মুক্তি পেতে পারে। কারণ প্রতিটি পুণ্য কাজের পুরস্কার দশগুণ পাওয়া যাবে।”

মদীনায প্রদত্ত দ্বিতীয় ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً واتقوه حق تقاته واصدقوا الله صالحا ماتقولون وتحابوا بروح الله بينكم ان الله يغضب ان ينتكث عهده .

“আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। তাঁকে পুরোপুরি ভয় করো। আল্লাহর রাস্তায় দান করো। আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে একে অপরকে ভালবাস। যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।”

মহানবী (সা) সাহাবাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করার সময় এবং মসজিদে ভাষণ দেয়ার সময় উপরোক্ত ধরনের কথাবার্তা বলতেন। মদীনার জীবনে প্রথম দিকে তিনি মসজিদে খোতবা বা ভাষণ দেয়ার সময় একটি খেজুর গাছের কাণ্ডের সাথে হেলান দিতেন। এরপর তাঁর নির্দেশে তিন সিঁড়ি বিশিষ্ট একটি মিম্বর বানানো হয়। প্রথম সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি ভাষণ দান করতেন। বসার সময় দ্বিতীয় সিঁড়িতে বসতেন এবং তৃতীয় সিঁড়ির সাথে হেলান দিতেন।

ভ্রাতৃত্বের বাস্তব রূপ

মহানবী (সা) শুধু কথার দ্বারাই মুসলমানদের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দান করতেন না। তাঁর প্রতিটি কাজও ছিল সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অনুপম দৃষ্টান্ত। মহানবী (সা) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল। তা সত্ত্বেও ক্ষমতা ও পদমর্যাদার প্রতি তাঁর মধ্যে স্বভাবজাত একটা ঘণাবোধ ছিল। তিনি সাহাবীদের বলতেন :

لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد الله فقولوا
عبد الله ورسوله -

“খৃষ্টানরা মরিয়ম পুত্রের প্রশংসায় যে বাড়াবাড়ি করে তোমরা আমার প্রশংসায় অনুরূপ করো না। আমি হচ্ছি আল্লাহর বান্দা। আমাকে তোমরা আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল বলবে।”

এরপর লাঠিভর দিয়ে মহানবী (সা) ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। সাহাবীরা দেখা মাত্র দাঁড়িয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের উদ্দেশে বলেন :

لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضهم بعضاً -

“আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তোমরা অনারবদের মতো দাঁড়াবে না। তারা একে অপরের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য অনুরূপ করে থাকে।”

মহানবী (সা) কোন মজলিসে গেলে মাঝখানে যাওয়ার চেষ্টা করতেন না। যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই বসে যেতেন। কোন কোন সময় সাহাবীদের সাথে হাসি-ঠাট্টাও করতেন। তাঁদের আলাপ-আলোচনায় শরীক হতেন। শিশু-কিশোরদের সাথে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতেন। শিশুদের কোলে বসিয়ে আদর করতেন। শরীফ, ক্রীতদাস, বাঁদী, ভিখারী নির্বিশেষে সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। তাদের আহবানে সাড়া দিতেন। মদীনা থেকে দূরদূরান্তে অসুস্থদের দেখতে যেতেন। কেউ কোন ব্যাপারে অপারগতা বা অক্ষমতা প্রকাশ করলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। কারো সাথে সাক্ষাতকালে সবার আগে সালাম দিতেন। তাদের সাথে হাসিমুখে করমর্দন করতেন। নামাযরত অবস্থায় কেউ নিকটে এসে বসলে নামায সংক্ষেপ করে আগন্তুককে তার প্রয়োজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। এরপর পুনরায় নামাযে আত্মনিয়োগ করতেন। ওহী নাযিল হওয়া, ধর্মীয় আলোচনা ও ভাষণ দানের সময় ছাড়া সব সময় তিনি মানুষের সাথে হাসিখুশি মন-মেজাজে মেলামেশা করতেন।

পারিবারিক কাজে তিনি সহযোগিতা করতেন। নিজের কাপড়-চোপড় নিজেই ধুতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, তালি লাগাতেন। পাপোশ সেলাই করতেন। বকরীর দুধ দুইতেন। নিজের উট নিজে বাঁধতেন। এভাবে তিনি নিজের কাজ নিজের হাতে করতেন। খাদেমদের সাথে একই পাত্রে খাওয়া-দাওয়া করতেন। কোন প্রকার সংকোচ করতেন না। তিনি অভাবী ও দুর্বলদের প্রয়োজন মিটিাতেন। কোন অভাবী ব্যক্তি আসলে নিজের প্রয়োজনের চাইতে, নিজের পরিবারবর্গের প্রয়োজনের চাইতে উক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন মিটানোকে অগ্রাধিকার

দান করতেন। ঘরে আগামী দিনের জন্য কোন কিছু সঞ্চয় করে রাখতেন না। এমনকি মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পর দেখা গেল তাঁর একটি বর্ম এক ইহুদীর নিকট তিনি বন্ধক রেখে গেছেন। খাদ্যশস্যের বিনিময়ে তিনি এটি বন্ধক রেখেছিলেন।

বিনয় ও প্রতিদানের তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। একবার আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর পক্ষ হতে একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় মহানবী (সা)-এর খেদমতে আসে। তাদের সেবা-যত্নের ভার তিনি নিজে গ্রহণ করেন। সাহাবীরা বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই কাজ আমাদের উপর ছেড়ে দিন।” মহানবী (সা) বললেন, “আবিসিনিয়ার লোকেরা আমার সাহাবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছে। আমি তাদের এই সহানুভূতির প্রতিদান দিতে চাই।” উম্মুল মু’মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুর পর তাঁর আলোচনা উঠলে তিনি তাঁর গুণাবলি বর্ণনা করতেন। এ জন্য হযরত আয়েশা (রা) বলতেন, “রাসূলুল্লাহর মুখে বিবি খাদীজার প্রশংসা শুনে আমার অত্যন্ত ঈর্ষা হতো। রাসূলের অন্য কোন স্ত্রীর বেলায় আমার মনে এমন ঈর্ষার উদয় হতো না।” একবার এক মহিলা মহানবী (সা)-এর খেদমতে আসেন। মহানবী (সা) তাঁর সাথে অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়ে কথাবার্তা বলেন। তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। উক্ত মহিলা চলে যাওয়ার পর মহানবী (সা) বললেন, “এই মহিলা হযরত খাদীজার জীবিতকালে আমাদের এখানে আসা-যাওয়া করতেন। বস্ত্রত বন্ধুত্ব এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ঈমানের নিদর্শন।” মহানবী (সা) ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক ও সরল মেজাজের লোক। নামায আদায় করার সময় তাঁর নাতি-নাতনীরা তাঁর সাথে খেলতেন। তিনি তাদের বারণ করতেন না। একবার নামায আদায়কালে মহানবী (সা) হযরত যয়নব (রা)-এর শিশুকন্যাকে কাঁধে বসিয়ে নিয়েছিলেন। সেজদায় যাওয়ার সময় তিনি তাঁকে মাটিতে বসিয়ে দিতেন। উঠার সময় পুনরায় কাঁধে বসিয়ে নিতেন।

জীবের প্রতি দয়া

মহানবী (সা)-এর দয়া ও অমায়িক ব্যবহার শুধু মানব জাতির মধ্যে সীমিত ছিল না, পশু-পাখির প্রতিও ছিলেন তিনি অত্যন্ত সদয়। কোন বিড়াল আশ্রয় নেয়ার জন্য ঘরে আসতে চাইলে নিজে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেন। কোন মোরগ রোগাক্রান্ত হলে তিনি নিজে তার দেখাশোনা করতেন। নিজের জামার আস্তিন দ্বারা ঘোড়ার পিঠ মুছে দিতেন। একবার হযরত আয়েশা (রা) তাঁর উটকে দ্রুত চলার জন্য কঠোরভাবে তাড়া করেন। মহানবী (সা) বললেন, “হে আয়েশা! উটের সাথে অমায়িক ব্যবহার কর।” সারকথা, মহানবী (সা)-এর দয়া মানুষ, জীবজন্তু নির্বিশেষে সবার জন্য অব্যাহত ছিল। কেউ তা থেকে বঞ্চিত হতো না।

ইনসাফ ও ন্যায়বিচার

মহানবী (সা)-এর এই অমায়িকতা ও সহৃদয়তা নিছক ভয়ভীতি কিংবা দুর্বলতার কারণে ছিল না। এটা তাঁর কোন প্রকার অভিনয় কিংবা লোক দেখানোর জন্যও ছিল না। এটা ছিল তাঁর আল্লাহুভীতি এবং আন্তরিক ভ্রাতৃত্ববোধের অভিব্যক্তি। আর এই গুণ মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীদের চরিত্রে পুরোপুরি ছিল। এই তথ্যের প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, ইসলামী তামাদ্বুনের বুনিয়াদ অন্যান্য জাতির তামাদ্বুনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনেরও। ইসলামে সাম্য ও

মৈত্রী বা ভ্রাতৃত্ববোধ পরস্পর সম্পৃক্ত। ইসলামী নীতিমালার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ভ্রাতৃত্ববোধের বুনিয়াদ ইনসাফ ও ন্যায়বিচার ছাড়া সুদৃঢ় করা সম্ভব নয়। এ কথাই পবিত্র কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে :

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ .

“সুতরাং যে কেউ তোমাদের আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে।”

(২ : ১৯৪)

পবিত্র কোরআনের অপর এক জায়গায় বলা হয়েছে :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

“হে সচেতন ব্যক্তিগণ! কিসাসের^১ মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।” (২ : ১৭৯)

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত ভাষ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহানুভূতির বুনিয়াদ হওয়া উচিত। আর যাদের অন্তরে মানবপ্রেম রয়েছে, যারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না কেবলমাত্র তাদের মধ্যেই এই গুণ বা বৈশিষ্ট্যের আশা করা যেতে পারে। কিন্তু যারা পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার ভয়ে ভীত হয়ে নিজেকে খোদাভীরু হিসাবে প্রকাশ করে থাকে, তাদের স্বভাবে সত্যিকারের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ আশা করা যায় না।

রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা কেবলমাত্র মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, হিজরতের মাধ্যমে তাঁরা কুরাইশদের অত্যাচারের খড়গ কৃপাণের বাইরে চলে যেতে পারবেন। স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে পারবেন। তাতে কোন মু‘মিনের কুপ্রবৃত্তি তাঁর উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হবে না। কারণ মানুষের আত্মার উপর তার কুপ্রবৃত্তির প্রভাব তাকে জড়বাদের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাতে মানুষের জ্ঞানকে কামনা-বাসনা বশ করে ফেলে। এর পরিণতিতে মানব জীবনের গতিই মূল লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ে। বস্তুত গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, স্বভাবজাত ভাবেই মানুষের মন কামনা-বাসনার উর্ধ্বে। এমনকি কামনা-বাসনাই মানব মনের নিয়ন্ত্রণে। আমরাও চেষ্টা করলে আমাদের মনকে অনুরূপ বলিষ্ঠ করে তুলতে পারি।

তাকওয়া ও নির্লোভ জীবন

মহানবী (সা)-এর জীবন ধারা ছিল তাকওয়া ও পরহেযগারীর মূর্ত প্রতীক। তিনি ছিলেন সকল প্রকার কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসার উর্ধ্বে। আগামীকাল খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে, এ নিয়ে তাঁর এতটুকু চিন্তা-ভাবনা ছিল না। তাঁর নিকট যাই থাকত অভাবীদের বিলিয়ে দিতেন। তাঁর দানশীলতা ও বদান্যতা দেখে একজন সাহাবী বলেছিলেন, “দান করা কিংবা কাউকে কিছু দেয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের প্রয়োজন ও অভাব-অনটনের কথা মোটেও খেয়াল করতেন না।” সত্যিকথা বলতে কি, লোভ-লালসা মহানবী (সা)-এর

১. ‘কিসাস’ শব্দের অর্থ হচ্ছে খুনের বদলা খুন বা মৃত্যুদণ্ডের বিধান।

উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করবে! লোভ-লালসাই বরং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, তাঁর নির্দেশে চলত। মূলত বস্তুজগতের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণই ছিল না। এই গুণ ছাড়াও মহানবী (সা)-এর মহান ব্যক্তিত্বে আর একটা বিষয় সব সময় কার্যকর ছিল। তিনি প্রতিটি বস্তুর অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটন নিয়ে সব সময় চিন্তা-ভাবনা করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল।

যে কোন ধরনের আরাম-আয়েশময় জীবন-যাপনের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি কৃচ্ছতার জীবন-যাপন করতেন। তাঁর পবিত্র বিছানা ছিল চামড়ার। তাতে খেজুরের পাতা ভর্তি ছিল। মানব জাতির মুক্তির দিশারী এই মহামানব কখনো পেট ভরে আহার গ্রহণ করতেন না। একাধারে দুই দিন কখনো তিনি যবের রুটি আহার করেননি। তাঁর সাধারণ খাবার ছিল খেজুর। আর বিশেষ খাবার ছিল ছাতু। তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা মাংসের গুরায় রুটি ভিজিয়ে খাবার খুব কমই সুযোগ পেতেন। অধিকাংশ সময় অর্ধাহার-অনাহারে কাটাতেন। ক্ষুধার যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য পেটে পাথর বেঁধে নিতেন। মোটকথা, এই ছিল মহানবী (সা)-এর সাধারণ খাদ্য-তালিকা। অবশ্য কোন কোন সময় ভাল খাবারও জুটে যেতো।^১ ছাগলের পায়া, কদু ও মধু ছিল তাঁর প্রিয় খাবার।

খাবারের ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতিও তিনি কোন প্রকার গুরুত্ব প্রদান করতেন না। একদিন এক মহিলা মহানবী (সা)-কে একটি চাদর উপহার হিসেবে প্রদান করেন। সে সময়ই এক ব্যক্তি মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। লোকটি এক মৃতের কাফনের কাপড় প্রার্থনা করেন। মহানবী (সা) উক্ত চাদর লোকটিকে দিয়ে দেন। অথচ তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাপড়ের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তাঁর সাধারণ পোশাক ছিল একটি কোর্তা, উল, সুতা কিংবা তছরের একটি চাদর। কোন প্রতিনিধিদলের সাক্ষাতের সময় তিনি একটি ইয়ামনী আবা পরিধান করতেন। তিনি সাধারণ জুতা পরতেন। অবশ্য আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এক জোড়া মূল্যবান জুতা ও সালওয়ার জাতীয় একটি পোশাক মহানবী (সা)-কে উপহার হিসাবে প্রেরণ করেন। কখনো কখনো তিনি এগুলোও ব্যবহার করতেন। মহানবী (সা)-এর এরূপ অসাধারণ পরহেযগারী ও কৃচ্ছসাধনার সাথে ধর্মীয় বিধানের কোন সম্পর্ক ছিল না। অর্থাৎ এরূপ জীবনধারাকে তিনি তাঁর উম্মতের জন্য প্রযোজ্য করেননি। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

“আমি তোমাদের যা দান করলাম, তা থেকে ভাল ভাল বস্তু আহার করো।” (২ : ১৭)

পবিত্র কোরআনে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ .

১. মহানবী (সা)-এর মাঝে-মধ্যে ভাল খাবার গ্রহণের পিছনেও একটা বিরাট তাৎপর্য ছিল। তাঁকে অনুসরণ করে যাতে কোন উম্মত খাবার-দাবারের ব্যাপারে চরম কৃচ্ছতা গ্রহণ না করে, সেজন্যই সম্ভবত তিনি কখনো কখনো ভাল খাবার গ্রহণ করতেন। -অনুবাদক

“আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তার দ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান করো। ইহলোকে তোমার বৈধ সম্মোগকে তুমি উপেক্ষা করো না। তুমি সদাশয় হও যেমন তোমার প্রতি আল্লাহ্ সদাশয়।” (২৮ : ৭৭)

মহানবী (সা)-এর এক হাদীসে বলা হয়েছে :

احرث لدنياك كأنك تعيش ابداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً -

“পৃথিবীর জন্য সংগ্রাম করো এই ভেবে যে, এখানে তোমাকে চিরকাল জীবিত থাকতে হবে। আর পরকালের জন্য আমল কর এই কল্পনা করে যে, আগামীকালই তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।”

মানুষ যাতে দুর্বল ও হতাশ না হয়ে পড়ে, তার জন্যই মহানবী (সা) মানবজাতির সামনে উপরোক্ত আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। কারণ সাধারণত দেখা যায়, ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধিই সমাজে মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বাহন হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু সত্যিকার মানব সন্তানদের নিকট এসব মেকি শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কোন মূল্য নেই। মুসলমানদের যাতে এ ধরনের মেকি শ্রেষ্ঠত্বের ভূত না পেয়ে বসে তার জন্যই মহানবী (সা) বিলাসময় জীবন-যাপনের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুসারীদের সামনে কৃচ্ছতার উপরোক্ত আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তবে তা তিনি কারো জন্য বাধ্যতামূলক করেননি। কিন্তু কোন মানুষ যখন মানবতার উক্ত স্তরে পৌঁছায়, তখন সবাই তাঁর অনুসরণ নিজের জন্য বাধ্যতামূলক মনে করে। এরূপ মহামানবের তরে নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করে না। মহানবী (সা)-এর জীবনাদর্শ ছিল এরূপ মহামানবের জীবনধারার একক দৃষ্টান্ত।

ইসলাম ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের সাথে সাথে ক্ষমার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কিন্তু ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য শক্তি-সামর্থ্য থাকা চাই। কারণ দুর্বল ব্যক্তির ক্ষমা প্রদর্শনের কোন মূল্য নেই। প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়, কেবলমাত্র তখন তা গুরুত্ব বহন করে।

মহানবী (সা) কিরূপ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, হযরত আলী (রা)-এর একটি বর্ণনা থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার সুনত কি? তিনি বললেন :

المعرفة رأس مالى - والعقل اصل دينى - والحب اساسى - والشوق مركبى وذكر الله انيسى والثقة كنزى - والحزن رفيقى - والعلم سلاحى - والصبر رداى - والرضا غنيمتى - والفقر فخرى والزهد حرفتى - واليقين قوتى - والصدق شفيعى - والطاعة حسبى والجهاد خلقى - وقرة عينى فى الصلوة -

“মা’রেফাত বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান হচ্ছে আমার সম্পদ, যুক্তিজ্ঞান হচ্ছে আমার ধর্মের বুনিয়াদ, প্রেম-প্রীতি হচ্ছে আমার কাজের ভিত্তি, উৎসাহ-উদ্দীপনা হলো আমার বাহন,

আল্লাহর যিকির আমার সাথী, বিশ্বাস আমার কোষাগার, চিন্তা আমার জীবনপথের বন্ধু, ইল্ম বা জ্ঞান হচ্ছে আমার হাতিয়ার, ধৈর্য আমার চাদর, সন্তুষ্টি আমার সম্পদ, দারিদ্র্য আমার গর্ব, কৃচ্ছ্রতা আমার ভূষণ, ইয়াকীন হচ্ছে আমার শক্তি, সততা আমার সুপারিশকারী, কব্বী ইবাদত আমার প্রাচুর্যের উপকরণ, সংগ্রাম আমার স্বভাব এবং নামায হচ্ছে আমার প্রশান্তি।”

ইহুদীদের বিরোধিতা

মদীনা এবং আশপাশ এলাকার লোকদের মনে মহানবী (সা)-এর শিক্ষা বেশ রেখাপাত করে। মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। মদীনায় মুসলমানদের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলে। ইসলামের এই ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে ইহুদীরা উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়ে। মহানবী (সা)-এর সাথে চুক্তি করার সময় তারা আশা করেছিল মুসলমানদের তারা বন্ধু হিসাবে পাবে। মুসলমানদের সাহায্য নিয়ে তারা খৃষ্টানদের পরাজিত করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। মুসলমানরাই বরং ইহুদী এবং খৃষ্টানদের চাইতে অধিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তির অধিকারী হয়ে বসেছে। শুধু তাই নয়, দিন দিন মুসলমানদের শক্তি বেড়েই চলেছে। মহানবী (সা) কখনও কখনও ভাবতেন কুরাইশরা তাকে এবং তাঁর শিষ্যদের কিরূপে মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য করেছে। এমনকি কোন কোন মুসলমানকে তারা ধর্মচ্যুত করেছে। এদিকে ইহুদীরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ধর্ম প্রচার এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়তে দেবে কিনা। আর নিজেরা তাঁর নেতৃত্বে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পদ সংগ্রহ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে কিনা। তাদের যদি এ বিশ্বাস হতো যে, মহানবী (সা)-এর ধর্মপ্রচার তাদের উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করবে না, তাহলে হয়তো তারা নিজেদের অবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিল না। তাছাড়া তাদের ধর্মের শিক্ষা ও আন্তরিক ইচ্ছা এই ছিল যে, বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্য কোন বংশে কোন ব্যক্তির নবুয়ত তারা স্বীকার করবে না। আর বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ে নবুয়ত যেতেও পারে না!

এ পর্যায়ে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইহুদী আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকেও ইসলামে দীক্ষিত করেন। তিনি ইহুদীদের অপবাদের আশংকা করে মহানবী (সা)-এর খেদমতে এসে একদিন বলেন, “আমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করার আগে আপনি আমার সম্পর্কে ইহুদীদের অভিমত গ্রহণ করুন।” মহানবী (সা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইচ্ছানুযায়ী ইহুদীদেরকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারা জবাব দিল, “আবদুল্লাহ ইবনে সালাম আমাদের নেতা। তাঁর পিতাও আমাদের নেতা ছিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে একজন জ্ঞানী ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।” কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ যখন তাদের সামনে এসে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন, তখন তারা হযরত আবদুল্লাহ (রা)-কে গালিগালাজ করা শুরু করে। শহরের প্রতিটি ইহুদী গোত্রে হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর সমালোচনা শুরু হয়। ইহুদীদের এই ভূমিকা দেখে মদীনার মুশরিক এবং আউস ও খায়রাজ গোত্রের মুনাফিকরাও ইহুদীদের সাথে মিলিত হয়। তারা ভাবে, এবার তারা ইহুদীদের সাহায্যে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করতে পারবে।

নবী করীম (সা) ও ইহুদী

মক্কায়া মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে যে ধরনের ঝগড়া-ফাসাদ ছিল, মদীনায়া মুসলিম-ইহুদী দ্বন্দ্ব-কলহ ও সংঘাত তার চেয়েও চরম রূপ ধারণ করে। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের ইতিহাস ইহুদীদের ভালো জানা ছিল। এমনকি তাদের শিক্ষা ও মতবাদ সম্পর্কেও তারা বেশ ওয়াকিফ ছিল। কিছু ইহুদী লোক দেখানোর জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা সব সময় নিজেদের ধর্মপরায়ণতা প্রচার করে বেড়াতো। কখনো কখনো তারা নিজেদের সন্দেহ দূর করার নাম করে নানা ধরনের প্রশ্ন করত। আসলে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বুনিয়াদ নড়বড়ে করাই ছিল তাদের এসব প্রশ্নের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এসব প্রশ্নের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের মনে নানা সন্দেহের সৃষ্টি করে ধর্মচ্যুত করার চেষ্টা করত। এভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের শত্রুতা চরম আকার ধারণ করে। এমনকি তাওরাতের যেসব জায়গায় মহানবী (সা) ও তাঁর রিসালাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেগুলোও তারা অস্বীকার করা শুরু করে। মুনাফিকরাও মহানবী (সা)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করা শুরু করে।

অথচ এতদিন সকল ইহুদী, মুশরিক এবং মুনাফিকরাও আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি তাদের বিশ্বাসের কথা জোর গলায় দাবি করে আসছিল। এমনকি পৌত্তলিকরাও আল্লাহকে স্বীকার করত। অবশ্য তারা তাদের প্রতিমাদেরও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসাবে মনে করত। এত কিছু সত্ত্বেও তারা সবাই মিলে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ তা'আলা তো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাঁকে কে সৃষ্টি করেছে? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে সূরা ইখলাস পাঠ করে শোনান:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ - وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

“বল, তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ সর্ব বিষয়ের নির্ভর। তিনি জনক নন এবং জাতকও নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।”

আউস ও খায়রাজ

মুসলমানরাও ইহুদীদের উপরোক্ত ষড়যন্ত্র ও কূট-পরিকল্পনার কথা জেনে ফেলে। একদিন দেখা গেল, কয়েকজন ইহুদী মসজিদে নববীতে বসে কানাঘুষা করছে। মহানবী (সা) তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বদ্ স্বভাবের ইহুদীদের মধ্যে এই হুমকির খুব একটা প্রতিক্রিয়া হলো না। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখল। শাস ইবনে কায়েস নামের এক ইহুদী দেখল আউস ও খায়রাজ গোত্রের কয়েকজন মুসলমান একই স্থানে মিলেমিশে বসে আছে। তাদের মধ্যে এরূপ ঐক্য ও সংহতি দেখে শাসের মন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। এক ইহুদী যুবকও সেখানে বসা ছিল। শাস তাকে ইঙ্গিত দিয়ে ডেকে আনল। তাকে বলল, তুমি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুয়াছ যুদ্ধ এবং তাতে খায়রাজদের পরাজয়ের ঘটনাবলি তাদের স্মরণ করিয়ে দাও। উক্ত ইহুদী যুবক তাই করল। এর পরিণামে হিংসা ও বিদ্বেষের অগ্নিশিখা পুনরায়

জ্বলে উঠল। আউস ও খায়রাজ গোত্রের লোকেরা একে অপরকে গালি-গালাজ শুরু করল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে উঠল, “তোমরা যদি পুনরায় যুদ্ধ করতে চাও আমরাও তার জন্য প্রস্তুত আছি।”

এ খবর মহানবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছায়। তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি আউস ও খায়রাজদের মিলিত সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, “ইসলাম তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতির বীজ বপন করে দিয়েছে। এখন তোমরা একে অপরের ভাই। এই সঙ্গে তিনি ইসলামের সৌন্দর্যগুলোও তাদের সামনে তুলে ধরেন। মহানবী (সা) বেশ কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন। শ্রোতাদের চোখে অশ্রুর বন্যা নেমে আসে। প্রেম-প্রীতির আতিশয্যে তারা একে অপরের গলা জড়িয়ে ধরে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ইহুদীদের এই ঝগড়া চরম রূপ ধারণ করে। পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার পরপর কয়েকটি আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা নিসায়ও তা আলোকপাত করা হয়েছে। তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের গ্রন্থে মহানবী (সা)-এর রিসালাত সম্পর্কিত ভাষ্য কিভাবে অস্বীকার করেছে। পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতগুলোতে তাদের অভিসম্পাতও করা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল :

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ - أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ . وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ - بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ . وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ .

“এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তারপরে পর্যায়ক্রমে রাসূলদের পাঠিয়েছি, মরিয়ম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ এবং কিছু সংখ্যককে মিথ্যে প্রতিপন্ন করেছ এবং কিছু সংখ্যককে হত্যা করেছ! তারা বলেছিল, ‘আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত।’ হ্যাঁ, সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে। তাদের নিকট যা আছে আল্লাহর নিকট থেকে যখন তার সমর্থক কিতাব আসল ; যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত, তবু তারা যা জ্ঞাত ছিল তা যখন তাদের নিকট আসল, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত।” (২ : ৮৭-৮৯)

ফিনহাসের কাহিনী

মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া-ফাসাদ লেগেই ছিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি দিন দিন বেড়েই চলছিল। এক পর্যায়ে তা সংঘর্ষের রূপ লাভ করে। হযরত আবু বকর (রা) ও ফিনহাস নামক এক ইহুদীর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক স্বভাবের লোক। একদিন ফিনহাসের সাথে হযরত আবু বকর (রা)-এর আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। তিনি ফিনহাসকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন। ফিনহাস প্রতি-উত্তর দান প্রসঙ্গে বলল, “হে আবু বকর! আমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী নই। তিনি বরং আমাদের মুখাপেক্ষী। তোমার বন্ধুর উক্তির মধ্যেও আমার দাবির সমর্থন রয়েছে। তিনি বলেছেন :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً -

“কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন।” (২ : ২৪৫)

ফিনহাস আরও বলল, “আল্লাহ উল্টো আমাদের নিকট হাত পাতছেন, যেন আমরা বিত্তবান আর তিনি বিত্তহীন। তিনি আমাদের সুদ খেতে বারণ করেছেন। অপরদিকে নিজে সুদ দেয়ার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন।” হযরত আবু বকর (রা) ফিনহাসের এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি সহ্য করতে পারেননি। তিনি তার গালে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে বললেন, “হে আল্লাহর শত্রু! তোমাদের সাথে আমাদের মৈত্রী চুক্তি না থাকলে আমি তোমার শির উড়িয়ে দিতাম।” এরপর ফিনহাস মহানবী (সা)-এর নিকট হযরত আবু বকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। কিন্তু সে তার ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তিটি চেপে যায়। এই ঘটনা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ - سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ -

“যারা বলে, ‘আল্লাহ অভাবগ্রস্ত ও আমরা অভাবমুক্ত’ তাদের কথা আল্লাহ শুনেছেন। তারা যা বলছে তা এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখব এবং বলব, তোমরা দহন-যন্ত্রণা ভোগ কর।” (৩ : ১৮১)

মদীনার ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের জাল বুনেতে থাকে। তারা মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করে মুসলমানদের শক্তি খর্ব করার চেষ্টা করে। নানা প্রতারণার মাধ্যমে তারা আউস ও খায়রাজ গোত্রীয় মুসলমানদের পুনরায় পৌত্তলিকতায় ফিরিয়ে নেয়ার তৎপরতা চালায়। শুধু তাই নয়, স্বয়ং মহানবীকেও তারা ধোঁকা দেয়ার জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা করতে থাকে। এরপর ইহুদীদের সরদার ও আলেমদের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তারা ছলনা করে বলে, “ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের মান-মর্যাদা সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন। আমরা আপনার নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে সব ইহুদী আপনার অনুসারীতে পরিণত হবে। তারা কোন অবস্থায়ই আমাদের বিরোধিতা করার সাহস পাবে না। কিন্তু আমাদের নিজেদের একটি গ্রুপের সাথে

আমাদের ঝগড়া রয়েছে। আমরা উভয় পক্ষ বিষয়টি আপনার নিকট মীমাংসার জন্য নিয়ে আসব। আপনি যদি আমাদের পক্ষে রায় প্রদান করেন, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব।” এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের ভাষ্য নাযিল হয় :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ - أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ .

“(হে নবী!) আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর। তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যেন তারা আল্লাহ্ যা তোমার প্রতি নাযিল করেছেন তার কোন কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।” (৫ : ৪৯-৫০)

ইহুদীরা তাদের এই পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়। এবার তারা আরেকটি ষড়যন্ত্র করে। তাদের এই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মদীনা থেকে বের করে দেয়া। তারা এই কূট পরিকল্পনা নিয়ে মহানবী (সা)-এর নিকট আসে এবং বলে, “সাবেক পয়গাম্বরদের মধ্যে প্রত্যেকেই বায়তুল মুকাদ্দাসকে তাদের স্থায়ী বাসস্থান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আপনি যদি সত্য নবী হন আপনারও তাদের অনুসরণ করা উচিত। আপনি মদীনাকে মক্কা ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যবর্তী স্থান হিসাবে মর্যাদা দিতে পারেন।” তাদের এই কূট পরিকল্পনা বোঝার ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন ছিল না। বস্তুত মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর সতের মাস পর্যন্ত তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ও তাঁর অনুসারী মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক মুখ করে নামায আদায় করছিলেন। কিন্তু আজ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা’বা শরীফকে কেবলা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ তা’আলা নির্দেশ প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ .

“আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকানোকে আমি প্রায়ই লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর। অতএব, তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন সেদিকে মুখ ফিরাও।” (২ : ১৪৪)

কেবলা পরিবর্তনের দরুন ইহুদীরা আরো মনোক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। তারা আরেকটি কূট

পরিকল্পনা করে। তারা মহানবী (সা)-কে এসে বলে, “আপনি যদি পূর্বের ন্যায় মাসজিদুল আক্সার দিকে মুখ করে নামায পড়েন, তা হলে আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا -
قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ - يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا - وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ - وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ .

“নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, তারা এ যাবত যে কেবলা অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে তাদের কিসে ফিরিয়ে দিল? বল, ‘পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।’ এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং তুমি এ যাবত যে কেবলা অনুসরণ করছিলে তা এজন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়? আল্লাহ যাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন, তারা ছাড়া অপরের নিকট এটা নিশ্চয়ই কঠিন।” (২ : ১৪২-১৪৩)

নাজরানের প্রতিনিধি

এ সময়ে ষাট সদস্যবিশিষ্ট একটি খৃষ্টান প্রতিনিধি দল মদীনায় আসে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও নেতা ছিলেন। তাঁরা ইন্জীল কিতাব ও খৃষ্টধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। নাজরানে খৃষ্ট ধর্মীয় জ্ঞান-চর্চার এই প্রাধান্য প্রাচীনকাল থেকে পুরুষানুক্রমে চলে আসছিল। নাজরানবাসীদের এই জ্ঞান-গরিমার জন্য রোমান সম্রাটরাও তাদের সম্মান করা নিজেদের জন্য গর্বের ব্যাপার মনে করতেন। এই জন্য নাজরানের খৃষ্টান আলেমদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে রোমান সম্রাটরা এতটুকু ত্রুটি করতেন না। রোমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় নাজরানে কয়েকটি গির্জাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব গির্জা রোমান সম্রাটদের নাজরানের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার স্বাক্ষর বহন করছে।

নাজরানে এ খবর পৌঁছে যে, ইয়াসরিবে মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়েছে। তারা এই পরিস্থিতিতে নিজেদের জন্য পরম সুযোগ বলে মনে করে। তারা মনে মনে ভাবতে থাকে, ইহুদী ও মুসলমানদের দ্বন্দ্ব যদি স্থায়ী রূপ লাভ করে, তাহলে সিরিয়া ও ইয়ামনের খৃষ্টানরা মুসলমান ও ইহুদীদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে।

মদীনায় মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টানদের এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। খৃষ্টানরা এ সমাবেশকে মহানবী (সা)-এর প্রতিপক্ষ হিসাবে একটি ধর্মীয় তর্কসভার রূপদান করে। তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় তাত্ত্বিক আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মীয় মতবাদ ব্যাখ্যা করতে থাকে। ইহুদীরা হযরত ইসা ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত অস্বীকার করে

বসে। তারা খৃষ্টানদের অনুকরণে হযরত ওয়ায়েরকে আল্লাহর পুত্র হিসাবে স্বীকার করে নেয়। খৃষ্টানরা ত্রিত্ববাদ ও হযরত ঈসাকে অন্যতম আল্লাহ হিসাবে দাবি করে বসে। মহানবী (সা) বলেন, আল্লাহ হচ্চেন এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। এই আলোচনার পর খৃষ্টান ও ইহুদীরা একজোট হয়ে মহানবী (সা)-কে প্রশ্ন করে, “পূর্ববর্তীদের নবীদের মধ্যে আপনি কোন্ কোন্ নবীকে রাসূল হিসাবে স্বীকার করেন?” মহানবী (সা) পবিত্র কোরআনের ভাষায় তাদের এই প্রশ্নের জবাব দান করেন :

قُولُوا أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ .

“তোমরা বল, ‘আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাইল, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ঈসা, মূসা ও অন্যান্য নবীদের দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী। (২ : ১৩৬)

ইহুদী ও খৃষ্টানরা আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে যা কিছু বলছিল, মহানবী (সা) সেগুলো কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করছিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আসমানী কিতাব বিকৃত করেছ। তোমরা যেসব নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের দাবি করছ, তোমাদের কাজ তাঁদের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। হযরত মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীর শিক্ষা ও মতবাদে বিন্দুমাত্র পার্থক্য বা বৈপরীত্য নেই। কারণ ইসলাম তাদের শিক্ষা দিচ্ছে, সকল নবী-রাসূলের শিক্ষার মূল উৎস হচ্ছে চিরন্তন মহাসত্তা। তিনি প্রত্যেক মানুষের জন্য সহানুভূতির হাত প্রসারিত করে রেখেছেন। যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর পূজা-অর্চনা থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে, তার মধ্যে এই বিশ্বাসও জন্মেছে যে, সেই চিরন্তন মহাসত্তা মানুষকে সকল প্রকার বাধ্যবাধকতা ও কুপ্রবৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম। এ ধরনের মানুষ বাতিল ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস পদদলিত করে সামনে এগিয়ে যায়। সেই অনাদি-অনন্ত মহাসত্তার আলোকছটা এ জাতীয় লোকের দিব্যদৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না।

তিনটি ধর্মীয় সম্মেলন

মদীনায় তিনটি ধর্মের অনুসারীদের এই সম্মেলন সমকালীন বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ তখনও পর্যন্ত এই তিনটি ধর্মই অধিকাংশ বিশ্ব মানবের দৃষ্টিপাতের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে পরিগণিত ছিল। এই সম্মেলনের পিছনে ইসলাম ছাড়া অপর দু’টি ধর্মের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাহ্যত তারা নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যই তৎপর ছিল। অপরদিকে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য মহানবী (সা)-এর নিকট ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। আর তা ছিল আধ্যাত্মিক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই সম্মেলনের পিছনে মহানবী (সা)-এর পরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর তাই ওহীর ভাষায় তিনি

ইহুদী ও খৃষ্টানদের সামনে এই তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি পবিত্র কোরআনের ভাষায় তাদের উদ্দেশ্যে বলেন :

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ ٱللَّهِ - فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ .

“তুমি বল, ‘হে কিতাবীগণ! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করি না, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক করি না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করি না।’ যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, ‘আমরা মুসলমান বা আত্মসমর্পণকারী, তোমরা সাক্ষী থাক।’
(৩ : ৬৪) ✓

মহানবী (সা)-এর উপরোক্ত আহ্বান ছিল সার্বজনীন ও শাস্বত আহ্বান। তাতে ইহুদী-খৃষ্টান কিংবা অন্য কোন ধর্মের অনুসারীদেরই আপত্তি উত্থাপনের কিছু ছিল না। কারণ তাতে ছিল উপাসনায় আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। কোন মানুষকে আল্লাহ্ তা‘আলার সমমর্যাদার আসনে গণ্য করা চলবে না। বস্তুত মানুষের প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ চিন্তাশক্তি মহানবী (সা)-এর উক্ত আহ্বানের যথার্থতা স্বীকার না করে পারে না। কারণ সুষ্ঠু চিন্তা ও জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে পরিচালিত কোন মানুষ আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে অপর কোন শক্তিকে শরীক করতে পারে না। কিন্তু কোন কোন মানুষ জড়বাদী স্বার্থের প্রলোভনে অনেক সময় নিজের আত্মিক ও সুষ্ঠু চিন্তাশক্তিকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য শক্তির সামনে নত করে বসে। তারা তাদের এই দুটো অমূল্য সম্পদকে বস্তুর বিনিময়ে অত্যন্ত সস্তায় বিক্রিয়ে দেয়। তারা আত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব বিসর্জন দিয়ে ঘৃণ্যতম ভাবাবেগের দাসে পরিণত হয়।

মানুষের জন্য জড়বাদী স্বার্থের মোহ অত্যন্ত ভয়াবহ। এই মোহ মানুষের মন-মানসিকতা ও সুষ্ঠু জ্ঞান-বুদ্ধিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। মানুষ তখন মোহাক্ক হয়ে পড়ে। এই জড়বাদী স্বার্থের মোহ কখনও কখনও ধন-সম্পদ রূপে তার মন-মানসিকতায় ছেয়ে যায়। কখনও কখনও পার্থিব পদমর্যাদায় রূপ নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়। আবার কখনও কখনও খেতাব ও উপাধির রূপ নিয়ে হাযির হয়। তখন সে এসবের মোহে অমূল্য সম্পদ তাওহীদকে বিসর্জন দিয়ে বসে। নাজরানের প্রতিনিধিদলের এক ব্যক্তির মধ্যে উক্ত প্রতিবেদনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। লোকটির নাম আবু হারেসা। তিনি ছিলেন উক্ত প্রতিনিধি দলে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি মহানবী (সা)-এর আহ্বান সম্পর্কে গভীর চিন্তা করেন। উক্ত সমাবেশেই তাঁর এক সাথীকে কানে কানে বলেন, “(হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর বক্তব্য যথার্থ।” এ কথা শুনে তার সাথী বলল, “তিনি ঠিক বললে আপনার তা গ্রহণ করায় বাধা কোথায়?” আবু হারেসা বললেন, “আমার সম্প্রদায়ের ভূমিকা আমাকে তা গ্রহণ করতে বাধা দিচ্ছে। তারা আমাকে সম্মান ও সম্পদ দিয়েছে। কিন্তু তারা ইসলাম বিরোধী। এরূপ পরিস্থিতিতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে আমার সম্মান ও ধন-সম্পদ সবকিছু বিসর্জন দিতে হবে। সব নষ্ট হয়ে যাবে।”

উক্ত সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে মহানবী (সা) ইহুদী ও খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে বলেন, “তোমরা যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না কর, তা’হলে চল আমরা সবাই মিলে দোয়া করি, যে সম্প্রদায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তারা যেন ধ্বংস হয়।” মহানবী (সা)-এর এই বলিষ্ঠ মন্তব্য শুনে ইহুদীরা বলে উঠে, ‘আমাদের তো আপনার সাথে মৈত্রী চুক্তি রয়েছে।’ এ কথা বলে তারা কেটে পড়ে। এদিকে খৃষ্টানরাও মহানবী (সা)-এর প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বলে, আপনি আপনার ধর্মে থাকুন। আমাদেরকেও নিজেদের ধর্ম নিয়ে থাকতে দিন। এভাবে তারা কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করে। ইতিমধ্যে মহানবী (সা)-এর সত্যপ্রিয়তা সম্পর্কে তাদের মনে বিশ্বাস জন্মে, তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীরা সত্যি ন্যায়পরায়ণ। তারা মহানবী (সা)-এর খেদমতে এসে অনুরোধ করে, আপনি কোন সাহাবীকে আমাদের সঙ্গে নাজরান যেতে দিন। তাঁর মাধ্যমে বিতর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা যাবে। মহানবী (সা) খৃষ্টানদের এই অনুরোধ গ্রহণ করেন। তিনি হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা)-কে খৃষ্টানদের সাথে নাজরান পাঠিয়ে দেন।

কুরাইশ ও মক্কা

মহানবী (সা) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে সর্বপ্রথম মক্কায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বুনয়াদ স্থাপন করেন। প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা’আলার নির্দেশে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের মদীনায় হিজরত করতে হয়। হিজরতের পর এক মুহূর্তের জন্যও তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা পবিত্র মক্কার কথা ভুলেন নি। পবিত্র মক্কা ও সেখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে সব সময় তাঁরা চিন্তা-ভাবনা করতেন। কিভাবে সেখানে ইসলামের প্রচার অভিযান চালান যায়, মক্কার কুরাইশদের নিয়ে কি করা যায় এসব বিষয় সব সময় তাঁরা ভাবতেন। এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পিছনে আরও কিছু কারণ ছিল। সেগুলো হলো, কা’বায় পবিত্র মক্কায় অবস্থিত ছিল। সেখানে মুসলমানদের ছাড়া সকল আরবের হজ্জের অনুষ্ঠান পালনের অবাধ অনুমতি ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতি মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের নিকট অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। তাঁরা ভাবতেন, না জানি কতকাল পর্যন্ত পবিত্র হজ্জব্রত পালন থেকে আমাদের বঞ্চিত থাকতে হয়। মক্কায় সকল মুহাজিরদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গ রয়ে গিয়েছিল। তাদের বিরহ-বেদনায় মুসলিম মুহাজিররা কোন কোন সময় অস্থির হয়ে উঠতেন। তা’ছাড়া এসব আত্মীয়-স্বজন ধর্মচ্যুত হয়ে যায় কিনা সে আশংকাও ছিল। মুসলমানরা মদীনায় হিজরতের সময় তাঁদের পারিবারিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক কোন মাল-সামানই সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেননি। এসব কিছু মক্কায় রয়ে গিয়েছিল। মুহাজিররা মদীনার পরিবর্তিত আবহাওয়ায় এসে কাঁপানো জুরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁদের অনেককে বসে নামায আদায় করতে হত। এ সময় তাঁরা ভাবতেন, বিদেশে এসে অবস্থান করার দরুনই তাঁদের এই অসুখ দেখা দিয়েছে। কারণ তাঁরা আনন্দের সাথে বাস্তুভিটা ত্যাগ করেননি। কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এসব কারণ ছাড়াও আর একটা ব্যাপার তাঁদের সবচেয়ে ব্যথিত করে তুলত। আর তা হল, মাতৃভূমির প্রতি সীমাহীন আকর্ষণ। সে মাটিতে তাঁরা জন্মেছেন, সেখানে তাঁদের শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। সেখানকার প্রাচীরের ছায়ায় তাঁরা যুবক হয়েছেন। সে মাটি আর সেখানকার মানুষের সাথে তাঁদের অনেক স্মৃতি

বিজড়িত ছিল। আর তাই জন্মভূমির প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। বস্তুত নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠার সাথে সাথে প্রতিটি মানুষের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হচ্ছে তার মাতৃভূমি।

আমরা নিজেদের দিয়েও বিষয়টার মূল্যায়ন করতে পারি। যে দেশে আমরা জন্মেছি, ছেলেবেলা কাটিয়েছি, যে দেশের মাঠে-প্রান্তরে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকাল হেসে-খেলে কাটিয়েছি, সে দেশের প্রতিটি বস্তুকে আমরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। এই ভালবাসা আমাদের মন-মস্তিষ্কে এমনভাবে ছেয়ে আছে যে, মৃত্যুর পর সে দেশের মাটিতেই সমাহিত হওয়ার জন্য আমরা প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। অনুরূপ মদীনায়ে মুসলিম মুহাজিরদের অন্তরেও স্বদেশপ্রেম বারবার দোলা দিচ্ছিল। কারণ দীর্ঘ তেরটি বছর তাঁরা সেখানে শত্রুর হাতে সীমাহীন নির্যাতন ভোগ করেছেন। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেননি। কিন্তু যে ধর্মের জন্য, যে আদর্শের জন্য তাঁরা বাস্তুভিটা ত্যাগ করেছেন, সে ধর্মে, সে আদর্শে দুর্বলতা, হতাশা ও অবসন্নতার এতটুকু অবকাশ নেই। সে ধর্মে অন্যদের সাথে বাড়াবাড়ি করার অনুমতি নেই। এই ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কায়েম করা। অন্যদেরও এই ধর্মের প্রতি আহ্বান জানানো। এই সঙ্গে এই ধর্মের অনুসারীদের জন্য রয়েছে নিজের আত্মার সম্মান, বিশ্বাসের নিরাপত্তা বিধান ও স্বদেশপ্রেমের মহান শিক্ষা। মহানবী (সা) ও আকাবায় বায়আতকারীদের এসব মহান শিক্ষা তা'লীম দিয়েছিলেন। মদীনায়ে মহানবী (সা) ও মুহাজিরদের সামনে এই প্রশ্নটিও ছিল যে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলার বিধান পালন করা যায়, তাঁর পবিত্র ঘরের (কা'বার) হেফাজত করা যায় এবং মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য কোন্ কোন্ পন্থা গ্রহণ করা যায়। বস্তুত মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মাতৃভূমি মুক্তি সমস্যার সমাধান হয়।

সামরিক বাহিনী ও প্রাথমিক যুদ্ধ-বিগ্রহ

মদীনায় মুসলমানদের রাজনীতি

মুসলমানদের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছে। তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী মদীনায় তাঁদের বসবাসেরও ব্যবস্থা করা হয়। তা সত্ত্বেও মক্কার স্থিতি তাঁদের অস্থির করে তুলত। তাঁরা মক্কায়ে ছেড়ে আসা পরিবার-পরিজন ও বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। এই সঙ্গে মক্কায়ে তাঁদের উপর কুরাইশদের অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতনের বিভীষিকাও তাদের মনে পড়ত। এসব স্মরণ হতেই তাঁদের দেহ-মন কেঁপে উঠত। কুরাইশদের সাথে কি করা যায়, এ নিয়ে তাঁরা চিন্তা-ভাবনা করতেন। এই বিষয়টি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে একাধিক অভিমত রয়েছে। একদলের অভিমত হলো মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীরা মদীনায় এসে বসবাস শুরু করার পর মক্কার কুরাইশদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণস্পৃহায় অধীর হয়ে উঠছিলেন। সুযোগ পেতেই এর সদ্যবহার করার জন্য তাঁদের দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের অপর একটি দলের মতে, মুহাজিররা মদীনায় পৌঁছেই কুরাইশদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য অর্জন না করা পর্যন্ত তাঁরা এই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন মূলতবী রাখেন। শেষোক্ত দলটি তাঁদের অভিমতের সমর্থনে বলেন, মহানবী (সা) কর্তৃক আকাবায় দ্বিতীয় বায়'আত গ্রহণের সময় মদীনার আনসাররা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, 'ইসলামের জন্য আমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতেও দ্বিধা করব না।' এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, মদীনায় সামরিক শক্তি অর্জন করা মাত্র তারা মক্কায়ে অভিযান চালাবেন। এমনকি কুরাইশরাও এরূপ একটা আশংকা করেছিল। যেমন আকাবায় দ্বিতীয় বায়'আতের ব্যাপারটা কিছুটা জানাজানি হওয়ার পর মক্কার কুরাইশরা আউস ও খায়রাজ গোত্রের বায়'আতকারীদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞেসও করেছিলেন। কুরাইশরা বায়'আতকারীদের জিজ্ঞেস করেছিল, 'গত রাতে তোমরা (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে কী চুক্তি করেছ। তোমাদের এই চুক্তির ভিত্তি কি এবং কি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এই চুক্তি করেছ?'

সৈন্যদল গঠন

* ঐতিহাসিকদের দ্বিতীয় বা শেষোক্ত দলটি নিজেদের অভিমতের সমর্থনে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনা মহানবী (সা)-এর হিজরতের দশ মাস পর সংঘটিত হয়। তার মধ্যে একটি হল, মহানবী (সা) তাঁর চাচা হযরত হামযা (রা)-এর নেতৃত্বে ত্রিশ জন মুহাজির সাহাবীর একটি দল সাগর উপকূলে টহল দেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন।^১ এ সময় আবু জেহেল

১. মহানবী (সা)-এর এ সৈন্যদল পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যকার বাণিজ্যপথ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। -অনুবাদক

একটি বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরছিল। তার সাথে তিন শ' অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। আবু জেহেলের সাথে মুসলিম বাহিনীর দেখা হয়ে যায়। হযরত হামযা (রা) কাফেরদের উপর আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হন। মাজদী ইবনে আমর জুহানী উভয় পক্ষকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সংঘর্ষ থেকে বিরত রাখেন। মাজদী উভয় পক্ষেরই বন্ধু ছিলেন। মদীনা থেকে বেশ কিছু দূরে 'ঈস' পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় বার মহানবী (সা) উবায়দা ইবনে হারিসের নেতৃত্বে ষাট সদস্যের একটি বাহিনী উপকূলীয় এলাকায় প্রেরণ করেন। মক্কা ও মদীনার সীমান্ত বরাবর উপকূলীয় মরুভূমি রাবেগ নামক স্থানে মুসলিম বাহিনীর সাথে আবু সুফিয়ানের দেখা হয়। তাঁর সাথে দু'শ সৈন্য ছিল। উভয় পক্ষ সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকে। শুধু হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) শত্রুদের উদ্দেশ্যে একটি তীর নিক্ষেপ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এই তীরটিই কাফেরদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম নিক্ষিপ্ত হয়।

* তৃতীয় দফা হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে মুসলিম মুহাজিরদের একটি বাহিনী পাঠানো হয়। এই অভিযানে আটজন, কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী বিশজন মুহাজির ছিলেন। তাঁরা মদীনা ও মক্কার সীমান্ত এলাকা হিজায় পর্যন্ত টহল দিয়ে ফিরে আসেন। তাঁদের সাথে কোন কাফেরের সাক্ষাৎ হয়নি।

নবী করীম (সা)-এর সফর

ঐতিহাসিকদের এই দলটি তাদের অভিযানের সমর্থনে আর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। মহানবী (সা) মদীনায় এক বছর অবস্থানের পর নিজে একটি বাহিনী নিয়ে আবওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ সময় মদীনার প্রশাসনিক দায়িত্ব তিনি হযরত সাআদ ইবনে উবাদার উপর ন্যস্ত করে যান। এই বাহিনীতেও শুধু মুহাজিররা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা) খবর পেয়েছিলেন মক্কার একটি বাণিজ্য কাফেলা এই পথ দিয়ে যাবে। তাই তিনি আবওয়ায় আসেন। কিন্তু বাণিজ্য কাফেলাটি অন্য পথে চলে যায়। অবশ্য এই গাযওয়া' বা অভিযানে যামরা গোত্রের সাথে মহানবী (সা)-এর একটি লিখিত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়।

এই ঘটনার এক মাস পর মহানবী (সা) দু'শ' মুসলমানের একটি সৈন্যদল নিয়ে এক অভিযানে বের হন। এ বাহিনীতে মুহাজির ও আনসার উভয় শ্রেণীর মুসলমান ছিলেন। তিনি তাদের নিয়ে 'বুয়াত' নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছান। বুয়াত ছিল রাযভী পাহাড়ের পাদদেশের একটি এলাকা। মহানবী (সা) খবর পেয়েছিলেন, কুরাইশ নেতা উমাইয়া ইবনে খালফ খাদ্যশস্য বোঝাই আড়াই হাজার উট নিয়ে এই পথ দিয়ে আসছেন। এই কাফেলার নিরাপত্তায় রয়েছে একশ' সশস্ত্র বীর যুবক। মহানবী (সা)-এর এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কাফেলাটি ঘেরাও করা। কিন্তু উমাইয়া ইবনে খালফ পরিস্থিতি টের পেয়ে কাফেলা নিয়ে অন্য পথে কেটে পড়ে।

* ১. ইসলামের প্রাথমিক যুগের সামরিক অভিযানগুলোকে দুটো নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। তার একটি হচ্ছে 'সারিয়া' এবং অপরটি 'গাযওয়া'। যেসব অভিযানে মহানবী (সা) নিজে শরীক হননি, সেগুলোকে বলা হয় 'সারিয়া'। আর যেসব অভিযানে তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেছেন সেগুলোকে বলা হয় 'গাযওয়া'। এসব অভিযানে সংঘর্ষ হোক বা না হোক উভয় ক্ষেত্রে এই দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। -অনুবাদক

বুয়াত অভিযান থেকে ফিরে আসার পর মহানবী (সা) দুই কিংবা তিন মাস কোনো অভিযানে বের হননি। এরপর তিনি হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদকে মদীনায়ে তাঁর স্থলবর্তী নিয়োগ করেন এবং নিজে দুইশ' মুসলমানের একটি বাহিনী নিয়ে এক অভিযানে বের হন। তিনি ইয়ানবু এলাকায় উশায়রা নামক স্থান পর্যন্ত আসেন। একটি খবরের উপর ভিত্তি করে তিনি এই অভিযানে আসেন। তিনি এই মর্মে খবর পান যে, আবু সুফিয়ান সিরিয়ার উদ্দেশে বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে এই পথে আসছেন। মহানবী (সা) উশায়রায় কয়েক দিন অবস্থান করেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান ও তাঁর পূর্ববর্তীদের মতো পথ পরিবর্তন করে পার হয়ে যান। এই ঘটনাটি ছিল ৬২৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের। এখানে মহানবী (সা) বনী মুদলাজ ও তার মিত্র গোত্রগুলোর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এরা ছিল বনী যামরা গোত্রের চুক্তিবদ্ধ মিত্র গোত্র।

মহানবী (সা) উশায়রা অভিযান থেকে ফিরে আসার দশ দিন পর মদীনার উপকণ্ঠে একটি ঘটনা ঘটে। মক্কার কুরয ইবনে জাবের ফাহরী নামক এক ব্যক্তি কুমতলব নিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হয়। সে মদীনার চারণভূমি থেকে মুসলমানদের কয়েকটি উট তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এই খবর পেয়ে মহানবী (সা) স্বয়ং কয়েকজন সাহাবী নিয়ে কুরয ফাহরীর পশ্চাতে ধাওয়া করেন। তিনি বদর প্রান্তরের অদূরে সাফওয়ান নামক স্থান পর্যন্ত আসেন। এ জন্য এই অভিযানকে 'গাযওয়ায়ে বদরে উলা' বা 'প্রথম বদর অভিযান' বলা হয়ে থাকে। এই অভিযানে কুরযকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি। সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অবশ্য পরে কুরয ফাহরীও ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রাথমিক যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের অভিমত

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবারা উপরোক্ত অভিযানগুলোর মাধ্যমে কি কুরাইশদের সাথে সংঘর্ষ বাঁধাতে চেয়েছিলেন, না তাঁদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল? ঐতিহাসিকদের একদলের অভিমত হলো, এসব অভিযানের পিছনে মহানবী-(সা)-এর দুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথমত সিরিয়ায় যাতায়াতকারী কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলাগুলোর উপর আক্রমণ চালিয়ে ধন-সম্পদ লুট করা। দ্বিতীয়ত মদীনা ও উপকূল ভাগের মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন আরব গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করা। এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সিরিয়ায় বাণিজ্যের সুযোগ থেকে কুরাইশরা বঞ্চিত হবে। কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ করা হলে সে এলাকায় বসবাসকারী আরব গোত্রগুলো কোন প্রকার প্রতিবন্ধক হবে না এবং কুরাইশদের সাহায্যে ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে না। হযরত হামযা, হযরত উবায়দা ইবনে হারিস ও হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর নেতৃত্বে যেসব সশস্ত্র লোক পাঠানো হয় এবং বনী যামরা, বনী মুদলাজ প্রভৃতি গোত্রের সাথে যেসব চুক্তি সম্পাদিত হয়, তার দ্বারা ঐতিহাসিকদের শেষোক্ত অভিমতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মুসলমানরা কুরাইশদের সিরিয়ার বাণিজ্য-পথ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। এসব অভিযানের পিছনে তাঁদের লুটতরাজ উদ্দেশ্য ছিল না।

আমাদের অভিমত

ঐতিহাসিকরা দাবি করেছেন, মদীনায হিজরতের ছ'মাসের মধ্যে মহানবী (সা) সৈন্য বাহিনী গঠন করে ফেলেছিলেন। এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল শুধু মুহাজিরদের নিয়ে। এই বাহিনীকে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদের বাণিজ্য কাফেলা লুট করার জন্য পাঠানো হতো। কিন্তু ঐতিহাসিকদের এই দাবির সাথে আমরা একমত হতে পারি না। কারণ হযরত হামযা (রা)-এর নেতৃত্বে যে সৈন্যদল পাঠানো হয়, তার সদস্য ছিল মাত্র ত্রিশজন কিংবা তার কিছু বেশি। হযরত উবায়দা ইবনে হারিছের বাহিনীতে ষাটজনের বেশি ছিল না। হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বাহিনীতে ছিল মাত্র আট কিংবা বিশজন। পক্ষান্তরে কুরাইশ কাফেলাগুলোর নিরাপত্তা বাহিনীর সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি থাকত। এ ছাড়া মহানবী (সা)-এর মদীনায হিজরতের পর কুরাইশরা সতর্কতামূলকভাবে তাদের বাণিজ্য কাফেলাগুলোর নিরাপত্তা বাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছিল। হযরত হামযা, হযরত উবায়দা ও হযরত সাআদ (রা) নিঃসন্দেহে বীরপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাদের বাহিনীর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। এই স্বল্পসংখ্যক লোক দিয়ে কুরাইশ কাফেলার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। এজন্যই তাঁরা কাফেলার উপর হামলা না করে ফিরে আসতেন। একবার শুধু হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস একটি তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। এটা ছিল উত্তেজনাপ্রসূত একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা।

কুরাইশ বাণিজ্য হস্তক্ষেপ

যে সব লোক কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল, তাদের অধিকাংশ ছিল মুসলিম মুহাজিরদের আত্মীয়-স্বজন। এজন্য স্বভাবতই তাদের উভয় পক্ষ একে অপরের উপর আক্রমণ করা পছন্দ করছিল না। তাদের এই আশংকাও ছিল যে, যদি কারো হাতে অপর পক্ষের কেউ নিহত হয়, তা'হলে খুনের বদলা খুন ছাড়া নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। তারা আরো আশংকা করছিল যে, মহানবী (সা)-এর সাথে দীর্ঘ তের বছর অব্যাহত শত্রুতা সত্ত্বেও পবিত্র মক্কাকে গৃহযুদ্ধের অভিশাপ থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে। এখন যদি মক্কা ও মদীনাবাসীদের মধ্যে রক্তপাত শুরু হয়, তা'হলে তা এক অকল্পনীয় বিভীষিকাময় পরিস্থিতি ডেকে আনবে।

অপরদিকে মুসলমানদের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, আকাবার দ্বিতীয় বায়আতকালে মদীনার আওস ও খায়রাজদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তার ধরন হচ্ছে আত্মরক্ষামূলক। এই ওয়াদা বা চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের অন্যদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। কিন্তু ইসলামের পক্ষ হয়ে অন্যদের উপর আক্রমণ করা উক্ত চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মোটেও ছিল না। আউস ও খায়রাজ ছাড়া অন্য বায়আতকারী মুসলমানদেরও এ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল যে, তাঁরা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর সাথে ওয়াদা করেছেন। কিন্তু আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁরা কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেননি। এসব কারণে উপরে উল্লিখিত ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া তারা মহানবী (সা)-এর ইত্তেকালের দুই শ' বছর পর তাঁর সম্পর্কে ইতিহাস লিখেন। তারা মুসলমানদের টহলদানকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলোকে আক্রমণকারী যুদ্ধবাজ হিসেবে চিহ্নিত করেন। বস্তুত তাদের এই ব্যাখ্যা

যুক্তির বিচারেও টিকে না। কারণ আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ছিল মহানবী (সা)-এর রাজনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাঁর রাজনীতি ছিল শতধা-বিচ্ছিন্ন আরব গোত্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা। এই মূলনীতির প্রেক্ষিতেই মহানবী (সা) বিভিন্ন এলাকায় সামরিক শক্তি প্রদর্শন ও টহলদান কালে কোন কোন মুশরিক গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেন। যেমন বনী যামরা, বনী মুদলাজ ও তাদের বন্ধু গোত্রগুলোর সাথে তিনি এ ধরনের চুক্তি সম্পাদন করেন। এসব চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল একে অপরের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করবে না। একে অপরের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। এক গোত্র আর এক গোত্রের কল্যাণকামিতার ব্যাপারে কোন প্রকার গাফলতি প্রদর্শন করবে না। আমাদের এই ব্যাখ্যা প্রথমদিকে মদীনায় মুসলমান বসবাস ও জীবনধারণের পরিপন্থী নয়।

আমাদের মতে মদীনায় ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের সৈন্যদল গঠন ও টহলদার বাহিনী পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং মুসলমানদের সাথে তাদের একটা সমঝোতায় আসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানো। তাতে করে উভয় পক্ষের, বিশেষ করে কুরাইশদের শত্রুতা ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব কেটে যাবে। এরূপে একদিকে মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে স্বাধীনতা লাভ করবে, অপরদিকে কুরাইশদের বাণিজ্য-পথও নিরাপদ হয়ে যাবে। এ সময় তায়েফ, ইয়ামন, সিরিয়া প্রভৃতি এলাকার সাথে কুরাইশদের বাণিজ্য চলত। দক্ষিণ অঞ্চল থেকে অনেক বাণিজ্য পণ্য মক্কায় আসত। কোন কোন বাণিজ্য কাফেলায় দুই হাজার উট বোঝাই পণ্য থাকত। এসব পণ্যের মূল্য পঞ্চাশ হাজার দীনারেরও বেশি হতো। প্রাচ্যবিদ ডঃ স্প্রুংগার বলেছেন, 'এ সময় মক্কা থেকে যেসব পণ্য বাইরে যেতো, সে সবার মূল্য অনেক সময় এক লাখ ৬০ হাজার লিরা বা দুই লাখ ডলার ছাড়িয়ে যেতো।' এরূপ পরিস্থিতিতে কুরাইশদের যদি উপলব্ধি হতো যে, মুহাজিরদের সাথে শত্রুতার দরুন তাদের বহির্বাণিজ্য বিপন্ন, তাহলে অবশ্যই তারা একটা সমঝোতায় পৌঁছার জন্য তৎপর হতো। অপরদিকে মুসলমানরাও এ ধরনের সমঝোতায় আগ্রহী হতো + কারণ তাতে তারাও নিজেদের ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচারের স্বাধীনতা লাভ করবে। নিরাপদে পবিত্র মক্কায় হজ্জ ও যিয়ারতের জন্য যাতায়াত করার সুযোগ লাভ করবে।

কুরাইশদের এরূপ একটা সমঝোতায় আসতে বাধ্য করার জন্য মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কুরাইশদের এ কথা বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন ছিল যে, মুসলমানরা তাদের বাণিজ্য-পথ বন্ধ করে দেয়ার শক্তি রাখে। এই কৌশলের প্রেক্ষিতেই আবু জেহেলের সাক্ষাৎ পাওয়া সত্ত্বেও হযরত হামযা (রা) ও তাঁর সাথীরা তাঁকে আক্রমণ করেননি। মাজদী ইবনে আমর জুহানীর অনুরোধে তিনি সঙ্গী মুসলমানদের নিয়ে ফিরে যান। আর এজন্যই কুরাইশদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের বাণিজ্য-পথে মুসলিম টহলদার বাহিনী পাঠানো হতো। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এত কম ছিল যে, এসব অভিযানের পেছনে কোন প্রকার আক্রমণের উদ্দেশ্য কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু মহানবী (সা) দেখলেন এই কৌশলের মাধ্যমে কোন কাজ হচ্ছে না। মক্কার মুহাজিরদের সম্পর্কে কুরাইশদের মনে কোন প্রকার ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। তারা মুহাজিরদের কোন প্রকার গুরুত্বই দিচ্ছে না। এবার তিনি অন্য একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি কুরাইশদের বাণিজ্য-পথের আশেপাশে বসবাসকারী বিভিন্ন আরব গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করলেন। এসব চুক্তির পেছনেও একই কৌশল

কার্যকর ছিল। আর তা হলো, কুরাইশদের ভয় প্রদর্শন করা। কুরাইশরা এসব চুক্তির খবর পেলে ভয় পাবে এবং মুসলমানদের সাথে সমঝোতায় আসতে বাধ্য হবে।

আনসার ও যুদ্ধ-বিগ্রহ

আমাদের উপরোক্ত অভিমতের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, বুয়াত ও উশায়রায় সামরিক টহলদান মহড়া প্রদর্শনকালে সম্পাদিত মহানবীর মৈত্রী চুক্তিগুলো। এ সময় তাঁর সফর সঙ্গীদের সংখ্যা ছিল একেবারে নগণ্য। তাঁদের মধ্যে মুহাজির ছাড়া কয়েকজন আনসারও ছিল। এসব আনসার আকাবার দ্বিতীয় বায়আতকালে শুধু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অঙ্গীকার করেছিলেন। তাতে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের স্বীকৃতি ছিল না। সামনে বদর যুদ্ধের ভূমিকায় এ বিষয়টি পাঠকদের নিকট পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও বদর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু মদীনার মুসলমানরা যুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করলে মহানবী (সা)-ও এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে মহানবী (সা)-এর মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে আনসার মুসলমানরা কোন প্রকার আপত্তি করেননি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, মহানবী (সা) মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে মদীনাবাসীরা তাঁর সাহায্যে অবশ্যই এগিয়ে আসবেন। বিশেষ করে আরবের রীতি অনুযায়ী মক্কা ও মদীনাবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কোন পরিস্থিতি দেখা না দিলে মদীনার অধিবাসীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

মহানবী (সা) আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে যে সব মৈত্রী চুক্তি করছিলেন, তাতে মদীনাবাসীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সঙ্গে এসব চুক্তি সম্পাদনের পেছনে মহানবী (সা)-এর আরেকটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। তা হলো, বাণিজ্য-পথের বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে মক্কাবাসীদের উপলব্ধি করানো। বস্তুত তা হচ্ছিল। মক্কাবাসীরা অনুভব করছিল তাদের বাণিজ্য-পথ দিন দিন বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এই বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে নির্দিধায় বলা যায় যে, মহানবী (সা)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্থানে মুসলিম টহলদার বাহিনী প্রেরণ এবং কখনো কখনো নিজে এসব বাহিনীর কমান্ড গ্রহণ যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধের সূচনা ছিল না। যারা বলেছেন, মহানবী (সা) আবওয়া, বুয়াত ও উশায়রা নামক স্থানে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, তাদের এ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তুত মুসলিম ঐতিহাসিকদের এ ধরনের অভিমত পোষণের কারণ হলো তারা মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে এসব ইতিহাস লিখতে বসেন। সে সময় পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত বদর যুদ্ধের চিত্র তাদের মন-মস্তিষ্কে অংকিত ছিল। বদরের যুদ্ধ দ্বারা তারা প্রভাবিত ছিলেন। এজন্য বদরের পূর্বাপর সব ঘটনাকে এমনকি মুসলমানদের টহলদান মহড়া প্রদর্শন তৎপরতাকেও যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। এসব লেখক মহানবী (সা)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ বেশি করে দেখানোটা তাঁর অধিক মর্যাদার কারণ বলে মনে করতেন।

অনুরূপভাবে প্রাচ্যবিদরাও মুসলিম ঐতিহাসিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থরাজিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার কোন মন্তব্য করেননি। অধিকন্তু তাঁরা সত্যের অপলাপ করে বাড়িয়ে লিখেছেন। মদীনায় বসবাস শুরু করার

পর মহানবী (সা) ও মুহাজিররা সবাই মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ বাঁধানোর তৎপরতায় লিপ্ত ছিলেন। প্রাচ্যবিদরা আরো লিখেছেন, মুসলমানরা মক্কাবাসীদের বাণিজ্য কাফেলাগুলো লুট করার উদ্দেশ্যেই টহলদার বাহিনী নিয়োগ করেছিলেন। তারা তাঁদের এই অভিমতের প্রমাণ হিসাবে বলেন যে, আরব বেদুঈনদের পেশাই ছিল লুটতরাজ ও রাহাজানি। বস্তুত আকাবায় সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী মদীনার মুসলমানদের কোন আক্রমণাত্মক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মহানবী (সা)-এর নেতৃত্বে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছিলেন। আর এটা করছিলেন তারা তাদের স্বভাবসুলভ লুটতরাজ ও গনীমতের সম্পদ লাভের লোভে।

মদীনাবাসীদের স্বভাব

আমাদের মতে প্রাচ্যবিদদের উপরোক্ত অভিমত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এসব কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। কারণ মক্কাবাসীদের মতো মদীনাবাসীরাও নাগরিক সভ্যতায় সমৃদ্ধ ছিল। আর নাগরিক সভ্য সমাজে লুটতরাজের কল্পনাই করা যায় না। তা ছাড়া মদীনাবাসীরা ছিলেন কৃষক। নিজেদের ক্ষেত-খামার ও শস্য-শ্যামল প্রান্তর নিয়ে ব্যস্ত থাকত। তারা যুদ্ধ-বিগ্রহের চাইতে শান্তিপ্রিয় জীবনধারাকেই অগ্রাধিকার দান করত। অবশ্য যুদ্ধ তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হলে সেটা ছিল আলাদা ব্যাপার। কিন্তু মুহাজিরদের অবস্থা ছিল তাদের আনসার বন্ধুদের চাইতে ভিন্ন ধরনের। তারা মক্কার অবৈধ দখলকারী কুরাইশদের নিকট থেকে নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য সব সময় তৎপর ও সচেতন ছিলেন। তা সত্ত্বেও বদর যুদ্ধের আগ পর্যন্ত এ ব্যাপারে তারা কোন প্রকার তাড়াহুড়ো করেননি। এ জন্যই টহলদার বাহিনী পাঠানো সত্ত্বেও মুহাজিররা কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার ধন-সম্পদ লুট করেননি। ইসলাম কোন নগণ্য উদ্দেশ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের অনুমতি প্রদান করেনি। এ সম্পর্কিত প্রাচ্যবিদদের ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তুত কোন বৈষয়িক স্বার্থে মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীরা কোন যুদ্ধ করেননি। যুদ্ধ করার পিছনে তাঁদের মহান উদ্দেশ্য ছিল যাতে কেউ ধর্মীয় দায়িত্ব পালন এক কথায় ইসলামের প্রচার-প্রসারের পথে কেউ হস্তক্ষেপ করতে না পারে। মহানবী (সা) বিভিন্ন আরব গোত্রের সাথে যেসব চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, তার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল মদীনার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা, যাতে কুরাইশরা মদীনায় আসার সাহস না পায়। তারা যেন মুসলমানদেরকে মদীনা থেকে বের করার জন্য আবিসিনিয়ার মতো ষড়যন্ত্র করতে না পারে। এতদসত্ত্বেও মহানবী (সা) আন্তরিকভাবে চাচ্ছিলেন যে, কুরাইশদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হোক। যাতে করে ঝগড়া-ফাসাদের অবসান হয় এবং ইসলাম প্রচারের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না থাকে।

ইহুদীদের ভীতি প্রদর্শন

মদীনা ও তার আশেপাশে অনেক ইহুদী বসবাস করত। সম্ভবত মুসলিম সৈন্যবাহিনী গঠন ও বিভিন্ন অভিযানে পাঠানোর পিছনে ইহুদীদের ভীতি প্রদর্শনও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মুসলমানদের মদীনায় বসবাস শুরু করাটা ইহুদীরা তাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। তাদের আশা ছিল, মুসলমানদের সহযোগিতায় তারা খৃষ্টানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে। মুসলমানদের মদীনায় বসবাস শুরু করার পর শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে একটি চুক্তি

সম্পাদিত হয়। ইহুদীরাও এই চুক্তিতে शामिल হয়। কিন্তু তারা দেখল, মহানবী (সা) দিন দিন অগ্রগতি সাধন করছেন। ইসলাম ও ইসলামের নবীর এই অগ্রগতি তারা মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারল না। তারা বিদ্বেষে ফেটে পড়ল। কিন্তু চুক্তিভঙ্গে অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে তারা মনের ভাব প্রকাশও করতে পারছিল না। তাতে এক দিকে মদীনায় গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। অপরদিকে মদীনা ও তার আশেপাশে ছড়িয়ে রাখা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুদের কারবার লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। এ কারণে তারা পর্দার অন্তরালে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চলল। তারা আনসার ও মুহাজিরদের একে ফাটল ধরাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। আবার কখনো কখনো আউস ও খায়রাজ গোত্রীয় মুসলমানদের মধ্যে বুয়াছ যুদ্ধের বিস্মৃত স্মৃতি পুনরায় জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। বুয়াছ যুদ্ধের সময় যেসব জ্বালাময়ী কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছিল, আউস ও খায়রাজদের উত্তেজিত করার জন্য ইহুদীরা সেগুলো উঠতে-বসতে গুনগুন করে আবৃত্তি করত। এভাবে তারা মুহাজির ও আনসার এবং আউস ও খায়রাজদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধার ষড়যন্ত্র করে চলছিল।

ইহুদীদের ষড়যন্ত্র

মুসলমানরা ইহুদীদের ষড়যন্ত্র খুব তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে। তারা পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ইহুদীদের এই ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর মুসলমানরা তাদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে। এমনকি মুনাফিকদের চেয়েও ইহুদীদের বেশি এড়িয়ে চলতে থাকে। তাদের মুসলমানদের মজলিস থেকে উঠিয়ে দেয়া হয়। প্রথমদিকে মহানবী (সা) ইহুদীদের বোঝানোর জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাদের মুসলিম-বিরোধী কার্যকলাপ দেখে তিনিও এড়িয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের বলাহীন ছেড়ে দেয়াও নিরাপদ ছিল না। তাতে তারা শহরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করত। তিনি ভাবলেন, তাদের সাথে উঠাবসা এবং কথাবার্তা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যও দেখাতে হবে। তাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করতে হবে যে, ষড়যন্ত্র করলে তোমাদের নির্মূল করে দেয়া হবে। এই কৌশলের প্রেক্ষিতেও মুসলিম টহলদার সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন দিকে পাঠানো হতো। এসব বাহিনী যাতে শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজেদের শক্তি নষ্ট করে না ফেলে, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। কারণ তাতে মক্কার পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তির আশংকা ছিল। মক্কায়ে যেমন কুরাইশরা মুসলমানদের দুর্বল পেয়ে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল, তেমনি মদীনায়ও ইহুদীরা মুসলমানদের দুর্বল দেখতে পেলে এখান থেকে বের করে দিতে সক্ষম হবে।

এজন্যই টহলদার বাহিনীগুলোর একটি কোম্পানী কমান্ডের দায়িত্ব হযরত হামযা (রা)-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া কোন ভয়-ভীতি কিংবা হস্তক্ষেপ তাঁকে তাঁর মিশন থেকে বিরত রাখতে পারত না। এসব পদক্ষেপ থেকে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, টহলদার বাহিনী গঠন ও বিভিন্ন অভিযানে পাঠানোর পিছনে মুসলমানদের দু'টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। তার একটি হলো ইহুদীদের ভয় দেখানো এবং অপরটি হলো কুরাইশদের সমঝোতার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে মুসলমানরা কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই স্বাধীনভাবে নিজেদের মতাদর্শ প্রচার করতে পারে।

ইসলাম ও যুদ্ধ

আমরা এ কথা বলি না যে, জান-মাল ও ঈমানের হেফাজতের জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। বরং সেকাল থেকে আজ পর্যন্ত এমনকি পৃথিবীর শেষ দিনটি পর্যন্ত আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধ ইসলাম ধর্মে ফরয করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর তা হলো, যুদ্ধে শত্রুর উপর বাড়াবাড়ি না করা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَلَا تَغْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُغْتَدِينَ -

“এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।” (২ : ১৯০)

যদিও মুহাজিরদের বিষয়-সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার দাবি ন্যায্য ছিল, তবু আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট তাদের মতবাদের স্বাধীনতা লাভই ছিল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চাইতেন কেউ যেন মুসলমানদের ধর্মচ্যুত করার সাহস না করে। আর এই উদ্দেশ্যেই ইসলাম ধর্মে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বৈধ করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহশের বাহিনী

হিজরতের দ্বিতীয় বছর রজব মাসে মহানবী (সা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহশের নেতৃত্বে একটি টহলদার বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র বিশজন মুহাজির। মহানবী (সা) বাহিনীর অধিনায়কের হাতে একটি মুখ বন্ধকৃত চিঠি দিয়ে বলেন, “দু’দিন পথ চলার পর এই চিঠিটি খুলে পড়বে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবে।” হযরত আবদুল্লাহ্ ও তার সাথীরা মহানবী (সা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পথ চলতে থাকেন। দু’দিন পথ চলার পর হযরত আবদুল্লাহ্ চিঠিটি খুলেন। তিনি দেখতে পান তাতে লেখা রয়েছে, “হে আবদুল্লাহ্! আমার চিঠি পড়ার পর তোমরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নখলায় যাবে। সেখানে কুরাইশ কাফেলা প্রতীক্ষা করবে এবং তাদের সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করবে।” হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহশ মহানবী (সা)-এর চিঠির বিষয়বস্তু তাঁর সফর সঙ্গীদেরকেও পড়ে শোনান। এরপর সবাই নখলার দিকে রওয়ানা দেন। পথে হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হযরত উতবা ইবনে গায়ওয়ান (রা)-এর উটগুলো হারিয়ে যায়। উটের সন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। উট তালাশ করার এক পর্যায়ে তাঁরা কুরাইশদের হাতে বন্দী হন। এদিকে দলের অধিনায়ক তাঁর অপর সঙ্গীদের নিয়ে নখলায় পৌঁছান। এ সময়ে মক্কার কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা নখলার রাস্তায় দেখা যায়। কাফেলাটি সিরিয়া থেকে মক্কা ফিরছিল। দিনটি ছিল রজব মাসের শেষ দিন। আর রজব ছিল নিষিদ্ধ মাসগুলোর অন্যতম। তৎকালীন আরবে এসব মাসে খুন-খারাবি নিষিদ্ধ ছিল। বাণিজ্য কাফেলার নেতা ছিল আমর ইবনে হায়রামী। তাকে দেখেই মুসলমানদের রক্ত গরম হয়ে উঠল। তাদের মানস স্মৃতিপটে জেগে উঠল এরাই তো আমাদেরকে নিজেদের বাস্তুভিটা ও বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা কাফেলার উপর আক্রমণ করার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করলেন। আর এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে দুটো অভিমতের সৃষ্টি হলো। একটি অভিমত হলো, “আজ যদি আমরা তাদের ছেড়ে দেই, তারা এই রাতের মধ্যেই মক্কার নিরাপদ এলাকায় চলে যাবে। এরপর আর আমরা

তাদের নাগাল পাবো না। আর আজ যদি আমরা তাদের উপর হামলা করি, তাহলে এটা হবে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা।” এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মুসলমানদের মধ্যে কিছুক্ষণ বিরাজ করল। এরপর তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলো। তারা বিদ্যুৎ বেগে কাফেলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত ওয়াকিদ সাহ্মীর তীরের আঘাতে আমার ইবনে হাযরামী মারা গেল। কাফেলার দু’ ব্যক্তিকে মুসলমানরা গ্রেফতার করল।

বিশৃঙ্খলা রক্তপাতের চেয়ে খারাপ

মুসলিম টহলদার বাহিনীর অধিনায়ক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ মদীনাতে ফিরে এলেন। তিনি দু’জন বন্দী ও লব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে পেশ করলেন। মহানবী (সা) সব ঘটনা শুনে উত্তেজিত হয়ে বললেন, “আমি তোমাদের নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করার অনুমতি দেইনি।” মহানবী (সা)-এর এই বাণী শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ বিব্রত হয়ে পড়েন। মহানবী (সা) বন্দী ও ধন-সম্পদ কিছুই গ্রহণ করলেন না। এগুলো তখনও টহলদার বাহিনীর অধিনায়কের নিকটে ছিল।

এ ঘটনা কুরাইশদের বিদ্বেষ ছড়ানোর একটা সুযোগ করে দেয়। তারা চারদিকে প্রচার করে বেড়ায়, “(হযরত) মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীরা নিষিদ্ধ মাসে আমাদের উপর হামলা করে রক্তপাত করেছে। তারা আমাদের ধন-সম্পদ ও মানুষ বন্দী করে নিয়ে গেছে।” মক্কাতে তখনো যেসব মুসলমান ছিলেন, তাঁরা এ ঘটনার ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলতেন, “মুসলমানরা রজব মাসে নয় বরং শাবান মাসে এ ঘটনা করেছে। অর্থাৎ রজব মাসের রাত শেষে শাবান মাসের প্রথম প্রহরে মুসলমানরা এই হামলা চালিয়েছে। এই ঘটনা মদীনার ইহুদীদেরও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সুযোগ এনে দেয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে তারাও বলতে শুরু করে, মুসলমানরা নিষিদ্ধ মাসেই এই আক্রমণ চালিয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে আয়াত নাযিল হয় :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ - قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ - وَصَدُّ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ
اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ - وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّى يَرْدُّوكُمُ عَنْ
دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا .

“পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, বল, ‘তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামের পথেও বাধা দেয়া এবং সেখানকার বাসিন্দাকে সেখান থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়। বিশৃঙ্খলা হত্যা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়।’ তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে। যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়।” (২ : ২১৭)

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানরা স্বস্তিবোধ করেন এবং আনন্দিত হন। মহানবী (সা) কাফেলা থেকে লব্ধ সম্পদ গ্রহণ করেন এবং ব্যয় করেন। তিনি

কাফেলার বন্দীদের কড়া পাহারায় রাখার ব্যবস্থা করেন। কুরাইশরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদের লোকদের ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মহানবী (সা) তাদের বলে পাঠান, “আমার দুই বন্ধু সা‘আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং উতবা ইবনে গায়ওয়ান তোমাদের নিকট বন্দী রয়েছে। আমরাও তাদের মুক্তি চাই। তোমরা যদি তাদের হত্যা করে ফেলে থাক, তাহলে আমরাও তোমাদের বন্দী সাথীদের হত্যা করব।” মহানবী (সা)-এর এই দৃষ্ট ঘোষণা শুনে কুরাইশরা হযরত সাআদ ও হযরত উতবাকে মুক্ত করে দেয়। বিনিময়ে মহানবী (সা)-ও কুরাইশ বন্দীদের মুক্ত করে দেন। এই দুজন বন্দীর মধ্যে হাকাম ইবনে কায়সান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অপরজন মক্কায় চলে যায় এবং সেখানে সে আমৃত্যু পৈতৃক ধর্মে ছিল।

এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের বাহিনী এবং উপরে উল্লিখিত পবিত্র কোরআনের আয়াতটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কারণ এখান থেকেই ইসলামের রাজনীতির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। এই ঘটনার মাধ্যমে একজন ক্ষমতামিশ্রিত এবং বিরাট ব্যক্তিত্বের অবস্থা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। এই বিরাট ব্যক্তিত্ব বস্তুবাদী ও আধ্যাত্মিক জীবনধারার মধ্যে অনুপম সমন্বয় সাধন করেছেন। এই সমন্বয় আমাদের জীবনপথের আলোকবর্তিকাস্বরূপ। পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ সম্পর্কিত মুশরিকদের প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। তাতে তাদের চিন্তাধারা সমর্থন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সত্যিই নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া পাপ কাজ। কিন্তু এই সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে, অপর একটি পাপ এর চাইতেও জঘন্যতর। আর তা হলো, মসজিদে হারাম থেকে মানুষকে বের করে দেয়া অর্থাৎ ধোঁকা-প্রতারণা, লোভ-লালসা ও অত্যাচার-নির্যাতনের মাধ্যমে কাউকে তার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করা নিষিদ্ধ মাসে হত্যার পদক্ষেপের চাইতে কোন অংশেই গুণ নয়। কুরাইশরা নিষিদ্ধ মাসে হত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। অথচ তারা নিজেরাই তখনও মুসলমানদের হত্যা করার জন্য নাসা-তরবারি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বের করে দিচ্ছে। ইসলাম ত্যাগ করার জন্য বাধ্য করছে। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানরা যদি নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যায় তাতে অন্যায়ের কি আছে। বস্তুত যদি কোন ব্যক্তি বা দল কোন খারাপ কাজ না করে, কুরাইশদের মতো কারো প্রতি অন্যায়-অবিচার ও অত্যাচার-নির্যাতন না করে এরূপ ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সত্যিই অন্যায় কাজ। ইসলামও তা সমর্থন করবে না।

নিঃসন্দেহে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হত্যাকাণ্ডের চাইতেও জঘন্য অপরাধ। বস্তুত যে জাতি অন্যদেরকে তাদের সত্য ধর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার কূট চক্রান্ত করে বেড়ায় এরূপ জাতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। এরূপ যুদ্ধ আল্লাহর পথে যুদ্ধ বলে গণ্য হবে। এ ধরনের যুদ্ধ এজন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে, তাতে বিরোধী পক্ষ তার ঘৃণ্য তৎপরতা থেকে বিরত হবে। তাতে করে আল্লাহর ধর্ম জয়যুক্ত হবে। পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করে খৃষ্টান প্রাচ্যবিদরা বলে বেড়ায়, “ইসলাম মানুষকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। ধর্ম প্রচারের জন্য যুদ্ধকে অত্যাৱশ্যক বলে মনে করে।” খৃষ্টানদের এই উক্তি নতুন কিছু নয়। এর আগেও তারা একাধিকবার বলেছে, “ইসলাম তরবারির জোরে তার মতাদর্শ মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চায়।” বস্তুত এসব উক্তি হচ্ছে এক শ্রেণীর খৃষ্টানদের

যারা ধর্ম প্রচারের জন্য কোন সময় তরবারি স্পর্শও করেনি। যারা কোন সময় ধর্মের কারণে অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়নি। এজন্য তারা নিজেরা শান্তির পথ বেছে নিয়েছে এবং অন্যদেরও এ পথ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। শান্তি ও মৈত্রী এ ধরনের লোকদের জাতীয় শ্লোগান। তারা সব সময় মানুষ ও আল্লাহ তা'আলার মাঝখানে হযরত ঈসাকে সেতুবন্ধ হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে। এ ধরনের লোকেরা তাদের ধর্মগ্রন্থের অনেক কথাই বেমালুম চেপে যায়। আমরা সেগুলো উল্লেখ করে তর্কের আসর জমাতে চাই না। অথচ তাদের ধর্মগ্রন্থ ইন্জীলেই রয়েছে, “আমি শান্তির সন্ধানে পৃথিবীতে আসিনি, আমি এসেছি তরবারি চালাবার জন্য।” পবিত্র ইন্জীল গ্রন্থের এই ভাষ্যটি আমরা ব্যাখ্যাও করতে চাই না। কারণ আমরা মুসলমানরা হযরত ঈসার নবুয়তকে স্বীকার করি। আমি শুধু খৃষ্টান প্রাচ্যবিদদের উল্লিখিত অভিযোগ খণ্ডন করতে চাই। তাদের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের দুটি ভাষ্য উল্লেখ করা যায়। তার একটিতে বলা হয়েছে :

لَا أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ -

“ধর্ম সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই। সত্যপথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে।” (২ : ২৫৬)

পবিত্র কোরআনের অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا - إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ -

“যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ; কিন্তু সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।” (২ : ১৯০)

উপরোক্ত দুটি ভাষ্য ছাড়াও পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে বলা হয়েছে, ইসলামে দীক্ষিত করার ব্যাপারে এতটুকু জোরজবরদস্তি নেই।

আল্লাহর পথে জিহাদ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের সৈন্যদল সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতটির দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহর পথে জিহাদের অর্থ হচ্ছে-- যারা মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে চায়, তাদের সাথে যুদ্ধ করা। বস্তুত ধর্মের হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্য এ যুদ্ধ হয়ে থাকে। বর্তমান যুগের পরিভাষায় এই যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিশ্বাস ও মতবাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা। এই ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কেউ যদি কাউকে ঘুষ, চাপ কিংবা নির্যাতন ছাড়া শুধু যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তার ধর্মবিশ্বাস থেকে বিপথগামী করতে চায়, তাহলে সে ব্যক্তিকেও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তার মোকাবিলা করতে হবে। আর যদি কোন লোককে যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া শুধু শক্তি, চাপ, ভয়-ভীতি ও নির্যাতনের মাধ্যমে তার ধর্মবিশ্বাস থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়, তাহলে এর প্রতিবিধানে সে ব্যক্তিকেও অনুরূপ পন্থা গ্রহণ করতে হবে। কেননা মানুষের সম্মান ও মর্যাদাই তাকে নিজ ধর্মবিশ্বাসের হেফাজতের যিদ্দাদার করেছে। যে ব্যক্তির মানবতার অর্থ সম্পর্কে উপলব্ধি রয়েছে, তার নিকট নিজের ধর্মবিশ্বাসের হেফাজত ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদা এমনকি নিজের জীবনের চাইতেও প্রিয় বস্তু।

মানুষ এবং জীব-জন্তু প্রাণী হিসাবে উভয়ই সমান। খাওয়া-দাওয়া ও বৃদ্ধি এবং নিজের শরীরের হেফাজতের ব্যাপারে উভয়েরই সমান অনুভূতি রয়েছে। শুধু ধর্মবিশ্বাসই মানুষকে মানবতার স্তরে নিয়ে আসে, আল্লাহ তা'আলার সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই ধর্মবিশ্বাসই মানুষকে অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। এই ধর্মবিশ্বাসের জন্যই মানুষ নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্যের জন্যও তা পছন্দ করে। ধর্মের প্রতি আস্থাভান মানুষই নিজের প্রয়োজনের চাইতে, নিজের পরিবার-পরিজনের চাইতে সমমনাদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দান করে। সে সব সময় মানব জাতির কল্যাণ বিধানে সচেষ্টি থাকে। এই ধর্মবিশ্বাস মানুষের মজ্জাগত হওয়ার পর যদি কেউ তাকে বিচ্যুত করতে চায়, শত অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েও কামিয়াব হয় না। ধর্মবিশ্বাসী লোকটি অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়েও নিজের মতবাদ ত্যাগ করে না। যেমন হিজরতের পূর্বে মক্কায় মুসলমানদের জীবনে ঘটেছিল। তারা শত অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছে, কিন্তু তবু ধর্মচ্যুত হয়নি। অত্যাচারে অত্যাচারে জীবন ওষ্ঠাগত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ধর্মবিশ্বাসের হেফাজতকে নিজের জীবনের চাইতেও প্রিয়তর মনে করেছেন।

খৃষ্টধর্মের প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানরাও এমনটি করেছেন। মক্কার মুসলমানদের ন্যায় তাঁরাও ধর্মের পথে নানা ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। তাঁরাও সংখ্যায় খুব কম ছিলেন। ঈমানী শক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের পছন্দ করেন। কোন অত্যাচার-নির্যাতনই তাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাঁদের দৃঢ়তা ও ঈমানী শক্তি সম্পর্কে পবিত্র ইন্জীল গ্রন্থেও বলা হয়েছে যে, তাঁরা পাহাড়কে নিজের স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিলে সে তা পালন না করে পারবে না।

বিরোধীরা যেসব উপকরণ ও অস্ত্র দ্বারা কাউকে ধর্মচ্যুত করতে চায়, সামর্থ্য থাকলে তাকেও সমপরিমাণ শক্তিতে মোকাবিলা করতে হবে। এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও ইতস্তত করা চলবে না। যদি উক্ত ব্যক্তি মোকাবিলা না করে, তা'হলে মনে করতে হবে তার ঈমান এখনো দৃঢ়তা লাভ করেনি। এখনো তার ধর্মবিশ্বাসের বুনিয়াদ দুর্বল রয়ে গেছে। মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীরাও মদীনায় বসবাস শুরু করার পর এই নীতি গ্রহণ করেন। সিরিয়া ও কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) অধিকারের পর খৃষ্টানরাও তাদের বিরোধীদের ব্যাপারে এই নীতি গ্রহণ করেন। কোন কোন রোমান সম্রাট কোমলমনা হওয়া সত্ত্বেও ধর্মীয় ব্যাপারে কোমলতার পরিচয় দেননি। নিজেদের ধর্মীয় মতবাদের নিরাপত্তা নিষ্কটক করার জন্য তারা বিরোধীদের উপর যথেষ্টভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন।

খৃষ্টধর্ম ও যুদ্ধ

বর্তমানে খৃষ্টান প্রচারকরা বলে বেড়ায়, “খৃষ্টধর্মের দৃষ্টিতে যুদ্ধবিগ্রহ বৈধ নয়।” আমরা তাদের এই দাবির যথার্থতা কিংবা ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে তর্ক করতে চাই না। খৃষ্টধর্ম ও ইসলামের ইতিহাস আমাদের সামনে রয়েছে। উভয় ধর্মেরই নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বলছে, খৃষ্টধর্মের জন্মলগ্ন থেকেই এই ধর্মের নামে পৃথিবী অসংখ্য মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। রোমান সাম্রাজ্যে এই ধর্মের নামে মানুষের রক্ত অনেক সস্তা হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়া হয় এই ধর্মকে কেন্দ্র করেই। খৃষ্টধর্মের অনুসারীরাই ক্রুশেডের যুদ্ধগুলো বাঁধিয়েছিল।

ক্রুশেডের নামে তারা মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের উপর বারবার হামলা চালায়। তারাই বায়তুল মুকাদ্দাসে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের রক্তস্রোত বইয়েছে। এসব যুদ্ধে ধর্মযাজকরা খৃষ্টান সৈন্যদের মধ্যে তাবাররোক বিতরণ করত। তারা বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকারের জন্য খৃষ্টান বাহিনীকে নানা উপায়ে উদ্বুদ্ধ করত, অনুপ্রাণিত করত। এ সময়ে বায়তুল মুকাদ্দাস ছিল মুসলমানদের অধিকারে। এসব ধর্মযাজক কি জানত না যে, খৃষ্টধর্মের দৃষ্টিতে রক্তপাত নিষিদ্ধ? খৃষ্টান চিন্তাবিদরা যদি বলেন, মধ্যযুগ ছিল অন্ধকার ও অজ্ঞতার যুগ। সে যুগের ঘটনাবলিকে খৃষ্টধর্মের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে টেনে আনা যায় না। আমরা বলব, এই বিংশ শতাব্দী হচ্ছে শিক্ষা ও সভ্যতার যুগ। এ যুগেও তো খৃষ্টধর্মের অনুসারীদের মধ্যে মধ্যযুগের ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি হতে দেখা গেছে। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সামনেই রয়েছে। ১৯১৮ সালের শেষ দিকে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়। এ সময় মিত্রশক্তির মুখপাত্র লর্ড আলবেনী বায়তুল মুকাদ্দাসে ক্রুশেড উড়িয়ে সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন, “আজ ক্রুশেডের যুদ্ধ পরিপূর্ণতা লাভ করল।”

মুসলমান ও খৃষ্টান মনীষী

সেকালে খৃষ্টানদের মধ্যে অনেক মনীষী ছিলেন যারা যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করতেন না। তাঁরা ছিলেন মানবতাবাদী। মানুষের কল্যাণ বিধানই ছিল তাঁদের একমাত্র কামনা। আমরা এ ঐতিহাসিক তথ্য অস্বীকার করি না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত বিরোধী মানবতাবাদী মনীষীদের সংখ্যা খৃষ্টানদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি ছিলেন। এসব মুসলিম মনীষী ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের একেক জন দিকপাল। তাঁরা ছিলেন সকল বিতর্কের উর্ধ্বে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল তাঁদের নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য ব্যাপার। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তাঁরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। একথা সত্য যে, খৃষ্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই যুগে যুগে আদর্শ পুরুষের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু মানব জীবনের বিকাশ সাধন ও পরিপূর্ণতার জন্য পৃথিবী শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত তৎপর থাকলেও প্রাক-ইসলামী যুগে মানুষ তা অর্জন করতে পারেনি। বিশ্ব-মানব পরিপূর্ণতার সে স্তরে পৌঁছার কোন লক্ষণও সেকালে দেখা যায়নি। এমনি একটি অজ্ঞতা ও অন্ধকারময় বিশ্বে আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে মহানবী (সা)-এর আবির্ভাব হয়। তিনি নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে মদীনাতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সে সময়েও পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি একে অপরের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। বিভিন্ন জাতি যুদ্ধের মারণাস্ত্র আবিষ্কার ও তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু সেকালে যুদ্ধবাজ জাতিগুলো পারস্পরিক সমঝোতা ও সন্ধির প্রত্যাশী ছিল না এমন কথাও আমরা বলছি না। সে সময়েও বিভিন্ন জাতি একে অপরের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করত। এই সঙ্গে তারা যুদ্ধের মারণাস্ত্র তৈরিও বন্ধ রাখত না। ‘যুদ্ধ নিষিদ্ধ’ এবং ‘অস্ত্র সীমিতকরণ’ শ্লোগান দুটিকে সেকালের মানুষও প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করত। এমনি পরিস্থিতিতে এক পর্যায়ে পৃথিবীর মানুষ যুদ্ধ-বিগ্রহের বাস্তবধর্মী নিন্দা শুনতে পেলো। এই নিন্দাবাদ ধ্বনি ছিল কপটতামুক্ত। আর এ ধ্বনি উঠেছিল মানব জাতির মুক্তির সনদ ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে। কিন্তু আজ পাশ্চাত্যে যারা ইসলামকে যুদ্ধবাজ ধর্ম বলে সমালোচনা করছে, তারা কি পৃথিবীকে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হানাহানি থেকে মুক্ত করতে পেরেছে। বস্তুত তারা শান্তির জন্য কোন কাজই করেনি, তাদের মুখেই এ ধরনের সমালোচনা শুনতে পাওয়া যায়।

স্বভাবজাত ধর্ম ইসলাম

কাল্পনিক চিন্তাধারা আর ধ্যান-ধারণার উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নয়। ইসলামের ভিত্তিতে কল্পনার কোন অবকাশ নেই। সীমিত কিছু সংখ্যক লোকের জীবন ব্যবস্থা উন্নত ও সমৃদ্ধ করাও ইসলামের লক্ষ্য নয়। বস্তুত এ ধর্ম হচ্ছে স্বভাবজাত ধর্ম, প্রকৃতির ধর্ম। তার অনুসারীদের মধ্যে ব্যক্তিও রয়েছে, দলও রয়েছে। ইসলামের প্রতি ব্যক্তি-দল নির্বিশেষে সবারই দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ইসলাম স্বীকৃত সত্য ও স্বভাবজাত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধ-বিগ্রহকে ইসলাম অস্বীকার করে না। কিন্তু মানবতার সম্মানের প্রেক্ষিতে ইসলাম যুদ্ধের ব্যাপারে কিছুটা উদার নীতির শিক্ষা দান করে। এটাই হচ্ছে যুদ্ধের ব্যাপারে মানব ইতিহাসে সবচাইতে বড় পরিবর্তন। এই পরিবর্তন মানুষের কল্যাণ বিধানের অনুপ্রেরণা দান করে। আমরা বলেছি ইসলাম উদার রণনীতির শিক্ষা দান করে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, শুধু দুটো পরিস্থিতিতে ইসলাম যুদ্ধ করার অনুমতি দান করে। তার একটি হলো মানব জীবনের নিরাপত্তা বিধান এবং অপরটি হচ্ছে মানুষের ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। ইসলাম শুধু এ দু'টি ক্ষেত্রেই যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেছে। আর পবিত্র কোরআনও তা অনুমোদন করেছে। এক কথায়, এ যুদ্ধ হচ্ছে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি এবং সামনে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বদর যুদ্ধ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের টহলদার সৈন্যদল ইসলামের ইতিহাসকে এক নতুন পথে প্রবাহিত করেন। কারণ এই বাহিনীর অন্যতম সদস্য হযরত ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহর তীরের আঘাতে কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার সদস্য আমর ইবনে হাযরামী নিহত হয়। মুসলিম বাহিনীর হাতে এটা ছিল প্রথম রক্তপাত। এই হত্যাকাণ্ডের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। আমরা তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। যারা মুসলমানদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করত, পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতে তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বস্তুত আমর ইবনে হাযরামীর হত্যাকাণ্ড উভয় পক্ষের (মুসলমান ও কুরাইশ) কর্ম-পদ্ধতি পরিবর্তন করে দেয়। মুসলমানরা মক্কায় তাদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি কিংবা তার বিনিময় কুরাইশদের নিকট থেকে আদায় করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়। অপরদিকে কুরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে যে তারা আমর ইবনে হাযরামীকে নিষিদ্ধ মাসে হত্যা করেছে। এই ঘটনাকে তারা মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে আরবের বিভিন্ন গোত্রকে উত্তেজিত করার একটি মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে। তাদের এই ভূমিকা দেখে মহানবী (সা) নিশ্চিত হন যে, মক্কার কুরাইশদের সাথে কোন প্রকার সমঝোতায় পৌছা সম্ভব নয়।

আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা

হিজরী দ্বিতীয় সালের শেষ দিকে কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়ার উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করে। এ কাফেলার নেতৃত্বে ছিলেন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান। এই কাফেলার অনুসন্ধানে মহানবী (সা) উশায়রা পর্যন্ত যান কিন্তু মহানবী (সা)-এর পৌছার দু'দিন আগেই কাফেলাটি সে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। এরপর মুসলমানরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কাফেলাটির ফেরার সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ফেরার সময় ঘনিয়ে আসলে মহানবী (সা) হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ এবং হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা)-কে কাফেলাটির খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য নিয়োগ করেন। তাঁরা হাওরা নামক স্থানে এসে কাশদ জাহানীর তাঁবুতে অবস্থান গ্রহণ করেন। কাফেলাটি সে স্থান অতিক্রম করতে দেখামাত্র হযরত তালহা ও হযরত সাঈদ (রা) দ্রুত মহানবী (সা)-এর দরবারে এসে খবর দেন। অবশ্য তাঁদের মদীনায় পৌছার আগেই মহানবী (সা) এ সম্পর্কে খবর পেয়ে যান। কাফেলাটি ছিল অনেক বড়। মক্কার সকল নারী-পুরুষ তাদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এই কাফেলার বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগ করে। এই কাফেলার পুঁজির পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার দীনার। মহানবী (সা) আশংকা

করেছিলেন হয়তো প্রতীক্ষা করতে করতে পূর্বের ন্যায় এবারও আবু সুফিয়ান সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কেটে পড়বে। এজন্য তিনি পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তিনি মুসলমানদের সমবেত করে বললেন, “হে মুসলমানগণ! বাণিজ্য শেষে কুরাইশ কাফেলা মক্কায় ফিরে যাচ্ছে। তোমরা সাহস করো। আশা করি আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ফেলে আসা ধন-সম্পদের চাইতেও বেশি দান করবেন।”

বদরের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের যাত্রা

মহানবী (সা)-এর উপরোক্ত আহ্বানে কিছু সংখ্যক মুসলমান অভিযানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। কিছু সংখ্যক মুসলমান যাওয়া-না যাওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পড়ে যান। অপরদিকে গনীমতের মালের লোভে মদীনার কাফেররাও মুসলমানদের সাহায্যে অভিযানে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু মহানবী (সা) তাদের বলেন, “ইসলাম গ্রহণ ছাড়া তোমাদের সাহায্যের আমাদের প্রয়োজন নেই।”

আবু সুফিয়ান সিরিয়ায় যাওয়ার পথে মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। বুদ্ধিবলে তিনি সেবার কোন রকমে নিরাপদে সিরিয়ায় চলে যেতে সক্ষম হন। সিরিয়া থেকে ফেরার পথেও সে আশংকা পুরোপুরি ছিল। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সারা পথে তিনি মুসলমানদের গতিবিধি সম্পর্কে খবরাখবর নেয়ার ব্যাপারে তৎপর থাকেন। এদিকে হাওরা নামক স্থানে কাশদ জাহানীর তাঁবুর নিকটে মহানবী (সা)-এর গোয়েন্দারা আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার প্রতীক্ষায় ওঁত পেতে বসে ছিল। আবু সুফিয়ান সেখানে পৌঁছে মুসলমানদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাশদ জাহানীকে জিজ্ঞেস করেন। সে মহানবী (সা)-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আবু সুফিয়ানকে কোন খবর দেয় না। অবশ্য এও ভাবে যে, কুরাইশদের এ বিরাট বাণিজ্য কাফেলায় মাত্র ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন লোক রয়েছে। মুসলমানরা এ অটেল বাণিজ্য পণ্য লুট করে নিতে পারে। এ কথা চিন্তা করে জাহানী কুরাইশদের প্রতি সদয় হলো। সে যমযম ইবনে আমর গিফারী নামক এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিয়ে এই বিপদ সম্পর্কে কুরাইশদের খবর দেয়ার জন্য মক্কায় পাঠিয়ে দিল। যমযম মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছে (আরবের তৎকালীন রীতি অনুযায়ী) নিজের উটের নাক-কান কেটে দিল। পণ্যবাহী গদি উটের পিঠে উঠিয়ে রেখে দিল। নিজের জামা ছিঁড়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, “হে কুরাইশ! তোমাদের বাণিজ্য কাফেলা বিপদগ্রস্ত! (হযরত) মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীরা আবু সুফিয়ানের উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তোমাদের বাণিজ্য পণ্য লাভের কোন আশা নেই। তাড়াতাড়ি লোক পাঠিয়ে আবু সুফিয়ানকে রক্ষা কর।”

আবু জেহেল যমযমের এই আহ্বান শুনে প্রথমে কা‘বাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। এরপর সে যমযমের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কুরাইশদের উদ্বুদ্ধ করে। অবশ্য কুরাইশদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কারণ উক্ত কাফেলার সবারই কিছু না কিছু পণ্য ছিল। তা সত্ত্বেও আবু জেহেলের মতো বিচক্ষণ ও অনলবর্ষী বাগ্মী ব্যক্তির আহ্বানে কুরাইশদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া জেগে উঠে। বিদ্যুৎ বেগে চারদিক থেকে মানুষ ছুটে আসতে থাকে। কিন্তু কুরাইশদের মধ্যেই আবার কিছু লোক ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তারা অনুভব করত, কুরাইশরা মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন

চালিয়েছে। মুসলমানরা কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথমে আবিসিনিয়ায় হিজরত করে। পরে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে মদীনায়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে মক্কার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক আবু জেহেলের আহবানে এই অভিযানে যেতে ইতস্তত করছিল। কিন্তু এই সঙ্গে তাদের আরেকটা আশংকা ছিল যে, আবু সুফিয়ান যদি মুসলমানদের হাতে আটকা পড়ে, তাহলে তাদের ধন-সম্পদও লুণ্ঠিত হবে।

কানানা ও কুরাইশদের পুরনো শত্রুতা

কুরাইশদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কানানা গোত্রের সঙ্গে তাদের পুরনো শত্রুতার কথাও ভাবছিল। তারা আশংকা করছিল কুরাইশরা আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তার জন্য অভিযানে গেলে কানানা গোত্র এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে। তারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মক্কায়ে হানা দিতে পারে। এই আশংকা কুরাইশদের মধ্যে তীব্রতর হয়ে উঠে। আবু সুফিয়ানের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা মূলতবী হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কানানা গোত্রপতি মালেক ইবনে জু'শাম মুদলাজী এই খবর শুনতে পায়। সে দ্রুত কুরাইশদের সমাবেশে এসে উপস্থিত হয় এবং বলে, “হে কুরাইশ বন্ধুগণ! আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কানানা গোত্র তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তোমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে তারা মক্কা আক্রমণ করবে না। এ ব্যাপারে আমি তোমাদের পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করছি। আবু জেহেল এবং আমার হায়রামী ছিল বাণিজ্য কাফেলার সাহায্যে অভিযানে যাওয়ার পক্ষপাতী। মালেক ইবনে জু'শামের এই প্রতিশ্রুতিতে তারা সাহস পেল। এরপর মক্কার যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিরা অভিযানে বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। কোন কারণে যারা যেতে অক্ষম ছিল, তারা অর্থের বিনিময়ে তাদের প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা করল। কিন্তু আবু লাহাব অভিযানে যাওয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজে না গিয়ে আস ইবনে হিশামকে তার বিকল্প হিসাবে ঠিক করল। আবু লাহাব আস-এর নিকট চার হাজার দিরহাম পেতো। এই অর্থ সে অভিযানে যাওয়ার বিনিময় হিসাবে আসকে ছেড়ে দিল।

উমাইয়া ইবনে খাল্ফ ছিল ভারী দেহের অধিকারী। সে দ্রুত চলাফেরা করতে পারত না। সে এই অভিযানে যেতে চাচ্ছিল না। উকবা ইবনে আবী মুআইত এবং আবু জেহেল উমাইয়ার নিকট আসে। উকবার নিকট ছিল একটি অঙ্গারধানিকা। তাতে লোবান জ্বলছিল। আর আবু জেহেলের নিকট ছিল একটি সুরমাদানী ও একটি শলাকা। উকবা উমাইয়াকে বলল, “তুমি হচ্ছে মহিলা। এই অঙ্গারধানিকা নাও এবং ঘরে বসে সুগন্ধ দ্বারা মস্তিষ্ক সুরভিত কর।” আবু জেহেল বলল, “হে মহিলা! তোমার জন্য সুরমা নিয়ে এসেছি।” এ ধরনের বিদ্রূপ শুনে উমাইয়া আর বসে থাকতে পারল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে যাওয়ার জন্য মনস্তির করল। মক্কার সবচাইতে দামি উটটি কিনে বন্ধুদের সাথে রওয়ানা দিল। চলাচলে সক্ষম মক্কার প্রতিটি লোকই এই অভিযানে শরীক হলো।

মুসলমানদের যাত্রা

হিজরী দ্বিতীয় সালে ৮ রমযান মহানবী (সা) মদীনা থেকে যাত্রা শুরু করেন। মদীনায়ে তাঁর অবর্তমানে হযরত আমর ইবনে উম্মে মাকতুমকে নামাযের ইমামতির দায়িত্ব ন্যস্ত করে

যান। রাওহা নামক স্থানে পৌঁছে হযরত আবু লুবাবাকে মদীনায় তাঁর স্থলবর্তী করে পাঠিয়ে দেন। এই অভিযানে মুসলমানদের দুটি পতাকা ছিল। যানবাহন বলতে ছিল মাত্র ৭০টি উট। এসব উটে পালা করে সাহাবীরা দুই থেকে চারজন পর্যন্ত আরোহণ করতেন। মহানবী (সা)-এর উটে শলীক ছিলেন হযরত আলী এবং হযরত মারছাদ ইবনে মারছাদ গানাবী (রা)। একটি উটে সাওয়ার হতেন হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)। এই অভিযানে মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০৫ জন।^১ মুহাজির ছিলেন ৮৩ জন। মদীনার আনসারদের মধ্যে আউস গোত্রের ছিলেন ৬১ জন। আর অবশিষ্ট ১৬১ জন ছিলেন খায়রাজ গোত্রের। মুসলমানরা খুব দ্রুত পথ অতিক্রম করছিলেন। তাঁরা আশংকা করছিলেন বিলম্ব করলে হয়তো আবু সুফিয়ান তাঁদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। তাঁরা চলার পথে লোকজনের নিকট কাফেলার কথা জিজ্ঞেস করতেন। ইরকুযাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে এক বেদুঈনের সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়। কিন্তু সে কাফেলা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারল না। মুজাহিদ বাহিনী এখান থেকে অগ্রসর হয়ে যাকেরান উপত্যকায় এসে পৌঁছান। তাঁরা এখানে এসে জানতে পারেন যে, মক্কার কুরাইশরা তাদের কাফেলার সাহায্যে এসে গেছে। এখন পরিস্থিতি ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। এখন শুধু আবু সুফিয়ান আর তার ত্রিশ-চল্লিশজন সাথীই নয়, পুরো মক্কাবাসীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। মক্কার এই বিশাল বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল শীর্ষস্থানীয় কুরাইশরা। তারা তাদের বাণিজ্য পণ্যের হেফাজতের ব্যাপারে মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিল। এ সময়ে মুসলমানদের মধ্যে তিন ধরনের অভিমতের সৃষ্টি হয়। আবু সুফিয়ানের কাফেলা লুট করতে পারলে প্রচুর ধন-সম্পদ পাওয়া যেত এবং কিছু কুরাইশকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া যেত। এরূপ পরিস্থিতিতে এই আশংকা ছিল যে, কুরাইশরা মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন করবে। তাতে যুদ্ধ বাঁধা ছিল অবশ্যস্বাবী। আজ যদি আবু সুফিয়ানের কাফেলার লুটের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে মদীনায় ফিরে যাওয়া হয়, তাহলে মক্কার কুরাইশ এবং মদীনার ইহুদীদের নিকট মুসলমানদের কোন মর্যাদাই থাকবে না। কুরাইশদের মতো ইহুদীরাও মুসলমানদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাবার দুঃসাহস করবে। তাতে করে মুসলমানদের মর্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। মহানবী (সা)-কে ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হতে হবে। তখন আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার আর ইসলামের বিজয়ের কোন প্রকার আশা-ভরসাই থাকবে না।

কুরাইশদের দল বেঁধে আসার খবর শুনে মহানবী (সা) যাকেরান উপত্যকায় এই পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর সফরসঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সবার আগে হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা) তাঁদের মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁদের পর মদীনার আনসারদের মধ্য থেকে হযরত মিকদাদ ইবনে আমর বলেন, “হে রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা‘আলা আপনার প্রতি যা প্রকাশ করেছেন আপনি সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা বনী ইসরাঈল নই। যারা হযরত মূসাকে বলেছিল, ‘আপনি এবং আপনার খোদা গিয়ে যুদ্ধ করুন--আমরা এখানে বসে থাকব।’ কিন্তু আমরা বলছি, আপনি এবং আপনার খোদার সঙ্গে মিলে আমরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব।”

১. মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে একাধিক অভিমত রয়েছে। কেউ বলেছেন ৩১১ জন, কেউ বলেছেন ৩১৩, কারো কারো মতে ৩৫০ জন। -অনুবাদক

এবার মহানবী (সা) আকাবার বায়আতে অংশগ্রহণকারীদের দিকে ইঙ্গিত করলেন। এসব আনসার মহানবী (সা)-এর সাথে প্রতিশ্রুতি দান করেছিল যে, আমরা আপনার নিরাপত্তার জন্য নিজেদের পরিবার-পরিজনদের বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করব না। অবশ্য তাদের উক্ত বায়আতে অন্যদের উপর আক্রমণ করার প্রতিশ্রুতি ছিল না।

হযরত সাআদ ইবনে মুআযের ভাষণ

আনসাররা বুঝতে পারলেন মহানবী (সা) তাদের দিকে ইঙ্গিত করছেন। আনসারদের পতাকাবাহী ছিলেন হযরত সাদ ইবনে মুআয (রা)। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের দিকে ইঙ্গিত করছেন?” মহানবী (সা) বললেন, “আমি তোমাদের দিকেই ইঙ্গিত করছি।” এরপর হযরত সাআদ বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আপনার রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা সাক্ষ্য প্রদান করেছি আপনার ধর্মই সত্য ধর্ম। আমরা আপনার সাথে এই ওয়াদাও করেছি, আপনার আনুগত্যে আমরা এতটুকু ত্রুটি করব না। যিনি আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন, সেই অদ্বিতীয় মহান স্রষ্টার শপথ করে বলছি, আপনি যদি সাগরে পা রাখেন, আমরাও বিনা দ্বিধায় তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব, আপনি আমাদের কাউকে পিছনে দেখতে পাবেন না। শত্রুর মোকাবেলা করার ব্যাপারে আমরা কোন প্রকার দ্বিধা করব না। যুদ্ধের ময়দানে আপনি আমাদের ধৈর্যশীল পাবেন এবং শত্রুর মোকাবেলায় পাবেন অটল, অনড়। আমরা আশা করি, আমাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত রাখবেন। শত্রুকে ঘেরাও করার জন্য এখন আমাদের দ্রুত এগিয়ে যাওয়া উচিত।”

হযরত সাআদের বক্তৃতা চলছিল। বক্তৃতা শুনে মহানবী (সা)-এর চেহারা খুশি ও আনন্দের এক অভাবনীয় দৃশ্য ফুটে উঠছিল। হযরত সাআদের বক্তৃতার পর মহানবী (সা) বললেন, “বন্ধুগণ! এখন এগিয়ে চলো। আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের জন্য বিজয়ের শুভ সংবাদ রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা দু’টি শত্রু কাফেলার মধ্যে একটির ব্যাপারে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। আল্লাহর শপথ, মক্কাবাসীদের প্রতিটি নিহতের দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

মুসলিম বাহিনী এখান থেকে সামনে এগিয়ে চলল। তারা বদরের নিকট গিয়ে পৌঁছল। মহানবী (সা) তাঁর সাথীদের এখানে রেখে আশেপাশে ঘোরার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। একটু দূরে গিয়ে একজন বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো। তিনি নিজের পরিচয় গোপন রেখে কুরাইশ ও মুসলমানদের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারলেন কুরাইশরা নিকটেই কোথাও শিবির স্থাপন করেছে।

মহানবী (সা)-এর প্রজ্ঞা

বৃদ্ধের সাথে আলাপের পর মহানবী (সা) শিবিরে ফিরে আসেন। তিনি হযরত আলী ইবনে আবু তালিব, হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম এবং হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে একদল সৈন্যসহ শত্রুর খোঁজখবর নেয়ার জন্য বদরের কূপের দিকে পাঠিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর তারা ফিরে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন দু’টি কিশোর। তাদের সঙ্গে

আলাপ-আলোচনা করে বোঝা গেল যে, সামনের পর্বত চূড়ার উল্টো দিকেই শত্রুরা শিবির স্থাপন করেছে। কিন্তু শত্রুবাহিনীর সংখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে তারা কিছুই বলতে পারল না। এরপর মহানবী (সা) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ওখানে যারা আছে তারা প্রতিদিন কয়টি উট যবাই করে। কিশোররা বলল, একদিন ৯টা উট জবাই করেছে এবং পরদিন করেছে ১০টা। এ থেকে মহানবী (সা) অনুমান করলেন যে, কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা ৯শ' থেকে ১ হাজার হবে। কিশোর দু'টি আরো বলল, কুরাইশদের সকল শীর্ষস্থানীয় নেতা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মক্কা থেকে এসেছেন। কুরাইশদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার পর মহানবী (সা) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, “মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলোকে তোমাদের পদদলিত করার জন্য বের করে দিয়েছেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুটা চিন্তিত হলেন। তিনি ভাবলেন, মুসলমানদের তুলনায় কুরাইশদের সংখ্যা তিনগুণ বেশি। আমার সাথীদের দুর্লভ মনোবলের প্রয়োজন। কারণ যাদের অন্তর ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান, আল্লাহর সাহায্যের প্রতি যাদের দৃঢ় আস্থা থাকে, এরূপ নায়ক পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র তারাই বিজয় লাভ করতে পারে। তিনি সাহাবীদের মনোবল ও ঈমানী শক্তি সুদৃঢ় করার প্রয়াস পেলেন।

মহানবী (সা) তাঁর পূর্ববর্তী তিনজন সাহাবার ন্যায় আরো দু'জনকে খবর সংগ্রহ ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তারা বদরে গেলেন। একটি খোলা জায়গায় সওয়ারী বা বাহন রেখে মশক নিয়ে কূপের নিকট গেলেন। সেখানে আগে থেকে দু'টি মেয়ে বসা ছিল। একটি মেয়ে তার সঙ্গিনীর নিকট পাওনা অর্থ চাইছিল। অপর মেয়েটি বলল, “কাল কিংবা পরশু দিন এখানে একটি বাণিজ্য কাফেলা আসার কথা আছে, আমি তাদের কাজ করে তোমার দেনা পরিশোধ করব।” এই খবর সাহাবী দুজন শুনেই শিবিরে ফিরে চলে গেলেন। তারা মহানবী (সা)-কে এ তথ্য অবহিত করলেন।

আবু সুফিয়ানের পলায়ন

আবু সুফিয়ানের আশংকা ছিল মুসলমানরা তার কাফেলা আক্রমণ করতে পারে। এই আশংকায় সে পরিস্থিতি আঁচ করার জন্য কাফেলাকে পিছনে রেখে এগিয়ে আসেন। বদরে পৌঁছে মাজদী ইবনে আমরের সাথে তার সাক্ষাত হয়। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কাউকে আসা-যাওয়া করতে দেখেছ? মাজদী বলল, কিছুক্ষণ আগে এখানে কুয়ার নিকটে দু'জন উষ্ট্রারোহী এসেছিল। তারা এখানে সামান্য সময় অপেক্ষা করে চলে গেছে। এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান দু'জন সাহাবী যেখানটায় তাঁদের উট দাঁড় করিয়েছিলেন সেখানে আসলেন। তিনি উটের মল উঠিয়ে দেখলেন। মল পরীক্ষা করে তিনি বুঝতে পারলেন এসব উট ছিল ইয়াসরিব বা মদীনার। এরপর পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে আবু সুফিয়ানের বেগ পেতে হলো না। আবু সুফিয়ান দ্রুত পিছনে সরে এলেন। কাফেলার নিকট এসেই তিনি গতিপথ পরিবর্তন করলেন। তিনি সাগরের উপকূল হয়ে চলতে লাগলেন। এরূপে তিনি কাফেলাকে মুসলমানদের চোখ এড়িয়ে নিরাপদে মক্কার দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চললেন। মুসলমানরা দ্বিতীয় দিন এ পথে আবু সুফিয়ানের কাফেলা আসার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু খবর পাওয়া গেল বাণিজ্য কাফেলাটি অন্যপথে চলে গেছে। অবশ্য কুরাইশ বাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য পর্বত চূড়ার অপর পার্শ্বে শিবির স্থাপন করেছে। এ খবর শুনে

মুসলমানদের মধ্যে কয়েকজন যাঁরা গনীমতের মাল লাভের আশায় এই অভিযানে এসেছিলেন তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন। কয়েকজন মদীনা ফিরে যাওয়ার জন্য মহানবী (সা)-এর অনুমতি চাইলেন। তাঁরা মক্কার কুরাইশদের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে চাইলেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ .

“স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে। অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদের নির্মূল করেন।” (৮ : ৭)

একদিকে তো মুসলমানদের এই অবস্থা ছিল। অপরদিকে কুরাইশরাও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিল। তারা ভাবছিল, আমরা যে কাফেলার নিরাপত্তার জন্য এসেছি, তারা মুসলমানদের সাথে কোনরূপ সংঘর্ষ ছাড়াই নিরাপদে পার হয়ে গেছে। এখন যে পথে এসেছি সে পথেই আমাদের চলে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাতে মুসলমানরাও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মদীনা ফিরে যেতে বাধ্য হবে। ইতিমধ্যে আবু সুফিয়ান ও খবর পাঠান, “আপনারা যে বাণিজ্য কাফেলাকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষার জন্য মক্কা থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তারা নিরাপদে চলে এসেছে। আপনারা মুসলমানদের সাথে কোনরূপ সংঘর্ষে জড়াবেন না। ফিরে চলে আসুন।” আবু সুফিয়ানের এই অভিমতের সাথে কুরাইশদের অধিকাংশ ঐকমত্য পোষণ করে। কিন্তু আবু জেহেল এই খবর শুনে বেঁকে বসে। সে দৃষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করে, “আল্লাহর শপথ! বদর পর্যন্ত না পৌঁছে আমরা ফিরে যাব না। সেখানে আমরা তিন দিন অবস্থান করব। এ সময়ে আমরা খুব নাচগান ও আমোদ-স্বৃতি করব। মন খুলে মুক্ত আকাশের নিচে বসে মদ্যপান করব। আরবের বিভিন্ন গোত্রে আমাদের এই আনন্দ-উল্লাসের আলোচনা হবে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই কাহিনী আরবদের মুখে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে।”

বদর ছিল আরবের প্রসিদ্ধ একটি মেলার স্থান। এ ছাড়া আরো কয়েকটি দিক থেকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। আবু জেহেলের ধারণা ছিল, ‘আমরা যদি এখান থেকে এমনি চলে যাই, তাহলে মানুষ বলবে মক্কাবাসীরা (হযরত) মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীদের ভয়ে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তাতে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর মর্যাদা দেশে আরো বেড়ে যাবে। তাঁর ইসলামের প্রতি আহ্বান আরো সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধি লাভ করবে। ইসলামের এই আহ্বানের সমৃদ্ধির ভিত্তি রচিত হয়েছিল হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহশের টহলদার বাহিনীর হাতে আমরা ইবনে হাযরামীর হত্যা, দু’জন কুরাইশের বন্দী এবং তাদের মাল-সামানা বাজেয়াপ্ত করার সময় থেকে। কিন্তু আবু জেহেলের সঙ্গী-সাথীরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিল, তারা কি আবু জেহেলের পরামর্শ গ্রহণ করবে, না মক্কা ফিরে যাবে। আবু জেহেলের প্রস্তাব গ্রহণ করলে ভীকৃতার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। মক্কা ফিরে যাওয়াতে কোন ক্ষতি ছিল

না। কারণ যে বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তার জন্য তারা এসেছিল, সে কাফেলা নিরাপদেই মক্কা পৌঁছে গেছে। বস্তুত মক্কাবাসীদের মধ্যে ববু যোহরা তাদের নেতা আখনাস ইবনে শোরাইকের পরামর্শ অনুযায়ী মক্কায় ফিরে যায়। অন্যান্য গোত্র আবু জেহেলের প্রস্তাব গ্রহণ করে মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাদের শিবিরের অদূরে একটি বালুকাময় পাহাড়ের পাদদেশে মোরচা তৈরি করে।

বদরে মুসলমানদের আগমন

মুসলমানরা দেখল বাণিজ্য কাফেলাটি চলে গেছে। তারা কুরাইশদের সাথে সংঘর্ষের ব্যাপারে পরামর্শ করতে লাগল। তারা কুরাইশদের সাথে একটা বোঝাপড়া ছাড়া মদীনা ফিরে যেতে অনিচ্ছুক ছিল। এই উদ্দেশ্যে তারা বদর উপত্যকায় পৌঁছল। গতরাতের বৃষ্টিতে এখানে একটি পরিখায় পানি জমেছিল। মুসলমানরা এই পরিখার নিকট এসে থেমে যায়। মুসলমানদের মধ্যে হুবাব ইবনে মুনযির বদর উপত্যকার ভৌগোলিক খুঁটিনাটি সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রাখতেন। তিনি দেখলেন, মহানবী (সা) এই জলাশয়ের তীরেই মোরচা স্থাপন করার ইচ্ছা করেছেন। তিনি মহানবী (সা)-কে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে এই স্থান নির্বাচন করে থাকেন তাহলে আমরা এখান থেকে অন্যত্র সরে গিয়ে মোরচা স্থাপন করতে চাই। আর যদি আপনি নিজের অভিমত অনুযায়ী এই স্থানের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে নির্বাচন করে থাকেন, তাহলে আলাদা ব্যাপার।’ মহানবী (সা) বললেন, “আল্লাহর নির্দেশে নয়, আমি নিজ বিবেচনায়ই এই স্থানে মোরচা স্থাপনের ইচ্ছা করেছি।” হযরত হুবাব বললেন, “মোরচা স্থাপনের জন্য এ স্থান উপযোগী নয়। আপনি শত্রুপক্ষের নিকটতর পরিখাটির পাশে মুসলমানদের মোরচা স্থাপনের নির্দেশ দেন। প্রথমে এই পানি দ্বারা খালি কূপটি ভরে নিতে হবে। অতঃপর কূপের কিনারে একটি হাউজ তৈরি করতে হবে। তাতে আমরা প্রয়োজনের সময় পানি পাব। আর কাফেররা বঞ্চিত হবে। এ ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার পর আমরা বিনা দ্বিধায় যুদ্ধ শুরু করতে পারি।” মহানবী (সা) হযরত হুবাবের এই পরামর্শ অত্যন্ত পছন্দ করেন। বস্তুত মহানবী (সা) নিজেকেও অন্যদের মতো মানুষ মনে করতেন। আর তাই তিনি অন্যদের প্রস্তাব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাও করতেন। সে মুহূর্তে মহানবী (সা) পরিষ্কার ঘোষণা করলেন, “আমিও তোমাদের মতো মানুষ। আমাদের সব কাজ পারস্পরিক পরামর্শ ছাড়া সম্পন্ন হতে পারে না। পরামর্শ ছাড়া আমিও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না।”

ছাউনি নির্মাণ

মুসলমানরা জলাধারের নিকটে পৌঁছে একটি হাউজ তৈরি করে নেয়। হাউজ নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত সা‘আদ ইবনে মুআয (রা) বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার জন্য একটি ছাউনি তৈরি করে দিচ্ছি। আপনি তাতে বসে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। ছাউনির পাশেই একটি সওয়ারী বা বাহন প্রস্তুত রাখা হবে। যুদ্ধে আমরা শত্রুর উপর জয়ী হলে সেটা হবে আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ। আর ব্যতিক্রম হলে আপনি উক্ত বাহনে আরোহণ করে মদীনা চলে যাবেন। সেখানে আপনি এবং আমরা যাদের রেখে এসেছি তাঁদের অন্তরে আপনার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আমাদের মতোই রয়েছে। যখনই যুদ্ধের সুযোগ আসবে, তারা

আপনাকে একলা ছেড়ে যাবে না। আপনার পৃষ্ঠপোষকতায় শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের তরবারির মাধ্যমে আপনাকে বিজয়ী করবেন।” মহানবী (সা) হযরত সা'আদের মুখে এ কথা শুনে তাঁর জন্য দোয়া করেন এবং তাঁর অত্যন্ত প্রশংসা করেন। মহানবী (সা)-এর জন্য ছাউনী তৈরি করা হয়। তিনি তাতে অবস্থান গ্রহণ করে যুদ্ধ পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রুরা বিজয়ী হলেও মহানবী (সা) কুরাইশদের হাতে বন্দী হবেন না। তিনি মদীনায় অন্যান্য সাহাবীদের নিকট চলে যেতে সক্ষম হবেন।

মুসলমানদের ঈমানী শক্তি

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে মুসলমানরা মহানবী (সা)-এর প্রতি যে আন্তরিকতা ও ভালবাসা প্রকাশ করেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। মহানবী (সা)-এর নবুয়তের প্রতি তাদের ছিল অগাধ আস্থা। মুসলমানরা এ কথা ভাল করেই জানতেন যে, কুরাইশদের সংখ্যা তাদের চেয়ে তিনগুণ বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তাঁরা এও জানতেন যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা চলে গেছে। এখন আর তাঁরা সে পণ্যের আশা করতে পারেন না। এর পরও তাঁরা জীবনের বাজি রাখতে প্রস্তুত ছিলেন। যুদ্ধে তাঁরা জয়ী হবেন, না পরাজয় বরণ করবেন এ সম্পর্কেও তাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা মহানবী (সা)-কে শত্রুমুক্ত রাখার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধ-প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। পরাজয়ের অবস্থায় মহানবী (সা) যাতে নিরাপদে মদীনায় পৌঁছতে পারেন, পূর্বাঙ্কে তাঁরা তারও ব্যবস্থা করেন। এর চাইতে বেশি ঈমানী শক্তির অভিব্যক্তি আর কি হতে পারে?

কুরাইশরাও যুদ্ধ ময়দানে এসে উপস্থিত হয়। মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য তারা তাদের এক ব্যক্তিকে গোপনে পাঠিয়ে দেয়। লোকটি ফিরে গিয়ে বলে, “মুসলমানরা সংখ্যায় তিনশ’ কিংবা তার কিছু বেশি বা কম হতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে তলোয়ার ছাড়া তাদের আশ্রয় নেবার মতো কোন বিশেষ অবস্থানও নেই। কিন্তু তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়, প্রতিপক্ষকে শেষ করা ছাড়া তারা নিজের জীবন বিসর্জন দেবে না।”

এ কথা শুনে দূরদর্শী কুরাইশদের পায়ের তলার মাটি সরে যায়। মক্কার প্রায় সব শীর্ষস্থানীয় নেতা এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তাদের আশংকা ছিল এসব নেতার অনেকেই মুসলমানদের হাতে নিহত হবে। কিন্তু অপরদিকে আবু জেহেলের বদ মেজাজকেও তারা ভয় করত। তা সত্ত্বেও উতবা ইবনে রবীআ বলেই ফেলল, “হে কুরাইশ বন্ধুগণ! (হযরত) মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে সংঘর্ষ থেকে বিরত থাক। তোমরা যদি জয়লাভ কর, তাহলে আপন চাচাত ভাই কিংবা খালাত ভাই অথবা অন্য আত্মীয়-স্বজনদের নিজেদের হাতে হত্যা করবে। এ ধ্বংসাত্মক ইচ্ছা ত্যাগ কর। (হযরত) মুহাম্মদ ও আরবদের তাদের নিজ নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও। যদি আরবরা মুসলমানদের উপর জয়লাভ করে, তাহলে এমনিতেই তোমাদের মনের ইচ্ছা পূরণ হবে। আর যদি (হযরত) মুহাম্মদ (সা) আরবদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন, তাহলে তার দ্বারা কখনো আমাদের ক্ষতি হবে না।” উতবার উক্তি শুনে আবু জেহেল তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে। সে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের হাতে নখলায় নিহত আমর ইবনে হায়রামীর ভাই আমের ইবনে হায়রামীকে বলে পাঠায়, “তোমার বন্ধুর ভূমিকা দেখ। সে তোমার ভাইয়ের রক্ত মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে। উতবা চায় মুসলমানদের

উপর তোমার ভাইয়ের প্রতিশোধ নেয়া ছাড়াই ফিরে যাওয়া হোক। হে আমের, তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে, তোমার ভাইয়ের উপর কিরূপ অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছে। সৈন্যবাহিনীর সামনে গিয়ে তোমার নিহত ভাইয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত।” আমের ইবনে হাযরামী সৈন্যদের সামনে গিয়ে জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে থাকে, “হে আমার ভাই আমর, হে আমার ভাই আমর!” আমেরের এই চিৎকার শুনে কুরাইশদের রক্ত টগবগিয়ে উঠে। তাতে যুদ্ধ অবধারিত হয়ে উঠে। কুরাইশদের মক্কায ফিরে যাওয়ার কোন পথ থাকে না।

যুদ্ধের সূচনা

কুরাইশদের মধ্য থেকে আসওয়াদ ইবনে আবদুল আসাদ মাখযুমী বেরিয়ে পড়ে। সে মুসলমানদের দিকে এগিয়ে যায় এবং তাঁদের তৈরি কূপটি নষ্ট করে দেয়ার জন্য উদ্যত হয়। মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালিব (রা) বিদ্যুৎ বেগে দৌড়িয়ে আসেন। তিনি আসওয়াদের পায়ে আঘাত হানেন। তার পা দুটো কেটে যায়। সে মুখ খুবড়ে মাটিতে পড়ে যায়। হযরত হামযা (রা) আরেকটি আঘাতে তার দফারফা করে দেন। রণাঙ্গনে আহতদের রক্তের চাইতে কোন বস্তু মানুষের মনে অধিক ভীতি সৃষ্টি করতে পারে না। আপন জনের মৃত্যুর দৃশ্য যুদ্ধের ময়দানে মানুষকে সবচাইতে বেশি উত্তেজিত করে তোলে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রমটি হলো না। আসওয়াদ মাখযুমী নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উতবা ইবনে রবীআ তার আপন ভাই এবং ছেলে শায়বা ও ওয়ালীদকে সঙ্গে নিয়ে কুরাইশদের সারি থেকে বেরিয়ে আসল। তারা মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বীদের এগিয়ে আসার আহবান জানালো। মদীনার কয়েকজন যুবক তাদের দিকে এগিয়ে এলো। কিন্তু উতবা তাদের চিনে ফেলল এবং বলল, “তোমাদের আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা স্বগোষ্ঠীয় লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই।” এক কুরাইশ যুবক উতবার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে চিৎকার করে বলল, “হে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)! আমাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আমাদের গোত্রের লোকদেরই আসতে দিন।” এরপর হযরত হামযা, হযরত আলী ইবনে আবী তালিব এবং উবায়দা ইবনে হারিস কুরাইশ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে লড়াই করার জন্য এগিয়ে গেলেন। হযরত হামযা ও হযরত আলী (রা) মুহূর্তে প্রতিপক্ষের শায়বা ও ওয়ালীদকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিলেন। কিন্তু উতবার সাথে হযরত উবায়দা ইবনে হারিস সুবিধা করে উঠতে পারছিলেন না। এ অবস্থা দেখে হযরত আলী ও হযরত হামযা (রা) উতবার উপর লাফিয়ে পড়েন। কুরাইশরা এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছিল না। তারা একজোটে আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসে। তাদের এগিয়ে আসতে দেখে মুসলমানরাও এগিয়ে যেতে শুরু করে। এ দিনটি ছিল হিজরী দ্বিতীয় সালের ১৭ রমযান, শুক্রবার।

আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা

মহানবী (সা) নিজেই মুসলমানদের কাতারবন্দী করেন। প্রতিপক্ষের দিকে তিনি তাকিয়ে দেখলেন, মুসলমানদের তুলনায় তাদের সংখ্যা অনেক বেশি। শত্রুপক্ষের এই দৃশ্য দেখে তিনি ছাউনির দিকে ফিরে এলেন। এ সময় হযরত আবু বকর (রা)-ও তাঁকে অনুসরণ করেন। মহানবী (সা) এই অসম যুদ্ধের পরিণাম ভেবে অত্যন্ত চিন্তাশ্রিত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবেন এই যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করতে না পারলে ইসলামের কি অবস্থা হবে! এই চিন্তায় এক পর্যায়ে

তিনি কেবলমুখী হয়ে পড়েন। অত্যন্ত একাগ্রতা ও বিনীতভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দুই হাত তুলে দোয়া করেন। আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মুসলমানদের বিজয়ী করার ওয়াদা পূরণের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে বলেন :

اللهم هذا قريش قد انت بخيلائها تحاول ان تكذب رسولك - اللهم فنصرك الذي وعدتني - اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد -

“হে আল্লাহ্! কুরাইশরা তাদের বাহিনী নিয়ে এসেছে। তারা তোমার রাসূলকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। হে আল্লাহ্! তোমার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূরণ কর। যদি এই সামান্য ক'জন মুসলমান ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কেউ তোমার ইবাদত করবে না।”

মহানবী (সা) বারবার এই দোয়া করছিলেন। দুই হাত আল্লাহ্র দরবারে উঠিয়ে তিনি দোয়ায় এত তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর পবিত্র কাঁধ থেকে চাদর মোবারক পড়ে যায়। হযরত আবু বকর মহানবী (সা)-এর পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি চাদর মোবারক উঠিয়ে মহানবীর কাঁধে রাখেন এবং বলেন, “হে আল্লাহ্র নবী! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার দোয়া কবুল করেছেন। তিনি তাঁর ওয়াদা অবশ্যই পূরণ করবেন। কিন্তু মহানবী (সা) মোনাজাতেই মশগুল ছিলেন। তিনি আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করতে থাকেন এবং মুসলমানদের সাহায্যের জন্য অনবরত দোয়া করতে থাকেন। এ অবস্থায় তাঁর মধ্যে কিছুটা ঘুমের ভাব হয়। এ সময় তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যের শুভ সংবাদ লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘুমের ভাব কেটে যায়। তাঁর পবিত্র চোখে-মুখে আনন্দের আভা ফুটে উঠে। তিনি ছাউনি থেকে বেরিয়ে যান। কাতারবন্দী মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশে বলেন :

والذي نفس محمد بيده لا تقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً
محتسباً مقبلاً غير مديراً الا ادخله الله الجنة -

“যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন, সে পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছি, আজ যে ব্যক্তি ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাফেরদের সাথে লড়াই করে শহীদ হবে এবং পিছপা হবে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশত দান করবেন।”

মহানবী (সা)-এর এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তাঁদের মনোবল অত্যন্ত বেড়ে যায়। তাঁরা শত্রুবাহিনীর সংখ্যাধিক্যকে তুচ্ছ মনে করতে থাকেন। শত্রুর সাথে মোকাবিলার সময় একজন মুসলমান দু'জন কাফেরের বিরুদ্ধে, এমনকি দশজনের বিপক্ষেও নিজেদের দুর্জয় শক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন করেন। তাঁরা যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। বস্তুত ঈমানী শক্তি মানুষের মন ও মস্তিষ্কে আমাদের কল্পনার চাইতেও অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সে দিন বদর রণাঙ্গনে মুসলিম মুজাহিদের বেলায়ও এই সত্য অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তাছাড়া দেশপ্রেমের প্রেরণাও মানব মনে কম প্রভাব বিস্তার করে না। বদরের রণাঙ্গনে মুসলমানদের মনে এই প্রেরণাও কার্যকর ছিল। তাঁদের মধ্যে জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার উদগ্র বাসনা ছিল। এই আকাঙ্ক্ষাও যুদ্ধক্ষেত্রে

মুসলমানদের মনে অসাধারণ শক্তি যোগায়। এজন্যই দেখা যায়, বিভিন্ন জাতি অত্যন্ত যত্নসহকারে তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ছোটবেলা থেকেই নানা পদ্ধতিতে দেশপ্রেমের শিক্ষা দিয়ে থাকে। আর এই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছোটরা বড় হয়ে প্রয়োজনের সময় মাতৃভূমির জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করে না। দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা নানা বিপদ-আপদ মাথা পেতে নেয়। মূলত আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতা অর্জন দেশপ্রেমের চাইতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট ব্যাপার। আর এসব ক'টি বিষয়ের যখন মানুষের মধ্যে এক সাথে সমাবেশ ঘটে, তখন দুর্বল ও অসহায় লোকেরাও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে দুর্জয় শক্তিতে পরিণত হয়।

শুধু জড়বাদী সম্পর্কের নিরাপত্তা বিধানের দিকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তি মানবতা, স্বাধীনতা ও শোষিতের সমর্থনের শ্লোগান দ্বারা তার সৈন্যবাহিনীকে জার্মানীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল। তাতে মিত্র বাহিনীর শক্তি ও মনোবল কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। অথচ এই যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল শুধু বস্তুগত স্বার্থ উদ্ধার। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের তুলনায় মহানবী (সা) ও কুরাইশদের বিতর্কিত বিষয় শুধু মানুষের বৈষয়িক কল্যাণের মধ্যেই সীমিত ছিল না। মহানবী (সা) শুধু স্বদেশ ও স্বজাতির ভ্রাতৃত্ববোধেরই দাবিদার ছিলেন না, তাঁর মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল গোটা মানবজাতির মধ্যে সামগ্রিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করা। আর এই লক্ষ্য অর্জিত হলে সকল কল্যাণ ও প্রাচুর্য মানুষের পদতলে লুটিয়ে পড়ে।

কুরাইশদের সাথে এই যুদ্ধের পিছনে মহানবী (সা)-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রচার-প্রসার অব্যাহত করা। এ দিক থেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে মহানবী (সা)-এর জিহাদের সাথে বর্তমান যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহের কোন তুলনাই হয় না। মূলত ভ্রাতৃত্ববোধের সাথে স্নেহ-ভালবাসা যুক্ত হয়ে মানুষকে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত করে তার আত্মিক শক্তিকে বৃদ্ধি করে। সে তখন প্রতিটি মানুষের সাথে প্রেম-প্রীতিময় সম্পর্ক গড়ে তোলা নিজের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য বলে মনে করে। তার মধ্যে এক উঁচু ভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সঙ্গে যদি মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাসও সংযোজিত হয়, তা'হলে এই বৈশিষ্ট্য মানুষের ঈমানবিহীন আত্মিক শক্তির চেয়ে হাজার গুণ বেশি শক্তি ও মহত্ত্বের অধিকারী হয়।

স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রীতি মহৎ গুণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সঙ্গে যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যও সংযোজিত হয়, তাহলে সেটা হয় মহত্তম। বিশেষ করে এই সন্তুষ্টি বিধানের উপলক্ষ যদি হয় একদল মুমিনকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা, যাদের উপর শুধু ধর্মবিশ্বাসের জন্য অকথ্য নির্যাতন চালান হয়, হিজরত করতে দেয়া হয় না, এমনকি পৌত্তলিকতায় ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়, তাহলে এই মহত্তম বৈশিষ্ট্যের সাথে নিছক স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রীতির কোন তুলনাই হয় না। মানুষের মহৎ গুণের এই দুটি দিকের বৈশিষ্ট্যের আকাশ-পাতাল ফারাক সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুত ঈমানের প্রেরণা ছাড়া স্বদেশপ্রেম একটা বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত কল্যাণকর হতে পারে। ঈমান ছাড়া মানবপ্রীতিরও একই অবস্থা। একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত গিয়ে তা থেমে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সন্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর মানুষের মধ্যে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্টি হয়। এ শক্তির মাধ্যমে মানুষ পাহাড়কেও হেলিয়ে নিতে পারে। তাঁর ইঙ্গিতে সারা বিশ্ব গতিময় হয়ে উঠতে পারে। যারা অপেক্ষাকৃত

কম ঈমানী শক্তির অধিকারী, তারা মনে করে তাতেই তাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাতে করে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে পৃথিবীর বস্তুসম্ভার তাদের হস্তগত হয়। বদর যুদ্ধের আগে কিছুটা পারস্পরিক মতপার্থক্যের দরুন মুসলমানদের নৈতিক শক্তি তখনো পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। এজন্য তাঁদের শারীরিক শক্তিতেও আশানুরূপ পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু বদর রণাঙ্গনে মহানবী (সা)-এর প্রেরণা লাভের মাধ্যমে তাঁদের আত্মিক শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আত্মিক শক্তির মাধ্যমে রণাঙ্গনে তাঁদের সংখ্যা ও যুদ্ধোপকরণের স্বল্পতার ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ - إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ . أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ عَنَّا وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا -
فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا
أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ - وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ .

“হে নবী, মু’মিনদের সংগ্রামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করো, তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশ’ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ’ জন থাকলে এক হাজার কাফেরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই। আল্লাহ্ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশ’ জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশ’ জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে আল্লাহ্‌র অনুজ্ঞাক্রমে তারা দুই হাজারের উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।” (৮ : ৬৫-৬৬)

মহানবী (সা) সারিবদ্ধ মুসলমানদের সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের সাহস দেন। তাদের যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। তাতে তাঁদের মনোবল ও শক্তি সীমাহীন বেড়ে যায়। এ সময় মহানবী (সা) মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেন, “আজ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অটল-অনড় হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করবে, সে এর পুরস্কার হিসাবে বেহেশত লাভ করবে।” মুসলমানরা কুরাইশদের এক একজন সরদারকে বিশেষভাবে মোকাবেলার জন্য লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেন। কারণ এরাই মুসলমানদের কাবাঘরে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে দেয়নি। আজ আল্লাহ্ তা’আলা মুসলমানদের সুযোগ দান করেছেন। তাঁরা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তাঁরা এসব দলপতিকে তাদের কৃতকর্মের জন্য চরম শাস্তি প্রদান করবেন।

উমাইয়া ইবনে খালফের পরিণতি

কুরাইশ সরদারদের মধ্যে উমাইয়া ইবনে খালফ প্রাক্-ইসলামী যুগে কিছু সংখ্যক মুসলমানদের মিত্র ছিল। এ জন্য এসব মুসলমান বদর রণাঙ্গনে উমাইয়া ইবনে খালফকে রক্ষা

করার জন্য এগিয়ে যান। তাঁরা তাকে ঘেরাও করে রাখে। কিন্তু এই উমাইয়াই হিজরতের আগে মক্কায় হযরত বিলাল (রা)-কে দুপুরের রোদে উত্তপ্ত আগুনে বালুর উপর শুইয়ে রাখত। হযরত বিলালকে ইসলাম থেকে চ্যুত করার জন্য পাপিষ্ঠ উমাইয়া তাঁর বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখত। এরূপ দুর্বিষহ নির্যাতনের ভিতরেও হযরত বিলাল (রা)-এর পবিত্র মুখ থেকে ‘আহাদ আহাদ’ বা ‘এক এক’ ছাড়া অন্য কোন শব্দ বেরুতো না। হযরত বিলাল (রা) উমাইয়ার সাথে কিছু সংখ্যক মুসলমানের এই ব্যবহার দেখে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠেন, “উমাইয়া কাফেরদের সরদার। আজ সে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারলে কাল পুনরায় আমাকে বিপদে ফাঁসিয়ে দেবে।” উমাইয়ার হিতাকাঙ্ক্ষী মুসলমানদের ইচ্ছা ছিল তাকে হত্যা না করে বন্দী করা হোক। কিন্তু হযরত বিলাল (রা) পুনরায় সজোরে বলে উঠলেন, “আজ যদি উমাইয়াকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে কাল সে আমাকে পুনরায় বিপদে ফেলবে।” মোটকথা, উমাইয়াকে হত্যা না করা পর্যন্ত হযরত বিলাল (রা) স্বস্তি বোধ করছিলেন না।

এদিকে হযরত মুআয ইবনে আমর (রা) আবু জেহেলের দফারফা করেন। হযরত হামযা, হযরত আলী (রা) ও অন্যান্য মুসলমানরা অভাবনীয় বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে চলছিলেন। নিজেদের সংখ্যালঘুতার প্রতি তাঁরা কোন প্রকার খেয়ালই করছিলেন না। এ সময় ধূলিঝড় শুরু হয়। তাতে ধূলায় সারা আকাশ অন্ধকারময় হয়ে যায়। কুরাইশ নেতাদের এক এক করে দফারফা করা হচ্ছিল। তাদের মৃত্যুতে মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাঁরা আনন্দে উচ্চকণ্ঠে শ্লোগান দিচ্ছিল, ‘আহাদ’ ‘আহাদ’। তাঁদের সামনে থেকে স্থান-কালের আবরণ অপসারিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের ঈমানের শক্তিকে আরো বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। ফেরেশতারা মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ দান করেন। তাতে করে তাঁদের ঈমানী শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। কোন মুসলমান তার শত্রুকে হত্যা করার জন্য তরবারি উঠালে আল্লাহ তা‘আলা তার বাহুতে আরো শক্তি বৃদ্ধি করে দিতেন। এতে পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল যে, মুসলমানরা নিজের শক্তিতে নয়, আল্লাহর শক্তিতে যুদ্ধ করে চলেছেন।

মহানবী (সা) মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে ছিলেন। তিনি রণাঙ্গনে ঘুরে-ফিরে যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যস্ত ছিলেন। আর আজরাঈল কাফেরদের রুহ কবয করায় ব্যস্ত ছিলেন। এ সময় মহানবী (সা) এক মুষ্টি কংকর উঠিয়ে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, “তোমাদের মুখ বিকৃত হয়ে যাক।” এ সঙ্গে তিনি সাহাবাদের পুরো শক্তি দিয়ে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। মুসলমানরা তাদের সংখ্যালঘুতার বিষয়টি উপেক্ষা করে মহানবী (সা)-এর নির্দেশ পালন করেন। মুসলমানদের অন্তর ঐশী শক্তিতে বলীয়ান ছিল। আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য না পেলে তাঁরা কোন কাফেরকে হত্যা করতে পারতেন না এবং বন্দীও করতে পারতেন না। এ সাহায্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - سَالِقِيْ
فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ
بَنَانٍ فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ - وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلٰكِنَّ
اللّٰهَ رَمٰى

★ “স্বরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, ‘আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং তোমরা মু’মিনদের অবিচলিত রাখ। যারা কাফের আমি তাদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করব। সুতরাং তাদের কাঁধে এবং সর্বাঙ্গে আঘাত করো।’তোমরা তাদের বধ করনি, আল্লাহ্‌ই তাঁদের বধ করেছেন এবং তুমি যখন নিশ্কেপ করেছিলে, তখন তুমি নিশ্কেপ করনি; আল্লাহ্‌ই নিশ্কেপ করেছিলেন।” (চ : ১২-১৭)

★ মহানবী (সা) অনুভব করলেন, আল্লাহ্‌ তা’আলা মুসলমানদের বিজয় লাভের যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। মুসলমানদের দিকে তিনি তাকিয়ে দেখলেন, তাঁরা রণাঙ্গনে কাফেরদের ধরাশায়ী করে চলেছেন। এ সময় মহানবী (সা) ছাউনিতে ফিরে আসেন। কুরাইশরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করা শুরু করেন। কাফেররা পালিয়ে জীবন রক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু যারা মুসলমানদের নাগালের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, তারা শত চেষ্টা করেও পালাতে পারেনি। মুসলমানরা তাদের বন্দী করে ফেলে।

বদর যুদ্ধে বিজয় লাভের পর মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সারা আরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে আরবের কেন্দ্রীয় পতাকা ইসলামের দখলে আসার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এক নতুন রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে, যাকে ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু বলা যায়। বস্তুত এ সভ্যতার নিদর্শন আজো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। আর এ সভ্যতা ভবিষ্যতেও কখনো পৃথিবী থেকে বিলীন হতে পারে না।

বদর রণাঙ্গনে মহানবী (সা) মুসলিম মুজাহিদদের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রেরণা যোগাচ্ছিলেন এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ যুদ্ধে শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা) যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সাহাবীদের বলে দিয়েছিলেন তোমরা কিছু সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় কুরাইশ নেতা এবং বনু হাশিমদের হত্যা করবে না। অথচ এসব কুরাইশ নেতা ও বনু হাশিম মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছিল। তারা সুযোগ পেলে যে কোন মুসলমানকে হত্যা করত। মহানবী (সা)-এর এই নির্দেশের ভিত্তি স্বজনপ্রীতি ছিল না। এ পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি কিছু সংখ্যক কুরাইশ নেতা ও বনু হাশিমদের অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে চেয়েছিলেন। বনু হাশিমরা হিজরতের আগে দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। এমনকি মক্কায় আউস ও খায়রাজদের আকাবার দ্বিতীয় বায়’আতের সময় গভীর রাত পর্যন্ত মহানবী (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা) মহানবী (সা)-এর সাথে ছায়ার মতো ছিলেন। মক্কাবাসীরা মুসলমান ও গোটা বনু হাশিম গোত্রের সাথে সামাজিক বয়কটের চুক্তি স্বাক্ষর করে। মহানবী (সা) ও তাঁর গোত্র এই ঘটনার পর শেয়াবে আবু তালেবে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। মক্কার কিছু সংখ্যক নেতা মতাদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কুরাইশদের নিকট উক্ত চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলার দাবি করেন। বনু হাশিম ও কিছু সংখ্যক কুরাইশ নেতার এই ত্যাগ স্বীকারে ও অনুগ্রহের প্রেক্ষিতে বদর রণাঙ্গনে মহানবী (সা) তাদের প্রতিদান দেয়ার মনস্থ করেন। বস্তুত মহানবী (সা)-এর এই প্রতিদান ছিল ত্যাগ ও অনুগ্রহের চাইতে কয়েক গুণ বেশি। কিন্তু কোন কোন হতভাগা মহানবী (সা)-এর এই প্রতিদানের সুযোগ গ্রহণ করেনি। তারা দাঙ্কিতার সাথে তা এড়িয়ে চলেছে এবং রণাঙ্গনে মৃত্যুবরণ করেছে। এসব হতভাগার অন্যতম ছিল আবুল বাখতারী। সে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যুকে

* অগ্রাধিকার দান করে। অথচ এ লোকটি কুরাইশদের সামাজিক বয়কটের চুক্তিপত্র বাতিল করার ব্যাপারে মুসলমানদের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

বদর রণাঙ্গনে কুরাইশরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে মক্কায় পালিয়ে যায়। মক্কায় পৌঁছে তারা একে অপরের দিকে চোখ তুলে তাকাতে লজ্জাবোধ করত। কোন লোক স্বেচ্ছায় অন্যের দিকে তাকাবার সাহস করত না। তারা মাথা নিচু করে ঘর থেকে বের হতো। এদিকে মুসলমানরা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত বদর রণাঙ্গনে অবস্থান করেন। তারা একটি গর্ত খোদাই করে কাফেরদের সব লাশ তাতে পুঁতে রাখেন। কাফেরদের পরিত্যক্ত মাল-সামান একত্রিত করেন। যুদ্ধবন্দীদের দেখাশোনায়ে সারারাত ব্যস্ত থাকেন। মহানবী (সা) সারারাত এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন যে, মুষ্টিমেয় মুসলমান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে বিপুল সংখ্যক মুশরিক বাহিনীর উপর কিভাবে বিজয় লাভ করল। কাফেররা সকল ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও উপকরণ থাকা সত্ত্বেও পরাজয় বরণ করে পালিয়ে গেল। অবশেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে একমাত্র ঈমানের শক্তিই বিজয় লাভে সাহায্য করতে পারে। আর মুশরিক এ নিয়ামত থেকে মাহরুম ছিল। এটাই ছিল তাদের পরাজয়ের একমাত্র কারণ। এ রাতে মুসলমানদের কানে মহানবী (সা)-এর কণ্ঠধ্বনি ভেসে আসে। তাঁরা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে পান, মহানবী (সা) বলছেন, “হে কূপে প্রোথিতরা! হে উতবা! হে শায়বা! হে উমাইয়া! হে আবু জেহেল!” এভাবে তিনি বারবার তাদের নাম ধরে ডাকছিলেন এবং তাদের উদ্দেশে বলছিলেন, হে কূপে প্রোথিতরা! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উদ্দেশ্যে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তোমরা কি তা বাস্তবে দেখতে পেয়েছ? আমাকে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমি তা বাস্তবে দেখতে পেয়েছি।” সাহাবীরা এগিয়ে গিয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো মৃতদের উদ্দেশে কথা বলছেন!” মহানবী (সা) বললেন, “তোমাদের শ্রবণশক্তি তাদের চাইতে বেশি নয়। কিন্তু তারা উত্তর দানে অক্ষম।”

মহানবী (সা) উতবা ইবনে রবীআর পুত্র আবু হোযায়ফাকে চিন্তিত দেখতে পেলেন। নিহত কুরাইশদের মধ্যে উতবা ইবনে রবীআ ছিল আবু হোযায়ফার পিতা। মহানবী (সা) আবু হোযায়ফাকে বললেন, “বোধ হয় তুমি তোমার পিতার পরিণাম দেখে চিন্তাষিত হয়ে পড়ছ!” হযরত আবু হোযায়ফা (রা) বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! পিতার মৃত্যুতে আমার এতটুকু দুঃখ নেই। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে তিনি একজন অত্যন্ত দূরদর্শী এবং ধৈর্যশীল লোক ছিলেন। আমার আশা ছিল শেষ পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন। কিন্তু তা আর হলো না।” এ কথা শুনে মহানবী (সা) উতবার প্রশংসা করেন এবং হযরত আবু হোযায়ফার ধৈর্যের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেন।

গনীমতের সুষম বণ্টন

ভোর হতেই মুসলিম বাহিনী মদীনায়ে রওয়ানা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এ সময়ে তাঁদের মধ্যে গনীমতের মালের মালিকানা নিয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। যারা এসব সম্পদ একত্রিত করেছিলেন তাঁরা বললেন, “এসব তাদের।” যারা দূর পর্যন্ত কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন এবং যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তাঁরা বললেন, “আমরা না হলে যুদ্ধে বিজয় লাভ করা সম্ভব হতো না এবং এসব সম্পদও হস্তগত হতো না। সুতরাং এসব শুধু আমাদেরই

হওয়া উচিত।” যারা মহানবী (সা)-এর নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের দাবি ছিল যুদ্ধে লব্ধ সম্পদের উপর আমাদের চাইতে অধিক দাবি কারো নেই। আমরাও শত্রুর উপর আক্রমণ চালাতে পারতাম এবং গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে পারতাম, কিন্তু আমাদের আশংকা ছিল শত্রুরা মহানবী (সা)-এর উপর আক্রমণ চালাতে পারে। এজন্য আমরা তাঁর নিকট থেকে দূরে যাইনি। মহানবী (সা) এসব কথা শুনে বললেন, “সব সম্পদ এক জায়গায় জড়ো কর। আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটির মীমাংসা করব। অথবা আল্লাহ্ যা নির্দেশ দিবেন সে অনুযায়ী মীমাংসা করা হবে।”

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা এবং হযরত যায়েদ ইবনে হারেসাকে নির্দেশ দিলেন, “তোমরা দ্রুত মদীনায পৌঁছে মুসলমানদের যুদ্ধ বিজয়ের শুভ সংবাদ দান কর। তাদের চলে যাওয়ার পর মহানবী (সা) সাহাবীদের নিয়ে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হন। গনীমতের মাল বা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ এবং যুদ্ধবন্দীদেরও সঙ্গে নেয়া হলো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে কা'বকে গনীমতের মালের দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হলো। সাফরা পর্বতের উপত্যকায় পৌঁছে যাত্রা বিরতি করেন। এখানে তিনি গনীমতের মাল বণ্টন শুরু করেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মুসলমানকে তিনি সম অংশ প্রদান করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, বণ্টনের পূর্বে তিনি নিজের এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে নেন। কারণ বণ্টনের আগেই এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ - فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعِ - وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

“আরো জেনে রাখ, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করো তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, পিতৃহীনদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের, যদি তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহে এবং তাতে মীমাংসার দিন যা আমি আমার বান্দার প্রতি নাযিল করেছিলাম, যখন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ্ সব বিষয়ে শক্তিমান।” (৮ : ৪১)

অধিকাংশ চরিতবিদ বিশেষ করে পূর্ববর্তীদের (মোতাকাদেমীন) মতে পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াতটি বদর যুদ্ধ ও গনীমতের মাল বণ্টনের পর নাযিল হয়। নবী করীম (সা) মুসলমানদের মধ্যে গনীমতের মাল সমভাবে বণ্টন করেন। অস্বারোহীকে তিনি দু'টি ভাগ প্রদান করেন। শহীদদের অংশ তাদের উত্তরাধিকারীদের হস্তান্তর করা হয়। যারা মদীনায গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন কিংবা যথাযোগ্য কোন কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, মহানবী (সা) তাদেরও অংশ প্রদান করেন। যাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার পিছনে যথাযোগ্য কোন কারণ ছিল না তাদের গনীমতের মাল দেয়া হয়নি। এমনকি যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি কিন্তু অন্যভাবে মুসলমানদের সাহায্য করেছেন, তাঁদেরও অংশ দেয়া হয়েছে।

দু'জন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা

মুসলিম বাহিনী বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর মদীনায়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় দু'জন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা হয়। তাদের একজন ছিল নযর ইবনে হারিছ এবং অপরজন উকবা ইবনে আবী মুআইত। তখনও মহানবী (সা) যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। তাদের হত্যা করা হবে, না মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হবে কিংবা দাস বানিয়ে রাখা হবে--তখনো কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। নযর ইবনে হারিছ এবং উকবা ইবনে আবী মুআইত মক্কায়ে মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন চালাত। এমন কোন অত্যাচার নেই, যা তারা মুসলমানদের উপর করেনি। মুসলিম বাহিনী উছায়ল নামক স্থানে পৌঁছেলে যুদ্ধবন্দীদের মহানবী (সা)-এর সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) নযর ইবনে হারিছের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। সে কেঁপে উঠে এবং নিকটস্থ যুদ্ধবন্দীদের বলে, “আল্লাহর শপথ! (হযরত) মুহাম্মদ (সা) আমাকে অবশ্যই হত্যা করে ফেলবেন। তিনি যখন আমার দিকে তাকান, তখন তাঁর দৃষ্টি আমার মৃত্যুর পরওয়ানা দিয়ে যাচ্ছিল।” তাঁর সঙ্গী বন্দীটি বলল, “তুমি নিজেই ভীত হয়ে পড়েছ। নতুবা তোমার মনে এমন কথা জাগত না।” নযর ছিল হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রা)-এর আত্মীয়। নযর হযরত মুসআবকে বলল, “হে মুসআব! তোমার বন্ধুর নিকট সুপারিশ করে আমাকে তাঁর সাথী হিসাবে গ্রহণ করিয়ে নাও। নতুবা তিনি আমাকে হত্যা করে ফেলবেন।” হযরত মুসআব বললেন, “পবিত্র কোরআন এবং রাসূল সম্পর্কে এমন কোন অশালীন উক্তি নেই, যা তুমি করনি। তুমি সব সময় তাঁর বন্ধুদের অত্যাচার-নির্যাতন করেছ।” নযর বলল, “হে মুসআব! আমার মতো কুরাইশরা যদি তোমাকে বন্দী করত, তাহলে আমার জীবন থাকতে তাঁরা তোমাকে হত্যা করতে পারত না।” এ কথার উত্তরে হযরত মুসআব বললেন, “তোমার এ কথা ঠিক নয়। আর তুমি আর আমি একও নই। তাছাড়া ইসলাম অঙ্গুতার যুগের সব চুক্তি বাতিল করে দিয়েছে।”

হযরত মিকদাদ নযর ইবনে হারিছকে বন্দী করেন। তাঁর ধারণা ছিল, নযরের আত্মীয়-স্বজনদের নিকট থেকে তিনি মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবি করবেন। হযরত মিকদাদ দেখলেন নযরকে হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই অবস্থা দেখে তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, ‘নযর আমার বন্দী।’ এ কথা শুনে মহানবী (সা) তখনই নযরকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী (রা) এগিয়ে গেলেন এবং তরবারির এক আঘাতে নযরের শির বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। এ সময় মহানবী (সা) হযরত মিকদাদ (রা)-এর আর্থিক সচ্ছলতার জন্য দোয়া করলেন।

মুসলমানরা এখান থেকে রওয়ানা দিয়ে ইরকুয্ যাবইয়া নামক স্থানে পৌঁছেন। সেখানে উকবা ইবনে আবী মুআইতকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করা হয়। উকবা চিৎকার করে বলল, “হে (হযরত) মুহাম্মদ (সা) আমার মৃত্যুর পর আমার কচি মেয়ের দেখাশোনা কে করবে?” মহানবী (সা) বললেন, “তোমার মেয়ের দেখাশোনা জাহান্নামের আগুন করবে।” হযরত আলী কিংবা হযরত আসিম ইবনে ছাবিত (রা) উকবার শিরচ্ছেদ করেন।

মদীনায়ে বিজয় সংবাদ

মহানবী (সা) মদীনায়ে পৌঁছার একদিন আগে হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে বিজয়ের খবর শোনানোর জন্য পাঠিয়ে দেন। তাঁরা একই সময়

এবং একই দিক থেকে মদীনায়ে প্রবেশ করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ একটি উটে সওয়ার হয়ে মহানবী (সা)-এর বিজয় এবং কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয়ের কথা বলে যাচ্ছিলেন। এই সঙ্গে তিনি রণাঙ্গনে নিহত কুরাইশদের নামও বলছিলেন। তার সঙ্গী হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা মহানবী (সা)-এর কাসওয়া নামক উটে সওয়ার ছিলেন। মুসলমানরা বিজয়ের খবর শুনে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন এবং আনন্দধ্বনি দিতে শুরু করেন। কিন্তু মদীনার মুশরিক, ইহুদী এবং মুনাফিকদের মুখ কালো হয়ে যায়। তারা সবাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। যে করেই হোক, মুসলমানরা যাতে বিজয়বার্তা বিশ্বাস না করে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। তারা শহরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের একজন বলে বেড়ায়, “(হযরত) মুহাম্মদ (সা) নিহত হয়েছেন। মুসলমানরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে মদীনায়ে ফিরে আসছে। হযরত মুহাম্মদের কাসওয়া উটটিকে আমরা সবাই চিনি। এটি যায়েদ ইবনে হারিসা নিয়ে এসেছে। তিনি নিহত না হলে এই উট তার নিকটই থাকত। গরীব যায়েদ এই বিরাট পরাজয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আর তাই সে পরাজয়কে বিজয় বলে বেড়াচ্ছে।” কিন্তু বিজয়ের ব্যাপারে মুসলমানদের এতটুকু সন্দেহ ছিল না। তাঁরা ইসলাম বিরোধীদের এসব অপপ্রচারণায় এতটুকু কর্ণপাত করেননি। তাঁরা মদীনার অলিতে-গলিতে আনন্দ-উল্লাস করে চলছিলেন। ইতিমধ্যে শহরে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। মহানবী (সা)-এর কন্যা হযরত রোকাইয়া (রা) হঠাৎ ইন্তেকাল করেন। তিনি মহানবী (সা)-এর যুদ্ধে রওয়ানা দেবার সময় অসুস্থ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর স্বামী হযরত উসমান (রা)-কে মদীনায়ে তার স্ত্রীকে দেখাশোনার জন্য রেখে যান। ধীরে ধীরে মদীনার মুশরিক, মুনাফিক এবং ইহুদীরাও মুসলমানদের বিজয়ের কথা বিশ্বাস করে। কিন্তু এই বিজয়ে তারা অত্যন্ত দুঃখিত হয়। ইহুদীদের সবচাইতে বড় নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ বলে উঠে, “কুরাইশ নেতারা ছিলেন কা'বাঘরের রক্ষক এবং আরবের বাদশাহ। তাদের মৃত্যুর পর আমাদের বেঁচে থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই। আমাদেরও মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়।”

বদরের যুদ্ধবন্দী

বিজয়ী মুসলিম বাহিনী যুদ্ধবন্দীদের একদিন আগে মদীনায়ে এসে পৌঁছেন। দ্বিতীয় দিন যুদ্ধবন্দীদের শহরে পৌঁছানো হয়। এই যুদ্ধে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদার আত্মীয় আফরার কয়েকটি সন্তান শাহাদাত বরণ করেন। হযরত সাওদা তাতে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। এরূপ অবস্থায় তিনি আবু ইয়াযীদ সোহায়েল ইবনে আমর কুরাইশীকে বন্দী অবস্থায় দেখেন। তার দুই হাত ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন দিকে বাঁধা ছিল। এই দৃশ্য দেখে তিনি বলেন, “হে আবু ইয়াযীদ! এরূপ অপমানের হাতে তুমি নিজেকে সমর্পণ করেছ! এভাবে বন্দী হওয়ার চাইতে সসম্মানে রণাঙ্গনে মরে যাওয়াই তোমার জন্য ভালো ছিল।” রাসূলুল্লাহ্ হযরত সাওদার এসব কথা শুনে ফেলেন। তিনি বলেন, “হে সাওদা! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে তুমি মানুষকে উত্তেজিত করছ?” হযরত সাওদা বললেন, “হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি শপথ করে বলছি, আবু ইয়াযীদের মতো বিশিষ্ট লোকের এ অবস্থা দেখে আমি বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ এসব কথা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।”

যুদ্ধবন্দীদেরকে মহানবী (সা) সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে বলেন, “তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। এদিকে তিনি নিজে বন্দী সমস্যার সমাধান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে

লাগলেন। তাদের হত্যা করা হবে, না ছেড়ে দেয়া হবে-- এ বিষয়টি তখনও তিনি স্থির করেননি। তিনি ভাবছিলেন, বন্দীদের মধ্যে অনেক বীর ও যুদ্ধবাজ লোক রয়েছে। মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া হলে তারা এই পরাজয়ের প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত স্বস্তিবোধ করবে না। যে কোন মুহূর্তে তারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর যদি তাদের হত্যা করা হয়, তাদের উত্তরাধিকারীরা বিদ্বেষে ফেটে পড়বে। তারা খুনের বদলা খুন নেয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যাবে।

বন্দীদের সম্পর্কে মতপার্থক্য

অবশেষে মহানবী (সা) যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সাহাবীদের মতামত চান। তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করেন যে, “তোমরা এ ব্যাপারে বিনা দ্বিধায় অভিমত প্রকাশ করতে পার।” মুসলমানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমান দুটি কারণে যুদ্ধবন্দী মুক্তি দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তার প্রধান কারণ হলো এসব বন্দী ছিল তাঁদের আত্মীয়-স্বজন। দ্বিতীয়ত তাদের মুক্তি দেয়া হলে মোটা অংকের মুক্তিপণ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মুসলমানদের এই শ্রেণীটি একে অপরের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করল হযরত আবু বকরকেও আমাদের সমমনা করার চেষ্টা করা দরকার। কারণ তিনি কুরাইশদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও কোমলমনা লোক। তাছাড়া তিনি মহানবী (সা)-এর সবচাইতে ঘনিষ্ঠ সাহাবা। এই শ্রেণীটি তাদের একজন প্রতিনিধি হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট পাঠান। তিনি গিয়ে বললেন, “হে আবু বকর! বন্দীদের মধ্যে প্রত্যেকের সাথে কোন না কোনভাবে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। কেউ আমাদের ভাই, কেউ আমাদের ভতিজা, কেউ আমাদের চাচাত ভাই, আবার কেউ ফুফু কিংবা মামার দিক থেকে আত্মীয়। তাদের যাতে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তার জন্য আপনি অনুগ্রহ করে মহানবী (সা)-এর নিকট সুপারিশ করুন।”

এসব লোক হযরত ওমর (রা)-এর ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তারা তাঁর নিকটও একজন প্রতিনিধি পাঠান। প্রতিনিধির মুখে হযরত ওমর (রা) সব কথা শুনে কোন কথা বললেন না। কিন্তু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তার দিকে তাকান। অতঃপর হযরত ওমর ও হযরত আবু বকর (রা) মহানবী (সা)-এর খেদমতে যান। হযরত আবু বকর প্রথমে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। কুরাইশ বন্দীদের মধ্যে প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে মুসলমানদের আত্মীয়। আপনি যদি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, আল্লাহ তা‘আলাও আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। অথবা তাদের মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হলে আমি আশা করি তারা আপনার এই অনুগ্রহে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে। তাছাড়া মুক্তিপণের অর্থ দ্বারাও মুসলমানদের শক্তি সঞ্চিত হবে। মহানবী (সা) এসব কথা শুনলেন, কিন্তু হ্যাঁ বা না কোন জবাব দিলেন না। হযরত আবু বকর (রা) উঠে চলে গেলেন।

এবার হযরত ওমর (রা) মহানবী (সা)-এর সামনে এগিয়ে গেলেন। যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে তিনি মহানবী (সা)-কে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, এসব যুদ্ধবন্দী আল্লাহর দুশমন। তারা আপনাকে মিথ্যে প্রতিপন্থকারী। আপনাকে তারা মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে এসেছে এবং আপনাকে হযরান করেছে। এসব লোক কুফরীর বুনিয়াদ এবং পথভ্রষ্টতার

পতাকা। তাদের ধ্বংস করা হলে ইসলামের অগ্রগতি সাধিত হবে। মুশরিকরা বরবাদ হবে। তাদের শিরশ্ছেদ করার ব্যাপারে আপনি কোনরূপ দ্বিধা করবেন না। মহানবী (সা) হযরত ওমরের বক্তব্য শোনে এবং কোন জবাব দেননি। ইতিমধ্যে হযরত আবু বকর (রা) পুনরায় মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হন। তিনি আবার যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সুপারিশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েত করবেন। এই সঙ্গে হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকরের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধবন্দীরা সদ্যবহার পাওয়ার যোগ্য নয়। তাঁদের উভয়ের বক্তব্য শোনার পর মহানবী (সা) নিজ কক্ষে চলে যান। সামান্য সময় পরই তিনি ফিরে আসেন। সাহাবারা যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর সিদ্ধান্ত জানার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হযরত আবু বকর (রা)-এর সমর্থক ছিলেন। আর কিছু সংখ্যক ছিলেন হযরত ওমর (রা)-এর সমর্থক। মহানবী (সা) পুনরায় সাহাবাদের অভিমত চান। এবারও তাঁরা দুটি অভিমত ব্যক্ত করেন।

এ সময় মহানবী (সা) হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)-কে নবী ও ফেরেশতাদের সাথে তুলনা করেন। তিনি বলেন, আবু বকর হচ্ছে মীকাঈল ফেরেশতার মতো, যিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে মানুষের জন্য ক্ষমা ও সন্তুষ্টির পয়গাম নিয়ে আসেন। আর নবীদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম ও হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে আবু বকরের অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন নিজের কওমের জন্য মধুর চেয়েও কোমল ও মিষ্টি। কিন্তু মুশরিকরা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করতেও দ্বিধা করেনি। এ সময় হযরত ইবরাহীম (আ) মুশরিকদের সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলেছিলেন :

أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ - أَفَلَا تَعْقِلُونَ .

“ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদেরকে। তবু কি তোমরা বুঝবে না।” (২১ : ৬৭)

এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর কওমের জন্য এই দোয়াও করেছিলেন :

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي - فَإِنَّكَ غَافُورٌ رَحِيمٌ .

“সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে-ই আমার দলভুক্ত। কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৪ : ৩৬)

হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে হযরত আবু বকরের সাযুজ্যতার দৃষ্টান্ত হলো, শত অত্যাচার-নির্যাতন সত্ত্বেও হযরত ঈসা (আ) তাঁর কওমের জন্য দোয়া করতেন :

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ - وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

“তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই দাস, আর যদি তাদের ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (৫ : ১১৮)

তিনি ফেরেশতাদের মধ্যে হযরত জিবরাঈলের সাথে হযরত ওমর (রা)-এর সাযুজ্যতা নির্দেশ করেন। আর নবী-রাসূলদের মধ্যে হযরত মূসা ও হযরত নূহ (আ)-এর সাথে তাঁর সাদৃশ্য বর্ণনা করেন। হযরত নূহ (আ) তাঁর কওমের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে দোয়া করেছিলেন :

رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا .

“হে প্রতিপালক! পৃথিবীতে কোন কাফেরের ঘরবাড়ি অবশিষ্ট রেখো না।” (৭১ : ২৬)

হযরত মুসা (আ) তাঁর কওমের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দোয়া করেছিলেন :

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ .

“হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের সম্পদ বিনষ্ট কর, ওদের হৃদয় মোহর করে দাও, ওরা তো মর্মভুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।” (১০ : ৮৮)

নবী-রাসূল ও ফেরেশতাদের সাথে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)-এর এসব সাদৃশ্য বর্ণনার পর মহানবী (সা) বললেন, “হে মুসলমানগণ! তোমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছুর প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। তাদের মধ্যে যারা মুক্তিপণ দিতে অস্বীকার করবে, তাদের হত্যা করে ফেলো।” বদর যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে আবু উযযা আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমায়ের জুমাহী নামের একজন কবিও ছিল। বন্দীদের ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে একাধিক অভিমত দেখতে পেয়ে সে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। সে বলল, আমার পাঁচটি মেয়ে রয়েছে। আমার পর তাদের দেখাশোনা করার আর কেউ নেই। তাদের জীবন যাপনের জন্য কোন সম্পত্তিও নেই। হে (হযরত) মুহাম্মদ! তাদের দিকে তাকিয়ে আমাকে মুক্তিপণ থেকে অব্যাহতি দিন। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আমি কখনো আপনার বিরুদ্ধে কাউকে উত্তেজিত করব না। আমি আপনার বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করব না।” মহানবী (সা) তাকে মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিলেন। বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে কেবলমাত্র এ লোকটিই মুক্তিপণ ছাড়া মুক্তি লাভ করে। কিন্তু লোকটি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। উল্লেখ্য যুদ্ধে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে অংশগ্রহণ করে। এবারও সে বন্দী হয়। এবার তার কোন কৈফিয়তই শোনা হয়নি। তাকে হত্যা করা হয়।

মহানবী (সা)-এর ঘোষণার পর যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা হয়। অবশেষে মহানবী (সা)-এর ঘোষণা অনুযায়ী মুক্তিপণের বিনিময়ে কাফেরদের ছেড়ে দেয়া হয়। মুসলমানদের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ - تُرِيدُونَ
عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

“দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয় ; তোমরা বাসনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (৮ : ৬৭)

প্রাচ্যবিদদের সমালোচনা

প্রাচ্যবিদদের একটি দল যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া এবং নযর ইবনে হারিছ ও উকবা ইবনে মুআইতের হত্যা সম্পর্কে বলেন, “এসব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম রক্তপাতের অনুমতি দিয়েছে। যদি তাই না হতো, মুসলমানরা উক্ত দু’জন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করত না। যুদ্ধে বিজয় এবং গণীমতের মাল বা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকত এবং যুদ্ধবন্দীদের বিনা মুক্তিপণেই ছেড়ে দিত।” প্রাচ্যবিদদের এ ধরনের সমালোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করা যে, ইসলাম তার অনুসারীদের ক্ষমার শিক্ষা দান করেনি। তারা এরূপ সমালোচনার মাধ্যমে বদর যুদ্ধের দেড় হাজার বছর পর ইসলাম ও তার প্রবর্তকের নিন্দাবাদ করতে চায়। নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টিপাত করলে আমরা তাদের এই সমালোচনায় কোন সারবত্তা দেখতে পাই না। যেসব রক্তপাতের ঘটনায় খৃষ্টানদের ইতিহাস রঞ্জিত, সেগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে উকবা ও নযরের হত্যার কোন গুরুত্বই থাকে না। খৃষ্টানরা যেসব রক্তপাত করেছে, সেসবের তুলনায় এই হত্যাকাণ্ড একেবারে মামুলী ব্যাপার। খৃষ্টানদের ইতিহাস ঘাটলে অসংখ্য লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিশেষ করে ফ্রান্স এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারকে কেন্দ্র করে লাখ লাখ মানুষের রক্তে হোলি খেলা হয়েছে। এমনকি আধুনিক সভ্যতার যুগেও প্রথম মহাযুদ্ধে খৃষ্টানদের হাতে বিশ্ব মানবগোষ্ঠি যেক্ষেপ অত্যাচার-নির্যাতন ও রক্তপাতের শিকার হয়েছে, তার সাথে বদর যুদ্ধে দু’জন বন্দী হত্যার তুলনা করুন। তাতে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, ইসলাম নযর ও উকবার প্রতি অধিক অত্যাচার করেছে, না ইউরোপ-আমেরিকা তথা খৃষ্টধর্মের অনুসারী মিত্রশক্তি প্রথম মহাযুদ্ধে অধিক অত্যাচার করেছে।^১

মহানবী (সা) আল্লাহর নির্দেশে তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে মানব জাতিকে শির্ক ও পৌত্তলিকতার অভিশাপমুক্ত করার আন্দোলন শুরু করেন। তিনি এই আন্দোলনের সূচনা করেন মক্কা থেকে। এজন্য তাঁকে দীর্ঘ তের বছর পৌত্তলিকদের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হতে হয়। তিনি নিজ জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে মদীনায় এসে বসবাস করতে বাধ্য হন। এখানে তিনি স্বস্তিলাভের কিছুটা সুযোগ পান। মুসলমানরা একটা শক্তিতে পরিণত হয়। মুসলমানদের এই শক্তি সম্পর্কে মক্কার কুরাইশরা অবহিত থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু মদীনার ইহুদীদের সঙ্গে যে মুসলমানরা মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেছেন, তা মক্কার কুরাইশরা অবশ্যই অবহিত ছিল। বদরের আগে মুসলমানদের টহলদার বাহিনী তাদের শক্তি প্রদর্শন করেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বদরের যুদ্ধই ছিল মুসলমানদের অগ্রযাত্রার প্রথম সোপান। কিন্তু এটাকে অগ্রগতির বুনিয়াদ বা ভিত্তি গণ্য করা যায় না। অবশ্য মুসলমানদের অগ্রগতির মাধ্যমগুলোর মধ্যে বদরের যুদ্ধই ছিল সবচাইতে বড় মাধ্যম। মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীরা যে আন্দোলনের প্রচার-প্রসারের জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন, তা ছিল ইসলামী নীতিমালার অনুসরণ। মহানবী (সা) এসব নীতি আল্লাহর নির্দেশে মানব জাতির সামনে তুলে ধরেন। বস্তুত আন্দোলন ও তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সব মাধ্যম বা উপায়

১. মূল গ্রন্থটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে লেখা হয়েছে। তাই গ্রন্থকার শুধু প্রথম মহাযুদ্ধের কথাই উল্লেখ করেছেন। বস্তুত মিত্রশক্তির দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রক্তপাতের ইতিহাস আরো ভয়াবহ। -অনুবাদক

অবলম্বন করা হয় সৈসবের সাথে মূল লক্ষ্যের পুরোপুরি মিল থাকা অপরিহার্য ব্যাপার নয়। ইসলামী সভ্যতার বুনিয়াদ হচ্ছে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। এই লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ পথে মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের সময়, সুযোগ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হয়েছিল। তাঁদের অবর্ণনীয় অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। কোন কোন সময় শক্তি প্রদর্শন করতে হয়েছিল। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদেরকে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দাবিদার খৃষ্টানরা তাদের বিরোধীদের সাথে যে পশুসুলভ আচরণ করেছে, তার তুলনায় মুসলমানদের তাদের শত্রুদের সাথে ব্যবহার দয়া ও অনুগ্রহ ভিত্তিক বলতে হবে। সানবারতিলমির রক্তপাত এবং এ ধরনের অন্যান্য অমানবিক ঘটনাবলি খৃষ্টধর্মের অনুসারীদের ইতিহাসকে কালিমালিগু করেছে। পক্ষান্তরে এ ধরনের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সানবারতিলমির ঘটনার কারণ একই রাতে সৃষ্টি হয়েছিল। সে রাতে ক্যাথলিক খৃষ্টানরা প্যারিস ও তার আশপাশের বিপুল সংখ্যক প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টানকে হত্যা করে ফেলে। মুসলমানরা দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত মক্কায়ে তাদের বিরোধীদের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এরপর তারা বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে দুজনকে হত্যা করেছে। তাতে এমনকি মহাপ্রলয়ংকরী কাজ হয়েছে? তাছাড়া এ দুটি লোককে হত্যা করার পিছনে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল। মক্কায়ে তারা মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। তারা দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত তাদের সঙ্গী-সাথীদের মুসলমানদের পিছনে লেলিয়ে রেখেছিল। এজন্যই অবশিষ্ট যুদ্ধবন্দীদের সাথে যে সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করা হয়েছে, উক্ত দু'জন বন্দীর সাথে তা করা হয়নি। মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেয়ার চাইতে হত্যা করাই আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক কল্যাণকর বলে বিবেচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ - تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ - وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

“দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় ; তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৮ : ৬৭)

মক্কায়ে পরাজয়ের খবর

এই যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের বিজয়ী করেছেন। এই সঙ্গে তারা প্রচুর ধন-সম্পদ গনীমত হিসাবে লাভ করেছেন। এজন্য মদীনায়ে তারা আনন্দ-উল্লাস করেছিলেন। কিন্তু অপরদিকে হায়সুমান ইবনে আবদুল্লাহ খোযায়ী নামক এক ব্যক্তি দ্রুত মক্কায়ে পৌঁছে এবং কুরাইশদের তাদের নেতৃবৃন্দের মৃত্যু ও যুদ্ধে তাদের শোচনীয় পরাজয়ের খবর দেয়। এই লোকটিই সর্বপ্রথম মক্কায়ে বদর যুদ্ধের খবর পৌঁছায়। এই খবর শোনামাত্র কুরাইশরা স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ সময় তারা এই বলে নিজেদের সান্ত্বনা দেয় যে, ‘এরূপ’ কিছুতেই হতে পারে না। তাদের প্রখ্যাত বীর এবং নেতারা যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে পারে একথা তারা সহজে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। কিন্তু হায়সুমান খোযায়ী সব ঘটনা বিস্তারিত বলে তাদেরকে বিশ্বাস

করাবার চেষ্টা করেছিল। অবশেষে তারা খবর সত্য বলে গ্রহণ করে। তারা এ কথা বিশ্বাস করে যে, সত্যই কুরাইশরা পরাজয় বরণ করেছে। এই ঘটনায় কুরাইশদের মধ্যে বিষাদের পাহাড় ভেঙে পড়ে। এই ঘটনা শোনার পর আবু লাহাব ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এই রোগেই সে সাতদিন পর মারা যায়। বদরে নিহতদের উত্তরাধিকারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, নিহতদের জন্য তারা কখনো মাতম বা শোক প্রকাশ করবে না। কারণ তাতে মদীনার মুসলমানরা আনন্দিত হবে। এমনকি যুদ্ধ-বন্দীদের খবর নেয়ার জন্য মদীনায় কাউকে পাঠাবে না। কারণ তাতে মুসলমানরা বিরাট অংকের মুক্তিপণ দাবি করে বসবে। এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরাইশরা কিছুদিন ধৈর্য ধারণ করে থাকে। অবশেষে তারা নিজ নিজ বন্দীদেরকে মুক্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে। মিকরায ইবনে হাফস্ সোহায়েল ইবনে আমরের মুক্তির জন্য মদীনায় আসে। সোহায়েল ছিল অনলবর্ষী বক্তা। সে মহানবী (সা)-এর নিন্দাবাদে কাফেরদের মধ্যে অগ্রগামী ছিল। সোহায়েলের মুক্তির জন্য মিকরায আসার পর হযরত ওমর (রা) মনে করলেন ছাড়া পেয়ে গিয়ে সোহায়েল পুনরায় মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে কুৎসারটনায় লিপ্ত হবে। এদিক চিন্তা করে হযরত ওমর (রা) মহানবী (সা)-এর নিকট নিবেদন করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে সোহায়েলের সামনের দুটো দাঁত ভেঙে দেয়ার অনুমতি দিন। তাতে পুনরায় সে আপনার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করতে পারবে না।” হযরত ওমরের এই নিবেদনের জবাবে মহানবী (সা) যা বললেন তাতে তাঁর উদারতা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার কিছুটা অনুমান করা যায়। তিনি বললেন, “আমি কাউকে ‘মোছলাহ্’ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটার অনুমতি দিতে পারি না। আমি যদি এরূপ করি নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা‘আলাও আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করবেন।”

মক্কা থেকে মহানবী (সা)-এর কন্যা হযরত যয়নব তার স্বামী যুদ্ধবন্দী আবুল আস ইবনে রবীর মুক্তিপণ হিসাবে একটি হার পাঠিয়ে দেন। এই হারটি ছিল উম্মুল মু‘মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর। এটি তিনি হযরত যয়নব (রা)-কে বিয়ের সময় উপহার দিয়েছিলেন। এ হারটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে মহানবী (সা) অশ্রুসজল হয়ে উঠেন। তিনি সাহাবীদের বললেন, “তোমরা যদি সঙ্গত মনে কর তাহলে যয়নবের হার এবং বন্দী উভয়কে ফিরিয়ে দাও।” রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আকাজক্ষা অনুযায়ী তাই করা হলো। এ সময় মহানবী (সা) আবুল আসের নিকট থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নেন যে, তিনি হযরত যয়নবকে পৃথক করে দেবেন। কারণ স্বামী-স্ত্রীর একজন মুসলমান হলে তাদের বিবাহ বন্ধন ভেঙে যায়। আবুল আস মহানবী (সা)-এর প্রস্তাব গ্রহণ করেন। মহানবী (সা) হযরত যয়নবকে নিয়ে আসার জন্য হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা সহ দুই ব্যক্তিকে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা হযরত যয়নবকে মদীনায় নিয়ে আসলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর আবুল আস মক্কাবাসীদের বাণিজ্যিক প্রতিনিধি হিসাবে সিরিয়া রওয়ানা দেন। মদীনার নিকট একটি মুসলিম টহলদার বাহিনী আবুল আসের সব পণ্যসামগ্রী লুট করে। আবুল আস রাতের অন্ধকারে মদীনায় পৌঁছে হযরত যয়নবের আশ্রয় প্রার্থনা করে। হযরত যয়নব তাকে আশ্রয় দান করেন। এ কথা জানতে পেরে মুসলমানরা তার লুণ্ঠিত সব পণ্য-সামগ্রী ফিরিয়ে দেয়। আবুল আস সিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করে মক্কায় ফিরে যায়। এ সব পণ্য যাদের ছিল তাদের তা তিনি ফিরিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমরা আমাকে যে পরিমাণ পণ্য দিয়েছিলে তার সব বুঝে পেয়েছ

তো ? আর কিছু আমার নিকট নেই তো! এ কথার জবাবে পণ্য-সামগ্রীর মালিকরা বলে, “আল্লাহ্ আপনাকে কল্যাণ দান করুন। আপনি আমাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক।” এরপরে আবুল আস তাদের বললেন, “আমি মদীনাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। তোমরা যাতে তোমাদের পণ্য সামগ্রী আত্মসাতের অভিযোগ আনতে না পার, তার জন্য সেখানে আমি তা প্রকাশ করিনি। এখন আমি নিজ দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল।’ এরপর হযরত আবুল আস (রা) মদীনাতে চলে আসেন। মহানবী (সা) হযরত যয়নবকে পুনরায় হযরত আবুল আসের নিকট সোপর্দ করেন।

কুরাইশরা মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বন্দীদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। একেকজন বন্দীর মুক্তিপণ ছিল এক হাজার থেকে চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত। কিন্তু বিত্তহীন ব্যক্তিদের মহানবী (সা) বিনা মুক্তিপণেই ছেড়ে দেন।

বদরে নিহতদের শোক

বদরের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর মহানবী (সা)-এর সাথে সন্ধির ব্যাপারে কুরাইশদের শুভ বুদ্ধির উদয় হলো না। তারা তাদের প্রিয়জনদের বিরহ-বেদনা কিছুদিন চেপে রাখলেও শেষ পর্যন্ত আর তা পারল না। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই তৎকালীন আরবের প্রথা অনুযায়ী শোক প্রকাশ শুরু করল। কোথাও বন্দীদের উট কিংবা ঘোড়া যবাই করা হতো। যবাইকৃত পশুর চারপাশে মহিলারা জড়ো হতো। তারা বুক চাপড়াতো এবং বিলাপ করে কান্নাকাটি করত। তারা নিজেদের মাথার চুল ছিঁড়ে আকাশে উড়িয়ে দিত। কিন্তু আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা ছিল তার ব্যতিক্রম। সে এসব শোক প্রকাশে যোগ দিত না। একদিন শোকাহত কুরাইশ মহিলারা তার নিকট এসে বলল, “হে হিন্দা! বদরে তোমার একজন আত্মীয়ই নিহত হয়নি, তোমার বাপ নিহত হয়েছে, চাচা নিহত হয়েছে, ভাই শেষ হয়েছে। এ ছাড়া আরো কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন মারা গেছে। অথচ তুমি শোক প্রকাশ করছ না। তোমার এই ভূমিকা আমাদের বুঝে আসছে না। হিন্দা বলল, “যদি আমি শোক প্রকাশ করি, তাহলে মদীনাতে (হযরত) মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সঙ্গীরা হাসি ঠাট্টা করার সুযোগ পাবে। খায়রাজ গোত্রের মহিলারা আনন্দ প্রকাশ করবে। আমি তাদের এ সুযোগ দিব না। আমি (হযরত) মুহাম্মদ এবং তাঁর সাথীদের উপর আমার প্রিয়জনদের হত্যার প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করব। আমার এই প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত চুলে তেল দেয়া এবং স্বামীর সঙ্গে সহবাস করা আমার জন্যে হারাম। আমি যদি জানতাম, শোক প্রকাশ ও কান্না-কাটির মাধ্যমে আমার মানসিক শান্তি আসবে, তাহলে অবশ্যই আমি তা করতাম, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, তাতে আমার শান্তি আসতে পারে না। না, কখনো না। আমার প্রিয়জনদের হত্যাকারীদের কলিজা চিবিয়ে না খাওয়া পর্যন্ত আমার আত্মা স্বস্তিবোধ করবে না।” হিন্দা তার দুটি প্রতিজ্ঞাই রক্ষা করে। সে আর একটি যুদ্ধের জন্য কুরাইশদের প্রলুব্ধ করতে থাকে। উহুদ যুদ্ধের আগ পর্যন্ত সে চুলে কখনো তেল দেয়নি। স্বামীকেও নিজের শয্যায় আসার সুযোগ দেয়নি। স্ত্রীর মতো স্বামী আবু সুফিয়ানও প্রতিজ্ঞা করেছিল, বদর যুদ্ধে নিহতদের প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত আমি কখনো স্ত্রী-সহবাস করব না। সেও এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে।

চতুর্দশ অধ্যায়

বদর থেকে উহুদ

বদর যুদ্ধের প্রভাব

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের ঘটনা মক্কাবাসীদের মধ্যে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তারা মুসলমানদের উপর আপনজনদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। এই সঙ্গে বদর যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে মদীনা ও মুসলমানদের অসাধারণ গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। মদীনার ইহুদী, মুশরিক ও মুনাফিকদের মধ্যে মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে অনুভূতি হতে থাকে। তারা এই ভেবে চিন্তাশ্রিত হয়ে পড়ে যে, মাত্র দু'বছর আগে এক ব্যক্তি নিজের বাস্তুভিটা মক্কা ত্যাগ করে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় আমাদের এ শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি এখনই এরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে! ভবিষ্যতে হয়তো এই লোক আমাদের শহর তাঁর পুরোপুরি করায়ত্তে নিয়ে যাবে! ইহুদীরা বদর যুদ্ধের আগেও মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের সাথে মৈত্রী চুক্তির প্রেক্ষিতে তারা প্রকাশ্যে কোন বিরোধী পদক্ষেপ নিতে পারছিল না। অবশ্য গোপনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চলছিল।

ইহুদীদের বিরোধিতা

মুসলমানরা বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর ইহুদীরা পূর্বের চাইতে আরো জোরে শোরে শত্রুতা শুরু করে। তারা সাধারণ মানুষকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য কবিতা রচনা শুরু করে। এরূপ পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বৈপ্লবিক ও সংশোধন আন্দোলন মক্কার মতো মদীনায়ও শুরু করতে বাধ্য হন। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে রাজনৈতিক বৈপ্লবিক চিন্তাধারারও প্রচার শুরু করেন। ইহুদীদের ন্যাকারজনক ভূমিকাই তাঁকে এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে। এতদিন ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে শুধু ধর্মীয় ব্যাপারেই তর্ক-বিতর্ক করত। বদর যুদ্ধ বিজয়ের পর ইহুদীরা ভাবতে থাকে যে, মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি মদীনায় একদিন আমাদের ক্ষমতা ধূলিসাৎ করে দেবে। এই আশংকায় ইহুদীরা অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যে কোন পদক্ষেপ নিতে ইতস্তত করা হবে না। ইহুদীদের প্রতিটি ষড়যন্ত্রও মহানবী (সা) জেনে ফেলতেন। তিনি (সা) তাদের প্রতিটি ষড়যন্ত্রকে, প্রতিটি প্রতারণাকে নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ব্যর্থ করে দিতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহুদীরা তাদের ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকত না। অপরদিকে মুসলমানরাও এসব ষড়যন্ত্র নস্যাত করার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। মোট কথা, উভয় পক্ষ

এই ক্ষেত্রে খুবই সচেতন ছিলেন। নিজ নিজ কর্মে ব্যস্ত ছিলেন। মুসলমান ও ইহুদীরা একে অপরের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকতেন।

আবু ইফ্ক ও আসমার হত্যা

বদর যুদ্ধের আগে মুসলমানরা মদীনায়ে তাদের প্রতিপক্ষ ইহুদী, মুশরিক ও মুনাফিকদের ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন। তাদের কেউ যদি কোন মুসলমানকে হত্যাও করে ফেলত, তাহলে মুসলমানরা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার সাহস করত না। কিন্তু বদর যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। মুসলমানদের সাহস বেড়ে যায়। মুসলমানরা এবার মদীনার এসব ষড়যন্ত্রকারী ও নিন্দাবাদকারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যারাই তাদের নিন্দাবাদ করবে, তাদের সমুচিত শিক্ষা দেয়ার মনস্থ করে।

মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে বনী আমর ইবনে আউফ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিল আবু ইফ্ক। সে রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের দুর্নাম করে কবিতা লিখত। এসব কবিতার মাধ্যমে সে তার সম্প্রদায়কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করত। আবু ইফ্ক বদর যুদ্ধের পরও তার রসনা সংযত করেনি। সে এই ঘৃণ্য কাজ করেই চলছিল। গ্রীষ্মের একরাতে সে তার বাসার ছাদে ঘুমাচ্ছিল। হযরত সালিম উমায়ের সেখানে পৌঁছেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে ঘুমন্ত আবু ইফ্কের উপর তরবারি দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করেন। তাতে তার দেহ দু'টুকরো হয়ে যায়। কেউ মুসলমানদের উপর এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার সাহস করেনি।

আসমা বিনতে মারওয়ান ইবনে জায়েদ নামে এক মহিলা কবি ছিল। সে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে ব্যঙ্গ কবিতা লিখতে শুরু করে। এই মহিলা কবি তার কবিতার মাধ্যমে মানুষকে মুসলমানদের হত্যা ও লুটতরাজের জন্য উত্তেজিত করত। এমনকি বদর যুদ্ধ থেকেও সে শিক্ষা গ্রহণ করেনি। আসমা এক রাতে তার পরিবার-পরিজন নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। তার কোলের শিশু তাকে জড়িয়ে ধরে দুধ খাচ্ছিল। এরূপ পরিবেশে হযরত উমায়ের ইবনে আউফ সেখানে পৌঁছেন। তিনি চোখে কম দেখতেন। তবু কোন রকমে হাতড়ে আসমার শয্যার পাশে পৌঁছান। প্রথমেই তিনি কোলের শিশুটিকে মায়ের বুকে থেকে একপাশে সরিয়ে রাখেন। এরপর আসমার বুকে ছুরিকাঘাত করেন। তাতে আসমার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায়। সে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। হযরত উমায়ের সকালে মহানবী (সা)-কে এই খবর দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় আসমার ছেলে তাকে দাফন করছিল। হযরত উমায়েরকে দেখে সে বললো, “হে উমায়ের! তুমি কি আমার মাকে হত্যা করেছ?” তার এই প্রশ্নের জবাব দান প্রসঙ্গে হযরত উমায়ের বললেন, “আমি তোমার মায়ের হত্যাকারী। তুমি যদি প্রতিশোধ নিতে চাও, তাহলে আমাকে আক্রমণ করতে পার। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমার মায়ের মতো তুমিও যদি আমাদের নিন্দাবাদ কর, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করতেও দ্বিধা করব না। হয় তুমি আমাকে হত্যা করবে, না হয় তোমাকে আমি হত্যা করব।” কিন্তু আসমার ছেলে কিংবা তার গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার সাহস করেনি। আসমা নিহত হওয়ার পর তার স্বামীর গোত্র বনী খাতমার লোকেরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। সে গোত্রের কিছু লোক ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ভয়ে তারা এতদিন প্রকাশ করছিল না। আসমা নিহত হওয়ার পর তাদের সে ভয় কেটে যায়। তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হয়।

কাআব ইবনে আশরাফের হত্যা

কাআব ইবনে আশরাফ ছিল আরেক জন চরম মুসলিম বিদ্রোহী কবি। সে বদরে কুরাইশদের পরাজয়ের খবর শুনে বলেছিল, “বদরে নিহত এসব কুরাইশ নেতা ছিলেন কাবাঘরের রক্ষক এবং আরবের বাদশাহ। তাদের মৃত্যুর পর আমাদেরও মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়।” কুরাইশরা বদর যুদ্ধে সত্যি পরাজয় বরণ করেছে কিনা, কাআব তা বিশ্বাস করতে পারেনি। এ সম্পর্কে সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য সে চল্লিশজন লোক নিয়ে মদীনা থেকে মক্কায় পৌঁছায়। মক্কায় পৌঁছে সে নিশ্চিত হয় যে, কুরাইশরা ঠিকই বদর যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছে। এরপর সে মহানবী (সা) ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। সে তাৎক্ষণিকভাবে অনর্গল কবিতা রচনা করতে পারত। কবিতার মাধ্যমে সে কুরাইশদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা শুরু করে। বদর যুদ্ধে নিহত আবু জেহেল ও অন্যান্য কুরাইশদের মুসলমানরা কালীব নামক গর্তে মাটি দিয়েছিল। এই গর্ত ও সেখানে পুঁতে রাখা কুরাইশদের সম্পর্কেও সে আবেগময় কবিতা আবৃত্তি করে। তাতে মক্কাবাসীরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কাআব মক্কা থেকে মদীনায় ফিরে আসে। এখানে এসেও সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন সব কবিতা রচনা করে, যা কোন মানুষ সহ্য করতে পারে না। মুসলিম ললনাদের নাম উল্লেখ করে সে নিন্দাবাদ শুরু করে। একথা সর্বজনবিদিত যে, আরবরা তাদের মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য জীবন দিতেও দ্বিধা করত না। আর এটা ছিল তাদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে অপমান। তাতে মুসলমানদের মনের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। কাআবের কবিতায় মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তারা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যে করেই হোক কালবিলম্ব না করে কাআবকে শেষ করার পদক্ষেপ নিতে হবে। কয়েকজন মুসলমান এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরিকল্পনামাফিক একজন মুসলমান কাআবের নিকট যায়। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মহানবী (সা) সম্পর্কে কাআবের নিকট অভিনয় করে বলেন, “এই লোকটি মদীনায় আসার ফলে আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সারা আরব আমাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। সবদিকে আমাদের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের পরিবার-পরিজন ধ্বংস হচ্ছে। আমরা ভীষণ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।” এ ধরনের কথাবার্তার মাধ্যমে মুসলমানটি কিছুক্ষণের মধ্যেই কাআবের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। এরপর তিনি তাকে বলেন, আমাকে এবং আমার কয়েকজন বন্ধুকে কিছু খাদ্যশস্য ধার দিন। বন্ধক হিসেবে আপনি আমাদের বর্মগুলো রেখে দিন। কাআব খাদ্যশস্য ধার দিতে সম্মত হয়। সে বলে, আজ নয়, অন্য একদিন এসো।

ইহুদী কাআবের সাথে অভিনয়কারী এই মুসলমানটি ছিলেন হযরত আবু নায়েলা (রা)। ইহুদী কাআব মদীনা শহরের বাইরে একটি দুর্গে বসবাস করত। হযরত আবু নায়েলা (রা) পরদিন রাতে তাঁর মিশনের সদস্যদের নিয়ে কাআবের বাসস্থানে যান। কাআব ঘুমিয়েছিল। হযরত আবু নায়েলা (রা) তাকে ডাকেন। কাআব ঘুম থেকে উঠে দরজা খোলার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু তার স্ত্রী বলে, রাত গভীর হয়ে গেছে। এ সময় দরজা খোলা ঠিক হবে না। কিন্তু কাআব স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত না করে দরজা খুলে দেয়। হযরত আবু নায়েলার অপর দুইজন সঙ্গী বাইরে ওঁত পেতে বসেছিলেন। কিন্তু কাআবের মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। হযরত আবু নায়েলা (রা) কথায় ভুলিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে আসেন। তিনি তাকে আস্থায়

আনার জন্য নিজের অভাব-অনটনের কথা বাড়িয়ে বলছিলেন। চলতে চলতে এক পর্যায়ে হযরত আবু নায়েলা (রা) কাআবের মাথার চুল স্পর্শ করেন। তিনি তাঁর চুলের ঘ্রাণ নিয়ে বলেন, ‘আজকের মতো এমন সুগন্ধি আতর আপনাকে আর কখনো ব্যবহার করতে দেখিনি।’ কাআব তার প্রশংসা শুনে মাথা নেড়ে সাই দিচ্ছিল। হযরত আবু নায়েলা (রা) পুনরায় তার মাথা স্পর্শ করেন। এবার তিনি তার চুল শক্ত করে ধরে চিৎকার করে সঙ্গীদের ডেকে বলেন, “তোমরা বেরিয়ে আস। আল্লাহ্ তা‘আলার দুশমনকে শেষ করে দাও।” এ কথা শোনামাত্র হযরত আবু নায়েলার সঙ্গীরা বিদ্যুৎ বেগে ছুটে আসেন। তারা কাআবকে হত্যা করেন।

ইহুদীদের শত্রুতা

কাআবের হত্যার পর ইহুদীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা প্রত্যেকে নিজেদের জীবন বিপন্ন মনে করতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের রসনা সংযত হয় না। তারা মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকে। মুখে যা আসত তা বলতে কোনরূপ দ্বিধা করত না। এ সময়ে এক মুসলিম আরব মহিলা বনী কায়নুকা গোত্রের ইহুদীদের বাজারে এক স্বর্ণকারের দোকানে যান। ইহুদীটি মহিলার চেহারা দেখতে চাচ্ছিল। সে তাঁকে বোরকার মুখ খুলতে বলে। কিন্তু মহিলা তাতে রাযী হন না। অপর এক ইহুদী মহিলার পিছন থেকে মহিলার মুখাবরণে কাঁটা আটকিয়ে উল্টে দেয়। বিদুষী মহিলাটি তাতে চিৎকার শুরু করেন। একজন মুসলমান ইহুদীদের এই কাণ্ড দেখতে পান। তিনি তরবারি নিয়ে এগিয়ে আসেন। এক আঘাতে ইহুদী স্বর্ণকারের দফারফা করে ফেলেন। কয়েকজন ইহুদী মিলে উক্ত মুসলমানকে পাল্টা আক্রমণ করে হত্যা করে। শহীদ মুসলমানের আত্মীয়-স্বজনরা শোরগোল শুরু করে। তারা মুসলমানদের সাহায্য প্রার্থনা করে। তাতে মুসলমান ও বনী কায়নুকায় ইহুদীদের মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মহানবী (সা) ইহুদীদের ডেকে বলেন, “তোমরা যদি মুসলমানদের কষ্ট দেয়া বন্ধ না কর এবং সন্ধিচুক্তি রক্ষা না কর, তাহলে মক্কার কুরাইশদের সাথে যেকোন ব্যবহার করা হয়েছে তোমাদের সঙ্গেও তা-ই করা হবে। ইহুদীরা মহানবী (সা)-এর এই সতর্কবাণীর কোন পরোয়া করে না। তারা বলে উঠে, “হে (হযরত) মুহাম্মদ! আপনি যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ একটি জাতিকে পরাজিত করেছেন। আমাদের সঙ্গে যদি যুদ্ধ করার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আমরা কারা এবং আমরা কি ধরনের লোক।” ইহুদীদের এই হুমকি দেয়ার পর তাদের সাথে যুদ্ধ মুসলমানদের অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাদের সাথে যুদ্ধ না করা হলে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধূলিসাৎ হয়ে যেতো। তাঁরা মানুষের নিকট হয়ে প্রতিপন্ন হতেন। কিছুদিন আগে কুরাইশরা মুসলমানদের নিকট যেকোন লাঞ্ছিত হয়েছে, মদীনায় মুসলমানদেরও সে পরিণতির শিকার হতে হতো। আরবের ঘরে ঘরে কুরাইশদের পরাজয়ের কথা যেকোন আলোচিত হচ্ছিল, সেরূপ মুসলমানদের অপমানের কথাও আলোচনা শুরু হতো। আর এই পরিস্থিতি মেনে নেয়া মুসলমানদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

বনী কায়নুকা গোত্র অবরোধ

অবশেষে মুসলমান ও বনী কায়নুকা গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। মুসলমানরা বনী কায়নুকাদের দুর্গ অবরোধ করে। তারা দুর্গদ্বার বন্ধ করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। তাদের দুর্গ

থেকে বের হতে দেয়া হয় না। অন্য কাউকেও তাদের নিকট যেতে দেয়া হয় না। তাদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। পনের দিন পর্যন্ত এই অবরোধ অব্যাহত থাকে। এসব ইহুদী মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তারা দুর্গের দরজা খুলে দেয়। মুসলমানদের দয়ার উপর তারা নিজেদের ভাগ্য ছেড়ে দেয়। বনী কায়নুকা গোত্রের সব ইহুদী মহানবী (সা)-এর সামনে উপস্থিত হয়। তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে বনী কায়নুকার সব ইহুদীকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর আবদার

মদীনার প্রখ্যাত মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের সাথে মুসলমান ও ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ের চুক্তি ছিল। সে মাঝখানে হস্তক্ষেপ করে বসে। সে বলল, “হে হযরত মুহাম্মদ! আমার বন্ধুদের প্রতি দয়া করুন।” কিন্তু মহানবী (সা) আবদুল্লাহর বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে রাযী হলেন না। অবশেষে সে কাতরভাবে মহানবী (সা)-এর বর্ম ধরে বসল। তাতেও মহানবী (সা)-এর ক্রোধ কমল না। তিনি আবদুল্লাহকে বললেন, “আমাকে ছেড়ে দাও।” এ সময় মহানবী (সা)-এর চেহারা ক্রোধ ও বিরক্তির ভাব আরো ফুটে উঠছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ কিছুতেই হুয়ের বর্ম থেকে হাত সরালো না। মহানবী (সা) আরো কঠোরভাবে তাকে হাত সরিয়ে নিতে বললেন। আবদুল্লাহ পূর্বের চাইতেও বেশি অনুনয়-বিনয় শুরু করল। সে বলল, “আমার বন্ধুদের মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত আমি হাত সরিয়ে নেব না। আমার বিপদের দিনে তাদেরই সাত শ’ সৈন্য আমার শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তারা আমার হেফাজত করেছে। আমার সামনেই যদি এই সাত শ’ বীরকে একই মুহূর্তে হত্যা করা হয়, তাহলে এরপর আমার পরিণাম কি হবে।” শহরের মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে আবদুল্লাহর নেতৃত্বের প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মদীনার আউস ও খায়রাজ গোত্রীয় পৌত্তলিকদের নিকট সে ছিল অবিসম্বাদিত নেতা। আবদুল্লাহর বারবার অনুনয়-বিনয়ের ফলে অবশেষে মহানবী (সা)-এর ক্ষোভ হ্রাস পায়। এদিকে মুসলমানদের মধ্যে হযরত উবাদা ইবনে সামিতও ইহুদীদের জন্য সুপারিশ করেন। মহানবী (সা) বললেন, “আমি আবদুল্লাহ এবং মুশরিকদের অনুরোধে ইহুদীদের মাফ করে দিলাম। তবে তাদেরকে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে হবে। কারণ তারা জঘন্য অপরাধী।”

মদীনা থেকে ইহুদীদের নির্বাসন

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইহুদীদের নির্বাসন মাফ করার জন্য পুনরায় মহানবী (সা)-এর নিকট যেতে চায়। কিন্তু এবার একজন মুসলমান তাকে বাধা দেয়। উভয়ের মধ্যে সংঘাত হয়। আবদুল্লাহ তাতে আহত হয়। এই দৃশ্য দেখে বনী কায়নুকার ইহুদীরা নিজেরাই বলে উঠে, “যে শহরে আবদুল্লাহর মতো আমাদের একনিষ্ঠ বন্ধু আহত হয়েছে, আমরা তার কোন সহযোগিতা করতে পারিনি, সেখানে আমরা বসবাস করতে পারব না। সে শহরে বসবাস করার আমাদের কোন অধিকার নেই। ইহুদীরা তাদের ব্যবসায়ের পণ্য, অস্ত্রশস্ত্র ও স্বর্ণালংকার মদীনায় ফেলে রেখেই শহর ছেড়ে চলে যায়। কিছুদিন তারা ওয়াদিউল কোরা নামক স্থানে অবস্থান করে। এরপর তারা সিরিয়ার আযরেআত নামক এলাকায় চলে যায়। তারা মনে করে

তাওরাত গ্রন্থে তাদের যে পবিত্র ভূমি দেয়ার কথা বলা হয়েছে, এই আযেরেআতই সেই এলাকা। এই ভূমির সন্ধানেই প্রত্যেক যুগে প্রতিটি ইহুদী ব্যাকুল থাকে।

মদীনায় রাজনৈতিক প্রাধান্য

বনী কায়নুকা গোত্রের নির্বাসনের পর মদীনা শহরে ইহুদীদের দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এরপর যে ক'জন ইহুদী ছিল, তারা নামেই মদীনার অধিবাসী ছিল। বাস্তবে তারা শহরের বাইরে খায়বর ও উম্মুল কোরায় বসবাস করত। ইহুদীদের বিশৃংখলা ও ঔদ্ধত্যে মহানবী (সা) অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। এজন্য তিনি চাচ্ছিলেন, তারা মদীনা ও তার আশপাশের এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাক। আর মহানবী (সা)-এর এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল। বনী কায়নুকাদের ব্যাপারে তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তার রাজনৈতিক যথার্থতা কোন ন্যায়পরায়ণ লোকই অস্বীকার করতে পারে না। তা'ছাড়া কোন শহরে বসবাসকারী দুইটি ভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকে। এই পরিস্থিতি সেখানে কখনো শান্তি-শৃংখলা নিশ্চিত করতে পারে না। এক পর্যায়ে একপক্ষ অপর পক্ষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রতিপক্ষকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এই পরিস্থিতি মদীনায়ও সৃষ্টি হয়েছিল। আর এই প্রভাব বিস্তারের রাজনীতিতে ইহুদীরা মুসলমানদের নিকট পরাজয় বরণ এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। রাজনীতির এই চিরাচরিত ধারাটিই খৃষ্টান ঐতিহাসিকদের নিকট মুসলমানদের বেলায় সমালোচনার ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। তারা বলেছেন, মুসলমান লোকটি যদি স্বর্ণকারকে হত্যা না করত, তাহলে মুসলিম মহিলাকে অপমানের প্রতিকার অন্যভাবেও করা যেত। কিন্তু যারা আরবদের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে অবহিত আছেন, তারা বেশ ভালো করেই জানেন যে, আরবরা নিজেদের মান-সম্মান রক্ষার জন্য জীবন দিতেও দ্বিধা করে না। আরব জাতির ইতিহাসে এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, নিজেদের মান-মর্যাদা সম্পর্কিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে বছরের পর বছর রক্তপাত চলেছে।

মুসলিম মহিলাকে অপমানের ব্যাপারটি চেকোশ্লোভাকিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ডের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এ দুটো ঘটনা একই ধরনের বলা চলে। ১৯১৪ সালে উক্ত যুবরাজের হত্যাকে কেন্দ্র করে প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধে সমগ্র ইউরোপ জড়িয়ে পড়ে। উক্ত মুসলিম মহিলাকে অপমানের ব্যাপারটিও অনুরূপ। এই ঘটনা ইহুদী এবং মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত করে। বস্তুত মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে বেশ কিছুদিন থেকে বিদ্বেষের যে আগুন জ্বলছিল, উক্ত ঘটনা এই আগুনকে আরো প্রজ্বলিত করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে মদীনা একটি আগ্নেয়গিরির রূপ ধারণ করেছিল। উক্ত ঘটনার ফলে তাতে বিস্ফোরণ ঘটে। বনী কায়নুকাদের অবরোধ এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলির পটভূমিতে উক্ত মুসলিম মহিলার অপমান করার ঘটনাটি কার্যকর ছিল।

ছাত্তর যুদ্ধ

ইহুদীদের মদীনা থেকে বের করে দেয়ার পর মুসলমানরা তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে আরো কিছুটা প্রসারিত করার সুযোগ পায়। তারা এই সুযোগের সদ্যবহার করে। এ সময়

আনুমানিক একমাস পর্যন্ত তারা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে। কোন বিরাট ঝড়ের পর যেমন আবহাওয়া কিছুটা শান্ত হয়, মুসলমানদের এই শান্তিপূর্ণ অবস্থা ছিল অনেকটা সে ধরনের। এই অবস্থা বেশি দিন টিকেনি। বদরে শোচনীয় পরাজয়ের পর আবু সুফিয়ান মক্কায় নীরবে বসে ছিল না। সে মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য একের পর এক পরিকল্পনার জাল বুনে চলছিল। সে আরবদের মধ্যে এই প্রচারণা শুরু করে যে, কুরাইশরা এখনো আরবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। তারা এখনো মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারে। বদর যুদ্ধের পর কুরাইশ দাষ্টিকদের মধ্যে সেই শক্তি অবশিষ্ট ছিল। সে শপথ করেছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর প্রতিশোধ নেয়ার আগ পর্যন্ত তারা নিজের স্ত্রীর নিকট যাবে না। তার এই শপথের উদ্দেশ্য ছিল বদরে কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি দূর করা। যাতে দেশে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি পূর্বের মত অক্ষুণ্ণ থাকে, বদরে পরাজয়ের পর এই চিন্তায়ই সে নিমগ্ন থাকত। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সে দুই কিংবা চারশ' সৈন্য নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হয়। সে অত্যন্ত সতর্কভাবে এগুতে থাকে। চলার পথে সে প্রতি পদে পদে মুসলমানদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। অবশেষে মদীনার সীমান্তে উরায়য নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে সে শিবির স্থাপন করে। এখানে তাদের সঙ্গে দু'জন মুসলমানের সাক্ষাত হয়। তাদের একজন ছিলেন আনসার। তারা এখানে বনভূমিতে গবাদি পশু চরাচ্ছিলেন। আবু সুফিয়ান তাঁদের উভয়কে হত্যা করে। তার বাহিনী উরায়য বস্তির দুটি বুপড়ি এবং একটি খেজুর বাগানে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনার পর সে এই ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করে যে, বদরে নিহতদের প্রতিশোধ নেয়ার আমি যে শপথ করেছিলাম তা বাস্তবায়িত হলো। কিন্তু এই সঙ্গে তার মনে এই আশংকাও ছিল যে, মুসলমানরা তার পিছনে ধাওয়া করতে পারে। সে তার সাথীদের নিয়ে দ্রুত মক্কার দিক রওয়ানা দেয়। মহানবী (সা) এই ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র আবু সুফিয়ানের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে একদল মুসলমান নিয়ে রওয়ানা দেন। তিনি 'কারকারাতুল কুদর' নামক স্থান পর্যন্ত এসে পৌঁছান। এদিকে মুসলমানদের ভয়ে আবু সুফিয়ান তার সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত পালাচ্ছিল। এমনকি তাদের যানবাহনের বোঝা হালকা করার জন্য বস্তাভর্তি ছাতু ফেলে দিতে শুরু করে। এসব রসদ তারা নিজেদের খাওয়ার জন্য নিয়ে এসেছিল। মুসলমানরা এসব ছাতুর বস্তা কুড়িয়ে নেন। আরবীতে ছাতুকে বলা হয় 'সাবীক'। এজন্য এই যুদ্ধের নাম ইতিহাসে 'গায়ওয়ায়ে সাবীক' নামে খ্যাতি লাভ করে। মহানবী (সা) 'কারকারাতুল কুদর' নামক স্থানে এসে দেখেন শত্রুরা নাগালের বাইরে চলে গেছে। এজন্য তিনি সেখান থেকে মদীনার দিকে ফিরে চলেন। আবু সুফিয়ানের এই ব্যর্থ অভিযান এবং পালিয়ে যাওয়ার খবর সারা আরবে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মদীনা থেকে দূরে বসবাসকারী আরব গোত্রগুলোর মধ্যে এসব ঘটনার তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। তারা মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের এসব তৎপরতার প্রতি খুব একটা গুরুত্ব প্রদান করত না।

সিরিয়ায় বাণিজ্য সফর

মদীনার আশেপাশে যেসব আরব গোত্র বসবাস করত, তারা মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, মুসলমানদের শক্তি কোন অংশেই কুরাইশদের চেয়ে কম নয়। সে যুগে মক্কা ও সিরিয়ায় যাতায়াতকারী বাণিজ্য

কাফেলাগুলো লোহিত সাগর উপকূল দিয়ে চলাচল করত। উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী গোত্রগুলো তাতে লাভবান হতো। কিন্তু মহানবী (সা) এসব গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তি করে কুরাইশদের বাণিজ্য পথ রুদ্ধ করে ফেলেন। তাতে উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী আরব গোত্রগুলোর জীবন ধারায় আর্থিক দুরবস্থা নেমে আসে। তাদের জীবনোপায় কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলাগুলোর যাতায়াতের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই পথ যদি কুরাইশদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সেখানকার অধিবাসী গোত্রগুলোর জীবন ধারণের আর কোন উপায় থাকবে না। বৃক্ষলতাহীন বালুময় ধু-ধু মরুপ্রান্তরে তারা কিভাবে জীবন যাপন করবে? তারা নিজেদের অন্ধকারময় ভবিষ্যত চিন্তায় শংকিত হয়ে পড়ে। অথচ মুসলমানদের মদীনায় আসার আগে এসব সমস্যার কথা তারা কোন দিন কল্পনাও করেনি। মুসলমানদের কারণে তাদের রুটি-রুঘির দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি তাদের নিকট ছিল ধারণাতীত ব্যাপার।

মুসলমানদের সম্পর্কে বিভিন্ন আরব গোত্রের ভয়-ভীতি

বদরে কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয় দেখে আরবের বিভিন্ন গোত্র মুসলমানদের ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মুসলমানদের সাথে লড়াই করবে, না অন্য কোন পথ বেছে নিবে, এ সম্পর্কে তারা মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছিল। এ সময়ে একদিন মহানবী (সা) সংবাদ পেলেন, গাতফান ও সুলায়ম গোত্র মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই খবর পেয়ে তিনি একদল মুসলমান নিয়ে মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়েন। তিনি ‘কারকারাতুল কুদর’ নামক স্থানে পৌঁছেন। সেখানে তিনি অনেক উট দেখতে পান। কিন্তু এসব উটের রাখাল কিংবা মালিক কাউকে দেখা যায় না। তিনি এসব উট আটক করেন। এরপর কিছু সংখ্যক মুসলমানকে অদূরের মরুদ্যানে খবর সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দেন। সেখানে ইয়াসার নামক এক কিশোরের সাথে তাঁদের দেখা হয়। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, “একটু আগে একদল লোক সমুদ্র উপকূলের দিকে পালিয়ে গেছে।” এই সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা) আটককৃত উটগুলো নিজের সঙ্গীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। আর এই বণ্টন পবিত্র কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক হয়েছিল। বণ্টনের আগে তিনি নিজের এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে নেন। এরপরও প্রত্যেক মুসলমানের ভাগে দু’টি করে উট পড়ে। উটের মোট সংখ্যা ছিল পাঁচ শ’।

এই ঘটনার কিছু দিন পর মহানবী (সা) সংবাদ পেলেন, বনু ছা’লাবা ও বনু মাহারিবের লোকেরা ‘যী-আমাররা’ নামক স্থানে জড়ো হচ্ছে। তারা মদীনার মুসলমানদের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা) চার কিংবা পাঁচ শ’ মুসলিম সৈন্য নিয়ে তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েন। পথে বনু ছা’লাবার এক ব্যক্তির সাক্ষাত হয়। সে খবর দেয়, “এসব লোক অমুক স্থানে লুকিয়ে আছে। আপনার আমার সাথে কথা শোনা মাত্র তারা সেখান থেকে পালিয়ে পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করবে। আমি নিজেই আপনাদের সেখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।” লোকটি মহানবী (সা) ও মুসলিম বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। মুসলমানদের আসার পদধ্বনি শোনা মাত্র এসব লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে দৌড়ে পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে।

কয়েকদিন পর বনী সুলায়ম গোত্রের লোকেরা পুনরায় আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। এই সংবাদ জানতে পেরে মহানবী (সা) তিন শ’ অনুসারী নিয়ে ‘বাহরান’ নামক

স্থানে পৌঁছান। সে রাতে উক্ত গোত্রেরই এক ব্যক্তি এসে মহানবী (সা)-কে খবর দেয়, আপনার আসার কথা টের পেয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

সারকথা, মুসলমানদের এসব তৎপরতার ফলে আরবের বিভিন্ন অমুসলিম গোত্র ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে কোন গোত্র মুসলমানদের সাথে একটা বোঝাপড়া করার জন্য সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে আসত। কিন্তু মুসলমানদের পাল্টা অভিযানের খবর পাওয়া মাত্র তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যেতো।

ইহুদীদের ভীতি

কাআব ইবনে আশরাফের হত্যার পর মদীনা ও তার আশপাশের ইহুদীরা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি লোক ভয় করছিল যে কোন সময় তারাও কাআবের পরিণতির শিকার হতে পারে। তদুপরি বনী কায়নুকার অবরোধ ও নির্বাসন তাদের এই ভয় আরো বাড়িয়ে দেয়। তারা আশংকা করছিল যে কোন সময় তাদের বেলায়ও এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা হতে পারে। একবার ইহুদীরা মহানবী (সা)-এর নিকট এসে অভিযোগ করে যে, “আচ্ছা, কাআবকে কি অপরাধে হত্যা করা হয়েছে?” মহানবী (সা) বললেন, “আমাদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের উত্তেজিত করার জন্য কাআব মক্কা পর্যন্ত গিয়েছিল। সে কবিতার মাধ্যমে আমাদের নিন্দাবাদ করত। অন্যদের মতো সেও যদি সতর্ক থাকত, তাহলে তার বিরুদ্ধে আমাদের এই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হতো না। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনার পর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিপত্রে উভয় পক্ষের সম্মানেরও নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহুদীদের মন থেকে মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ দূর করা সম্ভব হয়নি।

কুরাইশদের বাণিজ্যিক দুরবস্থা

এদিকে কুরাইশদের বাণিজ্যিক পথ অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তারা চিন্তাশ্রান্ত হয়ে পড়ে। কারণ মক্কাবাসীদের জীবনোপায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। মহানবী (সা) তাদের সিরিয়ায় যাওয়ার বাণিজ্যিক পথ অবরোধ করে রেখেছিলেন। এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে মক্কাবাসীরা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। তারা পরিস্কার বুঝতে পারছিল যে, মহানবী (সা) কুরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করে তাদের মক্কায় অবরোধ করে রাখার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। একদিন কুরাইশদের এক সমাবেশে ভাষণদান প্রসঙ্গে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বলল, “আমাদের শত্রু (হযরত) মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীরা আমাদের বাণিজ্যপথ অবরোধ করে রেখেছে। এই অবরোধ অতিক্রম করে নিরাপদে সিরিয়া যাওয়ার কোন সুরাহা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এই পথে বসবাসকারী গোত্রগুলোও মুসলমানদের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছে। এই অবস্থায় আমাদের যদি ঘরে বসে থাকতে হয়, তাহলে আমাদের পুঁজি শেষ হয়ে যাবে। আমরা নিঃস্ব হয়ে যাব। কারণ আবহমানকাল থেকে আমরা এই পথে গরমের দিনে সিরিয়ায় এবং শীতের দিনে আবিসিনিয়ায় বাণিজ্য করে আসছি। আর এই বাণিজ্যলব্ধ মুনাফার মাধ্যমেই আমরা জীবন ধারণ করে আসছি। এখন আমাদের কী অবস্থা হবে।” এ সময় আস্ওয়াদ ইবনে মোত্তালিব বক্তৃতা দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। সে বলল,

“আমরা উপকূলীয় পথ পরিত্যাগ করে ইরাক হয়েও সিরিয়া যেতে পারি। এই পথ চেনার মতো লোক আমাদের এখানে রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন ফুরাত ইবনে হায়্যান।” ফুরাত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আমি যতটুকু জানি, (হযরত) মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের কারো ইরাকের পথ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই। তারা এখন পর্যন্ত এ পথ চোখেও দেখেনি। এ পথে অংশখ্য পাহাড়-পর্বত আর মরু প্রান্তর ছড়িয়ে আছে।” সাফওয়ান বলল, “শীত মওসুমে যদি মরুভূমিতে সফর করা হয়, তাহলে তাতে কোন ঝুঁকি থাকে না। কারণ এই মওসুমে পিপাসা কম অনুভূত হয়।”

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি বাণিজ্য কাফেলা প্রস্তুত করা হয়। এই কাফেলার বাণিজ্য পণ্যের মূল্য ছিল এক লাখ দিরহাম। যে সময় কুরাইশরা উক্ত বাণিজ্য কাফেলার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ছিল, ঘটনাচক্রে সে সময় নুআয়ম ইবনে মাসুদ নামে মদীনার এক ব্যক্তি মক্কায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মদীনায় ফিরে এসে আলোচনা প্রসঙ্গে এক মুসলমানের নিকট কুরাইশদের এই পরিকল্পনার কথা বলে দেন। উক্ত মুসলমান সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপারে মহানবী (সা)-কে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়েদকে এক শ’ মুসলিম সৈন্যসহ কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা প্রতিরোধ করার জন্য পাঠিয়ে দেন। হযরত যায়েদ নজদের অদূরে একটি পাহাড়ি ঝর্ণার নিকট পৌঁছেন। এই ঝর্ণাটি উক্ত কাফেলার চলার পথে অবস্থিত ছিল। কুরাইশ কাফেলা সেখানে পৌঁছে মুসলমানদের দেখামাত্র পণ্যসামগ্রী ফেলে পিছন দিকে পালিয়ে যায়। কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার পরিত্যক্ত সব পণ্যসামগ্রী মুসলমানরা হস্তগত করে। এত বিপুল সম্পদ মুসলমানরা এর আগে আর কখনো গনীমত হিসাবে লাভ করেনি। হযরত যায়েদ (রা) গনীমতের মালপত্রসহ তাঁর বাহিনী নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। মহানবী (সা) এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে অবশিষ্ট সম্পদ হযরত যায়েদ (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। হযরত যায়েদ (রা) ফুরাত ইবনে হায়্যানকেও শ্রেফতার করে নিয়ে আসেন। তাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান হয়। এই আহবানে তিনি সাড়া দেন। এরপর তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়।

এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য যে, এসব আশাব্যঞ্জক ঘটনার পর মহানবী (সা) ইসলাম ও মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন কিনা। তিনি কি একথা ধরে নিয়েছিলেন যে, এ পর্যন্ত মুসলমানরা যেসব ধন-সম্পদ হস্তগত করেছেন এবং বিভিন্ন গোত্রের সাথে যেসব মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেছেন, তাতে ইসলামের বুনিয়াদ সুদৃঢ় হয়ে গেছে? আগামীতে এই ধর্মের প্রচার-প্রসারের সব ব্যবস্থা আল্লাহ তা‘আলা নিজেই করবেন। তাঁর আর উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই? বস্তুত মহানবী (সা)-এর মনে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা এতটুকু স্থান পায়নি। এরূপ ধারণা মহানবী (সা)-এর মহান সংকল্প থেকে অনেক দূরে ছিল। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, সবকিছু একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন এবং করতে পারেন। তিনি সর্বশক্তিমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, আল্লাহ তা‘আলা প্রতিটি কাজ উপকরণের মাধ্যমে সম্পাদন করেন। সাধারণত আল্লাহ তা‘আলার এই নিয়মের কোন পরিবর্তন হয় না। তিনি নিজেও বলেছেন, “আল্লাহ তাঁর বিধানের কোন পরিবর্তন করেন না।” (৩৩ : ৬২) আল্লাহ তা‘আলা মানুষের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কোন মানুষের সফলতা তার মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠু

প্রয়োগের উপর যে নির্ভর করে এই বাস্তবতাও অস্বীকার করা যায় না। মহানবী (সা)-এর মহান সংকল্প আল্লাহ তা'আলার বিধান ও বাস্তবতা বিবর্জিত ছিল না। আর তাই তাঁর পবিত্র জীবনধারায় আমরা দেখতে পাই, একদিকে তিনি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রত্যাশী ছিলেন। অপরদিকে তাঁর মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যরাজির সদ্যবহারে অতুলনীয় সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

কুরাইশদের নেতৃত্ব সারা আরবে স্বীকৃত ছিল। এরূপ মর্যাদাসম্পন্ন জাতি বারবার মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের হাতে পর্যুদস্ত ও অপমানিত হবে এবং প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না--এটা ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয় ব্যাপার। বিশেষ করে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাণিজ্য কাফেলা লুণ্ঠিত হওয়ার পর তারা আরো অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, যে করেই হোক শত্রুর উপর এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। মহানবী (সা) নিজের প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রেক্ষিতে কুরাইশদের এই মনোভাব সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না।

মহানবী (সা)-এর সাথে হযরত হাফসার বিবাহ

মহানবী (সা) ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অবশ্য ইসলাম প্রথম থেকেই তাঁর অনুসারীদের মনোবল সুদৃঢ় করে রেখেছিল। মুসলমানরা একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকার ব্যাপারে সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা হলে তাঁদের এই শক্তি আরো বৃদ্ধি পেতো। এই উদ্দেশ্যে তাঁদের মধ্যকার সম্পর্ক আরো মজবুত করার জন্য মহানবী (সা) কতকগুলো সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

হযরত ওমরের কন্যা সাইয়েদা হাফসা (রা)-এর সাথে মহানবী (সা) পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। হযরত হাফসা এর আগে হযরত খুন্স-এর স্ত্রী ছিলেন। সাতমাস আগে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার আগে মহানবী (সা) হযরত আবু বকরের কন্যা সাইয়েদা আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করেন। হযরত হাফসা (রা)-কে বিয়ের মাধ্যমে যেমন মহানবী (সা) হযরত ওমর (রা)-এর সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করেন, অনুরূপ নিজের আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা (রা)-কে হযরত আলী (রা)-এর সাথে বিয়ে দিয়ে তিনি তাঁকেও ঘনিষ্ঠতর করে নেন। মহানবী (সা)-এর কন্যা হযরত রোকাইয়া (রা) ছিলেন হযরত ওসমান (রা)-এর স্ত্রী। কিছুদিন আগে তিনি ইন্তেকাল করেন। এবার মহানবী (সা) তাঁর আরেক কন্যা হযরত উম্মে কুলছুম (রা)-কেও হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে বিয়ে দেন। সারকথা, আত্মীয়তার বন্ধনের মাধ্যমে মহানবী (সা) তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান এবং হযরত আলী (রা)-কে আরো ঘনিষ্ঠ করে নেন। বস্তুত মনোবল এবং সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারে সমসাময়িক সকল মুসলমানের মধ্যে তাঁরা ছিলেন উত্তম। এমনকি শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকেও এই চারজন সাহাবী অন্যদের চাইতে বেশি অগ্রগামী ছিলেন। বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য মহানবী (সা) মুসলমানদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন। এসব অভিযানে লব্ধ ধন-সম্পদের মাধ্যমে তিনি তাদের অসচ্ছলতা দূর করার চেষ্টা করেন। অনুরূপ উপরোক্ত চারজন সাহাবীর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে মহানবী (সা) প্রকৃতপক্ষে সকল মুসলমানের শক্তি ও সংহতি বৃদ্ধি করেছেন।

মহানবী (সা) একদিকে যেমন মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধিতে তৎপর ছিলেন, তেমনি অপরদিকে কুরাইশদের উদ্দেশ্য ও গতিবিধির প্রতিও পুরাপুরি সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন। কুরাইশরা মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, তারা তাদের সিরিয়ার বাণিজ্য-পথে মহানবী (সা)-এর অবরোধ অবসানের জন্যও ব্যস্ত ছিল। বস্তুত এই দু'টি ক্ষেত্রে কুরাইশদের সফলতার উপর মক্কার ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করছিল।

উদ্ভদের যুদ্ধ

কুরাইশদের প্রতিশোধস্পৃহা

বদর যুদ্ধের পর কুরাইশরা আরামে বসেছিল না। ছাতুর যুদ্ধের মাধ্যমেও তাদের প্রতিশোধস্পৃহা পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি। এরই মধ্যে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা লুট করেন। এই ঘটনা ক্ষতস্থানে লবণ ছিটানোর মতো কাজ করে। তাদের প্রতিশোধস্পৃহা আরো বেড়ে যায়। কারণ হযরত যায়েদের অভিযানের মাধ্যমে তাদের নতুন বাণিজ্যপথও বন্ধ হয়ে যায়। তারা লোহিত সাগরের উপকূলীয় পথ পরিত্যাগ করে ইরাকের এই পথে যাতায়াতের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাও বন্ধ হয়ে গেল। তারা বদরের মর্মান্তিক ঘটনা এবং বাণিজ্যপথ অবরোধ করার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। বদরের ঘটনা তারা কিভাবে বিস্মৃত হবে? সেখানে তাদের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ও নেতারা নিহত হয়েছে। তাদের স্বরণে কুরাইশ মহিলারা সব সময় কান্নাকাটি করত। কেউ ছেলে হারিয়েছে, কেউ পিতা হারিয়েছে, কেউ স্বামী হারিয়েছে, কেউ ভাই হারিয়েছে আবার কেউ হারিয়েছে অন্য আত্মীয়-স্বজনকে। তাদের জন্য কান্নাকাটি করা, বুক চাপড়ানো কুরাইশ ললনাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তাদের কান্নাকাটিতে কুরাইশরা মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বুদ্ধিজ্ঞানশূন্য মানুষের মতো একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকত।

বদর রণাঙ্গন থেকে যেসব লোক জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, তারা আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার সব পণ্য ‘দারুন নাদওয়ায়’ জমা করে। শীর্ষস্থানীয় কুরাইশ নেতা জোবায়র ইবনে মুতইম, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, ইকরামা ইবনে আবু জেহেল, হারেছ ইবনে হিশাম এবং হুওয়ায়তিব ইবনে আবদুল উয্য়া’র পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এসব পণ্য বিক্রি করে যুদ্ধোপকরণ কিনে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। এই অর্থের সাহায্যে সৈন্য সংখ্যা বাড়ানো হবে। বদরের কুরাইশ নিহদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বিভিন্ন আরব গোত্রকে উত্তেজিত করা হবে। এই উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক কুরাইশ বিভিন্ন গোত্রে বেরিয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কবি আবু আযযাও ছিল। সে বদর যুদ্ধে বন্দী হয়। মহানবী (সা) দয়াপরবশ হয়ে তাকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেন। এসব কুরাইশ তাদের সাহায্যের জন্য একদল হাবশী ক্রীতদাসও সঙ্গে নিয়ে যায়।

প্রতিশোধ আবেগে উন্মাদিতা একদল কুরাইশ রমণীও সৈন্যদের সাথে রণাঙ্গনে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে। এ ব্যাপারে পুরুষদের মধ্যে একাধিক মতের সৃষ্টি হয়। এক ব্যক্তি বলে, “আমরা মরণপণ করে যুদ্ধে যাচ্ছি। যদি নিহতদের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে না পারি, তা

হলে জীবিত ফিরে আসব না। এরূপ অবস্থায় মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কল্যাণকর হবে। তারা আহতদের সেবা করতে পারবে এবং বদরের ঘটনাবলি স্মরণ করিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে দিতে পারবে।” আরেকজন বলল, “মহিলারা হচ্ছে আমাদের ইয্যত। যদি আমরা পরাজিত হই, তা হলে মহিলাদের বেইয্যতি হলে আমাদের মান-সম্মান ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।” এ সময় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলল :

“সমবেত সুধীমণ্ডলী! আপনারা জীবিত ফিরে আসতে না পারার কথা চিন্তা করে ঘাবড়ে যাবেন না। বদর রণাঙ্গন থেকেও আপনারা জীবিতই ফিরে এসেছেন এবং নিজ নিজ রমণীদেরও দেখতে পেয়েছেন। এখন আমরা রণাঙ্গনে যাওয়ার ইচ্ছে করেছি। আপনারা আমাদের বারণ করছেন। আমাদের বারণ করার আপনাদের কোন অধিকার নেই। আমরা অবশ্যই যাব। বদর যুদ্ধের সময়ও আপনারা এই ভুল করেছিলেন। আপনাদের যুবতী মেয়েদের ‘জোহ্ফা’ নামক স্থান থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারা রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকলে আপনাদের প্রেরণা যুগিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। এই ভুলের পরিণতিতে আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা বদর রণাঙ্গনে প্রাণ হারিয়েছে।”

কুরাইশ বাহিনীর যাত্রা

যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর কুরাইশ বাহিনী মদীনার উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করে। যেসব মহিলার আত্মীয়-স্বজন বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তারাও হিন্দার নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনীর সাথে রওয়ানা দেয়। হিন্দা প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছিল, কারণ বদর রণাঙ্গনে তার পিতা, ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়। এই বাহিনীতে তিন হাজার সৈন্য ছিল। তাদের মধ্যে দুশ’ জন ছিল তায়েফের বনু সাকিফ গোত্রের। অবশিষ্টরা ছিল মক্কার অধিবাসী। তাদের মধ্যে কুরাইশ সরদারদের কিছু বন্ধু গোত্রের লোকও ছিল। এ ছাড়া ছিল একদল হাবশী ক্রীতদাস। এই বাহিনীতে তিনটি পতাকা ছিল। সবচেয়ে বড় পতাকাটি ছিল তালহা ইবনে আবু তালহার হাতে। এটি দারুননাদওয়ায় বসে তৈরি করা হয়। ঘোড়া ছিল দুশ’, উট ছিল তিন হাজার, বর্ম পরা সৈন্য ছিল সাতশ’। এ ছাড়া ছিল অটেল সমর সত্তার। এই বাহিনীতে মহানবী (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-ও ছিলেন। তিনি কুরাইশদের সকল পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। হযরত আব্বাস ইসলাম গ্রহণের আগেও মহানবী (সা)-কে অত্যন্ত সম্মান করতেন। বদর যুদ্ধের সময় মহানবী (সা) তার প্রতি যে সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করেন, তিনি তা ভুলতে পারেননি। তিনি এই জন্য মহানবী (সা)-এর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। কুরাইশ বাহিনী রওয়ানা দেয়ার পূর্বাঙ্কে হযরত আব্বাস (রা) মহানবী (সা)-কে একটি চিঠি লিখেন। তাতে কুরাইশদের সৈন্যসংখ্যা, সমর উপকরণ ইত্যাদির বিস্তারিত উল্লেখ ছিল। এই চিঠি তিনি গিফারী গোত্রের একজন দূত মারফত মদীনায়ে মহানবী (সা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি তাঁকে বলে দেন, “তুমি মদীনায়ে পৌঁছে এই চিঠিটি হযরত মুহাম্মদের হাতে দেবে।”

এদিকে কুরাইশ বাহিনী মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে একেক মন্ডল অতিক্রম করে এগিয়ে চলে। তারা আবওয়া নামক স্থানে এসে পৌঁছায়। এখানে মহানবী (সা)-এর মাতার মাযার ছিল। কুরাইশ বাহিনীর ‘অদূরদর্শী’ কিছু যুবক হযরত আমেনা (রা)-এর মাযার নিশ্চিহ্ন করে

ফেলার জন্য উদ্যত হয়। কিন্তু কুরাইশ নেতারা এই অশোভন কাজ থেকে তাদের বিরত রাখে। তারা বলে, আরবে এই কুপ্রথা শুরু হলে বনী বকর এবং বনী খোযাআর লোকেরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কবরও ধ্বংস করে ফেলবে। এ কথা শুনে কুরাইশ যুবকরা বিরত হয়। আবওয়া থেকে রওয়ানা হয়ে কুরাইশ বাহিনী আকীক নামক স্থানে পৌঁছায়। এটি ছিল উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে মদীনা থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। এখানকার একটি সমতল জায়গায় কুরাইশরা শিবির স্থাপন করে।

হযরত আব্বাসের দূত

হযরত আব্বাসের দূত মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। এ সময় তিনি মদীনা থেকে ছয় মাইল দূরে কোবায় ছিলেন। তিনি কোবা মসজিদ থেকে বেরিয়ে উটে আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় উক্ত দূত চিঠিটি মহানবী (সা)-এর নিকট হস্তান্তর করে। তিনি চিঠিটি হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা)-কে দিয়ে পড়িয়ে শোনেন। মহানবী (সা) হযরত উবাইকে বিষয়টি গোপন রাখতে বলেন। এরপর তিনি মদীনায় চলে আসেন। মদীনায় পৌঁছে তিনি সরাসরি হযরত সাআদ ইবনে রবীর ঘরে যান। তাকেও চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করেন। এই সঙ্গে তিনি ব্যাপারটি কারো নিকট প্রকাশ করতে বারণ করেন। কিন্তু হযরত সাআদের স্ত্রীও এই সময় ঘরে ছিলেন। তিনি পুরো ব্যাপারটা শুনে ফেলেন। ফলে চিঠির বিষয়বস্তু আর গোপন রাখা সম্ভব হয়নি।

মহানবী (সা) ফোয়ালার দুই ছেলে হযরত আনাস এবং হযরত মুনেসকে কুরাইশদের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার নির্দেশ দেন। তারা কুরাইশ বাহিনীকে মদীনার বাইরে শিবিরে দেখতে পায়। তারা আরো দেখতে পায় কুরাইশ বাহিনী তাদের উট ও ঘোড়াগুলো ফসলের ক্ষেতে ছেড়ে দিয়েছে। এরপর মহানবী (সা) হযরত হুকাব ইবনে মুনযির (রা)-কে কুরাইশ বাহিনীর তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দেন। হযরত হুকাব (রা) ফিরে এসে যে বর্ণনা দেন তার সাথে হযরত আব্বাসের লেখা চিঠির তথ্য পুরোপুরি মিলে যায়। তাতে মহানবী (সা) বিস্মিত হন। হযরত হুকাব (রা)-এর পর হযরত সালামা ইবনে সালামা (রা) কুরাইশ বাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের জন্য যান। তিনি কুরাইশদের একদল সৈন্যকে মদীনা শহরের অত্যন্ত নিকটে দেখতে পান। মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা শহরে প্রবেশ করবে। এই অবস্থা দেখে তিনি দ্রুত শহরে ফিরে আসেন এবং মুসলমানদের অবহিত করেন। আউস ও খায়রাজ গোত্র এবং মদীনার অন্যান্য বাসিন্দারা আসন্ন যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। কারণ কুরাইশরা এই যুদ্ধের প্রস্তুতিতে নিজেদের সর্বশক্তি ও অর্থ বিনিয়োগ করেছিল। আরবের ইতিহাসে কোন যুদ্ধের জন্য এমন প্রস্তুতির খবর আর কখনো শোনা যায়নি।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হেফাজতের জন্য একদল সশস্ত্র মুসলমান মসজিদে নববীতে রাতভর পাহারায় নিযুক্ত থাকেন। মুসলমানদের আরেকটি দল সারারাত শহরের নিরাপত্তা বিধানে ব্যস্ত থাকেন। এ ছাড়া শহরের সাধারণ লোকেরাও সারারাত জেগে সতর্ক থাকে। সকালে মহানবী (সা) শত্রুদের প্রতিরোধ করা সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করেন। এ ব্যাপারে তিনি মুনাফিকদের অভিমতও চান। মহানবী (সা)-এর ইচ্ছা ছিল শত্রুর মোকাবেলার ব্যাপারে যেন একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রণাঙ্গন সম্পর্কে মতবিরোধ

এ সম্পর্কে কারো অভিমত প্রকাশ করার আগে মহানবী (সা) নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন, “কুরাইশ মুহাজিররা শহরের বাইরে নিয়োজিত থাকবে। আর অন্যান্য অধিবাসীরা শহরের অভ্যন্তরে থেকে শত্রুর মোকাবেলা করবে। তাতে শত্রুকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।” মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মহানবী (সা)-এর অভিমত সমর্থন করে বলল, “আমরা সব সময় মদীনায় অবরুদ্ধ থেকেই যুদ্ধ করেছি। নারী এবং শিশুদেরকে আমরা বাসস্থানের ছাদে রাখার ব্যবস্থা করেছি। তাদের নিকট অটেল পাথরের টুকরো জমা করে রেখেছি। চারদিকে মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে শত্রুর প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য স্বল্প দূরত্বে একাধিক চৌকি স্থাপন করেছি। শত্রুরা হানা দিলে উপর থেকে নারী ও শিশুরা পাথর ছুঁড়ে মারত। আর যুবকরা তলোয়ার নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ত। হে আল্লাহর রাসূল! মদীনাকে একটি কুমারী নারীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, যার কুমারিত্ব কখনো নষ্ট হয়নি। আজ পর্যন্ত কোন শত্রু আমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারেনি। এই শহরে থেকে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা কখনো পরাজিত হইনি। কিন্তু যখনই আমরা শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করেছি আমাদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করুন। মদীনাকে রক্ষা করার এই কৌশল আমি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি। সমকালীন অভিজ্ঞ লোকেরাও আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছেন।” শহরে থেকে শত্রুর মোকাবেলা সম্পর্কিত মহানবী (সা)-এর অভিমতের সাথে শীর্ষস্থানীয় মুহাজির ও আনসাররাও ঐকমত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু মুসলিম যুবক শ্রেণী এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁরা শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য অভিমত প্রকাশ করেন। এসব বীর যুবকের মধ্যে দু’ধরনের লোক ছিলেন। একদল ছিলেন যারা কোন কারণে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু এখন এ সুযোগের সদ্যবহার করে নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তৎপর ছিলেন। আরেকদল ছিলেন যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন, বদর রণাঙ্গনে আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ তাঁদের শক্তি-সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল পৃথিবীর কোন শক্তি তাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে না। শহরে আবদ্ধ থাকাকে তাঁরা ভীর্ণতা মনে করতেন। তাঁদের মতে তাতে শত্রু মনে করবে তারা ভীর্ণ। এই দলটির আরেকটি ধারণা ছিল, বদর ছিল মদীনা থেকে অনেক দূরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কুরাইশদের উপর জয়লাভ করেছেন। আর উহুদ রণাঙ্গন হচ্ছে মদীনা শহরের অত্যন্ত নিকটে। উহুদকে মদীনার উপকণ্ঠেই বলা চলে। উহুদের প্রতিটি চড়াই-উৎরাই তাদের নখদর্পণে ছিল। অপরদিকে শত্রুদের এ স্থান সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এই দলের একজন যুবক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন :

“কুরাইশরা আমাদের এখান থেকে ফিরে গিয়ে বলবে, ‘(হযরত) মুহাম্মদ (সা) আমাদের ভয়ে ইয়াসরিবে তার দুর্গে লুকিয়ে গেছে।’ আমরা শহরে অবস্থান নিয়ে থাকলে শত্রুদের সাহস আরো বেড়ে যাবে। বন্ধুগণ! শত্রুরা আমাদের শস্য-শ্যামল ক্ষেত, ফলের বাগান ও ফল তছনছ করে ফেলছে। আমরা যদি তাদেরকে এই ধ্বংসাত্মক তৎপরতা থেকে বিরত না রাখি, তাহলে আমরা ফল-ফসল কিভাবে পাবো? আমাদের শত্রু বদর রণাঙ্গনে পরাজয়ের পর পুরো একবছর প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তা সত্ত্বেও তারা মাত্র মুষ্টিমেয় কিছু আরব আর হাবশী

ক্রীতদাসদের নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে! কুরাইশরা তাদের ঘোড়া আর উটের পাল আমাদের শহরের উপকণ্ঠে নিয়ে এসেছে। তাদের এই দুঃসাহস কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। তারা আমাদের শহরে এবং দুর্গে আবদ্ধ করে নিজেরা নিরাপদে ফিরে যাবে এটা নিশ্চয় আপনারা কেউ পছন্দ করবেন না। যদি এরূপ হয়, তাহলে শত্রুদের সাহস অনেক বেড়ে যাবে। ভবিষ্যতেও তারা এভাবে আমাদের শস্য-শ্যামল ভূমি ধ্বংস করতে থাকবে। যে কোন সময় এসে আমাদের ঘিরে ফেলবে, বশে নেয়ার চেষ্টা করবে। তাদের গোয়েন্দারা সব সময় আমাদের খবর সংগ্রহ করে তাদের নিকট পৌঁছাবে। আমাদের শহর তাদের গোয়েন্দাগিরি থেকে কখনো নিরাপদ থাকবে না। এভাবে একদিন কুরাইশরা আমাদের উপর বিজয় লাভ করবে।”

বীরত্ব ও শাহাদাত

এই জ্বালাময়ী ভাষণের মাধ্যমে মুসলমানদের বীরত্ব, সাহস ও শাহাদাত লাভের এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তারা প্রায় সবাই শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য অধীর হয়ে উঠেন। এ সময় মহানবী (সা)-এর খেদমতে যে সব সাহাবা উপস্থিত ছিলেন, তাদের মন-মানসিকতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর ভালবাসায় পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার অভিমতের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল আমরা অবশ্যই যুদ্ধে জয়ী হবো। শত্রুরা আমাদের তরবারির আঘাতে জর্জরিত হবে। তাদের মধ্যে দু'চার জন বেঁচে গেলেও আমাদের ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। আমরা তাদের বন্দী করতে সক্ষম হবো। প্রচুর গনীমতের মাল লাভ করব। আর আমাদের মধ্যে যারা শাহাদাত বরণ করবেন, তাঁরা আল্লাহর প্রতিশ্রুত জান্নাত লাভ করবে। সেখানে আমরা যা চাইব তা-ই লাভ করব। বদরে যারা শত্রুর হাতে শহীদ হয়েছিলেন, বেহেশতে সেসব বন্ধুর সাথে আমাদের সাক্ষাত হবে। আমরা তাদের সাথে মিলনের আনন্দ উপভোগ করব। সেখানে কোন দুঃখজনক কথাবার্তা শোনা যাবে না। এই আবেগময় পরিবেশে প্রবীণ সাহাবী হযরত খায়ছামা ভাষণ দান প্রসঙ্গে বললেন :

“আমি আশা করি আল্লাহ তা‘আলা এ যুদ্ধে আমাদের জয়যুক্ত করবেন। অবস্থা প্রতিকূল হলে অন্তত শাহাদাত তো অবশ্যই লাভ করব। আমি বদর যুদ্ধে এই শাহাদাত লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে আমি কিছুতেই বিরত থাকতে চাইছিলাম না। আমার পুত্র সাআদও যাওয়ার জন্য জেদ ধরেছিল। অবশেষে আমরা উভয়ে লটারী করি। তাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ আমার পুত্রের ভাগ্যে জোটে। সে উক্ত যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে। সে রাতেই আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখি। সে আমাকে বলে, ‘আল্লাহ আমাদের সঙ্গে যেসব ওয়াদা করেছেন, সবই আমরা দেখতে পেয়েছি। আপনিও আমাদের সঙ্গে এসে বেহেশতে অবস্থান করুন। হে আল্লাহর রাসূল! আমি সেই মুহূর্ত থেকে বেহেশতে আমার ছেলের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছি। আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার শরীরের হাড়গুলোর শক্তি লোপ পেয়েছে। এখন আমি আমার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করাই অধিক পছন্দ করি।”

মহানবী (সা) দেখতে পেলেন, শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষপাতী লোকের সংখ্যাই বেশি। এজন্য তিনি তাঁর অভিমত পুনরাবৃত্তি করে বললেন, “আমি তোমাদের পরাজয়ের আশংকা করছি।” কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পীড়াপীড়ি হ্রাস পেল না।

এই জন্য মহানবী (সা) সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত বাস্তবায়নই আবশ্যিক মনে করলেন। আর এ ছাড়া বিকল্প কোন উপায়ও ছিল না। কারণ কোন ব্যাপারে ওহী নাযিল না হওয়া পর্যন্ত মহানবী (সা) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ ছাড়া কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন না। তিনি নিজের অভিমত মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিতেন না। তিনি সানন্দে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত মেনে নিতেন।

সে দিন ছিল শুক্রবার। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের নিয়ে জুমার নামায আদায় করেন। নামাযের পর তিনি মুসলমানদের উদ্দেশে বলেন :

“হে মুসলমানগণ! তোমরা যদি ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দাও, তাহলে জয় তোমাদেরই হবে।”

এরপর তিনি শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য মুসলমানদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। আসরের নামায শেষে তিনি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে নিজের হুজরা বা বাসস্থানে যান। তাঁরা মহানবী (সা)-কে পাগড়ী বাঁধায় সহযোগিতা করেন। তাকে বর্ম পরান। কোমরে তরবারি ঝুলান। মহানবী (সা) তাঁর হুজরায় থাকা পর্যন্ত মুসলমানরা শহরে থেকে, না রণাঙ্গনে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে, এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। হযরত উসায়দ ইবনে হুযায়র (রা) এবং সাআদ ইবনে মুআয (রা) শহরে থেকে শত্রুর মোকাবেলা করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা ভিন্নমত পোষণকারীদের বললেন :

“আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মহানবী (সা) দুর্গমধ্য থেকে যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন। এরপরও আপনাদের পক্ষ থেকে তাঁকে শহরের বাইরে রণাঙ্গনে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা হচ্ছে। এখনো সময় আছে, মহানবী (সা)-এর অভিমতকে অগ্রাধিকার দেয়া হোক। তিনি যা নির্দেশ দান করেন, আপনারা কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন না করে তা মেনে নিন।”

এবার খোলা ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করার অভিমত পোষণকারীদের চৈতন্যোদয় হয়। তারা বুঝতে পারে যে, আমরা মহানবী (সা)-এর অভিমতের বিরোধিতা করেছি। সম্ভবত এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হতে পারে। একথা উপলব্ধি হওয়ার পর তাদের ভাবাবেগ স্তিমিত হয়ে পড়ে। মহানবী (সা) বর্ম পরিধান করে বেরিয়ে আসলে তাঁরা তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হন এবং বলেন :

“হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের উদ্দেশ্য আপনার বিরোধিতা করা নয়। আপনি আপনার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আমরা আমাদের অভিমত প্রত্যাহার করছি। আপনি যা নির্দেশ দান করবেন আমরা তা পালন করার জন্য প্রস্তুত আছি। আল্লাহ তা‘আলার পর আপনার নির্দেশ পালনই আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক।”

মহানবী (সা) বললেন, “আমি প্রথমে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলাম তোমরা তাতে দ্বিমত পোষণ করেছ। বর্ম পরিধানের পর শত্রুর মোকাবেলা ছাড়া তা খুলে ফেলা নবী হিসাবে আমার জন্য শোভনীয় নয়। এখন তোমরা আমার নির্দেশ পালন কর। তোমরা যদি ধৈর্য ধরে অবিচল থাক, জয় তোমাদেরই হবে।” বস্তুত পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মহানবী (সা) মুসলিম

বাহিনীকে বিন্যাস করেন। শত্রুর মোকাবেলার উদ্দেশ্যে তিনি তাদের নিয়ে উহুদের দিকে রওয়ানা দেন। শায়খায়ন নামক স্থানে পৌঁছে তিনি দেখতে পান একদল সৈন্য আগে থেকেই সেখানে শিবির স্থাপন করে আছে। তাদের সাথে মহানবী (সা)-এর পরিচয় ছিল না। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে, তারা মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও ইহুদীদের মিত্র। তারা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য এসেছে। মহানবী (সা) বললেন, ‘মুশরিকদের বিরুদ্ধে অপর মুশরিকদের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে না। তবে হ্যাঁ, তোমরা যদি আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে তোমাদেরকে গ্রহণ করা যেতে পারে।’ একথা শুনে তারা মদীনায় ফিরে রওয়ানা দেয়। রাস্তায় তাদের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর দেখা হয়। তারা আবদুল্লাহকে অভিযোগ করে বলে, “আপনি তো (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে উত্তম পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি আপনার পরামর্শের সাথে একমত হন। কিন্তু পরে তাঁর অনভিজ্ঞ যুবকদের পরামর্শ গ্রহণ করে তাঁদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছেছেন।” এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলল, “আপনারা ঠিকই বলেছেন। আমিই বা আর গিয়ে কি করব।” এরপর সেও তার বাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে ফিরে আসে। এখন মহানবী (সা)-এর সাথে শুধু তার একনিষ্ঠ সাহাবীরাই রয়ে গেলেন। তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র সাতশ’। এই সাতশ’ মুসলিম সৈন্য নিয়ে মহানবী (সা) তিন হাজার কুরাইশ বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করার জন্য উহুদের দিকে এগিয়ে চললেন।

মুসলমানদের কাতারবন্দী

মুসলমানরা উহুদে এসে পৌঁছেন। মহানবী (সা) মুসলমানদের কাতারবন্দী করেন। তাদের পিছনে ছিল উহুদ পাহাড়। অদূরে একটি গিরিপথ ছিল। এ গিরিপথ দিয়ে পেছন থেকে শত্রুদের আক্রমণ করার আশংকা ছিল। তিনি উক্ত গিরিপথে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজ নিয়োগ করেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, এ পথ দিয়েও শত্রুরা আক্রমণ করতে পারে। তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের প্রতিরোধ করবে। আমরা যদি শত্রুদের পর্যুদস্ত করে ফেলি, তখনো তোমরা এই স্থান ত্যাগ করবে না। খোদা না করুন, যদি দেখ শত্রুবাহিনী আমাদেরকে পর্যুদস্ত করে ফেলেছে, সে অবস্থায়ও তোমরা এ স্থান ত্যাগ করে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। বরং এখান থেকেই শত্রুপক্ষের ঘোড় সওয়ারদের লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করতে থাকবে। তাতে তীর বর্ষণের সামনে ঘোড় সওয়াররা টিকে থাকতে পারবে না। এরপর মহানবী (সা) সারিবদ্ধ মুসলিম বাহিনীর দিকে ফিরে যান। তিনি তাদের শুধু এই বলেন যে, আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ অস্ত্র প্রয়োগ করবে না।

এদিকে কুরাইশরা তাদের বাহিনীকে কাতারবন্দী করেছিল। কুরাইশ বাহিনীর ডান পার্শ্বে খালেদ ইবনে ওয়ালীদকে নিযুক্ত করা হয়। বামদিকে করা হয় ইকরামা ইবনে আবু জেহেলকে। পতাকা ন্যস্ত করা হয় আবদুল ওয়যা তাল্হা ইবনে আবু তালহার হাতে। কুরাইশ মহিলারা সুসজ্জিত হয়ে বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে সৈন্যদের উত্তেজিত করছিল। তারা কখনো সৈন্যদের সারির সামনে দিয়ে যেত, আবার কখনো পিছন দিয়ে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল হিন্দা বিনতে ওতবা। তারা কবিতা আবৃত্তি করে কুরাইশ বাহিনীকে অনুপ্রাণিত করছিল। তাদের এসব কবিতার সারমর্ম ছিল, “আমাদের দিকে তাকাও। আমরা শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহ থেকে বেরিয়ে

এসেছি। আমরা কোমল কার্পেটে মধুময় সম্ভাষণের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানিয়ে থাকি। আজ যদি তোমরা এগিয়ে গিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা কর, তাহলে কাল আমরা তোমাদের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হব। আর যদি তোমরা পশ্চাদপসরণ কর, তাহলে তোমাদের সাথে আমাদের আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।”

এরূপে উভয় পক্ষের সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য উদ্যত হচ্ছিল। কুরাইশরা বদর যুদ্ধে তাদের নিহতদের নাম উচ্চারণ করে সৈন্যদের উত্তেজিত করছিল। আর মুসলমানদের দৃষ্টি ছিল আল্লাহর অনুগ্রহ ও সহযোগিতার প্রতি। তারা শুধু আল্লাহ তা‘আলার প্রতি নির্ভর করছিল। মহানবী (সা) মুসলিম সৈন্য বাহিনীর উদ্দেশ্যে এ সময় যে ভাষণ দেন তাতেও তিনি এ কথাই পুনরাবৃত্তি করেন, “তোমরা যদি অবিচল থেকে ধৈর্য ও সাহসের সাথে শত্রুর মোকাবেলা কর, তাহলে জয় তোমাদের অবশ্যস্বাবী।”

হযরত আবু দুজানার বীরত্ব

মহানবী (সা) মুসলিম বাহিনীর সারিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি নিজের তলোয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, “হে মুসলমানগণ! তোমাদের মধ্যে কে এমন বীর আছে, যে এই তরবারির চাহিদা মেটাতে পারে?” তাঁর এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে তরবারিটি গ্রহণ করার জন্য কয়েকজন মুসলিম বীর এগিয়ে আসেন। কিন্তু মহানবী (সা) তাদের কারো আবেদন মন্যুর করেননি। হযরত আবু দুজানা মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই তলোয়ারের চাহিদা বা প্রাপ্য কি এবং তা কিভাবে বাস্তবায়িত করা যাবে?” মহানবী (সা) বললেন, “এই তলোয়ারের চাহিদা হলো এর দ্বারা শত্রুবৃহৎ এমনভাবে আক্রমণ চালাতে হবে যাতে শত্রু নিধনে তা কুণ্ঠিত হয়ে যায়।” বীর হযরত আবু দুজানা বাড়ি থেকেই শিরে লাল ফিতা বেঁধে বেরিয়েছিলেন। আর এটা ছিল আরবের বিশেষ নিদর্শন। যার মাথায় লাল ফিতা বাঁধা থাকবে, মনে করা হতো তিনি যুদ্ধে তার শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করবেন না। হযরত আবু দুজানা মহানবী (সা)-এর নিকট থেকে উক্ত তরবারি গ্রহণ করেন। তিনি একহাত দ্বারা তরবারি ধরেন, অপর হাত মাথার লাল ফিতায় রেখে অত্যন্ত গর্বিত ভঙ্গিতে শত্রুর দিকে এগিয়ে যান। মহানবী (সা) তার এই বিশেষ ভঙ্গি দেখে বললেন, “রণাঙ্গন ছাড়া আল্লাহ তা‘আলা এ ধরনের গর্বের প্রকাশ পছন্দ করেন না।”

আবু আমের নামক কুরাইশ পক্ষের এক ব্যক্তি রণাঙ্গনে প্রথম আক্রমণের সূচনা করে। এই লোকটি ছিল মদীনার আউস গোত্রের মুশরিক। সে মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের যুদ্ধের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তার কমান্ডে ছিল পনেরো জন আউস গোত্রীয় লোক এবং মদীনার কয়েকজন ক্রীতদাস। তার ধারণা ছিল আউস গোত্রের যেসব লোক মহানবী (সা)-এর সাথে রয়েছে তার ইঙ্গিতে তারা কুরাইশদের সাথে এসে মিলিত হবে। তাতে করে সবাই মিলে কুরাইশদের জয়যুক্ত করবে। সে রণাঙ্গনে সজোরে আওয়ায দিয়ে বলে, “হে আউস গোত্রীয় ভাইসব! দেখ আমি এখানে রয়েছি।” এদিক থেকে আউস গোত্রীয় মুসলমানরা তার প্রতি-উত্তরে বলেন, “হে পাপিষ্ঠ! আমরা তোমাকে ভালো করেই চিনি। আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে সাহায্য করবেন না।” ইতিমধ্যে যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। কুরাইশদের বাঁ দিকের সেনাপতি ইকরামা ইবনে আবু জেহেল তার ক্রীতদাস

বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের অগ্রভাগে আক্রমণ চালায়। মুসলমানরা পাথর ছুঁড়ে তাদের এই আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। ইকরামা পিছনে হটে যেতে বাধ্য হয়। এ সঙ্গে উক্ত আবু আমেরও পিছনে সরে যায়। এ সময়ে হযরত হামযা (রা) উত্তেজিত সিংহের মতো শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি কুরাইশ বাহিনীর ব্যুহ ভেদ করে কয়েকজন কাফেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। এদিকে কুরাইশ পতাকাবাহী তালহা ইবনে আবু তালহা তার সাথে মোকাবেলা করার জন্য দস্তোক্তি করা শুরু করে। বীর কেশরী হযরত আলী (রা) তালহার বিরুদ্ধে এগিয়ে যান। উভয়ের মধ্যে কয়েকবার আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ হয়। অবশেষে হযরত আলীর এক অব্যর্থ আক্রমণে তালহার মাথার খুলি কেটে খানখান হয়ে যায়। এই দৃশ্য দেখে মহানবী (সা) উচ্চকণ্ঠে ‘নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার’ বলে উঠেন। মহানবী (সা)-এর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে মুসলিম বাহিনীও তাকবীর ধ্বনি দিতে থাকেন। তাতে মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়ে যায়। মুসলমানরা শত্রু বাহিনীর উপর দুর্বীর আক্রমণ চালায়। মাথায় লাল ফিতা বাঁধা আবু দুজানা বিদ্যুৎ বেগে শত্রু ব্যুহে ঢুকে কাফেরদের ধরাশায়ী করে চলছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তির উপর তার দৃষ্টি পড়ে। লোকটি মুসলিম শহীদদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটছিল। আবু দুজানা লোকটিকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হন। লোকটি চিৎকার শুরু করে। হযরত আবু দুজানা গভীর দৃষ্টিপাত করে দেখেন এটি হচ্ছে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা। সঙ্গে সঙ্গে আবু দুজানা তাকে আক্রমণ থেকে বিরত থাকেন। তিনি ভাবেন, মহানবী (সা)-এর পবিত্র তরবারি কোন মহিলার উপর চালানো শোভনীয় হবে না। তাতে এই পবিত্র তরবারির অপমান হবে।

মক্কার কুরাইশ নেতারা প্রায় বদরে নিহত হয়েছে। তাই আজ তারা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মহানবী (সা)-এর সাথে আরেকটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। বদরের মতো এই যুদ্ধেও উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যা এবং সমর উপকরণের কোন প্রকার ভারসাম্য ছিল না। তাদের উভয়পক্ষের উদ্দেশ্যও অভিন্ন ছিল না। একপক্ষ ছিল প্রতিশোধ নেয়ার জয়বায় উন্মাদ। অপরপক্ষ নিজেদের ঈমান, বিশ্বাস ও মাতৃভূমির পবিত্রতা রক্ষার জন্য শত্রুকে প্রতিরোধ করছিলেন। মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের উন্মাদনা মুসলমানদের তুলনায় শক্তি ও সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা এই অসম শক্তির সাথে মরণপণ যুদ্ধ করে চলেছিলেন। তা ছাড়া কুরাইশ বাহিনীর পিছনে ছিল সুন্দরী রমণীকুল। তারা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পুরুষদের নিরলসভাবে উত্তেজিত করছিল। এসব মহিলা যেসব পুরুষকে মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য পিছন থেকে উত্তেজিত করে পাঠাতো, তাদের বলে দিত, তোমরা যদি আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের হত্যাকারীদের সমুচিত শিক্ষা দিতে পার, তা’হলে প্রচুর ধন-সম্পদ পুরস্কার দেয়া হবে।

বদর যুদ্ধে মুসলিম বীর হযরত হামযা (রা)-এর অব্যর্থ আঘাতে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার পিতা উতবা ও এক ভাই নিহত হয়। এই সঙ্গে তার আরো ক’জন আত্মীয় তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। হযরত হামযা (রা) উল্লেখ্য যুদ্ধেও অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করছিলেন। তাঁর তরবারির আঘাতে কাফেররা একের পর এক ধরাশায়ী হচ্ছিল। কুরাইশ বাহিনীর প্রখ্যাত যোদ্ধা আরতাত ইবনে আবদে শুরাহ্বীল হযরত হামযা (রা)-এর হাতে নিহত হয়। সিবা’ ইবনে আবদুল ওযযার দফারফা হয় হযরত হামযার তরবারির আঘাতে। যার

উপরে হযরত হামযা (রা)-এর তরবারির ছায়া পড়ত, তার আত্মা দেহত্যাগ করতে বাধ্য হতো।

হযরত হামযার শাহাদাত

বদর রণাঙ্গনে জোবায়র ইবনে মুতইমের চাচা এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার পিতা উতবা হযরত হামযার হাতেই নিহত হয়। মুতইম তার হাবশী ক্রীতদাস ওয়াহশীকে বলেছিল, “তুমি যদি (হযরত) হামযাকে হত্যা করতে পার, তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিব।” এদিকে উক্ত ওয়াহশীর সঙ্গে হিন্দাও কথা বলে রেখেছিল, “তুমি (হযরত) হামযাকে হত্যা করতে পারলে আমি তোমাকে প্রচুর সোনা-রূপা দিব।” সাইয়েদুশ শুহাদা বা শহীদদের নেতা হযরত হামযা (রা) এই ওয়াহশীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। ওয়াহশী পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণের পর এই মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলেছেন, “কুরাইশদের সাথে আমাকেও উহুদের যুদ্ধে আসতে হয়েছিল। হাবশীদের প্রখ্যাত বর্শা নিক্ষেপ পদ্ধতিতে আমি অত্যন্ত পটু ছিলাম। আমার কখনো লক্ষ্য ভ্রষ্ট হতো না। উহুদ রণাঙ্গনে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলে আমিও আমার শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। হযরত হামযা (রা) ছিলেন গোধূম বর্ণের। আমি ভিড়ের মাঝেও তাকে চিনে ফেলি। সে সময় তিনি কুরাইশ বাহিনীর ভিতরে ঢুকে প্রতিপক্ষের সৈন্যদের একের পর এক ধরাশায়ী করছিলেন। আমি আমার বর্শাটি পরিমাপ করে তাঁর দিকে ছুঁড়ে মারি। বর্শাটি তাঁর নাভিতে ঢুকে অপরদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। হযরত হামযা আমাকে দেখে ফেলেন। তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসেন। তারপরেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আমি তাঁর নিস্তেজ দেহ থেকে বর্শাটি বের করে নিই। আমি তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর শিবিরে চলে আসি। কারণ হযরত হামযা (রা)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই আমি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এরপর আমার আর কোন দায়িত্ব ছিল না। আর এটাও করেছিলাম আমি মুক্ত হওয়ার জন্য। যুদ্ধ শেষে মক্কা আসার পর আমাকে মুক্ত করে দেয়া হয়।

মুসলিম বাহিনীতে কিছু লোক ছিল যারা নিজেদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এ ধরনের লোকদের মধ্যে একজনের নাম ছিল কুযমান। সে ছিল মুনাফিক। সে শুধু বাহ্যিকভাবে নিজেকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করত। যেদিন মুসলমানরা উহুদের দিকে রওয়ানা দেয়, সেদিন সে আসেনি। সে মদীনায়ই ছিল। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার তার কোন ইচ্ছা ছিল না। পরদিন সকালে যাবার গোত্রের মহিলারা তাকে দেখে তিরস্কার শুরু করে। তারা বলে, “তোমার আত্মীয়-স্বজনরা সবাই রণাঙ্গনে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য চলে গেছে আর তুমি মহিলাদের মতো ঘরে বসে আছ। তোমার লজ্জা হয় না! কুযমান ছিল বীর পুরুষ। তার বীরত্বের কথা মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। সে মহিলাদের এই তিরস্কার সহ্য করতে পারেনি। সোজা ঘরে এসে তীর-ধনুক ও তরবারি নিয়ে বেরিয়ে উহুদে এসে পৌঁছায়। এ সময়ে রণাঙ্গনে মহানবী (সা) সৈন্য বিন্যাস করছিলেন। সে দৃষ্টি এড়িয়ে প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়ায়। কুযমানই সর্বপ্রথম মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে তীর ছুঁড়ে। তার নিক্ষিপ্ত তীর বল্লমের মতো শত্রুর শরীরে বিদ্ধ হতো এবং জীবন নিয়ে বের হয়ে যেতো। দুপুর পর্যন্ত সে শত্রুপক্ষের অনেককে হত্যা করে। অপরাহ্নের দিকে সে শত্রুপক্ষের সাতজনকে হত্যা করে। এরপর সে নিজেই নিজের উপর অস্ত্র চালিয়ে দেয়। কুযমান মৃত্যু

যন্ত্রণায় মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছিল। আবু গায়দাক নামক একজন মুসলিম সৈন্য তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কুযমানের অন্তিম মুহূর্ত দেখে তিনি তাকে শাহাদাতের শুভ সংবাদ দান করেন। কুযমান বলল, “হে বন্ধু! তুমি আমাকে শাহাদাতের শুভ সংবাদ দিচ্ছ! কিন্তু আমার এই জীবন পাঠ ধর্মের জন্য নয়। আমি একটা বিশেষ আবেগের তাড়নায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আর তা হলো, কুরাইশরা আমাদের শস্য-শ্যামল ফসলের ক্ষেত ধ্বংস করবে কিংবা আমাদের মহিলাদের অপমান করবে, এটা আমার নিকট অসহনীয় ব্যাপার। আল্লাহর শপথ করে বলছি, জাতীয় সংকীর্ণতার তাড়নায় আমি আত্মবলিদান করছি। এই আবেগ না হলে আমি কখনো ঘর থেকে বের হতাম না।

উদ্ভদ রণাঙ্গনে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা সাতশ’র বেশি ছিল না। এই স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিজেদের চাইতে চারগুণ বেশি শক্তির সাথে যুদ্ধ করছিল। মুসলিম বাহিনীতে হযরত হামযা, হযরত আলী ও হযরত আবু দুজানার মতো জীবন উৎসর্গকারী মুসলিম বীর মুজাহিদও ছিলেন। রণাঙ্গনে তারা অসাধারণ বীরত্ব ও সমর নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। এ থেকে সহজেই মুসলমানদের আধ্যাত্মিক শক্তি অনুমান করা যায়। তারা কুরাইশ বাহিনীর সারিগুলো বেতের মতো বাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। নিজেদের ইচ্ছেমত এসব সারি সরেছিলেন।

কুরাইশ বাহিনীও অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেয়। একটা ঘটনা থেকে তা সহজে অনুমান করা যায়। কুরাইশদের একজন পতাকাবাহী নিহত হওয়া মাত্র অপরজন দৌড়ে এসে পতাকা সমুন্নত রাখত। এই পতাকা সর্বপ্রথম ছিল তালহা ইবনে আবু তালহার হাতে। হযরত আলী (রা)-এর হাতে আবু তালহা নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওসমান ইবনে আবু তালহা দৌড়ে এসে পতাকা তুলে ধরে। হযরত হামযার হাতে ওসমান নিহত হওয়ার পর আবু সাআদ দৌড়ে এসে পতাকা তুলে ধরে। সে পতাকা হাতে নিয়েই সগর্বে হুঙ্কার দিয়ে মুসলমানদের উদ্দেশে বলে উঠে, “তোমরা কি এই ঔদ্ধত্যে যুদ্ধ করে চলছ যে, তোমাদের নিহতরা স্বর্গ লাভ করবে আর আমাদের নিহতরা নরকের জ্বালানিতে পরিণত হবে? তোমাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তোমরা এক ভুলের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছ। যদি তোমাদের এই ধারণা সঠিক হয়, তাহলে এসো, এগিয়ে এসো। দেখি তোমাদের কে আমাকে হত্যা করতে পারে? আবু সাআদের এই দম্ভোক্তির সাথে সাথে এদিক থেকে হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস এগিয়ে গেলেন। তিনি এক আঘাতে আবু সাআদের শির দু’টুকরো করে ফেললেন। এরপরও কুরাইশ পক্ষের আবদুদার গোত্রের নয়জন বীর যোদ্ধা তাদের পতাকা সমুন্নত রেখে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে থাকে। তাদের সর্বশেষ পতাকাবাহী ছিল সেই গোত্রেরই একজন হাবশী ক্রীতদাস। তার নাম ছিল সোয়াব। হযরত কুযমানের আঘাতে সোয়াবের ডান হাত চলে যায়। সে বাঁ হাতে পতাকা আঁকড়ে ধরে। কুযমান তাঁর বাঁ হাতটিও ফেলে দেন। এবার সোয়াব তার দুই কনুই দ্বারা পতাকা উঁচিয়ে রাখে। আঘাতে আঘাতে সে দুর্বল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও সে নিজেদের পতাকার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পিঠের নীচে জড়িয়ে রাখে। মৃত্যুর সময় তার মুখ থেকে বেরিয়েছিল, “হে বনী আবদুদার! কুযমান কিংবা সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের আঘাতে সোয়াব নিহত হচ্ছে।”

এরপর কুরাইশদের মধ্য থেকে তাদের পতাকা বহনের জন্য আর কেউ এগিয়ে এল না। তারা পরাজিত হয়ে পালাতে লাগল। এই ভাগ-দৌড়ের সময় কুরাইশরা তাদের রমণীদের

কথাও ভুলে গিয়েছিল। তারা এসব মহিলাকে নিয়ে যেতে পারল না। মুসলিম বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলেন। কুরাইশরা যুদ্ধযাত্রার সময় আশীর্বাদ লাভের জন্য কাবাঘর থেকে একটি প্রতিমা নিয়ে এসেছিল। রণাঙ্গনে এই প্রতিমাটিও মুখ খুবড়ে মাটিতে পড়েছিল। শত্রু-মিত্র সবাই এটিকে পদদলিত করছিল। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে।

বিশ্বাস ও ঈমানের শক্তি

কোন কোন ঐতিহাসিক উহুদ রণাঙ্গনে মুসলমানদের এই প্রাথমিক বিজয়কে মহানবী (সা)-এর দূরদর্শিতা ও নবীসুলভ প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি হিসাবে অভিহিত করে থাকেন। তাঁরা বলেন, মহানবী (সা) একজন অতুলনীয় সমরবিদ ছিলেন। তিনি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই সব কিছু সঠিক মূল্যায়ন ও পরিমাপ করে নিয়েছিলেন। পিছনের যে গিরিপথ দিয়ে শত্রুর আক্রমণ আশংকা ছিল, তিনি প্রথমেই সেখানে পঞ্চাশজন তীরন্দাজ নিয়োগ করেছিলেন। শত্রুসৈন্য এই পথে হানা দিলে আগেভাগেই তিনি তিনি তা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ঐতিহাসিকদের এই অভিমত সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এ ছাড়াও এ সম্পর্কে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে। আর তা হলো, মুসলিম বাহিনীর অধিনায়কের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা ছাড়াও এই বিজয়ের পিছনে তাঁদের বিশ্বাস ও ঈমানী শক্তিরও প্রভাব ছিল। কেননা বিশ্বাস ও ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান কোন লোক জড় শক্তির আধিক্যে এতটুকু ভয় পায় না। পৃথিবীর সকল জড়শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েও তার বিশ্বাসের প্রাচীর হেলাতে পারে না। বস্তুত উহুদ রণাঙ্গনে অতুলনীয় সিপাহসালারী ও সমর অভিজ্ঞতাই জয়লাভের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ তীরন্দাজের যে দলটি মহানবী (সা) গিরিপথে মোতায়ন করেছিলেন তারা সংখ্যায় মাত্র পঞ্চাশজন। যদি শত্রুপক্ষের তিন শ' সৈন্য এই পঞ্চাশ জনের উপর মরণাপন্ন আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করত, তাহলে অবশ্যই তারা বিজয়ী হতো। মুষ্টিমেয় পঞ্চাশ জন মুসলিম সৈন্যের সেখানে টিকে থাকা সম্ভব হতো না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস ও সঠিক চিন্তা এক অপরাজেয় শক্তি। এই শক্তির অধিকারীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধান হয়, তাহলে তাঁরা সংখ্যায় যতো কমই হোক না, কয়েকগুণ বেশি শক্তির পক্ষেও তাঁদের পরাজিত করা সম্ভব হয় না।

এজন্যই কুরাইশদের তিন হাজার বীর সৈন্য মাত্র সাত শ' মুসলিম মুজাহিদের নিকট পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। মুসলমানরা কুরাইশ মহিলাদের গ্রেফতার করার জন্য উদ্যত হন। একদল মুসলিম সৈন্য পলায়নপর শত্রুদের পিছনে ধাওয়া করে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান। মুসলমানদের এই দলটিই ফিরে এসে রণাঙ্গনে শত্রু বাহিনীর পরিত্যক্ত মালামাল কুড়ানো শুরু করেন। বলা চলে, তাঁরা শত্রুর পাল্টা আঘাত সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পার্থিব লোভ-লালসার শিকার হন।

বিজয়ের পর পরাজয়

মুসলিম বাহিনীর যে দলটি গিরিপথ অবরোধে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা দেখলেন অন্যান্য মুসলমানরা রণাঙ্গনে গনীমতের সম্পদ জমা করছেন। এই অবস্থা দেখে তাঁদের মনও পার্থিব সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাঁরা একে অপরকে বলেন, “এখন আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে

থাকার আর কি দরকার। শত্রুরা পালিয়ে গেছে। মুসলমানরা শত্রুশিবিরে ঢুকে গনীমতের মাল হস্তগত করছেন। চল, আমরাও তাদের সাথে গিয়ে শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদ সংগ্রহ করি।” এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে ভিন্নমতও ছিল। তাঁদের অপর দল বললেন, “মহানবী (সা) তাকিদ করে বলেছেন, ‘হযুর (সা)-এর উপর আক্রমণ হতে দেখলেও যেন আমরা এই স্থান ত্যাগ না করি।’ প্রথম পক্ষ বললেন, মহানবী (সা)-এর তাকিদ করার অর্থ এই নয় যে, শত্রুর পরাজয়ের পরও আমরা এই স্থান ত্যাগ করতে পারব না।” তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকে এভাবে নানা মত প্রকাশ করতে থাকেন। এই বাহিনীর অধিনায়ক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা) বললেন, “কোন অবস্থায়ই মহানবী (সা)-এর নির্দেশের বিরোধিতা করা আমাদের উচিত হবে না।” কিন্তু অধিনায়কের এই কথারও তাঁরা কোন গুরুত্ব দিলেন না। তাঁরা গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য রণাঙ্গনে ছুটে গেলেন। এরপরও যারা গিরিপথে ছিলেন তাঁদের সংখ্যা দশজনের বেশি ছিল না।

কুরাইশ বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ দেখলেন, গিরিপথে নিয়োজিত মুসলিম সৈন্যরা মোরচা ছেড়ে গনীমতের সম্পদ কুড়ানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের সাথে মাত্র ক’জন ছাড়া আর সবাই চলে গেছেন। খালিদ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে ঘুরে এসে গিরিপথে নিয়োজিত ক’জন মুসলিম মুজাহিদের উপর হামলা করেন। তাঁরা খালিদের বাহিনীর হাতে শাহাদাতবরণ করেন। খালিদ দেখলেন, রণাঙ্গনে গনীমতের সম্পদ সংগ্রহকারী মুসলিম সৈন্যরা তাঁর আক্রমণের আঁচই করতে পারেনি। তিনি এগিয়ে গিয়ে তাঁদেরও আক্রমণ করে বসেন। তিনি কুরাইশ বাহিনীকে এক বিশেষ ভঙ্গিতে হুকুম দিয়ে ডাকেন। এই আহবানের সাথে সাথে পরাজিত কুরাইশ বাহিনী পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, খালিদ মুসলমানদের ঘেরাও করে ফেলেছেন। তারা পুনরায় মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময় মুসলমানরা গনীমতের সম্পদ ছেড়ে অস্ত্র উঠিয়ে নেন। কিন্তু তখন সময় চলে গেছে। মুসলিম বাহিনীর কাতারবন্দী ভেঙ্গে গেছে। মুষ্টিমেয় মুসলিম বাহিনীকে বিরাট কুরাইশ বাহিনী ঘিরে ফেলেছে। দুঃখের বিষয়, একটু আগে যে মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহর কলেমার প্রতিষ্ঠা ও নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের হেফাজতের জন্য সুশৃংখল ও অজেয় শক্তি হিসাবে শত্রুর মোকাবেলা করছিলেন, এখন তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছেন। ছিঁড়ে যাওয়া তাসবীহর গোটার মতো তাঁরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা মৃত্যুর চোরাবালিতে ফেঁসে গেছেন। একটু আগে তাঁরা যে দূরদর্শী ও অনন্যসাধারণ সাহসী সেনানায়কের নেতৃত্বে ও নির্দেশ অনুযায়ী শত্রু বাহিনীর সাথে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, এখন তাঁদের সেই সেনানায়ক কোথায় আছেন সে খবরও তাঁদের ছিল না। পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। মুসলমানরা শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ করতে ব্যর্থ হন। এক মুসলমান অপর মুসলমানকে আঘাত করা শুরু করেন।

রণাঙ্গনে হঠাৎ গুজব ছড়িয়ে পড়ে মহানবী (সা) শাহাদাতবরণ করেছেন! এই গুজব শোনামাত্র মুসলমানরা একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। মুসলমানরা মনে করেন এখন তাঁদের আর কোন সেনাপতি নেই। এখন সেনাপতি ছাড়া সৈন্যবাহিনীর যে অবস্থা হয়, মুসলমানদের অবস্থাও তার ব্যতিক্রমটি ছিল না। এমনকি মুহাজিরদের তরবারির আঘাতে তাদেরই ভাই হযরত হোযায়ফা (রা) শাহাদাত বরণ করেন। আক্রমণের সময় তাঁকে চেনা সম্ভব হয়নি।

এরূপ নাযুক অবস্থায় হযরত আলী ইবনে আবু তালেবের মতো কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবা ছাড়া সবাই নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য চিন্তাশ্রিত হয়ে পড়েন।

মুসলমানদের মরণপণ সংগ্রাম

মহানবী (সা)-এর শাহাদাতের খবর কুরাইশদের কানে পৌঁছামাত্র তারা খুশিতে লাফিয়ে উঠে। তারা বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মতো মহানবী (সা)-এর অবস্থানের দিকে ছুটে আসে। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কে কার আগে কাটবে। তাতে করে তারা একে অপরের নিকট এই কৃতিত্বের জন্য গর্ব প্রকাশ করবে। কাফেরদের এভাবে ছুটে আসতে দেখে মুসলমানরা মহানবী (সা)-এর চারদিকে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে যান। তাঁদের ঈমানী শক্তি পুনরায় জেগে উঠে। তাঁদের নিকট জীবন-মৃত্যু অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় উতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাস মহানবী (সা)-কে লক্ষ্য করে একটি পাথর ছুড়ে মারে। তাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'টি পবিত্র দাঁত শহীদ হয়ে যায়। পবিত্র ঠোঁটে আঘাত লাগে। শিরজ্ঞাণের দুটি কড়া পবিত্র গণ্ডদেশে বসে যায়। এই দৃশ্য দেখে মুসলমানদের নিকট পৃথিবী আরো তুচ্ছ মনে হয়। তাঁদের ঈমানী শক্তি কয়েক হাজার গুণ বেড়ে যায়। প্রতিটি লোক সাহসী বীরের মতো মৃত্যুর সাথে লড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

মহানবী (সা) অবস্থান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। যেসব সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঘিরে রেখেছিলেন তিনি তাঁদের নিয়ে সামনে এগিয়ে যান। শত্রুপক্ষের আবু আমের একটি গর্ত খোদাই করে ঘাস দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। এগিয়ে যাওয়ার সময় মহানবী (সা) তাতে পড়ে যান। হযরত আলী (রা) সঙ্গে সঙ্গে নবী (সা)-এর হাত ধরে ফেলেন। হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) আল্লাহর রাসূল (সা)-কে গর্ত থেকে উঠিয়ে আনেন। মহানবী (সা) সাহাবীদের নিয়ে উহুদ পাহাড়ে উঠে পড়েন। প্রাকৃতিক কারণেই পর্বতচূড়া পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করা শত্রুদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ সময় মহানবী (সা)-এর নিরাপত্তায় জীবনপণকারী সাহাবীরা নবী (সা)-কে আরো দুর্ভেদ্যভাবে ঘেরাও করে রাখেন।

হযরত উম্মে আন্নারা নামের এক আনসার মহিলা সেদিন সকালে একটি মোশক নিয়ে রণাঙ্গনে আসেন। তিনি রণাঙ্গনে ঘুরে ঘুরে মুসলিম বাহিনীকে পানি পান করাতেন। যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হলে তিনি মোশক ফেলে তরবারি হাতে তুলে নেন। কুরাইশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর নিকট তীরও ছিল। সময় মতো তিনি তার সদ্যবহার করেন। এভাবে তিনি মহানবী (সা)-এর নিরাপত্তা বিধানে অংশগ্রহণ করে আহত হন।

হযরত আবু দুজানা (রা) মহানবী (সা)-এর নিরাপত্তার জন্য নিজেকে ঢাল হিসেবে উৎসর্গ করেন। যেসব তীর মহানবীর দিকে ছুটে আসত তিনি সেগুলো পিঠ পেতে নিতেন। হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস মহানবী (সা)-এর পাশে দাঁড়িয়ে শত্রুর দিকে অবিরাম তীরবর্ষণ করছিলেন। মহানবী (সা) নিজ হাতে তাঁকে তীর দিতেন এবং মুখে বলতেন, “হে সাআদ! তোমার জন্য আমার পিতামাতা কোরবান হোক। এই তীর নাও এবং কাফেরদের দিকে অকাতরে ছুড়ে মার।” হযরত সাআদের আসার আগে মহানবী (সা) নিজেই কাফেরদের দিকে তীর ছুঁড়ছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর ধনুকের গুণ ছিঁড়ে যায়।

মহানবী (সা)-এর শাহাদাত সম্পর্কে যারা বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)-ও ছিলেন। এই গুজব শোনার পর তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে পাহাড়ের এক কোণে গিয়ে বসে পড়েন। হযরত আনাস ইবনে নযর (রা) এভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা বসে আছেন কেন? তাঁরা বললেন, “মহানবী (সা)-এর শাহাদাতের খবর শুনে আমরা হতাশ হয়ে পড়েছি।” হযরত আনাস (রা) বললেন, “সত্যি যদি মহানবী (সা) শাহাদাতবরণ করে থাকেন, তাহলে আমরা বেঁচে থেকে কি করব। চলুন, যে মহান লক্ষ্য অর্জনের পথে মহানবী (সা) শাহাদাতবরণ করেছেন, আমরাও সে পথে আমাদের জীবন উৎসর্গ করি।” এরপরই তাঁরা তিনজন শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। হযরত আনাস (রা) যুদ্ধ করে শত্রুর ব্যুহে ঢুকে পড়েন। এক পর্যায়ে শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর দেহ এত ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল যে, শনাক্ত করা মুশকিল হয়ে পড়ে। অবশেষে তাঁর বোন এসে আঙ্গুলের একটি চিহ্ন দেখে তাঁকে শনাক্ত করেন।

মহানবী (সা)-এর শাহাদাতের কথা শুনে কুরাইশরা আনন্দে আটখানা হয়ে পড়ে। এমনকি কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান নিহতদের মধ্যে মহানবী (সা)-কে খোঁজ করা শুরু করেন। যেসব সাহাবী মহানবী (সা)-এর নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিলেন, তাঁরা ইচ্ছা করেই তাঁর শাহাদাতের গুজব প্রত্যাখ্যান করেননি। তাঁদের আশংকা ছিল এ খবর শুনলে কুরাইশরা হয়তো আবার আক্রমণ করে বসতে পারে। এ সময় হযরত কাআব ইবনে মালেক হযরত আবু দুজানার বাহিনীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর এই বাহিনী মহানবী (সা)-কে ঘিরে রেখেছিলেন। হযরত কাআব আর একটু আগে বাড়তেই মহানবী (সা)-কে দেখতে পান। শিরস্ত্রাণের ভিতরে মহানবী (সা)-এর পবিত্র দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছিল। তিনি নবী (সা)-কে চিনে ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সজোরে চিৎকার করে উঠেন, “হে মুসলমানগণ! আমাদের প্রিয়নবী এখানে আছেন।” মহানবী (সা) ইঙ্গিত করে হযরত কাআবকে বারণ করেন। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা হযরত কাআবের কণ্ঠধ্বনি শুনে ফেলেন। তাঁরা বিদ্যুতবেগে মহানবী (সা)-এর নিকট এসে পৌঁছান। এ সময় মহানবী (সা)-কে এক পর্বত চুড়ায় নিয়ে আসা হয়। সাহাবীরা মহানবী (সা)-কে ঘিরে রাখেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত আলী এবং হযরত যোবায়র ইবনে আওয়াম (রা)-ও ছিলেন। মহানবী (সা)-এর শাহাদাতের খবর কুরাইশদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করছিল না। তারা মনে করত এটা মুসলমানদের একটা চাল। মুসলমানদের যুদ্ধে আরো তীব্র গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এ গুজব ছড়ানো হয়েছিল বলে তারা মনে করত। এবার তাদের অনেকে হযরত কাআব (রা)-এর ঘোষণাও শুনে ফেলে। তারা মহানবীর জীবনকে নিজেদের মৃত্যুর পরোয়ানা বলে মনে করত। হযরত কাআবের ঘোষণামাত্র কুরাইশ সেনাপতি উবাই ইবনে খালফের নেতৃত্বে মহানবীর অবস্থানের উপর পুনরায় আক্রমণ করে বসে। উবাই ইবনে কাআব এগিয়ে এসে বলে, “(হযরত) মুহাম্মদ (সা) কোথায়? তিনি এখনো জীবিত থাকলে আমি তাঁকে জীবিত রাখব না।” মহানবী (সা) হযরত হারেছের বর্শা নিজ হাতে নিয়ে উবাইর দিকে ছুঁড়ে মারেন। উবাই ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। পুনরায় সে কোন রকমে ঘোড়ায় আরোহণ করে যেদিক থেকে এসেছিল আবার সে পথে ফিরে যায়। মক্কায় ফেরার পথে সে রাস্তায় প্রাণ ত্যাগ করে।

এদিকে হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা) নিজের ঢালে করে পানি নিয়ে আসেন। তিনি মহানবী (সা)-এর গণ্ডদেশের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করেন। অবশিষ্ট পানি মহানবী (সা)-এর মাথায় দেন। হযরত আবু উবায়দা রাসূলের পবিত্র গণ্ডদেশে বিদ্ধ শিরস্ত্রাণের কড়া দুটো টেনে বের করেন। এর ফলে মহানবী (সা)-এর সামনের দুটো পবিত্র দাঁতও বেরিয়ে আসে।

মুসলমানদের এমনি ব্যস্ত দেখে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ আরেকবার আক্রমণ করেন। হযরত ওমর (রা) অন্যান্য মুসলমানদের নিয়ে এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু মুসলমানরা এখান থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। এবার তাঁরা উহুদের এক সুউচ্চ পর্বত চুড়ায় পৌঁছান। মহানবী (সা) অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বসে যোহরের নামায আদায় করেন। সাহাবীরাও তাঁর অনুসরণে বসে নামায আদায় করেন।

কুরাইশরা এই বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। তারা ভাবতে থাকে, “আমরা যুদ্ধে নিহতদের প্রতিশোধ মুসলমানদের উপর নিতে সক্ষম হয়েছি। খুশীর এই আবেগে আবু সুফিয়ান উচ্চকণ্ঠে বলে উঠেন, “আজ আমরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ তোমাদের উপর পুরোপুরি নিয়েছি। আগামী বছর আরেকবার তোমাদের সাথে আমাদের বোঝাপড়া হবে।” এই বিজয় আর পিতার হস্তা হামযার শাহাদাতের পরও আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার উত্তেজনা প্রশমিত হয়নি। সে তার আক্রোশ মিটানোর জন্য অন্ধকার যুগের এক ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে। শহীদ মুসলমানদের নাক, কান কেটে নিজের গলার হার তৈরি করে। তাতেও তার আক্রোশ দমেনি। সে হযরত হামযার লাশ বের করে আনে এবং তাঁর কলিজা বের করে চিবায়। কিন্তু গলধকরণ করতে পারেনি। বমি করে ফেলে দেয়। শুধু তাই নয়, সে এবং তার সহগামী অপর ষোলজন কুরাইশ মহিলা মুসলিম মৃতদেহগুলোর আরো নানাভাবে অপমান করে। এসব মহিলার সাথে কুরাইশ পুরুষরাও এই অমানুষিক কাজে যোগ দেয়। অবশ্য আবু সুফিয়ান তাতে অংশগ্রহণ করেনি। সে বলেছে, “আমি এই কাজের প্রতি কাউকে উৎসাহও দেইনি এবং অপছন্দও করিনি।” এমনকি আবু সুফিয়ান একজন মুসলমানকে দেখে বলেছিল, “আমাদের লোকেরা তোমাদের নিহতদের অঙ্গহানি করেছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তাদের এই কাজে সন্তুষ্টও হইনি এবং অসন্তুষ্টও হইনি। এরূপ আচরণ করার জন্য আমি কাউকে নির্দেশ দেইনি এবং নিষেধও করিনি।”

কুরাইশরা তাদের মৃতদের দাফন করে মক্কায় রওয়ানা দেয়। এরপর মুসলমানরা তাদের শহীদদের লাশ সংগ্রহের জন্য রণাঙ্গনে আসেন। মহানবী (সা) তাঁর চাচা হযরত হামযার লাশ খুঁজছিলেন। তিনি দেখতে পান তাঁর লাশের পেট চিরা এবং নাক-কান কাটা। এই দৃশ্য দেখে তিনি বুকে হাত দিয়ে বসে পড়েন। মহানবী (সা) বলেন, “আল্লাহ তা‘আলা যেন আমাকে পুনরায় এরূপ ব্যথিত আর না করেন। এ পর্যন্ত আর কখনো আমি এরূপ ব্যথিত হইনি।” তিনি আরো বলেন, “আল্লাহ তা‘আলা যদি আমাকে তাদের উপর জয়যুক্ত করেন, তাহলে আমি তাদের মৃতদেহগুলোর এমনভাবে অঙ্গহানি করব, যা আরবে কখনো কেউ দেখেনি।” রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই মন্তব্য প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ - وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ

لِّلصَّابِرِينَ . وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ - وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ .

“যদি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য এটাই তো উত্তম। ধৈর্য ধারণ কর। তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহরই সাহায্যে। ওদের আচরণে দুঃখ করো না এবং ওদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না।” (১৬ : ১২৬-১২৭)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী (সা) নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করেন। তিনি সাহাবীদেরও সতর্ক করে দেন, তাঁরা যেন কখনো মৃতদের অঙ্গহানি না করেন।

উহুদের শহীদদের দাফন

মহানবী (সা) হযরত হামযা (রা)-এর কাফন হিসাবে নিজের পবিত্র চাদর ব্যবহার করেন। তিনি তাঁর জানাযা পড়েন। ইতিমধ্যেই হযরত হামযার বোন হযরত সাফিয়া (রা) ভাইয়ের শহীদ হওয়ার খবর শুনে ছুটে আসেন। তিনি হযরত হামযার মৃতদেহের এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত মর্মান্ত হন। অবশেষে মাগফেরাত কামনা করে দোয়ার পর হযরত হামযাকে দাফন করা হয়। উহুদ যুদ্ধে সত্তরজন মুসলমান শাহাদাতবরণ করেন। অন্যান্য শহীদকেও উহুদ রণাঙ্গনেই দাফন করা হয়। অতঃপর মহানবী (সা) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

মদীনায় ফিরে তিনি নানা কারণে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবলেন, মদীনার ইহুদী, মুনাফিক ও মুশরিকরা হয়তো আমাদের পরাজয়ে খুশী হয়েছে। কখনো ভাবলেন, কাল পর্যন্তও মদীনায় কোন লোক মুসলমানদের সামনে ধৃষ্টতা দেখাতে পারত না। আর এখন সে প্রভাব কি অক্ষুণ্ণ থাকবে? মদীনা থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ না করায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার দলবল নিয়ে ফিরে আসে। মহানবী (সা) ভাবলেন, আমি কেন তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করলাম না। সে হয়তো তার মিত্র ইহুদীদের শহর থেকে বের করে দেয়ার প্রশ্নটিও উঠাবে। তিনি আরো ভাবলেন, উহুদে পরাজয় বরণের পর মুসলমানরা যদি নীরব হয়ে যায়, তাহলে আমি ও আমার অনুসারীরা সবাই আরবদের চোখে খাটো হয়ে যাব। মদীনায় আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ভুলুপ্তি হবে। কুরাইশরা সারাদেশে দূত পাঠিয়ে মানুষের নিকট আমাদের খুব হেয় করবে। সারা আরবে আমাদের অপমানিত করবে। এসব অপপ্রচারে আমাদের বিরুদ্ধে মুশরিক ও পৌত্তলিকদের সাহস বেড়ে যাবে। এসব চিন্তা করে মহানবী (সা) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যে করে হোক উহুদ রণাঙ্গনে মুসলমানদের এই পরাজয়ের কালিমা মুছে ফেলতেই হবে। পুনরায় মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে ইহুদী ও মুনাফিকদের সাহস বৃদ্ধি না পায়। মুসলমানরা মান-সম্মান নিয়ে মদীনায় বসবাস করতে সক্ষম হয়।

কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবন

উহুদ যুদ্ধের পরদিনই মহানবী (সা) ঘোষণা করেন, মুসলমানদেরকে কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। যাঁরা উহুদে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদেরকেই এই অভিযানে যেতে হবে। মহানবী

(সা)-এর নির্দেশ পাওয়া মাত্র উহদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবাই পুনরায় মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়েন। তাঁরা কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। মহানবী (সা) সাহাবীদের নিয়ে মদীনা থেকে আট মাইল দূরে হামরাউল-আসাদ নামক স্থানে পৌঁছান। এ সময় আবু সুফিয়ান আরো কয়েক মাইল আগে 'রাওহা' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছিল। সেও মুসলমানদের হামরাউল আসাদ পর্যন্ত আসার খবর শুনল। মা'বাদ খোযায়ী নামক এক ব্যক্তি হামরাউল আসাদ হয়ে রাওহায় যান। সে তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি। আবু সুফিয়ান এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। মা'বাদ বললেন, “(হযরত) মুহাম্মদ (সা) এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আসছেন। এ পর্যন্ত এত বিরাট সৈন্য সমাবেশ আর কখনো দেখা যায়নি। এই বাহিনীতে উহদে অংশগ্রহণকারী ছাড়া নতুন সৈন্যও রয়েছে। প্রতিশোধ গ্রহণের আবেগে তারা নাজ্জা তলোয়ার নিয়ে পথ চলছে।” এ কথা শুনার পর আবু সুফিয়ানকে দৃষ্টিভ্রান্ত পেয়ে বসে। কখনো তিনি ভাবেন, উহদ রণাঙ্গনে বিজয়ের পর এখন পুনরায় (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর মোকাবেলায় না যাওয়াই ঠিক হবে। কারণ এবার যদি হেরে যাই, তা'হলে সারা আরব, বিশেষ করে সঙ্গী-সাথীরাই আমাকে তিরস্কার করবে। তিনি এ কথাও ভাবেন, এবার যদি যুদ্ধে হেরে যাই, তা'হলে কুরাইশরা আর কখনো এই ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না। অবশেষে আবু সুফিয়ান একটি কূটনীতি চালেন। তিনি মদীনাগামী আবদুল কায়েস গোত্রের একটি বাণিজ্য কাফেলার মাধ্যমে মহানবী (সা)-কে হুমকি প্রদর্শন করেন। তাঁরা হামরাউল-আসাদে পৌঁছে মহানবী (সা)-কে বলেন, আবু সুফিয়ান ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। এ কথা শুনেও মহানবী (সা) এতটুকু দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। তিনি সেখানে অটল-অনড় হয়ে অবস্থান করেন। কুরাইশদের নিকট নিজেদের দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রকাশ করার জন্য তিনি এক বিরাট অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে রাখেন। তিন দিন পর্যন্ত এই অগ্নিশিখা জ্বলতে থাকে। আবু সুফিয়ানও তা রাওহা থেকে দেখতে পায়। এই আলো দেখে তিনিও দ্বিতীয়বার সংঘর্ষের সাহস হারিয়ে ফেলেন। তারা মক্কায় ফিরে যাওয়াই নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করেন। আবু সুফিয়ান দলবল নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রাওহা ত্যাগ করেন।

কুরাইশদের চলে যাওয়ার পর মহানবী (সা) মদীনায় ফিরে আসেন। মুসলমানদের এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে উহদে তাদের পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া অনেকটা প্রশমিত হয়। তা সত্ত্বেও মোনাফেকরা হেসে হেসে বলত, “বদরযুদ্ধে বিজয় যদি (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের প্রমাণ হয়ে থাকে, উহদে পরাজয়বরণ কিসের ইঙ্গিত করছে?”

উহুদ যুদ্ধের পরিণাম

উহুদ যুদ্ধের পর

কুরাইশ বাহিনী মক্কায় পৌঁছার আগেই মুসলমানদের পরাজয়ের খবর সেখানে পৌঁছে যায়। তার ক'দিন পর আবু সুফিয়ান বিজয়ীর গর্ব নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। তার সবচাইতে বড় আনন্দ ছিল, উহুদে বিজয়ের মাধ্যমে কুরাইশরা বদরে তাদের পরাজয়ের গ্লানি দূর করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি প্রথমে কাবাঘরে প্রবেশ করেন। সেখানে 'হোবল' দেবতার প্রশংসাকীর্তন করেন। এরপর তিনি পৌত্তলিকতার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কানের উপরের বাড়তি চুল কাটেন। বদর যুদ্ধের পর শপথ করেছিলেন, নিহতদের প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত তিনি স্ত্রী-সহবাস করবেন না। এবার প্রতিশোধ নিয়েছেন। তাঁর শপথ বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি আনন্দে আটখানা হয়ে নিজের বাসস্থানে প্রবেশ করেন।

এদিকে মুসলমানরা মদীনায় ফিরে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো দেখতে পান। তাঁরা নানা কথা শুনতে পান। অথচ তাঁরা উহুদ যুদ্ধের পর কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবন করেছেন। হামরাউল আসাদে তিনি দিন পর্যন্ত অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছেন। শত্রুপক্ষও তা দেখতে পেয়েছে। তারা এগিয়ে এসে মোকাবেলা করার সাহস পায়নি। তা'ছাড়া উহুদ রণাঙ্গনে প্রথম বিজয় মুসলমানদের হয়েছে। এরপরও মুসলমানদেরকে মদীনায় বসবাসকারী শত্রুদের নানা বিদ্রূপ উক্তি সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তখনো শহরে মহানবী (সা)-এর ক্ষমতা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তা'সত্ত্বেও মহানবী (সা) পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। তিনি আশংকা করেন, মদীনা ও তার বাইরে বসবাসকারী অনুগত আরব গোত্রগুলো হয়তো মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। এভাবে যাতে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য তিনি গোপনে এসব গোত্রের খবরাখবর নেয়ার ব্যবস্থা করেন।

বনী আসাদ গোত্রে অভিযান

উহুদ যুদ্ধের দুই মাস পর মহানবী (সা) জানতে পারেন, বনী আসাদ গোত্রের নেতা তোলায়হা ইবনে খোয়ায়লিদ ও সালামাহ ইবনে খোয়ায়লিদ মদীনা আক্রমণ করার জন্য নিজ নিজ গোত্র প্রস্তুত করছে। তাদের এই আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদের গবাদি পশুসহ মালামাল লুট করা। বনী আসাদ গোত্রের এই দুঃসাহসের কারণ হলো, তারা মনে করেছে, উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা তাঁদের শক্তি-সামর্থ্য খুইয়ে ফেলেছেন। এখন তাঁরা আর প্রতিরোধই করতে পারবেন না। এই খবর পেয়েই মহানবী (সা) হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুল

আসাদের নেতৃত্বে দেড়শ' মুসলিম মুজাহিদকে বনী আসাদ গোত্রে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। এসব মুজাহিদের মধ্যে হযরত আবু উবায়দা, হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও হযরত উসায়দ ইবনে হোযায়ের (রা)-এর মতো বিশিষ্ট সাহাবীও ছিলেন। মহানবী (সা) এই অভিযানের পতাকা নিজ হাতে তৈরি করেন। রওয়ানা দেয়ার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলেন, “তোমরা রাতে সফর করবে। দিনে কোন নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে থাকবে। রাতেও যাতে কোন পথিক দেখে না ফেলে তার জন্য রাজপথ এড়িয়ে চলবে। শত্রুর উপর আকস্মিক হামলা চালাবে।”

এই বাহিনীর সেনাপতি হযরত আবু সালামা (রা) মহানবী (সা)-এর উপদেশ কঠোরভাবে পালন করেন। একদিন সকালে তাঁরা বনী আসাদ গোত্রে আকস্মিক আক্রমণ করেন। প্রতিপক্ষ মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেনি। তারা বাসস্থান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। হযরত আবু সালামা তাঁর বাহিনীর দু'টি দলকে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে পাঠিয়ে দেন। নিজে সেখানেই অপেক্ষা করেন। কিছুক্ষণ পর মুসলিম বাহিনী বনী আসাদ গোত্রের কয়েকজন ব্যক্তিসহ মালসামান হস্তগত করে ফিরে আসে। তিনি গনীমতের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে মহানবী (সা), বিত্তহীন ও মুসাফিরদের জন্য রেখে দেন। অবশিষ্ট সম্পদ অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সেখানেই বন্টন করে দেন। অতঃপর তাঁরা মদীনা ফিরে আসেন। সেই অভিযানে মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি পায়। উহুদের পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া বেশ কিছুটা লাঘব হয়। কিন্তু এই অভিযানের নেতৃত্বদানকারী হযরত আবু সালামা (রা) কিছুদিনের মধ্যে ইন্তেকাল করেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। ক্ষত পুরোপুরি না শুকাতেই তাঁকে এই অভিযানে যেতে হয়। দৌড়াদৌড়িতে ক্ষত আরো বেড়ে যায়। আর তাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

খালিদ হযালী

উপরোক্ত অভিযানের পর মহানবী (সা) জানতে পারেন, নাখলা নামক স্থানে হযালী গোত্রের খালিদ ইবনে সুফিয়ান মদীনা আক্রমণের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছে। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনায়সা (রা)-কে এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ছদ্মবেশে খালিদের নিকট পৌঁছান। এ সময় সে তার কয়েকজন স্ত্রীকে নিয়ে তাদের জন্য তাঁবু স্থাপনের উদ্দেশ্যে জায়গা নির্বাচন করছিল। হযরত আবদুল্লাহকে দেখে খালিদ বলল, “আপনি কে?” তিনি বললেন, “আমি একজন আরব। আমি শুনেছি আপনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করছেন। এই খবর পেয়ে আমি আপনার নিকট এসেছি।” খালিদ তার পুরো পরিকল্পনা হযরত আবদুল্লাহর নিকট উল্লেখ করে বলে, “আপনি ঠিকই খবর পেয়েছেন।” হযরত আবদুল্লাহ দেখলেন, খালিদের সাথে কোন পুরুষ নেই। তিনি তার সাথে সামান্য সময় এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করলেন। এরপর সুযোগ মতো খালিদকে হত্যা করে ফেলেন। খালিদের স্ত্রীরা তার মৃতদেহের উপর লুটিয়ে পড়ে কান্নাকাটি শুরু করে। এই সুযোগে হযরত আবদুল্লাহ কেটে পড়েন। তিনি মদীনা পৌঁছে মহানবী (সা)-কে ঘটনা বিস্তারিত খুলে বলেন।

নিহত খালিদ ইবনে সুফিয়ানের ছায়ায়লী গোত্র এই ঘটনার পর কিছুদিন নীরব থাকে। এরপর তারা এই খুনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এক ষড়যন্ত্র আঁটে। নিহত খালিদের গোত্রের প্রতিবেশী ছিল বনী লিহইয়ান গোত্র। তারা ছিল খালিদের বন্ধুগোত্র। এই গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় আসে। তারা মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, “আমরা মুসলমান হয়েছি। আমাদের গোত্রে কয়েকজন মুসলমান পাঠিয়ে দেন। তারা আমাদেরকে শরীআতের বিধান ও পবিত্র কোরআন শিক্ষা দান করবেন।” মহানবী (সা)-এর অভ্যাস ছিল কোন লোক তাঁর নিকট এ ধরনের আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করতেন না। তাঁর লক্ষ্য ছিল এভাবে ধর্মীয় শিক্ষাদানের মাধ্যমে বিভ্রান্ত আরবদের সংপথে আনা যাবে। আস্তে আস্তে ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শত্রুর সংখ্যা হ্রাস পাবে। অতীতে আকাবার বায়আতের সময় ইয়াসরিবে আউস ও খায়রাজ গোত্রের লোকদের অনুরোধে মহানবী (সা) সেখানে ধর্মীয় শিক্ষা দানকারী পাঠিয়েছিলেন।

রাজীর ঘটনা

বনু লিহইয়ান গোত্রের প্রতিনিধিদের অনুরোধে মহানবী (সা) ছয়জন সাহাবীকে তাদের সঙ্গে দেন। হিজাযের রাজী নামক স্থানে পৌঁছে বনী লিহইয়ান গোত্রের প্রতিনিধিরা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা ছায়ায়ল গোত্রীয় লোকদের চিৎকার করে ডাকে। ছায়ায়লরা চারদিক থেকে ছুটে এসে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে। এই পরিস্থিতি দেখে মুসলমানরাও তরবারি বের করে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়। ছায়ায়লরা মুসলমানদের বলে, “আমরা তোমাদের হত্যা করব না। তবে তোমাদেরকে মক্কার কুরাইশদের নিকট হস্তান্তর করতে চাই।” মুসলমানরা ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মক্কার শত্রুদের হাতে বন্দী হওয়ার চাইতে এখানে সংগ্রাম করে জীবন দেয়াই উত্তম। তারা ছায়ায়লদের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং তরবারি চালানো শুরু করে। ছায়ায়লদের হাতে তিনজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। অপর তিনজন মুসলমানকে বন্দী করে তারা মক্কার দিকে রওয়ানা দেয়। পথে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তারিক (রা) কাফেরদের হাত থেকে বেরিয়ে যান। তারা তাঁর পিছনে ছুটলে তিনি তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে যান। কিন্তু কাফেররা মোকাবেলা না করে পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করে। কাফেরদের পাথরের আঘাতে আঘাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তারিক শাহাদাত বরণ করেন। ছায়ায়লরা অপর দু’জন বন্দীকে মক্কায়ে নিয়ে যায়। হযরত যায়েদ ইবনে দাছনা বদর রণাঙ্গনে কুরাইশ নেতা উমাইয়া ইবনে খাল্ফকে হত্যা করেছিলেন। উমাইয়ার ছেলে সাফওয়ান পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হযরত যায়েদ ইবনে দাছনাকে খরিদ করে। সাফওয়ান তার ক্রীতদাস নাসতাসের নিকট হযরত যায়েদকে হত্যা করার জন্য দিয়ে দেয়। নাসতাস হযরত যায়েদকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে আবু সুফিয়ানের সাথে দেখা হয়। আবু সুফিয়ান হযরত যায়েদকে বলে, “আমরা তোমার পরিবর্তে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করব। তুমি আপনজনদের মধ্যে সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। আমাদের এই সিদ্ধান্ত কি তুমি গ্রহণ করবে। হযরত যায়েদ বললেন, “আল্লাহর শপথ করে বলছি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন ক্ষতি হবে আর আমি সুখে-শান্তিতে নিজ ঘরে জীবনযাপন করব, এই কথা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।” এ সময় আবু সুফিয়ান বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, “আমি (হযরত)

মুহাম্মদ (সা)-এর বন্ধুদের চাইতে একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ আর কোন লোকের সাক্ষাত পাইনি। নাসতাস হযরত যায়েদ (রা)-কে হত্যা করে ফেলেন। হযরত যায়েদ ইসলাম ও ইসলাম প্রবর্তকের ভালবাসায় অত্যন্ত হাসিমুখে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত খোবায়ের (রা)-এর শাহাদাত

হযরত খোবায়েরকে মক্কার কাফেররা কয়েকদিন বন্দী করে রাখে। এরপর তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারার জন্য নিয়ে যায়। হযরত খোবায়ের দু'রাকাআত নামায পড়ার জন্য কাফেরদের নিকট থেকে অনুমতি নেন। তিনি দু'রাকাআত নামায আদায় করার জন্য কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেন, “আল্লাহর শপথ করে বলছি! আমার সম্পর্কে তোমাদের যদি এরূপ কুধারণা না হতো যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায বিলম্ব করছি, তাহলে নামাযের উঠাবসায় আমি আরো সময় নিতাম।” কাফেরদের এক পাপিষ্ঠ হযরত খোবায়েরের গলায় ফাঁসির রশি লাগানোর জন্য উদ্যত হয়। হযরত খোবায়ের তুচ্ছস্বরে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেন, “হে আল্লাহ! তুমি তাদের প্রত্যেককেই এজন্য শাস্তি প্রদান করো। ছিঁড়ে যাওয়া তাসবীহ দানার মতো তারা যেন সবাই বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের কেউ যেন প্রাণ নিয়ে বাঁচতে না পারে।” হযরত খোবায়েরের মুখে এই অভিশাপ শুনে কাফেররা ঘাবড়ে যায়। ঐশী শাস্তির ভয়ে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। শাস্তির ভয়ে কাফেররা সবাই কাত হয়ে মাটিতে গুয়ে পড়ে। আবার কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেদের সামলে নেয়। তারা হযরত খোবায়েরের গলা থেকে ফাঁসির রশি খুলে নেয়। এরপর তারা তাকে হত্যা করে। বন্ধু হযরত যায়েদ ইবনে দাছনার মতো হযরত খোবায়েরও ধর্মের জন্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর ভালবাসায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন, শাহাদাতবরণ করলেন।

হযরত খোবায়ের ও হযরত যায়েদ ধর্মচ্যুতির বিনিময়ে জীবনরক্ষার পুরোপুরি সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা তা গ্রহণ করেননি। ইহজীবনের পর পরকাল এবং হিসাব-কিতাবের প্রতি তাঁদের অগাধ আস্থা। হযরত যায়েদ ও খোবায়ের (রা) মৃত্যুকে তাঁদের প্রতি দৌড়ে আসতে দেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। একদিন না একদিন ইহজীবন ত্যাগ করতে হবে। এ থেকে অব্যাহতি নেই। সুতরাং আল্লাহর দীনের জন্য এবং তাঁর ভালবাসায় এ জীবন ত্যাগ করাই সবচাইতে উত্তম। তাদের আরো বিশ্বাস ছিল, “আমাদের এই রক্ত কখনোই বৃথা যাবে না। আমাদের ধর্মীয় সাথীরা একদিন না একদিন বিজয়ীর বেশে অত্যন্ত শান-শওকতে মক্কায প্রবেশ করবেন। তারা মক্কাকে পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করবেন। এই কা'বাঘর থেকে সকল দেব-দেবীর মূর্তি ছুঁড়ে ফেলে দিবেন। এরপর এই ঘরে আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা হবে না।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, বদরের দুইজন যুদ্ধবন্দী নযর ইবনে হারেছ ও উকবা ইবনে মুঈত মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়ায় প্রাচ্যবিদদের তোলপাড়ে আকাশ-বাতাস একাকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মক্কাবাসীরা হযরত যায়েদ ও হযরত খোবায়েরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই ঘটনা সম্পর্কে নিরপেক্ষতার দাবিদার প্রাচ্যবিদদের কলমটি পর্যন্ত নড়েনি। অথচ হযরত যায়েদ ও হযরত খোবায়ের (রা) যুদ্ধবন্দীও ছিলেন না। বরং তাঁরা প্রতারণার শিকার হন। মহানবী (সা)-এর নির্দেশে তাঁদের বনী লিহইয়ান গোত্রের শিক্ষক হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের

চারজনকে ছায়েলরা হত্যা করে এবং দুইজনকে মক্কার কুরাইশদের নিকট বিক্রি করে দেয়। মক্কাবাসীরা তাঁদের অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে। প্রাচ্যবিদদের উচিত ছিল, এই দুইজন মুসলিম শহীদ সম্পর্কেও নিরপেক্ষতার পরিচয় দেয়া। কিন্তু তারা তা করেননি। তারা শুধু নয়র ও উকবা সম্পর্কেই কলমের ঝড় উঠিয়েছেন। মুসলিম শহীদদের সম্পর্কে একটি শব্দও লেখেননি। এ হলো প্রাচ্যবিদদের তথাকথিত নিরপেক্ষতার পরিচয়।

ছায়েল গোত্র কর্তৃক প্রতারণার মাধ্যমে উক্ত ছয়জন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে মুসলমানরা অত্যন্ত মর্মান্ত ও ব্যথিত হন। সাহাবীদের মধ্যে হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রা) শহীদ হযরত খোবায়ের ও হযরত য়ায়েদ (রা) সম্পর্কে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী শোকগাঁথা রচনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি এই ভেবে আরো চিন্তিত হন যে, আরবরা এই ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে যদি মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে আমাদের জন্য এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

মাউনা কূপের ঘটনা

চতুর্থ হিজরীতে কিলাব গোত্রের সরদার আবুল বারা আমের ইবনে মালেক মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। নবী (সা) তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। সে এই আহ্বান গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান কোনটাই করেনি। সে বলে, “আমি ইসলামের শত্রু নই। আপনি আমার সঙ্গে একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল নজদ অঞ্চলে পাঠিয়ে দিন। তাঁরা সেখানে ইসলাম প্রচার করবেন। আমি আশা করি তাঁদের প্রচারের মাধ্যমে সেখানকার অধিবাসীরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করবেন।” এদিকে ছায়েলদের পৈশাচিক কাণ্ড তখনো মুসলমানরা ভুলতে পারেননি। তাই মহানবী (সা) আবুল বারার অনুরোধ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করলেন না। আবুল বারা পুনরায় অনুরোধ করল, “আপনি ইসলাম প্রচারের জন্য প্রতিনিধি দল পাঠান। আমি তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করছি।” আবুল বারা তার গোত্রে অত্যন্ত প্রভাবশালী লোক ছিল। সে কাউকে নিরাপত্তা প্রদান করলে তার উপর কারো হাত তোলার সাহস হতো না। এ দিক লক্ষ্য করে মহানবী (সা) হযরত মুনযের ইবনে আমরের নেতৃত্বে চল্লিশ কিংবা সত্তর জন মুসলমানের একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন করেন। তিনি তাঁদের আবুল বারার সঙ্গে নাজদ এলাকায় পাঠিয়ে দেন। প্রতিনিধি দলটি বী'রে মাউনা বা মাউনা কূপের নিকট পৌঁছান। এটি বনী আমের ও বনী সালিম গোত্র যে এলাকায় বসবাস করত এই কূপটি ছিল তার অদূরে। সেখানে পৌঁছে মুসলিম প্রতিনিধিদলের লোকেরা মহানবী (সা)-এর লেখা একটি চিঠি হযরত হারাম ইবনে মালহানের মাধ্যমে বনী আমের গোত্রপতি আমের ইবনে তোফায়েলের নিকট পাঠিয়ে দেন। আমের চিঠিটি খুলেওনি। সে পত্রবাহক হযরত হারাম ইবনে মালহানকে হত্যা করে ফেলে। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের হত্যা করার জন্য সে আবুল বারার গোত্রকেও ডাকে। কিন্তু আবুল বারা মুসলমানদের নিরাপত্তা দেয়ায় তার গোত্র কোন প্রকার সাহায্য করতে অস্বীকার করে। এরপরও আমের ইবনে তোফায়েল স্থানীয় অন্যান্য গোত্রকে একত্রিত করে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে। এ অবস্থা দেখে মুসলমানরাও মোকাবেলার জন্য তৈরি হন। প্রতিপক্ষের সাথে সংগ্রাম করে সত্তর জন মুসলমানের মধ্যে দু'জন ছাড়া সবাই শাহাদাত বরণ করেন। হযরত কাআব ইবনে য়ায়েদকে মৃত মনে করে ফেলে রাখা হয়। এক সুযোগে তিনি

সেখান থেকে পালিয়ে নিরাপদে মদীনায় পৌঁছেন। হযরত আমর ইবনে উমাইয়া জোমেরীকে বন্দী করা হয়।

জোমেরী গোত্রের লোক জানতে পেয়ে তাঁকে হত্যা করা হয় না। তাঁকে আমের ইবনে তোফায়েল নিজের দাস বানিয়ে রাখে। আমেরের মায়ের একটি দাসমুক্তি করার মানত ছিল। হযরত আমর ইবনে উমাইয়াকে মুক্ত করে সে মানত পূরণ করা হয়।

হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রা) মদীনা রওয়ানা হন। কারকারা নামক স্থানে এসে তিনি একটা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেন। মদীনার দিক থেকে দু'জন লোক আসছিল। তারাও সেখানে এসে বসে। হযরত আমর (রা) জানতে পারেন, এই দুটি লোক কিলাব গোত্রের। তাদের নেতা আবুল বারাই মুসলমানদের নজদে নিয়ে গিয়েছিল। তারা ঘুমিয়ে পড়লে হযরত আমর (রা) তাদের হত্যা করেন। তিনি মদীনা পৌঁছে মহানবী (সা)-এর নিকট সব ঘটনা খুলে বলেন। তাতে তিনি জানতে পারেন, নিহত লোক দুটি ছিল আবুল বারার গোত্রের। আর আবুল বারার সাথে মহানবী (সা)-এর মৈত্রী চুক্তি ছিল। এ দিক থেকে লোক দুটি মহানবী (সা)-এর নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ছিল। এজন্য তাদের রক্তপাতের মূল্য দিতে হয়। মহানবী (সা) তা দিয়ে দেন।

বী'রে মাউনা বা মাউনা কূপের ঘটনায় মহানবী (সা) আরো দুঃখিত হন। তিনি বলেন, “এই মর্মান্তিক ঘটনা আবু বারার কূটচক্রান্তেরই পরিণতি। প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিল। তাই আমি তার প্রস্তাব গ্রহণে রাযী ছিলাম না।” এদিকে আবুল বারার আমের ইবনে তোফায়েলের এই পাশবিক কাজে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। সে বলে, “আমার নিরাপত্তা প্রদানে হস্তক্ষেপ করে আমের আমার মান-সম্মান সব শেষ করে ফেলেছে।” এই অভিযোগে আবুল বারার ছেলে রবী'আর মাধ্যমে আমেরকে শেষ করে দেয়।

এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য মহানবী (সা) ফজর নামাযের পর দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অনবরত দোয়া করতে থাকেন। দোয়ায় তিনি বলতেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই ঘটনার প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি দান করো।” মুসলমানরাও তাঁদের সাথীদের এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে অত্যন্ত দুঃখিত হন। কিন্তু তাদের এই বিশ্বাসও ছিল যে, বী'রে মাউনার ঘটনায় তাঁদের নিহত সাথীরা শাহাদাত বরণ করেছেন। এজন্য তাঁরা বেহেশত লাভ করেছেন।

মদীনার মোনাফেক ও ইহুদী

মুসলমানদের প্রতিটি বিপদে মদীনার ইহুদী ও মোনাফেকরা অত্যন্ত খুশী হতো। উদ্ভদের পর মাউনা কূপের ঘটনায় তারা আরো আনন্দিত হয়। রাযী এবং মাউনা কূপের ঘটনায় মদীনার ইহুদী ও মোনাফেকদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের প্রভাব কিছুটা হ্রাস পায়। আর সে যুগে মদীনাবাসীদের নিকট মুসলমানদের প্রভাব হ্রাস পাওয়া ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত ভয়ের কারণ। কারণ মদীনার আশেপাশের আরব গোত্রগুলো যদি জানতে পারত যে, মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ রয়েছে, তাহলে তারা অবশ্যই মুসলমানদের আক্রমণ করে বসত। এরূপ পরিস্থিতিতে ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যেও যুদ্ধ বাঁধার আশংকা ছিল। মদীনাবাসীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ছিল অবশ্যম্ভাবী। আর তাতে এ শহর ধ্বংস হয়ে যেতো। নবী করীম (সা) এ কথা বেশ ভালো করেই জানতেন যে, ইহুদীরা শুধু সময়ের অপেক্ষা করছে। এজন্য তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ারও প্রয়োজন ছিল। তাই মহানবী

(সা) একটা উপলক্ষ করে ইহুদীদের পরীক্ষা করার মনস্থ করেন। তিনি তাদের হাবভাব জানার সিদ্ধান্ত নেন।

মদীনার ইহুদী বনু নযীর গোত্রের সাথে বনী কিলাব গোত্রের মৈত্রী চুক্তি ছিল। আর এই বনী কিলাব গোত্রেরই দুই ব্যক্তি ভুলবশত হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রা)-এর হাতে নিহত হয়। বনু নযীর ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যেও চুক্তি ছিল। তাই তিনি উক্ত নিহত দুই ব্যক্তির হত্যার ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারে আলাপ করার উদ্দেশ্য করে বনু নযীরদের বসতিতে যান। তাদের বসতি ছিল মদীনা শহরের দু'মাইল দূরে কোবার উপকণ্ঠে। এ সময় মহানবী (সা)-এর সঙ্গে তার দশজন সাহাবী ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত আলী ইবনে আবী তালেব প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় সাহাবী। মহানবী (সা) মূল উদ্দেশ্য গোপন রেখে বনু নযীরকে জিজ্ঞেস করেন, “আচ্ছা বনু কিলাব গোত্রের একজন নিহত ব্যক্তির হত্যার ক্ষতিপূরণ কি হওয়া উচিত।”

ইহুদীদের ষড়যন্ত্র

মহানবী (সা)-এর আলোচনার উদ্দেশ্য জানতে পেরে প্রথমে তারা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের হাবভাবে কিছুটা পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়। তাদের কয়েকজন আলাদা হয়ে কানাঘুসা শুরু করে। মনে হচ্ছিল তারা যেন তাদের নেতা কাআব ইবনে আশরাফের হত্যার কথা আলোচনা করছে। তারা একে অপরকে কি যেন ইঙ্গিত করছিল। এক পর্যায়ে তাদের মধ্য থেকে আমর জাহাশ ইবনে কাআব উঠে যায়। মহানবী (সা) যে ঘরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন আমর সে ঘরে ঢুকে। মহানবীও তাদের এসব গতিবিধি গভীরভাবে লক্ষ্য করছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। তিনি নিজের সঙ্গীদের কিছু না বলেই সেখান থেকে উঠে পড়েন। সাহাবীরা মনে করলেন মহানবী (সা) হয়তো প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেছেন। কিন্তু ইহুদীরা ব্যাপারটা বুঝে ফেলে। তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের সাথেও সে ব্যবহারটি করবে কিনা এ সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পড়ে যায়। তারা ভাবে, “আমরা যদি (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর সাথীদের সঙ্গে সে ব্যবহার করি, তাহলে অবশ্যই তিনি আমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।” তারা আরো ভাবে যে, “তাঁর সাথীরা যদি নিরাপদে ফিরে যায়, তাহলে হয়তো তাঁরা আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা বুঝতেই পারবে না। তাতে করে মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের পুরনো চুক্তি বহাল থাকবে।” এ কথা চিন্তা করে বনু নযীররা মুসলমানদের তোষামোদী শুরু করে। কিন্তু সাহাবীরা মহানবী (সা)-এর ফিরে আসার জন্য পথের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁরা ইহুদীদের এসব তোষামোদের প্রতি কর্ণপাতই করেননি। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পরও যখন মহানবী (সা) আসলেন না, সাহাবীরা তাঁকে খোঁজ করার জন্য সেখান থেকে উঠে পড়েন। অবশেষে তাঁরা মদীনার দিকে রওয়ানা দেন। পথে এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়, লোকটি মদীনা থেকে আসছিল। তাঁকে মহানবী (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, “আমি মহানবী (সা)-কে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করতে দেখে এসেছি।” এ কথা শুনে সাহাবীরা স্বস্তিবোধ করেন। তাঁরাও মহানবী (সা)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মসজিদে নববীতে এসে উপস্থিত হন।

মহানবী (সা) তাঁর সঙ্গীদের সাথে বনু নযীরদের কানাঘুসা ও আকার-ইঙ্গিতের ব্যাপারে তাদের অসৎ উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেন। সাহাবীরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারাও এসব দেখছিলেন। মহানবী (সা)-এর সতর্কবাণীতে তাঁদের নিকটও ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এই ব্যাপারটি মহানবী (সা) তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে অবহিত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখনই হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার মাধ্যমে বনী নযীরদের নিকট যুদ্ধের সতর্কবাণী পাঠান। তিনি বনী নযীরদের উদ্দেশ্যে বলেন, “আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও। তোমরা আমাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেছ। তোমাদের দশ দিন সময় দেয়া হলো। এরপর তোমাদের যাকে মদীনায় দেখা যাবে, তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে।”

এই চরম নির্দেশ শুনে বনু নযীররা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তাঁদের মুখে কোন উত্তর আসে না। তারা শুধু এতটুকু বলে, “হে ইবনে মাসলামা! আউস গোত্রের কোন লোক এরূপ চরম সংবাদ আমাদের নিকট নিয়ে আসবে, এ কথা আমরা কোনদিন কল্পনাও করিনি।” এই উক্তির মাধ্যমে বনী নযীর বা আউস গোত্রের সাথে তাদের সম্পাদিত একটি অতীত চুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করেছিল। মহানবী (সা) মদীনায় আসার আগে খায়রাজদের বিরুদ্ধে আউসরা ইহুদীদের সাথে উক্ত চুক্তি সম্পাদন করেছিল। সে সময় ইহুদী ও আউসরা ছিল একে অপরের মিত্র। ইহুদীদের মন্তব্যের জবাবে হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা শুধু এই বললেন, “এখন আর মনের অবস্থা সেরূপ নেই।”

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর ঔদ্ধত্য

কয়েকদিন পর ইহুদীরা মদীনা ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বনু নযীরদের নিকট দু'জন দূত পাঠায়। দূতের মাধ্যমে সে বলে পাঠায়, “তোমরা বাস্তবতা ত্যাগ করো না। নিজেদের বাড়িঘর আঁকড়ে থাক। নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করো না। তোমাদের সাহায্যের জন্য আমি দু'হাজার লোক পাঠাব। এ ছাড়া আশেপাশের বিভিন্ন গোত্রও তোমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। তারা তোমাদের সকল প্রকার সাহায্য করবে। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি জীবিত থাকতেও তোমাদের উপর কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেয়া হবে না।” দূত মাধ্যমে এ খবর পেয়ে ইহুদীরা দ্বিধাবিহীন হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে অনেকেরই আবদুল্লাহর কথার প্রতি আস্থা ছিল না। কারণ এর আগে বনী কায়নুকার ইহুদীদেরও সাহায্য করার জন্য আবদুল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তাদের যখন ঘেরাও করা হয়, তাদের জীবন যাপন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। আবদুল্লাহ তাদের অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে নিজের পথ ধরে। বনু নযীররা তাদের স্বধর্মীয় বনু কোরায়যাদের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু তাদের সাথে মহানবী (সা)-এর চুক্তি ছিল। ফলে বনু কোরায়যাদের নিকট থেকেও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরতে হয়। তারা আরো চিন্তা করে, “আমাদের যদি মদীনা থেকে বেরই হতে হয়, তাহলে আমরা খায়বর কিংবা মদীনার আশেপাশে কোন স্থানে বসবাস করব। তাতে মদীনায় আমাদের বাগানগুলো থেকে ফল-ফলাদি নিতে পারব। এরূপ অবস্থায় মদীনা থেকে নির্বাসিত হলে আমাদের খুব একটা ক্ষতি হবে না।”

ইহুদীরা এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিল। এক পর্যায়ে তাদের সবচাইতে বড় নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব বলল, “না, তা হবে না, আমি (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে জানিয়ে দিচ্ছি, আমরা আমাদের ঘরবাড়ি কখনো ত্যাগ করব না। বিষয়-সম্পত্তিও ছাড়ব না। আমাদের বিরুদ্ধে আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন।” এ খবর পাঠানোর পর সে দুর্গবন্দী হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে এবং তার সঙ্গী-সাথীদের বলে, “আস, আমরা সবাই নিজ নিজ দুর্গ মজবুত করে সেগুলোতে বসে পড়ি। দুর্গ অবরোধকারীদের উপর ছুঁড়ে মারার জন্য ছাদে ছাদে পাথরের টুকরো জমা করে রাখতে হবে। আমাদের অবরোধ করা হলে তাতে ভয়ের কোন কারণ নেই। কারণ আমাদের গোলাভরা খাদ্যশস্য রয়েছে। এক বছরেও এসব শেষ হবে না। পানির প্রাকৃতিক উৎসও আমাদের দখলে রয়েছে। (হযরত) মুহাম্মদ (সা) এক বছর পর্যন্ত আমাদের অবরোধ করে রাখতে পারবে না।” মোটকথা, দশ দিন সময় শেষ হয়ে যায়। এদিকে ইহুদীরা তাদের নিজ নিজ ঘর থেকে আর বের হয় না।

বনু নযীরদের অবরোধ

মহানবী (সা)-এর নির্দেশে মুসলমানরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইহুদী বসতি অবরোধ করেন। বিশ দিন পর্যন্ত এই অবরোধ অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে মুসলমানরা কোন বাড়ি বা ইমারত দখল করলে ইহুদীরা তা ছেড়ে দিয়ে অন্য ইমারত বা বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিত। অবশেষে মহানবী (সা) নির্দেশ দেন, “তাদের খেজুরের বাগানগুলো কেটে জ্বালিয়ে দাও। তাতে তাদের আর্থিক ক্ষতির চিন্তায় তারা শক্তি ও সাহস হারিয়ে ফেলবে।” এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ইহুদীরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা ফরিয়াদ করে বলে, “হে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)! আপনি তো অন্যদেরকে বিশৃংখলা থেকে বারণ করেন। আর নিজেই আমাদের খেজুরের বাগানগুলো কেটে জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। এটা কোন ধরনের ইনসাফ।” তাদের প্রতি সতর্কবাণী হিসাবে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ .

“তোমরা যে কিছু খেজুর গাছ কেটেছ এবং কিছু না কেটে রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে, এটা এ জন্য যে, এর দ্বারা আল্লাহ সত্যত্যাগীদের লাঞ্চিত করবেন।” (৫৯ : ৫)

এদিকে তাদের সাহায্যে মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর দুই হাজার সশস্ত্র সৈন্যও এগিয়ে আসেনি এবং আরবের অন্য কোন গোত্রও তাদের এই বিপদে চোখ তুলে তাকায়নি। এরূপ পরিস্থিতিতে ইহুদী বনু নযীররা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা নিশ্চিত হয় যে, অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হলে এর পরিণাম তাদের জন্য ভয়াবহ হবে। তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশেষে তারা নিজেরাই মহানবী (সা)-এর নিকট আবেদন জানায়, “অনুগ্রহ করে আমাদের

এবং আমাদের নারী ও শিশুদের জীবনের নিরাপত্তা দান করুন। অস্থাবর সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমরা শহর ছেড়ে চলে যাব।” মহানবী (সা) শর্ত সাপেক্ষে তাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, “তোমাদের প্রতি তিনজনে এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য ও অন্য যে কোন সম্পদ তোমরা ইচ্ছা করলে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।”

বনু নযীরদের নির্বাসন

ইহুদীরা তাদের নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের নেতৃত্বে নির্ধারিত শর্তানুযায়ী মদীনা শহর খালি করে দেয়। এখান থেকে বের হওয়ার পর তাদের কিছু সংখ্যক খায়বরে বসতি স্থাপন করে। আর কিছু সংখ্যক সিরিয়ার এজরাট (আযরিআত) জনপদে চলে যায়। বনু নযীরদের নির্বাসনের পর অনেকগুলো খাদ্যশস্য ভর্তি গোলা, ফলের বাগান ও আবাদি জমি মুসলমানদের হস্তগত হয়। এ ছাড়া পঞ্চাশটি বর্ম এবং তিন শ’ চল্লিশটি তরবারি পাওয়া যায়। কিন্তু এসব সম্পদ গনীমত হিসাবে বণ্টন করা হয় না। মহানবী (সা)-এর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়। তিনি ভূমির একটা অংশ গরীব-মিসকীনদের প্রদান করেন। অবশিষ্ট সম্পদ, বাগান ও ভূমি মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করেন। এ সব সম্পদ লাভের পর মুহাজিরদের অবস্থার পরিবর্তন হয়। তাঁরা আনসারদের উপর নির্ভরতা কাটিয়ে উঠেন। কিছুদিনের মধ্যে তাদের আর্থিক অবস্থা আনসারদের সম পর্যায়ে উন্নীত হয়। অবশ্য আনসারদের মধ্যে হযরত আবু দুজানা এবং সাহাল ইবনে হানীফকেও মুহাজিরদের সম-পরিমাণ অংশ দেয়া হয়। কারণ তাঁদের আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। এ সময় বনু নযীরদের মধ্যে দু’জন ইহুদী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাদের সম্পত্তি তাদেরকে ভোগ করতে দেয়া হয়। মদীনায় ইহুদীদের অস্তিত্ব ছিল বিশৃংখলার উৎস। মদীনার মোনাফেকরা মুসলমানদের কোন রাজনৈতিক বিপদগ্রস্ত দেখতে পেলেই ইহুদীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিত। এসব কারণে মহানবী (সা) মদীনা থেকে ইহুদীদের বের করে দেয়া প্রয়োজন মনে করেন। তাছাড়া বাইরের কোন শত্রু মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলে ইহুদীদেরও শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করার পুরোপুরি আশংকা ছিল। তাতে করে মদীনার প্রতিটি ঘর রণাঙ্গনে পরিণত হতো। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

الْم تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِئْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ - وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ . لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ - وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ - وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ . لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ .

“তুমি কি কপটাচারীদের দেখনি। তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের সেসব সঙ্গীকে বলে, ‘তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব।’ কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। বস্তুত ওরা বহিষ্কৃত হলে কপটাচারীরা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবে না। এবং ওরা আক্রান্ত হলে এরা ওদের সাহায্য করবে না। এবং এরা সাহায্য করতে আসলেও অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে; সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা কোন সাহায্যই পাবে না। প্রকৃতপক্ষে তোমরাই এদের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর। এটা এজন্য যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।” (৫৯ : ১১-১২-১৩)

সূরা হাশরের এসব আয়াতের পর পুনরায় ঈমানের প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তা‘আলার উপর পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপনের পর মানুষের আত্মার উপর কোন অন্যায় বা পাপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আর তাই আল্লাহ তা‘আলার প্রভাব ও শক্তি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ - هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ . هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ - سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ . هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى - يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

“তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনিই রাজা, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহংকারের অধিকারী। ওরা যাকে শরীক স্থির করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সব উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৫৯ : ২২-২৪)

নবী করীম (সা)-এর লেখক

এতদিন মহানবীর লেখক ছিল একজন ইহুদী যুবক। সে হিব্রু ও সুরিয়ানী ভাষায় মহানবী (সা)-এর চিঠিপত্র লিখত। কিন্তু বনু নযীরদের সঙ্গে এই লোকটিও দেশ ত্যাগ করে চলে যায়। এখন থেকে মহানবী (সা) চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে কোন অমুসলিমের উপর নির্ভর করা সমীচীন মনে করলেন না। তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতকে হিব্রু ও সুরিয়ানী ভাষা শিখে

নেয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত যায়েদ কয়েকদিনের মধ্যেই উক্ত দু'ভাষায় চিঠিপত্র লেখার যোগ্যতা অর্জন করলেন। তিনি ওহী লেখকও ছিলেন। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলে হযরত যায়েদের তত্ত্বাবধানেই পবিত্র কোরআন সংকলিত হয়। হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফত আমলে পবিত্র কোরআনের কোন কোন শব্দের উচ্চারণ নিয়ে মতপার্থক্য শুরু হয়। এ সময় হযরত যায়েদই অত্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করেন। খিলাফতের উদ্যোগে পবিত্র কোরআনের একাধিক কপি করে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পবিত্র কোরআনের বিশুদ্ধ কপি ছাড়া অপরাপর সব কপি জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

বনু নযীরদের নির্বাসনের পর মদীনা শহরে শান্তি-শৃংখলা নেমে আসে। এখন মোনাফেকদের পক্ষ থেকেও মুসলমানদের দুর্ভাবনার কোন কারণ ছিল না। মুহাজিররাও অসচ্ছলতার অভিশাপমুক্ত হন। বনু নযীরদের আবাদী জমি ও ফলফলাদির বাগান লাভের পর মুহাজিরদের জীবনধারায় সচ্ছলতা নেমে আসে। আনসাররাও এ ব্যাপারে আনন্দিত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তাঁদের মুহাজির ভাইরা সচ্ছল জীবন যাপনের অধিকারী হয়েছেন। তাতে করে মুহাজির ও আনসাররা একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সম মানের জীবন যাপন শুরু করেন।

দ্বিতীয় বদর

এভাবে মুসলমানরা কিছুদিন থেকে মদীনায় শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করছিলেন। ইতিমধ্যে প্রায় একটি বছর অতিবাহিত হয়। মহানবী (সা) বদরের সময়ের কথা চিন্তা করেন। আবু সুফিয়ানের উহুদ রণাঙ্গনে কণ্ঠধ্বনি তাঁর স্মরণ হয়। উহুদ থেকে ফেরার সময় আবু সুফিয়ান উচ্চকণ্ঠে একাধিকবার বলেছিল, “বদরের প্রতিশোধ তো নেয়া হলো। আগামী বছর তোমাদের ও আমাদের মধ্যে বদর রণাঙ্গনে আরেকবার বোঝাপড়া হবে।” এরই মধ্যে আবু সুফিয়ান নুআয়ম নামক এক ব্যক্তিকে মক্কা থেকে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়। তাকে এমন সব কথা শিখিয়ে দেয়া হয় যাতে মুসলমানদের মনোবল ভেঙে যায়। নুআয়ম মদীনায় পৌঁছে ঘরে ঘরে গিয়ে বলতে শুরু করে, “এবার কুরাইশরা যে সৈন্যদল সংগ্রহ করেছে আরবের কোন সম্প্রদায়ই তার মোকাবেলা করতে পারবে না। আবু সুফিয়ান সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার মুসলমানদের উপর উহুদের চেয়েও কঠোর আক্রমণ করা হবে।” এসব কথা শুনে মুসলমানদের অনেকে হতভম্ব হয়ে পড়েন। তাঁদের কেউ কেউ ইচ্ছা করেন, এবার তাঁরা বদরে যাবেন না। কিন্তু মহানবী (সা) তাঁদের মনের গোপন ইচ্ছা বুঝে ফেলেন। তিনি রাগান্বিত হন। তিনি শপথ করে বলেন, “এবার আমাকে যদি একাও বদরে যেতে হয় তাতেও পিছপা হব না।”

মহানবী (সা)-এর কঠোর সতর্কবাণী ও দৃঢ় সংকল্প জানতে পেরে মুসলমানরা প্রত্যেকেই নিজের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ শুরু করেন। মহানবী (সা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলকে মদীনায় তাঁর স্থলবর্তী নিয়োগ করেন। এরপর তিনি বদরের দিকে রওয়ানা দেন। সেখানে তিনি শিবির স্থাপন করে প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

ওদিকে আবু সুফিয়ান দুই সহস্রাধিক কুরাইশ সৈন্য নিয়ে বদরের উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করেন। কিন্তু দুই দিন পথ চলার পরই সে সাহস হারিয়ে ফেলে। সে তার সফর সঙ্গীদের উদ্দেশে বলে, হে কুরাইশ বন্ধুগণ! যুদ্ধের জন্য এ বছর উপযোগী নয়। কারণ এ বছর বৃষ্টি হয়নি। আমি ফিরে যাচ্ছি। তোমরাও ফিরে চল।” কিন্তু মহানবী (সা) আটদিন পর্যন্ত তাঁর বাহিনী নিয়ে বদরে অবস্থান করেন। বদর একটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবেও খ্যাত ছিল। এই সুযোগে মুসলমানরা বেশ কিছু কেনাকাটা করেন। আর তা থেকে প্রচুর লাভ করেন। কুরাইশদের প্রতীক্ষায় থেকে অবশেষে মুসলমানরাও মদীনা ফিরে আসেন। আল্লাহ তা‘আলার প্রাচুর্য ও নেয়ামত লাভ করে মুসলমানরা অত্যন্ত আনন্দ-উল্লাসের সাথে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সাতটি আয়াত নাযিল হয় :

الَّذِينَ قَالُوا لَا خِوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا - قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . (২) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا - بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . (৩) فَرَحِمَنٌ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . (৪) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ . (৫) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ - لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ . (৬) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ - وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ . (৮) إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ - فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

“(১) যারা ঘরে বসে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলত, তারা তাদের কথামত চললে নিহত হতো না, তাদের তুমি বল, ‘যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর।’ (২) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের কখনো মৃত মনে করো না। না, তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত এবং তারা জীবিকা পেয়ে থাকে, (৩) আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন, তাতে তারা আনন্দিত। এবং তাদের পিছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এইজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (৪) আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ মু‘মিনদের শ্রমফল নষ্ট

করেন না। (৫) যখন হওয়ার পর যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করে এবং সাবধান হয়ে চলে, তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। (৬) এদেরকে লোকে বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর ; কিন্তু এটা তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট ; এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।’ তারপর তারা আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহ সহ ফিরে এসেছিল। কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে রাযী, তারা তারই অনুসরণ করেছে এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। (৭) শয়তানই তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। যদি তোমরা মু’মিন হও, তবে তোমরা তাদের ভয় কর না, আমাকেই ভয় কর।” (৩ : ১৬৮ - ১৭৫)

মুসলমানদের ভয়ে মক্কার কুরাইশরা যুদ্ধ ছাড়াই ফিরে যায়। এটা মুসলমানদের জন্য উহুদের পরাজয়ের ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরিগণিত হয়। অপরদিকে কাফেরদের এভাবে ফিরে যাওয়াটা বদরে তাদের পরাজয়ের চাইতে কম অপমানকর ছিল না। তা সত্ত্বেও কুরাইশরা আগামী বছরের জন্য যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে উদাসীন ছিল না।

যাতুর রিকা’র অভিযান

মহানবী (সা) দ্বিতীয় বদর অভিযান থেকে ফেরার পর আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহে অত্যন্ত শান্তিতে জীবন যাপন করছিলেন। কুরাইশদের মনে মুসলমানদের সম্পর্কে ভীতি সঞ্চারিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও শত্রুদের সম্পর্কে তিনি উদাসীন ছিলেন না। তিনি সাহাবীদের চারদিকে গোয়েন্দা হিসেবে লাগিয়ে রাখতেন। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া যায়, বনু গাতফানের লোকেরা মদীনায়ে আক্রমণ করার জন্য নজদে একত্রিত হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে মহানবী (সা)-এর কৌশল ছিল, তিনি শত্রুর উপর হঠাৎ আক্রমণ চালাতেন। তাতে শত্রুরা প্রতিরোধ করার সুযোগ পেত না। বনু গাতফানের আক্রমণ প্রস্তুতির খবর পাওয়া মাত্র চার শ’ মুসলমানের একটি দল নিয়ে তিনি নিজেই বেরিয়ে পড়েন। বনু গাতফানের উপগোত্র বনু মুহারিব ও বনু ছা’লাবা তাদের নির্ধারিত স্থানে একত্রিত হচ্ছিল। মহানবী (সা) তাঁর বাহিনী নিয়ে বনু গাতফানদের শিবিরের নিকট পৌঁছান। মুসলিম বাহিনীর প্রতি দৃষ্টি পড়া মাত্র গাতফানরা শিবির ছেড়ে পালিয়ে যায়। এমনকি তারা নিজেদের মাল-সামান ও মহিলাদেরও ফেলে যায়। এসব পরিত্যক্ত মালপত্র থেকে মুসলমানরা তাদের সাধ্যানুযায়ী উঠিয়ে নেন। কিন্তু তাঁরা মহিলাদের স্পর্শ করেননি।

শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনের আশংকা ছিল। তাই মুসলমানরা মদীনায়ে ফেরার সময় পথে ‘সালাতুল খাওফ’ বা ভীতির নামায আদায় করতেন। মহানবী (সা)-এর ইমামতিতে একদল মুসলমান নামায শুরু করতেন। অপর অংশ পাহারায় নিয়োজিত থাকতেন। এরপর পাহারাদার অংশ নামায শুরু করতেন এবং প্রথম অংশ পাহারার দায়িত্ব পালন করতেন। এরূপে মহানবী (সা) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বিজয়ীর বেশে মদীনায়ে ফিরে আসেন। এই অভিযানে পনের দিন সময় অতিবাহিত হয়।

দুমাতুল জান্দাল অভিযান

যাতুররিকা অভিযানের কিছুদিন পর মহানবী (সা) দুমাতুল জান্দাল অভিযানে যান। এই স্থানটি হিজাজ ও সিরিয়া সীমান্তে লোহিত সাগর ও পারস্যোপসাগরের উপকূলভাগে অবস্থিত। এখানে রয়েছে প্রচুর খেজুর বাগান।

রাসূলুল্লাহ (সা) দুমাতুল জান্দালে পৌঁছে শত্রুদের উপর অতর্কিতে হামলা চালান। তাঁর আসার খবর শুনে শত্রুরা পালিয়ে যায়। তারা অটেল মাল-সামান ফেলে যায়। মুসলমানরা এসব গনীমত হিসাবে লাভ করেন। দুমাতুল জান্দালের ভৌগোলিক অবস্থান ও দূরত্ব থেকে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীদের ক্ষমতার পরিধি এ সময় অনেক সম্প্রসারিত হয়েছিল। সমগ্র আরবে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে আরো জানা যায় যে, এসব অভিযান ও যুদ্ধ-বিগ্রহে মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে হতো। মওসুমের প্রতিকূলতায় তারা ঘাবড়াতো না। ক্ষুধা ও পিপাসা তাঁদের সংকল্পে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারত না। তাঁদের এই দৃঢ়তা ও অসাধারণ সাহসের একমাত্র উৎস ছিল তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি। এই শক্তিই তাঁদের বিশ্বাসকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার সাথে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করেছিল। এই শক্তির প্রভাবেই তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করত না।

পনের হিজরী সাল। এ বছরের কয়েকটি মাস মহানবী (সা) মদীনায়ে একটু স্বস্তিতে কাটানোর সুযোগ পান। এ সময় শুধু কুরাইশদের দিক থেকেই আশংকা ছিল, তারা আগামী বছর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি কিছুটা ভাবনায় ছিলেন। এই সুযোগে মহানবী (সা) ইসলামের সামাজিক বিধান বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। সে সময় এ সব বিধানের সাথে মাত্র কয়েক হাজার লোক ছিল। কিন্তু সময়ের অতিবাহনের সাথে সাথে এসব বিধানের উপর কোটি কোটি মানুষের সমাজ ও জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ছিল। তাই মহানবী (সা) অত্যন্ত দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার সাথে এসব বিধান প্রণয়ন করেন। এই বিরাট কাজে তাঁর পথপ্রদর্শক ছিল আল্লাহ তা'আলার ওহী। তাঁর প্রণীত এসব বিধান কালোত্তীর্ণ, চিরন্তন, শাস্বত। এগুলো সেকালের সামাজিক পরিবেশে যেমন মানব জাতির জন্য শান্তি ও কল্যাণের বাণী বয়ে এনেছিল, কয়েক শতাব্দী পর বর্তমান আধুনিক বিশ্বেও নিঃসন্দেহে সেগুলো মানব জাতির জন্য কল্যাণকর ও মুক্তির নিয়ামক। সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এসব বিধান আজও মহানবী (সা)-এর অতুলনীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অনুপম সামাজিক দূরদর্শিতার নিদর্শন হিসেবে দিক-নির্দেশ করছে।

রাসূলে করীম (সা)-এর সহধর্মিণীগণ

যয়নব বিনতে জাহশ ও প্রাচ্যবিদগণ

পূর্বের দু'টি অধ্যায়ে আলোচিত ঘটনাবলি যে সময়ে সংঘটিত হয়, সেদিনগুলোতে মহানবী (সা) একের পর এক তিনটি বিয়ে করেন। প্রথমে তিনি বিয়ে করেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে খোযায়মা (রা)-কে। এরপর করেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা বিনতে আবী উমাইয়া (রা)-কে। সবশেষে বিয়ে করেন হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রা)-কে। তাঁদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহশের আরেক বিয়ে হয়। মহানবী (সা)-এর পরামর্শে হযরত যায়েদ ইবনে হারেছার সাথে হযরত যয়নবের প্রথম বিয়ে হয়। হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা ক্রীতদাস ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) নিজের অর্থে তাকে খরিদ করে মহানবী (সা)-কে উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করেন। তিনি হযরত যায়েদকে মুক্ত করে দিয়ে নিজের পোষ্যপুত্র হিসাবে রাখেন। হযরত যায়েদের মুক্ত জীবনে হযরত যয়নবের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। উভয়ের মধ্যে বনিবনাও হয় না। শেষ পর্যন্ত হযরত যায়েদ (রা) তাঁকে তালাক দিয়ে পৃথক হয়ে যান। পরবর্তীকালে মহানবী (সা) হযরত যয়নবকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন। শেষ নবীর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে প্রাচ্যবিদ ও খৃষ্টান ধর্মযাজকরা এই ঘটনার কঠোর সমালোচনা করেছেন।

প্রাচ্যবিদরা তাঁদের বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে সত্যের অপলাপ করে বলেছেন, “(হযরত) মুহাম্মদ (সা) তাঁর মক্কার জীবনে অত্যন্ত কৃচ্ছতার পরিচয় দেন। আল্লাহুপ্রীতির দরুন তিনি মহিলাদের প্রতি চোখ তুলে তাকাতে না। কিন্তু হিজরত পরবর্তী জীবনে তাঁর এই স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে! তিনি পূর্বে তিনজন মহিলার পাণি গ্রহণ করা সত্ত্বেও আরো তিনজনকে বিয়ে করেন। এ সময় তিনি শুধু বিধবাদেরই বিয়ে করেননি, অন্যের স্ত্রীদের তাদের স্বামীদের থেকে ছাড়িয়ে নিজে বিয়ে করা শুরু করেন। তার প্রমাণ হচ্ছেন (হযরত) যয়নব বিনতে জাহশ। তিনি ছিলেন তাঁর ক্রীতদাসের স্ত্রী। এই বিয়ের পটভূমি হলো, একদিন তিনি (হযরত) যায়েদের ঘরে যান। (হযরত) যায়েদ তখন ঘরে ছিলেন না। (হযরত) যয়নব মহানবী (সা)-কে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এ সময় তিনি উত্তম পোশাক পরেছিলেন। তাঁকে দেখে (হযরত) মুহাম্মদ (সা) আকৃষ্ট হন। তিনি ‘সোব্‌হানাল্লাহ্’ বলে ফিরে আসেন। তাতে (হযরত) যয়নবের মনে উচ্চাভিলাষ জন্মে। স্বামী (হযরত) যায়েদ ঘরে ফিরার পর (হযরত) যয়নব তাঁর নিকট বিস্তারিত ঘটনা বলেন। তক্ষুণি (হযরত) যায়েদ (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু (হযরত) মুহাম্মদ (সা) বলেন,

“আল্লাহ্ তা‘আলাকে ভয় কর। নিজের স্ত্রীকে তালাক দিও না।” সে সময় থেকেই হযরত যয়নব স্বামীর সাথে অনেকটা সম্পর্কহীন হয়ে পড়েন। ফলে বাধ্য হয়ে (হযরত) যায়েদ তাকে তালাক দেন। এদিকে (হযরত) মুহাম্মদ (সা) (হযরত) যয়নবকে বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তিনি মুখে তা প্রকাশ করতেন না। এ ব্যাপারে (পবিত্র) কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ - وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ - فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا - وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا .

“আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলছিলে, ‘তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না, আল্লাহ্কে ভয় কর।’ তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন ; তুমি লোক-ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু‘মিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেসব রমণীকে বিবাহ করায় মু‘মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।” (৩৩ : ৩৭)

তঁারা আরো বলেছেন, “এরপর (হযরত) মুহাম্মদ (সা) (হযরত) যয়নবকে বিয়ে করে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন এক অদ্ভুত ধরনের নবী (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন)। তিনি অন্যদের সাথে তুলনাকালে নিজেকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি যে বিধান আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট থেকে লাভ করার দাবি করেছেন, নিজেই সে বিধান অনুসরণ করতে পারেননি। তাঁর হেরেমে রমণীদের ভিড় ছিল। এ ধরনের পরিবেশ প্রবৃত্তির পূজারী আমীর-ওমরাহদের মহলেই শোভা পায়। যিনি নিজেকে পূত-পবিত্র ও অন্যদের সংস্কারক বলে দাবি করেন, এরূপ কোন নবী-রাসূলের ঘরে এ ধরনের পরিবেশ হতেই পারে না। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, নিজে একজন নবুয়তের দাবিদার হয়ে তিনি কেন (হযরত) যয়নবের প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন যে, তাঁর কারণে শেষ পর্যন্ত মুক্ত দাস (হযরত) যায়েদ (রা) তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন! এরপর (হযরত) মুহাম্মদ (সা) (হযরত) যয়নব (রা)-কে বিয়ে করেন। নিজের পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা অজ্ঞতার যুগেও বৈধ মনে করা হতো না। কিন্তু মুসলমানদের নবী এসব বাধ্যবাধকতারও তোয়াক্কা করলেন না। বস্তুত এরূপ কাজকে প্রবৃত্তির পূজা হিসেবেই অভিহিত করা যায়।”

১. গ্রন্থকার হযরত যয়নব (রা) সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ ও খৃষ্টান ধর্মযাজকদের অপপ্রচারের জবাব দানের মহান লক্ষ্যে তাদের বক্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। আর কারো বক্তব্য উল্লেখ না করে সুস্পষ্টভাবে

প্রাচ্যবিদ, খৃষ্টান ধর্মযাজক ও প্রচারকরা মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করার সময় মনগড়া কল্পনার স্রোতে ভেসে যায়। ঘূর্ণিঝড় যেমন খড়কুটা আকাশে উড়াতে থাকে তাদের অবস্থাও তেমনটি হয়। তারা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এসব সমালোচকের একদল বলেছে, “হযরত যয়নব (রা) অর্ধ উলঙ্গ কিংবা পুরো উলঙ্গ অবস্থায় ছিলেন। তাঁর নিকষ কালো কেশরাজি আলুথালু অবস্থায় শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁর প্রতি মহানবী (সা)-এর দৃষ্টি পড়ে। তাতে তাঁর অন্তরে হযরত যয়নবের প্রতি প্রেমাসক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়!” অপর একদল বলেছে, “মহানবী (সা) নিজে হযরত যয়নবের ঘরের দরজা খোলেন। এসময় তাঁর পরনে রাতের পোশাক ছিল। তিনি পালংকে ঘুমিয়ে ছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁর প্রতি মহানবী (সা)-এর দৃষ্টি পড়ে। ... কিন্তু তিনি তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা কারো নিকট প্রকাশ করেননি।” মহানবী (সা) ও হযরত যয়নব (রা) সম্পর্কে এ ধরনের মনগড়া কাল্পনিক কথাবার্তা যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম ম্যুর, ডারমিংহাম, ওয়াশিংটন, ওরাংক, লা মেন্স প্রমুখ। আর খৃষ্টান ধর্মযাজকদের মধ্যে প্রায় সবাই এ ধরনের অশোভন মন্তব্য করেছেন। এসব প্রাচ্যবিদ কতটুকু সত্যসন্ধ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন মহানবী (সা) সম্পর্কে তাদের এ ধরনের সমালোচনা ও অশোভন মন্তব্য থেকে তা সহজে অনুমান করা যায়।

আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তাঁরা জীবনচরিত ও হাদীস বিষয়ক গ্রন্থরাজিকে তাঁদের লেখার উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মহানবী (সা) ও তাঁর সহধর্মিণীগণ সম্পর্কিত বর্ণনারাজিকে তাঁরা নিজেদের মনগড়া কল্পনার অলঙ্কার পরিয়ে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এ ধরনের ঘৃণ্য আচরণে গবেষণা ও নিরপেক্ষতা লজ্জায় মাথা হেঁট করেছে। মহানবী (সা)-এর নয় কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি স্ত্রী হওয়াটাকেই তাঁরা তাঁদের নীতিজ্ঞান বিবর্জিত সমালোচনার সবচেয়ে বড় ইন্ধন হিসাবে গ্রহণ করেছে। এসব সমালোচকের প্রতিটি কথারই দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া যায়। কিন্তু আমরা যদি তাদের এসব মন্তব্য সঠিক ধরে নেই, তাতেই বা এমন কী আপত্তি থাকতে পারে? মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্বই বা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় কি করে? বস্তুত কোন কোন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সর্বসাধারণের জন্য প্রণীত আইন-কানুনের উর্ধ্বে গণ্য করা হয়ে থাকে। আর আমরা যখন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কোন কোন সাধারণ আইনের উর্ধ্বে গণ্য করতে পারি, তখন নবী-রাসূলদের এসব আইনের উর্ধ্বে কেন গণ্য করতে পারব না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চেয়েও অনেক উঁচু মর্যাদাশালী ব্যক্তিত্ব।

এক্ষেত্রে আমরা হযরত মূসা (আ)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। হযরত মূসা (আ) একদিন এক ইসরাঈলী ও এক কিবতিকে হাতাহাতি করতে দেখেন। তিনি কিবতিকে সজোরে ঘুষি মারেন। তাতে লোকটি ঘটনাস্থলে নিহত হয়।^১ এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না

তার জবাব দেয়া যায় না। সুতরাং উল্লিখিত প্রতিবেদনটি বিধর্মীদের উক্তি হিসেবেই পাঠকদের গণ্য করতে হবে। -অনুবাদক

১. মূল গ্রন্থের লেখক হযরত মূসা (আ) কর্তৃক মিসরীয় লোকটিকে হত্যা সম্পর্কিত বিবরণ পবিত্র কোরআন থেকে নিয়েছেন। কিন্তু তাওরাত গ্রন্থে এই ঘটনা আরো বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, “হযরত মূসা (আ) বড় হওয়ার পর নিজের গোত্রীয় ভাইদের নিকট যান। তিনি তাদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট প্রত্যক্ষ করেন। তিনি দেখেন একজন মিসরী তাঁর এক ইহুদী বা ইসরাঈলী ভাইকে মারধর করছে। (শ্লোক-১১) তিনি এদিক-ওদিক তাকান। তিনি দেখেন সেখানে অন্য কেউ নেই। তিনি

যে, এ ধরনের হত্যা একমাত্র যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধের অনুরূপ অবস্থায়ই বৈধ হতে পারে। আর সে সময় হত্যাকাণ্ডটি বৈধ গণ্য করার মতো কোন অবস্থাই ছিল না। মহানবী (সা)-এর সমালোচক প্রাচ্যবিদ ও খৃষ্টান ধর্মযাজকরা এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কি বলবেন। তারা কি এটাকে বৈধ বলবেন, না অবৈধ? যদি বৈধ বলেন, তাহলে হযরত মূসা (আ) প্রবর্তিত ধর্মীয় বিধানেও তা প্রমাণ করতে হবে। সবাই জানেন, সে ধর্মের বিধানে এ ধরনের হত্যা জায়েয নয়। আর যদি অবৈধ বলেন, তাহলে মহানবী (সা)-এর সাথে হযরত যয়নবের বিয়েকে কেন্দ্র করে আপনারা রাসূলুল্লাহর যেকোন ঘণ্য সমালোচনা করেছেন, ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ করেছেন, অনুরূপ উক্ত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে হযরত মূসার নবুয়ত ও শ্রেষ্ঠত্ব কি কালিমালিগু হয় না?

এক্ষেত্রে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁর জন্মও ছিল স্বাভাবিক রীতিনীতির সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। হযরত মূসা (আ)-এর উল্লিখিত ঘটনা মহানবী (সা) সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের সমালোচিত ঘটনা এমনকি সকল নবী-রাসূলের জীবন বৃত্তান্তের চাইতে হযরত ঈসা (রা)-এর আবির্ভাবের ঘটনা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ও বিস্ময়কর। কোন আইন-কানুন এবং সামাজিক বিধিবিধানেই হযরত ঈসার জন্মলাভের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যাবে না। উক্ত ঘটনা শরীয়তের আইন-কানুন এবং প্রকৃতির নিয়ম-নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র আত্মা মানুষের আকৃতি ধারণ করে হযরত মরিয়মের সামনে আবির্ভূত হন। তাঁকে একটি সন্তান জন্মের শুভ সংবাদ দেয়া হয়। এ খবর শুনে হযরত মরিয়ম অত্যন্ত বিস্মিত হন। তিনি বলেন, “কি করে আমার ছেলে হতে পারে? কারণ কোন পুরুষ তো আমাকে স্পর্শও করেনি। এবং আমি চরিত্রহীনাও নই।” পবিত্র আত্মা বললেন, “নিশ্চয়ই তোমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তাই। কারণ আল্লাহ তা'আলা এই নবজাতককে তাঁর নিদর্শন হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চান।”

হযরত মরিয়মের প্রসববেদনা আরম্ভ হলে তিনি এদিক-সেদিক লুকোতে থাকেন। লজ্জায় তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, আমার যদি এখন মৃত্যু হতো। পৃথিবী যদি আমাকে ভুলে যেতো। এ সময়ও পবিত্র আত্মার তরফ থেকে হযরত মরিয়মের কানে ভেসে আসে, “আপনি এত চিন্তাবিহীন হচ্ছেন কেন? আল্লাহ তা'আলা আপনার পদতলে পানির ঝর্ণা বইয়ে দিয়েছেন।” হযরত মরিয়ম তাঁর নবজাতক শিশুকে কোলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। মানুষ দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়। তারা বলাবলি শুরু করে, মরিয়মের তো স্বামী নেই। এই শিশু হলো কি করে। তারা বিস্ময় ও ক্ষোভ মিশ্রিত কণ্ঠে হযরত মরিয়মকে বলল, “সুবহানাল্লাহ! এই অদ্ভুত

মিসরীয়কে হত্যা করে বালুতে লুকিয়ে রাখেন। (১২) দ্বিতীয় দিন তিনি আবার বাইরে যান। দেখেন দু'জন ইহুদী নিজেরাই মারামারি করছে। অপরাধী লোকটিকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, নিজের সাথীকে তুমি কেন মারছ। (১৩) লোকটি বলল, তোমাকে আমাদের উপর কে বিচারক নিয়োগ করেছে। তুমি মিসরীয়কে যেভাবে হত্যা করেছ, আমাকেও কি সেভাবে হত্যা করতে চাও? হযরত মূসা তার এই উক্তিে বুঝতে পারলেন, গতকাল যে তিনি মিসরীয় লোকটিকে হত্যা করেছেন, এটা জানাজানি হয়ে গেছে। তিনি ভয় পেয়ে যান। (১৪) এরপর তিনি মিসর থেকে পালিয়ে যান।

প্রাচ্যবিদ ও খৃষ্টান ধর্মযাজকরা মহানবী (সা)-এর একাধিক স্ত্রী সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাদের পূর্ব-পুরুষ হযরত সোলায়মান সম্বন্ধে কিছুই বলছেন না। হযরত সোলায়মানেরও তো এক হাজার স্ত্রী ছিলেন। আসলে এসব ঘটনাকে বর্তমান যুগ ও পরিবেশের আলোকে বিচার-বিবেচনা করাটাই ভুল। সেকালের সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ে এসব ঐতিহাসিক ঘটনার মূল্যায়ন করতে হবে। -অনুবাদক

প্রাণী তুমি কোথেকে নিয়ে এসেছ।” হযরত মরিয়মের পরিবর্তে নবজাতক শিশুই মানুষের প্রশ্নের উত্তরে বলল, “আমি আল্লাহর বান্দা, আমাকে তিনি (ইনজীল) কিতাব দান করেছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে বরকতময় করা হয়েছে। আমি যতদিন জীবিত থাকব আমাকে নামায এবং যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।”

এই হচ্ছে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের খৃষ্টানদের স্বীকৃত জন্ম বৃত্তান্ত। ইহুদীরা আবার কুমারী হযরত মরিয়মকে ইউসুফ নাজ্জার নামক এক ব্যক্তির সাথেও জড়িত করেছে। রিনাল এবং বর্তমান যুগের অন্যান্য ইহুদী লেখক এ ধরনের অশোভন মন্তব্য করেছেন। শত্রুরা যাই বলুক না কেন, হযরত ঈসা (আ)-এর রিসালাত ও শ্রেষ্ঠত্বই এ কথার নিশ্চয়তা বিধান করে যে, আল্লাহ তা‘আলা তা প্রমাণ করার জন্য তাঁর স্বভাবজাত রীতিনীতিতে এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। আর এটা তাঁর অসীম শক্তিমত্তারও এক বহিঃপ্রকাশ। এই ঘটনার মাধ্যমে তিনি মানবজাতিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন পিতা ছাড়াও তিনি তাঁর অসীম কুদরতে মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু খৃষ্টান ধর্মযাজকরা দাবি করছেন, স্বভাবজাত নিয়মের বিপরীতে হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাবের অলৌকিক ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁকেই সর্বশেষ আল্লাহ মনে করতে হবে। এবং চিরন্তন মুক্তিদাতা হিসাবে স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু মহানবী (সা)-এর বেলায় এসে তারা ব্যতিক্রমী ভূমিকা গ্রহণ করেন। মহানবী (সা)-এর জীবনে স্বাভাবিক আইন-কানুনের ব্যতিক্রম কোন ঘটনা দেখতে পেলেই তারা তাঁর সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেন। অথচ হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাবের ঘটনার অলৌকিকতার তুলনায় মহানবী (সা)-এর হযরত যয়নব সম্পর্কিত ঘটনা কিছুই নয়। বস্তুত পৃথিবীর বিশিষ্ট ব্যক্তির কোন কোন অবস্থায় সমাজের সাধারণ আইন-কানুনের উর্ধ্বে থাকেন, মহানবী (সা)-এর ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদ ও খৃষ্টান ধর্মযাজকরা এই সর্বজনস্বীকৃত ব্যাপারটি বেমালুম ভুলে যান!

আমরা আমাদের দাবির পুনরুল্লেখ করে বলছি, মহানবী (সা) সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ ও খৃষ্টানদের উপরে উল্লিখিত সমালোচনার আরো দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে পারি। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা হবে বাড়াবাড়ি। প্রকৃতপক্ষে খাতিমুন নাবিয়্যীন ও সাইয়েদুল মুরসালীন ছিলেন এসব সমালোচকের অবাস্তব কল্পনার অনেক উর্ধ্বে। তিনি ভালবাসা বা প্রেমপ্রীতির ভিত্তিতে কোন সহধর্মিণীকেই তাঁর সাহচর্যে আসার সুযোগ দান করেননি। অবশ্য কোন কোন মুসলিম চরিতবিদও মহানবী (সা) সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেও একথা বলা যায় যে, তাদের এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের হাতই শক্তিশালী হয়েছে। এসব অদূরদর্শী মুসলিম লেখকরা এ ধরনের হালকা কথাবার্তা মহানবী (সা)-এর মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করাকেও রাসূলপ্রীতির পরাকাষ্ঠা হিসাবে মনে করেছেন। এমনকি তারা পার্থিব কামভাবের মত নীচ স্বভাবকেও মহানবী (সা)-এর সাথে জড়িত করতে দ্বিধা করেনি। অথচ তিনি ছিলেন এসব থেকে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র।

পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত একই স্ত্রী

জীবনের তেইশতম বসন্তে পদার্পণের পর মহানবী (সা) হযরত খাদীজা (রা)-এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁরা উভয়ে সুদীর্ঘ আটাশ বছর বৈবাহিক জীবন অতিবাহিত করেন।

হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তেকালের সময় মহানবী (সা)-এর বয়সও পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছিল। সেকালে আরবে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপক রেওয়াজ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা)-এর ঘরে ছিল মাত্র একজন স্ত্রী। তাঁদের একাধিক সন্তান হয়। চারজন কন্যা সন্তান জীবিত ছিলেন। পুত্র সন্তানরা সবাই ইন্তেকাল করেন। সে সময় আরবের অভিজাত পরিবারেও কন্যা সন্তান হলে জ্যাক্ত কবর দেয়া হতো। পুত্র সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করা হতো না। পুত্র উত্তরাধিকারীদের ব্যাপারে তারা সদা প্রফুল্ল থাকত। এরূপ পরিবেশেও মহানবী (সা) এই সুদীর্ঘ সময়ে অন্য কোন মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেননি।

মহানবী (সা) নবুয়ত লাভের আগে হযরত খাদীজা (রা)-এর সাথে সতের বছর অতিবাহিত করেন। নবুয়ত লাভের পর করেন এগার বছর। কিন্তু এই এক-চতুর্থ শতাব্দীরও বেশি সময়কালের মধ্যে মহানবী (সা) দ্বিতীয় বিয়ে করার মনোভাবও প্রকাশ করেননি। অথচ সে সময় মহিলারা পর্দা করত না। সেজেগুঁজে আকর্ষণীয় হয়ে খোলামেলা চলাফেরা করত। (অবশ্য পরবর্তীকালে ইসলাম পর্দা প্রথা আরোপ করে)। এরূপ পরিবেশেও মহানবী (সা) কোন মহিলার দিকে চোখ তুলে তাকাননি। হযরত খাদীজা (রা)-এর সাথে বিয়ের পর, এমনকি বিয়ের আগেও এ জাতীয় কোন ঘটনা মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনে দেখা যায়নি। মন-মানসিকতা ও স্বভাবের দিক থেকেও তিনি নারীর সৌন্দর্যের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। মহানবী (সা)-এর বয়স যখন পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে, তখন তাঁর ঘরে পাঁচজন সহধর্মিণী রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা)-এর মত কম বয়স্কাও রয়েছেন। এরূপ অবস্থায় হযরত যয়নবের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়া (আল্লাহু ক্ষমা করুন) সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এক শ্রেণীর অজ্ঞ মুসলিম জীবনচরিতকার ও প্রাচ্যবিদরা হযরত যয়নবের ব্যাপারে মহানবী (সা) সম্পর্কে যে ধৃষ্টতামূলক মন্তব্য করেছেন, তা তো একজন সাধারণ মানুষের বেলায়ও দূষণীয় ব্যাপার। এরূপ পরিস্থিতিতে মহানবী (সা)-এর মতো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম এবং সারা বিশ্বে বিপ্লব সৃষ্টিকারী একজন মহামানবের ক্ষেত্রে তা কি করে মেনে নেয়া যায়। এ কিছুতেই হতে পারে না।

প্রাচ্যবিদরা মহানবী (সা)-এর পারিবারিক জীবনের বিস্ময়কর কোন কিছু যদি প্রত্যক্ষ করতে চান, তাহলে তাঁর সন্তান-সন্ততির ব্যাপারটি দেখতে পারেন। মহানবী (সা)-এর বয়স পঞ্চাশে পৌঁছার আগে হযরত খাদীজার ঘরে সন্তান-সন্ততি হয়েছে। বয়স যখন ষাট বছর হযরত মারিয়া কিবতিয়ার ঘরে এক সন্তান হযরত ইবরাহীম (রা) জন্মগ্রহণ করেন। এই দু'জন ছাড়াও মহানবী (সা)-এর সাত কিংবা নয়জন সহধর্মিণী ছিলেন। তাঁদের বয়স ছিল তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে। তাঁদের প্রত্যেকেরই পূর্ব স্বামীর ঘরে সন্তান-সন্ততি হয়েছে। কিন্তু মহানবী (সা)-এর ঘরে এসে তাঁদের কারো কোন সন্তান হয়নি। আর পাঁচজন মানুষের মতো মহানবী (সা)ও হয়তো পুত্র সন্তানের আশা পোষণ করতেন। তা সত্ত্বেও কোন সন্তান হয়নি। এটা কি বিস্ময়কর ও প্রকৃতির নিয়ম-কানুনের ব্যতিক্রম ব্যাপার নয়?

খৃষ্টান ধর্মযাজক ও প্রাচ্যবিদরা মহানবী (সা)-এর একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারেও সমালোচনা করেছেন। তাদের এ সমালোচনা অমূলক। মহানবী (সা)-এর একাধিক স্ত্রী গ্রহণের পটভূমি ও ইতিহাস তুলে ধরলেই পাঠকরা তা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন।

হযরত সাওদার সাথে বিবাহ

মহানবী (সা)-এর সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার বিবাহের পর তিনি আটাশ বছর জীবিত ছিলেন। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি। হযরত খাদীজার ইন্তেকালের পর মহানবী (সা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিনতে যামআর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এর আগে হযরত সাওদা ছিলেন সুকরান ইবনে আমরের স্ত্রী। খৃষ্টান সমালোচকদের অভিযোগ অনুযায়ী হযরত সাওদা (রা) খ্যাতিসম্পন্ন সুন্দরী ছিলেন না। এই বিয়ের কারণ হলো যেসব মুসলমান ইসলামের প্রথম দিকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছেন, হযরত সাওদা (রা) ছিলেন তাদের একজন। প্রথম স্বামীর সাথে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছেন। এই সফরে অন্যান্য মুহাজিরের সাথে তিনিও সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টের শরীক ছিলেন। আবিসিনিয়ায় তাঁর প্রথম স্বামী ইন্তেকাল করেন। এই মহীয়সী নারী অসাধারণ ধৈর্য ও সহনশীলতার নযীর স্থাপন করেন। তাঁর এই অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকারের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা) তাঁকে উম্মুল মু'মিনীন উপাধি লাভের সম্মান দান করেন। মহানবী (সা)-এর এই পদক্ষেপ সত্যি অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা)

হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রা) ছিলেন মহানবী (সা)-এর দুইজন সাহাবীর কন্যা। তাঁদের সাথে মহানবী (সা)-এর পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)-কে নিজের আরও ঘনিষ্ঠ করা। যেমন তিনি হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রা)-কে ঘনিষ্ঠতর করার জন্য নিজের মেয়েদের তাঁদের নিকট বিয়ে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি তাঁর এই ভালবাসা ছিল বৈবাহিক জীবনে। প্রাক-বৈবাহিক জীবনে তা কখনো ছিল না। মহানবী (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয় নয় বছর বয়সের সময়। আর এ বয়সের কোন কিশোরীর সাথে প্রেম-প্রীতিমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠার কোন প্রশ্নই ওঠে না। হযরত হাফসা (রা)-এর সাথেও বিয়ের আগে কোন আন্তরিক সম্পর্ক ছিল না। হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর ভাষ্য থেকেও একথা জানা যায়। তিনি বলেছেন :

“আল্লাহর শপথ! প্রাক-ইসলামিক যুগে আমাদের নিকট নারীর কোন মর্যাদা ছিল না। কিন্তু ইসলাম তাদের অধিকার দান করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীর মাধ্যমে (মৃতের) পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের জন্য একটা অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একদিন কোন ব্যাপারে কোন এক ব্যক্তির সাথে আমি পরামর্শ করছিলাম। আমাদের কথার মাঝখানে আমার স্ত্রী এসে বলল, ‘এরূপ করুন’। আমি তাকে এজন্য ধমক দিলাম। সে বলল, ‘হে ইবনুল খাত্তাব! বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, আপনি নিজের কাজে কারো হস্তক্ষেপ সহ্য করছেন না। কিন্তু আপনার কন্যা রাসূলুল্লাহকে তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করে অসন্তুষ্ট করে রেখেছে। এমন কি পুরো একদিন হাফসা মহানবী (সা)-কে অসন্তুষ্ট করে রাখে।’ হযরত ওমর (রা) বলেন, আমি আমার চাদরটি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে হাফসার ওখানে গেলাম। তাকে বললাম, হে আমার কন্যা! তুমি কেন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ঝগড়া কর ? যার জন্য সারা দিন তিনি অসন্তুষ্ট থাকেন। হাফসা (রা) বলল, 'কোন কোন সময় এরূপ হয়ে যায়। আমি বললাম, 'হে হাফসা! আমি তোমাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ সম্পর্কে সতর্ক করতে এসেছি। হে হাফসা! এ ব্যাপারে তুমি আয়েশার সমকক্ষ হতে চেয়ো না। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত ভালবাসেন।' অতঃপর হযরত ওমর (রা) আরো বললেন, 'হে আমার কন্যা! আমি জানি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে (আয়েশার মতো) ভালবাসেন না। আমার মন জয় করা যদি তাঁর লক্ষ্য না হতো, তাহলে তিনি তোমাকে তালুক দিয়ে দিতেন।'

উপরোক্ত ভাষ্য থেকে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, মহানবী (সা) প্রেম-প্রীতির প্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসাকে বিয়ে করেননি। বরং তাঁদের পিতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি তাঁদের বিয়ে করেছিলেন।

হযরত যয়নব বিনতে খোযায়মা

হযরত যয়নব বিনতে খোযায়মা ছিলেন হযরত উবায়দা ইবনে হারেছ ইবনে আবদুল মোত্তালিবের স্ত্রী। হযরত উবায়দা ইবনে হারেছ বদর যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর স্ত্রী হযরত যয়নব বিনতে খোযায়মা অকাতরে দান-খয়রাত করতেন। এজন্য তিনি 'উম্মুল মাসাকীন' বা বিত্তহীনদের মাতা নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও নেককার মহিলা ছিলেন। সুন্দরী হিসাবে তাঁর কোন খ্যাতি ছিল না। বয়সের দিক থেকে তিনি ছিলেন প্রৌঢ়। মহানবী (সা)-এর সাথে হযরত যয়নব বিনতে খোযায়মার বিয়ে হবার পর মাত্র দুই কিংবা তিন বছর তিনি জীবিত ছিলেন। হযরত খাদীজার পর মহানবী (সা)-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইন্তিকাল করেন।

হযরত উম্মে সালামা

হযরত উম্মে সালামা (রা) ছিলেন হযরত আবু সালামার স্ত্রী। তাঁদের কয়েকটি সন্তান ছিল। হযরত আবু সালামা (রা) উহুদ যুদ্ধে আহত হন। ক্ষতস্থান না শুকততেই মহানবী (সা) হযরত আবু সালামাকে অধিনায়ক করে হামরাউল আসাদ অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি সফল অভিযান চালিয়ে মদীনা ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর ক্ষতস্থানগুলোর মুখ খুলে যায়। তিনি আর সুস্থ হন না। এই অবস্থায়ই কিছুদিন পর ইন্তিকাল করেন। মহানবী (সা) হযরত আবু সালামার মৃত্যুর সময় শয্যাপাশে ছিলেন। তাঁর পবিত্র আত্মা নশ্বরদেহ ত্যাগ করছিল। মহানবী (সা) তাঁর জন্য মাগফেরাত কামনা করছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্র দু'চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে আসে। হযরত আবু সালামার ইন্তিকালের চার মাস পর মহানবী (সা) হযরত উম্মে সালামার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। তিনি বলেন, 'আমার বয়স অনেক হয়েছে। তা ছাড়া বেশ ক'টা সন্তান-সন্ততি রয়েছে।' তিনি প্রস্তাব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। মহানবী (সা) পুনরায় পয়গাম পাঠান। এবার হযরত উম্মে সালামা (রা) সম্মতি প্রকাশ করেন। বিয়ের পর মহানবী (সা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার সন্তানদের লালন-পালনের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। এই পটভূমির প্রেক্ষিতে নির্দিধায় বলা যায় যে, এই বিয়েও হযরত উম্মে সালামার সৌন্দর্যের জন্য হয়নি। তারপরও খৃষ্টান ধর্মযাজক ও প্রাচ্যবিদরা অপপ্রচার করেছেন, মহানবী

(সা) হযরত উম্মে সালামার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। নারীর সৌন্দর্যেই যদি মহানবী (সা)-এর এই বিয়ের পিছনে কারণ হতো, তা'হলে সে সময় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে অনেক সুন্দরী যুবতী ছিল। ধনৈশ্বর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকেও তাদের সাথে হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর কোন তুলনাই হয় না। প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকে তাদের কোন সন্তান-সন্ততিও ছিল না। মহানবী (সা) সেসব সুন্দরীর মধ্য থেকে কাউকে নিজের পছন্দমত বেছে নিতে পারতেন। আর এরূপ করা তাঁর জন্য কোন কঠিন ব্যাপারও ছিল না। কিন্তু তিনি তা করেননি। বস্তুত যে মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে মহানবী (সা) হযরত যয়নব বিনতে খোযায়মাকে তাঁর সহধর্মিণী হওয়ার সম্মান প্রদান করেছিলেন এখানেও সে একই উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল। এই সব সম্বন্ধের মাধ্যমে মহানবী (সা) মুসলমানদের সাথে তাঁর সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ ও মজবুত করে তোলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শ্রেষ্ঠত্ব মুসলমানদের মনে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা) এই আত্মীয়তার সম্পর্ককে উপলক্ষ হিসাবে গ্রহণ করেন। তাতে তাঁকে তারা একদিকে আল্লাহ তা'আলার রাসূল হিসাবে মনে করতেন, অপরদিকে মনে করতেন তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক পিতা। প্রতিটি বিত্তহীন, পরনির্ভরশীল, বিধবা, অনাথ ও ইয়াতীমের প্রতি মহানবী (সা)-এর সীমাহীন সমবেদনা ছিল। তারা তাঁকে তাদের অত্যন্ত আপনজন হিসাবে মনে করত।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলাফল

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, দেশ ও জাতির সাধারণ অবস্থায় এক স্ত্রী নিয়েও জীবন যাপন করা যায়। মহানবী (সা) তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সুদীর্ঘ আটশ বছর হযরত খাদীজাকে নিয়ে জীবন যাপন করেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি, পরিবেশ ও ক্ষেত্র বিশেষে পবিত্র কোরআন চারজন স্ত্রী গ্রহণেরও অনুমতি প্রদান করেছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلْثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

“নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চারজনকে বিয়ে করবে। যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে নিয়েই (সন্তুষ্ট) থাকবে।” (৪ : ৩)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ .

“এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি কখনো সমান ব্যবহার করতে পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং অপরকে ঝুলিয়ে রেখ না।” (৪ : ১২৯)

হিজরতের অষ্টম সালে একাধিক স্ত্রী সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত দুইটি আয়াত নাযিল হয়। মহানবী (সা)-এর সব বিয়ে এর আগেই সম্পন্ন হয়। এরপর তিনি আর কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি। পবিত্র কোরআনের উক্ত দু'টি আয়াতে স্ত্রীদের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়ার আগে স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। যে কেউ নিজেদের ইচ্ছে মতো স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত। এক শ্রেণীর লোক মহানবী (সা)-এর সমালোচনা করে বলে, “তিনি অন্যদের জন্য যে ব্যাপারটি নিষিদ্ধ করেছেন, নিজের বেলায় তা করেননি।” ইসলামে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সম্পর্কে উপরোক্ত পটভূমির প্রেক্ষিতে তাদের এই অভিযোগ অমূলক বলে প্রমাণিত হয়। তা'ছাড়া একাধিক স্ত্রী গ্রহণ ইসলামে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেয়া হয়েছে। যদি সব স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি রক্ষা করা সম্ভব হয় কেবলমাত্র তখনই একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কোরআনের উপরে উদ্ধৃত আয়াতে এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি পুরোপুরি রক্ষা করা মানুষের পক্ষে এক সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই একজন স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় একজন স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার করা নিঃসন্দেহে উত্তম ব্যাপার। কিন্তু অনেক সময় জাতীয় জীবনে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তখন একজন পুরুষের চারজন স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধই নয়, অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সে অবস্থায়ও স্ত্রীদের প্রতি সুষমতা বজায় রাখতে হবে। এ দিকটির প্রতি সব সময় যত্নবান হতে হবে। একবার মহানবী (সা)-এর আমলেই বিভিন্ন যুদ্ধে অনেক পুরুষ শাহাদাত বরণ করেন। মুসলিম সমাজে বিধবা সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য মহানবী (সা) পুরুষদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। তাতে বহু বিবাহ ব্যাপক শুরু হয়। কোন বিশ্বযুদ্ধ, মহামারী কিংবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে সমাজে পুরুষের সংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পেলে তখনও কি একই স্ত্রী নিয়ে জীবন যাপন করতে হবে। এই বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকে কি বহু বিবাহের সমালোচকরা অস্বীকার করতে পারেন? পাশ্চাত্যের এক স্ত্রীর প্রবক্তারা কি এই দাবি করতে পারেন যে, বিশ্বযুদ্ধের পর এক স্ত্রী গ্রহণের বিধান তাদের সমাজে বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর ছিল? মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে আর্থ-সামাজিক যে অবক্ষয় নেমে আসে, তার প্রধান কারণ হলো সেখানে নারী-পুরুষের মধ্যে আইনানুগ কোন সহযোগিতা ছিল না। এই সহযোগিতা থাকলে সেসব দেশের স্বামীহীনা মহিলারা পুরুষের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সক্ষম হতো। তাতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ থাকত এবং সেখানকার সমাজব্যবস্থা বিশৃংখলার অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করত। আমরা আমাদের এই মূল্যায়নের ভার পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদদের সঠিক সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। তাঁরা এ ব্যাপারে বিদেষমুক্ত ও নিরপেক্ষ মন-মানসিকতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করবেন। এক্ষেত্রে আমরা শুধু এই বলতে চাই যে, স্বাভাবিক অবস্থায় একজন স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা কোন পরিবারের জন্য সত্যি কল্যাণকর ব্যাপার। কিন্তু অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একথা অকাট্য নয়।

হযরত যয়নব বিনতে জাহশের ঘটনা

হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রা) সম্পর্কে কোন কোন মুসলিম বর্ণনাকারী মনগড়া কাহিনী বর্ণনা করেছেন। প্রাচ্যবিদ ও খৃষ্টান ধর্মযাজকরা এসব কাহিনী লুফে নিয়েছেন। তাঁরা এসব

কাহিনীকে নিজেদের বর্ণনামূল্যের মাধ্যমে প্রণয় কাহিনীর রূপ দিয়েছেন। অথচ এসব কাহিনী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মহানবী (সা) হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সেরা এবং মানবজাতির মুক্তির দিশারী। এসব কাহিনী তাঁর বেলায় তো দূরের কথা, একজন চরম বস্তুবাদী মানুষের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত অশোভনীয়। প্রকৃতপক্ষে হযরত যয়নব ও হযরত যায়েদের ঘটনার মাধ্যমে মহানবী (সা) তাঁর একটি পবিত্র বাণীকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন : **لا يكمل ايمان المرء حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه** “কোন মানুষের ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, অপর ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে না।”

মহানবী (সা) অজ্ঞতার যুগের মানুষে মানুষে ভেদাভেদের নিন্দনীয় কুপ্রথা নির্মূল করার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম নিজের আপনজনদের মধ্যেই এই বিপ্লবের সূচনা করেন। মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নতুন জীবন ব্যবস্থার এদিক থেকে যাতে কোন দুর্বলতা না থাকে তা দূর করার জন্য তিনি এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নিজের আত্মীয়কে একজন মুক্ত ক্রীতদাসের নিকট বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এ পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি মানবজাতিকে বুঝিয়েছেন, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসাবে অভিজাত বংশীয় হযরত যয়নব আর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস হযরত যায়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রা) ছিলেন মহানবী (সা)-এর ফুফাত বোন। ছোট বেলায় মহানবী (সা)-এর সামনে খেলাধুলা করে বড় হয়েছেন। তিনি তাঁকে ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছেন। বলা চলে হযরত যয়নব ছিলেন মহানবী (সা)-এর ছোট বোন কিংবা কন্যাতুল্য। তাঁর সাথে হযরত যয়নবের এই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাও উক্ত কাহিনীর ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করে। তা ছাড়া মহানবী (সা) নিজেই হযরত যায়েদের সাথে হযরত যয়নবের বিয়ের প্রস্তাব করেন। সত্যি যদি হযরত যয়নবের সৌন্দর্য-লাবণ্য মহানবী (সা)-এর মনে রেখাপাত করে থাকত, তাহলে তিনি নিজের জন্যই তো বিয়ের প্রস্তাব করতে পারতেন! তাতে তো কোন প্রতিবন্ধকতাও ছিল না। বস্তুত মহানবী (সা) ও হযরত যয়নবের আত্মীয়তার সম্পর্ক, তাঁর সামনে হযরত যয়নবের যৌবনপ্রাপ্তির মিথ্যে কাহিনীর রূপকারদের উদ্ভট কল্পনার প্রতি বিরাট আঘাত বই কিছু নয়। এসব বাস্তবতার সামনে সমালোচকদের অপবাদের এতটুকু মূল্য নেই।

হযরত যায়েদের সাথে বিয়ে

হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রা) ছিলেন মহানবী (সা)-এর ফুফাত বোন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পৃষ্ঠপোষকতায়ই লালিত-পালিত হন। ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা) হযরত যয়নবের সাথে হযরত যায়েদের বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন। কিন্তু হযরত যয়নবের ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহশ (রা) এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তাঁর বোন অভিজাত কুরাইশ বংশের হাশেম গোত্রীয়। তিনি মহানবী (সা)-এর ফুফাত বোন হওয়ার সম্মানের অধিকারী। উভয় দিক থেকে এরূপ শরীফ যুবতীর সাথে (হযরত) যায়েদের বিয়ে হতে পারে না। কারণ তিনি কুরাইশ বংশীয় হযরত খাদীজার ক্রীতদাস ছিলেন। মহানবী (সা)-কে উপহার দেয়া হলে তিনি তাকে মুক্ত করে দেন। অভিজাত বংশীয় কুমারীকে মুক্ত ক্রীতদাসের নিকট বিয়ে দেয়া শুধু (হযরত) যয়নবের জন্যই নয়, সারা আরবের

অভিজাত শ্রেণীর জন্য লজ্জাকর ব্যাপার হবে। কিন্তু মহানবী (সা) এ ধরনের বংশগত বৈশিষ্ট্য নির্মূল করার জন্য বন্ধপরিকর ছিলেন। তাঁর মতে আরব হওয়াটাই প্রতি অনারবের উপর শ্রেষ্ঠত্বের নিশ্চয়তা বিধায়ক নয়। পবিত্র কোরআনের ভাষায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিধায়ক হচ্ছে : “تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ بِرَبٍّ وَكِيمٍ” “তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক সাবধানী।” (৪৯ : ১৩)

মহানবী (সা) আরবের এই বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব নির্মূল করার অভিযান নিজ বংশ থেকেই শুরু করার মনস্থ করেন। এই মহান লক্ষ্য সামনে রেখেই নিজের ফুফাত বোন হযরত যয়নবকে হযরত যায়েদের সাথে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিলেন। কারণ নিজের বংশ ছাড়া এ ধরনের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ সে যুগ ও পরিবেশে অন্য কোথাও সম্ভবপরও ছিল না। হযরত যায়েদ শুধু মুক্ত ক্রীতদাসই ছিলেন না, তিনি মহানবী (সা)-এর পোষ্যপুত্র হওয়ার সম্মানেরও অধিকারী ছিলেন। আরবের তৎকালীন রীতি অনুযায়ীই অন্যান্য রক্ত সম্পর্কের উত্তরাধিকারীদের সাথে পোষ্যপুত্রও মহানবী (সা)-এর সম্পদের উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু পরে ইসলাম এই প্রথার অবসান ঘটায়।^১ সে যাই হোক, মহানবী (সা)-এর বারবার অনুরোধে তার ফুফাত বোন হযরত যয়নব ও তাঁর ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা) এ বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। তাদের এই সম্মতি প্রদানের প্রশংসায় পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ - وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا .

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু’মিন পুরুষ কিংবা কোন মু’মিন নারী সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তার রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।” (৩৩ : ৩৬)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত যয়নব ও তাঁর ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা) আরো খোলা মনে মহানবী (সা)-এর প্রস্তাবের প্রতি নিজেদের সম্মতি প্রকাশ করেন। এরপর হযরত যায়েদ ও হযরত যয়নব (রা)-এর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। হযরত যায়েদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা) দেনমোহর পরিশোধ করেন। কিছুদিনের ভিতরে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। হযরত যয়নব (রা) নিজের বংশমর্যাদা নিয়ে গর্ব করতেন। হযরত যায়েদকে হয়ে দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, “আমি মুক্তিপ্রাপ্ত নই।” সব সময় হযরত যয়নবের এ ধরনের আচরণ হযরত যায়েদের জন্য অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। তিনি প্রায়ই মহানবী (সা)-এর নিকট স্ত্রীর আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করতেন। তিনি স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অনুমতি চাইতেন। প্রতিবারই মহানবী (সা) হযরত যায়েদকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, “নিজের স্ত্রীকে তালাক দিও না। আল্লাহ তা’আলাকে ভয় কর!” কিন্তু হযরত যয়নবের সাথে জীবন যাপন করা হযরত যায়েদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। কিছু দিন অপেক্ষা করেও দেখলেন,

১. পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা ইসলামের এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তেরও সমালোচনা করেছেন। অথচ প্রায় দেড় হাজার বছর পর আধুনিক বিশ্বও এই বিধানের যথার্থতা অস্বীকার করতে পারেনি। স্বয়ং বৃটিশ আইনেই এর ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। বৃটিশ ভারতে অনেক জমিদারের দত্তক পুত্রকে বৃটিশ আইনে অস্বীকার করা হয়েছে। -অনুবাদক

হযরত যয়নবের ব্যবহারের কোন প্রকার পরিবর্তন হয়নি। অবশেষে তিনি হযরত যয়নবকে তালাক দিয়ে আলাদা হয়ে যান।

অজ্ঞতার যুগে আরব দেশে পোষ্য সন্তানকে ঔরসজাত সন্তান ও অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের সমতুল্য গণ্য করা হতো। তারা অন্যান্য উত্তরাধিকারীর মতো পোষ্য সন্তানদেরও মৃতের সম্পদের অংশ প্রদান করত। মহানবী (সা) এই কুপ্রথাটিও নির্মূল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পোষ্যদের অবাধে ঘরে প্রবেশ করা, বংশমর্যাদা কিংবা অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে ঔরসজাত সন্তানদের সমপর্যায়ের গণ্য করা এবং মৃতের সম্পদের অংশীদার করাটা মহানবী (সা) পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন পোষ্যপুত্রদের অধিকার একজন বন্ধু কিংবা ধর্মীয় ভাইয়ের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত নয়। অবশেষে পোষ্যপুত্রদের অধিকার নির্ধারণ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ - ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ - وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ .

“এবং পোষ্য পুত্র--যাদের তোমরা পুত্র বল, আল্লাহ তাদের পুত্র করেননি, এসব তোমাদের মুখের কথা। সত্য কথা আল্লাহ্ই বলেন এবং তিনিই সকল পথ নির্দেশ করেন।” (৩৩ : ৪)

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত ভাষ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, যে কোন লোক তার পোষ্যপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা কোন মহিলাকে বিয়ে করতে পারে। এই কুপ্রথার সংস্কারকেই সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর পোষ্যপুত্রকেও তা মেনে নিতে হবে। কিন্তু আরব দেশে এই কুপ্রথাটি শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে সামাজিক নিয়মে পরিণত হয়েছিল। এটা তাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা চাড়াখানি ব্যাপার ছিল না। মহানবী (সা)-এর মতো দৃঢ় সংকল্প ও ঐশী প্রজ্ঞার অধিকারী মহান ব্যক্তিত্ব ছাড়া কারো পক্ষে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছিল সম্পূর্ণ কল্পনাভীত ব্যাপার। আল্লাহ তা‘আলার প্রজ্ঞা ও কৌশলের গভীর উপলব্ধি মহানবী (সা)-কে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তা‘আলার বিধান প্রবর্তন করার লক্ষ্যে মহানবী (সা) তাঁর পোষ্যপুত্র হযরত যায়েদ কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হযরত যয়নবের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু তাঁর অন্তরে এই অনুভূতিও ছিল যে, দেশের এত পুরনো একটি প্রথা ভঙ্গ করলে মানুষ তাঁকে কি বলবে। মহানবী (সা)-এর মনের এই অনুভূতি প্রকাশ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَتَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ .

“তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিয়েছেন ; তুমি লোকভয় করলে অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত।” (৩৩ :

আল্লাহ্ তা'আলার বিধান বাস্তবায়নের ব্যাপারে সকল উম্মতের মধ্যে মহানবী (সা) ছিলেন অগ্রগামী। এসব বিধান প্রচারের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। আর তাই তিনি মানুষকে কি বলবে, তার প্রতি তোয়াক্কা করলেন না। তিনি তাঁর মুক্ত ক্রীতদাস হযরত যায়েদের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করলেন। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার বিধান বাস্তবায়নে মানুষের পরিবর্তে আল্লাহকেই ভয় করতে হবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا - وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا .

“অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেসব মহিলাকে বিয়ে করায় মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।” (৩৩ : ৩৭)

(আবারও হযরত যয়নবের কথা পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়) তিনি ছিলেন মহানবী (সা)-এর ফুফাত বোন। এই আত্মীয়তার দরুন হযরত যায়েদের সাথে হযরত যয়নবের বিয়ের আগে তিনি সব সময় মহানবী (সা)-এর সামনে চলাফেরা করেছেন। তিনিই ছিলেন তাঁদের বিয়ের ঘটক। এমনকি বিয়ের পরও পর্দার বিধান প্রবর্তিত হওয়ার আগে মহানবী (সা) ও হযরত যয়নবের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তিনি মহানবী (সা)-এর খেদমতে আসা-যাওয়া করতেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন মহানবী (সা)-এর পোষ্যপুত্রের স্ত্রী। হযরত যায়েদ ও যয়নবের মধ্যকার তিক্ত সম্পর্ক দূর করার জন্যও মহানবী (সা)-কে তাঁদের সেখানে একাধিকবার যেতে হতো। বিশেষ করে তাঁদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল শুরু হওয়ার পর থেকে তো তাঁকে যেতেই হতো। এসব আয়াতে তালাকের পর মহানবী (সা)-এর সাথে হযরত যয়নবের বিয়েরও ইঙ্গিত ছিল। পবিত্র কোরআনের এসব ভাষ্যে বর্ণিত বিধানের মাধ্যমেই মুক্ত ক্রীতদাসকে নাগরিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। পোষ্যপুত্রকে ঔরসজাত সন্তানের সমতুল্য গণ্য করার প্রচলিত কুপ্রথার অবসান করা হয়েছে। তারা এতদিন মৃত ব্যক্তির (ধর্মপিতার) পরিত্যক্ত সম্পদে যে অনধিকার সুযোগ লাভ করে আসছিল পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত বিধানের মাধ্যমে তাও রহিত করা হয়েছে।

এসব বাস্তব ঘটনা ও তথ্যের আলোকে নির্দিধায় বলা যায় যে, এ ব্যাপারে প্রাচ্যবিদ ও খৃষ্টান ধর্মযাজকদের কল্পকাহিনীর সামান্যতম গুরুত্ব নেই। এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়, উইলিয়াম ম্যুর, অরফ্যাঞ্জ, স্প্রিংগার, সেল, ডরমিংহাম, লা মেনস প্রমুখ প্রাচ্যবিদ এসব কল্পকাহিনীর অসারতা জানা সত্ত্বেও কেন তাঁরা নিজেদের গ্রন্থরাজিতে এসবকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করলেন। এর পিছনে কী উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই, ইসলাম ও মহানবী (সা) সম্পর্কে গবেষণার ছদ্মাবরণে এসব প্রাচ্যবিদ আসলে নিজেদের খৃষ্টধর্ম প্রচার করেছেন। ক্রুশেডের যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে কয়েক শতাব্দী থেকে এসব খৃষ্টান লেখকের মনে বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। মহানবী (সা) সম্পর্কে গ্রন্থরাজি লিখে এসব গ্রন্থে মহানবী (সা)-এর সহধর্মিণীগণ, বিশেষ করে হযরত যয়নব (রা) সম্পর্কে অপবাদ রটিয়ে

নিজেদের মনের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ প্রকাশের অপচেষ্টা করেছেন। তাঁরা জেনেও দুর্বল ও ভিত্তিহীন বর্ণনারাজিকে নিজেদের গবেষণার উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ঐতিহাসিক বিচারে তাঁরা মহা অন্যায় করেছেন। ইতিহাস তাদের এই অপরাধ কোন দিন ক্ষমা করবে না। তারা যদি সঠিক বর্ণনারাজিকে তাঁদের গবেষণার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতেন, তাহলে আমরা তাদের অভিমত মেনে নিতাম। সেক্ষেত্রেও আমরা বলতাম, মহামানবরা পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের জন্য রচিত কোন কোন আইন-কানূনের উর্ধ্বে থাকেন। যেমন হযরত মূসা, হযরত ঈসা ও হযরত ইউনুস (আ)-এর বেলায় এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। হযরত মূসা (আ) একজন কিবতী বা মিসরীয়কে হত্যা করা সত্ত্বেও শাস্তিযোগ্য হননি। হযরত ঈসা (আ) পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছেন। খৃষ্টানরা তাঁকে ‘পবিত্র আত্মা’ ইত্যাদি বলেছে। বস্তুত এভাবে আল্লাহ তা‘আলার কুদরতে জন্মলাভ করাটাই তাঁর জন্য পবিত্রতার কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশের ব্যতিক্রম ঘটানোর পরিণতিতে হযরত ইউনুস (আ)-এর উপর চরম বিপদ নেমে এসেছিল। বস্তুত নবী-রাসূলদের জীবনে এ জাতীয় ঘটনাবলি প্রকাশ পাওয়ার দরুন তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও পূত-পবিত্রতা সম্পর্কে সমালোচনা করা হয় না। আর সমালোচনা করাও ঠিক হবে না।

কিন্তু মহানবী (সা)-এর বেলায় এসে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী ও খৃষ্ট ধর্মযাজকরা ব্যতিক্রম মন-মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অথচ মহানবী (সা) আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে মানবজাতির জন্য একটা বৈশ্বিক সমাজ ব্যবস্থার বুনয়াদ স্থাপন করেন। তিনি আল্লাহ তা‘আলার পথ প্রদর্শন অনুযায়ী উক্ত সমাজ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেন। আল্লাহ তা‘আলার বিধান প্রচার-প্রসারে তিনি অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রদর্শন করেন। পবিত্র কোরআনে তাঁর অনুপম জীবনাদর্শের প্রশংসা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টির সেরা এবং এরূপ সর্বগুণের অধিকারী মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সমালোচনা প্রসঙ্গে খৃষ্ট ধর্মযাজক ও প্রাচ্যবিদরা বলেছেন, “তিনি অন্যদের জন্য চার স্ত্রী নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু নিজের বেলায় তা করেননি। চারজন স্ত্রী রেখে অন্য স্ত্রীদের তিনি তালাক দিলেন না কেন?” আমরা বলব, মহানবী (সা) যদি এরূপ করতেনও, তবু তিনি খৃষ্টান সমালোচকদের নিন্দাবাদের হাত থেকে কি রেহাই পেতেন? বস্তুত মহিলা সমাজের প্রতি তিনিই সবচেয়ে বেশি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য তিনি যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, ইতিপূর্বে তা আর কেউ করেননি। নারীদের প্রতি তাঁর অমায়িক ব্যবহার ছিল এক অনুপম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত। হযরত ওমরের বর্ণনা থেকেও তা পরিষ্কার প্রতিভাত হয়। হযরত ওমর (রা)-এর বর্ণনাটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইউনুস (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে নিনোয়া যাওয়ার নির্দেশ করেন। সেখানে গিয়ে নিনোয়াবাসীদের পাপাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলেন। কিন্তু এই নির্দেশ পাওয়ার পরও হযরত ইউনুস (আ) নিনোয়ায় না গিয়ে ইফায় চলে যান। সেখান থেকে জাহাজযোগে তিনি তরমিস রওয়ানা দেন। এই জাহাজ সাগরে প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পতিত হয়। সাগরের এক বিরাট মাছ তাঁকে গিলে ফেলে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেন। তিনি মাছের পেট থেকে উদ্ধার পান। (ইনাহ : ১-১০ অধ্যায়) -অনুবাদক

৩। স্তম্ভ-কায়নুক-পার-বনু-নযীরকে-ও-তাদের-ষড়যন্ত্র-ও-একগুঁয়েমির-শান্তি-হিসাবে-মদীনা-থেকে-বের-করে-দেয়া-হয়।-দ্বিতীয়-বদর-অভিযানে-আবু-সুফিয়ান-যুদ্ধ-না-করেই-মক্কা-ফিরে-যায়।-গাতফান-ও-দুমা-তুল-জান্দালে-মুসলমানদের-সফল-সামরিক-অভিযান-দেখে-আরবের-অন্যান্য-গোত্রের-যুদ্ধংদেহী-মনোভাবে-অনেকটা-ভাটা-পড়ে।-এ-সময়-মদীনায়-মুসলমানদের-শান্তিপূর্ণ-জীবনযাপনের-কিছুটা-সুযোগ-হয়।-কিন্তু-কখনো-তারা-কোথাও-বাণিজ্যিক-সফরে-যেতে-পারতেন-না।-এমনকি-চাষাবাদ-করার-জন্য-তখনো-অবাধে-মদীনা-শহরের-বাইরে-যাওয়ার-পরিবেশ-সৃষ্টি-হয়নি।-বিভিন্ন-যুদ্ধ-ও-অভিযানে-মুসলমানরা-যেসব-ধন-সম্পদ-লাভ-করেছিলেন-তার-দ্বারা-এ-সময়ে-তাদের-জীবিকা-নির্বাহ-করতে-হয়েছে।-এই-বিরতিকালীন-সময়েও-মহানবী-(সা)-শত্রুদের-দিক-থেকে-নিশ্চিন্ত-ও-নিষ্ক্রিয়-ছিলেন-না।-সময়-আসার-আগেই-যাতে-শত্রুকে-মোকাবেলার-প্রস্তুতি-গ্রহণ-করা-যায়-তার-জন্য-মহানবী-(সা)-এ-সময়ে-চারদিকে-তার-গোয়েন্দাদের-ছড়িয়ে-দেন।-প্রকৃতপক্ষে-এ-ছাড়া-মুসলমানদের-কোন-উপায়ও-ছিল-না।-কারণ-তখনো-কুরাইশ-ও-অন্যান্য-শত্রু-গোত্রগুলো-মুসলমানদের-বিরুদ্ধে-রেখেছিল।-তাছাড়া-আচার-অনুষ্ঠানের-প্রতি-অন্ধ-বিশ্বাস-এবং-রক্ষণশীল-হওয়া-সত্ত্বেও-বেদুঈন-নির্বিশেষে-আরবের-সকল-অধিবাসীর-মধ্যে-একটা-গণতান্ত্রিক-ব্যবস্থা-প্রতিষ্ঠিত-ছিল।-প্রতিটি-জনপদই-ছিল-অনেকটা-ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-সার্বভৌম-রাষ্ট্রের-মতো।-কিন্তু-তা-সত্ত্বেও-তাদের-পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ-এমনকি-ধর্মীয়-ধ্যান-ধারণায়-একটা-অভিন্নতা-ছিল।-এসব-জনপদের-অধিবাসীরা-আঞ্চলিক-দূরত্ব-থাকা-সত্ত্বেও-একে-অপরের-অত্যন্ত-ঘনিষ্ঠ-ছিল।-এরূপ-ঘনিষ্ঠতা-পৃথিবীর-অন্য-কোন-জাতির-মধ্যেই-কেউ-দেখাতে-পারবে-না।-মহানবী-(সা)-একজন-আরব-হওয়ার-দরুন-তঁার-দেশে-বসবাসকারী-প্রতিটি-জাতির-মন-মানসিকতা-সম্পর্কে-তিনি-পুরোপুরি-অবহিত-ছিলেন।-হিংস্র-আরবরা-যে-কোন-সময়-মুসলমানদের-উপর-ঝাঁপিয়ে-পড়তে-পারে।-এ-ব্যাপারে-তিনি-সব-সময়-শঙ্কিত-থাকতেন।-মক্কার-কুরাইশরা-বদরে-তাদের-নিহতদের-প্রতিশোধ-গ্রহণের-জন্য-মুসলমানদের-রক্ত-পিপাসু-ছিল।-বনু-কায়নুকা-ও-বনু-নযীরকে-মুসলমানরা-মদীনা-থেকে-বের-করে-দিয়েছিলেন।-এজন্য-তারা-ছিল-মুসলমানদের-চরম-শত্রু।-বনু-গাতফান-ও-বনু-হুযায়লরাও-মুসলমানদের-উপর-প্রতিশোধ-গ্রহণের-ফন্দি-ফিকিরে-ছিল।-এ-ছাড়া-গোত্রীয়-সংকীর্ণতার-দরুন-প্রতিটি-আরবই-একে-অপরের-সাহায্যের-জন্য-এক-পায়ে-দাঁড়িয়ে-ছিল।-এরূপে-আরবের-প্রতিটি-লোক-বিভিন্ন-কারণে-মহানবীর-উপর-মৃত্যুপণ-করেছিল।-তারা-আরও-হিংসার-আগুনে-জ্বলছিল-এজন্য-যে,-মাত্র-সেদিন-যে-লোকটি-শুধুমাত্র-আল্লাহর-উপর-বিশ্বাস-স্থাপন-করে-কোন-প্রকার-ধন-সম্পদ-ছাড়াই-মাতৃভূমি-ছেড়ে-বেরিয়ে-এসেছিলেন, তিনি-মাত্র-পাঁচ

খন্দকের যুদ্ধ ও বনু কোরায়যা

বনু কায়নুকার পর বনু নযীরকেও তাদের ষড়যন্ত্র ও একগুঁয়েমির শান্তি হিসাবে মদীনা থেকে বের করে দেয়া হয়। দ্বিতীয় বদর অভিযানে আবু সুফিয়ান যুদ্ধ না করেই মক্কা ফিরে যায়। গাতফান ও দুমা তুল জান্দালে মুসলমানদের সফল সামরিক অভিযান দেখে আরবের অন্যান্য গোত্রের যুদ্ধংদেহী মনোভাবে অনেকটা ভাটা পড়ে। এ সময় মদীনায় মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের কিছুটা সুযোগ হয়। কিন্তু কখনো তারা কোথাও বাণিজ্যিক সফরে যেতে পারতেন না। এমনকি চাষাবাদ করার জন্য তখনো অবাধে মদীনা শহরের বাইরে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযানে মুসলমানরা যেসব ধন-সম্পদ লাভ করেছিলেন তার দ্বারা এ সময়ে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছে। এই বিরতিকালীন সময়েও মহানবী (সা) শত্রুদের দিক থেকে নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। সময় আসার আগেই যাতে শত্রুকে মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায় তার জন্য মহানবী (সা) এ সময়ে চারদিকে তার গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে এ ছাড়া মুসলমানদের কোন উপায়ও ছিল না। কারণ তখনো কুরাইশ ও অন্যান্য শত্রু গোত্রগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে রেখেছিল। তাছাড়া আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস এবং রক্ষণশীল হওয়া সত্ত্বেও বেদুঈন নির্বিশেষে আরবের সকল অধিবাসীর মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতিটি জনপদই ছিল অনেকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সার্বভৌম রাষ্ট্রের মতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ এমনকি ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় একটা অভিন্নতা ছিল। এসব জনপদের অধিবাসীরা আঞ্চলিক দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও একে অপরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। এরূপ ঘনিষ্ঠতা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যেই কেউ দেখাতে পারবে না। মহানবী (সা) একজন আরব হওয়ার দরুন তাঁর দেশে বসবাসকারী প্রতিটি জাতির মন-মানসিকতা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। হিংস্র আরবরা যে কোন সময় মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এ ব্যাপারে তিনি সব সময় শঙ্কিত থাকতেন। মক্কার কুরাইশরা বদরে তাদের নিহতদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুসলমানদের রক্ত-পিপাসু ছিল। বনু কায়নুকা ও বনু নযীরকে মুসলমানরা মদীনা থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এজন্য তারা ছিল মুসলমানদের চরম শত্রু। বনু গাতফান ও বনু হুযায়লরাও মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ফন্দি-ফিকিরে ছিল। এ ছাড়া গোত্রীয় সংকীর্ণতার দরুন প্রতিটি আরবই একে অপরের সাহায্যের জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এরূপে আরবের প্রতিটি লোক বিভিন্ন কারণে মহানবীর উপর মৃত্যুপণ করেছিল। তারা আরও হিংসার আগুনে জ্বলছিল এজন্য যে, মাত্র সেদিন যে লোকটি শুধুমাত্র আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে কোন প্রকার ধন-সম্পদ ছাড়াই মাতৃভূমি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, তিনি মাত্র পাঁচ

বছর সময়ের মধ্যে মদীনায়ে অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছেন। আশেপাশের প্রতিটি শহর, জনপদ এবং মরুপ্রান্তরে বসবাসকারী প্রতিটি আরব গোত্র তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

ইহুদীদের চরম শত্রুতা

অন্যান্য শত্রুর তুলনায় ইহুদীরা মহানবী (সা)-এর শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে অধিক অবহিত ছিল। তাদের এও জানা ছিল যে, ইসলামের প্রচার-প্রসারের ফলশ্রুতি হিসাবে মহানবী (সা) যে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হবেন, তাতে ইহুদীদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। আরবে ইহুদীরাও একত্ববাদ প্রচার করত। খৃষ্টানদের প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যই তাদের সাথে ইহুদীদের শত্রুতা ছিল। ইহুদীরা আশা পোষণ করত যে-কোনভাবে একদিন তারা খৃষ্টানদের উপর জয়ী হবে। আর তাদের এই আকাঙ্ক্ষা অযৌক্তিক ছিল না। কারণ আরবরা ছিল সেমেটিক। তারা স্বভাবগতভাবেই একত্ববাদ প্রভাবিত ছিল। ইহুদীদের দৃষ্টিতে ত্রিত্ববাদের অনুসারী খৃষ্টানদের কোন স্থান ছিল না। এদিকে মহানবী (সা)-ও ছিলেন সেমেটিক বংশোদ্ভূত। তিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে মানুষকে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানাতেন। তিনি তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের মাধ্যমে মানুষের মন-মানসিকতাও উন্নত করে তুলেছিলেন। তাছাড়া অল্পদিনের মধ্যেই তিনি (সা) অকল্পনীয় শক্তিও অর্জন করে ফেলেন। তিনি প্রথমে ইহুদী বনু কায়নুকা গোত্রকে তাদের ঘৃণ্য ভূমিকার জন্য মদীনা ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। এরপর বনু নযীরকে শহর থেকে বের করে দেন। কারণ এরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বনু কায়নুকাদের অনুসরণ করেছিল। নিজেদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে যাওয়ার সময় এই দুটি ইহুদী গোত্রের মধ্যে দু'টি বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারা কি মুসলমানদের উপর কোন প্রকার প্রতিশোধ নেয়া ছাড়াই পূর্ব পুরুষের জন্মভূমি বায়তুল মোকাদাসের দিকে চলে যাবে, না যে করেই হোক আরব গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। তারা শেষোক্ত বিষয়টি বেছে নেয়। আর এ ব্যাপারে বনু নযীররাই ছিল অগ্রগামী।

ইহুদীদের দূত

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বনু নযীররা তাদের একটি প্রতিনিধিদল মক্কায়ে পাঠায়। এই প্রতিনিধিদলে ছিল বনু নযীর গোত্রের হুয়াই ইবনে আখতাব, সালাম ইবনে আবী হাকীক, কানানা ইবনে আবী হাকীক এবং বনু ওয়ায়লের দুই ব্যক্তি হাওয়া ইবনে কায়েস ও আবু আম্মার। মক্কাবাসীরা হুয়াই ইবনে আখতাবকে বনু নযীরদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। হুয়াই বলল, “তারা মদীনা ও খায়বরের মাঝখানে শিবির স্থাপন করে তোমাদের পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে। তারা তোমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে (হযরত) মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের উপর আক্রমণ করার জন্য অধীর প্রতীক্ষা করছে।” এরপর কুরাইশরা বনু কোরায়যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তারা তখনো মদীনায়ে অবস্থান করছিল। হুয়াই বলল, “বনু কোরায়যারা (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে প্রতারণায় রাখার জন্য এখনো মদীনায়ে অবস্থান করছে। তারা সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে।”

ইসলামের উপর পৌত্তলিকতার প্রাধান্য

হুয়াই ইবনে আখতাবের মুখে এসব কথা শুনে কুরাইশরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে মহানবী (সা)-এর উপর আক্রমণ করা ঠিক হবে কিনা, এ সম্পর্কে তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পড়ে যায়। তারা ভাবে, একত্ববাদ নিয়ে মহানবী (সা)-এর সাথে তাদের বিরোধ শুরু হয়েছিল। এখন একত্ববাদের আহ্বানের প্রভাববলয় দিন দিন বেড়েই চলেছে। হয়তো তাঁর মতাদর্শই সঠিক। নতুবা এরূপ হবে কেন। কুরাইশদের মনে এ ধরনের প্রশ্ন জাগার পর তারা ইহুদী প্রতিনিধিদলকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। তারা বলে, “হে ইহুদী ভাইসব! কিতাবধারী হওয়ার দরুন আপনারা জ্ঞান-গরিমায় অনেক উন্নত। আমাদের ও (হযরত) মুহাম্মদের মধ্যকার মতবিরোধও আপনারা জানেন। এখন বলুন তো আমাদের ধর্ম উত্তম, না আমাদের শত্রু (হযরত) মুহাম্মদের ধর্ম উত্তম।” ইহুদীরা বলল, “ইসলামের তুলনায় আপনাদের ধর্মই উত্তম। আপনারাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।” ইহুদীদের এই সত্য গোপন সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَبْتِ
وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا .
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا .

“তুমি কি তাদের দেখ নাই, যাদের কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল, তারা জিবত ও ‘তাগুতে’ বিশ্বাস করে, তারা কাফেরদের সম্বন্ধে বলে, এদের পথই মু’মিনদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর।’ এরা তারা, যাদের আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন এবং আল্লাহ্ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি কখনো তার কোন সাহায্যকারী পাবে না।” (৪ : ৫১-৫২)

এক ইহুদী ঐতিহাসিকের সমালোচনা

ইহুদী ঐতিহাসিক ডঃ ইসরাঈল উলফান্শন তাঁর স্ব-ধর্মীয়দের সমালোচনা করেছেন। তিনি ইহুদী প্রতিনিধিদল কর্তৃক একত্ববাদের বিপরীতে পৌত্তলিকতার প্রশংসা করাকে গর্হিত আচরণ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর “আরবে ইহুদীদের ইতিহাস” নামক প্রখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন :

“ইহুদীরা কুরাইশদের নিকট একত্ববাদের বিপরীতে পৌত্তলিকতার প্রশংসা করে অন্যায় কাজ করেছে। তারা আশংকা করেছিল, কুরাইশদের নিকট এ ধরনের মন্তব্য না করা হলে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাযী হবে না। কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষ বনী ইসরাঈলরা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতির সাথে বিরূপ সংগ্রামরত ছিল আরবের ইহুদীরা তা ভুলে গিয়েছিল। তাদের পূর্বপুরুষদের অনেক লোক একত্ববাদ প্রচারের সংগ্রামে শাহাদাত বরণ করেছেন। শুধু আল্লাহ্ তা‘আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দরুন তাদের অসংখ্য লোক আহত হয়েছে। ইহুদীদের

১. ‘জিবত’ প্রতিমার নাম। আর ‘তাগুতের’ আভিধানিক অর্থ সীমালংঘনকারী, দুষ্কৃতির মূল বস্তু, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইত্যাদি। সুতরাং সকল প্রকার বিভ্রান্তিকর উপায়-উপকরণ তাগুতের অন্তর্ভুক্ত।

উচিত ছিল, পৌত্তলিকতা নির্মূল করার জন্য নিজেদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করা। তাদের কর্তব্য ছিল নিজেদের সব বিষয়-সম্পদ এ পথে ব্যয় করা। কিন্তু তারা তা করেনি। তারা বরং পৌত্তলিকতার প্রশংসা করেছে। তাদের এই ভূমিকা তাওরাতের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাতে পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করা এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।”

বিভিন্ন আরব গোত্রে যুদ্ধের আন্দোলন

হুয়াই ইবনে আখতাব ও ইহুদী প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা কুরাইশদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, কয়েক মাস পর যুদ্ধ শুরু করা হবে। কিন্তু ইহুদী প্রতিনিধিদল এ ব্যাপারে শুধু কুরাইশদের সাথে চুক্তি সম্পাদনই যথেষ্ট মনে করেনি। তারা আরবের অন্যান্য গোত্রকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করে তোলে। তারা প্রতিটি গোত্রে গিয়ে এ ব্যাপারে প্রচারাভিযান চালায়। এসব গোত্রের মধ্যে ছিল বনী গাতফান, বনী মুররাহ, বনী ফাযারাহ, বনী আশজা', বনী সোলায়ম, বনী সাআদ, বনী আসাদ প্রমুখ। বিশেষ করে যেসব গোত্রের কোন লোক মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল, ইহুদীরা তাদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য খুবই উত্তেজিত করে তোলে। এসব গোত্রকে আশ্বাস প্রদান করা হয় যে, কুরাইশরাও আমাদের সাথে রয়েছে। যুদ্ধের এই প্রচারাভিযানে ইহুদীরা বিভিন্ন গোত্রের নিকট পৌত্তলিকতার প্রশংসাসূচক কবিতা আবৃত্তি করে। তাদের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে, এই যুদ্ধে আমাদের জয় অবধারিত।

বনু নযীর গোত্রের এই প্রচার অভিযান অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। চারদিকে রণ-দামামা বেজে ওঠে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কাফেররা চারদিক থেকে দলে দলে বেরিয়ে পড়ে। মক্কা থেকে আবু সুফিয়ান চার হাজার সৈন্য নিয়ে বের হন। তাতে তিন শ' সৈন্য ছিল অশ্বারোহী। দ্রুতগামী উট ছিল দেড় হাজার। 'দারুন নাদওয়ায়' বসে কুরাইশদের পতাকা তৈরি করা হয়। ওসমান ইবনে তালহাকে পতাকাবাহীদের নেতৃত্ব প্রদান করা হয়। তার পিতা তালহা উহুদ যুদ্ধে কুরাইশ পতাকা বহনকালে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল। এ জন্য এ যুদ্ধে তাকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। ফাযারা গোত্রের বিপুল সংখ্যক যুবক যুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হয়। বাহন হিসাবে তাদের ছিল এক হাজার দ্রুতগামী উট। তাদের অধিনায়ক ছিল উয়ায়নিয়া ইবনে হাসান ইবনে হোযায়ফা। আশজা ও মুররা গোত্র থেকে আসে চার শ' করে সৈন্য। তাদের অধিনায়ক ছিল যথাক্রমে মিসআর ইবনে রোখায়লা ও হারেছ ইবনে আওফ। বনী সোলায়েম গোত্র থেকে সাতশ' সৈন্য সমবেত হয়। অনুরূপ বনী সাআদ ও বনী আসাদ গোত্র থেকেও লোক জড়ো হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। তাদের প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হন আবু সুফিয়ান ইবনে হারব। এই বিরাট বাহিনী মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। পথে বিভিন্ন বাহিনীর অধিনায়করা তাদের সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করে চলছিল।

মুসলমানদের ভয়-ভীতি

মদীনায় মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে এই বিরাট বাহিনী এগিয়ে আসার খবর পায়। তাঁরা ঘাবড়ে যান। তাঁরা ভাবেন, এই বিরাট বাহিনী হয়তো আমাদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে

ফেলবে। তাঁরা কখনো কখনো চিন্তা করতেন, ‘এরূপ বিরাট বাহিনী আরবের ইতিহাসে কখনো সমবেত হয়নি। এ কি হতে চলেছে! কখনো উহুদ রণাঙ্গনের স্মৃতি তাঁদের মনে ভেসে উঠত। তাঁরা ভাবতেন এর চেয়ে অনেক কমসংখ্যক সৈন্য উহুদে আমাদের পরাজিত করেছে। এবার এরূপ বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা কি করে টিকে থাকব? তা’ছাড়া শত্রুদের রয়েছে অঢেল অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন ও রসদপত্র!

মুসলমানরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এবার খোলা ময়দানে যাওয়া হবে না। শহরে থেকেই প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু এই পদ্ধতিতেও শত্রুপক্ষের বিরাট বাহিনীর মোকাবেলা করা ছিল এক সাধ্যাতীত ও অকল্পনীয় ব্যাপার। হযরত সালমান ফারসী (রা) এ সময় মদীনায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন রণকৌশলবিদ। তিনি এমন কিছু রণকৌশল জানতেন যার সাথে আরবরা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। মুসলমানদের এই নায়ক পরিস্থিতিতে তিনি পরামর্শ দিলেন, আভ্যন্তরীণ শক্তি সুসংহত করে শহরের চারদিকে খন্দক বা পরিখা খনন করতে হবে। হযরত সালমান ফারসীর পরামর্শ অনুযায়ী পরিখা খনন শুরু হয়। মহানবী (সা)-ও তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনিও মাটিভর্তি টুকরী বহন করতেন। এই দৃশ্য সাহাবীদের পরিখা খননে সীমাহীন প্রেরণার সঞ্চার করে। বস্তুত এটাও ছিল মহানবী (সা)-এর সত্যের প্রতি আহ্বানের বিশেষ কৌশল। ইহুদী বনু কোরায়যারা তখনো মদীনায় অবস্থান করছিল। তাদের সাথে মুসলমানদের মৈত্রী চুক্তি তখনো বলবত ছিল। তাদের নিকট কোদাল, শাবল, টুকরী প্রভৃতি মাটি কাটার উপকরণ অনেক ছিল। সেগুলো তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। ছয় দিনে পরিখা খনন সম্পন্ন হয়। যেসব বাড়ি শত্রুর আক্রমণের আওতায় ছিল, এ সময় সেগুলো মেরামত করা হয়। নারী ও শিশুদের সংক্ষিপ্ত ও নিরাপদ এক বাসস্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রয়োজনের সময় শত্রুর উপর নিষ্ক্ষেপ করার জন্য পরিখার ভিতর প্রান্তে অঢেল পাথর টুকরো জমা করে রাখা হয়।

পরিখা দেখে কুরাইশদের বিস্ময়

কুরাইশরা মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় এই আশা নিয়ে এসেছিল যে, গত যুদ্ধের মতো এবারও উহুদেই বোঝাপড়া হবে। এই আশায় তারা উহুদ ময়দানে এসে শিবির স্থাপন করে। সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে অবশেষে তারা মদীনার দিকে অগ্রসর হয়। মদীনার উপকণ্ঠে এসে পরিখা দেখে তারা বিস্মিত হয়ে পড়ে। এই রণকৌশলের সাথে তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তারা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে এবং বলতে থাকে, “এটা কি যুদ্ধের কোন পদ্ধতি হলো? এ তো দস্তুরমত কাপুরুষতা ছাড়া কিছু নয়।” অবশেষে পরিখার অদূরে রোমা উপত্যকার ঋণাধারার নিকট কুরাইশ ও তার সহযোগী গোত্রগুলো শিবির স্থাপন করল। বনী গাতফান ও নজদবাসী নাকামা উপত্যকায় শিবির তৈরি করল।

এদিকে মহানবী (সা) তাঁর মাত্র তিন হাজার সাহাবী নিয়ে শহরের পরিখার দিকে সালআ’ পাহাড়ের পাদদেশে শিবির স্থাপন করেন। সেখানে মহানবী (সা)-এর জন্য লাল রংয়ের একটি ছাউনি তৈরি করা হয়। উভয় পক্ষের মাঝখানে ছিল পরিখা। কুরাইশ ও তার সহযোগী

১. মদীনা তিন দিক থেকে পাহাড় বেষ্টিত। এক দিক খোলা। শুধু সেই দিকটায় পরিখা খনন করা হয়।

—অনুবাদক

বাহিনী ভাবল, পরিখা অতিক্রম করা হবে মৃত্যুর নামান্তর। তারা পরিখা অতিক্রমের দুঃসাহস না করে তীর নিক্ষেপ শুরু করল। মুসলমানরাও তীর বর্ষণের মাধ্যমে প্রতি-উত্তর দেয়া আরম্ভ করলেন।

কাফের বাহিনীর শীত-ভীতি

আবু সুফিয়ান ও তার সহযোগীদের মনে এই প্রত্যয় জন্মে যে, পরিখা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আমাদের সফল হতে দেবে না। এমনিতে সে সময় তীব্র শীত পড়ছিল। এই সঙ্গে ছিল রক্ত জমাট করে দেয়ার মত কনকনে বাতাস। তার উপর বৃষ্টিপাতের আশংকা। প্রতিটি লোক মনে করছিল, তাদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে। কুরাইশ ও বনী গাতফানরা নিজেদের বাড়িঘরে এ ধরনের তীব্র শীত সহ্য করতে পারত। কিন্তু মদীনার মুক্ত প্রান্তরে সামান্য তাঁবুতে এরূপ তীব্র শীত সহ্য করা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। এই চরম প্রতিকূল আবহাওয়ার আশংকায় তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল। তারা ভাবছিল, এরূপ হাড়-কাঁপানো শীতের মধ্যে যদি আবার বৃষ্টিপাত হয়, তা'হলে মদীনার এসব তাঁবুতে তারা কিছুতেই বাঁচতে পারবে না। মৃত্যু তাদের অবধারিত। এসব যুদ্ধবাজ এই আশা নিয়ে এসেছিল যে, উহদের মত একই দিনে যুদ্ধ জয় করে ফেলবে। এরপর নিহত মুসলমানদের মাল-সামান নিয়ে বিজয়ের গান গাইতে গাইতে নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে যাবে। বনু নযীর গোত্রের ইহুদীরা বনী গাতফানদের সাথে ওয়াদা করেছিল, যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারলে খায়বরের বাগানগুলোর এক মওসুমের পুরো ফল তোমাদের দেয়া হবে। গাতফানদের মাথায় ইহুদীদের এই প্রতিশ্রুতি ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারা ভাবছিল, মদীনা শহর জয় করতে পারলে তারা খায়বরের অটেল ফলফলাদি লাভ করবে।

একদিকে ছিল এসব পাওয়ার আশা, অপরদিকে সামনে ছিল পরিখা। কিছুতেই তারা এই পরিখা অতিক্রম করার সাহস পাচ্ছিল না। কাফেররা তাদের ব্যর্থতা সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। বনু নযীররা আশংকা করছিল, গাতফানরা শীতের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে যদি খায়বরের ফল লাভের আশা ত্যাগ করে, তারা যদি শিবির ছেড়ে চলে যায়, তা'হলে আমাদের কি অবস্থা দাঁড়াবে।

কুরাইশদের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে চরম বিদ্বেষ বিরাজ করছিল। তারা বদর ও পরবর্তী কয়েকটি যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট শোচনীয় পরাজয়বরণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এবার পরিখা ও মদীনার সুরক্ষিত দুর্গগুলো প্রতিশোধ গ্রহণে দুর্লংঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অপরদিকে মদীনায় বসবাসরত ইহুদী বনু কোরাযযাদের পক্ষ থেকে আশংকা ছিল। তারা মুসলমানদের সাহায্য করছিল। তাদের এই সাহায্যও অবরোধকে দীর্ঘায়িত করছিল। কখনো কখনো কুরাইশরা ভাবত, মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার আশা ত্যাগ করে চলে গেলে ক্ষতি কি? আবার ভাবত, বারবার এত বড় বাহিনী জড়ো করা সহজ ব্যাপার নয়। এবার ইহুদীরা মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হুয়াই ইবনে আখতাবের নেতৃত্বে ঘুরেফিরে বিভিন্ন আরব গোত্রকে একত্র করেছে। এই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে এবং এই বিরাট বাহিনী নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে গেলে জয় হবে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর। এরপর চিরদিনের জন্য ইহুদীদের আর কোন মূল্য থাকবে না।

হুয়াই ইবনে আখতাবের চাল

বনু নযীর গোত্রীয় ইহুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবও পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিল। তার মনেও নানা ধরনের বিপদ-আশংকা উঁকিঝুঁকি মারছিল। সে নিজের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অত্যন্ত শংকিত ছিল। সে পরিস্থিতি অনুকূল রাখার জন্য সর্বশেষ চাল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে আরব বাহিনীকে বলে, মদীনায় বসবাসরত বনু কোরায়যা গোত্রকে আমি মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য সম্মত করার চেষ্টা করছি। এই উদ্যোগে কামিয়াব হলে মুসলমানদের রসদ বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া তাতে মুসলমানদের হামলা করারও পথ পাওয়া যাবে। এই কৌশল বাস্তবায়িত করা গেলে আমরা বিজয় লাভ করব। এই পরিকল্পনার কথা শুনে কুরাইশ ও বনী গাতফানরা অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে ওঠে।

মদীনায় বনু কোরায়যাদের নেতা ছিল কাআব ইবনে আসাদ। হুয়াইয়ের এই পরিকল্পনা কাআবও শুনতে পায়। হুয়াই ইবনে আখতাব তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাআবের নিকট রওয়ানা দেয়। কিন্তু হুয়াইয়ের পৌছার আগেই কাআব তার দুর্গের দরজা বন্ধ করে দেয়। কাআবের অবশ্য এই ধারণা ছিল যে, মহানবী (সা)-এর চুক্তিভঙ্গের পর মুসলমানরা পরাজিত হলে শুধু সে নিজেই নয়, পুরো ইহুদী সমাজ উপকৃত হবে। কিন্তু হানাদাররা পরাজিত হলে মুসলমানরা বনু কোরায়যাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে।

হুয়াই ইবনে আখতাবের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত কাআবকে তার দুর্গের দরজা খুলতে হয়। হুয়াই বলে, “হে কাআব! তোমার কী হয়েছে। আমি সারা আরবের প্রখ্যাত লোকদের সৈন্যবাহিনী একত্র করেছি। কুরাইশ ও গাতফানের লোকেরা তাদের গোত্রীয় প্রধানদের নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা চুক্তি করে এসেছে, “(হযরত) মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত এক পা-ও পিছনে হটবে না।” কিন্তু কাআব তখনো দ্বিধাম্বিত ছিল। সে বলল, “(হযরত) মুহাম্মদ (সা) সত্যবাদী। তিনি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।” সে বলল, ‘তাতে আমাদের পরিণাম খারাপ হবে।’ একথা বলে হুয়াইকে কোন প্রকার সহযোগিতা করতে অস্বীকার করল। কিন্তু হুয়াই ইবনে আখতাব বারবার পীড়াপীড়ি করছিল। সে বলল, “(হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে ইহুদীদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের শিকার হতে হয়েছে। এবারের আক্রমণ ব্যর্থ হলে তোমাদের পরিণামও অন্যান্য ইহুদীর ব্যতিক্রম হবে না।” এরপর সে হানাদার কাফের বাহিনীর শক্তি-সামর্থ্যের প্রশংসা করে বলল, “যদি পরিখাটি আমাদের সামনে প্রতিবন্ধক না হতো, তা’হলে কবেই না আমরা মুসলমানদের গুঁড়িয়ে ফেলতাম!” হুয়াই ইবনে আখতাবের এসব কথায় কাআব অনেকটা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সে হুয়াইকে বলল, “হানাদার বাহিনী ব্যর্থতা বরণ করে ফিরে গেলে আমাদের নিরাপত্তার কি অবস্থা হবে?” হুয়াই বলল, “এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আমরাও তোমাদের দুর্গে এসে অবস্থান গ্রহণ করব। তোমাদের সুখে-দুঃখে শরীক হবো।” এবার কাআবের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার ইহুদী মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সে তার ইহুদী ভাই হুয়াই ইবনে আখতাবের হাতে হাত রেখে মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিভঙ্গের কথা ঘোষণা করে।

বনু কোরাযযা ও মহানবী (সা)-এর দূত

মহানবী (সা) ও তাঁর শীর্ষস্থানীয় সাহাবারা বনু কোরাযযা ও হানাদার বাহিনীর নতুন ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে যান। তাতে মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবারা নতুন বিপদ আশংকায় কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। মহানবী (সা) আওস গোত্রের সরদার হযরত সাআদ ইবনে মুআয এবং খায়রাজ গোত্রের সরদার হযরত সাআদ ইবনে উবাদাকে আরো দুই ব্যক্তিসহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বনু কোরাযযাদের নিকট পাঠান। অপর দুই ব্যক্তি ছিলেন আউস গোত্রের হযরত খাওয়াত ইবনে জোবায়ের এবং খায়রাজ গোত্রের হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। তিনি তাঁদের এই উপদেশ দেন যে, যদি ইহুদীদের চুক্তিভঙ্গের খবর সত্য হয়, তাহলে ফেরার পথে তা মুসলমানদের নিকট প্রকাশ করবে না। কারণ তাতে মুসলমানরা আরো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

মহানবী (সা)-এর এসব দূত বনু কোরাযযাদের বস্তিতে গিয়ে দেখেন, তাঁরা যা শুনেছিলেন পরিস্থিতি তার চেয়েও অনেক খারাপ। তাঁরা কাআবের নিকট যান। সে এ ব্যাপারে আগে থেকেই চোখ-কান বুঁজে বসেছিল। সে মুসলমানদের দেখে আবোল-তাবোল বলা শুরু করে। কিন্তু তাঁদের বারবার বলাতে সে একটি শর্ত আরোপ করে বসে। সে বলে, “প্রথমে বনু নযীরদের পুনরায় শহরে বসবাস করার সুযোগ দিতে হবে।” হযরত সাআদ ইবনে মুআয (রা)-এর সাথে বনু কোরাযযাদের ব্যক্তিগত চুক্তিও ছিল। তিনি সমবেদনার সুরে কাআবকে বলেন, “তোমাদের পরিণতিও বনু নযীরদের অনুরূপ হতে পারে।” কিন্তু তাতেও বনু কোরাযযাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। বরং উল্টো তারা বলে উঠল, “রাসূলুল্লাহকে আমরা চিনি না। মুহাম্মদ বল। তাঁর সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই।” এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে কড়া বাক্য বিনিময় হয়। মুসলিম প্রতিনিধিরা সেখান থেকে উঠে চলে আসেন। বনু কোরাযযাদের চুক্তিভঙ্গ মহানবী (সা)-কে বেশ ভাবিয়ে তোলে। তাতে বিপদের আশংকা আরও ঘনীভূত হয়। বনু কোরাযযা কর্তৃক হানাদার বাহিনীকে শহরে ঢোকার সুযোগ করে দেয়ার আশংকা দেখা দেয়। এরূপ সুযোগ পেলে কাফের বাহিনী মুসলমানদের কচুকাটা করে ফেলবে। শুধু তাই নয়, বনু কোরাযযাদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ারও আশংকা ছিল।

আরব বাহিনীর সাহস

বনু কোরাযযা এবং হুয়াই ইবনে আখতাবের মধ্যকার আলোচনা সফল হয়। সে নিরাপদে কাফের বাহিনীতে ফিরে আসে। হুয়াই ইবনে আখতাব মিশনের সফলতায় কুরাইশ ও গাতফানদের সাহস বেড়ে যায়। তারা আঘাত হানার জন্য জোরেশোরে প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। হুয়াই ও কাআবের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাতে বনু কোরাযযারা আরব গোত্রগুলোর নিকট দশ দিন সময় চেয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল, এ সময়ের মধ্যে তারা যুদ্ধের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তুলবে। কিন্তু তাতে শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, আরব বাহিনী এই সময়ে মুসলমানদের উপর আঘাত হানবে এবং তা অব্যাহত রাখবে। কাফেররা মুসলমানদের উপর আঘাত হানার জন্য তাদের বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করে নেয় এবং পৃথক পৃথকভাবে তিনদিক থেকে এই আক্রমণ পরিচালনা করে। পূর্বদিক থেকে বনু আসাদ ও বনু গাতফান অগ্রসর হয়। মালেক ইবনে আওফ এবং উয়ায়না ইবনে হিস্ন গাতফান বাহিনীর পরিচালনার

দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর বনু আসাদ বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করে তোলায়হা ইবনে খোয়ায়লেদ আল আসাদী। পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হয় কুরাইশ ও বনু কানানা। তাদের পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল আবু সুফিয়ানের হাতে। পরিখার দিক থেকে এগিয়ে আসছিল আমর ইবনে সুফিয়ান ইবনে আওয়ার সুলামীর নেতৃত্বে একদল কাফের বাহিনী। এই ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

اِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَأَازِزَاتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا - هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا . وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا . وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا - وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ - وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ - إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا .

“যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল থেকে। তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল। তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সস্বন্ধে নানা সন্দেহে দোদুল্যমান ছিলে। তখন মু’মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং মোনাফেকরাও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল, ‘আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।’ এবং ওদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল।’ এবং ওদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিল, ‘আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত, যদিও সেগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।’ (৩৩ : ১০-১৩)

মদীনায অন্তরীণ মুসলমানদের উদ্বেগ

মদীনায অবরুদ্ধ মুসলমানদের চরম বিপদ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। অগণিত শত্রু-সৈন্য দেখে তারা ভীষণ চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। অবরুদ্ধদের মধ্যে একদল মোনাফেকও ছিল। তারা মুসলমানদের বলতে শুরু করল, “(হযরত) মুহাম্মদ আমাদেরকে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের অটল ধন-সম্পদ হস্তগত করার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, প্রাকৃতিক প্রয়োজনেও আজ আমরা যেতে পারছি না।” মুসলমানদের মধ্যে একটি শ্রেণী যুদ্ধবাজ আরব বাহিনী দেখে পাথরের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিল। তারা কুরাইশ ও গাতফানদের ঝলসানো তরবারিগুলো নিজেদের জন্য বিদ্যুতের চমক মনে করছিল। কিছুসংখ্যক মুসলমান বনু কোরায্যাদের চুক্তিভঙ্গের কারণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন। তারা দাঁতে দাঁত কামড়ে বলছিলেন, ‘হে ইহুদীগণ! তোমাদের উপর আল্লাহ্র গযব পড়ুক।’ মহানবী (সা) যদি বনু নযীরদের নির্বাসন না দিয়ে হত্যা করে ফেলতেন, তাহলে আজ আমাদের এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে হতো না। হে হুয়াই ইবনে

আখতাব, মহানবী (সা) তোমাকে জীবিত ছেড়ে দিয়েছিলেন, যার জন্য তুমি আজ কুরাইশ ও আরব গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছ। যে ভূমিতে মুসলমানরা আজ পরিখা খনন করে নিজেদের আত্মরক্ষায় লিপ্ত, মদীনার সে স্থানটিতে যদি হুয়াই ইবনে আখতাব ও তার সঙ্গীদের রক্ত বইয়ে দেয়া হতো, তাহলে সেখানে মুসলমানদের রক্ত বওয়ার কোন উদ্যোগই অবশিষ্ট থাকত না। এই বিরাট বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

কাফেরদের আক্রমণ

সারকথা, হুয়াই ইবনে আখতাবের ফিরে আসার পর হানাদারদের উন্মাদনা আরো বেড়ে যায়। পরিখার একটি অংশ অপেক্ষাকৃত সরু ছিল। তারা সেখান দিয়ে পরিখা পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে স্থানের দিকে কুরাইশ বাহিনী এগিয়ে চলে। তাদের সামনে ছিল কুরাইশদের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরযোদ্ধা আমর ইবনে আবদুদ। তার পিছনে ছিল ইকরামা ইবনে আবু জেহেল, যিয়ার ইবনে খাতাব প্রমুখ। তারা পরিখার সরু স্থান দিয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে দেন। মুহূর্তে তাদের ঘোড়া মুসলমানদের নিকটে এসে পড়ে। এদিক থেকে হযরত আলী ইবনে আবু তালিব, হযরত উমর (রা) প্রমুখ হানাদার পথ রুখে দাঁড়ান। এই অবস্থা দেখে কাফেরদের মধ্য থেকে আমর ইবনে আবদুদ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানায়। হযরত আলী (রা) তরবারি নিয়ে এগিয়ে যান। আমর বলে, ‘হে আমার স্নেহস্পদ! আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না।’ হযরত আলী (রা) বললেন, ‘কিন্তু আমি আমার তরবারি তোমার রক্তে রঞ্জিত করতে চাই।’ উভয়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। অবশেষে হযরত আলী (রা) আমর ইবনে আবদুদের দফা রফা করে ফেলেন। অন্য হানাদাররা ইবনে আবদুদের পরিণতি দেখে পিছনের দিকে ছুটে পালায়।

সূর্যাস্তের পর হানাদারদের মধ্য থেকে নওফেল ইবনে আবদুল্লাহ পরিখা অতিক্রমের জন্য এগিয়ে আসে। সে দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে পরিখা অতিক্রমের উদ্যোগ নিতেই ঘোড়াসহ পরিখার মধ্যে মুখ খুবড়ে পড়ে। পরিখা থেকে সে আর জীবিত উঠতে সক্ষম হয়নি। আবু সুফিয়ান নওফেলের লাশ ফিরিয়ে দেয়ার বিনিময়ে এক শ’ উট মুসলমানদের দেয়ার প্রস্তাব করে। মহানবী (সা) এই বলে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন যে, “খবীছের লাশের বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।” এরপর তার লাশ মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।

ইহুদীদের ঔদ্ধত্য

রাতে হানাদাররা এক বিরাট অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করা। সে রাতেই বনু কোরায়যাদের বীর যুবকরা নিজেদের বাসস্থান থেকে বেরিয়ে শহরে ঘোরাফেরা শুরু করে। মহানবী (সা)-এর ফুফু হযরত সুফিয়া বিনতে আবদুল মোত্তালিব (রা) হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত (রা)-এর পরিবারের সাথে তাঁর বাসস্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

১. ‘ফতহুল বারি’ কিতাবে ‘পরিখার যুদ্ধ’ শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হয়েছে, নওফেল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিহত হয়। হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম মতান্তরে হযরত আলী (রা)-এর তরবারির আঘাতে নওফেল নিহত হয়।

-অনুবাদক

হযরত সুফিয়া (রা) দেখতে পান, এক ইহুদী সে বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। তিনি হযরত হাস্‌সানকে গিয়ে বলেন, “দেখ, এক ইহুদী বাড়ির চারদিকে ঘোরাফেরা করছে। সে হয়তো অন্য ইহুদীদের নিয়ে আমাদের বাসস্থান আক্রমণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও শীর্ষস্থানীয় সাহাবীরা অন্যদিকে ব্যস্ত আছেন। তুমি নিচে যাও এবং উক্ত ইহুদীকে শেষ করে দাও।” হযরত হাস্‌সান বললেন, “হে আবদুল মোত্তালিবের কন্যা! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি তো জানেন, কারো উপর হাত উঠানোর মতো সাহসী লোক আমি নই।” হযরত হাস্‌সানের এই বক্তব্য শুনে হযরত সুফিয়া নিজেই একটি অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে যান। তিনি ইহুদীর মাথায় সজোরে অস্ত্রাঘাত করেন। এক আঘাতেই তার মৃত্যু ঘটে। অতঃপর তিনি ঘরে ফিরে এসে হযরত হাস্‌সানকে বলেন, “আমি পুরুষের শরীর থেকে অস্ত্র এবং পোশাক খুলতে পারি না, এ কাজটি সম্পন্ন করো।” কিন্তু হযরত হাস্‌সানের এই সাহসও ছিল না। তিনি বললেন, “আমার এসব জিনিসের প্রয়োজনই নেই।”

মদীনায় অবরুদ্ধ মুসলমানদের মধ্যে সে সময় চরম অস্থিরতা ও ভয়ভীতি বিরাজ করছিল। এই বিপদ থেকে কিভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তার কোন একটা উপায় বের করার জন্য মহানবী (সা) গভীর চিন্তা-ভাবনায় মশগুল ছিলেন। একথা সত্য যে, তখন রণাঙ্গনে শত্রুর মোকাবেলা করার মতো শক্তি মুসলমানদের ছিল না। আর তাই মহানবী (সা) বাধ্য হয়ে কোন একটা কৌশলের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য চেষ্টা করছিলেন। তিনি (সা) কোন একজন সাহাবীকে বনু গাত্‌ফানের নিকট পাঠান। তাঁর মাধ্যমে এই আশ্বাস দেয়া হয় যে,

১. অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ও জীবন-চরিত বিষয়ক গ্রন্থে লেখকের এই প্রতিবেদনের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন ‘তাবরানী’ ও ‘বায়যায়’ কিতাবে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে সর্বপ্রথম গাত্‌ফানদের নিকট কোন দূত পাঠাননি। বরং গাত্‌ফান নেতা হারেছই তার সম্প্রদায়ের তরফ থেকে মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দাবি করেছিল, “আপনি মদীনার ফসলের অর্ধেক আমাদেরকে রাজস্ব হিসাবে দেয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করুন। নতুবা আমাদের বাহিনীই মদীনাকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।” এই প্রস্তাবের জবাবে মহানবী (সা) বলেছিলেন, “আমি আউস ও খায়রাজ গোত্রের নেতাদের সাথে আলাপের পর তোমাদের এই দাবি সম্পর্কে আমার অভিমত জানাতে পারি।” অতঃপর মহানবী (সা) আউস ও খায়রাজ গোত্রের নেতা হযরত সাআদ ইবনে উবাদা এবং হযরত সাআদ ইবনে মুআযকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু তাঁরা পরিস্কার অসম্মতি প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, “হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এখন তো আমরা মুসলমান হয়েছি। এমনকি অজ্ঞতার যুগেও আমরা এ ধরনের অন্যায় শর্ত মেনে নেইনি।” হারেছ গাত্‌ফানী তার প্রস্তাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অভিমত জানার জন্য পুনরায় আসে। মহানবী (সা) তাকে এ ব্যাপারে আনসারদের অভিমত জানিয়ে দেন। রাজস্ব প্রদানে মুসলমানদের অসম্মতির কথা শুনে হারেছ অভিযোগ করে বলল, “হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছেন।” তার এই ধৃষ্টতামূলক উক্তি সাহাবারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত হারেছের উদ্দেশ্যে একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা আবৃত্তি করেন। হারেছ হযরত হাস্‌সানের এই বিদ্রূপবাণ সহ্য করতে পারছিল না। সে মহানবী (সা)-কে বলল, “হে মুহাম্মদ! আপনি অনুগ্রহ করে হাস্‌সানকে বারণ করুন। কারণ হাস্‌সানের এসব কবিতা সমুদ্রে ফেলে দিলেও সেখানকার অথৈ পানিকে তিত্ত করে ফেলবে।” বস্তৃত মুসলমানদের অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় বনু গাত্‌ফানরা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তারা নিজেরাই তাদের দলীয় সরদারকে দূত হিসাবে মহানবী (সা)-এর দরবারে পাঠায় এবং রাজস্ব দাবি করে। কিন্তু মদীনার এসব আবাদী জমি, ফলের বাগান ও উৎপাদিত ফসলের মালিক হচ্ছে আনসাররা। তাদের মতামত গ্রহণ ছাড়া যেমন মহানবী (সা)-এর পক্ষে কোন কিছু বলা সম্ভবপর ছিল না, তেমনি মতামতের

তারা রণাঙ্গন ছেড়ে চলে গেলে এর বিনিময়ে মদীনার ফসলের এক-তৃতীয়াংশ তাদের দেয়া হবে। বনু গাত্ফানের লোকেরা তার আগে থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েছিল। তারা ইহুদীদের চক্রান্তের শিকার হয়ে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার জন্য অনেকটা অনুতপ্ত ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, “এই বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আমরা কি পেলাম।”

নুআয়ম ইবনে মাসউদের রাজনীতি

হযরত নুআয়ম ইবনে মাসউদ (রা) মহানবী (সা)-এর অনুমতি নিয়ে বনু কোরায়যাদের নিকট যান। ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁর সাথে ইহুদীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা তখনো ইহুদীরা জানতে পারেনি। তিনি একজন কল্যাণকামী বন্ধুর বেশে বনু কোরায়যাদের নিকট যান। প্রথমে তিনি তাদের সাথে পুরনো বন্ধুত্বের স্মৃতিচারণ করেন। এরপর বলেন, “আপনারা কুরাইশ ও বনু গাত্ফানদের (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে একত্রিত করে এক বিরাট দুঃসাহসের কাজ করেছেন। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, কুরাইশ ও বনু গাত্ফানরা আর বেশি দিন এখানে থাকবে না। তারা অবরোধ তুলে চলে গেলে আপনারা (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবেন। তিনি আপনাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ছাড়বেন না। সবচাইতে দূরদর্শিতার কাজ হবে, প্রথমে কুরাইশ ও বনু গাত্ফানদের কিছু লোক জামানত হিসাবে আটক রাখা এবং এরপর যুদ্ধে আপনাদের পক্ষ থেকে তাদের সাহায্য করা।” বনু কোরায়যারা হযরত নুআয়ম ইবনে মাসউদের এই প্রস্তাব অত্যন্ত পছন্দ করে। তারা বলে, ‘আমরা আপনার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করব।’

হযরত নুআয়ম বনু কোরায়যাদের নিকট থেকে উঠে কুরাইশদের শিবিরে যান। তিনি তাদের বলেন, “আমি জানতে পেরেছি বনু কোরায়যারা (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে চুক্তিভঙ্গের জন্য অনুতপ্ত। এখন তারা তাঁকে খুশি করার জন্য চিন্তাভাবনা করছে। তারা চাচ্ছে কুরাইশদের কিছু লোককে যিম্মি হিসাবে গ্রহণ করে তাদেরকে (হযরত) মুহাম্মদের নিকট হস্তান্তর করবে। তিনি (সা) তাদের হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। ইহুদীরা যদি তোমাদের নিকট এ ধরনের প্রস্তাব নিয়ে আসে যে, তোমাদের কিছু লোককে আমাদের নিকট রেখে দাও, তোমরা এ প্রস্তাব কখনো গ্রহণ করবে না।” এরপর হযরত নুআয়ম ইবনে মাসউদ বনু গাত্ফানদের নিকট যান। কুরাইশদেরকে যা বলেছিলেন এখানেও তাই বললেন। তিনি কুরাইশদের মতো তাদেরকেও সাবধান করে দিলেন তারা যেন নিজেদের লোকদের বনু কোরায়যাদের নিকট হস্তান্তর না করেন।

ব্যতিক্রম কিছু করাও সম্ভবপর ছিল না। আর তাই গাত্ফান নেতাকে তিনি প্রথমে বলেছিলেন, এসব জমি ও ফসলের মালিক যারা, আমাকে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। মহানবী (সা)-এর এই মন্তব্যের পরিষ্কার অর্থ হলো, “তারা যা বলবে আমার জবাব তাই হবে।” তিনি আনসারদের খায়রাজ ও আউস গোত্রীয় নেতাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করেন। তাঁরা রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। আর এই অভিমতই তিনি গাত্ফান সরদারকে জানিয়ে দেন। তাতে প্রতারণার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অনেক মুসলিম ঐতিহাসিকই এ ব্যাপারটাকে অনেক জটিল করে তুলেছেন। -অনুবাদক

হযরত নুআয়ম ইবনে মাসউদের উপরোক্ত প্রস্তাবে কুরাইশ ও বনু গাত্ফানদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। আবু সুফিয়ান সঙ্গে সঙ্গে একজন দূত ইহুদী কাআব ইবনে আসাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি তাকে বলে পাঠান, “হে কাআব! আমরা বেশ কিছুদিন থেকে (হযরত) মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অবরোধ করে রেখেছি। কিন্তু তাতে কিছুই ফলোদয় হচ্ছে না। আমার প্রস্তাব হলো, আগামীকাল সকালেই আপনি তাঁদের আক্রমণ করুন। আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছি।” বনু কোরায়যাদের নেতা কাআব ইবনে হাদ বলল, “আগামীকাল শনিবার। এইদিন যুদ্ধ কিংবা অন্য কোন পার্থিব কাজ করা যায় না।” কাআবের এই জবাব শুনে আবু সুফিয়ানের বিশ্বাস হলো যে, (হযরত) নুআয়ম তাদের সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন। তিনি পুনরায় কাআবের নিকট খবর পাঠালেন, “এই শনিবারের উপাসনা আপনারা অন্য কোন শনিবারে করে নিবেন। আগামীকাল অবশ্যই হযরত মুহাম্মদের উপর আক্রমণ করতে হবে। আমরা যুদ্ধের জন্য বের হবো। আপনি যদি আমাদের পক্ষে অংশগ্রহণ না করেন, তাহলে মনে করা হবে, আমাদের সঙ্গে আপনার সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে আপনি (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর মিত্র হয়ে গেছেন।” কাআব পুনরায় বলে পাঠালো, “কোন অবস্থায়ই আমরা শনিবারে যুদ্ধ করতে পারি না। কেননা যারা এই পবিত্র দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেনি, তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছে। এমনকি তারা বানর ও শূয়রে পরিণত হয়েছে।” এই সঙ্গে বনু কোরায়যা কয়েকজন কুরাইশকে তাদের নিকট যিম্মি হিসেবে রাখার জন্য আবু সুফিয়ানের নিকট প্রস্তাব করে। বনু কোরায়যাদের একথা শুনে আবু সুফিয়ানের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, (হযরত) নুআয়ম ইবনে মাসউদ তাকে যা বলেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন তিনি কি করবেন, কি করা উচিত কিছুই ঠিক করতে পারছিলেন না। তিনি বনু গাত্ফানদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন। কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে মদীনার ফসলের অংশ লাভের আশায় বসেছিল। পরে হযরত সাআদ ইবনে উবাদা ও হযরত সাআদ ইবনে মুআযের পক্ষ থেকে তাদেরকে পরিস্কার জানিয়ে দেয়া হয় ফসলের অংশ দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বনু গাত্ফানরা আবু সুফিয়ানকে সাহায্য-সহায়তার কোন প্রকার বল-ভরসা দিতে পারেনি। কারণ মদীনার আউস ও খায়রাজ গোত্রের মুসলমানরা ফসলের অংশদানে অসম্মতি প্রকাশ প্রসঙ্গে গাত্ফানদের পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল, “বনু গাত্ফান ও আমাদের মধ্যে এ বিষয়ের সমাধান একমাত্র তরবারি করবে।” মুসলমানদের এরূপ তেজোদীপ্ত ঘোষণার পর গাত্ফানদের মনোবল ভেঙে যায়। তাঁরা যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পড়েন।

মরুঝাড়

সে রাতেই মরুঝাড় ও মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। মেঘ গর্জন ও বিদ্যুৎ চমক কাফেরদের অন্তরাখ্যা কাঁপিয়ে তোলে। বাতাসের দাপটে তাঁবুর রশিগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। একের পর এক তাঁবু বাতাসে উড়তে থাকে। এমনকি তাদের খাবার পাকানোর বিরাট বিরাট পাত্রগুলোও আকাশে বেলুনের মতো উড়তে থাকে। কাফের বাহিনীর প্রতিটি লোক ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে। তারা ভাবে, এ সময় যদি মুসলমানরা তাদের উপর আক্রমণ চালায় তাহলে তাদেরকে অত্যন্ত করুণ পরিণতির শিকার হতে হবে। আসাদ গোত্রের অধিনায়ক

তোলায়হা ইবনে খোয়ায়লেদ চিৎকার করে বলতে শুরু করে, “হে বন্ধুগণ! মুহাম্মদ (সা)-এর কারণেই আমাদের উপর এই বিপদ এসেছে। চল, এখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই।” আবু সুফিয়ান উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, হে কুরাইশগণ! ঝড় আমাদের বাহনের ঘোড়া, গাভী, উট সব শেষ করে ফেলেছে। বনু কোরায়যারা প্রথম থেকেই আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার উপর শুরু হয়েছে এই প্রলয়কংর ঝড়। এখন মুহূর্তের জন্য এখানে আমাদের অবস্থান করা ঠিক হবে না।

সারকথা, এসব হতভাগ্য অত্যন্ত হতবুদ্ধি ও অস্থির অবস্থায় সে স্থান থেকে ছুটে পালায়। তাদের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তারা নিজেদের সব মাল-সামানও সঙ্গে নিতে পারেনি। এমনকি পালানোর সময় এমন প্রবল বাতাস বইছিল যে, তারা চলার সময় নিজেদের দু’পা একত্র করতে পারছিল না। এই দৌড়াদৌড়িতে কুরাইশরা ছিল সবার আগে। তাদের পিছনে ছিল বনী গাত্ফানরা। আর এর পিছনে ছিল একের পর এক আরবের অন্যান্য গোত্র। তারা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে পালাচ্ছিল। শত চেষ্টা করেও অধিনায়করা তাদের মধ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে পারছিল না। সকাল হতে না হতেই শত্রু শিবিরগুলো জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। সেখানে কোন জনপ্রাণী ছিল না। প্রত্যুষে একজন মুসলমান দৌড়ে এসে মহানবী (সা)-কে খবর দিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি। শত্রুরা পালিয়ে গেছে। আমরা বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি।” এ খবর শুনেই মহানবী (সা) ও অন্য মুসলমানরা মদীনার চারদিকে ঘুরে শত্রুদের অনুসন্ধান করেন। কোথাও কাউকে দেখা গেল না। এই বিপদমুক্তির জন্য মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীরা আল্লাহ তা‘আলার দরবারে কৃতজ্ঞতা জানালেন। শত্রু-বাহিনীর পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا - وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ - وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا -

“আল্লাহ্ কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। যুদ্ধে মু‘মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।” (৩৩ : ২৫)

পরিস্থিতির মূল্যায়ন

আরব গোত্রগুলো মদীনা ত্যাগ করার পর মহানবী (সা) পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা ও মূল্যায়ন করেন। প্রথমেই অদূর ভবিষ্যতের একটি বিপদের আশংকা তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনি ভাবলেন, “শীত ও ঝড়ের দাপটে এবার শত্রুরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই বিপদ কাটেনি। শীত শেষে ইহুদীরা পুনরায় আরব গোত্রগুলোকে উত্তেজিত করবে। এক্ষেত্রে বনু কোরায়যাদের ব্যাপারটি মহানবী (সা) স্মরণ করেন। যদি কুরাইশ ও গাত্ফানদের সাথে তাদের মতবিরোধ না হতো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই শত্রুদের পথ দেখিয়ে শহরে নিয়ে আসত। আর তখন মুসলমানদের ধ্বংস ছিল অবধারিত। এখন বনু কোরায়যারা আমাদের প্রভাবাধীন রয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ সাময়িক। ইহুদীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে লেজকাটা সাপের মতো। এরূপ সাপের মতো ইহুদীদের দিক থেকেও যে কোন

মুহূর্তে আঘাত হানার আশংকা ছিল। এ জন্য মদীনায়ে বসবাসকারী বনু কোরায়যাদের নির্মূল করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

বনু কোরায়যা অভিযান

মহানবী (সা) এই লক্ষ্য সামনে রেখে মুয়াযযিনকে একটি ঘোষণা প্রচার করার নির্দেশ প্রদান করেন। আর সে ঘোষণাটি হলো, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত প্রতিটি লোক যেন বনু কোরায়যাদের বস্তিতে গিয়ে আসরের নামায আদায় করে।’ মহানবী (সা) হযরত আলীকে কিছুসংখ্যক মুসলমানসহ উক্ত ঘোষণা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘ দিন অবরুদ্ধ থাকার ফলে মুসলমানরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা উক্ত ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বনু কোরায়যাদের বস্তির উদ্দেশে রওয়ানা দেন। কারণ এই অভিযানে মুসলমানরা তাদের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। অবশ্য বনু কোরায়যা গোত্রের ইহুদীরা অত্যন্ত সুরক্ষিত দুর্গে বসবাস করত। কিন্তু এসব দুর্গ আত্মরক্ষার জন্যই অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। সেখানে থেকে প্রতিপক্ষকে হামলা করার ব্যাপারে এসব দুর্গ খুব একটা সুবিধাজনক ছিল না। তাছাড়া মুসলমানরা এর আগেও এ ধরনের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণকারী শত্রুর সাথে মোকাবেলা করেছেন। তাঁরা এর আগে দুর্গে অবস্থানকারী বনু নযীরদের পরিণতি প্রত্যক্ষ করেছেন। বনু নযীর আর বনু কোরায়যাদের ক্ষেত্রে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, বনু কোরায়যাদের দুর্গগুলো অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু বনু কোরায়যাদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণের কোনরূপ আশংকা ছিল না। কারণ পরিস্থিতি ছিল তখন মুসলমানদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। তাছাড়া কুরাইশ বাহিনী পালিয়ে যাওয়ার সময় প্রচুর খাদ্যশস্য ফেলে যায়। এসব খাদ্যশস্য মুসলমানদের হস্তগত হওয়ার ফলে খাদ্যাভাবেরও কোন আশংকা ছিল না। এসব কারণে মুসলমানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বনু কোরায়যা বস্তির উদ্দেশে হযরত আলী (রা)-কে অনুসরণ করেন।

তাঁরা সেখানে গিয়ে দেখেন, ইহুদীরা হুয়াই ইবনে আখতাবের সাথে আলাপ-আলোচনা করছে। মহানবী (সা) সম্পর্কে তারা অত্যন্ত অশোভনীয় কথাবার্তা বলছে। তাঁকে তারা মিথ্যাবাদী বলছে। এমনকি মহানবী (সা)-এর পবিত্র সহধর্মিণীগণ সম্পর্কেও অশোভন উক্তি করছে। আসলে কাফের বাহিনী ফিরে যাওয়ার পর তারা নিজেদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা মুখে যা আসছিল তাই বলছিল। ইতিমধ্যে মহানবী (সা) সেখানে পৌঁছান। হযরত আলী (রা) এগিয়ে গিয়ে বলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনি ইহুদীদের দুর্গগুলোর নিকট যাবেন না।” মহানবী (সা) বললেন, “কি হয়েছে, তারা কি আমার সম্পর্কে অশোভন উক্তি করেছে।” হযরত আলী বললেন, “জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ!” মহানবী (সা) বললেন, “আমার সামনে এ ধরনের কথাবার্তা বলার সাহস তাদের হবে না”—এ কথা বলে মহানবী (সা) তাদের নিকট এগিয়ে গেলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, “হে বানরদের ভাই বানরগণ! আল্লাহ তা‘আলা কি তোমাদের অপমানিত করেননি? তিনি কি তোমাদের উপর গযব অবতীর্ণ করেননি?” মহানবী (সা)-এর এই বক্তৃৎধানি শুনে ইহুদীরা বলে উঠল, “হে আবুল কাসেম! আপনি আমাদের ইতিহাস অবশ্যই জানেন।” সন্ধ্যা পর্যন্ত দলে দলে মুসলমানরা বনু কোরায়যাদের বস্তিতে এসে সমবেত হলেন। মহানবী (সা) ইহুদীদের বাসস্থানগুলো অবরোধ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

অবরোধ

বনু কোরাযযাদের এই অবরোধ দীর্ঘ পঁচিশ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময়ের ভিতর দুই-একবার ইহুদীদের তরফ থেকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। অবরোধকারী মুসলমানরাও তীর বর্ষণের মাধ্যমে জবাব প্রদান করেন। কিন্তু তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে মুসলমানদের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস করেনি। তারা ঘাবড়ে যায়। তারা ভাবে, এরূপে একদিন অবরোধের অবসান হবে। মুসলমানরা আমাদের খেফতার করতে সক্ষম হবে। তাতে করে দুর্গবন্দী অবস্থা আমাদের নির্ঘাত মৃত্যু ডেকে আনবে। বনু কোরাযযারা মহানবীর খেদমতে একজন দূত পাঠিয়ে অনুরোধ করে, “আবু লোবাবাকে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিন। এ ব্যাপারে তাঁর মাধ্যমে আলাপ করতে চাই।” আবু লোবাবা ছিলেন আউস গোত্রীয় একজন মুসলমান। তার সাথে বনু কোরাযযাদের ব্যক্তিগত চুক্তিও ছিল। মহানবী (সা)-এর অনুমতিক্রমে আবু লোবাবা ইহুদীদের নিকট যান। তাকে দেখে ইহুদী নারী ও শিশুরা তার চারদিকে এসে জড়ো হয়। তারা কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। তাতে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। এই দৃশ্য দেখে স্বয়ং আবু লোবাবাও অনেকটা প্রভাবিত হন। তারা হযরত আবু লোবাবাকে বলে, “হযরত মুহাম্মদের নিকট আমাদের আত্মসমর্পণের ব্যাপারটি আপনিও কি সমর্থন করেন?” হযরত আবু লোবাবা বললেন, “আমি তা সমর্থন করি।” এ কথা বলার সময় তিনি নিজের হাত বিশেষ ভঙ্গিতে ঘাড়ের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনেন। তার এই হাত ঘুরানোর অর্থ ছিল, “তোমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পার, তোমাদের জীবন দিতেই হবে। এরপর আবু লোবাবা সেখান থেকে চলে আসেন। জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থরাজিতে বলা হয়েছে, হাতের এই বিশেষ ইঙ্গিতের জন্য হযরত আবু লোবাবা পরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

কাআব ইবনে আসাদের অভিমত

হযরত আবু লোবাবা চলে আসার পর ইহুদী নেতা কাআব ইবনে আসাদ তাঁর গোত্রের লোকদেরকে তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু তারা কোনটাই গ্রহণ করতে চায়নি। কাআব বলেন, তোমাদের জন্য সবচাইতে উত্তম হলো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা। তাতে তোমাদের জান-মাল, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও বিষয়-সম্পত্তির কোন ক্ষতি হবে না। ইহুদীরা বলল, “আমরা তাওরাত বাদ দিয়ে অন্য কোন ধর্মমত ও ধর্মগ্রন্থ গ্রহণ করতে পারি না।” এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর কাআব বলল, “তা না হলে আসুন, আমরা আমাদের স্ত্রী-পুত্র-সন্তানদের হত্যা করে মোকাবেলার জন্য বেরিয়ে পড়ি। এরপর যদি আমরা সংঘর্ষে নিহত হই, তাহলে স্ত্রী-পুত্রদের ধ্বংস হওয়ার দুশ্চিন্তা নিয়ে যেতে হবে না। আর যদি বেঁচে যাই, তাহলে আমরা পুনরায় ঘর-সংসার গড়ে তুলব। এ প্রস্তাবও ইহুদীরা প্রত্যাখ্যান করে। তারা বলে, “নিজের হাতে স্ত্রী-পুত্রদের হত্যা করার পর যদি আমরা বেঁচেও যাই, তখন তাদের ছাড়া আমরা কিভাবে জীবন যাপন করব।” কাআব সর্বশেষে বললেন, তাহলে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করুন। তবে আত্মসমর্পণের পরিণতি কি হবে, তা আপনাদের সবারই জানা। বিশেষ করে আবু লোবাবার সেই বিশেষ ইঙ্গিতের কথা আপনাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। ইহুদীরা এ বিষয়ে গভীর আলাপ-আলোচনা করে। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলে, “আমাদের পরিণতি বনু নযীরদের চাইতে বেশি কিছু

হবে না।” আউস গোত্রীয় আমাদের মুসলিম বন্ধুরাও এ ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতায় কোন প্রকার ক্রটি করবে না। সিরিয়ার দিকে যেতে দেয়ার জন্য আমাদের দাবি করা উচিত। এসব আলাপ-আলোচনার পর ইহুদীরা মহানবী (সা)-এর নিকট দূত পাঠিয়ে আবেদন করল, “নিজেদের মাল-সামান নিয়ে আমাদেরকে সিরিয়ার জনপদে হিজরত করার সুযোগ দান করুন।” কিন্তু মহানবী (সা) তাদের এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, “তোমরা আত্মসমর্পণ কর।”

বনু কোরায়যারা আউস গোত্রীয় মুসলমানদের নিকট তাদের একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে বলল, “হে আউস গোত্রীয় বন্ধুগণ! খায়রাজরা যেমন বনু নযীরদের জন্য সুপারিশ করেছিল, আপনারাও আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। কারণ খায়রাজদের সাথে যেমন বনু নযীরদের চুক্তি ছিল, তেমনি আপনারদের সাথেও আমাদের চুক্তি রয়েছে। আউসরা তাদের এই প্রস্তাবে সম্মতি জানান। তারা মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করেন, “হে আল্লাহ্র নবী (সা)! খায়রাজরা বনু নযীরদের মিত্র ছিল। আপনি বনু নযীরদের সম্পর্কে খায়রাজদের সুপারিশ গ্রহণ করেছেন। বনু কোরায়যারা আমাদের বন্ধু। আমরা তাদের জন্য সুপারিশ করছি। আপনি তাদেরকে মাল-সামান নিয়ে মদীনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দান করুন।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “আমি নিজের এবং বনু কোরায়যাদের সম্পর্কে তৃতীয় একজন ফায়সালাকারীকে মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। তোমরা তা মানতে প্রস্তুত কিনা।” আউসরা তাতে সম্মতি জানায়। মহানবী (সা) বললেন, “এবার তোমরা বনু কোরায়যাদের নিকট যাও। তাদেরকে বল, তারা আউস গোত্রের যাকে ইচ্ছা এ ব্যাপারে বিচারক নিযুক্ত করতে পারে। আমিও তাদেরই নির্বাচিত ব্যক্তিকে বিচারক হিসাবে মেনে নিতে রাযী আছি।

বনু কোরায়যারা আউস গোত্রীয় হযরত সাআদ ইবনে মুআযকে বিচারক হিসাবে মনোনীত করে। কিন্তু তারা ভুলে গেছে, কাফের বাহিনী কর্তৃক মদীনা অবরোধকালে তারা মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে হানাদার বাহিনীর সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মুসলমানদের সেই বিপদসংকুল দিনগুলোতে এই হযরত সাআদ ইবনে মুআযই মহানবী (সা)-এর দূত হিসাবে বনু কোরায়যাদের নিকট এসেছিলেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি তাদের অনুরোধ করেন। কিন্তু সেদিন তারা হযরত মুআযের অনুরোধের এতটুকু গুরুত্ব দেয়নি। তারা শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধেই নয়, মহানবী (সা) সম্পর্কেও অশালীন উক্তি করেছিল। ভাগ্যের কি পরিহাস। আজ তারা সেই হযরত সাআদ ইবনে মুআযকেই নিজেদের সালিস হিসাবে মনোনীত করল।

সাআদ ইবনে মুআযের সালিসি

হযরত সাআদ একজন বিজ্ঞ বিচারক হিসাবে প্রথমে তাঁর রায় মেনে নেয়ার ব্যাপারে উভয় পক্ষের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ইহুদীদের অস্ত্র ফেলে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর পরবর্তী রায় হলো, বনু কোরায়যাদের যুদ্ধবাজ পুরুষদের হত্যা করা হোক এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করা হোক। তাদের সব ধন-সম্পদ তিনি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত সাআদের এই রায় শুনে মহানবী (সা) বললেন, “হে সাআদ! আল্লাহ তা‘আলার শপথ করে বলছি, আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর রাসূল ও

সকল মুসলমান আপনার এই সিদ্ধান্ত ঘোষণায় সন্তুষ্ট। ওহীর মাধ্যমে আমাকেও অনুরূপ নির্দেশ জানানো হয়েছে।”

ইহুদীদের জন্য বাজারের মধ্যস্থলে এক বিরাট গর্ত খোদাই করা হয়। এরপর যুদ্ধবন্দীদের সেখানে নিয়ে এক এক করে হত্যা করে গর্তে ফেলে দেয়া হয়। সব অপরাধীকে হত্যার পর গর্তটির মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। বনু কোরায়যাদের এই চরম পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْ رَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّهَا - وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا .

“আর কিতাবীদের মধ্যে যারা ওদের সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। এখন তোমরা ওদের কিছু সংখ্যককে হত্যা করছ এবং কিছু সংখ্যককে বন্দী করছ। এবং তোমাদের অধিকারী করলেন ওদের ভূমি, ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদের এবং এমন এক দেশের, যেখানে তোমরা এখনো অভিযান কর নাই। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।” (৩৩ : ২৬-২৭)

হযরত সাআদ ইবনে মুআয (রা)-এর নিকট বনু কোরায়যারা এরূপ চরম সিদ্ধান্ত আশা করেনি। তাদের আশা ছিল, এর আগে মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মহানবী (সা)-এর নিকট সুপারিশ করে বনী কায়নুকাদের হত্যা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। অনুরূপ হযরত সাআদের মাধ্যমে তারাও জীবন ভিক্ষা পাবে। কিন্তু বনী কায়নুকা ও বনু কোরায়যাদের ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। বনু কোরায়যাদের ব্যাপারে হযরত সাআদের সামনে এক ভয়াবহ দৃশ্য ছিল। তাঁর চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে ওঠে, এই বনু কোরায়যারাই হানাদার কাফের বাহিনীকে মদীনায় ঢোকার পথ করে দিচ্ছিল। তারা যদি তাতে কামিয়াব হতো, তাহলে এখন মুসলমানদের একজনকেও খুঁজে পাওয়া যেতো না। এক এক করে প্রত্যেক মুসলমানকে হত্যা করা হতো। এমনকি তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত বিকৃত করা হতো। কুরাইশরা উল্লেখ রণাঙ্গনেও তাই করেছিল।

বধ্যভূমিতে ইহুদীদের মনোবল

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় ইহুদীরা অত্যন্ত সাহস ও মনোবলের পরিচয় দেয়। মৃত্যুর আগে হুয়াই ইবনে আখতাবের আলাপ-আলোচনা থেকে তার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১. হযরত সাআদ ইবনে মুআযের অনুরূপ ফায়সালা ‘তাওরাত’ গ্রন্থেও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, “তুমি কোন শহরে আক্রমণ করতে গেলে, প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব দিবে। প্রতিপক্ষ এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে আগে বাড়বে না। যদি তারা সন্ধি প্রস্তাবে সাড়া না দেয়, তাদের অবরোধ করবে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর তোমাদের বিজয় দান করলে পুরুষদের হত্যা করবে। নারী, শিশু, গবাদিপশু ও অন্য যেসব জিনিস উক্ত শহরে পাওয়া যাবে সব তোমাদের জন্য গনীমত হিসাবে বিবেচিত হবে। (তাওরাত : তসনিয়া অধ্যায়, শ্লোক নম্বর-১০) -অনুবাদক

হুয়াই ইবনে আখতাবকে হত্যা করার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হয়। মহানবী (সা) তার দিকে তাকিয়ে বলেন, “হে হুয়াই! তোমাকে কি আল্লাহ তা‘আলা অপমানিত করেননি?” সে বলল, “মৃত্যু থেকে কারো অব্যাহতি নেই। আমার আয়ু যে ক’বছর নির্ধারিত ছিল তা আমি লাভ করেছি। আপনার সাথে শত্রুতা পোষণ সম্পর্কে আজও আমার কোন প্রকার অনুশোচনা নেই।” অতঃপর সে অন্যদের উদ্দেশ্যে বলে, “হে ভাইসব! আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে ঘাবড়ে যাওয়া কাপুরুষতা ছাড়া কিছু নয়। আমরা বনী ইসরাঈলীদের বিপদ-আপদ আমাদের তাকদীরেই লেখা ছিল।”

এক ইহুদীর নাম ছিল যোবায়ের ইবনে বাতকুরযী। সে বুয়াছের যুদ্ধে হযরত সাবিত ইবনে কায়েসের জীবন রক্ষা করেছিল। এমনকি বন্দী করার পর সে হযরত সাবিতকে ছেড়ে দেয়। হযরত সাআদ ইবনে মুআয কর্তৃক ইহুদীদের হত্যার ফরমান জারি করার পর হযরত সাবিত (রা) তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের প্রতিদান দেয়ার মনস্থ করেন। তিনি ইহুদী যোবায়েরকে ক্ষমা করার জন্য মহানবী (সা)-এর নিকট সুপারিশ করেন। তিনি যোবায়েরকে ক্ষমা করেন। কিন্তু ইহুদী যোবায়ের বলে বসে, আমি একজন বৃদ্ধ লোক। সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন ছাড়া এই বেঁচে থাকায় কি লাভ? হযরত সাবিত (রা) পুনরায় মহানবী (সা)-এর খেদমতে গিয়ে যোবায়েরের পরিবার-পরিজনের জন্য সুপারিশ করেন। মহানবী (সা) তাদেরও ক্ষমা করেন। এবার যোবায়ের কাআব ইবনে আসাদ, হুয়াই ইবনে আখতাব, আজ্জাল ইবনে সামুয়েল প্রমুখ ইহুদী নেতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। এসব ইহুদী নেতার পরিণতি যোবায়েরকে জানান হয়। তাদের মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনে যোবায়ের বলে উঠে, “হে সাবিত! তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহের বিনিময় হিসাবে তুমি আমাকে আমার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা কর। আল্লাহর শপথ! তাদের ছাড়া আমার জীবন কূপের বালতির মতো, যে বালতি সারা দিনে এক ঘণ্টাও কূপের ভেতর থাকার সুযোগ পায় না।” অবশেষে এই হতভাগার ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে হত্যা করা হলো।

অনুরূপ এক ইহুদী মহিলার সাহসিকতা ও মনোবলের ঘটনা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মুসলমানরা যুদ্ধ-বিগ্রহে নারী ও শিশুদের কখনো হত্যা করতেন না। কিন্তু বনু কোরায়যাদের এক মহিলাকে মুসলমানরা সে সময় হত্যা করেন। এই ইহুদী মহিলা একটি আটা পেষার চাকা ফেলে একজন মুসলমানকে শহীদ করে। বধ্যভূমিতেও উক্ত মহিলা অত্যন্ত সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। উম্মুল মু‘মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, “আল্লাহর শপথ! আমি কোন দিন সে মহিলাকে ভুলতে পারব না। বধ্যভূমিতেও তাকে অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। এমনকি হাসতে হাসতে সে জল্লাদের সামনে নিজের ঘাড় এগিয়ে দেয়।”

বনু কোরায়যা গোত্রের ইহুদীদের মধ্যে চারজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। মহানবী (সা) তাদের ক্ষমা করেন। তাঁরা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করেন।

বনু কোরায়যাদের হত্যার দায়-দায়িত্ব

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হলে বনু কোরায়যাদের হত্যার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব তাদেরই ধর্মীয় ভাই এবং বনু নযীর গোত্রের নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের উপর ন্যস্ত করা

ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অথচ বনু কোরায়যাদের সাথে এই লোকটিও নিহত হয়েছে। হুয়াই মদীনা থেকে তার গোত্রকে নিয়ে চলে যাওয়ার সময় মুসলমানদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির মাধ্যমেই বনু নযীরদের কাউকেই হত্যা করা হয় না। কিন্তু মদীনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই হুয়াই উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে। সে কুরাইশদের উত্তেজিত করে, বনু গাতফানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে উদ্বুদ্ধ করে। সে আরবের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করে। হুয়াই ইবনে আখতাবের কারসাজিতেই মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে চরম শত্রুতার সৃষ্টি হয়। আর এই শত্রুতা দিন দিন চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। ইহুদীরা মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদেরকে নিজেদের জানী দুশমন মনে করতে থাকে। তারা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করা ছাড়া অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। তা ছাড়া সকল আরবকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার পর বনু কোরায়যারা চুক্তি ভঙ্গ করে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত আরবের ইতিহাসে নেই বললেই চলে। বনু কোরায়যারা চুক্তি ভঙ্গ না করলে মুসলমানরা তাদের অবরোধ করার প্রশ্নই উঠত না।

মদীনায় কাফেরদের সমবেত করার পর হুয়াই ইবনে আখতাব বনু কোরায়যাদের নিকট যায়। তাদেরও সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উত্তেজিত করে। হানাদার কাফের বাহিনী ফিরে যাওয়ার পর মহানবী (সা) বনু কোরায়যাদের বস্তিতে যান। সে সময়ও যদি তারা দুর্গবন্দী হয়ে অস্ত্রধারণ না করত, মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতেন না। এ সময়ও যদি তারা মহানবী (সা)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করত তাহলে তাদের হত্যা করার কোন কারণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে হুয়াই ইবনে আখতাবের মনে যে চরম বিদ্বেষ বসেছিল তা বনু কোরায়যাদের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়। এজন্য বনু কোরায়যাদের বন্ধু হযরত সাআদ ইবনে মুআযের মনেও এই প্রত্যয় হয়েছিল যে, আজ যদি তাদের জীবিত ছেড়ে দেয়া হয় তা হলে তারা পুনরায় কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রগুলোকে মদীনা আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করবে। তখন মুসলমানদের একজন নারী-পুরুষের জীবনও রক্ষা পাবে না। আর তাই হযরত সাআদ (রা)-এর ফায়সালা বাহ্যত কঠোর মনে হলেও, কিন্তু তাঁর নিকট এ ছাড়া বিকল্প কোন পথ ছিল না। কারণ হযরত সাআদের দৃষ্টিতে ইহুদীদের জীবিত ছেড়ে দেয়া ছিল মুসলমানদের সবংশে মৃত্যুর নামান্তর।

বনু কোরায়যাদের সম্পদ বণ্টন

মহানবী (সা) বনু কোরায়যাদের বিষয়-সম্পদ ও নারী-শিশুদের এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করার পর অবশিষ্ট সবকিছু অভিযানে অংশগ্রহণকারী গায়ীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। একজন যানবাহনধারীকে তিন অংশ প্রদান করা হয়। এক ভাগ ছিল তার নিজের এবং দুই ভাগ যানবাহনের জন্য। যারা পদব্রজে অভিযানে অংশগ্রহণ করেন, তাদের দেয়া হয় এক ভাগ করে। আর এই অভিযানে যানবাহনধারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৬ জন।

মহানবী (সা) বনু কোরায়যাদের কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীসহ হযরত সাআদ ইবনে যায়েদকে নজদে পাঠিয়ে দেন। এসব যুদ্ধবন্দীকে বিক্রি করে সেখান থেকে কিছু ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র কিনে আনার নির্দেশ দেয়া হয়।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে রায়হানা নামের এক সুন্দরী মহিলা নির্ধারিত এক-পঞ্চমাংশে মহানবী (সা)-এর ভাগে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সে অসম্মতি জানায়। অতঃপর মহানবী (সা) তাকে বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, আমি তোমাকে বিয়ে করব। সে বলল, আপনি আমাকে দাসী হিসেবে গ্রহণ করুন। আমি আপনার সেবা করব। আর এটা উভয়ের জন্য কল্যাণকর হবে। রায়হানা মহানবী (সা) ও মুসলমানদের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করত। তাই সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রস্তাবে সম্মত হয়নি।

জীবন-চরিতকাররা কেউই রায়হানার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেনি। অথচ সে ছিল অপকৃপ সুন্দরী। সৌন্দর্যের দিক থেকে সে হযরত যয়নব বিনতে জাহশের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। তাঁরা শুধু সাদামাঠাভাবে বলেছেন, রায়হানা সুন্দরী ছিল। চরিতকাররা যতো সব কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করেছে হযরত যয়নব বিনতে জাহশের ক্ষেত্রে। রায়হানা পর্দা করত কিনা, এ ব্যাপারে চরিতবিদদের মধ্যে একাধিক অভিমত রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, রায়হানা আজীবন মহানবী (সা)-এর পরিবারে ছিল।

হানাদার বাহিনীর ব্যর্থতাবরণ করে ফিরে যাওয়া এবং বনু কোরায়যাদের নির্মূল করার মাধ্যমে মুসলমানদের জীবনে অনেকটা স্বস্তি নেমে আসে। মোনাফেকরা ভয় পেয়ে যায়। আরবের ঘরে ঘরে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তির আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু মহানবী (সা)-এর রিসালাতের পরিধি শুধু মদীনা কিংবা আরবেই ছিল না। বরং তাঁর রিসালাতের আহ্বান ছিল বিশ্বব্যাপী। আর তাই মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য কণ্টকাকীর্ণ পথ সুগম করতে হবে। এই মহান লক্ষ্য পথে যে সব বিরোধিতা ও বাধা আসবে, যে কোন মূল্যে সেসব দূর করতে হবে। বস্তুত এই মহান লক্ষ্যে তাঁরা তাঁদের প্রয়াস অব্যাহত রাখেন।

বনু কোরায়যার যুদ্ধ থেকে হোদায়বিয়ার সন্ধি

পরিখার যুদ্ধ ও বনু কোরায়যাদের নির্মূল করার পর মদীনায়ে মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের জীবনে বেশ প্রশান্তি নেমে আসে। বিভিন্ন আরব গোত্র ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এই সঙ্গে কুরাইশরা ভাবতে শুরু করে, (হযরত) মুহাম্মদ (সা) ও আমরা একে অপরের আত্মীয়। তাঁর সাথে ঝগড়া-ফাসাদ বন্ধ করে দিলে আমাদের এমন কী ক্ষতি হবে? বিশেষ করে তাঁর মুহাজির সাহাবীরা তো আমাদেরই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

মদীনা থেকে ইহুদীদের নির্বাসন ও নির্মূল করার পর মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। প্রায় ছ'মাসকাল এই পরিবেশ অব্যাহত থাকে। এ সময়ে মুসলমানরা একদিকে চলমান জীবনে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন, অপরদিকে স্বস্তিতে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা অনুশীলনের সুযোগ পান। এ সময় মহানবী (সা) তাঁর প্রতি ন্যস্ত রিসালাতের লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমানরা তাঁদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং মহানবী (সা)-এর শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নে পূর্বের চেয়ে আরো বেশি করে মনোনিবেশ করেন। মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীরা একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান, যা আরবে ইতিপূর্বে আর কখনো বাস্তবায়িত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম আরবদের জন্য এ সময়ে একটি সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। তবে ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রবর্তিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ইসলামের এই নতুন সমাজ ব্যবস্থা তখনো ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। উক্ত বিরতিকালীন সময়ে মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীরা নতুন গড়ে তোলা সমাজ ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা চাচ্ছিলেন সমকালীন ইরানী, রোমান ও মিসরীয় সমাজ ব্যবস্থা যেন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় বিলীন হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এই সমাজ ব্যবস্থা যেন পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাতে করে এই সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে যেন পবিত্র কোরআনের নিচের আয়াতটি নাযিল হওয়ার ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি হয় :

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا .

“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।”

নারী-পুরুষের সম্পর্ক

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের মক্কা-মদীনা ও এ ধরনের অন্যান্য জনপদগুলো সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তারা যাযাবরদের তুলনায় অনেক উন্নত সমাজ ব্যবস্থার অধিকারী ছিল। তাদের এই সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে যাই বলা হোক না কেন, শুধু পবিত্র কুরআনই নয়, অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শন দ্বারাও প্রমাণিত যে, এসব শহর-জনপদের নারী-পুরুষের পারিবারিক ও যৌন জীবন জীব-জন্তুর যৌন জীবনের চাইতে কোন অংশেই উন্নত ছিল না। সেকালে মহিলারা অত্যন্ত সাজ-সজ্জা করত। যৌন উত্তেজনাকর অঙ্গভঙ্গির ব্যাপারে তাদের মধ্যে দস্তুরমতো প্রতিযোগিতা চলত। তারা স্বামীদের ঘরে ফেলে রেখে সেজেগুঁজে বেরিয়ে পড়ত। তারা দল বেঁধে, কোন কোন সময় জোড়ায় জোড়ায়, আবার কখনো বা একাকী মরুভূমিতে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত চলে যেতো। বিশেষ বিশেষ স্থানে যুবক শ্রেণী, এমনকি প্রৌঢ়রা পর্যন্ত তাদের জন্য অপেক্ষা করত। এসব নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে পৈশাচিক উন্মত্ততায় মেতে থাকত। একে অপরের উদ্দেশ্যে কামোত্তেজক অঙ্গভঙ্গি ও কথাবার্তা বলত। একে অপরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হতো। এমনকি কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও উহুদ রণাঙ্গনে কামোত্তেজনাকর কবিতার মাধ্যমে কুরাইশ বাহিনীকে প্রলুব্ধ করেছিল। তার সেসব কবিতার মধ্যে ছিল : “তোমরা যদি অবিচল হয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর, তাহলে আমরা নিজেদের কোলে তোমাদের স্থান দিব। তোমাদের জন্য নরম তুলতুলে মখমলের শয্যা পেতে দেব। আর যদি তোমরা পশ্চাদপসরণ কর, তাহলে আমরা চিরদিনের জন্য তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাব।”

অজ্ঞতার যুগে আরবরা ব্যভিচারকে বিরাট অপরাধ বলে গণ্য করত না। আরবদের মধ্যে প্রেম-প্রণয়ঘটিত তৎপরতা ব্যাপক ছিল। বিবাহিতা রমণীরা পর-পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশা করত। এটা সেকালে কোন দৃষণীয় ব্যাপার ছিল না। আবু সুফিয়ানের মতো শীর্ষস্থানীয় নেতার স্ত্রী হিন্দা অন্য পুরুষের সাথে মন দেয়া-নেয়া করত। কিন্তু এই জঘন্য স্বভাবের দরুন আত্মীয়-স্বজনদের নিকট তার মান-মর্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। কোন মহিলার গর্ভজাত সন্তানের পিতা নির্ণয় করা সম্ভব না হলে উক্ত মহিলা যেসব পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে, গর্ভের সাথে তাদের সবার নাম প্রকাশ করত। এরপর যে পুরুষের আকৃতির সাথে উক্ত নবজাতকের চেহারা-সুরতের মিল পাওয়া যেতো, তাকেই শিশুর পিতা হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হতো। এ ছাড়া একজন পুরুষ তার ইচ্ছা অনুযায়ী স্বাধীন রমণী ও দাসীদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে পারত। স্বাধীন রমণী ও দাসীদেরও এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তারা যার সাথে ইচ্ছা যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারত। স্বামী কিংবা ক্রীতদাসীদের প্রভুরা মহিলাদের এসব ঘৃণ্য আচরণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রকার আপত্তি করত না, বাধা দিত না। বলা চলে সেকালে নারী-পুরুষের প্রেম-প্রণয় ও দৈহিক সম্পর্কই তাদের সকল দোষত্রুটি লুকিয়ে রাখত। কিন্তু কোন প্রকার মন-কষাকষি হলেই প্রণয়িনীদের দোষ-ত্রুটি জনসাধারণ্যে প্রকাশ করে বেড়াত।

আরবরা সব সময় মুক্ত আকাশের নিচে জীবন যাপন করত। তারা ছিল জীবনোপায়ের সন্ধানে সদা ব্যস্ত জাতি। আত্মপ্রশংসা ও মিথ্যের বেসাতি ছড়ানোর ব্যাপারে তারা এতটুকু ঘৃণাবোধ করত না। শান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ উভয় অবস্থায়ই বাড়াবাড়ি ছিল তাদের স্বভাবজাত

ব্যাপার। প্রেম-প্রীতি ও মন দেয়া-নেয়ার সময় তারা নিজেদের প্রেয়সীকে পবিত্রতার দেবীরূপে প্রকাশ করত। কিন্তু ব্যতিক্রম অবস্থায় তারা নিজেদের প্রিয়তমাদের উলঙ্গ করে ছেড়ে দিত। এমন কোন দোষত্রুটি নেই যা তার বিরুদ্ধে প্রচার করত না। তাদের প্রকাশভঙ্গি ও ভাষা দেখে মনে হতো উক্ত রমণীর মধ্যে সৌন্দর্য বলতে কিছুই নেই। তার কমণীয় গ্রীবাদেশ, স্ফীত বক্ষ, কোমর, নিতম্ব মোটকথা প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমন এক বিকৃত চিত্র শব্দ ব্যঞ্জনার মাধ্যমে তুলে ধরত, যা দেখলে যে কোন মানুষের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যায়। প্রিয়ার পরিবারের সদস্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে কিতাবে তার শয্যাসঙ্গী হয়েছে, এসব কথাও কাব্যের ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের পর নারী সমাজকে নিয়ে এ ধরনের অশ্লীল কাব্যচর্চা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনো প্রাচীন আরব কবিদের ভাষায় এসব অশ্লীলতার কিছু কিছু নমুনা দেখতে পাওয়া যায়।

আরবে নারীর মর্যাদা

যারা আরব সংস্কৃতির অনুরাগী এবং যারা আরবের বেদুঈন জীবনধারাকেও সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক বলে মনে করে, তারা হয়তো আমাদের প্রতিবেদনকে বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করবে। তাদের ব্যাপারে আমাদের বলার কিছু নেই। এসব লোক অজ্ঞতার যুগের নারী-পুরুষের সম্পর্কে বর্তমান যুগের আরব জীবনধারার আলোকে মূল্যায়ন করে থাকে। তাদের এই মূল্যায়ন সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অবাস্তব। বরং সপ্তম শতাব্দীর আরবের বিভিন্ন গোত্রের সমাজ ব্যবস্থা ও জীবনধারার সাথে সমকালীন অন্যান্য জাতির জীবনধারার তুলনা ও মূল্যায়ন করা যেতে পারে। যদি দাবি করা হয়, সেকালের আরব জীবনধারা অনেকটা বন্য স্তরের হওয়া সত্ত্বেও সমসাময়িক অন্যান্য জাতির চেয়ে উন্নত ছিল, তাহলে বাড়িয়ে কিছু বলা হবে না। সেকালে ভারত উপমহাদেশ ও চীনের লোকদের জীবনধারা সম্পর্কে আমাদের নিকট কোন তথ্য নেই। এজন্য আমরা তাদের জীবনধারা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। আরব জীবনধারার সাথে সেখানকার জীবনধারার তুলনাও আমরা করতে চাই না। তবে সেকালে আরব গোত্রগুলোর জীবনধারা অনেকটা বন্য ও বর্বর স্তরের হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপ ও সিরিয়ায় বসবাসকারী খৃষ্টানদের চেয়ে উন্নত ছিল। উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের খৃষ্টানরা সেকালে সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে অনেক অনেক দূরে ছিল। বলা চলে তাদের জীবনধারা ছিল বর্বর স্তরের।

সপ্তম শতাব্দীতে রোমান খৃষ্টানরা একটা ধর্ম ব্যবস্থার অনুসারী ছিল। রাজনৈতিক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এমনকি এক পর্যায়ে ইরানও তাদের অধীন ছিল। এতদসত্ত্বেও তাদের নিকট নারীর কোন নাগরিক অধিকার ছিল না। এমনকি রোমান সমাজে নারীর মর্যাদা আরব বেদুঈন নারীদের সমানও ছিল না। সেকালে রোমান সামাজিক আইনের দৃষ্টিতে নারী ছিল গণ্য সামগ্রীর মতো। পুরুষ নারীকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারত। কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে হত্যা করলেও সমাজে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হতো না। কোন স্বামী তার স্ত্রীকে দাসী হিসাবে বিক্রি করে দেয়াটা ছিল মামুলী ব্যাপার। স্বামীর এই ব্যবহার রোমান শরীয়তের পরিপন্থী মনে করা হতো না। কোন রমণী একই সময়ে তার জন্মদাতা পিতার কন্যা ও দাসী উভয় হিসাবে গণ্য হতো। এসব ভাগ্য-বিড়ম্বিতা নারী তার স্বামীর ঘরেও স্ত্রী ও দাসী হিসাবে বিবেচিত হতো। আবার কোন মহিলার পেটের সন্তান যুবক হওয়ার পর পিতা মাকে সন্তানের

দাসী করে দেয়ার আইনত অধিকার ছিল। এভাবে মাকে পেটের সন্তানের শুধু দাসীই করা হতো না, ছেলে তার মাকে গবাদিপশুর মতো বিক্রিও করতে পারত।

রোমান সমাজে মহিলাদের পুরুষের যৌনক্ষুধা নিবারণের একটা মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই মনে করা হতো না। এমনকি নিজেদের শরীরের বিশেষ অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করার আইনত কোন অধিকারও তাদের ছিল না। রোমানরা বিদেশে যাওয়ার সময় নিজেদের স্ত্রী কিংবা দাসীদের যৌনাঙ্গ পর পুরুষ থেকে নিরাপদ রাখার জন্য লোহার তৈরি এক ধরনের বর্ম পরিয়ে চাবি দিয়ে রেখে যেতো। এই বর্ম মহিলাদের কোমর থেকে পা পর্যন্ত সবকিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অষ্টোপাসের মতো জড়িয়ে রাখত। বিদেশ থেকে বাড়ি ফেরার পর এই বর্ম খুলে দেয়া হতো। রোমান সাম্রাজ্যে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এই পাশবিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সমসাময়িককালে আরবের নারীদের অবস্থা সে তুলনায় অনেক উন্নত ছিল।

হযরত ঈসা (আ) নারী সমাজের সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করতেন। একবার হযরত ঈসা (আ)-এর শিষ্যরা ব্যভিচারে অভিযুক্ত এক মহিলাকে তাঁর সামনে উপস্থিত করে। হযরত ঈসা (আ) মহিলার সাথে সদয় ব্যবহার করেন। তাতে হযরত ঈসা (আ)-এর শিষ্যরা দুঃখিত হয় এবং বিস্ময় প্রকাশ করে। তাদের এই ভূমিকা দেখে হযরত ঈসা (আ) অনেকটা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, “ঠিক আছে, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পাপ না করে থাকে, তা’হলে সে মহিলাকে ‘সঙ্গেসার’ বা পাথর মারার শাস্তি প্রদান করতে পারে।”

সেকালে ইউরোপের পৌত্তলিক ও খৃষ্টান নির্বিশেষে সবাই মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহার করত। তারা মহিলাদের মনে করত যৌনক্ষুধা নিবারণের মাধ্যম কিংবা সেবাদাসী। সবচাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, সেকালের খৃষ্টান ধর্মযাজকরা মহিলাদের মধ্যে মানবাত্মা রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে বিতর্ক সভার আয়োজন করত। পুরুষের মতো পরকালে নারীদেরও হিসাব-কিতাব হবে কিনা এ নিয়েও তাদের মধ্যে বাহাচ্ চলতো!

ইসলাম ও সমাজ-সংস্কার

আল্লাহ তা’আলা ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা)-কে অবহিত করেন, নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা ছাড়া সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এজন্য চলমান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একে অপরের সহযোগিতা করা একান্ত কর্তব্য। কারণ নারী-পুরুষ একই দেহের দু’টি অংশ। এই দু’টি অংশকে প্রেম-প্রীতির বন্ধনে জড়ানো হয়েছে। মহানবী (সা) ওহীর মাধ্যমে এ কথাও অবগত হন যে, নারী ও পুরুষ একে অপরের উপর সমান অধিকার রাখে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের উপর নারীর অধিকার বেশি রয়েছে। কিন্তু সেকালের সমাজ ও পরিবেশে একবারে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করা সহজ ব্যাপার ছিল না। কারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে যেসব কুসংস্কার চলে আসছিল, সেগুলো একসাথে নির্মূল করা চাটুখানি ব্যাপার ছিল না। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, সেকালে যেসব আরব ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করেছিল, তাদের ঈমানের বুনিয়াদ ছিল অত্যন্ত মজবুত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ সংস্কার চলছিল ধাপে ধাপে। এই কৌশল অবলম্বনের ফলেই

১. হযরত ঈসা (আ)-এর এই বাণী থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সেকালে ব্যভিচারের পাপমুক্ত পুরুষের সংখ্যা খুবই কম ছিল। -অনুবাদক

মুসলমানদের ঈমানী শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ইসলামের প্রভাববলয় সম্প্রসারিত হচ্ছিল। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের কল্যাণে যেসব সামাজিক সংস্কারমূলক বিধান প্রবর্তন করেন, সেগুলোও ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হয়। ইবাদতের মধ্যে নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ এবং নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে শরাব, জুয়া, শূকরের মাংস খাওয়া প্রভৃতি বিষয়ও পর্যায়ক্রমে কঠোরতা লাভ করে। নারী-পুরুষের সম্পর্কের সংস্কারও মহানবী (সা) নিজ থেকেই সূচনা করেন। অন্য মুসলমানরা মহানবী (সা)-এর মধ্যে এই সংস্কার দেখে নিজেরাও তা অনুসরণ করতে থাকেন। পর্দার আয়াত নাযিল হয় পরিখার যুদ্ধের পর পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে। অনুরূপ একজন পুরুষের অনধিক চার স্ত্রীর বিধানও খায়বর যুদ্ধের এক বছর পর প্রবর্তন করা হয়। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বিধান নাযিল হওয়ার আগেই মহানবী (সা) তাদের সম্পর্কের সীমা নির্ধারণ করে দেন। এই সীমা নির্ধারণের সময় উভয়ের সমান অধিকারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিধান অবতীর্ণ হয়। তাতেও পূর্বাঙ্কে মহানবী (সা) প্রবর্তিত বিধি-বিধানই স্থান লাভ করে। তাতে করে এসব বিধান ইসলামের অনুশাসন হিসাবে পরিগণিত হয়। এরূপে মহানবী (সা) পুরুষদের কর্তৃত্বে নারী সমাজকেও তাদের মৌলিক অধিকার লাভের নিশ্চয়তা বিধান করেন।

সৌন্দর্য প্রদর্শনের নিন্দা

প্রথম দিকে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্বরতার ছাপ ছিল। এমনকি মুসলিম নারী-পুরুষরাও তখনো অজ্ঞতার যুগের অবাধ মেলামেশার অভিশাপ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মহিলারা সেজেগুঁজে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করত। অনেক সময় পুরুষরা রাস্তাঘাটে তাদের উত্ত্যক্ত করত। কিন্তু নারী-পুরুষের এই সম্পর্ক ছিল মানবতা ও আধ্যাত্মিকতার মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী। সে সময় ইহুদী ও মুনাফিকরাও মদীনায়ে বসবাস করত। তারা মহানবী (সা) ও সাহাবীদের শত্রুতায় এতটা নিচে নেমে গিয়েছিল যে, মুসলিম মহিলাদের রাস্তাঘাটে চলার সময় তাদের উত্ত্যক্ত করত। এমনকি কোন কোন সময় তারা মুসলিম মহিলাদের দুঃখ-কষ্ট দেয়ার ঔদ্ধত্যও প্রদর্শন করত। তাদের এসব আচরণ মুসলমানদের জন্য একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। তখনকার পরিবেশে এটা নিয়ন্ত্রণ করা মুসলমানদের জন্য সম্ভবপরও ছিল না। আমরা পিছনেও উল্লেখ করেছি যে, এ ধরনের একটা অপ্রীতিকর ঘটনার পরিণতিতে ইহুদী বনী কায়নুকা গোত্রকে অবরোধ করা হয়েছিল। মুসলিম মহিলারা যদি সেজেগুঁজে খোলামেলা না চলত, তাদের বিরক্ত করার সুযোগই পাওয়া যেতো না এবং অবাধ চলাফেরার দরুন যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলোও হতো না। সারকথা, ইসলাম নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করে। আর এই সংস্কারের বুনিয়াদ ছিল পারস্পরিক সমতা। কিন্তু এই সংস্কারের মাধ্যমে যে প্রাক-ইসলামী যুগের আচার-আচরণ ও সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তন করা হচ্ছে, এটা অনেক মুসলমান লক্ষ্য করেননি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيَرِيمًا كَتَسْبُؤًا فَقَدْ احْتَمَلُوا
بُهْتَانًا وَآتِمَّا مَبِينًا . يَأْيُهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ - ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ - وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا . مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا . سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا .

“এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদের কষ্ট দেয়, তারা সে মিঃথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মু’মিনদের রমণীদেরকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের মুখমণ্ডলের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদের উদ্ভুক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মোনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব; এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশীরূপে অল্প সংখ্যকই থাকবে। অভিশপ্ত হয়ে, ওদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। তুমি কখনো আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবে না।” (৩৩ : ৫৮-৬২)

সারকথা, মুসলমানরা আরবের অজ্ঞতার যুগের সব পুরনো কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত হানেন। তাঁরা সমাজদেহ থেকে এসব কুপ্রথা নির্মূল করেন। মহানবী (সা)-এর মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সকল প্রকার কুপ্রথা, কুসংস্কার ও পাপ-পংকিল থেকে সমাজদেহকে পূত-পবিত্র করা। এজন্যই তিনি ব্যাভিচারকে কবীরা গুনাহ বলে ঘোষণা করেন। তিনি সাহাবীদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি-আকর্ষণ করেন যে, ‘গায়রে মুহররম’ বা যাদের সাথে বিয়ে না-জায়েয নয়, এমন আত্মীয়-স্বজনদের সামনেও মহিলাদের সেজেগুঁজে বেপর্দাভাবে আসা-যাওয়া বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ - ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ - إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى

عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ -
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

“মু’মিনদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে ; এটাই তাদের জন্য উত্তম । ওরা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবহিত । মু’মিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে ; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তাছাড়া তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে । তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, স্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, সেবিকা যারা তাদের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে । তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে । হে মু’মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার ।” (২৪ : ৩০-৩১)

এই পদ্ধতিতে ইসলাম নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কে সংস্কার সাধন করে । বিশৃংখলা ও ক্ষতিকর পরিবেশ থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম নারী ও পুরুষকে পরস্পর নিরাপদ দূরত্বে থাকার জন্য উপদেশ প্রদান করে । কিন্তু ক্ষতিকর ও বিশৃংখল পরিবেশ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের একে অপরের নিকট থেকে দূরে থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়নি । কারণ এ ছাড়া সর্বত্র ইসলাম নারী-পুরুষকে সমান মর্যাদা প্রদান করেছে । তারা উভয় সম্প্রদায় আল্লাহ্ তা’আলার বান্দা । কল্যাণকর সব কাজে একে অপরের সাহায্যকারী । এরপরও যদি তাদের পদস্থলন ঘটে, তাহলে তাকে নিজের কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহ্ তা’আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে । বস্তুত আল্লাহ্ তা’আলা অনুশোচনাকারীর তওবা কবুল করে থাকেন ।

প্রাক-ইসলামী যুগের আচার-আচরণ ও রীতিনীতি কয়েক শতাব্দী থেকে আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল । সুতরাং নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ক ইসলামী শিক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে তাদের জীবনে কার্যকর হওয়াটা খুবই মুশকিল ব্যাপার ছিল । অবশ্য আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও শির্ক ত্যাগ করার ব্যাপারটি তাদের মন-মানসিকতায় দ্রুত বৈপ্লবিক গতিতে পরিবর্তন এনেছিল । কিন্তু আচার-আচরণের ব্যাপারটি তেমন নয় । এসব হচ্ছে অভ্যাসগত ব্যাপার । আর বস্তুর মতো অভ্যাসগত ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন সূচিত হয় । বস্তু যেমন একটা প্রাকৃতিক নিয়ম ও আইনের ভিতর দিয়ে সমৃদ্ধি লাভ করে থাকে, তেমনি মানব জীবনের অভ্যাসগত ব্যাপারগুলোও নিয়ম-নীতির ভিতর দিয়ে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে থাকে । মানব জীবনের এই দিকটির পরিবর্তনও হঠাৎ করে সম্ভবপর হয় না । তা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে থাকে । বিশেষ করে কোন আচার-আচরণ ও রীতিনীতি যখন মানব জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে, তখন তাতে পরিবর্তন সাধনের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া দূরদর্শিতার পরিপন্থী । তবে সময়ের আবর্তন-বিবর্তনে এসব আচার-আচরণের চাপ এমনিতে হ্রাস পাওয়া শুরু হলে এবং মানুষের জীবনধারায় তা গ্রহণের উপযোগী হলে সংস্কার সাধনের পদক্ষেপ নেয়াতে কোন ক্ষতি নেই । এরূপ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন গ্রহণের শক্তি গড়ে ওঠে । মানুষ তা

গ্রহণ করে। বস্তুত ইসলামও মুসলমানদের সামাজিক জীবনের সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিই গ্রহণ করে। প্রথম প্রথম ইসলাম আল্লাহ তা'আলার প্রতি, রাসূলের প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস্য বিষয়গুলো মানুষের নিকট তুলে ধরে। মানুষের মনে এসব বিষয়ের ঈমান-বিশ্বাসের বুনিয়াদ মজবুত করা হয়। কিন্তু এসব বিষয়ের সাথে সাথে মানুষের বস্তু জীবনের দিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। কারণ সে সময় বেদুঈন জীবনধারার অনেক আচার-আচরণ মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। অন্য মহিলাদের সাথে মেলামেশা ও কথাবার্তার অভ্যাসও তাদের মধ্যে ছিল। আর এই অভ্যাস ছাড়ানো সহজ ব্যাপার ছিল না। ইসলাম এ ব্যাপারেও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

রাসূলের প্রতি আদব

যদিও নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক সংস্কার সাধিত হয়েছিল, তবু কোন কোন প্রাক-ইসলামী আচার-আচরণ তখনো মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাঁরা এসব তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগে কখনো কখনো কোন কোন মুসলমান মহানবী (সা)-এর কক্ষে আসতেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা) ও উম্মুল মু'মিনীনদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা করতেন। তাতে মহানবী (সা)-এর রিসালাতের দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি হতো। বিভিন্ন জটিল বিষয়ে গভীর মনোযোগের সাথে চিন্তাভাবনা করা তাঁর পক্ষে মুশকিল হতো। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের এই প্রবণতা বন্ধ করার জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نُظْرَيْنَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ . إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ . وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ - ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ . وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا . إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا .

“হে মু'মিনগণ! তোমাদের অনুমতি না দেয়া হলে তোমরা আহায্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে খাওয়ার জন্য নবীগৃহে প্রবেশ করো না। তবে, তোমাদের ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ করো এবং খাওয়া শেষে তোমরা চলে যেও ; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না, কারণ এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের উঠে চলে যাওয়ার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের নিকট থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের বিয়ে করা কখনো সংগত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা গুরুতর অপরাধ।” (৩৩ : ৫৩)

উপরোক্ত আয়াত মু'মিনদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। তাতে নবী করীম (সা) ও তাঁর স্ত্রীদের সম্পর্কে মু'মিনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। নিচের আয়াত দুটো মহানবী (সা)-এর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। তাতে তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে তাঁদেরকে অবহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ - وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا . وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا
تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ - إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا .

“হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও ; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তবে তোমরা পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুদ্ধ হয়। এবং তোমরা সদালাপ করবে এবং তোমরা ঘরে অবস্থান করবে, প্রাক-ইসলামী যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িও না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে।” (৩৩ : ৩২-৩৩)

মানব জাতির অগ্রগতির জন্য ইসলাম এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও কামভাব প্রবণতার নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার সাধন ছিল উক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ। এই সংস্কারের লক্ষ্য ছিল, নারী-পুরুষের অন্তর থেকে কামভাবের প্রভাব দূর করতে হবে। এটাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে যাতে প্রকৃতি প্রদত্ত আর পাঁচটা বিষয়ের চেয়ে এর প্রতি অধিক আকর্ষণ যেন না থাকে।

ইসলাম কতকগুলো বিশেষ উপকরণের উপর তার সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ স্থাপন করেছে। এসব উপকরণের মাধ্যমে মানবতার উঁচু স্তরে পৌঁছা যায়। এসব উপকরণ মানুষকে তার জীবন উপভোগেরও সুযোগ করে দেয়। জীবনপথে মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব না করে বরং সম্প্রসারিত করে। অবশ্য জীবনের সে স্তরে পৌঁছেও মানুষকে তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কামরিপুর সাথে মোকাবেলা করতেই হয়। সারকথা, ইসলাম প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে মানুষ একদিকে উঁচু মর্যাদা লাভ করে, অপরদিকে দিগন্তহীন পৃথিবীর সাথে তার সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। সে কৃষি, শিল্প ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য কলাকৌশল থেকে উপকৃত হয়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মানব জীবনে একটা নিয়ম-শৃংখলার ভিতর দিয়ে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আর এরই ফলশ্রুতি হিসাবে এই সমাজ-ব্যবস্থার সত্যিকার অনুসারী পৃথিবীতে পূত পবিত্র মানুষ হিসাবে পরিচিত হয়। কখনো কখনো সে ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদের অত্যন্ত নিকটস্থ মর্যাদায় পৌঁছে যায়। কেননা ইসলাম ধর্মের অনুসারীকে কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য জ্ঞানগত ও

কর্মতৎপরতার সাথে সাথে নামায, রোযা ও যাকাতও আদায় করতে হয়। এই পদ্ধতিতে পার্থিব জীবনধারার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করাও তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর এরূপ জীবনধারার ফলশ্রুতি হিসাবে ব্যভিচার ও আনুষঙ্গিক আচার-আচরণের প্রতি আপনা থেকেই তার মধ্যে একটা ঘৃণাভাব সৃষ্টি হয়। তার মন-মানসিকতা অবচেতনভাবেই নির্লজ্জতা থেকে দূরে সরে আসতে থাকে। আল্লাহ তা'আলার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসার মাধ্যমে সে তার অন্তরকে পূত-পবিত্র করে তোলে। এরূপ পূত-পবিত্র স্বভাবের মানুষ একদিকে মু'মিনদের সাথে নিজেকে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে, অপরদিকে মানবতা ও পৃথিবীর অন্যসব কিছুর সাথেও তার একটা সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এই সময়ে মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীরা ভবিষ্যতে বিশ্ব-বিপ্লবের জন্য ধীরে ধীরে নতুন সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করছিলেন। বস্তুত ইসলামের এই নতুন সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্যই প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু অপরদিকে কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্র সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। তারা সব সময় এই ফিকিরে থাকত যে, সুযোগ পাওয়ামাত্র ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ইসলামের এমন বর্ধমান শক্তিকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিতে হবে। মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীরাও শত্রুদের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। তাঁরাও কাফেরদের সামরিক অভিযানের আশংকা করছিলেন। তাঁরাও সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন যে, সুযোগ পাওয়া মাত্র কাফেরদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক আক্রমণ চালাতে হবে। তাদের এমনভাবে পর্যুদস্ত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে আর কোন দিন তাদের মোকাবেলা করার শক্তি না থাকে।

বনু লিহুইয়ান অভিযান

দুই বছর আগে বনু লিহুইয়ান গোত্র প্রতারণার মাধ্যমে হযরত খোবায়ের ইবনে আদিকে গ্রেফতার করে এবং তাঁর সঙ্গীদের রাজী নামক স্থানে নিয়ে হত্যা করে। মহানবী (সা) এসব শহীদের প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনীকে অভিযানে বের হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। যুদ্ধকৌশলের প্রেক্ষিতে তিনি কোন্‌দিকে অভিযানে যাবেন প্রকাশ করেননি। কারণ তাতে শত্রুরা তাঁর অভিযানের লক্ষ্য জেনে ফেলার আশংকা ছিল। সে যাই হোক, সাহাবীদের নিয়ে মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় তিনি সিরিয়ার দিকে রওয়ানা দেন। সিরিয়া ছিল মদীনা থেকে উত্তর দিকে। সিরিয়ার দিকে বেশ কিছুদূর পথ চলার পর তিনি নিশ্চিত হন যে, এখন আর কুরাইশ ও তাদের শুভাকাজক্ষীরা মহানবী (সা)-এর অভিযানের লক্ষ্য জানতে পারবে না। তিনি মুসলিম বাহিনীকে গতি পরিবর্তন করে দক্ষিণে মক্কার দিকে চলার নির্দেশ প্রদান করেন। এ সময় তাঁরা দ্রুত পথ চলতে থাকেন। মহানবী (সা) তাঁর বাহিনী নিয়ে বনু লিহুইয়ানদের আবাসস্থল বু'রান উপত্যকায় পৌঁছান। কিন্তু যে স্থান থেকে তিনি গতি পরিবর্তন করে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিক রওয়ানা দেন, সেখানে বনু লিহুইয়ান গোত্রের কোন লোক তা দেখে ফেলে। সে দ্রুত এসে বনু লিহুইয়ান গোত্রে এ খবর দেয়। মুসলিম বাহিনীর খবর পাওয়া মাত্র বনু লিহুইয়ান গোত্র তাদের গবাদিপশু ও মাল-সামান নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে লুকায়। ফলে মহানবী (সা)-এর অভিযান ব্যর্থ হয়। মহানবী (সা) তাদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে একশ' অশ্বারোহী সৈন্যসহ হযরত আবু বকরকে উসফান নামক স্থান পর্যন্ত পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেখানেও তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশেষে

মহানবী (সা) মুসলিম বাহিনী নিয়ে মদীনায ফিরে আসেন। সে সময়টি ছিল গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। মুসলিম বাহিনী মদীনায প্রবেশ করেন। এখানে পৌঁছে মহানবী (সা) বলেন, “আমরা সবাই আল্লাহর প্রশংসা করছি। তিনি আমাদেরকে মদীনায ফিরিয়ে এনেছেন। সফরের দুঃখ-কষ্ট, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের অপ্রীতিকর অবস্থা দেখা থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করেছেন।”

যী-কারাদ অভিযান

মহানবী (সা) বনু লিহুইয়ান অভিযান থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পর উয়ায়না ইবনে হিস্ন আল-ফাজারা মদীনার চারণভূমিতে অতর্কিতে হানা দেয়। সে মহানবী (সা)-এর রাখালকে হত্যা করে। উক্ত রাখালের স্ত্রীকে বন্দী করে উটের পাল নিয়ে রওয়ানা দেয়। হযরত সালামা ইবনে আমর ইবনে আকওয়া (রা) দেখতে পান ডাকাতরা উক্ত মহিলা ও উটের পাল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তিনি তাদের উপর তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করেন। ডাকাতরা মদীনার সালাআ পাহাড়ের নিকট পৌঁছতেই হযরত সালামা (রা) সজোরে মুসলমানদের ডাকতে শুরু করেন এবং নিজে ডাকাতদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকেন। ডাকাতরা দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছিল আর হযরত সালামা তাদের দিকে তীর বর্ষণ করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি শহরের দিকে মুখ করে চিৎকার করে মুসলমানদের ডাকেন। তাঁর আওয়াজ মহানবী (সা) শুনতে পান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে শহরে এই খবর ছড়িয়ে দেন। খবর শুনে মুসলমানরা চারদিক থেকে বিদ্যুতবেগে ছুটে আসেন। তাঁরা সবাই ছিলেন সশস্ত্র। মহানবী (সা) মুসলমানদের নিয়ে ডাকাতদের পিছন ধাওয়া করেন। তিনি অগ্রসর হয়ে যী-কারাদ নামক পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছান। ওদিকে লুটেরা উয়ায়না তার দলবলসহ দ্রুত পালাতে থাকে। সে মরিয়্যা হয়ে দৌড়াচ্ছিল, যাতে বনু গাতফান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে সে মুসলমানদের পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু মুসলিম বীররাও তার পিছনে দ্রুত ছুটছিলেন। তারা উয়ায়নার দলবলের পিছন দিকের উটগুলো ধরে ফেলেন। ইতিমধ্যে মহানবী (সা) সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। কিছুক্ষণ পর লুটেরাদের হাতে বন্দী মহিলাও সেখানে এসে পৌঁছেন। মুসলমানরা লুটেরাদের আরো পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য মহানবী (সা)-এর নিকট আবেদন করেন। কিন্তু তিনি বলেন, তারা ইতিমধ্যে বনু গাতফানে পৌঁছে গেছে। এজন্য আর পশ্চাদ্ধাবন করা সম্ভব হবে না। এরপর মহানবী (সা) মুসলমানদের নিয়ে সেখান থেকে মদীনায ফিরে আসেন।

লুটেরাদের হাত থেকে মুক্ত মুসলিম মহিলা একটি উটে করে মদীনায ফিরছিলেন। তিনি পথিমধ্যে মানত করেন এই উট যদি আমাকে নিরাপদে মদীনায পৌঁছায়, তাহলে আমি এটাকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী করব। মহিলার এই মানত করার খবর মহানবী (সা) জানতে পারেন। তিনি মহিলাকে বলেন, “তোমার এই বিনিময় অত্যন্ত খারাপ। কারণ আল্লাহ এই উটের মাধ্যমে তোমাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আর এটাকে তুমি কিনা যবাই করার জন্য প্রস্তুত হয়েছ। এরূপ আচরণ আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী। এ ধরনের মানত করা অর্থহীন। যে বস্তুর উপর নিজের মালিকানা স্বত্ত্ব নেই তা মানত করা যায় না। বস্তুত এ উটটি হচ্ছে মুসলমানদের।” এই মহিলা ছিলেন হযরত হারেছ (রা)-এর স্ত্রী।

বনী মুসতালিক বা মুরায়সীর যুদ্ধ

উপরোক্ত ঘটনার দু'মাস পর বনী মুসতালিকের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষ হয় মুরায়সী নামক একটি কূপের নিকট। এই যুদ্ধ জীবনচরিতবিদ ও ঐতিহাসিকদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই গুরুত্ব শুধু এজন্য নয় যে, মুসলমান ও শত্রুদের মধ্যে এখানে তুমুল সংঘর্ষ হয়েছে। কিংবা এজন্য নয় যে, এখানে চরম দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও মুসলমানরা অসাধারণ ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। বস্তুত একাধিক কারণে এই যুদ্ধ চরিতবিদ ও ঐতিহাসিকদের নিকট গুরুত্ব লাভ করে। এগুলো হচ্ছে : (১) এই যুদ্ধের পর মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। মহানবী (সা) অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই বিরোধ মীমাংসা করে দেন। (২) এই যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আরেকটা কারণ হলো সেখানে মহানবী (সা) হযরত জুওয়ায়রিয়া বিনতে হারেছকে বিয়ে করেন। এই বিয়ে অত্যন্ত কল্যাণ বয়ে আনে। (৩) আরেকটা কারণ হলো এই যুদ্ধের পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি একটি মিথ্যা অপবাদ রটানো হয়। অথচ সে সময় হযরত আয়েশার বয়স যোল বছরের বেশি ছিল না। কিন্তু তাঁর সুদৃঢ় ঈমানী শক্তি ও সততা সত্ত্বেও শত্রুদের অপবাদের দরুন তাঁকে লজ্জিত হতে হয়।

মহানবী (সা)-এর নিকট এই মর্মে খবর পৌঁছায় যে, খোয়াআ গোত্রের শাখা গোত্র মক্কার অদূরে সৈন্য সমাবেশ করেছে। তাদের নেতা ছিল হারেছ ইবনে আবু যেরার। সে সমবেত বাহিনীকে মহানবী (সা)-কে হত্যার জন্য উত্তেজিত করে তুলছে। রাসূলুল্লাহ (সা) একজন বেদুঈনের মাধ্যমে এই গোপন তথ্য অবগত হন। বেদুঈনটির নাম ছিল বারিদা ইবনে হোসাইন আসলামী। এই খবর পাওয়া মাত্র মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীরা দ্রুত অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মোকাবেলার জন্য বেরিয়ে পড়েন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল অতর্কিতে শত্রুদের উপর ঝাঁপিড়ে পড়া। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে মুহাজিরদের পতাকা বহন করছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)। আর আনসারদের পতাকা বহন করছিলেন হযরত সাআদ ইবনে উবাদা। মুসলিম বাহিনী বনু মুসতালিক জনপদের অদূরে একটি কূপের নিকট শিবির স্থাপন করেন। এই কূপটি মুরায়সী নামে খ্যাত। কিছুক্ষণের মধ্যে মুসলিম বাহিনী শত্রুদের ঘেরাও করে ফেলে। অবস্থা বেগতিক দেখে বনী মুসতালিক গোত্রের অনুপ্রেরণায় বাইরে থেকে যারা এসেছিল, তারা এদিক-ওদিক দিয়ে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে শত্রুপক্ষের দশ ব্যক্তি নিহত হয়। হযরত হিশাম ইবনে সুবাবা নামের একজন মুসলমান একজন আনসার মুসলমানের হাতে সন্দেহবশত শহীদ হন। অবরুদ্ধ বনু মুসতালিকরা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তীর বর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু তারা দেখল প্রতিপক্ষ তাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। তারা কিছুতেই পিছু হটছে না। অবশেষে তারা মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। তাদের নারী-পুরুষ-শিশু-গবাদিপশু ও সকল মাল-সামান মুসলমানদের হস্তগত হয়।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের সাথে তাঁর একজন সহিসও ছিল। যুদ্ধের পর সে পানি আনার জন্য কূপের নিকট যায়। একজন মুসলিম আনসারের সাথে সেখানে তার ঝগড়া হয়। উক্ত আনসার মুসলমানটি ছিল খায়রাজ গোত্রের। এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। সহিস লোকটি মুহাজিরদের সাহায্য প্রার্থনা করে। আনসার মুসলমানটিও খায়রাজ

গোত্রকে ডাকতে শুরু করে। তাদের ডাকাডাকিতে আনসার ও মুহাজিররা সেখানে এসে জড়ো হয়। মদীনার মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও গনীমতের লোভে এই যুদ্ধে যোগদান করেছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ তার মনে আগে থেকেই পুঞ্জীভূত ছিল। সে এই সুযোগের সদ্যবহার করল। সে আনসারদের উদ্দেশ্যে বলল, “মুহাজিরদের আমরা নিজেদের শহরে আশ্রয় দিয়েছি। এখন তারা শক্তিশালী হয়ে আমাদের উপরই আঘাত হানছে। তাদের পর্যুদস্ত করার জন্য বিজ্ঞদের একটি প্রথা আমাদের পালন করতে হবে। তাঁরা বলেছেন, কুকুরকে যদি পানাহার করিয়ে মোটাতাজা করা হয়, তাহলে সে প্রথমেই তার প্রভুর ঘাড় চেপে ধরবে। এরপর সে শপথ করে বলল, “আমরা মদীনায় পৌঁছলে দেখতে পাবে, সেখানকার সম্মানিতরা অপমানিতদের শহর থেকে বের করে দিয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার স্বগোত্রীয়দের আরো বলল, তোমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মেরেছ। তোমরা তাদের (মুসলমানদের) শুধু আশ্রয়ই দাওনি, আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা দান করতেও দ্বিধা করনি। আল্লাহর শপথ! তোমরা তাদের আর কখনো সাহায্য করো না। তাতে তারা মদীনা ছাড়তে বাধ্য হবে।”

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর এসব কথা মহানবী (সা) জানতে পারেন। ঘটনাচক্রে সেখানে হযরত ওমর (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও এসব কথা শুনতে পান। তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি মহানবী (সা)-এর নিকট আবেদন করেন, “হে আল্লাহর রাসূল! এই বেঈমানকে হত্যা করার জন্য আপনি বিলালকে নির্দেশ প্রদান করুন।” কিন্তু মহানবী (সা) এই নায়ক পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন, “হে ওমর (রা)! যদি এরূপ করা হয়, বিশ্ববাসী বলবে, মুহাম্মদ তার সাথীদের হত্যা করতে দ্বিধা করেননি।”

এ সময় মহানবী (সা)-এর আশংকা ছিল যদি এই পরিস্থিতির প্রতি দ্রুত লক্ষ্য না করা হয়, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর সৃষ্ট বিশৃংখলা যদি তাড়াতাড়ি প্রশমিত না করা হয়, তাহলে হয়তো এই ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিতে পারে। এ কথা চিন্তা করে মহানবী (সা) মুসলিম বাহিনীকে মদীনায় রওয়ানা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। অথচ এ সময়ের আবহাওয়া সফর শুরু করার উপযোগী ছিল না। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ কথা জানতে পেরে দৌড়ে এসে মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। সে নিজের স্বভাব অনুযায়ী শপথ করে বলতে লাগল, ‘আমি এসব কথা বলিনি।’ কিন্তু মহানবী (সা) তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি সৈন্যবাহিনীর রওয়ানা দেয়ার নির্দেশ বহাল রাখলেন। সারাদিন মুসলিম বাহিনীর সফর অব্যাহত থাকে। রাত আসার পরও তাঁরা কোথাও যাত্রাবিরতি করেননি। এমনকি পরদিন যোহরের ওয়াক্ত পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী পথ চলতে থাকেন। এ সময় তাঁরা মদীনার সীমানায় প্রবেশ করেন। একটানা দীর্ঘ সফরের ফলে সবাই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েন। নিজ নিজ ঘরে পৌঁছেই তাঁরা সবাই অসাড় ঘুমে নিস্তেজ হয়ে পড়েন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর বিশৃংখলা সৃষ্টির কথা তাদের মন থেকে মুছে যায়। সে কি বলেছিল তাঁরা সব ভুলে যান। বস্তুত মহানবী (সা)-এর বিরতিহীন দীর্ঘ সফরের উদ্দেশ্য ছিল এটাই। এই যুদ্ধে মুসলমানরা অনেক গবাদিপশু ও মাল-সামান লাভ করেন। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে বনী মুস্তালিক দলপতি হারেছ ইবনে আবী যেরারের কন্যা জুওয়ায়রিয়াও ছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর হিংসা-বিদ্বেষ

মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও মুসলিম বাহিনীর সাথে মদীনায পৌছায়। বাহ্যিক তখনো পূর্বের মতো তার মুখে ঈমান ও ইসলামের আলোচনা ছিল। কিন্তু তাঁর অন্তরে মহানবী (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ পুরাদস্তুর ছিল। মুরায়সী নামক স্থানে মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধে সে যেসব কথা বলেছিল মদীনায এসে শপথ করে সব অস্বীকার করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনের নিচের আয়াতের মাধ্যমে তার এই কপটতা প্রকাশ করে দেন :

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا -
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ . يَقُولُونَ لَنَنْ
رْجِعَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ لِنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ - وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ .

“ওরাই বলে, ‘আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করো না, তা’হলে ওরা সরে পড়বে।’ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তো আল্লাহরই ; কিন্তু মুনাফিকগণ তা বুঝে না। ওরা বলে, ‘আমরা মদীনায প্রত্যাবর্তন করলে সেখান থেকে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করবেই। কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু’মিনদেরই। তবে মুনাফিকরা এটা জানে না।” (৬৩ : ৭-৮)

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করা হবে। এসব মুসলমানের মধ্যে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ছেলে হযরত আবদুল্লাহও ছিলেন। তিনি মহানবী (সা)-এর খেদমতে এসে আবেদন করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! শুনতে পেয়েছি আপনি আমার পিতাকে হত্যা করার মনস্থ করেছেন। উত্তম হবে যদি আপনি এই কাজের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করেন। আমি আমার পিতার শির আপনার খেদমতে এনে হাযির করব। হে আল্লাহর রাসূল! খায়রাজ গোত্রে এমন কোন লোক নেই, যে নিজের পিতার সাথে আমার চেয়ে বেশি সদ্ব্যবহার করবে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আপনি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে আমার পিতাকে হত্যা করেন, তাহলে আমি পিতার হত্যাকারীকে সহ্য করতে পারব না। তাকে হত্যা করা ছাড়া আমি স্বস্তি পাব না। কিন্তু কাফেরের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে কোন মু’মিনকে হত্যা করে আমি জাহান্নামের ইন্ধন হতে চাই না। এটা আমার নিকট অসহনীয় ব্যাপার।”

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মহানবী (সা)-এর খেদমতে তাঁর মনের ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা যেরূপ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন তা বর্ণনাভীত। এর চাইতে সুন্দর অভিব্যক্তি আছে কিনা আমার জানা নেই। তাঁর এই অভিব্যক্তিতে রয়েছে একদিকে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এবং অপরদিকে রয়েছে নিজের ঈমান রক্ষার ব্যাকুলতা। হযরত আবদুল্লাহর আশংকা ছিল তাঁকে ছাড়া অন্য কেউ তাঁর পিতাকে হত্যা করলে রক্ত-সম্পর্কের আকর্ষণ ও অহমিকা ইসলামী শান্তির উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে। তাতে করে মুসলমানদের

মধ্যে একের পর এক প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠতে পারে। তাই তিনি অকপটে মহানবী (সা)-এর নিকট তাঁর মনের এই ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। বিশ্বয়কর ব্যাপার হলো, ঔরসজাত সন্তানও তাঁর পিতার হত্যাকে অবশ্যম্ভাবী মনে করছেন। কিন্তু তিনি মহানবী (সা)-এর নিকট তাঁর পিতার প্রাণভিক্ষার আবেদন করেননি। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মহানবী (সা) প্রতিটি কাজই আল্লাহর নির্দেশে করে থাকেন। তাঁর পিতার কুফরী সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। এই সঙ্গে তাঁর এও আশংকা ছিল যে, তাঁর পিতাকে হত্যার পর পিতৃস্নেহ এবং আরবদের প্রতিশোধম্পৃহার স্বভাব সমুন্নত হয়ে তাঁকে পিতার হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এজন্য তিনি নিজেই পিতাকে হত্যার দায়িত্ব গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবশ্য তাঁর এই আশংকাও ছিল যে, জন্মদাতা পিতাকে হত্যা করার সময় হয়তো তিনি নিজেও ভেঙে পড়তে পারেন। কিন্তু এসব আশংকা সত্ত্বেও হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) পিতাকে হত্যার ব্যাপারে বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছিলেন। এই ঝুঁকি নেয়ার কারণ হলো, তাঁর পিতাকে অন্য কোন মুসলমান হত্যা করলে তিনি তাঁকে হত্যা করে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবেন। এরূপ পরিণতি তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি এক বিরাট মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। একদিকে ঈমান এবং অপরদিকে পিতৃস্নেহ। তার সাথে ছিল হযরত আবদুল্লাহর মত সুপুত্রের চারিত্রিক শক্তি। সত্যি এর চেয়ে অধিক আত্মিক দ্বন্দ্ব আর কি হতে পারে?

আরো বিশ্বয়কর ব্যাপার হলো, হযরত আবদুল্লাহর সব কথা শুনে মহানবী (সা) বললেন, আমরা ইবনে উবাইকে হত্যা করতে চাই না। আমরা তার সাথে সদ্ব্যবহার করে যাব। আমাদের দরজাও তার জন্য অবারিত থাকবে। আমরা চাই, সে আমাদের নিকট আসা-যাওয়া করবে। তাকে সংশোধনের প্রচেষ্টায় কোন প্রকার গাফলতি প্রদর্শন করা হবে না।

ক্ষমা প্রদর্শনের এর চাইতে উত্তম দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? মহানবী (সা) এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে চলেছেন। আর সে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মদীনার সবাইকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর মুহাজির সাহাবীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। সত্যি ক্ষমা ও দয়ার কী অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

মূলত মহানবী (সা)-এর এই ক্ষমা প্রদর্শনও আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর জন্য এক ধরনের প্রতিশোধ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। কারণ এই ঘটনার পর যখনই সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে উদ্ভবাচ্য করত, মানুষ তাকে গালিগালাজ করত। তারা বলত, “যিনি তোমাকে জীবনে বাঁচার সুযোগ দিয়েছেন, এখন তুমি তাঁরই বিরুদ্ধে বিষোদগার করছ। তোমার কি লজ্জা-শরম নেই!”

উক্ত ঘটনার পর একদিন হযরত ওমর (রা) মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর আপত্তিকর কথাবার্তা এবং মুসলমানদের আবেগ-উত্তেজনা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। মহানবী (সা) বললেন, “হে ওমর! তুমি যেদিন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে হত্যা করার জন্য আমাকে বলেছিলে, আমি যদি সেদিন তোমার প্রস্তাব মেনে নিতাম, তাহলে বিরোধীরা দল বেঁধে তেড়ে আসত। কিন্তু আজ যদি আমি তাকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করি, তাহলে কোন কথাই উঠবে না।” হযরত ওমর (রা) বললেন, “আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহর রাসূলের দূরদর্শিতা ও আমার জ্ঞানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে।”

হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ

বনী মুসতালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর একটি অপ্রীতিকর ঘটনা প্রকাশ পায়। প্রথম দিকে এই ঘটনা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু কিছুদিন পর এক শ্রেণীর অদূরদর্শী লোকের কানাঘুষায় এই ঘটনা বেশ প্রসার লাভ করে।

মহানবী (সা) কোন যুদ্ধে যাত্রার সময় তার সহধর্মিণীদের কোন একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কে যাবেন তা নির্ধারণ করা হতো 'কোরা' বা বিশেষ ধরনের নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে। বনী মুসতালিক যুদ্ধের সময় উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) মহানবী (সা)-এর সাথে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন হালকা-পাতলা গড়নের। যাওয়ার সময় ঘরের প্রবেশ-দ্বারের সাথে হাওদা লাগিয়ে দেয়া হতো। তিনি তাতে প্রবেশ করার পর উষ্ট্র চালকরা তা উঠিয়ে নিয়ে উটের পিঠে রেখে দিতেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর ওজন কম হওয়ায় হাওদাটি তেমন ভারী মনে হতো না। বনী মুসতালিক যুদ্ধ থেকে মুসলিম সৈন্য বাহিনীকে মহানবী (সা) হঠাৎ মদীনায় রওয়ানা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। রওয়ানা দেয়ার পর প্রথম মনয়িলে এসে মহানবী (সা) যাত্রাবিরতি করেন। রাতের কিছু সময় আরাম করার পর পুনরায় রওয়ানা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এই মনয়িলেই রওয়ানা দেয়ার প্রাক্কালে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে হযরত আয়েশা (রা) ছাউনি থেকে কিছু দূরে চলে যান। ফেরার সময় তিনি দেখেন তাঁর গলার হারটি পড়ে গেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে হারটি অনুসন্ধান করতে করতে এগিয়ে যান। হার খুঁজে পেতে তাঁর কিছু সময় কেটে যায়। সম্ভবত সফরের ক্লান্তির দরুন তাঁর চোখে ঘুমও এসে গিয়েছিল। যে স্থানে শিবির স্থাপন করা হয়েছিল, সেখানে ফিরে এসে দেখেন কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। এদিকে রওয়ানা দেয়ার সময় সাহাবীরা মনে করেন হযরত আয়েশা (রা) নিজের হাওদাতেই আছেন। তাঁরা হাওদাটি উটের পিঠের উপর উঠিয়ে রাখেন। এদিকে হযরত আয়েশা (রা) শিবিরের নিকট এসে দেখেন, সে স্থান জনশূন্য। তিনি ভাবেন, উষ্ট্র চালকরা যখন বুঝবে যে, তিনি হাওদাতে নেই, তারা তখন উট নিয়ে দ্রুত ফিরে আসবেন। এজন্য হযরত আয়েশা (রা) সে স্থান ত্যাগ করা সঙ্গত মনে করেননি। তিনি বোরকা পরে সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন।

এদিকে হযরত সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল (রা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগে হযরত আয়েশা (রা)-কে দেখেছিলেন। তিনি সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত আয়েশা (রা)-কে দেখতে পান। দেখেই তিনি বলে উঠেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।" তিনি বলেন, "হে উম্মুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি দয়া করুন। আপনি কিভাবে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন।" হযরত আয়েশা (রা) কোন উত্তর দেননি। অতঃপর হযরত সাফওয়ান (রা) নিজের উট বাড়িয়ে দিয়ে তাতে হযরত আয়েশা (রা)-কে আরোহণ করার অনুরোধ করেন। এ সময় তিনি একটু দূরে সরে যান। হযরত আয়েশা (রা) তাতে আরোহণ করেন। হযরত সাফওয়ান কাফেলার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উটটি দ্রুত তাড়িয়ে চলেন। কিন্তু কাফেলাও দ্রুত এক একটি মনয়িল অতিক্রম করছিলেন। অবশেষে তারা একদম মদীনায় এসে

পৌছেন। সৈন্যবাহিনীর পৌছার কিছুক্ষণ পর হযরত সাফওয়ান মদীনায়ে এসে পৌছেন। এ সময় দিনের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। হযরত আয়েশা (রা) হযরত সাফওয়ান (রা)-এর উটের উপর বসা ছিলেন। হযরত আয়েশা তার কক্ষের নিকট এসে উট থেকে নেমে ভিতরে চলে যান। এ সময়ে কোন মানুষের মনেই তাঁদের সম্পর্কে কোনরূপ খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়নি। মুখ খুলে কেউ কোন কথাও বলেনি। এমনকি হযরত আবু বকর (রা)-এর পুত্র-পবিত্র কন্যা এবং হযরত সাফওয়ানের মত মু'মিন ব্যক্তি সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর মনেও কোন প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হয়নি। আর এটা সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কোন ব্যাপারও ছিল না।

গনীমতের মাল বণ্টন

মুসলিম বাহিনী মদীনা পৌছার কিছুক্ষণ পরই হযরত আয়েশা (রা) এসে পৌছেন। এজন্য কোন প্রকার খারাপ ধারণার অবকাশও ছিল না। হযরত আয়েশা (রা) অত্যন্ত হাসিখুশি মনে ঘরে এসে পৌছান। তাঁর এই হাসিখুশি ভাবই বলে দিচ্ছিল পথে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এ সময় শহরের অবস্থা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। মুসলমানরা তাদের প্রতিপক্ষ বনী মুসতালিকের মাল-সামান ও যুদ্ধ-বন্দীদের বিলি-বণ্টনে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমানদের জীবনধারা ছিল খুবই শ্রমসাধ্য। তারা নিজেদের ঈমানী শক্তির মাধ্যমে শত্রুর উপর জয়ী হয়েছেন। কিছু মাল-সামান ও যুদ্ধবন্দী লাভ করেছেন। এসবের মাধ্যমে কটা দিন তারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন। শত্রুর সাথে এই সংগ্রামে কোন কোন সময় তাদের অনেকের জীবনও বিসর্জন দিতে হয়েছে। আল্লাহর পথে দীন ও ধর্মের ভালবাসা তাঁদের অনেককে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে। প্রাক-ইসলামী যুগে এ ধরনের সংগ্রামময় জীবনধারা থেকে আরবরা নিজেদের দূরে রাখতে চাইত। কিন্তু মুসলমানরা ছিল তার ব্যতিক্রম। তারা আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতেও এতটুকু দ্বিধা করেননি। এই সংগ্রামের পথে তারা কিছুটা ধন-সম্পদ গনীমত হিসাবে লাভ করতেন। কিন্তু তাদের ত্যাগের তুলনায় এসব ধন-সম্পদ ছিল একেবারে নগণ্য।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)

বনী মুসতালিক গোত্রের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে তাদের দলপতি হারেছের কন্যাও মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তাঁর নাম ছিল জুয়ায়রিয়া। তিনি বেশ সুন্দরী ছিলেন। গনীমতের মাল বণ্টনের সময় জুয়ায়রিয়া একজন আনসার মুসলমানের ভাগে পড়েন। মহিলা উক্ত আনসার মুসলমানের নিকট অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের আবেদন করেন। জুয়ায়রিয়া (রা)-কে উঁচু পরিবারের দেখে তাঁর প্রভু মুক্তিপণ হিসাবে অনেক অর্থ দাবি করেন। হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) মুক্তিপণের অর্থ সাহায্য লাভের আশায় মহানবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর কক্ষে ছিলেন। হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) আবেদন করলেন, 'আমি বনী মুসতালিক গোত্রপতি হারেছ ইবনে আবী যেরারের কন্যা। আমার বিপদ সম্পর্কে আপনি অবহিত আছেন। যে ভদ্রলোকের ভাগে আমি পড়েছি, মুক্তিপণের বিনিময়ে তিনি আমাকে ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছেন। আমি মুক্তিপণের সাহায্যের জন্য আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি।' মহানবী (সা) বললেন, "আমি তোমাকে একটি সুন্দর পদ্ধতি বলছি। তুমি

আমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ কর। আমি তোমার পুরো মুক্তিপণ পরিশোধ করে দেব।” মুসলমানরা যখন শুনতে পেল যে, বনী মুসতালিক গোত্রের সাথে মহানবী (সা) আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, তারা সবাই নিজেদের অংশের যুদ্ধবন্দীদের বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দিলেন। এসব বন্দীর সংখ্যা ছিল ছয়শ’র মতো। শুধু বনু মুসতালিক গোত্রের ছিল একশ’। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেছেন, “কোন মহিলা নিজের জাতির জন্য জুয়ায়রিয়া (রা)-এর চাইতে বেশি কল্যাণময়ী প্রমাণিত হয়নি।”

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, “হারেছ তার কন্যার মুক্তিপণ নিয়ে মদীনায়ে উপস্থিত হন। তিনি মহানবী (সা)-এর সামনে এসেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তার কন্যা জুয়ায়রিয়া (রা)-ও ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর মহানবী (সা) তাকে বিয়ে করেন। এই বিয়েতে চারশ’ দিরহাম মোহর আদায় করা হয়।”

এ ব্যাপারে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে। এই বিয়েতে হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-এর পিতা সম্মত ছিলেন না। তার অপর এক আত্মীয়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই বিয়ে সম্পন্ন হয়। মহানবী (সা) হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-এর বসবাসের জন্য মসজিদে নববীর নিকটে অন্যান্য সহধর্মিণীর কক্ষের পাশে একটি কক্ষ তৈয়ার করেন। উম্মুল মু’মিনীনদের মতো তাঁকেও উম্মুল মু’মিনীন খেতাবে ভূষিত করা হয়।

মিথ্যা অপবাদের কাহিনী

হযরত জুয়ায়রিয়া এ সময় মহানবী (সা)-এর অন্যতম সহধর্মিণী হিসাবে মর্যাদা লাভ করেন। এদিকে শহরে কানাঘুসা হচ্ছিল, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা কাফেলা থেকে কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন? এবং সাফওয়ানের মতো সুদর্শন যুবকের সাথে মদীনায়ে ফিরে আসার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে। মুসলমানদের মধ্যে হযরত যয়নব বিনতে জাহশের বোন হযরত হামনার প্রথম থেকেই হযরত আয়েশার প্রতি ঈর্ষা ছিল। হযরত হামনা ভাবতেন মহানবী (সা)-এর নিকট তার বোনের চাইতে হযরত আয়েশার মর্যাদা এত বেশি কেন? এই ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে হযরত আয়েশা সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদের পিছনে হযরত হামনা ইন্ধন যোগাতে থাকেন। পর্দার আড়ালে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত। হযরত আলীর সাথে তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠতা ছিল, উঠাবসা ছিল। বেঈমানদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও এ ব্যাপারে পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করে। সেও আদাপানি খেয়ে এই মিথ্যা ঘটনা রটিয়ে বেড়ায়। আউস গোত্রের আনসার মুসলমানরা এই গুজব শুনে তাঁদের ঈমানের পরিপক্বতার পরিচয় প্রদান করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর পূত-পবিত্রতার ব্যাপারে তাঁদের পুরো আস্থা ছিল। তাঁরা এই গুজব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই গুজব শহরময় ছড়িয়ে পড়ে।

মহানবী (সা)-এর উদ্বেগ

শেষ পর্যন্ত এই মিথ্যা অপবাদ মহানবী (সা) শুনতে পান। তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন। এ সময় তাঁর মনে নানা ধরনের প্রশ্ন দেখা দেয়। তিনি ভাবেন, হে আল্লাহ! একি হলো! আয়েশা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? এ কিছুতেই হতে পারে না। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব

ব্যাপার। বিশেষ করে এত বড় মর্যাদার অধিকারিণীর পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হতে পারে? হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি মহানবী (সা)-এর অত্যন্ত আস্থা ছিল। তাঁর মনে হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে এরূপ খারাপ ধারণা কিছুতেই স্থান পাচ্ছিল না। কিন্তু এই সঙ্গে তাঁর মনে এরূপ ধারণাও উদয় হতো যে, নারী জাতির মনের রহস্য ভেদ করা সহজ ব্যাপার নয়। তা'ছাড়া আয়েশার বয়সও খুব কম? যদি তার হার হারিয়ে দিয়ে থাকত, অধিক রাত পর্যন্ত মরুভূমিতে দূরে যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল। শিবিরে এসে সৈন্যবাহিনী রওয়ানা দেয়ার আগে ব্যাপারটা আমাকেও সে বলতে পারত। কিন্তু সে এরূপ কেন করল না? মহানবী (সা)-এর মন-মস্তিষ্কে এ ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুরপাক খাচ্ছিল। তিনি এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছিলেন না।

হযরত আয়েশা (রা)-এর অসুস্থতা

সারা শহরে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদের গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকরের পরিবারের কোন সদস্যের এ কথা হযরত আয়েশার সামনে মুখ খুলে বলার সাহস হয়নি। ফলে তিনি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। অবশ্য তাঁর প্রতি মহানবী (সা)-এর সহানুভূতি দৃষ্টি আগের মতো ছিল না। শুধু এই চিন্তায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত আয়েশার মাতা সব সময় তাঁকে দেখা-শোনা করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও মাঝে-মধ্যে তাঁকে দেখতে আসতেন। তিনি এসে শুধু এতটুকু জিজ্ঞেস করতেন, “এখন তোমার শরীর কেমন।” মহানবী (সা)-এর মৌন ভাব দেখে দিন দিন তাঁর অসুখ বেড়েই চলে। মহানবী (সা)-এর এই অমনোযোগিতা দেখে হযরত আয়েশা (রা) ভাবলেন, নবী (সা) সম্ভবত উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়ার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। এরূপ ধারণা করে একদিন তিনি মহানবী (সা)-এর খেদমতে আবেদন করলেন, ‘সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে আমার পিতামাতার নিকট থাকার অনুমতি দান করুন।’ নবী করীম (সা) তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দান করেন। তাতে তাঁর মনে আরো গভীর প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি দীর্ঘ ঊনত্রিশ দিন অসুস্থ থাকেন এবং শুকিয়ে হাড়িসার হয়ে পড়েন। কিন্তু তখনো তিনি নিজের অপবাদের কথা জানতে পারেননি।

এ সময় মহানবী (সা) এক ভাষণে বলেন, “হে মুসলমানগণ! কোন কোন লোক আমার পরিবার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে বেড়াচ্ছে। এটা আমার মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমার পরিবারের পূত-পবিত্রতার ব্যাপারে আমার পুরো আস্থা রয়েছে। যে ব্যক্তির সাথে এই অপবাদ রটানো হচ্ছে, তাকেও আমি একজন সৎচরিত্রবান বলে মনে করি। সে আমাদের ঘরে কোন সময় এসে থাকলেও আমার সাথেই এসেছে।”

এ সময় আউস গোত্রের হযরত উসাইদ ইবনে হোযায়ের (রা) দাঁড়িয়ে আবেদন করেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই অপবাদ আউস গোত্রের কেউ রটিয়ে থাকলে তার নাম জানা মাত্র আমরা তা চিরতরে বন্ধ করতে সক্ষম। আর যদি সে লোক খায়রাজ গোত্রীয় ভাইদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে আপনি তার সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করুন। আমরা আপনার নির্দেশ কার্যকর করার জন্য প্রস্তুত। আল্লাহর শপথ! এ ধরনের অপবাদ রটনাকারীর শাস্তি নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড।”

এ কথা শুনে খায়রাজ গোত্রের নেতা হযরত সাআদ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে বললেন, “উসাইয়েদ এসব কথা আমাদের লক্ষ্য করে বলেছেন। কারণ তিনি জানেন যে, এই অপবাদ সম্পর্কে যারা কানাঘুষায় অংশগ্রহণ করেছে, তাদের অধিকাংশই খায়রাজ গোত্রীয় লোক। তারা যদি আউস গোত্রের হতো এসব কথা উসাইয়েদ কখনো বলতেন না।” উভয় পক্ষের কথা কাটাকাটিতে আউস ও খায়রাজ গোত্রের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু মহানবী (সা)-এর দূরদর্শিতামূলক হস্তক্ষেপের ফলে তা আর আগে বাড়তে পারেনি।

হযরত আয়েশা (রা)-কে অপবাদ সম্পর্কে অবহিতকরণ

অবশেষে এক মুহাজির মহিলা উক্ত অপবাদ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-কে অবহিত করেন। তিনি তাঁর পুত্র-পবিত্র চরিত্রের উপর এই কালিমার কথা শুনে বুকে হাত রেখে বসে পড়েন। কান্নায় তাঁর বুক ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। তিনি বিছানা থেকে ওঠেন এবং মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর বাকশক্তি লোপ পায়। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে অভিযোগের সুরে মাকে বলেন, “আপনি নিশ্চয়ই এসব কথা শুনেছেন, এতদিন কেন এসব কথা আমার নিকট গোপন রাখলেন। কেন আমাকে বললেন না।” হযরত আয়েশা (রা)-এর কান্না দেখে তাঁর মা বলেন, “হে আমার পুত্র-পবিত্রা কন্যা! তোমার মতো কোন মহিলা স্বামীর অত্যন্ত আদরণীয়া হবে এবং তার সতিনরা তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে না, এ কিছুতেই হতে পারে না। এ ধরনের ঘটনা হয়েই থাকে।” মায়ের এরূপ সান্ত্বনামূলক বাক্যে হযরত আয়েশা নিশ্চিত হতে পারেননি। তিনি যখন ভাবতেন, মহানবী (সা)-এর অন্তরে তাঁর সম্পর্কে অস্পষ্টতা রয়েছে, তখন তিনি আরো হতাশ হয়ে পড়তেন। কখনো তিনি মনে করতেন, মহানবী (সা) এলে তার সামনে শপথ করে নিজের নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ দিবেন। কখনো কখনো ভাবতেন, তাঁর বিরুদ্ধে এসব অপবাদের মূল উৎস প্রকাশ করে দিবেন। কখনো পরিকল্পনা করতেন, মহানবী (সা) আমার সাথে যেমন ব্যবহার করছেন আমিও তাঁর সাথে অনুরূপ ব্যবহার করব। এক পর্যায়ে তাঁর ধারণা হলো মহানবী (সা) হচ্ছেন আল্লাহর মনোনীত রাসূল। তিনি তাঁকে স্ত্রী হওয়ার সম্মান প্রদান করেছেন। এই অপবাদ হচ্ছে অন্যদের রটানো। কাফেলা থেকে পিছনে পড়ে যাওয়ার পর সাফওয়ানের উটে ফেরার ফলে মানুষ এই অপবাদ রটানোর সুযোগ পেয়েছে। তাতে মহানবী (সা)-এর কোন হাত নেই।

অবশেষে হযরত আয়েশা (রা) আল্লাহর দরবারে দুহাত উঠিয়ে বলেন, “হে মহান স্রষ্টা! তুমি আমাকে সহজ সরল পথ প্রদর্শন কর, যাতে মহানবী (সা)-এর নিকট আমার নিরপরাধ হওয়া প্রকাশ পায়। তিনি আগের মতো আমাকে স্নেহ-ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখা শুরু করেন।

মহানবী (সা)-এর পরামর্শ

এই অপবাদ সম্পর্কে কানাঘুষার ফলে মহানবী (সা)-ও স্বস্তিবোধ করছিলেন না। অবশেষে তিনি এর একটা সুরাহা করার কথা চিন্তা করেন। তিনি বিষয়টি অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকরের বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সহচরদের মধ্যে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) এবং হযরত আলী ইবনে আবী তালিবকে ডেকে পাঠান। এই ঘটনা সম্পর্কে

তাদের মতামত জিজ্ঞেস করেন। হযরত উসামা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে হযরত আয়েশার পূত-পবিত্রতা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, “উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়েশা (রা) নিরপরাধ। মানুষ এসব মিথ্যে অপবাদ রটিয়ে বেড়াচ্ছে।” মহানবী (সা)-এরও ঘটনা সম্পর্কে এরূপই ধারণা ছিল। এরপর হযরত আলীর অভিমত জিজ্ঞেস করেন। তিনি ঘটনার সত্যাসত্য এড়িয়ে গিয়ে বলেন, ‘মহিলার কোন অভাব নেই।’ তিনি আরো বলেন, “এ ব্যাপারে আপনি হযরত আয়েশা (রা)-এর বাঁদী বারীদাকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন।” বারীদা আসতেই হযরত আলী তাকে খুব মারধর করেন। এরূপ করার উদ্দেশ্য হলো সে যেন মহানবী (সা)-এর সামনে সত্য সাক্ষ্য প্রদান করেন। বারীদা বলল, “আল্লাহর শপথ! হযরত আয়েশা (রা) সম্পূর্ণ নিষ্পাপ।” সে হযরত আয়েশার পূত-পবিত্রতা সম্পর্কে আরো অনেক কথা বলে।

হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসাবাদ

এ পর্যন্ত খোঁজখবর নেয়ার পর এবার হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসাবাদের পালা। মহানবী (সা) একদিন হযরত আবু বকর (রা)-এর বাড়িতে যান। সে সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর পিতামাতা ছাড়া একজন আনসার মহিলাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনা সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। উক্ত আনসার মহিলাও কান্না সংবরণ করতে পারেননি। হযরত আয়েশার এরূপ কান্নার কারণ ছিল, মহানবী (সা)-এর নিকট আমার কতো মর্যাদা ছিল। সকল দিক থেকে আমার উপর তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। আর আজ তাঁর দৃষ্টিতে আমি এত নীচ হয়ে গেলাম।

এক পর্যায়ে মন শক্ত করে তিনি মহানবী (সা)-এর দিকে তাকান। তাতে আপনা থেকেই তাঁর চোখের পানি বন্ধ হয়ে যায়। মহানবী (সা) বললেন, “হে আয়েশা! আল্লাহ তা’আলাকে ভয় কর। যদি মানুষের ধারণা ঠিক হয়, তাহলে আল্লাহর দরবারে তাওবা কর। তিনি মানুষের তাওবা কবুল করেন।” মহানবী (সা)-এর সাবধান করা শেষ হতেই হযরত আয়েশা (রা) কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ইতিপূর্বেই তাঁর চোখের পানি পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে তিনি মায়ের দিকে তাকান। তিনি নীরবে বসেছিলেন। এরপর তাকান পিতার দিকে। তাঁরও একই অবস্থা ছিল। হযরত আয়েশা (রা) অভিযোগের সুরে তাদের লক্ষ্য করে বলেন, আপনারা নীরবে বসে আছেন? তাঁরা উভয়ে বলেন, মূল ব্যাপার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এ কথা বলে তাঁরা মাথা নিচু করে থাকেন। হযরত আয়েশা (রা) আবার কাঁদতে শুরু করেন। কান্না অবস্থায় তিনি মহানবী (সা)-কে বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে তাওবা করার পরামর্শ দিচ্ছেন। আমি তো অপরাধই করিনি। কিজন্য তাওবা করব? শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অপবাদ রটাচ্ছে। আমি এ কথা বেশ ভাল করেই জানি। এজন্য কি আমি তাওবা করব? আল্লাহ তা’আলার দরবারে নিজের সাফাই বর্ণনা করার কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ আল্লাহ তা’আলার নিকট সব কিছু অত্যন্ত স্পষ্ট। আর মানুষের সামনে নিজের পবিত্রতার সাক্ষ্য দেয়াও নিরর্থক। কারণ তারা আমার কথা কেন বিশ্বাস করবে?” কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর হযরত আয়েশা (রা) আবার বললেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতা হযরত ইয়াকুব (আ) যা বলেছিলেন, আমিও নিজের পবিত্রতার ব্যাপারে সে কথারই পুনরাবৃত্তি করতে পারি। তিনি বলেছিলেন :

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ - وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ .

“সুতরাং ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম। তোমরা যা বানিয়ে বলছ, এ ব্যাপারে আল্লাহই আমাকে সাহায্য করবেন।” (১২ : ১৮)

ওহী

এই আলোচনার পর উক্ত বৈঠকে নীরবতা নেমে আসে। কারো মুখ থেকে কোন কথা বেরোয় না। এমনকি মহানবী (সা)-ও নীরব ছিলেন। এই নীরবতা কতক্ষণ ছিল সেদিকে কেউ লক্ষ্যই করেননি। ইতিমধ্যে ওহী নাযিল হওয়ার নিদর্শন প্রকাশিত হয়। মহানবী (সা)-এর চেহারা মুবারক কাপড় দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়। তাঁর পবিত্র শিরের নিচে বালিশ দেয়া হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় আমার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই হয়নি। কারণ আমি নির্দোষ ছিলাম। এজন্য আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আল্লাহ তা‘আলা আমার ব্যাপারে অবশ্যই ইনসাফ করবেন। কিন্তু আমার পিতামাতার মধ্যে এ সময় চরম ব্যাকুলতা দেখা যায়। মনে হচ্ছিল যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। তাদের আশংকা ছিল, ওহীর মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়ে যায় কিনা। ওহী নাযিল শেষ হওয়ার পর তাঁদের ব্যাকুলতা দূর হয়। ওহী নাযিল শেষ হলে মহানবী (সা) তাঁর পবিত্র ললাট থেকে ঘাম মুছেন। অতঃপর আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, “হে আয়েশা! তোমার জন্য শুভ সংবাদ। আল্লাহ তা‘আলা তোমার সততা সম্পর্কে ওহী নাযিল করেছেন।” মহানবী (সা)-এর এই মন্তব্য শুনে হযরত আয়েশা (রা) শুধু ‘আল্হামদু লিল্লাহ’ বলেন এবং নীরব থাকেন। মহানবী (সা) মসজিদে চলে যান এবং মুসলমানদের সদ্য নাযিল হওয়া নিচের আয়াত শোনান :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ - لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ - بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ - لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ - وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ . لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ . لَوْ لَاجَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ . وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ - إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنْتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا - وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ - وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا - سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ . يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ . وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ - وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . إِنْ

الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

“যারা মিথ্যে অপবাদ রটনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল। এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না ; বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। ওদের প্রত্যেকের জন্য আছে ওদের কৃতকর্মের ফল এবং ওদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। এ কথা শোনার পর মু’মিন পুরুষ ও নারীরা কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি এ তো নির্জলা অপবাদ। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি। যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি সেজন্য তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী। ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে মগ্ন ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদের স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা এটাকে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ছিল গুরুতর বিষয় এবং তোমরা যখন এটা শুনছিলে, তখন কেন বললে না, ‘এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয় ; আল্লাহ পবিত্র, মহান! এ তো এক গুরুতর অপবাদ।’ আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, ‘তোমরা যদি মু’মিন হও কখনো এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।’ আল্লাহ তোমাদের জন্য তার আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মু’মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মভুদ শাস্তি। এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।” (২৪ : ১১-১৯)

পূত-পবিত্র নারীদের সম্পর্কে যারা মিথ্যে অপবাদ রটনা করে, তাদের শাস্তি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا . وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

“যারা সাক্ষী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং সপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না ; এবং এরাই ফাসেক (সত্যত্যাগী)।” (২৪ : ৪)

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী (সা) উক্ত বিধান কার্যকর করেন। তিনি মিসতাহ ইবনে আছাছা, হাস্‌সান ইবনে সাবিত এবং হামনা বিনতে জাহশকে আশিটি করে দোররা মারার শাস্তি প্রদান করেন। তাঁরাই হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছিল। পবিত্র কোরআনের উপরে উল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আয়েশা (রা)-এর পূর্বকার সম্মান ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (সা)-এর নিকটও তিনি পূর্বের মতো স্নেহ-ভালবাসার পাত্রী হিসাবে পরিগণিত হন। তিনি পিত্রালয় থেকে মহানবী (সা)-এর ঘরে চলে যান।

উইলিয়াম ম্যুরের অভিমত

হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে উইলিয়াম ম্যুর বলেছেন, “এই অপবাদের পূর্বাপর ঘটনাবলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন একজন সতীসাক্ষী নারী। তাঁর পবিত্র জীবন ছিল সকল প্রকার কালিমামুক্ত। এমনকি এই অপবাদ প্রত্যাখ্যান করারও প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না।”

অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার পর

কশাঘাতের শাস্তি ভোগের পর হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত পূর্বের মতোই মহানবী (সা)-এর সহানুভূতি লাভ করতে থাকেন। মিস্তাহ ইবনে আছাছাকে হযরত আবু বকর (রা) সাহায্য-সহায়তা করতেন। এই ঘটনার পরও মহানবী (সা)-এর নির্দেশে হযরত আবু বকর (রা) পুনরায় নতুন করে তার ভাতা নির্ধারণ করে দেন। কয়েক দিনের মধ্যেই মদীনার পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর মুসলমানদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর মর্যাদা পূর্বের চেয়েও অনেক বৃদ্ধি পায়। মহানবী (সা) একাত্ততার সাথে ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের নিরলস প্রচেষ্টায় আরবের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে সোলহে হোদায়বিয়া বা হোদায়বিয়ার সন্ধির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। বস্তুত এই সন্ধি-চুক্তি ছিল পবিত্র কোরআনের ভাষায় ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য স্পষ্ট বিজয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

হোদায়বিয়ার সন্ধি

ইতিমধ্যে মহানবী (সা) ও তাঁর সাথীদের হিজরতের ছ'টি বছর অতিবাহিত হয়। এই ছ'টি বছর মুসলমানদের শত্রুর সাথে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয়। কখনো কুরাইশদের সাথে সংঘর্ষ হয়। কখনো ইহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য সংঘর্ষে জড়াতে হয়। কিন্তু মুসলমানদের এই নাযুক অবস্থায়ও ইসলাম চারদিকে প্রসার লাভ করতে থাকে। এই সঙ্গে মুসলমানদের সামাজিক অবস্থান ও শক্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিজরতের প্রথম বছরেই নামাযে মুসলমানদের কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের মসজিদে আকসার পরিবর্তে মসজিদে হারাম বা কা'বাঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করেন। মক্কায় অবস্থিত এবং হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মিত কা'বাঘরকে মুসলমানরা তাদের কাবা হিসাবে গ্রহণ করে। আর এই ঘর পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার নির্মিত-পুনর্নির্মিত হয়। যৌবনে মহানবী (সা) একবার কা'বাঘর নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, সর্বসম্মতভাবে হাজরে আসওয়াদ পুনঃস্থাপনের গৌরবও তিনিই লাভ করেন। এ ঘটনা ছিল মহানবী (সা)-এর প্রাক-নবুয়ত জীবনের। পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হওয়ার মর্যাদা দান করবেন, এ কথা তিনি নিজে যেমন সে সময় প্রত্যাশা করেননি, তেমনি অন্যদের নিকটও ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ কল্পনাভীত।

সেকালে কা'বাঘর ছিল আরবদের উপাসনালয়। নিষিদ্ধ চার মাসে আরবের আনাচে-কানাচে থেকে মানুষ দলে দলে কা'বাঘরের যিয়ারতে আসত। এই ঘরকে তারা অত্যন্ত পূত-পবিত্র মনে করত। এই ঘরে প্রবেশকারী নিজেকে শত্রুর হাত থেকে নিরাপদ মনে করত। এমনকি কা'বাঘরের আশেপাশেও একে অপরের প্রতি হামলা করার সাহস করত না। আরবে এই ঘরের এরূপ পবিত্রতা কয়েক শতাব্দী থেকে সংরক্ষিত হয়ে আসছিল।

বায়তুল্লাহর যিয়ারতে বাধা

কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা দেয় মুসলমানদের বেলায়। মহানবী (সা) ও মুসলমানরা মক্কা থেকে হিজরতের পর মক্কাবাসীরা শপথ গ্রহণ করে যে, তারা মুসলমানদের কা'বাঘরে প্রবেশ করতে দেবে না। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, যে কোন মূল্যে মুসলমানদের কা'বাঘরের সীমানায় প্রবেশ থেকে রুখতে হবে। এমনকি আরবের অন্যান্য গোত্রের মতো তাদের কা'বাঘর যিয়ারতের সুযোগ-সুবিধাও দেয়া যাবে না। মক্কাবাসীদের এই আচরণ সম্পর্কে হিজরতের প্রথম বছরেই পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ - قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ - وَصَدُّ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ .

“পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, বল, ওতে যুদ্ধ করা ভীষণ
অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে
বাধা দেয়া এবং এর বাসিন্দাকে সেখান থেকে বের করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা বেশি
অন্যায়।” (২ : ২১৭)

বদর যুদ্ধের পর অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনের আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمَا لَهُمْ آلًا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا
أَوْلِيَاءَهُ - إِنْ أَوْلِيَائُوهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . وَمَا كَانَ
صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً وَتَضِيدَةً - فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ -
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ - فَسَيُنْفِقُونَهَا
ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ - وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ .

“এবং তাদের কীই বা বলার আছে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যখন তারা
মানুষকে মাসজিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করে ? যদিও তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়,
সাবধানিগণই এর তত্ত্বাবধায়ক কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না। কা’বাঘরের নিকট
শুধু শিস ও করতালি দেয়াই তাদের সালাত, সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য তোমরা
শাস্তি ভোগ কর। আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার জন্য কাফেররা তাদের
ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে। অতঃপর তা তাদের
মনস্তাপের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফরী করে তাদেরকে
জাহান্নামে একত্র করা হবে।” (৮ : ৩৪-৩৬)

হিজরতের পর ছ’বছর সময় মধ্যে এ ধরনের অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। এসব
আয়াতে বলা হয়েছে, পবিত্র কা’বাঘর হচ্ছে মানবজাতির যিয়ারতের স্থান। আর এই স্থান
সবার জন্য নিরাপদ জায়গা। যেমন পবিত্র কোরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে :

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا -

“এবং সে সময়কে স্মরণ কর, যখন কা’বাঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তার
স্থল করেছিলাম।” (২ : ১২৫)

কিন্তু কুরাইশরা জিদ ধরে বসেছিল, মুসলমানরা কা’বাঘরের হোবল, আসাফ, নায়েলা
প্রভৃতি প্রতিমা থেকে তাদের বিশ্বাস প্রত্যাহার করেছে। যতদিন তারা আমাদের ও তাদের
পূর্বপুরুষদের দেব-দেবীকে পুনরায় গ্রহণ না করবে, ততদিন তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করা
অবশ্য কর্তব্য। আমরা কখনো তাদের কা’বাঘর যিয়ারতের সুযোগ দেব না।

মাতৃভূমির আকর্ষণ

হিজরতের পর ছ'বছর মুসলমানরা কা'বাঘরের যিয়ারত থেকে মাহরুম ছিলেন। তাঁদের পূর্বপুরুষরা সব সময় কা'বাঘর যিয়ারত করত। কিন্তু মুসলমান হওয়ার দরুন তাঁরা ধর্মীয় বিধান হিসেবেও কা'বাঘর যিয়ারত করতে পারছেন না। এটা তাঁদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। বিশেষ করে মুহাজিরদের মনে কা'বাঘর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা তীব্রভাবে অনুভূত হতো। তারা জন্মভূমি মক্কা থেকে দূরে চলে এসেছে। তাদের আত্মীয়-স্বজনরা সেখানে রয়ে গেছে। এই বিরহ-বেদনা সব সময় তাদের মনে একটা অস্বস্তি সৃষ্টি করে রাখত। কিন্তু মুহাজির ও আনসার সবাই আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যের প্রত্যাশী ছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন, একদিন না একদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ও রাসূলের অনুসারীদের কামিয়াব করবেন। তিনি ইসলামকে সকল ধর্মের উপর বিজয় দান করবেন। তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল খুব শিগ্গির আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের জন্য পবিত্র মক্কা নগরীর দরজা অব্যাহত করে দেবেন। তাঁরা কা'বাঘর যিয়ারত করতে সক্ষম হবেন। তাতে করে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মানব জাতির জন্য ফরযকৃত হজ্জব্রত অন্যদের মতো তাঁরাও পালন করার সুযোগ লাভ করবেন।

হিজরতের পর কয়েকটি বসন্ত অতিবাহিত হয়েছে। এসময়ে মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘিরে রেখেছে। বদর যুদ্ধের পর তাঁদের উপর উহুদ যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর হঠাৎ পরিখার যুদ্ধ তাদের গ্রাস করে। এভাবে অন্যান্য যুদ্ধ-বিগ্রহও তাঁদের একটু স্বস্তিবোধ করার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু এতসব বিপদ-আপদ সত্ত্বেও মুসলমানরা পবিত্র কা'বাঘর যিয়ারতের ব্যাপারে অত্যন্ত আস্থাবান ছিলেন। কা'বাঘর যিয়ারতের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা সব সময় অধীর আগ্রহে দিন গুণছিলেন। তাঁদের পথ প্রদর্শক মহানবী (সা)-ও কা'বাঘর যিয়ারতের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর অনুসারীদের শুভসংবাদ দান করলেন, 'আমাদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হওয়ার দিন ঘনিয়ে এসেছে।'

আরব ও কা'বাঘর

শক্তি মদমত্ত কুরাইশরা মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের জন্য কা'বাঘরের দ্বার বন্ধ করে রেখেছিল। এজন্য মুসলমানরা হজ্জ ও ওমরা আদায় করতে পারছিলেন না। এখন প্রশ্ন হলো, কুরাইশরা কি এই প্রাচীন উপাসনালয়ের একচ্ছত্র মালিক ছিল? বস্তুত এই ঘরের উপর (তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে) সকল আরবের সমঅধিকার স্বীকৃত ছিল। কুরাইশরা ছিল কা'বাঘরের দেখাশোনকারী। বলা চলে, তারা কা'বাঘরের চাবি রাখা ও হাজীদের পানাহার করানোর চাকরিতে নিয়োজিত ছিল। তাদের এই পদমর্যাদা লাভের পিছনেও কা'বাঘর যিয়ারতকারীদেরই অবদান ছিল।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, কা'বাঘরের ভিতর প্রতিটি গোত্রের আলাদা আলাদা প্রতিমা ছিল। নিজেদের প্রতিমা ছাড়া কোন গোত্রেরই অন্যদের প্রতিমার সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। কুরাইশ খাদেমরা কোন গোত্রকে কা'বাঘর যিয়ারত, তাওয়াফ কিংবা অন্য কোন অনুষ্ঠান পালনে নিষেধ করত না। কিন্তু মহানবী (সা)-এর আবির্ভাব হলো। তিনি মানুষকে পৌত্তলিকতার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করার তৎপরতা শুরু করলেন। মানুষকে এক আল্লাহ্র উপাসনার প্রতি আহ্বান

জানালেন। তাঁর এই আহবানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল মানব জাতির মধ্যে মানবতার সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীতে মানব জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হবে। তাদের উপর আল্লাহ ছাড়া আর কারো স্থান থাকবে না। বস্তুত মহানবী (সা) মানব জাতিকে আধ্যাত্মিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করে তুলতে চাইলেন, যাতে তারা এর মাধ্যমে মহান সত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। আর এই তাওহীদবাদের বিধানে হজ্জ ও ওমরাও ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কুরাইশরা ইসলামের অনুসারীদের ওমরা ও হজ্জব্রত পালন থেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখল।

কুরাইশদের আশংকা ছিল, মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারী মুসলমানরা যদি কোন সময় কা'বাঘর যিয়ারতে এসেই পড়েন, তাহলে সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। কারণ এসব মুসলমানদের অধিকাংশ মক্কাবাসীদেরই আত্মীয়-স্বজন। তাদের প্রতি তাকাতেই আত্মীয়সুলভ স্নেহ-প্রীতি জেগে উঠবে। মক্কাবাসীরা অত্যন্ত দুঃখিত হবে। তারা বলবে, আমাদের ভাই-বন্ধু তাদের পরিবার-পরিজন থেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাটা খুবই অন্যায় কাজ। তাতে আমাদের মধ্যকার মুসলমানদের কল্যাণকামী ও শত্রুদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। এ ছাড়া কুরাইশদের মধ্যে আর একটা বেদনা ছিল, মহানবী (সা) ও তাঁর সাথীরা কুরাইশদের সিরিয়ার বাণিজ্যপথ বন্ধ করে রেখেছেন। এসব কারণে কুরাইশদের মনে মুসলিম বিদ্বেষ ও শত্রুতা একেবারে জেঁকে বসেছিল। তারা যে কা'বাঘরের মালিক নয়, নিছক খাদেম মাত্র। এদিক থেকে যিয়ারতকারীদের পানাহার করাতে তারা বাধ্য ছিল। কিন্তু মুসলিম বিদ্বেষের দরুন তারা এই নির্জলা সত্যটি সম্পর্কে কখনো চিন্তাও করেনি।

কা'বাঘর ও মুসলমান

হিজরতের পর ছ'টি বসন্ত অতিক্রান্ত হয়েছে। মুসলমানরা কা'বাঘরের যিয়ারত, হজ্জ ও ওমরা পালনের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। এক সুপ্রভাতে তাঁরা মসজিদে নববীতে বসা ছিলেন। মহানবী (সা) তাঁর সাহাবাদের সদ্য নাযিল হওয়া ওহীর মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রদান করলেন :

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْنِينَ -

“আল্লাহ চাহেত (অদূর ভবিষ্যতে) তোমরা মসজিদে হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে।”

(৪৮ : ২৭)

এই খবর শোনামাত্র মুসলমানরা সমবেত কণ্ঠে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন। এই খবর মুহূর্তে বিদ্যুতগতিতে সারা মদীনায়ে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলমানরা উদ্ভিগ্ন ছিলেন, তারা কিভাবে আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করবেন। যুদ্ধের মাধ্যমে কুরাইশদের মক্কা থেকে বের করে দেয়া হবে ? না কুরাইশরা নিজেরাই কা'বাঘরের দ্বার মুসলমানদের জন্য অব্যাহত করে দেবে !

হজ্জের ঘোষণা

মহানবী (সা) হজ্জ যাতায়াত প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সারা মদীনায়ে মুসলমানদের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করেন। তিনি মুসলমানদের অমুসলিম মিত্র গোত্রগুলোতে প্রতিনিধি পাঠান।

তাদেরও মুসলমানদের সাথে কা'বাঘরের যিয়ারতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এই সঙ্গে মহানবী (সা) আরো ঘোষণা করেন, যুদ্ধের মনোভাব নিয়ে কেউ যেন এই সফরে যোগদান না করে। মহানবী (সা)-এর আকাঙ্ক্ষা ছিল মুসলমানরা যেন এই সফরে অধিক সংখ্যায় যোগদান করে। তাতে আরবদের নিকট একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীরা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করার পক্ষপাতী নন। এই সফরে তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আব্দুল্লাহর ঘর যিয়ারত করা।

হজ্জব্রত পালন শুধু মুসলমানদেরই ধর্মীয় বিধান ও একক বৈশিষ্ট্য ছিল না। অন্যান্য আরবরাও কা'বাঘর যিয়ারত করা তাদের জন্য অনেকটা বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিল। এজন্য মহানবী (সা) অমুসলিমদেরও সফরসঙ্গী করে নেন। এক্ষেত্রে মহানবী (সা)-এর আরেকটা কৌশল ছিল এই যে, মক্কাবাসীরা যদি মুসলমানদের তরবারির মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানাতে চায়, তাহলে মুসলিম কাফেলায় অমুসলিমরা থাকলে আরবের অন্য কোন গোত্র মক্কাবাসীদের সমর্থনে এগিয়ে আসবে না। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। তারা বরং একথা বিশ্বাস করবে যে, কা'বাঘর যিয়ারতের দরজা বন্ধ করে মক্কাবাসীরা আরবদের হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাইল (আ)-এর ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে চাচ্ছে। কুরাইশরা এবার যদি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধই বাঁধিয়ে বসে, তাহলে আগামীতে তারা আর পরিবার যুদ্ধের সময়ের মতো লোক জমায়েত করতে পারবে না। কোন আরব গোত্র কুরাইশ পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। তাতে এত দিন যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি, তাদের নিকট ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া আরবের অন্যান্য গোত্র পরিষ্কার বলে উঠবে, একদল লোক কা'বাঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বেঁধে কোরবানীর পশু নিয়ে এসেছিল। তাদের প্রত্যেকের তরবারিও কোষবদ্ধ ছিল। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কা'বাঘর যিয়ারতের মাধ্যমে নিজেদের ধর্মীয় বিধান পালন করা। কিন্তু মক্কাবাসী তাদের কা'বাঘর যিয়ারত করতে দেয়নি। অথচ কা'বাঘরের উপর সারা আরববাসীর যৌথ অধিকার রয়েছে।

অমুসলিম গোত্রগুলোকে হজ্জের দাওয়াত

মহানবী (সা) মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে হজ্জ যাবার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু অমুসলিম গোত্রগুলো থেকে খুব সামান্য সংখ্যক মহানবী (সা)-এর আমন্ত্রণে সাড়া দেয়। তিনি যিলকাদ মাসের প্রথম দিকে তাঁর 'কাসওয়া' নামের উটে আরোহণ করে মদীনা থেকে রওয়ানা হন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন এক হাজার চারশ' জন। তাদের মধ্যে ছিলেন মুহাজির, আনসার ও কিছু অমুসলিম। তাদের সঙ্গে সত্তরটি কোরবানীর উট ছিল। তার মধ্যে আবু জেহেলের একটি উটও ছিল। এই উটটি বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হস্তগত হয়। কোরবানীর পশুগুলোকে নিশান পরিয়ে দেয়া হয়। মদীনা থেকে পাঁচ-ছ' মাইল এগিয়ে এসে 'যুল হোলায়ফা' নামক স্থানে পৌঁছে মহানবী (সা) ওমরার নিয়ত করে ইহ্রাম বাঁধেন। যুল হোলায়ফার আকাশ-বাতাস 'তালবিয়া' ধ্বনিতে নিনাদিত হয়ে ওঠে। সফরসঙ্গী মুসলমানদের নিকট শুধু কোষবদ্ধ তরবারি ছিল। আর এ ধরনের তরবারি তৎকালীন আরবদের একটা সাধারণ রীতি ছিল। উম্মুল মু'মিনদের মধ্যে শুধু হযরত উম্মে সালামা (রা) মহানবী (সা)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন।

মুসলমানদের হজ্জ ও কুরাইশ

মক্কাবাসী জানতে পারে যে, মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীরা ওমরা করার জন্য মক্কা আসছেন। কুরাইশ ও মক্কার অন্যান্য বাসিন্দা এ ব্যাপারটির বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও সলা-পরামর্শ করে। তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, মহানবী (সা) কুরাইশ ও তাদের বন্ধু গোত্রগুলোকে মদীনা শহরের সীমানায় প্রবেশ করতে দেননি। কিন্তু নিজে তিনি ওমরা পালনের ছদ্মাবরণে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করার মনস্থ করেছেন। এরূপে তিনি একদিকে মদীনা আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। অপরদিকে মক্কা নগরী দখল করে বসবেন। অথচ মুসলমানরা ইহ্রাম বেঁধে মক্কার দিকে আসছিলেন। সারা আরবে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছিল যে, শুধু ওমরা পালনের জন্যই মুসলমানরা মক্কা য় যাচ্ছেন। কিন্তু মুসলমানদের ওমরা পালন প্রস্তুতি এবং এই ঘোষণাও মক্কাবাসীদের মধ্যে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তারা যে কোন মূল্যে মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের তাওয়াফ ও যিয়ারত থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও ইকরামা ইবনে আবু জেহেলের নেতৃত্বে দু'শ' সৈন্য মুসলমানদের বাধা দেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেয়। তারা যী-তুওয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে এবং মুসলমানদের পথরোধ করে থাকে।

উভয় বাহিনীর মুখোমুখি

এদিকে মহানবী (সা) মুসলমানদের নিয়ে মক্কা থেকে দুই মন্ঘিল ব্যবধানে 'উসফান' নামক স্থানে এসে পৌঁছেন। উসফান হচ্ছে মক্কা-মদীনার পথে একটি জনপদের নাম। এখানে বনী কাআব গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে মুসলমানদের সাক্ষাত হয়। মহানবী (সা) তাকে কুরাইশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। লোকটি বলল, আপনার আসার খবর শুনেই কুরাইশরা উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। এখন তাদের বাহিনী যী-তুওয়া নামক স্থানে এসে পড়েছে। আপনাদের মক্কায় প্রবেশ রোধ করার জন্য প্রতিটি সৈনিক শপথ গ্রহণ করেছে। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ তাদের 'কারাউল গামীম' পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। এই স্থানটি ছিল 'উসফান' থেকে মাত্র আট মাইল দূরে। এই খবর শুনে মহানবী (সা) বললেন :

“কুরাইশদের ভূমিকা সত্যি দুঃখজনক। যুদ্ধ-বিগ্রহে তারা বরবাদ হয়ে গেছে। এরপরও তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। তারা যদি অন্যান্য আরব গোত্রের দয়ার উপর আমাকে ছেড়ে দিত, তাতে তাদের কি ক্ষতি হতো। সে সব গোত্র আমার উপর জয়লাভ করলে কুরাইশদের মনের আশা পূরণ হতো। আর যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদের উপর বিজয় দান করতেন, তা'হলে তারা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতো। কুরাইশরা এ ধরনের কিছু চিন্তা-ভাবনা না করে যুদ্ধও করতে পারে। কারণ তাদের যুদ্ধ করার শক্তি-সামর্থ্য রয়েছে। জানি না কুরাইশরা এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমাকে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে, আমি তা বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করে যাব। এই সংগ্রামে হয় আমি বিজয় লাভ করব, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাব।”

এই নাজুক পরিস্থিতিতে মহানবী (সা) গভীর চিন্তায় মশগুল হয়ে পড়েন। কারণ তিনি মদীনা থেকে জিহাদের উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বের হননি। তিনি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মানব জাতির উপর ফরযকৃত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বেঁধে মদীনা

থেকে বের হয়েছেন। মহানবী (সা) এরূপ ধারণাও করেছেন যে, কুরাইশরা যদি জয়লাভ করে, তা'হলে তারা গর্ব ও অহংকারে মাটিতে পা রাখবে না। তিনি আরো চিন্তা করেছেন, কুরাইশরা হয়তো এই উদ্দেশ্যেই খালিদ ও ইকরামাকে পাঠিয়েছে। কারণ তারা জানতে পেরেছে মুসলমানরা যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিয়ে আসেননি। এরূপ পরিস্থিতিতে তাদের পরাজিত করা খুবই সহজ হবে।

মহানবী (সা) এ ধরনের চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন। ইতিমধ্যে একটু দূরে কুরাইশ বাহিনীকে আসতে দেখা যায়। তাদের আসার ধরন দেখে মনে হচ্ছিল, এই বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করা ছাড়া মুসলমানরা তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবেন না। আরো মনে হচ্ছিল, এই যুদ্ধে কুরাইশরা তাদের জন্মভূমির হেফাজত ও মান সম্মান রক্ষা করার জন্য জীবন দিতেও দ্বিধা করবে না। কিন্তু মহানবী (সা) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার জন্য পরিস্থিতি তাঁকে বাধ্য করছিল। যেসব মুসলমান তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরা শৌর্য-বীর্যে কোন অংশে কারো থেকে কম ছিলেন না। তাঁরা তরবারি নিয়ে হানাদারদের প্রতিহত করার জন্য ময়দানে নেমে পড়লে অবশ্যই জয়লাভ করতেন। কিন্তু তাতে মহানবী (সা)-এর উদ্দেশ্য সফল হতো না। তা'ছাড়া মুসলমানরা সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে রুখে দাঁড়ালে কুরাইশরা সারা আরবে প্রচার করে বেড়াতো (হযরত) মুহাম্মদ (সা) নিষিদ্ধ মাসেও আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। মহানবী (সা) শুধু আল্লাহ তা'আলার রাসূলই ছিলেন না, তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। এদিক থেকেও তাঁর কোন পদক্ষেপ কৌশল ও দূরদর্শিতার পরিপন্থী হতেই পারে না। সুতরাং উক্ত নায়ক পরিস্থিতিতে মহানবী (সা) তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কিনা যে ব্যক্তি কোন নিরাপদ পথে আমাদের মক্কায় নিয়ে যাবে, যাতে কুরাইশ বাহিনীর সাথে আমাদের মুখোমুখি হতে না হয়। তাতে করে মহানবী (সা) মদীনা থেকে তাওয়াফ ও যিয়ারতের যে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছিলেন তাতে অবিচল থাকার আশ্রয় প্রকাশ করেন।

মহানবী (সা)-এর আহবানে মুসলিম বাহিনী থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে আসেন। তিনি দুর্গম ও আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে মুসলিম বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে চলে। এই পথ অতিক্রমকালে মুসলমানদের খুবই দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে হয়েছিল। এক পর্যায়ে একটি গিরিপথ থেকে মুসলমানরা সমতল ভূমিতে এসে পড়েন। সেখান থেকে ডানদিকে মোড় নিতেই মক্কার নিম্ন এলাকায় 'ছানিয়াতুল মুরার' নামক পর্বত চূড়ার অদূরে হোদায়বিয়া নামক স্থানে এসে পৌঁছেন। এখানে মুসলমানরা শিবির স্থাপন করেন। এদিকে কুরাইশ বাহিনী দেখে মুসলমানরা রাজপথ ছেড়ে গিরিপথে মক্কার দিকে এগিয়ে চলেছেন। এই অবস্থা দেখে তারা দ্রুত মক্কার দিকে ফিরে যায়। তাদের ধারণা ছিল, মুসলমানরা মক্কা আক্রমণ করলে তারা যেন প্রতিরোধ করতে পারে।

মুসলমানদের হোদায়বিয়ায় পৌঁছার সাথে সাথে মহানবী (সা)-এর উট 'কাসওয়া' মাটিতে বসে পড়ে। মুসলমানরা মনে করেছিল, কাসওয়া ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে। কিন্তু মহানবী (সা) বললেন, “না, তোমাদের ধারণা ঠিক নয়। কাসওয়া ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েনি। যে মহান শক্তি আবরার হস্তি বাহিনীকে মক্কায় প্রবেশকালে থামিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সত্তাই কাসওয়াকেও বসিয়ে দিয়েছেন।” এরপর তিনি বলেন, “আজ মক্কাবাসী মানবতার কল্যাণের জন্য আমার

নিকট যে কোন শর্ত দাবি করবে, আমি তা মেনে নিব।” একথা বলার পর তিনি সেখানে শিবির স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন। মুসলমানরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখানে তো পানি নেই। মহানবী (সা) নিজের শরাশ্রয় থেকে একটি তীর খুলে এক ব্যক্তিকে দিয়ে বললেন, এটি উপত্যকার কোন কূপে নিয়ে স্থাপন কর। তীরটি একটি শুকনো কূপের মধ্যে স্থাপন করা মাত্র তা থেকে পানি বের হওয়া শুরু হলো। সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করলেন এবং সেখানেই শিবির স্থাপন করা হলো।

উভয় পক্ষের দূরদর্শিতা

মুসলমানরা হোদায়বিয়ায় শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু কুরাইশরা মুসলমানদের বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, পরিণাম যাই হোক, তারা মহানবী (সা)-কে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। এজন্য জীবন দিতে হলেও তারা দ্বিধা করবে না। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরও কি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া উচিত ছিল? কোন কোন মুসলমানের অভিমত ছিল, বারবার যাতে কলহ-বিবাদের মোকাবেলা করতে না হয়, তার জন্য আজই চূড়ান্ত বোঝাপড়া করা উচিত। আল্লাহ তা‘আলা ভাগ্যে যা রেখেছেন তার ফায়সালা আজই হয়ে যাবে। কুরাইশরা এই ভেবে উদ্দিগ্ন ও শংকিত ছিল যে, সংঘর্ষে মুসলমানরা জয়লাভ করলে দেশে তারা মুখ দেখাতে পারবে না। কা‘বাঘরের কর্তৃত্ব, চাবি রাখা ও অন্যান্য পদবী সবই তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। (হযরত) মুহাম্মদ (সা) এসব কিছু হস্তগত করে ফেলবেন। সংঘর্ষে যাওয়া-না যাওয়ার ব্যাপারে কুরাইশরা দ্বিধাম্বিত হয়ে পড়েছিল।

এরূপে উভয় পক্ষই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। কিন্তু উভয় পক্ষের চিন্তা-ভাবনা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আকাশ-পাতালের ফারাক ছিল। মহানবী (সা)-এর লক্ষ্য ছিল, তিনি ওমরা পালনের আকাজক্ষা নিয়ে মদীনা থেকে বেরিয়েছেন। এজন্য কুরাইশরা অস্ত্রধারণে বাধ্য না করা পর্যন্ত রক্তপাত এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা প্রয়োজন। অপরদিকে কুরাইশরা ভাবল, (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট বিচক্ষণ ও দূরদর্শী প্রতিনিধি দল পাঠানো দরকার। তারা একদিকে মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য পর্যবেক্ষণ করবেন, অপরদিকে তাদের তাওয়াফ ও যিয়ারত ছাড়াই ফিরে যেতে সম্মত করবেন।

কুরাইশরা হোদায়বিয়ায় মহানবী (সা)-এর নিকট একাধিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। খোযায়া গোত্রের সরদার বোদায়েল ইবনে ওয়ারকার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল পাঠান হয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তারা বুঝতে পারে, মহানবী (সা)-এর যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছে নেই। মুসলমানরা শুধু কা‘বাঘর যিয়ারত ও তাওয়াফ করার জন্যই এসেছেন। অতঃপর বোদায়েল কুরাইশদের নিকট ফিরে এসে সব খুলে বলেন। তিনি মুসলমানদের আল্লাহর ঘরের যিয়ারতের পথ খুলে দেয়ার জন্য কুরাইশদের পরামর্শ দেন। তারা উল্টো বোদায়েলকে অভিযুক্ত করে এবং দু’কথা গুনিয়ে দেয়। তারা বলে, (হযরত) মুহাম্মদ (সা) যুদ্ধ করার জন্য না এলেও আমরা তাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে পারি না। তাতে আরবরা আমাদের দুর্বলতার কাহিনী প্রচার করে বেড়াবে। আমরা তাদের এই সুযোগ দিতে পারি না। এরপর কুরাইশদের দ্বিতীয় প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তাদের সাথেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একই ধরনের আলাপ-আলোচনা হয়। কিন্তু কুরাইশদের দুর্নামের ভয়ে

তারা মূল আলোচনা এড়িয়ে নানা কথা বলে অব্যাহতি লাভ করে। কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে 'আহাবীশদের' উপর অনেকটা নির্ভর করত। আরবদের তীরন্দায় কয়েকটি গোত্রকে 'আহাবীশ' বলা হতো। মক্কার নিচু এলাকায় হোবশা পাহাড়ে তারা বসবাস করত। এজন্য তাদের হোবশা বা আহাবীশ (বহুবচনে) বলা হতো। কুরাইশরা ভাবল, এবার আহাবীশ গোত্রপতিকে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট পাঠাতে হবে। তিনি তার কথা মেনে না নিলে এবং তার সাথে একটা সমঝোতায় না পৌঁছলে সে আন্তরিকভাবে কুরাইশদের সাহায্য করবে। তাতে করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের শক্তি কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। এই দিক চিন্তা করে কুরাইশরা আহাবীশদের সরদার হুলায়েসকে মুসলিম শিবিরে পাঠিয়ে দেয়। হুলায়েসকে আসতে দেখে মহানবী (সা) তাকে চিনে ফেলেন। তিনি কোরবানীর পশুগুলো তার সামনে ছেড়ে দেয়ার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ প্রদান করেন। তাতে হুলায়েস পরিষ্কার বুঝতে পারবে, কুরাইশরা যাদের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করছে, তারা শুধু কা'বাঘর যিয়ারত এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এসেছে। হুলায়েস কোরবানীর পশুগুলো দেখতে পেলো। সে আরো দেখল, সত্তরটি কোরবানীর পশু ক্ষুধার তাড়নায় একে অপরের শরীরের পশম চেটে খাচ্ছে। এই করুণ দৃশ্য তাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে। তার মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণার সৃষ্টি হয়। তার বিশ্বাস হয়, কুরাইশরাই মুসলমানদের উপর বাড়াবাড়ি করছে। মুসলমানরা কুরাইশদের সাথে সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে এখানে আসেনি। সে মহানবী (সা)-এর সাথে দেখা না করেই ফিরে যায়। হোদায়বিয়ায় যা কিছু দেখেছে কুরাইশদের নিকট খুলে বলে। তার কথা শুনে কুরাইশরা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। তারা হুলায়েসকে বলে, "চুপ থাক। তুমিও তো একজন বেদুঈন ছাড়া কিছু নও। তুমি এসব কথা কি বুঝবে?" কুরাইশদের এ ধরনের কথা শুনে হুলায়েসও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সে বলে, "মানুষকে কা'বাঘরের যিয়ারত থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য আমি তোমাদের সাথে মিত্রতা করিনি। আহাবীশদের কেউ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর যিয়ারতের পথে বাদ সাধবে না।" হুলায়েসের মুখে এসব কথা শুনে কুরাইশরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে, "এ ব্যাপারে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করার সময় দাও।"

উরওয়া ইবনে মাসউদের প্রতিনিধিত্ব

এবার কুরাইশরা একজন বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে মহানবী (সা)-এর খেদমতে পাঠানোর পরিকল্পনা করে। এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি পড়ে উরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফীর উপর। কিন্তু কুরাইশ কর্তৃক পূর্ববর্তী প্রতিনিধিদলগুলোকে অপমান করার কথা উরওয়ার জানা ছিল। সে কুরাইশদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কুরাইশরা বলল, আপনার প্রজ্ঞা সম্পর্কে আমাদের পুরোপুরি আস্থা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত উরওয়া তাদের অনুরোধ রক্ষা করেন। তিনি হোদায়বিয়ায় মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করেন, 'মক্কা আপনারও জন্মভূমি। আজ আপনি যদি এসব নীচ লোকদের দ্বারা মক্কা নগরীকে পর্যুদস্ত করেন, তা'হলে কুরাইশরা চিরদিনের জন্য অপমানিত হবে। এসব লোক আপনাকে ছেড়ে চলে গেলে কুরাইশদের অপমান করার জন্য আপনিও অনুশোচিত হবেন। আপনিও এই অপমানের অংশীদার হবেন। কুরাইশদের সাথে আপনার যতই যুদ্ধ-বিগ্রহ হোক, আমার মনে হয়, তাদের এই অপমান আপনি সহ্য করবেন না।'

হযরত আবু বকর (রা) দেখলেন, উরওয়া সুকৌশলে মুসলমানদের সম্পর্কে মহানবী (সা)-কে খারাপ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছে। তিনি জোরালো ভাষায় উরওয়ার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! কোন অবস্থায়ই মুসলমানরা আপনাকে ছেড়ে যেতে পারে না।”

তৎকালীন আরবের রীতি অনুযায়ী উরওয়া আলাপ-আলোচনার সময় মহানবী (সা)-এর পবিত্র দাড়ি স্পর্শ করে কথা বলতেন। হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) মহানবী (সা)-এর পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বারবার উরওয়ার হাত সরিয়ে দিতেন। অথচ এই উরওয়াই ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত মুগীরা (রা)-এর বিরাট উপকার করেছিলেন। হযরত মুগীরার পক্ষ থেকে উরওয়া তেরজন নিহতের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দেন।

আলাপ-আলোচনার পর উরওয়া কুরাইশদের নিকট ফিরে আসেন। তিনি তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলেন, “হে কুরাইশ বন্ধুগণ! আমি কিসরা, কায়সার ও নাজ্জাশীর মত সম্রাটদের দরবার দেখেছি। কিন্তু আমি কোন লোককে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর মতো এত সম্মানিত দেখতে পাইনি। তাঁর ওযুতে ব্যবহৃত এক ফোঁটা পানিও তাঁর সাথীরা মাটিতে পড়তে দেয় না। তাঁর একটি চুলও মাটিতে পড়ে গেলে তারা তা উঠিয়ে নেয়। যে কোন মূল্যে অন্যকে তা দেয়া সহ্য করে না। আমার দৃঢ় আস্থা জন্মেছে যে, তারা কখনো তাঁকে ছেড়ে যাবে না। আমার পরামর্শ হলো, আপনারা নিজেদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করুন।”

রাসূল (সা)-এর দূতের সাথে দুর্ব্যবহার

কুরাইশ প্রতিনিধিদের ব্যর্থতার দরুন মহানবী (সা) ভাবলেন, তারা বোধ হয় কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে সত্যিকার অবস্থা বলে না। এদিক বিবেচনা করে তিনি নিজের পক্ষ থেকে একজন দূত কুরাইশদের নিকট পাঠালেন। খারাম ইবনে উমাইয়া আল খোযাই নামক মহানবী (সা)-এর দূতকে কুরাইশরা দেখামাত্র তার উটটি মেরে ফেলল। শুধু তাই নয়, তারা তাঁকে বন্দী করে ফেলল। অবশেষে আহাবীশদের হস্তক্ষেপে তাঁর জীবন রক্ষা পায়। মক্কাবাসীদের এই আচরণের মাধ্যমে মুসলমানদের প্রতি তাদের চরম হিংসা-বিদ্বেষ বেরিয়ে পড়ে। তাদের এই আচরণ দেখে কোন কোন মুসলমান যুদ্ধের কথা চিন্তা করা শুরু করে।

মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা চলাকালে কোন কোন অদূরদর্শী কুরাইশ রাতে এসে মুসলিম শিবিরে পাথরের টিল ছুঁড়ত। এক রাতে ৪০/৫০ জনের একটি কুরাইশ যুবক দল এসে প্রথমে পাথর বর্ষণ করে। এরপর তারা একেবারে আক্রমণ করে বসে। মুসলমানরা আক্রমণকারীদের সবাইকে থেফতার করে মহানবী (সা)-এর সামনে এনে হাযির করেন। মহানবী (সা) কুরাইশদের সাথে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তা'ছাড়া সময়টা ছিল যিলকদ মাস। এ মাসে রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল। আর হোদায়বিয়া ছিল পবিত্র কা'বার উপকণ্ঠে। এসব দিক বিবেচনা করে মহানবী (সা) কুরাইশ বন্দীদের মুক্ত করে দেন। মহানবী (সা)-এর এই মহানুভবতায় কুরাইশরা অত্যন্ত লজ্জিত হয়। এই ঘটনার পর কুরাইশদের বিশ্বাস হয় যে, সত্যি মহানবী (সা) যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসেননি। তারা আরো অনুভব করে, এরপরও যদি মুসলমানদের উপর বাড়াবাড়ি করা হয়, তাহলে অন্য আরবরা তাদেরই

দোষারোপ করবে। তারা বিশ্বাস করবে, কুরাইশদের সাথে মহানবী (সা)-এর যে কোন ধরনের ব্যবহার করার ন্যায়ত অধিকার রয়েছে।

দূত হিসাবে হযরত ওসমান (রা)

মহানবী (সা) কুরাইশদের আর একবার সুযোগ দেয়ার জন্য অপর একজন দূত পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তিনি হযরত ওমর (রা)-কে বলেন। হযরত ওমর (রা) নিবেদন করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জানেন কুরাইশরা আমার প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। আমিও তাদের জন্য উপযোগী নই। তা’ছাড়া মক্কায় আমার গোত্র বনী আদীর কেউ নেই। আপনি যদি ওসমান ইবনে আফ্ফানকে পাঠান, তা’হলে সব দিক থেকে ভাল হবে। মক্কাবাসীরাও তাঁকে বেশ সম্মান করে।”

এরপর মহানবী (সা) তাঁর জামাতা হযরত ওসমান (রা)-কে ডেকে আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতার সাথে আলোচনার জন্য মক্কায় পাঠিয়ে দেন। সবার আগে প্রতিপক্ষের আবান ইবনে সঈদের সাথে হযরত ওসমানের দেখা হয়। আবান নিজ থেকে মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ের জন্য হযরত ওসমানের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত ওসমান (রা) কুরাইশদের নিকট মহানবী (সা)-এর বক্তব্য পেশ করেন। তারা বলল, “হে ওসমান! আপনি ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারেন।” হযরত ওসমান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তা করতে পারি না। হে কুরাইশ! আমরা শুধু আল্লাহর ঘর যিয়ারত ও তওয়াফ করার জন্যই এসেছি। এই ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের ধর্মের বিধান। আমরা শুধু ওমরা পালন করব। কোরবানীর পশু আমাদের সাথেই রয়েছে। এই অনুষ্ঠান পালনের পর আমরা ফিরে যাব।”

কুরাইশরা বলল, “আমরা শপথ করেছি এ বছর (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে মক্কায় প্রবেশ করতে দেব না।” আলোচনা দীর্ঘায়িত হলো। তাতে হযরত ওসমান (রা)-কে অনেকক্ষণ অবস্থান করতে হলো। তাঁর ফেরার বিলম্বের দরুন মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, হযরত ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে। সম্ভবত এ সময়ে কুরাইশরা হযরত ওসমানের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা সমাধান বের করার চেষ্টা করছিলেন, যাতে মুসলমানরাও তাদের ধর্মীয় বিধান পালন করতে পারে এবং কুরাইশদের শপথও যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। মহানবী (সা) ও কুরাইশদের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নত করার জন্যও সম্ভবত এ সময়ে তারা চেষ্টা করছিলেন।

বায়আতে রেদওয়ান

হযরত ওসমানের শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর মুসলমানরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাঁরা বিস্মিত হন যে, মক্কাবাসী আরবের রীতি লংঘন করে সম্মানিত মাসেও রক্তপাত করতে দ্বিধা করল না। প্রতিটি মুসলমান হযরত ওসমানের হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহায় নিজ নিজ তরবারি হাতে নেয়ার জন্য উদ্যত হন। কুরাইশদের এই অমানবিক কাণ্ডে মহানবী (সা)-ও বিস্মিত হন। তিনি হতবাক হন যে, শেষ পর্যন্ত কুরাইশরা সম্মানিত মাসে ওসমানকে হত্যা করল। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, “ওসমান হত্যার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত আমরা এখান

থেকে একপাও পিছনে হটব না।” তিনি একটি গাছের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। মুসলমানদের জিহাদের বায়আত বা শপথ নেয়ার আহবান জানান। প্রতিটি মুসলমান শপথ করেন, তারা পশ্চাদপসরণের চেয়ে মৃত্যুকেই অগ্রাধিকার দান করবেন। শপথ গ্রহণের পর প্রতিটি মুসলমান দৃঢ় প্রত্যয় ও অভূতপূর্ব মনোবলের পরিচয় প্রদান করেন। সবার মুখে একই বাক্য ছিল, “যারা সম্মানিত মাসে দূতকে হত্যা করেছে, আমরা সেসব বিশ্বাসঘাতকের উপর প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হবো না।” পবিত্র কোরআনের ভাষায় মুসলমানদের মনোবলের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔

“বৃক্ষতলে মু’মিনরা যখন তোমার নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত আছেন। তাদের তিনি প্রশান্তি দান করলেন এবং তাদের জন্য স্থির করলেন আসন্ন বিজয়।” (৪৮ : ১৮)

সকল মুসলমানের শপথ গ্রহণ শেষে মহানবী (সা) তাঁর নিজের এক হাত অপর হাতের উপর রেখে বললেন, এ হাত হচ্ছে ওসমানের। এভাবে তিনি তাঁর দ্বিতীয় দূত হযরত ওসমান (রা)-এর পক্ষ থেকেও শপথ গ্রহণ সম্পন্ন করলেন। শপথ অনুষ্ঠানের পর মুসলমানরা প্রত্যেকে কোষ থেকে নিজ নিজ তরবারি বের করে নিলেন। কুরাইশদের সাথে সংঘর্ষের ব্যাপারে এখন তাদের কোন প্রকার সন্দেহ রইল না। এমনকি কিছুক্ষণ পর হয় তারা বিজয় লাভ করবেন, নতুবা শাহাদাতবরণ করবেন, এ সম্পর্কেও তাঁরা সংশয়মুক্ত হলেন। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল হযরত ওসমান (রা) জীবিত আছেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি নিজেও ফিরে আসলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ‘বায়আতে রেদওয়ান’ বায়আতে আকাবার মত ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে চিত্রিত হয়ে আসছে। বায়আতে রেদওয়ানের আলোচনা উঠলে মহানবী (সা)-এর পবিত্র চেহারায় খুশির আমেজ ফুটে উঠত। যখনই তিনি এ সম্পর্কে কল্পনা করতেন সাহাবীদের জীবন উৎসর্গের চিত্র তাঁর পবিত্র অন্তরে ভেসে উঠত। বস্তুত যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করে না, মৃত্যু তাঁর নাম নিলে কেঁপে ওঠে। সফলতা তাঁদের জন্যই অপেক্ষা করতে থাকে।

কুরাইশদের বার্তা

হযরত ওসমান (রা) ফেরার পর মহানবী (সা)-এর নিকট কুরাইশদের বার্তা পৌছান প্রসঙ্গে বললেন, “এখন তারা বুঝতে পেরেছে যে, আপনি ও আপনার অনুসারীরা ওমরা পালন করার জন্যই এসেছেন। তাঁরা একথা স্বীকারও করেছেন যে, নিষিদ্ধ বা পবিত্র মাসে হজ্জ ও ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগন্তুকদের বিরত রাখার তাদের কোন অধিকার নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা খালিদ ইবনে ওয়ালীদদের নেতৃত্বে সৈন্য পাঠিয়ে আপনার সাথে যুদ্ধ করা এবং আপনাকে মক্কায় প্রবেশ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। তাদের ও মুসলমানদের মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষও হয়েছে। এত কিছু হওয়ার পরও যদি আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে

দেয়া হয়, তা'হলে অন্যান্য আরব গোত্র বলবে, কুরাইশরা আপনার কাছে হার মেনেছে। তাতে করে আরবদের নিকট কুরাইশদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা সবই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। নিজেদের মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য এবার তারা আপনাকে ও আপনার অনুসারীদের ওমরা পালন করতে না দেয়ার জিদ ধরেছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এখন উভয় পক্ষকেই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। নতুবা যুদ্ধ ছাড়া সমস্যার সমাধান হবে না। তারাও অগত্যা যুদ্ধের পথই বেছে নেবে।” বস্তুত তারা নিজেরাও এই পবিত্র মাসে যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল না। কারণ একদিকে তারা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ মাসগুলোর পবিত্রতা কলুষমুক্ত রাখার পক্ষপাতী ছিল, অপরদিকে তারা মনে করছিল, এখন যদি নিষিদ্ধ মাসগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করা হয় এবং তাতে সংঘর্ষ ও রক্তপাত ঘটানো হয়, তা'হলে আগামীতে এসব মাসে আরবের কোন লোক মক্কার বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে ব্যবসা করতে আসবে না। তাতে করে মক্কার অধিবাসীদের একমাত্র জীবনোপায় এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

উভয় পক্ষের আলোচনা অব্যাহত

উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা অব্যাহত থাকে। এবারে কুরাইশরা সোহায়েল ইবনে আমরকে দূত হিসাবে পাঠিয়ে দেয়। তাকে সাবধান করে দেয়া হয়, মুসলমানদের পক্ষ থেকে এবার ওমরা পালনের শর্ত যেন গ্রহণ করা না হয়। নতুবা দেশে আমাদের মুখ খাটো হয়ে যাবে। সন্ধির শর্তগুলো দীর্ঘায়িত হওয়ায় একাধিকবার আলোচনা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু উভয় পক্ষই একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পরও আবার সচল হয়ে ওঠে। বৈঠকে উপস্থিত মুসলমানরা কুরাইশ প্রতিনিধি সোহায়েল ইবনে আমরের দেয়া শর্তগুলো মেনে নিতে পারছিল না। মহানবী (সা) এ ধরনের শর্ত মেনে নিলে মুসলমানরা মনোক্ষুণ্ণ হয়ে পড়তেন। আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান ও অগাধ আস্থা না থাকলে মুসলমানরা এ ধরনের একতরফা শর্ত কিছুতেই মেনে নিতেন না। ভাগ্যে যাই থাক তারা ওমরা পালনের জন্য এগিয়ে যেতেন। সোহায়েল ইবনে আমরের একতরফা শর্তগুলোর ব্যাপারে হযরত ওমর (রা)-এর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট এসে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন :

- হযরত ওমর : মহানবী (সা) কি আল্লাহ তা'আলার রাসূল নন ?
 হযরত আবু বকর : নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল।
 হযরত ওমর : আমাদের মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ আছে ?
 হযরত আবু বকর : মোটেও নয়।
 হযরত ওমর : এসব শর্তে কি ইসলামকে খাটো করা হয়নি ?
 হযরত আবু বকর : ধৈর্য ধারণ করুন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল।
 হযরত ওমর : আমি বিশ্বাস করি, মহানবী (সা) আল্লাহর রাসূল।

এই আলোচনার পর হযরত ওমর (রা) মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথেও তিনি অনুরূপ আলাপ করেন। তিনি মহানবী (সা)-এর ধৈর্য ও

দৃঢ়তা পুরোপুরি দেখতে পান। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রা)-এর সাথে মহানবী (সা)-এর শেষ বাক্য ছিল : “আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি তাঁর নির্দেশ লংঘন করব না। আমি আশা করি তিনিও আমাকে নিরাপদ রাখবেন।”

সন্ধির ধারা

সন্ধিচুক্তির খসড়া তৈরির সময়ও মহানবী (সা) সীমাহীন ধৈর্যের পরিচয় দেন। তাতে কোন কোন সাহাবীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তাঁরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে কুরাইশ প্রতিনিধির বারবার আপত্তি ও সংশোধনী আনায় কোন কোন মুসলমান অত্যন্ত দ্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। হযরত আলী (রা)-কে খসড়া তৈরির নির্দেশ প্রদান করে মহানবী (সা) বলেন, “লেখ ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’। কুরাইশ প্রতিনিধি বললেন, “থামুন, আমরা ‘রাহমান’ ও ‘রাহীম’-এর সমর্থক নই। তার পরিবর্তে লেখা হোক ‘বিইস্মিকা আল্লাহুমা।” মহানবী (সা) হযরত আলী (রা)-কে বললেন, ‘তাই লেখ।’ এরপর নবী করীম (সা) হযরত আলীকে বললেন, লেখ, “এসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ও সোহায়েল ইবনে আমরের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হলো।” সোহায়েল প্রতিবাদ করে বললেন, “আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল স্বীকার করে নিলে আপনার ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহই হতো না। আপনি নিজ নাম ও পিতার নাম লেখার কথা বলুন।” মহানবী (সা) সোহায়েলের এই সংশোধনীও মেনে নিলেন। তিনি হযরত আলীকে বললেন, “লেখ, এই সন্ধিচুক্তি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও সোহায়েল ইবনে আমরের মধ্যে সম্পাদিত হলো।” এই চুক্তির শর্তগুলো হলো :

১. উভয় পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে দশ বছর পর্যন্ত কোন যুদ্ধ করবে না।
২. মক্কায় কুরাইশদের যেসব লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাদের অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া মদীনায় চলে যাবে (হযরত) মুহাম্মদ (সা) তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।
৩. কোন মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় চলে এলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।
৪. অন্যান্য আরব উভয় পক্ষের কারো সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করতে চাইলে অন্য পক্ষ তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।
৫. এবার তাওয়াফ ও যিয়ারত ছাড়াই মুসলমানদের মদীনায় ফিরে যেতে হবে।
৬. আগামী বছর মুসলমানরা বিশেষ শর্তাধীনে মক্কায় আসতে পারেন। আর তা হলো সঙ্গে শুধু কোষবদ্ধ তরবারি রাখতে পারবেন। তিন দিনের বেশি সময় মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন না।

মহানবী (সা)-এর সন্ধি প্রস্তাব অনুসরণ

সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পরপরই হোদায়বিয়ায় বনী খোযাআ গোত্র মহানবী (সা)-এর সাথে এবং বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে।

ইতিমধ্যে কুরাইশ প্রতিনিধি সোহায়েল ইবনে আমরের পুত্র আবু জান্দাল মহানবী (সা)-এর দরবারে এসে উপস্থিত হন। তাঁর পায়ে তখন শৃংখল ছিল। ইসলাম গ্রহণের ‘অপরাধে’ তাঁকে

১. কিন্তু ওয়াকিদী বলেছেন, দুই বছরের জন্য যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। ওয়াকিদী ছাড়া আর সব ঐতিহাসিকের অভিমত হলো দশ বছর। -অনুবাদক

কুরাইশরা বন্দী করে রেখেছিল। এক সুযোগে তিনি বন্দীদশা থেকে পালিয়ে আসেন। সোহায়েল ছেলেকে দেখা মাত্র তাকে চপেটাঘাত করে। হযরত আবু জান্দাল (রা) চিৎকার শুরু করেন। তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, “হে মুসলিম ভাইগণ! কাফেররা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে হয় আমাদের ধর্মচ্যুত করবে, নতুবা হত্যা করে ফেলবে।” হযরত আবু জান্দালকে এরূপ অবস্থায় দেখে মুসলমানদের ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়। মহানবী (সা) হযরত আবু জান্দালকে বললেন, “হে আবু জান্দাল! আল্লাহ তা‘আলার নিকট তোমার বিপদের প্রতিদান প্রার্থনা করো। তিনি তোমার সাথে মক্কার অন্যান্য বন্দীর মুক্তির পথ করে দিবেন। কুরাইশদের সাথে আমাদের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। আমরা উভয় পক্ষ আল্লাহ তা‘আলার নামে তাতে স্বাক্ষর করেছি। এখন আমি তা লংঘন করতে পারি না।” মহানবী (সা)-এর চুক্তি অনুসরণের প্রেক্ষিতে অবশেষে হযরত আবু জান্দাল (রা) কুরাইশদের নিকট ফিরে যেতে বাধ্য হন।

হযরত আবু জান্দাল (রা)-এর মক্কায় প্রত্যাবর্তনের ফলে মুসলমানদের মনে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারা কিছুতেই এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য বিস্মৃত হতে পারছিলেন না। মহানবী (সা)-এর মধ্যেও এর প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি উঠে নামায আদায় করেন। তাতে মনে অনেকটা প্রশান্তি আসে। অতঃপর কোরবানী করেন, এরপর ওমরা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে পবিত্র শির মুগুন করেন। তাতে তিনি আরো আত্মিক প্রশান্তি লাভ করেন। মহানবী (সা)-কে প্রফুল্লচিত্ত দেখতে পেয়ে সাহাবারাও নিজ নিজ কোরবানী করেন। কেউ কেউ মাথা মুড়ান। আবার কোন কোন সাহাবী চুল ছাঁটেন। সাহাবীদের মহানবী (সা)-কে এ ব্যাপারে অনুসরণ করতে দেখে তিনি খুশি হয়ে বলেন, “যারা শির মুড়িয়েছে, তাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার রহমত বর্ষিত হোক।” সাহাবারা নিবেদন করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! হজ্জ ও ওমরা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে যারা মাথার চুল ছেঁটেছে, তারা কি গুনাহ্গার হবে?” মহানবী (সা) বললেন, “তাদের উপরও আল্লাহ তা‘আলার রহমত বর্ষিত হোক।” সাহাবীরা একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেন। মহানবী (সা) একই জবাব পুনরায় উল্লেখ করেন। অতঃপর তাঁরা বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো প্রথমে যারা শির মুড়িয়েছে তাদের উপর রহমত বর্ষণের দোয়া করেছিলেন।” মহানবী (সা) বললেন, “তাদের এ জন্য অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে যে, তারা আমার সামনে কোন প্রকার অভিযোগ প্রকাশ করেনি।”

এখন মুসলমানদের জন্য মদীনায রওয়ানা দেয়া এবং হজ্জ ও কা‘বাঘর যিয়ারতের ব্যাপারটি আগামী বছরের জন্য মূলতবি রাখা ছাড়া বিকল্প কোন পথ ছিল না। অধিকাংশ সাহাবা এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ণ ছিলেন। তাঁরা এই ব্যর্থতা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলেন না। কিছু করার উপায় ছিল না। কারণ এটা ছিল মহানবী (সা)-এর নির্দেশ। মহানবী (সা)-এর নির্দেশ পালনের জন্যই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়েছিল। নতুবা শত্রুর সাথে মোকাবেলা না করে ফিরে যাওয়া ছিল তাঁদের স্বভাব-বিরুদ্ধ পদক্ষেপ। আর পরাজয় কি বস্তু, তাঁরা তা জানতেন না। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, “আল্লাহ যাদের সহায়, তাদের পক্ষে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর ধর্মের জন্য কামিয়াবী অর্জন করায় কোন সন্দেহ নেই।” মহানবী (সা) যদি তাঁদের অনুমতি দান করতেন, তাহলে তাঁরা উক্ত বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে মক্কায প্রবেশ করে দেখিয়ে দিতেন।

মুসলমানরা কোরবানী সম্পন্ন করা এবং ইহ্রাম খোলার পরও কয়েক দিন (তিন সপ্তাহ) হোদায়বিয়ায় অবস্থান করেন। এই সময়ে কোন কোন সাহাবা একে অপরের নিকট সন্ধিচুক্তির তাৎপর্য জানতে চাইতেন। আবার কেউ কেউ চুক্তির তাৎপর্য সম্পর্কে আপত্তিও উত্থাপন করতেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধি স্পষ্ট বিজয়

অবশেষে মুসলমানরা মদীনার উদ্দেশে হোদায়বিয়া ত্যাগ করেন। কাফেলা মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি পথে এসে পৌঁছায়। এ সময় মহানবী (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হয়। এই ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হোদায়বিয়ার সন্ধিকে 'স্পষ্ট বিজয়' বলে অভিহিত করেন। এজন্য পবিত্র কোরআনের উক্ত সূরার নামই 'ফাতাহ' বা বিজয় রাখা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে :

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا . لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ
وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا .

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার জন্য স্পষ্ট বিজয় অবধারিত করেছেন। এটা এজন্য যে, তিনি তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিগুলো মার্জনা করবেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন।” (৪৮ : ১-২)

বস্তুত হোদায়বিয়ার সন্ধি ইসলাম ও মুসলমানদের স্পষ্ট বিজয়ই ছিল। পরিস্থিতি ও সময়ের বিবর্তন প্রমাণ করেছে, এই চুক্তি ছিল রাজনৈতিক কৌশল ও দূরদর্শিতা ভিত্তিক। এই চুক্তি ইসলাম ও আরবদের ভবিষ্যত জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। এত দিন কুরাইশরা মহানবী (সা)-কে একজন বিদ্রোহীর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিত না। কিন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তারা মহানবী (সা)-কে তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল।” বলা চলে হোদায়বিয়ায় তাদের নিকট ইসলাম একটি নতুন আবির্ভূত শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করল। তা'ছাড়া সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুসলমানদের যিয়ারত, তাওয়াফ ও হজ্জব্রত পালনের অধিকার স্বীকার করে নেয়ার অর্থ এই ছিল যে, মক্কাবাসীদের নিকট ইসলাম ও আরবের অন্যান্য ধর্মের সমমর্যাদা লাভ করেছে। সন্ধির একটি শর্ত মোতাবেক দশ বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে 'যুদ্ধ নয়' প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তাতে দক্ষিণ দিক বা মক্কার শত্রুদের আক্রমণ আকাঙ্ক্ষা থেকে মুসলমানরা মুক্ত হলেন। এসব কারণে হোদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের জীবনে কিছুটা স্বস্তি লাভের সুযোগ হয়। এই সুযোগকে তাঁরা ইসলামের প্রচার-প্রসার কাজে সদ্যবহার করেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধির একটি ধারা হলো, 'মক্কার কোন লোক মুসলমান হওয়ার পর তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মদীনায় চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। অপরদিকে কোন মুসলমান ধর্মচ্যুত হয়ে মক্কায় চলে এলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।” এই পরস্পর বিরোধী বা অসম ধারা সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর অভিমত ছিল, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় চলে যাবে, তাকে ফিরিয়ে এনে মুসলমানদের মধ্যে রাখার কোন অর্থ নেই।

কিন্তু মক্কাবাসীর মধ্য থেকে যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মদীনায়ে চলে আসবেন, তাঁকে ফিরিয়ে দেয়ার পর মহানবী (সা)-এর অভিমত ছিল এরূপ লোকের মুক্তির পথ আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করে দেবেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির কিছুদিন পরই মহানবী (সা)-এর উক্ত অভিমতের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। তাতে সাহাবীরা অত্যন্ত বিস্মিত হন। পরবর্তীকালের পরিস্থিতি ও ঘটনাবলিতে প্রমাণিত হয় যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলীর মাধ্যমে ইসলামের খুবই কল্যাণ সাধিত হয়। ইসলামের প্রচার-প্রসারের সম্ভাবনা প্রবলতর হয়। মুসলমানরা বেশ শক্তি অর্জন করেন। এই চুক্তি সম্পাদনের মাত্র দুই বছর পরই মহানবী (সা) আশেপাশের রাজ্যের সম্রাট ও জায়গীরদার-জমিদারদের নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখেন।

আবু বাসীরের ঘটনা

আবু বাসীর নামের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর মক্কা থেকে মদীনায়ে চলে আসেন। তিনি তাঁর অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই মক্কা ত্যাগ করেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী অভিভাবকের চাওয়া মাত্র তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আজহার ইবনে আওফ ও আখনাস ইবনে শোরায়েক হযরত আবু বাসীর (রা)-কে মক্কায়ে ফেরত পাঠানোর জন্য মহানবী (সা)-এর নিকট খবর পাঠায়। তারা বনী আমের গোত্রের এক ব্যক্তিকে এজন্য মদীনা পাঠায়। তার সাথে একজন ক্রীতদাসও পাঠানো হয়। মহানবী (সা) হযরত আবু বাসীর (রা)-কে ডেকে বলেন, “আমরা মক্কাবাসীদের সাথে যে চুক্তি করেছি, তুমি তা জান। আমাদের ধর্মে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার অবকাশ নেই। তুমি মক্কায়ে ফিরে যাও।” হযরত আবু বোমায়ের (রা) নিবেদন করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে মুশরিকদের নিকট হস্তান্তর করতে চাচ্ছেন। তারা তো আমাকে ধর্মচ্যুত করে ফেলবে।” কিন্তু মহানবী (সা) বার বার হযরত আবু বোমায়ের (রা)-এর মক্কায়ে ফিরে যাওয়ার উপদেশ দিতে থাকেন। অবশেষে তিনি মক্কা থেকে আসা দুই ব্যক্তির সাথে রওয়ানা দেন। জুলহোলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে হযরত আবু বোমায়ের (রা) আমেরীকে তার তরবারিটি দেখার জন্য দেয়ার অনুরোধ করেন। তরবারিটি হাতে নিয়েই তিনি আমেরীকে দ্রুত এবং সজোরে আঘাত করেন। তাতে তার শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। নিহতের সাথী ক্রীতদাসটি এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে দৌড়ে মদীনায়ে এসে উপস্থিত হয়। মহানবী (সা) তাকে দৌড়ে আসতে দেখে বলেন, “মনে হয় লোকটি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত।” মহানবী (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। সে বলে, “আপনার সাথীই আমার সাথীকে হত্যা করেছে।” ইতিমধ্যে হযরত আবু বোমায়েরও সেখানে এসে উপস্থিত হন। তাঁর হাতে তখন রক্তমাখা তরবারি ছিল। তাঁকে কোন প্রকার প্রশ্ন না করতাই তিনি নিবেদন করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে শত্রুদের হাতে হস্তান্তর করে আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। কিন্তু এর পরবর্তী ঘটনা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়া আমি পছন্দ করিনি। এমনকি মক্কায়ে গিয়ে নিজেকে কাফেরদের তামাশার বস্তুতে পরিণত করাও আমার নিকট পছন্দনীয় নয়।”

হযরত আবু বাসীরের অন্তরে মহানবী (সা)-এর প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল তা তিনি লুপ্তায়িত রাখতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ (সা) তার ব্যবহার দেখে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সাথে যদি এ

ধরনের আরো কিছু লোক যোগদান করে তাহলে তারা কুরাইশদের সাথে অবশ্যই সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। এরপরই হযরত আবু বাসীর (রা) মহানবী (সা)-এর সামনে থেকে সরে পড়েন। শুধু তাই নয়, তিনি মদীনা থেকেই বেরিয়ে যান। তিনি ঈস নামক স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। এই স্থানটি লোহিত সাগর উপকূলে সিরিয়া যাওয়ার পথে অবস্থিত। হোদায়বিয়ার সন্ধিতে উভয় পক্ষের কেউ এই পথে যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলাগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি।

হযরত আবু বাসীরের বসবাস করার খবর মক্কার অবরুদ্ধ মুসলমানরাও শুনতে পান। তাঁরা ধরে নেন, হযরত আবু বাসীরের এই পদক্ষেপ নিশ্চয়ই মহানবী (সা)-এর অনুমোদন লাভ করেছে। তাঁদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুযোগ পেয়েছেন নযরবন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে হযরত আবু বাসীরের নিকট এসে গেছেন। এভাবে তাঁদের সংখ্যা সত্তরজনে পৌঁছায়। তাঁরা হযরত আবু বাসীরের নেতৃত্বে এ পথে যাতায়াতকারী কুরাইশদের অবরোধ শুরু করেন। তাঁরা কুরাইশদের যাদের দেখা পান সুযোগ পাওয়ামাত্র তাদের হত্যা করেন। এ ছাড়া কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা লুটতরাজ আরম্ভ করেন। এরূপ অবস্থা দেখে কুরাইশরা বুঝতে পারে যে, মক্কায় মুসলমানদের রাখা তাদের নিজেদের জন্যও ক্ষতিকর। তাদের নিকট এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায়, ন্যায় ও সত্যের শক্তিতে বলীয়ান লোককে বন্দী করে রেখে কোন ফায়দা হয় না। একদিন না একদিন তার মুক্তির পথ হয়ে যায়। অতঃপর সে যারা বন্দী করে রেখেছিল, উল্টো তাদের বিপদে ফেলে। তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

এ সময়ে কুরাইশদের সামনে তাদের অতীত কার্যকলাপের চিত্র ভেসে ওঠে। তাদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী (সা) মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি মদীনায় পৌঁছে কুরাইশদের সিরিয়ার বাণিজ্য-পথ বন্ধ করে দেন। কুরাইশরা শংকিত হয়ে পড়েন যে, হযরত আবু বাসীর (রা) সে অবস্থার পুনরাবৃত্তি করবেন। এই ভেবে তারা মহানবী (সা)-এর নিকট দূত পাঠান। তারা মহানবী (সা)-এর সাথে তাদের রক্তসম্পর্কের উল্লেখ করে অনুরোধ করেন, “আপনি আমাদের সিরিয়ার বাণিজ্য-পথ নিরাপদ করার স্বার্থে মক্কা থেকে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের মদীনায় আশ্রয় দিতে পারেন। তাতে করে হোদায়বিয়ায় কুরাইশ প্রতিনিধি সোহায়েল ইবনে আমের পীড়াপীড়ি করে যে অসম শর্তটি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করেছিল, এখন কুরাইশরা নিজেরাই তা উঠিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করল। আর সে শর্তটি ছিল, “যে ব্যক্তি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মদীনায় মহানবী (সা)-এর নিকট পালিয়ে যাবে, তাকে কুরাইশদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কোন মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় চলে এলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না।” এদিকে মুসলমানদের মধ্যে হযরত ওমর (রা) চুক্তির এই ধারাটিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছিলেন। এবার হযরত ওমরও এর পরিণতি দেখতে পেলেন। কুরাইশদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা) এ ব্যাপারে হযরত আবু বাসীরকে মদীনায় ফিরে আসার আশ্রয় প্রকাশ করেন। হযরত আবু বাসীর (রা) দেখলেন, এখন আর তাঁদের মক্কায় ফিরে যেতে বাধ্য করা হবে না। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তিনি ঈসা থেকে শিবির উঠিয়ে সবাইকে নিয়ে মদীনায় চলে আসেন। তাতে করে কুরাইশদের সিরিয়ার বাণিজ্য-পথ নিরাপদ হয়ে যায়।

মুসলিম মুহাজির মহিলাদের ব্যাপার

যে সব মুসলিম মুহাজির মহিলা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায়ে চলে আসতেন, তাঁদের ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর ভিন্নমত ছিল। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর উকবা ইবনে আবু মুঈত্তের কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রা) মক্কার নজরবন্দী অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করে মদীনায়ে চলে আসেন। তাঁর ভাই আশ্মারা ও ওয়ালীদ হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাঁকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য মদীনায়ে মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। নবী করীম (সা) হযরত উম্মে কুলসুম (রা)-কে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। মহানবী (সা) বলেন, “চুক্তির উক্ত ধারায় পুরুষদের ফিরিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ধারা কার্যকর হতে পারে না। যে কোন মহিলা আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করবে, তার নিরাপত্তা বিধান করা আমাদের কর্তব্য বলে বিবেচিত।” তাছাড়া কোন মহিলা মুসলমান হওয়ার পর মুশরিক স্বামীর বিবাহ বন্ধনে থাকতে পারে না। তাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে পড়ে। এসব কারণে হযরত উম্মে কুলসুমকে ফিরিয়ে না দেয়ার ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর ভূমিকা ছিল যথার্থ। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِّرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ - اللَّهُ
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ
حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ - وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا - وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
تَنْكِحُوا هُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا
مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ سَأَلُوا مَا أَنْفَقُوا - ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ.

“হে মু’মিনগণ! তোমাদের নিকট মু’মিনা নারীরা দেশত্যাগী হয়ে এলে তাদের পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু’মিনা, তবে তাদের কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠিও না। মু’মিনা নারীগণ কাফেরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফেরগণ মু’মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তাদের তা ফিরিয়ে দাও। অতঃপর তোমরা তাদের বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না--যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দাও। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছে, তা ফেরত চাইবে এবং কাফেররা যা ব্যয় করেছে তারা তা ফেরত চাইবে। এটাই আল্লাহর বিধান। তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (৬০ : ১০)

মহানবী (সা)-এর কর্মধারা

হোদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী অবস্থা ও ঘটনাবলি মহানবী (সা)-এর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক যথার্থতা প্রমাণ করে। আরো প্রমাণিত হয় যে, হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিল ইসলামের

প্রচার ও অগ্রগতির একটি ভিত্তি। কুরাইশ ও মহানবী (সা) একে অপরের দিক থেকে নিরাপদ বোধ করেন। কুরাইশরা তাদের বাণিজ্য সম্প্রসারণে মনোযোগ প্রদান করে। তারা নিজেদের সকল তৎপরতা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিবদ্ধ করে। মুসলমানরা কুরাইশদের সিরিয়ার বাণিজ্য-পথ বন্ধ করে দেয়ার ফলে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সম্ভবত এ সময় তারা সে ক্ষতিপূরণের উদ্যোগ নিয়েছিল। এদিকে মহানবী (সা) এ সময় পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তাঁর রিসালাতের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমানরা যাতে আরবে অন্যদের মতো স্বাধীনভাবে জীবন যাপন ও ধর্ম-কর্ম করতে পারে, তার জন্যও তিনি চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এ ব্যাপারে তিনি দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমত আশেপাশের বাদশাহ ও শাসকদের নিকট দূত পাঠান। তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল, ষড়যন্ত্রকারী ইহুদীদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেয়া।

খায়বরের যুদ্ধ ও বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরণ

মহানবী (সা) ও তাঁর সঙ্গীরা হোদায়বিয়ায় এ কথা স্বীকারই করে নিয়েছিলেন যে, তাঁরা এবারের পরিবর্তে আগামী বছর হজ্জ ও যিয়ারত করতে আসবেন। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তিন সপ্তাহ পর্যন্ত তাঁরা হোদায়বিয়ায় অবস্থান করেন। কিন্তু মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা দেয়ার পর কোন কোন মুসলমান এই চুক্তিকে ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদার পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেন। পশ্চিমদিকেই সূরা ফাতাহ নাযিল হয়। মহানবী (সা) এই সূরা মুসলমানদের পাঠ করে শোনান। হোদায়বিয়ায় অবস্থানকালে এবং সেখান থেকে রওয়ানা দেয়ার পরও দু'টি ব্যাপারে নবী করীম (সা) চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এগুলো হলো, মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, হিরাকুল, কিসরা, মোকাওকেস, নাজ্জাশী, হারেছ গাস্‌সানী ও ইয়ামানে কিসরার গভর্নরের নিকট ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লিখতে হবে। এই সঙ্গে তিনি আরো সিদ্ধান্ত নেন, আরব উপদ্বীপের ইহুদীদের শক্তি নির্মূল করতে হবে।

ইসলামের দাওয়াত

প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে ইসলাম বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার মতো অগ্রগতি লাভ করে। তখন ইসলামের শিক্ষা শুধু তাওহীদ বা একত্ববাদ এবং তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মধ্যে সীমিত ছিল না। বরং তা মানুষের সামাজিক জীবন ও তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ছিল। সে সামাজিক জীবনের অগ্রগতি সাধন করে ব্যক্তি মানুষকে মানবতার পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ফলে পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ইসলামের বিভিন্ন বিধান প্রবর্তিত হচ্ছিল।

শরাবের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

মদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপের সময়কাল সম্পর্কে চরিতবিদ ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে একাধিক অভিমত রয়েছে। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যকের অভিমত হলো হিজরী চতুর্থ সালে মদ হারাম করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে হোদায়বিয়ার সন্ধির বছর অর্থাৎ ষষ্ঠ হিজরীতে শরাবের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারটি মানুষের সামাজিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাওহীদ বা একত্ববাদ চিন্তাধারার সাথে এর সম্পর্ক খুব একটা নেই বললেই চলে। তার একটা বড় প্রমাণ হলো, মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের দীর্ঘ বিশ বছর পর মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই দীর্ঘ সময়কালে সমাজে মদপান প্রচলিত

ছিল। তাছাড়া একবারে হঠাৎ করে মদ হারাম করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে মদ পান সম্পর্কে সতর্কবাণী নাযিল হয়েছে। তাতে মুসলমানরা ধীরে ধীরে মদপান ত্যাগ করেছে। অবশেষে এ সম্পর্কে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা নাযিল হয়েছে। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রা) সম্পর্কে একটি বর্ণনা রয়েছে। শরাব পান সম্পর্কে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করে বলতেন, “হে আল্লাহ! শরাবের ব্যাপারে তুমি স্পষ্ট বিধান নাযিল কর।” এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا -

“(হে রাসূল!) মানুষ তোমাকে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি তাদের বলে দাও, এ দুটোতে অনেক ক্ষতি রয়েছে এবং উপকারও রয়েছে। তবে উপকারের তুলনায় ক্ষতিই তাতে বেশি রয়েছে।” (২ : ২১৯)

কিন্তু এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরও মানুষ মদপান ত্যাগ করেনি। কোন কোন সময় সারারাত মদপানে কাটিয়ে দিত। সারারাত মাতাল অবস্থায় কাটানোর পর ভোরে ফজর নামায আদায় করার সময় অনেকেরই দিশা থাকত না তারা নামাযে কি পড়ছে। হযরত ওমর (রা) পুনরায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করেন, “হে আল্লাহ! আমাদের জন্য শরাবের ব্যাপারে পরিষ্কার বিধান নাযিল করুন। কারণ তাতে আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়। আর্থিক দিক থেকেও তা আমাদের জন্য ক্ষতিকর।” এবার নেশাতুর অবস্থায় নামায পড়া নিষিদ্ধ করা হয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ -

“হে মু'মিনগণ! মদ্যপানোত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হবেও না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার।” (৪ : ৪৩)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী (সা)-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করে দেয়া হলো, কোন লোক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যেন নামায পড়ার জন্য উদ্যত না হয়। বস্তুত পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত দু'টি আয়াত মুসলমানদের বেশ প্রভাবিত করে। তাদের মদ্যপানের অভ্যাস হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য উপরে উল্লিখিত দু'টি আয়াত যথেষ্ট ছিল না। কিছুদিন পর হযরত ওমর (রা) পুনরায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন, “হে প্রতিপালক! মদ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট বিধান নাযিল করুন। কারণ এটা বুদ্ধি ও সম্পদ উভয়েরই চরম শত্রু। মদ্যপানের ব্যাপারে হযরত ওমরের অভিমত যথার্থ ছিল। কারণ সেকালে শুধু অমুসলমানই নয়, মুসলমানরাও মদের নেশায় একে অপরের দাড়ি পাকড়ে ধরত। ঝগড়া, এমন কি সংঘর্ষও বাঁধিয়ে রসত। সে সময় এক ব্যক্তি মদপান করার জন্য অপর কয়েকজনকে দাওয়াত করে। তারা মদপান করে নেশাতুর হয়ে পড়ে। এ সময় উক্ত মদের আসরে মুহাজির ও আনসারদের আলোচনা ওঠে। এক ব্যক্তি মুহাজিরদের সমর্থনে কথা বলে। আনসারদের একজন সমর্থক দস্তরখান থেকে হাড় উঠিয়ে মুহাজিরদের সমর্থকের নাক লক্ষ্য

করে ছুঁড়ে মারে। তাতে লোকটি আহত হয়। তার নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। অপর এক জায়গায় মদ্যপানোন্মত্তরা দু'টি গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে বসে। অথচ এ ঘটনার আগে উভয় গোত্রের মধ্যে হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ .

“হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবু তোমরা নিবৃত্ত হবে না?” (৫ : ৯০-৯১)

যে দিন মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়, ঘটনাচক্রে সে সময় কোন এক আসরে হযরত আনাস (রা) শরাব পানের আয়োজন করছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি মদ হারাম হওয়ার ঘোষণা শুনতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সব মদ মাটিতে ঢেলে দেন। কিন্তু মদ্যপানের এই নিষেধাজ্ঞা কিছুসংখ্যক লোকের নিকট অত্যন্ত কষ্টকর মনে হয়েছে। তারা আপত্তি করে বলেছে, মদ যদি ঘৃণ্য বস্তু হয়ে থাকে, তাহলে বদরে ও উহুদ যুদ্ধে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন তাঁরাও তো মদ পান করেছেন। তাঁদের পরিণাম কি হবে? এই আপত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا
اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا -
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

“যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তারা পূর্বে যা খেয়েছে, তার জন্য তাদের কোন পাপ নেই ; যদি তারা সাবধান হয় এবং বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, পুনরায় সাবধান হয় এবং সৎকাজ করে এবং আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।” (৫ : ৯৩)

ইসলাম তার অনুসারীদের সততা, দয়া, উদারতা ও ভাল কাজ করার আহবান জানায়। আর ইবাদতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তাই। তাতে আত্মিক অগ্রগতি ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। যেমন নামাযে রুকু-সিজদার মাধ্যমে মানুষের দম্ব ও অহংকার দূর করা হয়। এসব কারণেই ইসলাম তার পূর্ববর্তী অন্যান্য ধর্মের তুলনায় অনেক স্বভাবজাত। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের নিকট ইসলামের আবেদন অধিক গ্রহণযোগ্য।

রোম ও ইরান সাম্রাজ্য

সেকালে হিরাক্ল ও কিসরা ছিলেন রোম ও ইরানের শাসনকর্তা। এই দুটি সাম্রাজ্য সমকালীন পৃথিবীতে সবচাইতে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হতো। তৎকালীন বিশ্বে সকল জাতি এই দুটি রাষ্ট্রকে সমীহ করত এবং নিজেদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে মনে করত। বিশেষ করে আশেপাশের রাজ্যগুলোতে এই দুটি রাষ্ট্রের প্রভাব ও রাজনীতি কার্যকর ছিল। আবার এই দুটি রাষ্ট্র একে অপরের শত্রু ছিল। মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের মাত্র কিছুকাল আগে ইরানী ও রোমানদের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ হয়। তাতে রোমানরা পরাজয় বরণ করে। মিসর, সিরিয়া এবং খৃষ্টানদের ধর্মীয় পবিত্র স্থান বায়তুল মুকাদাস ইরানীরা দখল করে বসে। এমনকি বায়তুল মুকাদাস থেকে পবিত্র ত্রুশ ইরানীরা উঠিয়ে নিয়ে যায়। রোমান সম্রাট হিরাক্ল মানত করেন, তিনি যদি ইরানীদের পরাজিত করে পবিত্র ত্রুশ উদ্ধার করতে পারেন, তাহলে তিনি রাজধানী হেমস্ থেকে পদব্রজে বায়তুল মুকাদাসে যাবেন এবং তীর্থস্থান যিয়ারতের পর পবিত্র ত্রুশ আবার পুরানো জায়গায় স্থাপন করবেন।

রোমান সম্রাট হিরাক্ল তাঁর এই ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম হন। ইরান ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে এই শত্রুতা ও সংঘর্ষ কয়েক শতাব্দী থেকে চলে আসছিল। কখনো ইরানীরা আবার কখনো রোমানরা জয়লাভ করত। কিন্তু এই দুটি রাজ্যের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো এবং সেসবের বাসিন্দারা কিসরা ও হিরাকলের ভয়ে সব সময় কম্পমান থাকত। তাদের সাথে মোকাবেলা দূরের কথা, প্রতিটি রাষ্ট্র তাদের দয়া ও সহানুভূতির প্রত্যাশায় থাকত।

ইরান ও রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী অন্যান্য রাষ্ট্রে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা ছিল। তা সত্ত্বেও তারা ইরানী ও রোমানদের প্রভাববলয় মুক্ত হতে পারেনি। বরং সব সময় তাদের অনুগ্রহ প্রত্যাশী হয়ে থাকত। এসব রাষ্ট্রের তুলনায় আরবের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। গোত্রীয় জীবনধারা এক গোত্রকে অপর গোত্র থেকে পৃথক করে রেখেছিল। তাদের মধ্যে জাতীয় সংহতি বলতে কিছুই ছিল না। এ জন্য আরবের বাসিন্দারা অন্যান্য যে কোন রাজ্যের তুলনায় ইরানী ও রোমানদের দয়া ও অনুগ্রহের অধিক মুখাপেক্ষী ছিল। তাছাড়া আরবের বিরাট দুটি এলাকা ইয়ামন ও ইরাক ইরানীদের দখলে ছিল। মিসর ও সিরিয়া ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে হিজাজ তথা আরব উপদ্বীপ ইরানী ও রোমান সাম্রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। অপরদিকে আরবদের জীবন-উপায় সম্পূর্ণরূপে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। আর তাদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল একদিকে ইয়ামন ও অপরদিকে সিরিয়া। আর এই দুটি এলাকাই ইরান ও রোমানদের শাসনাধীন ছিল। ফলে বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার ভয়ে আরবের অধিবাসীদের সব সময়ে ইরানের কিসরা এবং রোমের কায়সারের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হতো। তাদের সালাম করে চলতে হতো। তদুপরি আরবে রাজনৈতিক বিশৃংখলা বিরাজ করছিল। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে কখনো কখনো হয়তো শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করত। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। তাদের মধ্যে এমন কোন শক্তি ছিল না, যা তাদের ঐক্যবদ্ধ করে সমকালীন বৃহৎ শক্তি ইরান ও রোমের সাথে বোঝা-পড়া করার উপযোগী করে তুলতে পারে। একরূপ পরিস্থিতিতে মহানবী (সা) রোম, ইরান, গাস্‌সান, ইয়ামন, মিসর এবং আবিসিনিয়ার শাসকদের নিকট দূত মাধ্যমে পত্র পাঠান। তাদের ইসলাম

গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে মহানবী (সা)-এর এই পদক্ষেপ ছিল সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি তাঁর এই পদক্ষেপের পরিণাম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ভীত ছিলেন না। বাহ্যত আশংকা ছিল মহানবী (সা)-এর এই পদক্ষেপে ইরানী ও রোমানরা আরবদের উপর চটে যাবে। তারা চিরদিনের জন্য আরব উপদ্বীপ দখল করে বসবে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের পরাধীনতায় শৃংখলাবদ্ধ করে ফেলবে।

মহানবী (সা)-এর দূত

সারকথা, এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মহানবী (সা) বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যাপারে এতটুকু দ্বিধা করেননি। একদিন তিনি সাহাবীদের উদ্দেশে বলেন, “হে লোক সকল! আল্লাহ তা‘আলা আমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন। ঈসা ইবনে মরিয়মের শিষ্যদের মতো তোমরা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও মতবিরোধিতা করো না।” সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ব্যাপারে হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে তাঁর শিষ্যদের মতবিরোধিতা হয়েছিল।” মহানবী (সা) বললেন, “আমি তোমাদের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করতে যাচ্ছি, ঈসা ইবনে মরিয়মও অনুরূপ দায়িত্ব তাঁর সহচরদের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। তাদের মধ্যে যেসব লোককে তিনি অদূরে কোথাও হিমইয়ারী উক্ত দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা খুশি মনে তা পালন করেন। কিন্তু যাদের তিনি দূরে কোথাও উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তারা তাতে অসন্তুষ্ট হন এবং তারা তা পালনে অবহেলা করেন।” অতঃপর মহানবী (সা) সাহাবীদের নিকট আসল ব্যাপার প্রকাশ করে বলেন, “আমি হিরাক্ল, কিসরা, মোকাওকেস, ইরাকের শাসক হারেছ গাস্‌সানী, ইয়ামনের শাসক হারেছ হিমইয়ারী ও আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্‌জাশীর নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর তোমাদের আমি এই দায়িত্ব প্রদানের ইচ্ছা করছি।” সাহাবারা সন্তুষ্টচিত্তে এই দায়িত্ব পালনের আশ্রয় প্রকাশ করেন। অতঃপর মহানবী (সা) রূপার একটি আংটি তৈরি করান। আংটির পাথরে ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ খোদাই করা হয়। এরপর তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে চিঠি লেখান এবং তাতে উক্ত আংটির ছাপ মেরে দেন। এসব চিঠি তিনি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে প্রেরণ করেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা এখানে একটি চিঠি উল্লেখ করছি। এটি তিনি রোমের বাদশাহ হিরাকলের নিকট পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটির বিষয়বস্তু ছিল :

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান হিরাকলের নামে।-- যে ব্যক্তি হেদায়েত বা সৎপথ অনুসরণ করে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি তা গ্রহণ করলে শান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ তা‘আলা এর দ্বিগুণ প্রতিদান প্রদান করবেন। আর যদি আপনি অস্বীকার করেন, তাহলে দেশের সকল মানুষের পাপের বোঝাও আপনাকে বহন করতে হবে। “তুমি বল, হে কিতাবীগণ! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন ; আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করি না, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক করি না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া কাউকে প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বল, আমরা মুসলমান, তোমরা সাক্ষী থাক।” (৩ : ৬৪)

মহানবী (সা) নিম্নলিখিত দূতদের তাঁদের নামের পাশে উল্লিখিত রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট প্রেরণ করেন :

১. হযরত দিহুইয়া ইবনে খালীফা কালবী--রোমের সম্রাট হিরাক্ল ।
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা--ইরানের সম্রাট কিসরা (খসরু পারভেয) ।
৩. হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামরী--আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী ।
৪. হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতাআ--মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মোকাওকেস ।
৫. হযরত আমর ইবনে আস সাহ্মী--ওমানের বাদশাহ জায়কর ।
৬. হযরত সালীত ইবনে আমর--ইয়ামামার সরদার হাউজা ইবনে আলী ।
৭. হযরত আলী ইবনে হাযরামী--বাহ্রাইনের শাসক মুনযের ইবনে সাবী ।
৮. হযরত শুজা ইবনে ওয়াহাব আসাদী--গাস্‌সানের শাসক হারেছ গাস্‌সানী ।
৯. হযরত মুহাজির ইবনে উমাইয়া মাখযুমী--ইয়ামনের শাসক হারেছ হিমইয়ারী ।

মহানবী (সা)-এর এসব দূত মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত হলো, তাঁরা সবাই নির্ধারিত গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে একই সময় মদীনা ত্যাগ করেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিকের মতে তাঁরা বিভিন্ন সময় মদীনা ত্যাগ করেন।

ইরান ও বাইজেন্টাইন

সমকালীন রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট মহানবী (সা)-এর দূত ও পত্র প্রেরণ ছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা। তার চাইতেও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এই ঘটনার তিরিশ বছরের মধ্যে এসব দেশ ইসলামের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। এসব দেশের অধিকাংশ বাসিন্দা ইসলাম গ্রহণের গৌরব লাভ করে। কিন্তু আমরা যদি তৎকালীন আরবের প্রতিবেশী বিভিন্ন রাষ্ট্রের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে এই পরিবর্তন বিস্ময়কর মনে হয় না। কারণ সেকালের আরবের প্রতিবেশী দুই বৃহৎ রাষ্ট্র ইরান ও বাইজেন্টাইনের দাবি ছিল, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে কোন দেশ তাদের পিছনে ফেলতে পারেনি। বাস্তব ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই ছিল। সারা বিশ্বে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারিত ছিল। কিন্তু এই দুটি রাজ্য বস্তুবাদী উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সব সময় তৎপর থাকত। আধ্যাত্মিকতার নামগন্ধও তাদের মধ্যে ছিল না। অগ্নিপূজা ও পৌত্তলিকতা ইরানের জাতীয় সংহতিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিল। অপরদিকে রোম বা বাইজেন্টাইনের খৃষ্টানরা ধর্মীয় বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তারা জাতীয় সংহতি খুইয়ে বসেছিল। তাদের ধর্মীয় বুনিয়াদ মজবুত করার মতো সুষ্ঠু কোন মতাদর্শই অবশিষ্ট ছিল না। সে সময় তাদের ধর্ম বাহ্যিক কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে পড়েছিল। আর ধর্মের নামে এসব আচার-অনুষ্ঠানই তাদের দেহমানে জেকে বসেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ইরানের অগ্নিপূজা আর বাইজেন্টাইনের আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব খৃষ্টধর্মের প্রতিপক্ষ হিসাবে আরবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়। এই নতুন ধর্মের প্রবর্তক হযরত

মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্ম প্রচারের ভিত্তি ছিল আত্মিক। এর লক্ষ্য ছিল মানবতার শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধগুলো জাগরিত ও প্রতিষ্ঠিত করা। আর একথা বাস্তব সত্য যে, বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদ এবং ধর্ম ও পার্থিব স্বার্থের সংঘাতে বস্তুবাদকে নিশ্চিত পরাজয়বরণ করতে হয়।

সেকালে ইরান ও রোমান সাম্রাজ্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী শৌর্যবীর্যের অধিকারী ছিল। কিন্তু তারা গবেষণা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী শক্তি হারিয়ে বসেছিল। তাদের নিকট পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া কিছুই ছিল না। তারা প্রতিটি নতুন চিন্তাভাবনাকে বেদআত ও পথভ্রষ্টতা মনে করত। বস্তুত মানব সমাজও ব্যক্তি ও পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর মতো পরিবর্তন-পরিবর্ধনশীল। কোন মানব সমাজ শক্তিশালী থাকা পর্যন্ত নিজের সৃজনী ও উদ্ভাবনী শক্তির উন্নতি সাধন এবং জীবনের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস তৎপরতায় ব্যস্ত থাকে। কিন্তু যখন তাদের সমৃদ্ধির সংগ্রাম কোন পর্যায়ে রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সৃজনী ও উদ্ভাবনী শক্তি হারিয়ে বসে, তখন তাদের জীবনের পুঁজি বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পাওয়া শুরু হয়। ধীরে ধীরে সে সমাজ বা জাতির পতনের কারণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। যে ধনাঢ্য ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে অর্থ বিনিয়োগ না করে শুধু নিজের আরাম-আয়েশে ব্যয় করে নিঃশেষ করে ফেলে, তার সাথে পতনোন্মুখ উন্নত জাতির সাদৃশ্য রয়েছে। উক্ত ব্যবসায়ীর মতো পতনোন্মুখ কোন উন্নত জাতি যদি নিজের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য অধিক চেষ্টা-তদবীর না করে বসে থাকে, তা হলে এটা তার জন্য কয়েক শতাব্দীর সঞ্চিত সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনষ্ট করে ফেলারই নামান্তর। তার এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য একদিন তাকে বঞ্চনা, লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকার হতে হবে। আর যে জাতি এভাবে অপমানের শিকার হয়, তাকে কোন উদীয়মান বহিঃশক্তির অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হতেই হবে। অবশ্য কোন উদীয়মান জাতি যখন কোন পতনশীল জাতিকে আশ্রয় দান করে, তখন এটা আবার তার জন্য অগ্রগতির ক্ষেত্রও প্রস্তুত করে থাকে।

মহানবী (সা)-এর আমলে পতনোন্মুখ জাতিগুলোর মধ্যে ইরান ও বাইজেন্টাইন ছিল সমকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুটি রাষ্ট্র। তাদের এই পতন ঠেকাবার এবং তাদের মধ্যে পুনর্জাগরণ আনার শক্তি চীনের কিংবা ভারতীয় উপমহাদেশের কারোই ছিল না। এই দীনতা মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও ডানা বিস্তার করেছিল। তাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাকারী একমাত্র অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন মহানবী (সা)। তাঁর দাওয়াত বা আহ্বান ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ। ধর্মীয় ভ্রান্ত ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধ অনুকরণে পথভ্রষ্ট এসব জাতিকে একমাত্র মহানবী (সা) সত্য ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শনে সক্ষম ছিলেন। আর তাই মাত্র তিন দশকের মধ্যে এই দুই বৃহৎ শক্তি মুসলমানদের কাছে পরাজয় বরণ করে।

বস্তু ও আত্মার সমন্বয়

ঈমানের এক অনুপম নূর বা আলোয় মহানবী (সা)-এর অন্তর আলোকিত ছিল। এক অতুলনীয় আত্মিক শক্তিতে তিনি ছিলেন বলীয়ান। এই শক্তির মোকাবেলা করার মতো অন্য কোন শক্তিই পৃথিবীতে ছিল না। মহানবী (সা) ঈমানের এই আলো দ্বারা অন্যদেরও আলোকিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি নিজের প্রচারকদের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। তাঁদের নিকট পত্র পাঠান। তিনি তাঁদের এমন এক ধর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান যাতে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও চরমোৎকর্ষ রয়েছে। আর এই

ধর্মের বিধান এসেছে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে। তিনি তাদের এমন এক ধর্মের নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছিলেন, যাতে মন-মস্তিষ্ককে বাতিল ধারণামুক্ত করে বাস্তববাদী করে তোলা যাবে। বস্তুত এই ধর্ম শুধু সামাজিকই নয়, আধ্যাত্মিক জীবনধারণার জন্য বিভিন্ন বিধান ও ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এসব বিধান বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে একটা সমন্বয় সূচিত করেছে। একটা মধ্যপন্থা সৃষ্টি করেছে। এই মধ্যপন্থা সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে মানুষ মানবতার নির্ভেজাল উচ্চাসনে পৌঁছতে সক্ষম হবে। মানব সমাজ বিপ্লব বা পরিবর্তনের সকল স্তর অতিক্রম করে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার জন্য নির্ধারিত চরমোৎকর্ষের স্তরে গিয়ে পৌঁছবে।

ইহুদীদের উৎখাত

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, প্রতিবেশী রাজা-বাদশাহদের নিকট পত্র প্রেরণ করাটা সময় উপযোগী ছিল কিনা। বিশেষ করে তখনো মদীনার উত্তর দিকে ইহুদীদের বসতি ছিল। মহানবী (সা) তাদের দিক থেকে নিশ্চিত ছিলেন না। তারা সব সময় মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার জাল বিস্তার করে চলছিল। অবশ্য একথা সত্য যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রেক্ষিতে মহানবী (সা) কুরাইশদের বাড়াবাড়ি থেকে নিরাপদ ছিলেন। এমনকি দক্ষিণ দিক থেকে কোন প্রকার আক্রমণেরই আশংকা ছিল না। কিন্তু উত্তর দিকে খায়বরের ইহুদীদের তরফ থেকে এই আশংকা পুরোপুরি ছিল। হিরাক্ল কিংবা ইরানের বাদশাহ কিসরা কর্তৃক খায়বরের ইহুদীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার আশংকা ছিল। বিশেষ করে খায়বরের ইহুদীদের ধর্মীয় ভাই বনী কায়নুকা ও বনী নযীরদের মদীনা থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। বনী কোরায়যাদের উপর গণহত্যা চালান হয়েছিল। এসব স্মৃতি খায়বরের ইহুদীদের মনে জেগে ওঠার আশংকা উড়িয়ে দেয়ার ছিল না। তা ছাড়া কুরাইশদের তুলনায় মহানবী (সা)-এর প্রতি ইহুদীরা বেশি শত্রুতা পোষণ করত। একে তো তারা অত্যন্ত ধর্মান্ধ ছিল। দ্বিতীয়ত, জ্ঞান-বুদ্ধির দিক থেকে তারা কুরাইশদের চেয়ে অনেক অগ্রসর ছিল। এরূপ অবস্থায় ইহুদীদের সাথে হোদায়বিয়ার মতো কোন সন্ধি করা সহজ ব্যাপার ছিল না। তাদের দিক থেকে মহানবী (সা) নিশ্চিতও হতে পারছিলেন না। কারণ তারা মুসলমানদের নিকট একাধিকবার পরাজয় বরণ করেছিল। সুতরাং বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাকলের তরফ থেকে কোন প্রকার সাহায্য পেলে ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার পুরোপুরি আশংকা ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে আরব উপদ্বীপে ইহুদীরা যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে, তার জন্য তাদের চিরদিনের জন্য নির্মূল করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। আর মহানবী (সা) ও মুসলমানদের শত্রু বনী গাতফান কিংবা অন্য কোন আরব গোত্র থেকে তারা যাতে কোন প্রকার সাহায্য লাভের সময় না পায়, তার জন্য তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার দরকার ছিল।

খায়বর যুদ্ধের প্রস্তুতি

মহানবী (সা) তাঁর রাসূলসুলভ দূরদর্শিতার প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি হোদায়বিয়া থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের মাত্র পনের দিন, মতান্তরে এক মাস, পর মুসলমানদের খায়বর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। যারা হোদায়বিয়ায়

উপস্থিত ছিলেন মহানবী (সা) তাঁদেরকেই এই যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি প্রদান করেন। এ ছাড়া সাহাবীদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় যেতে আগ্রহী, তাঁদেরও অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু তাঁদের জানিয়ে দেয়া হয় যে, তাঁরা গনীমতের সম্পদের দাবি করতে পারবেন না। খায়বর অভিযানে এক হাজার ছ' শ' মুসলমান অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সওয়ারীর সংখ্যা ছিল মাত্র এক শ'। প্রতিটি মুসলমান আল্লাহ তা'আলার সহানুভূতির প্রতি আশ্রয়ান ছিল। কারণ হোদায়বিয়া থেকে ফেরার পথে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছিলেন। তার মধ্যে একটি আয়াত ছিল :

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ - قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا - بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا .

“তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভের জন্য যাবে, তখন যারা ঘরে রয়ে গিয়েছিল তারা বলবে, ‘আমাদের তোমাদের সাথে যেতে দাও।’ ওরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। বল, ‘তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। আল্লাহ পূর্বেই এরূপ ঘোষণা করেছেন। ওরা বলবে, ‘তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ।’ বস্তুত ওদের বোধশক্তি সামান্য।” (৪৮ : ১৫)

মুসলমানরা মদীনা থেকে রওয়ানা দেয়ার তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর খায়বরে পৌঁছান। রাতভর তারা খায়বরের দুর্গগুলোর সামনে শিবির স্থাপন করে ফেলেন। কিন্তু দুর্গবাসী ইহুদীরা মুসলমানদের আসা ও শিবির স্থাপন সম্পর্কে মোটেও টের পায়নি। নিত্য দিনের মতো সকালে তারা টুকরি-কোদাল নিয়ে ক্ষেতে কাজ করার জন্য বের হয়। দুর্গের বাইরে এসে মুসলিম বাহিনী দেখেই তারা বিস্মিত হয়ে পড়ে। তারা দ্রুত দুর্গের দিকে ফিরে যায় এবং চিৎকার করে বলতে থাকে, “(হযরত) মুহাম্মদ (সা) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে এসে পড়েছে।” তাদের মুখে একথা শুনে মহানবী (সা) সজোরে বললেন, “খায়বর ধ্বংসের সময় এসে গেছে। আমরা কোন জাতির উপর আক্রমণ করতে বাধ্য হলে তাদের পরিণাম তাই হয়ে থাকে।”

ইহুদীদের হতবুদ্ধিতা

খায়বরের ইহুদীরা আগে থেকেই আশংকা করছিল, মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীরা যে কোন মুহূর্তে খায়বর আক্রমণ করতে পারেন। এই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা নানা চিন্তা-ভাবনাও করছিল। খায়বরের ইহুদীদের কারো কারো অভিমত ছিল, ওয়াডিউল কোরা ও তায়মার ইহুদীদের সাথে সলা-পরামর্শ করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আরব গোত্রগুলোর সাহায্য ছাড়াই ইয়াসরিব বা মদীনা আক্রমণ করা হোক। কিন্তু কিছুসংখ্যক ইহুদী বলেছিল, ‘ইসলামের নবী (সা)-এর সাথে একটা সন্ধিচুক্তি করা যেতে পারে। তাতে হুয়াই ইবনে আখতাব পরিখার যুদ্ধের সময় মদীনা জবরদখলের ব্যর্থ চেষ্টা করে মুসলমানদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল, তা দূর হয়ে যাবে। অবশ্য বাস্তব ক্ষেত্রে মুসলমান ও ইহুদী উভয় পক্ষের মনে প্রতিশোধ গ্রহণের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত ছিল। মুসলমানরা খায়বর যুদ্ধের আগেই

সেখানকার ইহুদী নেতা সাল্লাম ইবনে আবু হাকীক ও ইয়াসীর ইবনে রায্যামকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ জাতীয় নানা ঘটনায় উভয় পক্ষের মধ্যে দুষ্টর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। এই ব্যবধান দূর হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। মুসলমানদের খায়বর অভিযান সম্পর্কে সেখানকার ইহুদীরা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। তারাও বসে ছিল না। বনু গাতফানদের সাথে তারা পূর্বেকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো নিবিড় করে তোলে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বনু গাতফানদের সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু মুসলমানদের খায়বর অভিযানকালে বনু গাতফানের ইহুদীরা সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল কিনা, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের একাধিক অভিমত রয়েছে।^১

বনু গাতফানরা ইহুদীদের সাহায্য করেছিল কিংবা করেনি। অথবা মহানবী (সা) খায়বর যুদ্ধে লব্ধ সম্পদের অংশ দেয়ার প্রস্তাব করে তাদের ইহুদীদের সাহায্য করা থেকে বিরত রেখেছিলেন কিংবা রাখেন নি, এসব কথা বাদ দিলেও একথা অনস্বীকার্য যে, এই যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চরিতবিদরা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, খায়বরের ইহুদীরা শুধু নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই শক্তিশালী, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ও ধনী ছিল না, সারা আরবে তারা ছিল সবচেয়ে বেশি অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী। আর তাই মুসলমানদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, আরবে ইহুদীদের এই দলটির অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত নতুন ধর্মের সাথে তাদের বৈরিতা ইসলাম ধর্মের অগ্রগতির সাথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেই যাবে। তারা নিজেদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে না। তাদের অশুভ প্রভাবে ইসলাম প্রসার লাভ করতে পারবে না। এসব কারণে মুসলমানরা খায়বরের ইহুদীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাতে বাধ্য হন।

খায়বরে মুসলমানদের সামরিক অভিযানের সংবাদ সারা আরবে বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ে। কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রগুলো এই যুদ্ধের জয়-পরাজয় বা ফলাফল দেখার জন্য অত্যন্ত উৎকর্ষা নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল। কোন কোন কুরাইশ নেতা তো বিবদমান পক্ষ দুটোর জয়-পরাজয় নিয়ে রীতিমত বাজি ধরেছিল। অধিকাংশ কুরাইশের ধারণা ছিল, এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ খায়বরের ইহুদীরা অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিল। তাছাড়া তাদের দুর্গগুলোও অত্যন্ত মজবুত ছিল। এসব দুর্গ পর্বতচূড়া ও উপত্যকায় সুরক্ষিতভাবে তৈরি করা হয়েছিল। এসব কারণে ইহুদীরা সহজে মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হবে।

খায়বর অবরোধ

মুসলিম বাহিনী সর্বাঙ্গিক সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে খায়বরে ইহুদী দুর্গগুলো অবরোধ করে ফেলেন। তারা পরিস্থিতির নাযুকতা লক্ষ্য করে নিজেরা সলা-পরামর্শ করে। তাদের এক নেতা সাল্লাম ইবনে মিশ্কিম অভিমত প্রকাশ করে যে, আমাদের মাল-সামান, নারী ও শিশুদের ওয়াতীহ ও সালালিম দুর্গে স্থানান্তর করা হোক। রসদপত্র রাখা হোক নাইম দুর্গে। আর বীরযোদ্ধাদের 'নাতাত' দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। সৈন্যদের উৎসাহ দেয়ার জন্য সে

১. অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত হলো, ইহুদীদের সাহায্যে বনু গাতফানরা এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু মুসলমানরা আগে থেকেই গাতফানদের আসার পথ রুদ্ধ করে রাখে। ফলে তারা ফিরে চলে যায়।

নিজেও এই দুর্গে অবস্থানের আশ্রয় প্রকাশ করে। ইহুদী নেতা সাল্লামের এই প্রস্তাব সবাই মেনে নেয়। প্রস্তাব অনুযায়ী যুদ্ধবাজ ইহুদীরা সবাই 'নাতাত' দুর্গে অবস্থান নেয়। এই দুর্গের নিচেই উভয় বাহিনী সর্বপ্রথম মুখোমুখি হয়। দীর্ঘক্ষণ সংঘর্ষ চলে। এই সংঘর্ষে পঞ্চাশজন মুসলিম সৈন্য আহত হয়। ইহুদীদের হতাহতের সংখ্যা এ থেকে অনেকটা অনুমান করা যায়।

নাতাত দুর্গের পাদদেশের সংঘর্ষে ইহুদী অধিনায়ক সাল্লাম নিহত হয়। সাল্লাম নিহত হওয়ার পর নাইম দুর্গের সরদার হারেছ ইবনে আবু যয়নবকে ইহুদী বাহিনীর সেনাপতি করা হয়। হারেছ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নাইম দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলে মুসলিম বাহিনীর খায়রাজ গোত্রীয় বীর সেনানীরা তাকে দুর্গের অভ্যন্তরে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। মুসলমানরা অবরোধ দুর্ভেদ্য করে রাখেন। অপরদিকে অবরুদ্ধ ইহুদীরাও জীবনপণ করে প্রতিরোধ তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। কারণ তারা বেশ ভাল করেই জানত যে, এবার তারা মুসলমানদের নিকট পরাজয় বরণ করলে সারা আরব থেকে চিরদিনের জন্য ইহুদীদের নির্মূল করা হবে।^১

ইতিমধ্যে উভয় পক্ষে কয়েকবার সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু তাতে কোন পক্ষের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়নি। অবশেষে মহানবী (সা) মুসলিম বাহিনীর পতাকা হযরত আবু বকর (রা)-এর হাতে সমর্পণ করেন। তিনি তাঁকে নাইম দুর্গ অভিযানে প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্গ দখল করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় দিন হযরত ওমর ফারুক (রা)-কে এই মহান দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়। এদিনও আশানুরূপ সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তৃতীয় দিন মহানবী (সা) হযরত আলী (রা)-কে এই দায়িত্বে নিয়োগ করেন। তিনি হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, “হে আলী! পতাকা নাও এবং আক্রমণ করো। আল্লাহ তা'আলা তোমার মাধ্যমে এই অভিযান সফল করবেন।” হযরত আলী (রা) মুসলিম বাহিনী নিয়ে দুর্গের নিকট পৌঁছলে ইহুদীরা বেরিয়ে আসে। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। এক ইহুদী হযরত আলী (রা)-এর উপর সজোরে আঘাত করে। তাতে তাঁর ঢালটি মাটিতে পড়ে যায়। তিনি অদূরে পড়ে থাকা একটি কাঠের দরজা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেন। সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। এক পর্যায়ে মুসলমানরা ইহুদীদের দুর্গে পালাতে বাধ্য করেন। এরপর মুসলমানরাও দুর্গে প্রবেশ করেন। প্রবেশপথে একটি পরিখা ছিল। হযরত আলী (রা) কর্তৃক ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত দরজাটি মুসলিম বাহিনী পরিখা পার হওয়ার জন্য ব্যবহার করেন। তাঁরা এটি পরিখার উপর ফেলে পার হয়ে যান। ইহুদী সেনাপতি হারেছ ইবনে আবু যয়নব নিহত হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম বাহিনী নাইম দুর্গ দখল করে ফেলেন। এই ঘটনা থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, যুদ্ধে প্রতিটি ইহুদী কিরূপ বীরত্বের সাথে জীবনপাত করেছে। অপরদিকে মুসলমানরাও কিরূপ সাহস ও ক্ষিপ্ততার সাথে ইহুদীদের প্রতি আক্রমণ করেছেন।

নাইম দুর্গ দখলের পর যুদ্ধের অগ্নিশিখা আরো প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। এবার মুসলমানরা

১. দশটি দুর্গের সমন্বয়ে খায়বর গড়ে উঠেছিল। এসব দুর্গে দশ হাজার সৈন্য অবস্থান করত। তিনটি বৃত্তে এই দুর্গগুলো স্থাপন করা হয়। প্রথম বৃত্তে ছিল চারটি দুর্গ--(১) নাইম, (২) নাতাত, (৩) সাআব ইবনে মুআয, (৪) আযযোবায়র। দ্বিতীয় বৃত্তে ছিল তিনটি দুর্গ--(১) শাক্ক, (২) আলবার, (৩) উবাই। তৃতীয় বৃত্তেও তিনটি দুর্গ ছিল--(১) কামূস, (২) ওয়াতীহ ও (৩) সালালিম। -অনুবাদক

কামুস দুর্গ অবরোধ করেন। এখানেও প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। অবশেষে এই দুর্গ মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়। এ সময় মুসলিম বাহিনীর রসদ শেষ হয়ে যায়। তাঁরা এ ব্যাপারে মহানবী (সা)-কে অবহিত করেন। কিন্তু তিনি খাদ্যের কোন সংস্থান করতে পারেন না। অগত্যা তিনি মুসলিম বাহিনীকে সওয়ারীর ঘোড়া যবাই করার অনুমতি প্রদান করেন। এ সময় ইহুদীদের একটি দুর্গ থেকে ছাগলের পাল বেরিয়ে পড়ে। দু'টি ছাগল মুসলমানদের নিকট চলে আসে। তাঁরা এগুলো যবাই করে জঠরজ্বালা নিবারণ করেন। এরপর মুসলমানরা সাআব ইবনে মুআয দুর্গ অবরোধ করেন। এক্ষেত্রেও ইহুদীরা পরাজয় বরণ করে। এই দুর্গে মুসলমানরা প্রচুর খাদ্যশস্য লাভ করেন। তাতে তাঁরা রসদের দিক থেকে নিশ্চিত হন। এরপর একের পর এক দুর্গ অবরোধ করতে থাকেন। কিন্তু ইহুদীরা তাদের এতটুকু ভূমিও সহজে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। প্রতিটি দুর্গ রক্ষার জন্য তারা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিল। পুরোপুরি নিঃশক্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা কোন দুর্গের দখল ছাড়ত না। ইহুদীদের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর মারহাব পালোয়ান একটি দুর্গ থেকে কবিতা আবৃত্তি করে বেরিয়ে আসে।

قد علمت خير انى مرحب * شاكى السلام بطل مجرب
اطعن احيانا وحيننا اخرج * اذا الليوث اقبلت تحرب
ان حماى للحمى لايقرب * يحجم عن صولتى المجرب

“খায়বর জানে আমি মারহাব,
সশস্ত্র, অভিজ্ঞ ও যুদ্ধবাজ।

বাঘ এগিয়ে এসে আমার উপর হামলা করলে
আমি কখনো তার প্রতি তীর ছুঁড়ি, কখনো অস্ত্রাঘাত করি।
আমার চারণভূমির নিকট আসা এক অসম্ভব ব্যাপার,
আমার ভয়-ভীতিতে অভিজ্ঞ যোদ্ধাও পিছনে সরে যায়।”

মারহাবের গর্জনধ্বনি শুনে মহানবী (সা) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, “তোমাদের মধ্যে কে তার সাথে লড়ার জন্য এগিয়ে যাবে।” মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা আনসারী (রা) বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! গতকাল তার হাতে আমার ভাই মাহমূদ শাহাদাত বরণ করেছে। আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাই।” মহানবী (সা) তাকে অনুমতি প্রদান করলেন। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) অস্ত্র নিয়ে মোকাবেলার জন্য এগিয়ে যান। উভয়ের মধ্যে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ শুরু হয়। এক পর্যায়ে মারহাব মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। কিন্তু তিনি তাঁর ঢাল দ্বারা এই আঘাত প্রতিরোধ করেন। মারহাবের তরবারি ইবনে মাসলামার ঢালে আটকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারহাবকে প্রতিঘাত করেন। তাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।^১ এরপর উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু ইহুদীদের প্রতিটি দুর্গ ছিল অত্যন্ত মজবুত ও সুরক্ষিত। এজন্য এসব দুর্গ অধিকার করতে মুসলমানদের বেশ বেগ পেতে হয়।

১. ‘সিরাতুননবী’ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে এই ঘটনা অন্যরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। -অনুবাদক

ইহুদীদের হতাশা

এবার মুসলমানরা যোবায়ের দুর্গ অবরোধ করেন। উভয় পক্ষ সর্বাঙ্গিক বীরত্ব প্রদর্শন করে। কয়েকদিন পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকে। আশেপাশে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্গ দখল করা সম্ভব হয় না। অবশেষে মুসলমানরা ইহুদীদের পানির সরবরাহ বন্ধ করে দেন। এবার বাধ্য হয়ে তাদের দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। শেষ পর্যন্ত ইহুদীরা পরাজয় বরণ করে। এভাবে একের পর এক দুর্গ মুসলমানরা দখল করতে থাকে। ওয়াতীহ ও সালালিম দুর্গেও ইসলামী পতাকা শোভা পেতে থাকে। এবার ইহুদীরা হতাশ হয়ে পড়ে। মুসলমানরা শাক্ক, নাতাত ও কাতীবা দুর্গও অধিকার করে ফেলে। এবার ইহুদীরা একেবারে ভেঙে পড়ে। তারা প্রাণ বাঁচানোর শর্তে মহানবী (সা)-এর খেদমতে সন্ধির প্রার্থনা করে। দয়ার সাগর আল্লাহর রাসূল তাদের আবেদন মন্যুর করেন। যেসব জমি মুসলমানরা অধিকার করেছিলেন, সেগুলো ইহুদীদের চাষাবাদ করার জন্য ফিরিয়ে দেয়া হয়। তবে শর্তারোপ করা হয় যে, অর্ধেক ফসল মুসলমানদের দিতে হবে।

ইহুদী সন্ধির অবসান

এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, মহানবী (সা) খায়বরের ইহুদীদের তাদের জমিজমায় চাষাবাদ করার সুযোগ প্রদান করেছিলেন, কিন্তু মদীনার ইহুদী বনী কায়নুকা ও বনী নযীরকে তিনি এ সুযোগ প্রদান করেননি। এই দু'টি গোত্রকে তিনি তাদের জমিজমা থেকেই উৎখাত করেননি, মদীনা থেকেও বের করে দেন। বস্তুত উভয় স্থানের ইহুদীদের সাথে ব্যতিক্রম ব্যবহার করার পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। খায়বরের ইহুদীদের ব্যাপারটা মদীনার ইহুদীদের চেয়ে ভিন্নধর্মী ছিল। খায়বর বিজয়ের পর সেখানকার ইহুদীদের পুনরায় মাথা উঠানোর কোন আশংকা ছিল না। কিন্তু মদীনার ইহুদীদের ক্ষেত্রে সে আশংকা বিদ্যমান ছিল। খায়বরে খেজুর ও অন্যান্য ফলের বাগান এবং আবাদী জমি অনেক বেশি ছিল। এসবের দেখাশোনা ও চাষাবাদ করার জন্য অনেক লোকের প্রয়োজন ছিল। মদীনার মুসলমানরা কৃষিজীবী ছিলেন বটে, কিন্তু নিজেদের জমিজমা নিয়েই তাঁদের ব্যস্ত থাকতে হতো। এজন্য কৃষিকাজের জন্য তাদের মদীনার বাইরে পাঠানো সম্ভবপর ছিল না। তা ছাড়া মদীনার আনসারদের যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যও সব সময় মদীনায় থাকার প্রয়োজন ছিল।

অপরদিকে খায়বরের ইহুদীদের রাজনৈতিক মর্যাদা বলতে কিছুই অবিশিষ্ট ছিল না। তারা জীবনের সকল প্রকার আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে নিজেদের জমিজমায় চাষাবাদ করার সুযোগ লাভও তাদের জন্য বিরাট ব্যাপার ছিল। বলা চলে এটা ছিল তাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ। প্রতিবছর মহানবী (সা)-এর প্রতিনিধি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) খায়বরে যেতেন। তিনি উৎপাদিত ফসল সমান দুই ভাগ করতেন। এরপর চাষাবাদকারী ইহুদীদের বলতেন, “তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী একটা অংশ তোমরা নিয়ে যাও।” এরূপ ন্যায়-নীতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও ইহুদীরা তাদের কুস্বভাব পরিত্যাগ করতে পারেনি। তাদের অসৎ উদ্দেশ্যের ফলে ধীরে ধীরে খায়বরের কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়।

ইহুদীদের প্রতি মহানবী (সা)-এর সদ্যবহারের আরেকটা প্রমাণ হলো, খায়বর বিজয়ের সময় পবিত্র তাওরাত গ্রন্থের কয়েকটি কপি মুসলমানদের হস্তগত হয়। ইহুদীরা আবেদন করলে মহানবী (সা) এসব কপি তাদের ফিরিয়ে দেন। অথচ রোমান খৃষ্টানরা জেরুজালেম অধিকারের পর সেখানকার তাওরাত গ্রন্থের কপিগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এমনকি পোড়া ছাইগুলো পা দিয়ে মাড়িয়েছিল। শুধু তাই নয়, স্পেন বিজয়ের পরও খৃষ্টানরা সেখানকার তাওরাত গ্রন্থগুলো পুড়িয়ে দিয়েছিল।

ফাদাকের ইহুদী

ওয়াতীহ ও সালালিম দুর্গ অবরোধকালীন সময়ে মহানবী (সা) ফাদাকের ইহুদীদের নিকট খবর পাঠান, “তোমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, নতুবা তোমাদের ধন-সম্পদ আমাদের নিকট সোপর্দ করতে হবে। ফাদাকের ইহুদীরা খায়বরবাসীদের পরিণতি শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। মহানবী (সা)-এর বাণী পেয়ে তারা শেষোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে। এটাই তারা নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করে। তারা অর্ধেক খাদ্যশস্য মুসলমানদের দেয়ার শর্তে সন্ধি করে নেয়।

খায়বর ও ফাদাকের ভূমির জন্য দু’টি ভিন্ন ধরনের আইন প্রবর্তন করা হয়। খায়বর যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকৃত হয়। এজন্য সেখানকার ভূমি গাযী বা যুদ্ধে বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। কিন্তু ফাদাক যুদ্ধ ছাড়াই অধিকার করা হয়। এজন্য এখানকার জমি মহানবী (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়।

ওয়াদিউল কোরার আনুগত্য

ওয়াদিউল কোরা জনপদ খায়বর ও মদীনার মধ্যবর্তী ছিল। খায়বর থেকে ফেরার পথে মুসলমানরা ওয়াদিউল কোরার অদূরে থাকতেই ইহুদীরা তীর বর্ষণ শুরু করে। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরও মোকাবেলার জন্য তৈরি হতে হবে। মহানবী (সা) মুসলিম বাহিনীকে কাতারবন্দী করেন। কিন্তু প্রতি-আক্রমণের আগে রাসূলুল্লাহ (সা) ইহুদীদের ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। ইহুদীদের একেক জন বীর যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু তাদের কারোরই ফেরার সুযোগ হয় না। ইহুদীদের প্রতিটি বীরকে হত্যার পর মহানবী (সা) পুনরায় তাদের নিকট ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব করতেন। অপরদিকে ইহুদীরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। এভাবে রাত হয়ে যায়। পরদিন ভোরে ইহুদীরা নিজেরাই আনুগত্যের প্রস্তাব পাঠায়। মহানবী (সা) তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনি ইহুদীদের সব সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। কৃষিজমি ও ফলের বাগানগুলো অর্ধেক ভাগে ইহুদীদের চাষাবাদ করার জন্য অনুমতি দেয়া হয়।

সে পথেই ওয়াদিয়ে তায়মা অবস্থিত ছিল। সেখানেও ইহুদীরা বসবাস করত। তারা মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে কোন প্রকার মোকাবেলা করেনি। এমনিতেই আনুগত্য ও জিযিয়া দেয়ার শর্ত মেনে নেয়।

এখন থেকে আরবে ইহুদী সম্প্রদায়ের কয়েক শতাব্দীর পুরনো প্রভাব-প্রতিপত্তির অবসান ঘটে। তারা মহানবী (সা)-এর আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর

মদীনার দক্ষিণাঞ্চল মক্কার দিক থেকে শত্রুদের আক্রমণ আশংকা দূরীভূত হয়। অনুরূপ খায়বর বিজয়ের মাধ্যমে উত্তর দিকের সকল প্রকার আক্রমণ ও সংঘর্ষের আশংকা চিরদিনের জন্য তিরোহিত হয়। ইহুদীদের বশ্যতা স্বীকারের পর তাদের সম্পর্কে মুসলমানদের, বিশেষ করে আনসারদের ক্ষোভ স্তিমিত হয়ে যায়। তখনো কিছু কিছু ইহুদী মদীনায় বসবাস করছিল। মুসলমানরা তাদেরকে দেখেও কিছু বলতেন না। এমনকি মুনাফিক প্রধান আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর মৃত্যুর সময় ইহুদীরা তার জন্য কান্নাকাটি করছিল। মহানবী (সা) সহানুভূতি প্রকাশের জন্য আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট যান। এ সময় ইহুদীরাও সেখানে উপস্থিত ছিল। মহানবী (সা) ইহুদীদের গা ঘেঁষে দাঁড়ানোকেও কোন প্রকার আপত্তিকর মনে করেননি। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে উপদেশ দেন, তিনি যেন ইহুদীদের ধর্মকর্ম পালনের ব্যাপারে কোন প্রকার আপত্তি না করেন। বাহরায়নের ইহুদীরা তাদের পুরনো ধর্ম পালন করত। তা সত্ত্বেও মহানবী (সা) তাদের উপর জিযিয়া কর ধার্য করেননি। অবশ্য বনী গাযিয়া ও বনী আরীয গোত্রের ইহুদীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের পর মহানবী (সা) তাদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। সারকথা, আরবে মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করে ইহুদীদের থাকতে হয়। তাদের কেন্দ্রীয় মর্যাদা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এমনকি এত দিন তারা যে আরবে যুগ যুগ থেকে মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে বসবাস করছিল, এক পর্যায়ে তাদের সে বাস্তুভিটাও ত্যাগ করতে হয়। এক বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা)-এর জীবিতকালেই ইহুদীরা আরবদেশ ত্যাগ করে চলে যায়। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, মহানবী (সা)-এর ইত্তিকালের পর তারা আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করে।

বিষ মেশানো মাংস

খায়বর ও অন্যান্য এলাকার ইহুদীরা মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেও পরাজয়ের গ্লানি তারা ভুলতে পারেনি। তাদের মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত ছিল। তারা যে কোন উপায়ে মহানবী (সা) ও সাহাবীদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তা-ভাবনা করত। খায়বর যুদ্ধের পর পরিস্থিতি বেশ শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে যায়। এ সময় সাল্লাম ইবনে মিশকামের স্ত্রী যয়নব বিনতে হারেছ একটি বকরী ভূনা করে মহানবী (সা)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দেয়। তিনি অন্যান্য সাহাবীকে নিয়ে বকরীর মাংস আহারে বসেন। প্রথমে মহানবী (সা) এক টুকরো মাংস উঠিয়ে মুখে দেন। মাংসের টুকরোটি তাঁর নিকট বিশ্বাদ লাগে। তাঁকে অনুসরণ করে হযরত বিশর ইবনে বারাও এক টুকরো মাংস মুখে দেন। মহানবী (সা) সঙ্গে সঙ্গে মাংসের টুকরোটি মুখ থেকে বের করে ফেলেন। তিনি বলেন, “মাংসের টুকরো কিংবা হাড়টি আমাকে বলছে, তাতে বিষ মেশানো রয়েছে।” সঙ্গে সঙ্গে হযরত বিশর ইবনে বারাও মাংসের টুকরোটি বমি করে ফেলে দেন। অতঃপর মহানবী (সা) যয়নবকে ডেকে পাঠান। সে মাংসে বিষ মেশানোর অপরাধ স্বীকার করে এবং বলে, “আমার সম্প্রদায়ের সাথে আপনি যে আচরণ করেছেন, আপনার তা অজানা নয়। আমি ভেবেছি, আপনি শুধু বাদশাহ হলে তাতে আপনার মৃত্যু হবে। আমরা আপনার মৃত্যুতে নিষ্কৃতি লাভ করব। আর আপনি নবী হলে আমার এই কাজ অবশ্যই আপনি পূর্বাহ্নে জানতে পারবেন।” অপরাধ স্বীকার করায় যয়নবকে

ক্ষমা করা-না করার ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। একটি বর্ণনা অনুযায়ী তার স্বামী ও পিতা নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। অপর একটি বর্ণনা অনুযায়ী বলা হয়েছে, হযরত বিশর (রা)-এর ইত্তিকাল হওয়ার দরুন তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।^১

যয়নবের উপরোক্ত প্রতিশোধমূলক আচরণের পর মুসলমানরা ইহুদীদের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েন। তাদের ক্ষমতা নির্মূল হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের অনিষ্ট সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকতেন।

খায়বরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সাফিয়া নামের এক মহিলাও ছিলেন। তিনি মদীনার বনু নযীর গোত্রের সরদার ছুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা এবং বনু কোরায়যা নেতা কানানা ইবনে রবীর স্ত্রী ছিলেন। মদীনা থেকে নির্বাসনের সময় কানানা একটি চামড়ার ব্যাগভর্তি সোনা-দানা নিয়ে এসেছিল। মহানবী (সা) সন্ধির শর্তানুযায়ী কানানাকে উক্ত ব্যাগটি হস্তান্তর করার কথা বলেন। সে শপথ করে উক্ত ব্যাগের কথা অস্বীকার করে বসে। মহানবী (সা) তাকে বলেন, “যদি প্রমাণ হয় যে, উক্ত সম্পদ তোমার নিকট রয়েছে, তা হলে এই মিথ্যে শপথের জন্য তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। তুমি এই শাস্তি মেনে নিতে প্রস্তুত আছ কিনা।” লোকটি বলল, “আমি অবশ্যই তা মাথা পেতে নিতে রাখি আছি।” সে এই বিবরণ লেখা কাগজে নিজ থেকে স্বাক্ষর দান করে। একজন মুসলমান কিছুক্ষণ আগে কানানাকে একটি পরিত্যক্ত জীর্ণ ইমারতের নিকট দেখতে পায়। লোকটি পূর্বাঙ্কে এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-কে অবহিত করেছিলেন। এরপর তিনি উক্ত জীর্ণ ইমারতের মেঝে খনন করার নির্দেশ প্রদান করেন। সেখানে তালাশ করে ধন-সম্পদের একটা অংশ উদ্ধার করা হয়। কানানাকে তার লিখিত শর্ত অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।

যুদ্ধবন্দিনী বিবি সাফিয়া (রা) সম্পর্কে সাহাবীরা মহানবী (সা)-এর নিকট আবেদন করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! বিবি সাফিয়া (রা) বনু কোরায়যা ও বনু নযীর অর্থাৎ পিতা ও স্বামী উভয় গোত্রের দিক থেকেই বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারিণী। সুতরাং এ মহিলাকে আপনার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আমরা সুপারিশ করছি। সাহাবীদের অনুরোধে মহানবী (সা) বিবি সাফিয়া (রা)-কে মুক্ত করে দেন এবং নিজের সহধর্মিণীর মর্যাদা দান করেন। এ ব্যাপারে মহানবী (সা) অতীতের বিজয়ীদের কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। তারা পরাজিত রাজা-বাদশাহদের কন্যাদের নিজেদের স্ত্রীর মর্যাদা দান করে তাদের পরাজয়ের ব্যথা হালকা করার চেষ্টা করতেন। তাতে করে এসব মহিলার সাবেক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকত। সুতরাং বিবি সাফিয়া (রা)-এর বেলায় মহানবী (সা)-ও তাই করলেন।

হযরত আবু আইয়ুব খালিদ আনসারীর আশংকা ছিল, বাসর রাতে হয়তো বিবি সাফিয়ার অন্তরে প্রতিশোধ গ্রহণের উন্মাদনা জেগে উঠতে পারে। কারণ খায়বর যুদ্ধে তার স্বামী, পিতা ও সম্প্রদায়ের অনেক লোক মুসলমানদের অশ্রাঘাতে নিহত হয়েছে। এই ক্ষোভে তিনি হয়তো মহানবী (সা)-এর উপর আঘাত করে বসতে পারেন। এই আশংকায় বাসর রাতে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) নাজা তরবারি নিয়ে সারারাত মহানবী (সা)-এর তাঁবুর চারপাশে পাহারা দিতে থাকেন। প্রত্যুষে মহানবী (সা) হযরত আবু আইয়ুব আনসারীকে পাহারায়

১. মূলত প্রথমে যয়নবকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু হযরত বিশরের ইত্তিকাল হওয়ার পর তাকে হত্যাকারী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। -অনুবাদক

নিয়োজিত দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বিবি সাফিয়ার পিতা, স্বামী ও ইহুদী সম্প্রদায়ের অনেক লোককে হত্যা করিয়েছেন। হয়তো তাঁর অন্তর থেকে কুফরীর প্রভাব এখনো পুরোপুরি দূরীভূত হয়নি। তাঁর দিক থেকে আপনার ব্যাপারে আমার আশংকা ছিল।” এই আশংকা হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর নিছক কল্পনা ছাড়া কিছুই ছিল না। বস্তুত সহধর্মিণীর মর্যাদা লাভের পর উম্মুল মু‘মিনীন হযরত সাফিয়া (রা) মহানবী (সা)-এর ইত্তিকালের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুগতা ছিলেন। মহানবী (সা)-এর মৃত্যুশয্যায় উম্মুল মু‘মিনীনরা সবাই উপস্থিত ছিলেন। উম্মুল মু‘মিনীন হযরত সাফিয়া (রা) নিবেদন করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনার যে কষ্ট হচ্ছে আপনার পরিবর্তে আল্লাহ তা‘আলা যদি তা আমাকে দান করতেন।” হযরত সাফিয়া (রা)-এর এই মন্তব্যে মহানবী (সা)-এর অন্য স্ত্রীগণ বিশেষ ভঙ্গিতে একে অপরের দিকে তাকান। তাঁদের এই দৃষ্টি বিনিময়ের সাথে সাথে মহানবী (সা) বললেন, “তোমরা সবাই কুলি করে নাও।” উম্মুল মু‘মিনীনগণ এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মহানবী (সা) বললেন, “তোমরা সাফিয়া সম্পর্কে বিদ্বেষাত্মক দৃষ্টি বিনিময় করেছে। আল্লাহর শপথ! সাফিয়া আন্তরিকভাবেই এই মন্তব্য করেছে।” উম্মুল মু‘মিনীন হযরত সাফিয়া (রা) আমীর মুআবিয়ার শাসনামলে ইত্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যে, মহানবী (সা) হিরাক্লিয়াস, কিসরা, নাজ্জাশী প্রমুখের নিকট যেসব প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন, তাদের কোন্ সময় পাঠিয়েছিলেন। তাদেরকে কি খায়বর যুদ্ধের পূর্বে পাঠানো হয়েছিল, না পরে? এই সময়কাল নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই মতপার্থক্যের দরুন নিশ্চিত অভিমত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একথা বলা যায় যে, মহানবী (সা) তাঁর সব প্রতিনিধিকে একই সময় পাঠাননি। কিছু সংখ্যককে খায়বর যুদ্ধের পূর্বে পাঠিয়েছেন এবং কোন কোন প্রতিনিধিকে এই যুদ্ধের পরে পাঠিয়েছেন। পরে প্রেরিতদের মধ্যে রয়েছেন হযরত দিহইয়া ইবনে খালীফা কালবী। তিনি খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। খায়বর বিজয়ের পর মহানবী (সা) পবিত্র চিঠিসহ হযরত দিহইয়াকে রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পাঠান। এ সময় হিরাক্লিয়াস ইরানীদের পরাজিত করে পবিত্র ত্রুশ পুনরুদ্ধার করেন। ইরানীরা বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করে ত্রুশটি উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাতে হিরাক্লিয়াস অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি পণ করেছিলেন, ত্রুশটি ইরানীদের নিকট থেকে পুনরুদ্ধার করতে পারলে পদব্রজে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে এটি যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করবেন। হিরাক্লিয়াস হেমস শহরে পৌঁছে মহানবী (সা)-এর পবিত্র চিঠি পান। চিঠি পাওয়া সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে। একটিতে বলা হয়েছে, মহানবী (সা)-এর দূত হযরত দিহইয়া কালবী (রা) তাঁর আরব সাথীদের নিয়ে হিরাক্লিয়াসের দরবারে পৌঁছেন। তিনি নিজে পবিত্র চিঠি সম্রাটের নিকট হস্তান্তর করেন। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, বুসরার গভর্নরের মাধ্যমে পত্রটি সম্রাটের নিকট পৌঁছান। যে কোন ভাবেই হোক, সম্রাট পত্রটি ভাষান্তর করিয়ে শুনেন। পত্রের বিষয়বস্তু জানার পর সম্রাটের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হননি। প্রতিশোধ নেয়ার কথাও তিনি ভাবেননি। আরবভূমি আক্রমণেরও কোন পরিকল্পনা তৈরি করেননি। বরং তিনি অত্যন্ত শালীন ভাষায় জবাব লিখে হযরত দিহইয়া কালবীর নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে পত্রের জবাব দেয়ায়

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেছেন, হিরাক্লিয়াস ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মূলত তাদের এই অভিমত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

হিরাক্লিয়াসের জবাব

সে সময়েই রোমানদের নিযুক্ত শাসক হারেছ গাসসানীর এক দূত হিমসে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাথে দেখা করেন। তিনি সম্রাটকে অবহিত করেন, হারেছ গাসসানীর নিকটও অনুরূপ একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। নবুয়তের দাবি করায় তিনি হারেছের পক্ষ হতে মদীনা আক্রমণ করার জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারতে শরীক হওয়ার জন্য হারেছকে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নতুন ধর্ম প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে দমন করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেননি। কিন্তু সে সময় তিনি জানতেন না, কয়েক বছর পর এই বায়তুল মুকাদ্দাস আর রোমান সাম্রাজ্যে ইসলামের পতাকা উড়ানো হবে! তাঁর অধিকৃত দামেশক শহর ইসলামী খেলাফতের রাজধানীতে পরিণত হবে। ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে মুসলিম ও রোমান শাসকদের সংঘর্ষে মুসলমানরা জয়লাভ করবে। তুর্কী মুসলমানরা ইস্তাম্বুল অধিকার করে নিবে। সেখানকার সবচেয়ে বড় গির্জাটি মসজিদে রূপান্তর করা হবে। তার মেহরাবে মহানবী (সা)-এর পবিত্র নাম অংকিত হবে। কয়েকশ' বছর পর আবার তুর্কীরাই সে মসজিদটিকে পূর্ব রোম বা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রত্নতত্ত্বের জাদুঘরে পরিণত করবে।

কিসরা বা পারস্য সম্রাটের আচরণ

ইরানের বাদশাহ্ কিসরার দরবারে মহানবী (সা)-এর চিঠি পড়ে শোনানো হয়। উক্ত চিঠিতে তিনি বাদশাহকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। একথা শোনামাত্র বাদশাহ তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। তিনি মহানবী (সা)-এর পবিত্র চিঠি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলেন। কিসরা তাঁর অধীনস্থ ইয়ামনের শাসক বাযানকে নির্দেশ প্রদান করেন, তিনি যেন মহানবী (সা)-এর পবিত্র শিরশ্ছেদ করে বাদশাহর দরবারে পাঠিয়ে দেয়। সম্ভবত বাদশাহ্ চিন্তা করেছিলেন, এই আচরণের মাধ্যমে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাথে তার পরাজয়ের গ্লানি দূর করা সম্ভব হবে। মাত্র কিছু দিন আগে ইরানের বাদশাহ্ রোমান সম্রাটের নিকট পরাজয় বরণ করেছিলেন। মুসলিম দূত ইরান থেকে ফিরে এসে মহানবী (সা)-এর নিকট ইরানী বাদশাহ্‌র ঘৃণ্য আচরণের বিবরণ দান করেন। মহানবী (সা) বললেন, “আল্লাহ্ তা’আলা তার সাম্রাজ্য অনুরূপ টুকরো টুকরো করে ফেলবেন।” ইরানী সম্রাটের নির্দেশমতো বাযান তাঁর দূত মহানবী (সা)-এর খেদমতে প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে কিসরার ছেলে শীরাওয়াহ্ পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে। নবী করীম (সা) ওহীর মাধ্যমে এ ঘটনা অবগত হন। বাযানের দূত মহানবী (সা)-এর দরবারে পৌঁছলে তিনি তাকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বাযানের দূতদের বলে দেন, তোমরা ইয়ামনে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে বাযানকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাবে।

রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাথে ইরানীদের শোচনীয় পরাজয় ইয়ামনবাসীদের সামনে ছিল। তারা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল ইরানীদের পতন অবধারিত। এমন কি অদূর ভবিষ্যতে

ইয়ামনের উপরও ইরানীদের কর্তৃত্ব থাকবে না। এ ছাড়া মহানবী (সা)-এর নিকট কুরাইশদের বারবার পরাজয়বরণ এবং ইহুদীদের শক্তি নির্মূল করার খবরও তারা জানতে পেরেছিল। দূতরা ইয়ামনে ফিরে এসে মহানবী (সা)-এর পক্ষ থেকে বায়ানকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়। বায়ান এই আমন্ত্রণে সাড়া দেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইরানের পরিবর্তে মহানবী (সা)-এর পক্ষ থেকে নিজেকে ইয়ামনের গভর্নর হিসাবে ঘোষণা করেন। মহানবী (সা)-ও বায়ানকে ইয়ামনের গভর্নর হিসাবে অনুমোদন দান করেন। তখনো মক্কায় মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মক্কা ছিল মদীনা ও ইয়ামনের মধ্যবর্তী স্থানে। এজন্য স্বভাবতই মহানবী (সা)-এর পক্ষ হতে বায়ানের নিকট খারাজ, জিযিয়া কিংবা যাকাত দাবি করার পরিবেশ ছিল না। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বায়ানও পতনোন্মুখ ইরানের নাগপাশ-মুক্ত হয়ে আরবের নতুন শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাই নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করেন। কারণ আরবের এই নতুন শক্তি তাঁর নিকট কোন প্রকার রাজস্ব দাবি করছিলেন না। কিন্তু সে সময় বায়ানের এ কথা জানা ছিল না যে, মহানবী (সা)-এর সাথে তাঁর ধর্মীয় ও পার্থিব সম্পর্ক গড়ে তোলার অর্থ হচ্ছে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণাংশে ইসলামের জন্য একটা সুদৃঢ় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া। মাত্র দুই বছর পরই বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়।

মোকাওকেসের জবাব

মিসরের বাদশাহ্ মোকাওকেসের নিকট মহানবী (সা)-এর দূত হিসাবে হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতাআকে পাঠান হয়। তিনি বাদশাহের দরবারে পৌঁছলে তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করা হয়। বাদশাহ্ অত্যন্ত শালীন ভাষায় মহানবী (সা)-এর চিঠির জবাব প্রদান করেন। তিনি লিখেন, “আমারও জানা মতে একজন নবী আসবেন। কিন্তু তাঁর আবির্ভাব তো সিরিয়ায় হবে।” মোকাওকেস মহানবী (সা)-এর দূতের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করেন। তিনি মহানবী (সা)-কে দেয়ার জন্যও দূতের নিকট অনেক মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করেন। এসব উপহারের মধ্যে ছিল, দু’জন সুন্দরী যুবতী, একটি সাদা খচ্চর, একটি গাধা, মিসরে দুপ্রাপ্য কিছু দ্রব্য-সামগ্রী। যুবতীদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম ছিল মারিয়া কিবতিয়া।^১ মহানবী (সা) তাঁকে উম্মুল মু’মিনীনের মর্যাদা দান করেন। হযরত মারিয়া (রা)-এর গর্ভে মহানবী (সা)-এর ছেলে হযরত ইবরাহীমের জন্ম হয়। অপর যুবতীর নাম ছিল সীরীন। তাকে হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেত (রা)-এর সাথে বিয়ে দেয়া হয়। মহানবী (সা) খচ্চরটির নাম রেখেছিলেন দুলাদাল। এই খচ্চরটি সাদা রঙের হওয়ায় আরবের অন্যান্য খচ্চরের চাইতে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। তিনি খচ্চরটির নাম দিয়েছিলেন উফায়র বা ইয়াফুর। রোমানরা মোকাওকেসের সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। এ আশংকা না থাকলে তিনি অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করতেন।

১. ঐতিহাসিকরা কেউ কেউ লিখেছেন এই দুই যুবতী ছিলেন দাসী। তাদের এই মন্তব্য ঠিক নয়। কারণ বাদশাহ্ যুবতীদের সম্পর্কে মহানবী (সা)-কে লিখেছেন, “আমি আপনার জন্য দু’জন যুবতী পাঠাচ্ছি। কিবতীদের নিকট তাদের অনেক সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। সে যুগ ও পরিবেশে দাসীদের সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া তারা ছিল, কিবতী বংশের। কিবতী বংশ ছিল রাজবংশ। রাজবংশের লোক আবার দাসী হয় কি করে। আসলে এই দুই যুবতী ছিল রাজ-পরিবারের। -অনুবাদক

নাজ্জাশীর জবাব

আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী ও মুসলমানদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই যে, বাদশাহ্ মহানবী (সা)-এর চিঠির জবাব শালীন ভাষায় দিয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, বাদশাহ্ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদদের একটি দল এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

মহানবী (সা) ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণলিপি ছাড়াও আর একটি চিঠি বাদশাহ্ নাজ্জাশীর নিকট পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবিসিনিয়ায় অবস্থানকারী মুহাজিরদের মদীনায় পাঠিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেন। নাজ্জাশী দুটো নৌযান তৈরি করেন এবং এগুলোর মাধ্যমে মুহাজিরদের মদীনায় পাঠিয়ে দেন। এসব মুসলিম মুহাজিরের নেতা ছিলেন হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালিব (রা)। উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ানও তাঁদের সাথে ছিলেন। তাঁর স্বামী আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহশ আবিসিনিয়ায় খৃষ্টানদের প্রভাবে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি খৃষ্টান থাকা অবস্থায় পরলোক গমন করেন। আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় আসার পর মহানবী (সা) হযরত উম্মে হাবীবাকে বিয়ে করেন। কোন কোন পশ্চিমা ঐতিহাসিক বলেছেন, আবু সুফিয়ানের সাথে এই আত্মীয়তা স্থাপনকে মহানবী (সা) হোদায়বিয়ার সন্ধি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে একটা কৌশল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আবার তাদেরই কেউ কেউ বলেছেন, তখনো আবু সুফিয়ান ছিলেন পৌত্তলিক। তাকে মানসিক পীড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর কন্যাকে মহানবী (সা) বিয়ে করেন। মূলত পাশ্চাত্য ইতিহাসকারদের দুটো অভিমতই ভিত্তিহীন।

যেসব আরব সরদারের নিকট মহানবী (সা) দূত মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ইয়ামন ও ওমানের শাসকরা জবাবের ভাষায় অসৌজন্যমূলক শব্দ ব্যবহার করে। বাহরাইনের আমীর মুনযের ইবনে সাবী ইসলাম গ্রহণ করেন। ইয়ামামার আমীর তার আমীরিয়াতের স্বীকৃতির শর্তে ইসলাম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এই লোভ-লালসা প্রকাশ করার মহানবী (সা) তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তাকে অভিসম্পাত প্রদান করেন। এই ঘটনার এক বছর পরই সে মৃত্যুবরণ করে।

জবাবের ধরন

যে সব বাদশাহ্ ও শাসকবর্গের নিকট মহানবী (সা) ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে দু'একজন ছাড়া প্রায় সবাই অত্যন্ত ভদ্রতার পরিচয় প্রদান করেন। তারা শালীন ভাষায় মহানবী (সা)-এর চিঠির জবাব দান করেন। তাদের কেউ মহানবী (সা)-এর কোন দূতকে হত্যা করেননি, বন্দীও করেননি। এমনকি এসব রাজন্যবর্গের মধ্যে কেউ নতুন ধর্মের বাণী শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ধর্মপ্রচারক মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেননি। অথচ তাঁদের সবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন ধর্মের প্রবর্তক আমাদের প্রিয়নবী (সা)-কে নিশ্চিহ্ন করার উদ্যোগ নেয়াই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। কেন তাঁরা এরূপ করলেন না, এর পিছনে কি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, পাঠকবর্গের মনে এসব প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

বস্তুত আমাদের বর্তমান যুগে বস্তুবাদ যেমন অপ্রতিরোধ্য গতিতে সম্প্রসারিত হয়ে চলছে এবং অধ্যাত্মবাদ দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে, তেমনি সে যুগের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সে যুগেও জীবনের অপর নাম ছিল ভোগ-বিলাস। বিভিন্ন জাতি একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার কিংবা ক্ষমতাসীন শাসকের বৈধ-অবৈধ ইচ্ছার বাস্তবায়ন অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকে। এরূপ পরিবেশে ঈমান বা বিশ্বাসের অনুসরণ ছিল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। ঈমান-বিশ্বাসের গভীরে যে সত্য লুক্কায়িত রয়েছে মানুষ তা উদ্ধারের চেষ্টা করত না। যেসব শাসক মানুষের বস্তুবাদী স্বার্থ ও ভোগ-বিলাসের উপকরণের সংস্থান করত, জনসাধারণ সেসব শাসকেরই অন্ধ অনুসরণ করত। এসব লোক ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলোই শুধু পালন করত। স্বার্থোদ্ধারের পর তাদের ধর্মবিশ্বাসেও ভাটা পড়ত। ধর্মের প্রতি তারা উদাসীন হয়ে পড়ত। এরূপ পরিস্থিতিতে তারা জানতে পারল, এক ব্যক্তি এক নতুন ধর্মীয় আদর্শের প্রতি তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন। সে সব আদর্শ অত্যন্ত সরল-সহজ। কিন্তু এসবের নৈতিক দিক অত্যন্ত বলিষ্ঠ। এই নতুন ধর্মীয় মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহর নিকট সব মানুষ সমান। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তাঁর সৃষ্ট জীবের কল্যাণ-অকল্যাণ বিধান করে থাকেন। কেউ তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হলে পৃথিবীর কোন শক্তিশালী ও অত্যাচারী শাসকই তাঁর ক্ষতি সাধন করতে পারে না। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর গযবের শিকার হয়, তাহলে পৃথিবীর সকল রাজা-বাদশাহর ধন-সম্পদ ও কৃপা-দৃষ্টিও আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা করতে পারে না। মানুষকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটই মুক্তি ও কল্যাণের প্রত্যাশা করতে হবে। নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য তাঁর নিকটই তওবা করতে হবে। তিনিই তাদেরকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখতে পারেন। কল্যাণ ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে পারেন।

নতুন ধর্ম ইসলামের ব্যাপারে মানুষ আরও জানতে পারে, এই ধর্ম প্রবর্তকের উপর নানান অকথ্য নির্যাতন চালানো সত্ত্বেও তাঁকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। দিন দিন তাঁর শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাঁর বিরুদ্ধে সকল প্রকার জড়শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছেন। তারা আরো জানতে পারে, এই নতুন ধর্ম প্রবর্তক এতীম ছিলেন, যৌবনে তিনি ছিলেন নিঃস্ব কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কারো নিকট হাত পাতেননি। তিনি সর্বকালের মধ্যে অসাধারণ সফলতা লাভ করেন। তাঁর মতো এরূপ অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব সারা আরবে আর দ্বিতীয়টি নেই। মানুষ তাঁর সাক্ষাতের জন্য অধীর হয়ে থাকে। অত্যন্ত আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা নিয়ে তাঁর কথাবার্তা শোনে। বস্তুত এসব কারণেই বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্ মহানবী (সা)-এর আমন্ত্রণলিপির জবাব দানকালে নমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এসব কারণই তাদেরকে মহানবী (সা)-এর কোন দূত বা তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল। বৈষয়িক স্বার্থ ও লোভ-লালসা যদি তাদের সত্য গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করত, তাহলে তারা সবাই মহানবী (সা)-এর আহ্বানে সাড়া দিতেন। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে গৌরব লাভ করতেন। অবশ্য তারা ইসলাম গ্রহণ না করলেও তাদের নমনীয় ভূমিকায় মুসলমানদের ঈমান ও মনোবল কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আবিসিনিয়া থেকে মুসলমানদের প্রত্যাবর্তন

মহানবী (সা) খায়বর থেকে মদীনা ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে হযরত জা'ফর ইবনে আবী তালিব (রা) তাঁর মুসলিম মুহাজির সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মদীনায়ে পৌঁছান। মহানবী (সা) বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর নিকট যেসব দূত পাঠিয়েছিলেন, এ সময় তাঁরাও নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করে মদীনায়ে ফিরে আসেন। মদীনায়ে মুসলমানরা কাবাঘর যিয়ারতের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন। হোদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী এবার তাঁদের 'উমরাতুল কাযা' বা গত বছরের উমরা আদায় করার জন্য পবিত্র মক্কায়ে যাওয়ার কথা। মহানবী (সা) হযরত জা'ফর ইবনে আবী তালিবের সাক্ষাত পেয়ে অত্যন্ত খুশি হন। তিনি তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ প্রসঙ্গে বলেন, "আমি অনুভব করতে পারছি না, খায়বর বিজয়ে আমি বেশি আনন্দিত হয়েছি, না জা'ফরের সাক্ষাত পেয়ে বেশি খুশি হয়েছি।"

ইতিহাসে এ সময়েরই একটি ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। ইহুদীরা লবীদ নামের এক জাদুকরের মাধ্যমে মহানবী (সা)-কে জাদু করে। তাঁর স্মৃতিশক্তিতে জাদুর প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি এখন যে কাজ করেছেন, কিছুক্ষণ পরই মনে হতো তিনি তা করেননি। জাদুর কাহিনী সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। অনেকগুলো বর্ণনায় বলা হয়েছে, এ কাহিনীর কোন ভিত্তি নেই। এই অভিমতটি বেশ নির্ভরযোগ্য।

খায়বর বিজয়ের পর মুসলমানরা মদীনায়ে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করছিলেন। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তাঁরা যেসব সম্পদ ও প্রাচুর্য লাভ করেছিলেন, সেগুলোর সদ্যবহার করছিলেন। এ সময় তাঁরা যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা বা পরিকল্পনা করেননি। অবশ্য এ সম্পর্কে কেউ তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে তাকে দমন করার জন্য মাঝে-মধ্যে সামরিক অভিযান চালান হতো। এভাবে বছর গড়িয়ে যিলকাদ মাস ঘুরে আসে। মহানবী (সা) তাঁর দু'হাজার সাহাবী নিয়ে ওমরাতুল কাযা বা গত বছরের ওমরা পালনের জন্য পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। তাতে করে তাঁরা পবিত্র কাবাঘর যিয়ারতের মাধ্যমে তাঁদের অধীর দেহ-মনকে প্রশান্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ওমরাতুল কাযা

হোদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীদের মক্কায় যাওয়ার সুযোগ আসে। ওমরাতুল কাযা বা গত বছর যে ওমরা পালন থেকে মুসলমানদের বিরত রাখা হয়েছিল, এবার মহানবী (সা) মুসলমানদের সে ওমরা পালনের জন্য মক্কায় যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। মহানবী (সা)-এর এই ঘোষণায় মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। তারা অত্যন্ত খুশি মনে মক্কায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিলেন মুহাজির। বিগত কয়েক বছর থেকে তাঁরা নিজেদের জন্মভূমি পবিত্র মক্কা নগরীতে যেতে পারছেন না। জন্মভূমির মাটি আর মানুষকে দেখার জন্য তাঁরা অধীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। গত বছর ওমরা পালনের জন্য মক্কায় গিয়েও তাঁদের ফিরে আসতে হয়েছে। ফলে গত বছর ওমরা পালনের জন্য যেখানে চৌদ্দশ' মুসলমান মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছিলেন এবার তা বৃদ্ধি পেয়ে দু'হাজারে পৌঁছায়।

হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য কোন মুসলমান একটি তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে নেননি। অবশ্য মহানবী (সা) মক্কাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে উদ্বেগ ছিলেন। এজন্য সতর্কতা হিসাবে তিনি মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার অধিনায়কত্বে এক শ' মুসলমানের একটি দল আগেই মক্কায় পাঠিয়ে দেন। তাঁদের নিষেধ করে দেয়া হয় তাঁরা যেন মক্কার হেরেমে প্রবেশ না করেন। হেরেমের অদূরে মার্বায় যাহরানে তাঁদের শিবির স্থাপন করার নির্দেশ দেয়া হয়।

মদীনা থেকে রওয়ানা দেয়ার সময় মুসলমানদের সাথে ষাটটি কোরবানীর পশু ছিল। সাইয়েদুল মুরসালীন আমাদের প্রিয়নবী (সা) তাঁর 'কাস্ওয়া' নামক উটে আরোহণ করে কাফেলার আগে আগে চলেছেন। কী এক মনোরম অভূতপূর্ব দৃশ্য! কাফেলার প্রতিটি লোক পবিত্র মক্কা নগরীর যিয়ারত ও কা'বাঘর তাওয়াফের আনন্দে আত্মহারা ছিলেন। মুহাজিরদের অবস্থা ছিল ভাষায় বর্ণনাতিত। তাঁরা যে জনপদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই সফরে তা দেখার তাঁদের ভাগ্য হবে। যে শহরের প্রাচীরের ছায়ায় তাঁরা শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন, এ সফরের মাধ্যমে তাঁরা সে সব প্রাচীর স্পর্শ করার সুযোগ লাভ করবেন। শহরের অলিগলিতে ঘোরাফেরা করবেন। যে সব বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনদের সাথে জীবনের একটা বিরাট অংশ অতিবাহিত করেছেন, এবার তাদের সঙ্গে সাক্ষাত হবে। কুশল বিনিময় হবে। মাতৃভূমির আবহাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে প্রশান্তি লাভ করবেন। যে পবিত্র ভূমিতে মহানবী (সা)-এর আবির্ভাব হয়েছে, যেখানে আল্লাহ্র প্রথম ওহী নাযিল হয়েছে এবার তাঁরা তা প্রত্যক্ষ করবেন। এর চাইতে আনন্দের বিষয় তাঁদের নিকট আর কী হতে পারে!

দু'হাজার মুসলমানের এই কাফেলা অত্যন্ত আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে চলছিলেন। তাঁদের দেহমানে খুশির ফোয়ারা বয়ে চলছিল। তাঁরা মনে মনে কল্পনা করছিলেন, মক্কায় পদার্পণ করেই অতীতের স্মৃতিচারণ করবেন। মক্কা থেকে নির্বাসিত হওয়ার সময় যেসব বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে গিয়েছিলেন, যারা ইতিমধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের আলোচনা করবেন। আল্লাহর পথে হিজরতের সময় যেসব মাল-সামানা ফেলে রেখে গিয়েছিলেন, সে সবার লুটপাটের কাহিনীও তাঁরা আত্মীয়-স্বজনের মুখে শুনবেন। তাঁদের কল্পনায় এদিকটিও ভেসে উঠছিল যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান বা গভীর আস্থা তাঁদের জীবনে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। এই ঈমানই তাঁদের মানব জাতির জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা কেন্দ্র পবিত্র কা'বায় যিয়ারতে নিয়ে এসেছে। তাঁরা এক অপরাজেয় শক্তি হিসেবে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ঘর দর্শনে এসেছেন। এই সঙ্গে তাঁরা ভুলতে পারছিলেন না, কয়েক বছর পর্যন্ত এই পবিত্র ঘর যিয়ারত থেকে তাঁদের বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। কিন্তু আজ তাঁরা পরম আনন্দে অভিভূত। কিছুক্ষণ পরই তাঁরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করবেন।

কুরাইশদের মক্কা ত্যাগ

কুরাইশরা জানতে পারে, মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীরা কা'বায় যিয়ারতের জন্য আসছেন। এ খবর পেয়েই তারা হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী মক্কা থেকে বেরিয়ে আসে। তারা শহরের বাইরে বিভিন্ন পর্বতচূড়ায় তাঁবু টানিয়ে আশ্রয় নেয়। কেউ কেউ বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার অনেকে আবু কোবায়েস ও হীরা পর্বতের পাদদেশে শিবির স্থাপন করে। মক্কার এসব বাসিন্দা উঁচু জায়গা থেকে মুসলমানদের আগমন প্রত্যক্ষ করছিল। তারা দেখছিল, এই সেদিন যে ব্যক্তিকে মক্কা থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল, আজ তিনি কীরূপ শান-শওকতের সাথে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করছেন। মহানবী (সা) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মক্কার উত্তর দিক দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। তাঁর উট কাসওয়ার লাগাম ছিল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার হাতে। তিনি উটের লাগাম ধরে পদব্রজে আগে আগে চলছিলেন। এ ছাড়া অনেক সাহাবী পদব্রজে, আবার কেউ কেউ যানবাহনে চড়ে মহানবী (সা)-কে ঘেরাও করে এগিয়ে চলছিলেন। পবিত্র কা'বায় দৃষ্টিগোচর হতেই মুসলমানরা সবাই এক বাক্যে 'লাক্বাইক', 'লাক্বাইক' তালবিয়া পড়া শুরু করেন। তাঁদের মন-মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিবেদিত ছিল। তাঁদের অন্তর ছিল আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরপুর। মহানবী (সা) যিনি তাঁদের মহান প্রতিপালকের পথ প্রদর্শন করেছেন, সত্য ধর্মের সন্ধান দিয়েছেন, তাঁরা তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত ছিলেন। ইতিহাসে এরূপ অভূতপূর্ব দৃশ্য দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাষণ্ড হৃদয়ের মুশরিক ও ইসলামের চরম শত্রুরাও এই দৃশ্য দেখে অনেকটা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তাদের চোখ খুলে যায়। 'লাক্বাইক, লাক্বাইক' বা 'আমি উপস্থিত', 'আমি উপস্থিত' গগনবিদারী ধ্বনি কাফেরদের কর্ণকুহর ভেদ করে অন্তর স্পর্শ করে। তারা এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে পড়ে।

মহানবী (সা)-এর কাসওয়া কা'বায়ের দরজায় এসে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন। তিনি ইহরামের চাদরের এক দিক ডান বাহুর নিচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধে রাখেন। এরপর বলেন, اللهم ارحم امراً اراهم اليوم من نفسه

“হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি শত্রুর সামনে সসম্মানে এসেছে, তুমি তার প্রতি দয়া কর।” তিনি ‘রোকনে ইয়ামনী’ স্পর্শ করেন (হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন)। এরপর কা’বাঘর সাতবার তাওয়াফ করেন। প্রথম তিনবার তাওয়াফ করেন দ্রুত এবং পরের চারবার স্বাভাবিক গতিতে প্রদক্ষিণ করেন। মহানবী (সা)-এর দুই হাজার সাহাবীও তাঁকে অনুসরণ করেন। কুরাইশ আবু কোবায়েস পাহাড় থেকে এই দৃশ্য দেখছিল আর বিস্মিত হচ্ছিল। তারা কিছুক্ষণ আগে পরস্পর মন্তব্য করছিল, “(হযরত) মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।” কিন্তু তাওয়াফে মুসলমানদের দ্রুতগতি দেখে তাদের এই ধারণার অপনোদন ঘটে।

মহানবী (সা)-এর উটচালক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) আবেগাপ্লুত হয়ে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী কবিতা আবৃত্তি শুরু করেন। হযরত ওমর (রা) তাঁকে এরূপ উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কবিতা আবৃত্তি করতে বারণ করেন। মহানবী (সা) শুনে বলেন, “হে ইবনে রাওয়াহা! এ ধরনের কবিতা আবৃত্তি করো না। এসবের পরিবর্তে বল, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনিই তাঁর বান্দা (রাসূলকে) সাহায্য করেছেন। তাঁর বাহিনীকে সম্মান দান করেছেন। পরিখার যুদ্ধে আরব বাহিনীকে পরাজিত ও অপমানিত করেছেন।” হযরত ইবনে রাওয়াহার সাথে অন্য মুসলমানরাও এসব বাক্য আবৃত্তি করেন। তাঁদের আবৃত্তি ধ্বনিতে মক্কার পাহাড়-পর্বত, আকাশ-বাতাস নিনাদিত হয়ে ওঠে। পাহাড়ে আশ্রয়গ্রহণকারী মুশরিকদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

মক্কায় তিন দিন

মহানবী (সা) ও তাঁর সাথীরা কা’বাঘর তাওয়াফের পর সাফা পাহাড়ে যান। সাফা ও মারওয়া সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। এরপর মারওয়া পাহাড়ের নিকট কোরবানী করে শির মুণ্ডন করেন। এসব আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তাঁরা ওমরা দ্রুত পালন সম্পন্ন করেন।

দ্বিতীয় দিন মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীরা কা’বাঘরে উপস্থিত হন। তখন কা’বাঘরে প্রতিমা ছিল। তা সত্ত্বেও হযরত বিলাল (রা) কা’বাঘরের ছাদে উঠে আযান দেন। মহানবী (সা) তাঁর দুই হাজার সাহাবী নিয়ে যোহরের নামায আদায় করেন। বিগত সাত বছর এই কা’বাঘরে ইবাদত করা থেকেই মুসলমানদের বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মহানবী (সা) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মক্কায় তিন দিন অবস্থান করেন। এ সময় কুরাইশরা মক্কার আশে-পাশের পাহাড়-পর্বতে অবস্থান করতে থাকে। মুসলমানরা শহরের অলিগলিতে যথেষ্টভাবে ঘোরাফেরা করেন। কেউ তাঁদের বাধা দেয়নি। মুহাজিররা তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর দেখতে যাওয়ার সময় আনসারদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। শহরে তাঁদের চলাফেরা দেখে মনে হতো আনসাররাও এ শহরেরই বাসিন্দা। মুসলমানদের প্রত্যেকের চালচলন ছিল ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাঁরা নামায আদায় করছিলেন। এই নামাযের মাধ্যমে তাঁদের মনের সব গর্ব-অহমিকা দূর হচ্ছিল। তাঁদের স্বাস্থ্যবানরা দুর্বলদের সহায়তা করছিলেন। বিত্তবানরা বিত্তহীনদের সাহায্য করছিলেন। মহানবী (সা) একজন দয়ালু পিতার ন্যায় তাদের মাঝে চলাফেরা করছিলেন। কারো সাথে স্থিত হাস্যে কথা বলছিলেন। আবার কারো সাথে কৌতুক করছিলেন। সে কৌতুকও বাস্তব বিবর্জিত ছিল না। কুরাইশরা পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। সত্যি এ ছিল ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব বিস্ময়কর দৃশ্য।

তারা দেখছিল মুসলমানরা মদ্যপান করছেন না। কোন দূষণীয় কাজও করছেন না। পানাহারের কোন বস্তুই তাঁদের প্রতারণিত করছে না। কোন প্রকার ঝগড়া-ফাসাদও তাঁদের প্রভাবিত করছে না। তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার কোন নির্দেশ অমান্য করছে না। বরং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনের জন্য তাঁরা সব সময় সচেতন থাকতেন। বস্তুত তাঁদের চলাফেরায় মানবতার শ্রেষ্ঠতম মূল্যবোধের এক জীবন্ত দৃশ্য ফুটে উঠছিল। আর এই দৃশ্য কি প্রত্যক্ষকারীদের মধ্যে কোনই রেখাপাত করছিল না? অবশ্যই করেছিল। এই ঘটনার মাত্র কয়েক মাস পর মহানবী (সা) দশ হাজার মুসলমান নিয়ে পবিত্র মক্কা নগরী জয় করেন।

মহানবী (সা)-এর সাথে হযরত মায়মুনার বিবাহ

মহানবী (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাসের স্ত্রী হযরত উম্মে ফযল তাঁর বোন হযরত মায়মুনা (রা)-এর অভিভাবিকা ছিলেন। তাঁকে বিয়ে দেয়ার পূর্ণ অধিকার ছিল হযরত উম্মে ফযলের। এ সময় হযরত মায়মুনার বয়স ছিল ছাব্বিশ বছর। তিনি ছিলেন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের খালা। হযরত উম্মে ফযল বোনকে বিয়ে দেয়ার তাঁর অধিকার স্বামী হযরত আব্বাসের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। ওমরাতুল কাযা আদায়কালে মুসলমানদের চালচলন দেখে হযরত মায়মুনা (রা) ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। হযরত আব্বাস (রা) হযরত মায়মুনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মহানবী (সা)-কে অবহিত করেন। এই সঙ্গে তিনি শ্যালিকা হযরত মায়মুনাকে বিয়ে করার জন্য মহানবী (সা)-কে অনুরোধ করেন। তিনি হযরত আব্বাসের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনি চার শ' দেহরহাম মোহরানার বিনিময়ে হযরত মায়মুনাকে বিয়ে করেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুসলমানদের মক্কায় অবস্থানের সময় তিন দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মহানবী (সা) হযরত মায়মুনা (রা)-এর ওলীমা করার জন্য কুরাইশদের নিকট মক্কায় আরো কিছু সময় থাকার অনুমতি চাওয়ার মনস্থ করলেন। কুরাইশ প্রতিনিধি সোহায়েল ইবনে আমর এবং হোয়ায়তিব ইবনে আবদুল ওয়্যা এসে মহানবী (সা)-কে বলল, 'সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আপনার মক্কায় অবস্থানের সময় শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি আমাদের শহর খালি করে দিন। আপনার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে যান।' মহানবী (সা) বললেন, "আমি মায়মুনার ওলীমা বা বৈবাহিক ভোজ করার ইচ্ছা করেছি। আশা করি আপনারাও তাতে যোগদান করবেন।" সোহায়েল বলল, "আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যান। আপনার নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করব না।"

ওমরা পালনকালে মুসলমানদের চাল-চলন মক্কাবাসীদের মধ্যে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাতে তাদের ক্ষোভ অনেকটা প্রশমিত হয়ে পড়েছিল। মহানবী (সা) এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদের দাওয়াতে যোগদান করিয়ে পরস্পরকে আরো নিকটে আনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কুরাইশ প্রতিনিধিদের একগুঁয়েমিতে তা আর সম্ভব হলো না।

মুসলমানদের মদীনা রওয়ানা

মহানবী (সা) হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কুরাইশ প্রতিনিধিদের মক্কা ত্যাগের দাবির ব্যাপারে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেননি। তিনি মুসলমানদের রওয়ানা

দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। যেরূপ শান-শওকতের সাথে তিনি সাহাবীদের নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, অনুরূপভাবেই প্রত্যাগমন করেন। দুই হাজার সাহাবী দল বেঁধে এগিয়ে চলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মায়মুনাকে নিয়ে আসার দায়িত্ব ক্রীতদাস আবু রাফের উপর ন্যস্ত করেন। প্রথম রাত যাপন করেন 'সারিফ' নামক স্থানে। এই স্থানটি মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা ছিলেন মহানবী (সা)-এর সর্বশেষ স্ত্রী। তিনি মহানবী (সা)-এর ইত্তিকালের পর পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। ইত্তিকালের পূর্বে তিনি তাঁকে 'সারিফে' দাফন করার জন্য ওসীয়াত করে যান। তাঁর ওসীয়াত অনুযায়ী তাঁকে সারিফে দাফন করা হয়।

মহানবী (সা) মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রা) দুই বোনকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তাঁদের একজন ছিলেন হযরত সালমা (রা)। তিনি ছিলেন মহানবী (সা)-এর চাচা হযরত হামযা (রা)-এর স্ত্রী। অন্যজন হযরত আন্নারাহ্ তখনো অবিবাহিতা ছিলেন।

মুসলমানরা মদীনায়ে এসে পৌঁছান। এখানে তাঁরা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে থাকেন। ওমরাতুল কাযা পালনকালে কুরাইশ ও অন্যান্য মক্কাবাসীর অন্তরে নতুন ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে যে প্রভাব পড়েছিল, মহানবী (সা) এ ব্যাপারে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতেই এর ফলশ্রুতি দেখা যাবে।

খালিদ ইবনে ওয়ালীদের ইসলাম গ্রহণ

'ওমরাতুল কাযা' পালনের পরবর্তী ঘটনাবলি প্রমাণ করল, মহানবী (সা)-এর ধারণা সঠিক ছিল। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ছিলেন কুরাইশদের শ্রেষ্ঠতম বীর। উহুদ প্রান্তরে তিনি যুদ্ধের গতিই পাল্টে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা) ওমরাতুল কাযা পালন করে মদীনায়ে পৌঁছার কিছুদিন পরই খালিদ ইবনে ওয়ালীদ কুরাইশদের এক সমাবেশে ঘোষণা করলেন : "প্রত্যেক জ্ঞানীর নিকট এ সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, (হযরত) মুহাম্মদ (সা) কবি কিংবা জাদুকর নন। তাঁর বাণী বিশ্ব প্রতিপালকেরই ওহী। তাঁকে অনুসরণ করা প্রতিটি লোকের একান্ত কর্তব্য।" সে সমাবেশে ইকরামা ইবনে আবু জেহেলও ছিল। সে হযরত খালিদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলল, "তুমি তারকাপূজারীদের ধর্ম গ্রহণ করেছ।" হযরত খালিদ (রা) বললেন, "আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি।" ইকরামা বলল, "তোমার মুখ দিয়ে এরূপ কথা বের হবে কুরাইশরা তা আশা করেনি।" হযরত খালিদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কুরাইশদের এরূপ ধারণার পিছনে কী কারণ রয়েছে। ইকরামা বলল, "(হযরত) মুহাম্মদ (সা) তোমার পিতা ওয়ালীদকে হত্যা করিয়েছেন। তোমার চাচা ও চাচাত ভাই মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে। আমি যদি তোমার স্থানে হতাম, তা'হলে ইসলাম গ্রহণ করতাম না। এমনকি এ ধরনের কথাও বলতাম না।" হযরত খালিদ বললেন, "এসব হচ্ছে অজ্ঞতার সময়ের ব্যাপার। এখন আমার নিকট সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।"

হযরত খালিদ (রা) মহানবী (সা)-এর নিকট তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পাঠান এবং এই সঙ্গে কয়েকটি ঘোড়া উপহার হিসেবে প্রেরণ করেন। আবু সুফিয়ান হযরত খালিদের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে তাঁকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন, "তোমার সম্পর্কে যে

গুজব শোনা যাচ্ছে, তা সত্য কিনা।” হযরত খালিদ বললেন, “আপনি যা শুনেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য।” আবু সুফিয়ান ত্রুদ্বন্ধরে লাত ও ওয়্যার শপথ করে বললেন, “তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তা’হলে (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর আগে তোমার সাথেই বোঝাপড়া করে নেব।” হযরত খালিদ বললেন, “মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। কারো পছন্দ হোক বা না হোক তাতে আমার কিছু আসে যায় না।” একথা শুনে আবু সুফিয়ান হযরত খালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঘটনাক্রমে সেখানে ইকরামা ইবনে আবু জেহেলও উপস্থিত ছিলেন। সে আবু সুফিয়ানকে বারণ করে বলল, “হে আবু সুফিয়ান! আপনি যে ব্যাপারে ভয় করছেন আমিও সে ব্যাপারে শংকিত। নতুবা খালিদের মতো আমিও বলতাম এবং তার ধর্ম গ্রহণ করতাম। আমি আশংকা করছি, আগামী এক বছরের মধ্যে মক্কার সব অধিবাসী খালিদের মতাদর্শ গ্রহণ করে ফেলবে।” এ ঘটনার পর হযরত খালিদ (রা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায়ে চলে যান এবং মুসলমানদের সাথে যোগদান করেন।

আমর ইবনে আস ও ওসমান ইবনে তালহার ইসলাম গ্রহণ

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদদের পর হযরত আমর ইবনে আস ও হযরত ওসমান ইবনে তালহা (রা)-ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার আরো অনেকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করেন। তাতে করে অল্প কিছুদিনের মধ্যে মক্কায়ে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আশ্রাণীত বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতির আলোকে পরিকার প্রতিভাত হচ্ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে মক্কার দ্বার চিরদিনের তরে মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

মুতার যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর বিশেষ কোন তাড়াহুড়া ছিল না। কারণ তিনি জানতেন, পরিস্থিতি দিন দিন তাঁর অনুকূলে আসবে। তা'ছাড়া তখনো হোদায়বিয়ার সন্ধির এক বছরের বেশি অতিবাহিত হয়নি। আর এ সময় চুক্তিভঙ্গের মতো কোন ঘটনাও ঘটেনি। মহানবী (সা) প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কথা কিংবা কাজ কোনটির মাধ্যমেই তিনি প্রতিশ্রুতির খেলাফ করতেন না। 'ওমরাতুল কাযা' পালন শেষে মদীনায় ফিরে এসে তিনি কয়েক মাস মদীনায় অবস্থান করেন। এ সময় বিরোধীদের সাথে মুসলমানদের ছোটখাটো সংঘর্ষ হতো।

মহানবী (সা) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বনু সুলায়ম গোত্রে পঞ্চাশ জন সাহাবীর একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। এই গোত্রের লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে একজন ছাড়া মুসলমানদের সবাইকে হত্যা করে। ঘটনাক্রমে তিনি নিজের জীবন রক্ষা করে কোন প্রকারে মদীনায় ফিরে আসতে সক্ষম হন। মহানবী (সা)-এর দরবারে পৌঁছে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা খুলে বলেন। মহানবী (সা) বনী সুলায়ম গোত্রের মোকাবেলা করার জন্য অপর একদল মুসলমান পাঠান। এই অভিযানে মুসলমানরা জয়লাভ করেন। তাঁরা গনীমতের সম্পদ নিয়ে মদীনা ফিরে আসেন। এ ছাড়া মুররা গোত্র মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাদের শায়েস্তা করার জন্যও একদল মুসলমান পাঠান হয়। মহানবী (সা) পনের জন মুসলমানের একটি দল সিরীয় সীমান্তে যাতুত তালহা নামক স্থানে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেখানকার লোকেরা মুসলমানদের দলপতি ছাড়া সবাইকে হত্যা করে।

হোদায়বিয়ার সন্ধি ও ইয়ামনের শাসনকর্তার ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা) দক্ষিণ দিক সম্পর্কে অনেকটা শংকামুক্ত হন। এবার তিনি মদীনার উত্তর দিকে সিরিয়া ও আশপাশের বিভিন্ন আরব গোত্রে ইসলাম প্রচারের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন। ওমরাতুল কাযা পালন শেষে মদীনায় ফেরার কয়েক মাসের মধ্যে দু'টি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। একটি ছিল যাতুত তালহায় মুসলমানদের হত্যার ঘটনা। অপর ঘটনাটি ঘটে বুসরায়। সে সময় মহানবী (সা) বুসরায় রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস কিংবা তাঁর মনোনীত প্রাদেশিক শাসনকর্তা শোরাহ্বিল ইবনে আমর গাস্‌সানীর নিকট হযরত হারেছ ইবনে উমায়ের (রা)-কে ইসলামের বাণী সহকারে প্রেরণ করেন। শোরাহ্বিল মহানবী (সা)-এর দূতকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেন। এরূপ পরিস্থিতিতে বুসরার শাসনকর্তা এবং যাতুত তালহার মুশরিকদের উপর উপরোক্ত দুটি হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে পড়ে। মহানবী (সা) তিন হাজার মুসলিম সৈন্য নিহত মুসলমানদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করেন। তাঁদের প্রতিপক্ষে ছিল

একলাখ সৈন্য। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল দুই লাখ। বর্তমান সিরিয়ার মুতা নামক স্থানে এই যুদ্ধ হয়।

মুতার যুদ্ধ

হোদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে প্রথমে ‘ওমরাতুল কাযা’ এবং তারপর মক্কা বিজয়ের পথ সুগম হয়। অনুরূপ মুতার যুদ্ধের মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর জীবিতাবস্থায় তাবুকের যুদ্ধ এবং তাঁর ইত্তিকালের পর সিরিয়া বিজয়ের পথ সুগম হয়। মুতার যুদ্ধের একাধিক পটভূমি বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ বলেন, বুসরার শাসক শোরাহবিল মহানবী (সা)-এর দূত হারেস ইবনে উমায়েরকে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিম বাহিনী পাঠান। আবার কেউ বলেন, যাতুত তালহার বিধর্মীরা চৌদ্দজন মুসলিম ধর্ম প্রচারককে নির্মমভাবে হত্যা করে। মহানবী (সা) এই হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মুসলমানদের প্রেরণ করেন। এই দুই কারণের যেটাই হোক, মহানবী (সা) মুতার অভিযানের জন্য তিন হাজার সৈন্য তৈরি করেন। অষ্টম হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে (৬২৯ খৃষ্টাব্দে) তিনি তাঁদের হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার অধিনায়কত্বে প্রেরণ করেন। যাওয়ার সময় তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, যায়েদ শাহাদাত বরণ করলে তোমাদের অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করবে জা‘ফর ইবনে আবী তালিব। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) স্বেচ্ছায় এই বাহিনীতে যোগদান করেন। রণাঙ্গনে বীরত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি নিজের অগাধ আস্থা প্রমাণের জন্য হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ এরূপ একটি সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন।

এই বাহিনী অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে পাঠান হয়। মহানবী (সা) তাঁদের বিদায় দেয়ার জন্য শহরের বাইরে ছানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত আসেন। এখানে পৌঁছে তিনি সৈন্যদের সতর্ক করে বলেন, “তোমরা নারী, শিশু ও অন্ধদের হত্যা করবে না। কোন বাসস্থান ধ্বংস করবে না। এমনকি কোন বৃক্ষও কাটবে না।” এখান থেকে রওয়ানা দেয়ার পূর্বাঙ্কে মহানবী (সা) ও সকল মুসলমান মিলে দোয়া করেন। সৈন্যবাহিনীকে বিদায় দেয়ার সময় মহানবী (সা)-এর সর্বশেষ কথাগুলো ছিল, “আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের সাহায্য করুন। বিপদ-আপদ থেকে তোমাদের নিরাপদ রাখুন এবং নিরাপদে ফিরে আসার তাওফীক দান করুন।”

মহানবী (সা)-এর রণকৌশল ছিল অতর্কিতে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। তাতে শত্রুরা বিব্রত হয়ে পড়ত। মুতায় অভিযানকারী বাহিনীর অধিনায়কও ভাবছিলেন, তিনি সিরীয়দের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাবেন। এই পদ্ধতিতে তাঁরা বিজয় ও গনীমতের সম্পদ উভয়ই লাভ করতে পারবেন। এই পরিকল্পনা করে তাঁরা সিরিয়ার মাআন নামক স্থানে এসে পৌঁছান। সামনে কিরূপ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন, একথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি।

যুদ্ধের প্রস্তুতি

মুসলিম বাহিনীর গতিবিধি রোমানরা আগেই টের পেয়ে যায়। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে সিরিয়ার শাসক ছিলেন শোরাহবিল। তিনি মুসলিম বাহিনীর অভিযানের খবর পেয়েই আশেপাশের গোত্রগুলোকে জড়ো করেন। অপরদিকে হিরাক্লিয়াসের নিকট সংবাদ

পাঠান। রোমান সম্রাট কয়েক কোম্পানী গ্রীক ও অপর সৈন্য সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দেন। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, হিরাক্লিয়াস নিজেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন। তাঁর সাথে এক লাখ রোমান সৈন্য ছাড়াও বনী লাখাম, বনী জুয়াম, বনী এলকীন, বাহুরা বালিয়া গোত্রের একলাখ সৈন্য ছিল। হিরাক্লিয়াস বাল্লাকা এলাকার ‘মায়াব’ নামক স্থানে এসে শিবির স্থাপন করেন। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হিরাক্লিয়াস নিজে সৈন্যবাহিনীর সাথে ছিলেন না। এই বিশাল বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন সম্রাটের সহোদর ভাই থিওডর।

মুসলিম বাহিনী মায়ানে পৌঁছেই শত্রুপক্ষের অগণিত সৈন্য সমাবেশের কথা জানতে পারেন। এখানে তাঁরা দুইরাত অবস্থান করেন। এ সময় তাঁরা চিন্তা-ভাবনা করেন, কিভাবে এত বড় বাহিনীর মোকাবেলা করবেন। মুসলিম বাহিনীর একজন প্রস্তাব করেন, এ ব্যাপারে মহানবী (সা)-কে অবহিত করা হোক। তিনি হয় সাহায্য পাঠাবেন, নতুবা যা নির্দেশ করেন তাই পালন করা হবে। মুসলমানরা এই প্রস্তাবই মেনে নিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা উঠে দাঁড়ান। বীরত্ব ও বাগ্মিতায় তিনি ছিলেন বিরল ব্যক্তিত্ব। তিনি সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ-কঠোর বলেন, “বন্ধুগণ! বিস্ময়কর ব্যাপার! আপনারা শাহাদাত বরণের মহান ব্রত নিয়ে এখানে এসেছেন। আর এখন শাহাদাতের সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। বন্ধুগণ! যুদ্ধোপকরণ, শক্তি কিংবা সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে আমরা শত্রুর মোকাবেলা করি না। আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত ধর্ম বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে আমরা শত্রুর মোকাবেলা করে থাকি। আর এই ধর্মবিশ্বাসের জন্যই আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সারা বিশ্বে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন।”

এই বলিষ্ঠভাষী কবির ভাষণ মুসলিম বাহিনীতে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সবাই একবাক্যে বলে উঠে, “আল্লাহর শপথ! ইবনে রাওয়াহা যথার্থ বলেছেন।” এরপর মুসলিম বাহিনী সামনে অগ্রসর হন। তাঁরা বাল্লাকা সীমান্তে পৌঁছে দেখেন, মোশারেফ জনপদের অদূরে হিরাক্লিয়াসের রোমান ও আরব সৈন্যরা শিবির স্থাপন করেছে। মুসলমানরা মোশারেফের তুলনায় মুতা নামক স্থানটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করেন। তাঁরা মুতায় অবস্থান গ্রহণ করেন। এরপরই উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। হিরাক্লিয়াসের ছিল এক কিংবা দুই লাখ সৈন্য। আর মুসলমানরা ছিলেন মাত্র তিন হাজার।

যায়েদ ইবনে হারেসার শাহাদাত

ঈমানের সীমাহীন প্রেরণা আর শক্তির পরিমাপ করা সত্যি এক কঠিন ব্যাপার। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা) মহানবী (সা)-এর দেয়া ঝাণ্ডা হাতে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ নেই। কিন্তু তিনি জানতেন এখানে যে মৃত্যু হবে, তা মৃত্যু নয়, আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায় শাহাদাতবরণ। আর শাহাদাতের মর্যাদা বিজয়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। হযরত যায়েদ (রা) জীবন হাতে নিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে থাকেন। শত্রুর তীরের আঘাতে আঘাতে তাঁর পবিত্র দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তাঁর শাহাদাতের পর হযরত জা‘ফর ইবনে আবু তালিব (রা) পতাকা ধারণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র তেত্রিশ বছর। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ও বীরপুরুষ ছিলেন।

জা'ফর ইবনে আবু তালেবের শাহাদাত

হযরত জা'ফর (রা) পতাকা হাতে যুদ্ধ করে চলেছেন। অবশেষে রোমান বাহিনী তাঁর ঘোড়া ঘিরে ফেলে। এই পরিস্থিতি দেখে হযরত জা'ফর (রা) ঘোড়া থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়েন। তিনি নিজের ঘোড়ার পা কেটে ফেলেন। এরপর এক হাতে পতাকা আর অপর হাতে তরবারি নিয়ে শত্রু ব্যূহে ঢুকে কচুকাটা শুরু করেন। পতাকা ছিল তাঁর ডান হাতে। শত্রুরা তাঁর ডান হাতটি কেটে ফেলে। এবার তিনি বাঁ হাত দ্বারা পতাকা উঁচু রাখেন। তাঁর বাঁ হাতটিও কেটে ফেলা হয়। তিনি দুই বাহু দ্বারা পতাকা আঁকড়ে থাকেন। এভাবেও তাঁর পক্ষে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হয় না। তিনি শাহাদাত বরণ করেন। শত্রুরা তাঁর দেহ দুই টুকরো করে ফেলে।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদাত

হযরত জা'ফর (রা)-এর শাহাদাতের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এগিয়ে যান। তিনি মুসলিম বাহিনীর পতাকা উঁচিয়ে ধরেন। অশ্বারোহী হযরত আবদুল্লাহ (রা) শত্রু বাহিনীর দিকে এগিয়ে যান। ঘোড়া থেকে নামার সময় তিনি কি যেন একটা বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। মুহূর্তে তিনি নিজেকে সামলে নেন। নিচের কবিতার চরণ দুটো আবৃত্তি করে শত্রু-বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

اقسمت يانفس لتنزله * لتزلن او لتكرهه

ان اجلب الناس ود والرنة * مالى اراك تكرهين الجنة

“আমি শপথ করছি! হে আমার আত্মা! তুমি পছন্দ কর আর নাই কর, তোমাকে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এটা কি করে হতে পারে, বন্ধুরা আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে যাবে। আর তুমি বেহেশতে প্রবেশ পছন্দ করবে না।”

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা মুখে কবিতার উপরোক্ত চরণ দুটো আবৃত্তি করছিলেন আর হাতে অস্ত্র-চালনা করছিলেন। তাঁর তরবারির অব্যর্থ আঘাতে শত্রুসৈন্য ধরাশায়ী হচ্ছিল। এক পর্যায়ে তিনিও শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত য়ায়েদ, জা'ফর এবং ইবনে রাওয়াহা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে একই রণাঙ্গনে শাহাদাত বরণ করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ মহানবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছায়। হযরত য়ায়েদ ও জা'ফরের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করে মহানবী (সা) বললেন, “স্বপ্নে আমাকে এই তিন সিপাহসালারকে সোনার পালংকে আরামরত অবস্থায় দেখান হয়েছে। তবে ইবনে রাওয়াহার পালংকটি একদিকে একটু হেলান ছিল।” মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এরূপ কেন হলো। নবী করীম (সা) বললেন, য়ায়েদ ও জা'ফর বিনাধ্বিধায় রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর সামনে এগিয়ে যায়।”

মহানবী (সা)-এর উপরোক্ত বাণীতে পাঠকদের জন্য উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। একটু চিন্তা করলে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, মহানবী (সা)-এর উপরোক্ত বাণীর সারকথা

হলো, আল্লাহ তা'আলার পথে মৃত্যুকে ভয় করা উচিত নয়। যে বিষয় মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবে এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও দেশের কল্যাণ নিহিত থাকবে তা অর্জনের জন্য বিনা দ্বিধায় জীবনপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ পথের সকল বাধা-বিপত্তি জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও অপসারণের চেষ্টা করবে। এ সংগ্রামে জয়ী হলে মনে করতে হবে, আল্লাহ তা'আলা কিংবা দেশ ও জাতির দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে। আর শাহাদাত-বরণ করলেও ভবিষ্যত বংশধরদের নিকট দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। শাহাদাত বরণের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকা জীবিত থাকার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ মর্যাদার পরিচয় বহন করে। বস্তুত আল্লাহর পথে কিংবা দেশ-মাতৃকার কল্যাণে জীবন দেয়ার তুলনায় বেঁচে থাকার কোনই মূল্য নেই। মানুষের সবচেয়ে নিন্দনীয় দিক হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহবানে জিহাদে জীবনদান থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি। এ ধরনের লোকেরা মৃত্যুর ভয়ে এরূপ সন্ত্রস্ত থাকে যে, তাদের এই অবস্থা মৃত্যুর চেয়েও দুর্বিশ্বাস।

অপরদিকে লক্ষ্য করুন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাঁর এই আত্মবিসর্জনে মুহূর্তের জন্য হলেও কিছুটা ইতস্তত ছিল। কিন্তু হযরত যায়েদ ও হযরত জা'ফর (রা)-এর শাহাদাত বরণে এই ইতস্তত ছিল না। আর এজন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁদের মর্যাদায়ও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) শেষোক্ত দু'জনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদা লাভ করেন। এই সামান্য ইতস্তত বা ভাবনার দরুন যদি মর্যাদায় এরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তাহলে যারা পার্থিব শান-শওকত ও জীবনের অন্যান্য বিলাসিতায় মোহগ্রস্ত হয়ে সব সময় পিছপা হতে থাকে, তাদের অবস্থা কিরূপ হবে। পৃথিবীতে তারা যতই মর্যাদাবান হোক না, এমনকি কারুনের সমতুল্য ধন-সম্পদের অধিকারী হোক না, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাদের মর্যাদা পোকা-মাকড়ের চেয়েও তুচ্ছ। বস্তুত মানুষের জন্য সবচেয়ে মর্যাদা ও আনন্দের বিষয় হলো, সে যা সত্য ও ন্যায় মনে করবে, তা প্রতিষ্ঠার জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধা করবে না। এমনকি এজন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও ইতস্তত করবে না।

খালিদ ইবনে ওয়ালীদেদের সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের পর হযরত সাবিত ইবনে আরকাম মুসলিম বাহিনীর পতাকা তুলে ধরেন। তিনি ছিলেন আজলান গোত্রের লোক। পতাকা হাতে নিয়েই তিনি মুসলিম বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “হে মুসলমানগণ! কাউকে তোমাদের সেনাপতি নির্বাচন করে নাও।” শ্রোতারা বললেন, “আপনিই এই দায়িত্ব গ্রহণ করুন।” হযরত সাবিত বললেন, “আমার মধ্যে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা নেই।” এরপর সবাই হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে সেনাপতি মনোনীত করেন। হযরত খালিদ (রা) দেখলেন, মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাঁদের মনোবল ভেঙে পড়েছে। এই পরিস্থিতি দেখে তিনি কালবিলম্ব না করে মুসলিম বাহিনীর পতাকা হাতে তুলে নেন। মুসলমানদের সংখ্যান্বতা ও শক্তির ভারসাম্যহীনতা হযরত খালিদেদের অজানা ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি। রণাঙ্গনের পরিবেশ পরিমাপ করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তিনি দ্রুত সৈন্যবাহিনীর পুনর্বিন্যাস করেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাধারণ দু'চারটা আক্রমণ চালিয়ে তিনি রণাঙ্গনে

টিকে থাকেন। রাতের অন্ধকার নেমে আসার পর উভয় পক্ষ পরদিন সকাল পর্যন্ত যুদ্ধ মূলতবি রাখেন। রাতে হযরত খালিদ (রা) এক অভিনব রণকৌশল অবলম্বন করেন। তিনি মুসলিম সৈন্যবাহিনীর একটা বিরাট অংশকে রণাঙ্গন থেকে একটু দূরে সরিয়ে ফেলেন। ভোর হওয়ার সাথে সাথে তারা তকবীর ধ্বনি দিতে দিতে রণাঙ্গনে এসে মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হন। শত্রুপক্ষ মনে করে, “রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিম বাহিনীর সাহায্যে নতুন সৈন্য পাঠিয়েছেন। তারা হতাশ হয়ে পড়ে। তারা ভাবে, গতকাল মুসলমানদের মাত্র তিন হাজার সৈন্য কিরূপ বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করেছে। আমাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে। আজ তারা নতুন জনশক্তিতে বলীয়ান হয়ে রণাঙ্গনে এসেছে। আজ হয়তো আমাদের পরাজয় বরণ করতে হতে পারে।” কিন্তু হযরত খালিদের রণচাতুর্য রোমানদের কেউই বুঝতে পারেনি। তারা ঘাবড়ে যায়। তারা মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে এক পাও সামনে এগুবার সাহস করেনি। তারা রণাঙ্গনে নিজস্ব অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। মুসলমানরা দেখলেন, শত্রুপক্ষ সামনে এগিয়ে আসছে না। এই পরিস্থিতিতে তাঁরাও নিজেদের মান-মর্যাদা নিয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা দেন। এই যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করেননি, কিন্তু রোমানরাও বিজয়ীর গৌরব নিয়ে ফিরে যেতে পারেনি।

হযরত খালিদ (রা) মুসলিম বাহিনী নিয়ে মদীনায় পৌঁছান। মহানবী (সা) ও অন্যান্য মুসলমানরা মুতায় অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের সাথে সাক্ষাত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী হযরত জা'ফরের কিশোর ছেলে আবদুল্লাহকে বাসা থেকে ডেকে এনে কোলে উঠিয়ে নেন। কিছু সংখ্যক ভাবাবেগপ্রবণ মুসলমান মুতার যোদ্ধাদের দিকে ধূলি ছিটিয়ে বলতে শুরু করেন, ‘হে পলাতকগণ! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থেকে পালিয়ে এসেছ!’ মহানবী (সা) একথা শুনে বললেন, “তারা পলাতক নয়, খোদা চাহে তো পুনরায় তারা অভিযান চালাবে।” মহানবী (সা)-এর তরফ থেকে আশ্বাসবাণী প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও এক শ্রেণীর মুসলমান মনে করতেন, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তারা বিরাট অপরাধ করেছে। এমনকি হযরত সালামা ইবনে হিশাম এই বিদ্বেষের ভয়ে মসজিদে আসা বন্ধ করে দেন। মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ, বিশেষ করে তাঁদের সেনাপতি হযরত খালিদ (রা) যদি পরবর্তীতে নিজের অসাধারণ বীরত্ব ও রণকৌশলের পরিচয় না দিতেন, তা'হলে চিরদিন তাঁদের এই বদনামের বোঝা বহন করতে হতো। তাঁদের এই ভীর্ণতা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত।

শহীদদের আত্মীয়দের শোক

হযরত যায়েদ (রা) ও হযরত জা'ফর (রা)-এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে মহানবী (সা) অত্যন্ত মর্মান্বিত হন। তিনি হযরত জা'ফরের বাসায় যান। এ সময় তাঁর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রা) আটা ছানছিলেন। ছেলে-মেয়েদের গোসল করিয়ে মাথায় তেল দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন। মহানবী (সা) হযরত জা'ফরের ছেলে-মেয়েদের আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তাঁর দুই চোখ বেয়ে পানি পড়ছিল। হযরত আসমা (রা) রাসূলের এই অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন। মহানবী (সা)-এর খেদমতে আরম্ভ করেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনি কাঁদছেন কেন। জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে কি কোন সংবাদ পেয়েছেন?” মহানবী (সা) বললেন, “হ্যাঁ পেয়েছি। তাঁরা

শাহাদাত বরণ করেছেন।” একথা বলার সাথে সাথে মহানবী (সা)-এর পবিত্র চোখ থেকে আরো বেশি পানি পড়তে লাগল। হযরত আসমা (রা) কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাঁর কান্নাধ্বনি শুনে আশেপাশের মহিলারাও এসে জড়ো হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখান থেকে নিজের বাসায় ফিরে আসলেন। তিনি পরিবারের লোকদের বললেন, “জা’ফর শাহাদাত বরণ করেছে। তার পরিবার কান্নাকাটি করছে। তাদের জন্য খাবার তৈরি করো।”

ইতিমধ্যে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা)-এর মেয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। সে মহানবী (সা)-এর বাহুতে হাত রেখে কাঁদতে থাকে। মুতার যুদ্ধে শহীদদের জন্য মহানবী (সা)-এর কান্নাকাটি দেখে কোন কোন সাহাবী বিস্মিত হন। মহানবী (সা) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, “তাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে। এ তো বন্ধুদের বিরহ-বেদনার অভিব্যক্তি মাত্র।”

একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত জা’ফরের লাশ মদীনায় নিয়ে আসা হয়েছিল। হযরত খালিদ (রা) ও অন্যান্য মুসলমান ফিরে আসার তিনদিন পর হযরত জা’ফরের লাশ দাফন করা হয়। এবার মহানবী (সা) মানুষকে কান্নাকাটি বন্ধ করতে বলেন। তিনি বলেন, “জা’ফরকে তার দুই বাহুর পরিবর্তে দুটো পাখা বিশিষ্ট বাহু দান করা হয়েছে। এই পাখার সাহায্যে সে বেহেশতে উড়ে বেড়ায়।”

যাতুস্ সালাসিল অভিযান

মুতার যুদ্ধ থেকে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদের প্রত্যাবর্তনের কয়েক সপ্তাহ পর মহানবী (সা) উত্তরাঞ্চলে মুসলিম প্রভাব বিস্তারের জন্য নতুন করে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি হযরত আমর ইবনে আস (রা)-কে মুষ্টিমেয় কিছু সৈন্যসহ সেদিকে পাঠিয়ে দেন। যাওয়ার সময় তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেন, পথ থেকে আরবদের সঙ্গে নিয়ে যাবে। হযরত আমর ইবনে আসের মামার বাড়ি ছিল সে এলাকায়। মহানবী (সা)-এর আশা ছিল, আত্মীয় সম্পর্কের জন্য সে এলাকার বাসিন্দারা আমর ইবনে আস তথা মুসলিম বাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে যাবে। কিন্তু জুযাম নামক স্থানে ‘সালসাল’ কূপের নিকট পৌঁছে হযরত আমর ইবনে আস (রা) ঘাবড়ে যান। তিনি সাহায্যের জন্য মহানবী (সা)-এর খেদমতে দূত পাঠান। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু উবায়দার নেতৃত্বে একদল মুহাজির মুসলিম সৈন্য পাঠিয়ে দেন। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের মতো শীর্ষস্থানীয় সাহাবারাও এই সাহায্যকারী বাহিনীতে ছিলেন। হযরত আমর ইবনে আস মাত্র কিছু দিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। অপরদিকে হযরত আবু উবায়দা (রা) ছিলেন প্রথম হিজরতকারী মুসলমানদের একজন। এজন্য মহানবী (সা)-এর আশংকা ছিল তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। রওয়ানা দেয়ার সময় তিনি হযরত আবু উবায়দা (রা)-কে বলেছিলেন, “কোন প্রকার মতবিরোধিতা করো না।” মহানবী (সা)-এর আশংকাই সঠিক প্রমাণিত হলো। সাহায্যকারী সৈন্যবাহিনী নিয়ে হযরত আমর ইবনে আসের নিকট পৌঁছলে তিনি হযরত আবু উবায়দাকে বললেন, “আপনি আমাদের সাহায্য করার জন্য এসেছেন। মূল বাহিনীর সেনাপতি আমি।” হযরত আবু উবায়দা (রা) অত্যন্ত কোমলহৃদয় ও ধৈর্যশীল লোক ছিলেন। কোন প্রকার পদমর্যাদার প্রতিও তাঁর আসক্তি ছিল না। তিনি হযরত আমর ইবনে আসকে বললেন, “মহানবী (সা) আমাদের উভয়কে মতবিরোধিতা করতে বারণ

১. এই পাখার জন্যই হযরত জা’ফর (রা) ‘তাইয়ার’ বা ‘উড়নেওয়ালা’ উপাধি লাভ করেন। -অনুবাদক

করেছেন। আপনি আমার অনুগত থাকতে রাজী না হলে আমি আপনার অনুগত থাকার জন্য প্রস্তুত আছি।” নামাযেও হযরত আমর ইবনে আসই ইমামতি করেন। এরপর মুসলিম বাহিনী নিয়ে সামনে এগিয়ে যান। সিরীয় বাহিনী মুসলমানদের অগ্রাভিযান দেখে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। সিরীয়দের এভাবে পালিয়ে যাওয়া দেখে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ সময়ে মহানবী (সা) মক্কা ও মক্কাবাসীদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। কিন্তু তিনি হোদায়বিয়ার চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিলেন। অর্থাৎ চুক্তিতে উল্লিখিত দুই বছর সময় শেষ হওয়ার জন্য তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন। এ সময় কোন গোত্র মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিলে তিনি তাদের দমন করতেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি ছোট ছোট মুসলিম বাহিনী পাঠিয়ে দিতেন। এরূপ অভিযানে তাঁকে কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। এই দিনগুলোতে আশেপাশের বিভিন্ন গোত্র স্বেচ্ছায় মদীনায়ে এসে মহানবী (সা)-এর প্রতি নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করত। এ সময়ে হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটে। আর এই ঘটনাই মক্কা বিজয়ের ভূমিকার রূপ লাভ করে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই মহানবী (সা) মক্কা বিজয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাতে করে এই পবিত্র নগরী চিরদিনের জন্য মুসলমানদের পবিত্রতম স্থানে পরিণত হয়।

মক্কা বিজয়

মুতার যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী হযরত খালিদ (রা)-এর নেতৃত্বে মদীনা ফিরে আসে। তাঁদের এই অভিযান বিজয় কিংবা পরাজয় কোনটাই বলা চলে না। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদরা সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাঁরা নিরাপদে মদীনা ফিরে আসতে পেরেছেন। অপরদিকে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা, হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালিব ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদাত বরণের পর অবশিষ্ট মুসলিম বাহিনীর মদীনা প্রত্যাবর্তন বিভিন্ন মহলের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই ঘটনা রোমানরা মূল্যায়ন করে এক দৃষ্টিকোণ থেকে; মদীনার মুসলমানরা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। আবার কুরাইশ ও অন্যান্য আরব মূল্যায়ন করে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

যুদ্ধের চূড়ান্ত ফায়সালা ছাড়াই রণাঙ্গন থেকে মুসলিম বাহিনী চলে যাওয়ায় রোমানরা অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করে। অথচ তারা ছিল এক লাখ, মতান্তরে দুই লাখ। অপরদিকে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। এই স্বস্তি বোধ করার কারণ হলো, তারা দেখেছে, মুসলিম বাহিনীর চতুর্থ অধিনায়ক হযরত খালিদ (রা) শত্রু বাহিনীর পরিবেষ্টন ছিন্ন করার জন্য একের পর এক নয়টি তরবারি ব্যবহার করেছেন। একটি তরবারি ভেঙে গেলে তিনি সেটি ছুঁড়ে ফেলে আর একটি নিয়েছেন। অপরদিকে যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন হযরত খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীকে দ্বিধাবিভক্ত করে রোমানদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করেছেন যে, মুসলমানদের সাহায্যে মদীনা থেকে নতুন সৈন্য এসে গেছে। এই যুদ্ধে মুসলমানদের অসাধারণ বীরত্ব দেখে সিরীয় সীমান্তে বসবাসকারী আরব গোত্রগুলো বিস্মিত হয়ে পড়ে। এসব আরব গোত্রের এক সরদার কারওয়া ইবনে আমর জুযামী ছিলেন রোমান বাহিনীর একটি অংশের অধিনায়ক। তিনি মুসলিম বাহিনীর শৌর্যবীর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে তাকে খেফতার করা হয়। অবশ্য পুনরায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণের শর্তে হিরাক্লিয়াস তাকে পূর্বপদে বহাল করার জন্য সম্মত ছিলেন। কিন্তু হযরত কারওয়া এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ইসলাম ধর্মে অটল থাকেন। তাঁকে শহীদ করা হয়। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে ইরাক ও সিরীয় সীমান্তে অবস্থিত এবং রোমান শাসিত নজদ এলাকার বিভিন্ন গোত্রে ইসলামের প্রসার ঘটে।

আরবের উত্তরাংশে ইসলামের প্রসার

পূর্ব-রোম বা বাইজেন্টাইনের রাজনৈতিক বিশৃংখলাও সে এলাকায় ইসলামের প্রচার-প্রসারে অনেকটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। রোমান সাম্রাজ্যের প্রশাসনযন্ত্রের দুর্নীতিতে সে অঞ্চলের অধিবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব-রোমে

হিরাক্লিয়াসের শাসনাধীন আরবরা ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। সে সময় সীমান্ত এলাকার অনেক আরব মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রোমান বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করেছিল। একবার সৈন্যবাহিনীর রসদ বন্টনকারী রোমান কর্মকর্তা ঘোষণা করল, “সম্রাট নিয়মিত বাহিনীর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং স্বেচ্ছাসেবকরা সৈন্যবাহিনী থেকে বেরিয়ে যাও। কারণ ফালতু কুকুরদের খাবার সরবরাহ করা সম্রাটের পক্ষে সম্ভব নয়।” একজন সরকারী কর্মকর্তার মুখে এ ধরনের অশালীন কথা শুনে আরব স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা রোমান সৈন্যবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসে। সম্ভবত এই বেরিয়ে আসাটাই সে এলাকার আরবদের জন্য শাপে বর হয়। নতুন ধর্মের আলো তাদের আকৃষ্ট করে। তারা সত্য পথের দিশা পায়। তাতে করে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের গৌরব লাভ করে। ইতিহাসে দেখা যায়, সে সময়ই সীমান্তবর্তী আরবদের কয়েকটি গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভাগ্য পরিবর্তন করে। এসব গোত্রের মধ্যে রয়েছে বনী সোলায়েম। তাদের সরদার আব্বাস ইবনে মিরদাস সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। গোত্রের অন্য লোকেরাও তাঁকে অনুসরণ করে। আশজা, বনী গাতফান, বনী আবস, বনী যুবইয়ান ও বনী ফাযারা গোত্রও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় নিজেদের স্থান করে নেয়। ইহুদীদের বন্ধু গোত্র ছিল বনী গাতফান। তাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে খায়বরে বসবাসকারী ইহুদীদের মধ্যে বিষাদের পাহাড় ভেঙে পড়ে। বস্তুত মুতার যুদ্ধ আরবের উত্তর প্রান্তে সিরিয়া পর্যন্ত মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়। এই যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের শক্তিও বেশ বৃদ্ধি পায়।

মদীনায় বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে মুতার যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল রোমান ও অন্যদের চাইতে ভিন্ন ধরনের। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে রোমান বাহিনীকে পরাজিত না করে মদীনায় ফিরে আসতে দেখে তাঁরা প্রকাশ্যে বলতে শুরু করেন, “হে পলায়নকারীগণ! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ থেকে পালিয়ে এসেছ।” মদীনার মুসলমানদের এসব উক্তি শুনে মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কিছুসংখ্যক বীর মুজাহিদও অত্যন্ত লজ্জাবোধ করেন। তাঁরা যুবক ও বয়োকনিষ্ঠদের এসব তিরস্কার বাক্য যাতে না শুনতে হয়, তার জন্য নিজেদের বাড়িঘর থেকে বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেন।

কুরাইশদের মধ্যে মুতার যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এই যে, তারা ভাবল, রোমানদের সাথে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করেছে। সুতরাং মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তিরও অবসান হয়েছে। এখন কেউ আর তাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করবে না। তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিরও কোন প্রকার গুরুত্ব দিবে না। একরূপ পরিস্থিতিতে কুরাইশদেরও ওমরাতুল কাযা, এমনকি হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাওয়া উচিত। মুসলমান ও তাদের বন্ধু গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার। কারণ এ সময় হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর বন্ধু গোত্রগুলো কোন প্রকার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার সাহস পাবেন না।

হোদায়বিয়ার সন্ধি লংঘন

হোদায়বিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল, আরবের বিভিন্ন গোত্র কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে যে-কোন পক্ষের সাথে মিত্রচুক্তি করতে পারবে। এ ব্যাপারে কোন পক্ষ প্রতিবন্ধকতা

সৃষ্টি করবে না। এই শর্ত অনুসারে বনু খোযাআ গোত্র মহানবী (সা)-এর সাথে মিত্র চুক্তি সম্পাদন করে। আর বনু বকররা করে কুরাইশদের সাথে। বনু খোযাআ ও বনু বকরদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে শত্রুতা চলে আসছিল। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর এই বিরোধ অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। গোত্র দুটির মধ্যে কিছুটা সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু মুতার যুদ্ধের পর আবার পূর্বাবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কুরাইশদের মতো বনু বকররাও মনে করে যে, এই যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করেছে। এই ধারণার ফলে তাদের মধ্যে বনু খোযাআদের প্রতি পুরনো বিদ্বেষ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা মনে করে, বনু খোযাআদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। কুরাইশদের মধ্য থেকে ইকরামা ইবনে আবু জেহেলও এ ব্যাপারে বনু বকরদের প্ররোচিত করে। কোন কোন কুরাইশ নেতা তাদের অস্ত্র সাহায্য করে। একরাতে বনু খোযাআদের অনেক লোক ওয়াতির নামক একটি কূপের তীরে ঘুমিয়েছিল। বনু বকরদের শাখা গোত্র বনু দায়ল ঘুমন্ত বনু খোযাআদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। তাতে তাদের কয়েক ব্যক্তি নিহত হয়। খোযাআ গোত্রের অন্যরা মক্কায় পালিয়ে গিয়ে বোদায়েল ইবনে ওয়ারকার ঘরে আশ্রয় নেয়। তারা বোদায়েলের নিকট অভিযোগ করে, কুরাইশ ও বনু বকররা মহানবী (সা)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

নবী করীম (সা)-এর নিকট খোযাআদের সাহায্য প্রার্থনা

বনু খোযাআ গোত্রের সরদার আমর ইবনে সালিম দ্রুত মদীনায়ে পৌঁছান। রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে নববীতে সাহাবীদের মাঝখানে বসা ছিলেন। তিনি বনু বকরদের বিশ্বাসঘাতকতা ও হামলার বিবরণ দেয়ার পর মহানবী (সা)-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহানবী (সা) বললেন, “হে ওমর! তোমাদের সাহায্য করা হবে।” এরপর বোদায়েল ইবনে ওয়ারকা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মদীনা পৌঁছেন। তিনি বনু বকরকে কুরাইশদের আপন সাহায্যের কথা উল্লেখ করেন। অবশেষে মহানবী (সা) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কুরাইশদের পক্ষ থেকে হোদায়বিয়ার সন্ধি লংঘনের ক্ষতিপূরণ মক্কা বিজয় ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা) আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় এই মর্মে সংবাদ পাঠান যে, “মুসলমানদের প্রত্যেকে যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় এবং পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে।” কিন্তু আক্রমণের লক্ষ্য তিনি কারো নিকট প্রকাশ করেননি।

কুরাইশ নেতাদের ভয়

এই ঘটনার কয়েকদিন পর মক্কায়ে কুরাইশ নেতারা অনুভব করে যে, ইকরামা ও তার সাথীরা মারাত্মক ভুল করেছে। তাদের এই আচরণ কুরাইশদের নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলেছে। কারণ এরই মধ্যে মহানবী (সা)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি সারা আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দিক চিন্তা করেও কুরাইশ নেতারা অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়েছিল। এখন কি করা যায়, এ নিয়ে তারা মহাভাবনায় পড়ে। শীর্ষস্থানীয় কুরাইশরা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, আবু সুফিয়ানকে একটি প্রতিনিধি দলসহ মদীনায়ে পাঠানো হোক। তিনি হোদায়বিয়ার সন্ধির দুই বছর মেয়াদকালকে দশ বছরে বাড়িয়ে আনতে পারবেন। আবু সুফিয়ান মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা দিয়ে উসফান নামক স্থানে পৌঁছে। সেখানে বোদায়েল ইবনে ওয়ারকা ও তার সাথীদের সাথে আবু সুফিয়ানের

সাক্ষাৎ হয়। তিনি সন্দেহ করেন, বোদায়েল বোধ হয় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে আসছে। যদি তাই হয়, তবে নিশ্চয়ই তিনি মক্কার পুরো ঘটনা রাসূলুল্লাহকে অবহিত করে এসেছেন। তাঁর এই কাজ সমস্যাটি আরো জটিল করে তুলেছে। তিনি বোদায়েলকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। বোদায়েল মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের কথা অস্বীকার করেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান বোদায়েলের উটের মল পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন যে, তিনি মদীনা থেকেই এসেছেন।

মদীনায় আবু সুফিয়ান

আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌঁছে সরাসরি মহানবী (সা)-এর সাথে আলোচনার আগে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে প্রথমে পরিস্থিতি জানার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে প্রথম তিনি নিজের কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা)-এর ঘরে যান। কুরাইশদের ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর মনোভাব হযরত উম্মে হাবীবা (রা)-এর নিকট অস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) কি পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, হযরত উম্মে হাবীবা তা জানতেন না। তিনি তাঁর পিতাকে আসতে দেখে মহানবী (সা)-এর বিছানাটি গুটিয়ে ফেলেন। আবু সুফিয়ান বললেন, “এটি কি তোমার পিতার যোগ্য নয়, না তোমার পিতা এই বিছানায় বসার যোগ্য নয়?” হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বললেন, “এটা মহানবী (সা)-এর পবিত্র বিছানা। আপনি অপবিত্র মুশরিক। এতে আপনার বসা আমি পছন্দ করি না।” একথা শুনে আবু সুফিয়ান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, “আমি তোমার এই আচরণের প্রতিশোধ অবশ্যই নেব।” তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে হযরত উম্মে হাবীবা (রা)-এর কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি সরাসরি মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সন্ধির সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) আবু সুফিয়ানের এই আবেদনের কোন জবাব প্রদান করেননি। আবু সুফিয়ান সেখান থেকে হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট যান এবং তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি অস্বীকার করেন। এবার তিনি হযরত ওমরের নিকট যান। তিনি আবু সুফিয়ানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, “আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করব? তোমাদের সাথে যুদ্ধ করায় যদি সামান্যতম কল্যাণও নিহিত থাকে, তাহলেও আমি তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে এতটুকু দ্বিধা করব না।” এবার আবু সুফিয়ান হযরত আলী (রা)-এর শরণাপন্ন হন। এ সময় হযরত ফাতেমাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবু সুফিয়ান হযরত আলীর নিকট সব ঘটনা খুলে বললেন। তিনি মহানবী (সা)-এর নিকট হযরত আলীকে সুপারিশ করার অনুরোধ করলেন। হযরত আলী (রা) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আবু সুফিয়ানকে বুঝিয়ে বললেন, “রাসূলুল্লাহ (সা) কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কেউ তাঁকে বারণ করতে পারে না।” এরপর কুরাইশ প্রতিনিধি আবু সুফিয়ান হযরত ফাতেমাকে অনুরোধ করেন, তাহলে আমাকে হামান ইবনে আলীর নিরাপত্তা লাভের সুযোগ দেয়া হোক। হযরত ফাতেমা (রা) বললেন, “রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন লোক কাউকে আশ্রয় বা নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে না।” পরিস্থিতি আবু সুফিয়ানের জন্য অত্যন্ত কঠিন রূপ পরিগ্রহ করে। এরূপ অবস্থায় হযরত আলী (রা) তাকে পরামর্শ দিলেন, “এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ আমি তোমার জন্য দেখছি না। তবে তুমি একটা কাজ করতে পার এবং এটাও যে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে

তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তবু তোমাকে এই পথই গ্রহণ করতে হবে। তুমি বনু কেনানা গোত্রের সরদার। মদীনার কোন প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা কর, 'হোদায়বিয়ার সন্ধি বলবৎ রইল।' এরপর তুমি দ্রুত দেশে ফিরে যাও।"

আবু সুফিয়ান মসজিদে যান। সেখানে দাঁড়িয়ে নিজ থেকে ঘোষণা করেন, "হোদায়বিয়ার সন্ধি বলবৎ রইল।" এরপর তিনি দ্রুত নিজের সওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কার দিকে রওয়ানা দেন। কিন্তু নিজের কন্যা ও অন্য মুহাজিররা তাঁর সাথে যে ব্যবহার করেন, তাতে তিনি নিজেকে অত্যন্ত অপমান বোধ করেন। অথচ এসব লোকই হিজরতের আগে মক্কায় তাঁর অনুগ্রহ প্রত্যাশী ছিলেন।

আবু সুফিয়ান মক্কায় পৌঁছে কুরাইশদের নিকট বিস্তারিত ঘটনা খুলে বলেন। এরপর তিনি হযরত আলী (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে হোদায়বিয়ার সন্ধি বলবৎ ও মেয়াদ বাড়ানোর একতরফা ঘোষণার কথা উল্লেখ করেন। একথা শুনে তাঁর স্বগোত্রীয়রা বলে, "তুমি বুঝতে পারনি। আলী তোমার সাথে বিদ্রূপ করেছে।" এরপর শীর্ষস্থানীয় কুরাইশরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য পরামর্শ বৈঠকে বসে যায়।

মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি

মক্কা বিজয়ের ব্যাপারে মহানবী (সা) নিজের শক্তি-সামর্থ্য ও আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের প্রতি পুরোপুরি আস্থাশীল ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে কুরাইশদের মোকাবেলা করার মতো প্রস্তুতি নেয়ার সময়-সুযোগ দেয়া সঙ্গত মনে করেননি। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যথাসম্ভব দ্রুত হানা দিতে হবে যাতে কুরাইশরা সংঘর্ষ ছাড়াই অস্ত্র সংবরণ করতে বাধ্য হয়। প্রথমে তিনি মুসলমানদের শুধু জিহাদের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ঘোষণা করেন, মক্কায় অভিযান চালাতে হবে। হে মুসলমানগণ! দ্রুত সামনে এগিয়ে চল। এরপর মহানবী (সা) আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ করেন, মুসলমানদের এই অভিযানের আগাম সংবাদ যেন মক্কাবাসী জানতে না পারে।

হাতিব ইবনে আবী বালতআর চিঠি

মুসলমানরা মক্কা অভিযানে রওয়ানা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এ সময় হযরত হাতিব ইবনে আবী বালতআ (রা) এই খবর জানিয়ে কুরাইশদের নিকট এক পত্র লেখেন। তিনি গোপনে মক্কায় পৌঁছানোর জন্য চিঠিটি সারাহ নামের এক বাঁদীর নিকট হস্তান্তর করেন। সারাহ ছিল আবদুল মুত্তালিব গোত্রের কোন এক ব্যক্তির ক্রীতদাসী। হযরত হাতিব এই কাজের জন্য উক্ত বাঁদীর পারিশ্রমিকও নির্ধারণ করে দেন। হযরত হাতিব (রা) ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান। কিন্তু মানুষের মধ্যে কিছু দুর্বল দিকও রয়েছে। এসব দুর্বল দিক মানুষকে কোন কোন অযাচিত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে। একজন মানুষ হিসাবে হযরত হাতিবও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। মহানবী (সা) এ খবর জানতে পারেন। তিনি হযরত আলী (রা) ও হযরত যোবায়ের (রা)-কে সারাহর পশ্চাদ্ধাবন করার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের বলেন, "দ্রুত গিয়ে সারাহর নিকট থেকে একটি চিঠি উদ্ধার কর।" তাঁরা সারাহকে আটক করে তার মাল-সামান তন্ন তন্ন করে তাল্লাশ করেন। কিন্তু চিঠিটির কোন সন্ধান করতে

পারেননি। হযরত আলী (রা) সারাহকে ধমক দিয়ে বলেন, চিঠিটি যদি আমাদের নিকট হস্তান্তর না কর, আমরা তোমার পরার কাপড় খুলে চিঠিটি বের করতে বাধ্য হবো। সে ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। হযরত আলী (রা)-কে মুখ ফিরানো মাত্র সে মাথার চুলের ভিতর থেকে চিঠিটি বের করে দেয়।

হযরত আলী (রা) অন্যদিকে মুখ ফিরানোর অনুরোধ করে। হযরত আলী ও হযরত যোবায়ের (রা) চিঠিটি নিয়ে মদীনায়ে পৌছেন। মহানবী (সা) হযরত হাতিবকে ডেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, “হে আল্লাহ্ রাসূল! আমি আল্লাহ্ তা‘আলার শপথ করে বলছি, আল্লাহ্ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলের উপর আমার ঈমান যেমন ছিল তেমনি আছে। তাতে এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। এরপর উপরোক্ত কাজ করার পিছনে একটা কারণ ছিল। তা হলো, আমার সন্তান-সন্ততিরা এখনো মক্কায় বিধর্মীদের মধ্যে পরিবেষ্টিত আছে। সেখানে তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো আমার কোন আত্মীয়-স্বজনও নেই। উপরোক্ত তথ্য পাচারের মাধ্যমে আমি আমার সন্তান-সন্ততিদের প্রতি কুরাইশদের সহানুভূতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম।” হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) আবেদন করলেন, “হে আল্লাহ্ রাসূল! হাতিব মোনাফেক হয়ে গেছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার ঘাড় উড়িয়ে দেব।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “হে ওমর! হাতিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আর আল্লাহ্ তা‘আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।” এ ঘটনা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত নাযিল হয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ .

“হে মু‘মিনগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তোমরা তো ওদের সাথে বন্ধুত্ব করছ, যদিও ওরা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে।” (৬০ : ১)

মুসলিম বাহিনীর মক্কা রওয়ানা

মুসলিম বাহিনী মক্কা বিজয়ের লক্ষ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হয়। তাঁদের এই অভিযানের লক্ষ্য শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র পবিত্র কা‘বাঘরকে সবার যিয়ারতের জন্য অব্যাহত করা। মদীনার অধিবাসীরা এত বিপুল সংখ্যক সৈন্যবাহিনীর অভিযান পূর্বে আর কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। এই বাহিনীতে মুহাজির ও আনসার ছাড়াও ছিল বনু সূলায়েম, বনু মুযায়না ও বনু গাতফান গোত্রের বিপুলসংখ্যক লোক। তাদের ছাড়া অন্যান্য গোত্রেরও অনেক লোক ছিল। চমকানো বর্ম পরা জনসমুদ্রের পদভারে সারা মরু প্রান্তরে এক অভূত দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। এই বিশাল জনসমুদ্র বালুকাময় মরুর যেখানে তাঁবু ফেলত, দর্শকরা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। এভাবে হাজার হাজার বীর মুসলিম অব্যাহত গতিতে মক্কার দিকে এগিয়ে চলছিলেন। যতই সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আশেপাশের মুসলমানরাও এই বাহিনীতে যোগদান করছিলেন। এক্রূপে প্রতি পদে পদে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা বেড়ে চলছিল। তাঁদের সবার মনে দৃঢ় প্রত্যয়

ছিল, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া তাঁদের আর কেউ পরাভূত করতে পারবে না। এই বিশাল বাহিনীর সামনে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি বাহনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা যেন বিনা রক্তপাতে মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশের সুযোগ দান করেন! মুসলিম বাহিনী মক্কা থেকে (এক মনযিল দূরে) মাররায্‌যাহরান নামক স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করে। এ সময় তাঁদের সংখ্যা দশ হাজারে পৌঁছায়। এই বিরাট মুসলিম বাহিনীর আগমন সম্পর্কে কুরাইশদের কোনই খবর ছিল না। এমন কি (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর শত্রুতা দমন করা সম্পর্কে তখনো তারা কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছিল না।

বনু হাশিমের ইসলাম গ্রহণ

মহানবী (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা) কুরাইশদের উপরোক্ত মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ফেলে রেখে নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েন। তিনি (মক্কা থেকে ৮৩ মাইল দূরে) জুহফা (নামক) স্থানে এসে মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সম্ভবত বনু হাশিম গোত্রের লোকেরা কোন-না-কোন প্রকারে মুসলিম বাহিনীর গতিবিধি জানতে পারেন। এ জন্য বিরোধীদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগেই তারা মহানবী (সা)-এর নিকট নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছা নিজেদের জন্য শ্রেয় মনে করেন। হযরত আব্বাস ছাড়া মহানবী (সা)-এর চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান এবং ফুফাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া ইবনে মুগীরাও মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েন। মুসলিম বাহিনী নায়কুল উকাব নামক স্থানে এসে শিবির স্থাপন করেন। আবু সুফিয়ান ও আবদুল্লাহ এখানে পৌঁছে মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের সাক্ষাৎদানে অসম্মতি প্রকাশ করেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) তাদের ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর দরবারে সুপারিশ করেন। মহানবী (সা) বললেন, “আমার তাদের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ আমার চাচাত ভাই মক্কায় আমাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে। ফুফাত ভাই আমার সম্পর্কে অনেক অশালীন মন্তব্য করেছে।” আবু সুফিয়ান মহানবী (সা)-এর এ কথা শুনে বললেন, “রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবশ্যই সাক্ষাৎ দান করতে হবে। নতুবা আমার সন্তানদের হাত ধরে আমি দিগন্তহীন মরুপ্রান্তরে বেরিয়ে পড়ব। সেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর হয়ে আত্মহুতি দেব।” আবু সুফিয়ানের এ কথা শুনে

হযরত আব্বাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে। একদল জীবন চরিতবিদ বলেছেন, হযরত আব্বাস (রা) রাবিগ নামক স্থানে মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের স্থান ‘জুহফা’ কিংবা রাবিগ যেখানেই হোক না কেন, তাদের মতে হযরত আব্বাস এই সাক্ষাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। অপর একদলের মতে হযরত আব্বাস (রা) মক্কা বিজয়ের আগে মদীনায় চলে যান এবং সেখানে ইসলাম গ্রহণের পর এই বাহিনীর সাথে মক্কায় আসেন। দ্বিতীয় দলের অভিমত প্রত্যাখ্যানকারীরা বলেন, এই অভিমতটি আব্বাসীয় খলীফাদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। দ্বিতীয় দলের জীবন চরিতবিদরা তাদের অভিমতের সমর্থনে আরো বলে থাকেন, হযরত আব্বাস মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণের আর একটি প্রমাণ হল, হিজরতের পূর্বেই তিনি মক্কার খবরাখবর মহানবীকে সরবরাহ করতেন। নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সূদের কারবার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকায় সে সময় তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেননি। কিন্তু এই অভিমতের বিরোধীরা বলেন, যদি মেনে নেয়া হয় যে, হযরত আব্বাস মক্কা বিজয়ের আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাহলে হোদায়বিয়ার সন্ধি সম্প্রসারণের জন্য অবশ্যই তিনি মদীনায় আসতেন। -গ্রন্থকার

মহানবী (সা) নমনীয় হয়ে পড়েন। তিনি তাদের সাক্ষাতের অনুমতিদান করেন। তাঁরা মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব

হযরত আব্বাস (রা) তাঁর ভাতিজার বিশাল বাহিনী ও অসীম শক্তি দেখে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি অবশ্য ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণের গৌরব লাভ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি এ জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, এই বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করার মত কোন শক্তি আরবে নেই। এই বাহিনী মক্কা আক্রমণ করলে সেখানকার অধিবাসীদের যে কি দুর্বিষহ অবস্থা হবে, তা কল্পনাও করা যায় না। কিছুক্ষণ আগে হযরত আব্বাস মক্কা থেকে আসেন। তখনো তাঁর পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা মক্কায়েই অবস্থান করছিল। হযরত আব্বাস (রা) তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। তিনি নিজের মনের আশংকা প্রকাশ করতে গিয়ে মহানবী (সা)-কে বললেন, “কুরাইশরা আপনার নিকট শান্তি ও নিরাপত্তার আবেদন জানালে আপনি কি ভূমিকা গ্রহণ করবেন। সম্ভবত মহানবী (সা) হযরত আব্বাসের এই আপোসমূলক কথা অপছন্দ করেননি। মহানবী (সা) তাঁর দূত হিসাবে হযরত আব্বাসকে কুরাইশদের নিকট পাঠানোর মনস্থ করেন। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে কুরাইশদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করা এবং বিনা রক্তপাতে মক্কায়ে প্রবেশ করা। সম্ভবত মক্কা নগরীর পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে মহানবী (সা) এই ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। হযরত আব্বাস (রা) মহানবী (সা)-এর শ্বেত খচ্চরে আরোহণ করে মক্কার দিকে রওয়ানা হন এবং তিনি আরাক পর্যন্ত পৌঁছান। তিনি অপেক্ষা করছিলেন কোন কাঠুরিয়া, গোয়ালা কিংবা অন্য কোন লোক মক্কার দিকে যায় কিনা। তিনি এ ধরনের কোন লোকের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনী ও তার শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে মক্কাবাসীদের অবহিত করতে চাইছিলেন। তাঁর এই সংবাদ পৌঁছানোর উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) শক্তিবলে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশের আগেই যেন মক্কার অধিবাসীরা নিজেরাই মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিরাপত্তার আবেদন জানায়।

আবু সুফিয়ানের গোয়েন্দাগিরি

মুসলমানরা মাররাযযাহরান নামক স্থানে পৌঁছান। এদিকে কুরাইশরা অনুভব করছিল, তাদের বিপদ ঘনিষে এসেছে। তাই তারা পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও খবর সংগ্রহের জন্য তিন ব্যক্তিকে মক্কার বাইরে পাঠান। তারা হলো--আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, বোদায়েল ইবনে ওয়ারকা ও হযরত খাদীজা (রা)-এর আত্মীয় হাকিম ইবনে হাযাম। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্বাস (রা) মহানবী (সা)-এর সাদা খচ্চরে আরোহণ করে তাঁর দূত হিসাবে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলেন। এক স্থানে হযরত আব্বাস (রা) আবু সুফিয়ান ও বোদায়েলের কথোপকথন শুনতে পান। তাঁরা বলছিলেন :

আবু সুফিয়ান : আমি কোন রাতেই এরূপ উজ্জ্বল অগ্নিশিখা আর এত বিরাট বাহিনী দেখতে পাইনি।

বোদায়েল : আল্লাহর শপথ ! এরা বনী খোযাআর লোক-লশকর। যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এসেছে।

আবু সুফিয়ান : না, এই বাহিনী বনী খোযাআদের হতে পারে না। তারা ক্ষুদ্র ও নিচ সম্প্রদায়। তাদের এত শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোথায়।

হযরত আব্বাস আবু সুফিয়ানের কণ্ঠস্বর চিনে ফেলেন। আবু সুফিয়ানের উপনাম ছিল আবু হান্‌যালা। আব্বাস তাকে এই নামে ডাকেন। আবু সুফিয়ানও সাড়া দেয়ার সময় হযরত আব্বাসের ডাক নাম 'আবুল ফযল' ব্যবহার করেন। হযরত আব্বাস (রা) বলেন, “হে আবু সুফিয়ান! তোমার অমঙ্গল হোক! এটা মুসলিম বাহিনী। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের মাঝে রয়েছেন। এই বাহিনী শক্তিবলে মক্কায় প্রবেশ করলে কুরাইশদের উপর মহা প্রলয় নেমে আসবে।” আবু সুফিয়ান বললেন, “আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক! এখন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।” হযরত আব্বাস (রা) তাঁর খচ্চরের পেছনে বসিয়ে আবু সুফিয়ানকে মুসলিম বাহিনীর ভিতর নিয়ে গেলেন। তাঁর অপর দুজন সঙ্গীকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। মুসলমানরা মহানবী (সা)-এর খচ্চরটি দেখেই চিনে ফেলেন। তারা সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য রাস্তা ছেড়ে দিলেন। হযরত আব্বাস (রা) ও আবু সুফিয়ান দশ হাজার মুসলিম বাহিনীর ভিতর দিয়ে চলছিলেন। মুসলমানরা মক্কাবাসীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে বিরাট আগুনের কুণ্ডলি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। সাদা খচ্চরটি হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আবু সুফিয়ানকে চিনে ফেলেন। তিনি বুঝে ফেলেন যে, হযরত আব্বাস (রা) আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় দিতে চাইছেন। হযরত ওমর (রা) মহানবী (সা)-এর তাঁবুতে প্রবেশ করেন। আবু সুফিয়ানের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্য মহানবী (সা)-এর অনুমতি প্রার্থনা করেন।

নবী করীম (সা)-এর দরবারে আবু সুফিয়ান

হযরত ওমর (রা)-এর উপরোক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত আব্বাস (রা) মহানবী (সা)-এর দরবারে নিবেদন করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি আবু সুফিয়ানকে নিরাপত্তা প্রদান করেছি। এ নিয়ে হযরত ওমর ও হযরত আব্বাসের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। অবশেষে মহানবী (সা) বললেন, হে আব্বাস! তুমি আবু সুফিয়ানকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাও। প্রত্যুষে আমার নিকট নিয়ে আসবে। সকালে আবু সুফিয়ানকে মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত করা হয়। মুহাজির ও আনসারদের উপস্থিতিতে মহানবী (সা) ও আবু সুফিয়ানের মধ্যে নিম্নরূপ আলোচনা হয় :

নবী করীম (সা) : আবু সুফিয়ান! তোমার অমঙ্গল হোক। এখনো কি তোমার নিকট এই সত্য উদ্ভাসিত হয়নি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই?

আবু সুফিয়ান : আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আপনি কত ধৈর্যশীল, উদারমনা ও আত্মীয়-প্রিয় ব্যক্তি! শপথ করে বলছি, ‘আল্লাহ ছাড়া যদি আরো কোন উপাস্য হতো তাহলে আপনিই তা হতেন।’

নবী করীম (সা) : হে আবু সুফিয়ান! তোমার অমঙ্গল হোক! এখনো কি সে সময় হয়নি যে, তুমি আমাকে আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস করবে?

আবু সুফিয়ান : আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আপনি কত ধৈর্যশীল, উদারমনা ও আত্মীয়-প্রিয় ব্যক্তি। আল্লাহর শপথ! এ ব্যাপারে এখনো আমার মন নিশ্চিত হতে পারেনি।

ইতিমধ্যে হযরত আব্বাস (রা) প্রবেশ করেন। তিনি আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে বলেন, “তোমার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার আগে স্বীকার করা উচিত, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল।” এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমান হওয়া ছাড়া আবু সুফিয়ানের সামনে বিকল্প কোন পথ ছিল না। অতঃপর হযরত আব্বাস (রা) মহানবী (সা)-এর খেদমতে নিবেদন করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান নেতৃত্বপ্রিয় ও স্বাধীনচেতা লোক। তাঁর এই দুর্বলতার প্রতি লক্ষ রাখার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।’ মহানবী (সা) বললেন, “যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। যে ব্যক্তি নিজের ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেবে, তার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কা’বা ঘরে আশ্রয় নেবে, তাকেও নিরাপত্তা দেয়া হবে।”

এসব ঘটনা কি আকস্মিক ?

উপরে উল্লিখিত ঘটনাবলি সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিক ও চরিতবিদ ঐকমত্য পোষণ করেন। অবশ্য কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলেছেন, সত্যি কি এসব ঘটনা আকস্মিক ছিল, না পূর্ব পরিকল্পনামাফিক সংঘটিত হয়েছিল ? হযরত আব্বাস মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা দিলেন। জুহুফা নামক স্থানে মুসলিম বাহিনীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের পেছনে কি কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না ? বোদায়েল ইবনে ওয়ারকা মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মদীনায় যান। তিনি বনী খোযাআদের উপর আক্রমণের মর্মান্তিক ঘটনা মহানবী (সা)-এর নিকট তুলে ধরেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট থেকে এ কথা জানতে পেরেছেন যে, মহানবী (সা) বনী খোযাআ গোত্রের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। আজ সেই বোদায়েলই তার বনু খোযাআ গোত্রের শত্রু আবু সুফিয়ানের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে আসবেন। মক্কার বাইরে আসার সময় আবু সুফিয়ান কি জানতেন না যে, মহানবী (সা) মক্কা অভিযানে এসেছেন। বোদায়েল ইবনে ওয়ারকা, হাকিম ইবনে হাযাম ও আবু সুফিয়ানের সঙ্গে হযরত আব্বাসের সাক্ষাতের ব্যাপারটি আকস্মিক ছিল ? এমনও তো হতে পারে যে, তাদের মধ্যে পূর্ব পরিকল্পনা ছিল, হযরত আব্বাস মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের পর নির্ধারিত স্থানে আসবেন। এদিকে মক্কার দিক থেকে সে স্থানে আবু সুফিয়ান যাবেন। তাতে করে সেখানে তাদের সাক্ষাৎ হবে। বস্তুত হোদায়বিয়ার সন্ধির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবু সুফিয়ান মদীনায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি খালি হাতে ফিরে আসেন। এই মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি নিশ্চিত হন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কুরাইশদের নেই। এমনও হতে পারে যে, মহানবী (সা)-এর মক্কা বিজয়ের ব্যাপারে আবু সুফিয়ান নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি মক্কায় নিজের সরদারী অক্ষুণ্ণ রাখারও একটা পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। আবু সুফিয়ান এও উপলব্ধি করেছিলেন, মক্কা অভিযানের ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর রক্তসম্পর্কের ঘনিষ্ঠ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রকাশ করেননি। তার প্রমাণ হলো, আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাসের সাথে মহানবী (সা)-এর দরবারে পৌঁছেলে হযরত ওমর তাঁকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। বস্তুত উপরে উল্লিখিত ঘটনাবলি সম্পর্কে উভয় ধরনের অভিমত রয়েছে। এইজন্য নিশ্চিতভাবে কোন একটি সমর্থন করা এবং অপরটি প্রত্যাখ্যান করা যায় না। অবশ্য সংঘটিত সব ঘটনা আকস্মিকই হোক কিংবা

পূর্বপরিকল্পিতই হোক, এ কথা নির্দিধায় বলা যায় যে, বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে ইসলামের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা মক্কা বিজয় ছিল মহানবী (সা)-এর অনুপম বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

মহানবী (সা)-এর মক্কা প্রবেশের কৌশল

নিশ্চয়ই সাহায্য ও সফলতা আল্লাহ তা'আলার হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। অবশ্য যিনি সুষ্ঠু কর্মপন্থা গ্রহণ করেন এবং সুযোগের সদ্যবহার করেন আল্লাহ তা'আলাও তাঁকেই সাহায্য করেন। আর এজন্যই মহানবী (সা) শুধু হযরত আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণকে মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশের ব্যাপারে যথেষ্ট মনে করেননি। তিনি যথাসম্ভব সকল প্রকার সতর্কতা ও কৌশলময় কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। যে সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে মুসলিম বাহিনী মক্কা নগরীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, মহানবী (সা) সেখানে হযরত আবু সুফিয়ানকে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর এই ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়। এই ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল, মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ও শক্তি সম্পর্কে হযরত আবু সুফিয়ানকে প্রভাবিত করা। তিনি এ ব্যাপারে নিজের সম্প্রদায়কে সতর্ক করবেন। তাতে করে মক্কাবাসীদের কেউ মুসলমানদের প্রতিরোধ করার দুঃসাহস করবে না। হযরত আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে মুসলিম বাহিনীর প্রতিটি গোত্র এগিয়ে যায়। কিন্তু তিনি একটি কোম্পানী ছাড়া অন্য কোন কোম্পানী সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। এই কোম্পানীর পতাকা ছিল সবুজ রঙের কাপড় দ্বারা তৈরি। এই কোম্পানীতে মুহাজির ও আনসার উভয় সম্প্রদায়ের সশস্ত্র লোক ছিল। এই কোম্পানীর প্রতিটি সৈন্য আপাদমস্তক বর্ম পরিহিত ছিলেন। তাঁদের চোখ ছাড়া শরীরের অপর কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছিল না। তাঁদের মাঝে পরিবেষ্টিত ছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)।

মুসলিম বাহিনীর শান-শওকত দেখে হযরত আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাসকে বললেন, “হে আব্বাস! আজ কোন শক্তি এই বাহিনীর মোকাবেলা করতে পারবে না। হে আবুল ফযল! আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমার ভাতিজার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কেউ তা রুখতে পারবে না।” ঐ কথা বলেই হযরত আবু সুফিয়ান কুরাইশদের দিকে দৌড়ে গেলেন। তিনি একটি পর্বত চূড়ায় উঠে সজোরে চিৎকার করে বললেন, “হে কুরাইশ! (হযরত) মুহাম্মদ (সা) এক দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে এসেছেন। তোমরা তার মোকাবেলা করতে পারবে না। যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে কিংবা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে থাকবে কিংবা কা'বাঘরে আশ্রয় গ্রহণ করবে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।”

মহানবী (সা) মুসলিম বাহিনী নিয়ে মক্কা নগরীর দিকে এগিয়ে যান। যী-তুওয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি দেখলেন, মক্কাবাসীদের মোকাবেলা করার সাহস নেই। এখানে তিনি মুসলিম বাহিনীকে যাত্রাবিরতি করার নির্দেশ দিলেন। নিজে সওয়ারী থেকে অবতরণ করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে গুরুরিয়ার সিজদা আদায় করেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলাই তাঁর রাসূলের জন্য প্রথম ওহী নাযিলকৃত ভূমির দ্বার খুলে দেন এবং মু'মিনদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ঘরে যাতায়াতের নিশ্চয়তা বিধান করেন।

১. হযরত আবু সুফিয়ানের এ কথার জবাবদান প্রসঙ্গে হযরত আব্বাস (রা) বললেন, তুমি যথার্থ বলেছ। তবে বাদশাহী নয়, নবুয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। -অনুবাদক

হযরত আবু বকর (রা)-এর পিতা আবু কুহাফা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। বার্ষিক্যজনিত কারণে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ সময়ে তিনি তাঁর নাতনীকে বলেন, আমাকে তুমি আবু কুবায়েস পাহাড়ে নিয়ে চল। উভয়ে পর্বতচূড়ায় ওঠার পর আবু কুহাফা অনুভব করলেন, তাঁর নাতনী যেন কিছু একটা গভীরভাবে তাকিয়ে দেখছে। তিনি নাতনীকে জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখতে পাচ্ছ? মেয়েটি বলল, দূরে কালো যেন কি দেখা যাচ্ছে। আবু কুহাফা বললেন, এ তো সৈন্যবাহিনী। ইতিমধ্যে বলে উঠলো, কালো রেখা এখন আর নেই। আবু কুহাফা বললেন, এসব ছিল সৈন্যবাহিনী। তারা মক্কায় প্রবেশ করেছে। তুমি আমাকে দ্রুত বাসায় নিয়ে চল। আবু কুহাফা বাসায় পৌঁছার আগেই মুসলিম বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করেন। এ সময় মহানবী (সা) পুনরায় আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন।

সৈন্যদের বিন্যাস

এ বিজয় মুহূর্তেও মহানবী (সা) সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে চার ভাগে ভাগ করেন। তাদের সবার প্রতি ফরমান জারি করেন, “একান্ত বাধ্য না হলে কারো উপর আক্রমণ করবে না। কোন প্রকার রক্তপাত ঘটাবে না।” মুসলিম বাহিনীকে চার অংশে বিভক্ত করার পর তিনি হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়ামকে বাঁ দিকের বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেন। তাঁকে তাঁর বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশের উপদেশ দিলেন। ডানদিকের বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদেদের উপর। তাঁকে মক্কার নিম্ন এলাকা দিয়ে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলেন। আনসারদের নিয়ে হযরত সাআদ ইবনে উবাদাকে পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবেশ করতে বললেন। পদাতিক মুহাজিরদের নেতৃত্ব প্রদান করলেন হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহকে। তাঁদের উঁচু এলাকার জাবালে হিন্দের দিক থেকে মক্কায় প্রবেশের নির্দেশ দিলেন। মহানবী (সা) নিজেও এই দলে ছিলেন। চার দলে বিভক্ত বাহিনী রওয়ানা দেয়ার সাথে সাথে হযরত সাআদ ইবনে উবাদা প্রতিশোধ নেয়ার ভাবাবেগে বলে উঠলেন, “আজ প্রচণ্ড যুদ্ধের দিন। এই যুদ্ধে কা'বার পবিত্রতাও রক্ষা করা হবে না।” মহানবী (সা)-এর নির্দেশ ছিল, ‘একান্ত বাধ্য না হলে কাউকে আক্রমণ করবে না। কোন প্রকার রক্তপাত ঘটাবে না।’ কিন্তু হযরত সাআদ ইবনে উবাদার উক্ত বক্তব্য ছিল মহানবী (সা)-এর নির্দেশের পরিপন্থী। হযরত সাআদের মন্তব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (সা) তাঁর হাত থেকে পতাকা নিয়ে হযরত সাআদের ছেলে হযরত কায়েসের হাতে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। হযরত কায়েস ছিলেন স্থূলদেহী। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সহনশীল স্বভাবের লোক ছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর তিনটি অংশ কোন প্রকার প্রতিরোধের সম্মুখীন হননি। তাঁরা নির্ধারিত পথে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটে হযরত খালিদেদের নেতৃত্বাধীন অংশটির বেলায়। তাঁদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। মক্কার নিম্ন এলাকার অধিবাসীরা হযরত খালিদেদের বাহিনীর প্রবেশপথে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলার জন্য প্রথম থেকে মোরচা তৈরি করে বসেছিল। এই এলাকার অধিবাসীরা মহানবী (সা)-এর প্রতি মক্কার অন্যান্য লোকের চাইতে অধিক শত্রুতা পোষণ করত। এসব লোকই মুসলমানদের বন্ধু গোত্র বনু খোযাআর বিরুদ্ধে বনু বকর গোত্রকে সাহায্য করেছিল। আজ তারা তাদের নেতা আবু সুফিয়ানের

আত্মসমর্পণ ঘোষণা উপেক্ষা করে সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অবশ্য এই এলাকার জনপদের কিছু লোক এদিক-সেদিক কেটে পড়েছিল। কিন্তু বেশির ভাগ লোক ওঁত পেতে বসে সুযোগের অপেক্ষা করছিল। এ সময়ে তাদের নেতা ছিল সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, সুহায়েল ইবনে আমর ও ইকরামা ইবনে আবু জেহেল। হযরত খালিদের বাহিনী নিকটে আসতেই কাফেররা তীর বর্ষণ শুরু করে। হযরত খালিদ প্রতি-আক্রমণ শুরু করতেই মুহূর্তের মধ্যে প্রতিপক্ষের তেরজন, অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী আঠার জন, ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে কাফেররা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। এই সংঘর্ষে দুইজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। তাঁরা নিজেদের সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাফেরদের ঘেরাওতে পড়ে গিয়েছিলেন। কাফেরদের নেতা সাফওয়ান, সুহায়েল ও ইকরামা নিজেদের হযরত খালিদের কাছে দেখতে পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তারা হযরত খালিদের সামরিক অভিজ্ঞতা ও বীরত্বের কথা স্মরণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

সঙ্গী-সাথীদের হযরত খালিদের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের জীবন নিয়ে কেটে পড়ে।

এদিকে মহানবী (সা) হিন্দ পাহাড়ের সামনের পর্বতচূড়ায় মুহাজিরদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন। বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয়ের কথা চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছিলেন। কিন্তু শহরের দিকে তাকিয়ে মক্কার নিম্ন এলাকায় তরবারির ঝলকানি দেখতে পান। তিনি দেখেন, হযরত খালিদের বাহিনী প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করছে। এই দৃশ্য দেখে মহানবী (সা) উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি ভাবেন, আমি তোমাদের রক্তপাত করতে বারণ করেছিলাম; কিন্তু তোমরা তা থেকে বিরত রইলে না। আসল ঘটনা অবহিত হওয়ার পর তিনি নিশ্চিত হন এবং বলেন, “সম্ভবত তাতেও আল্লাহ তা‘আলার কোন কল্যাণ নিহিত ছিল।”

মক্কায় প্রবেশ

নবী করীম (সা) জাবালে হিন্দ বা হিন্দ পাহাড়ের সামনে গিরিপথ আলাই-মক্কা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। এই স্থানের অদূরে ছিল হযরত খাদীজা (রা) ও আবু তালিবের মাযার। মহানবী (সা)-এর জন্য মাযারের নিকটে তাঁবু খাটানো হয়। কিন্তু শহরে প্রবেশের পূর্বাঙ্কে নিবেদন করা হয়, “হে আল্লাহর রাসূল! পৈতৃক বাসস্থানে আরাম করার ইচ্ছা হলে সেখানেই ব্যবস্থা করা হবে।” মহানবী (সা) বললেন, “আমি পৈতৃক ঘরে অবস্থান করতে চাই না। তাছাড়া মক্কার লোকেরা আমার জন্য সে ঘরটি অক্ষুণ্ণ রাখেনি।” একথা বলে তিনি আরাম করার জন্য তাঁবুতে প্রবেশ করেন। এ সময় তাঁর পবিত্র মন ছিল অত্যন্ত প্রফুল্ল। তিনি পরম করুণাময়ের শুকরিয়া আদায় করছিলেন। আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহে তিনি আজ প্রিয় জন্মভূমিতে ফিরে এসেছেন। একদিন তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের এই শহরে কত দুঃখ-নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত হিজরত করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আজ তিনি নির্যাতিত-নিপীড়িত অনুসারীদের নিয়ে বিজয়ীর বেশে সে শহরে আবার ফিরে এসেছেন। সত্যি আল্লাহ তা‘আলার কী অপার অনুগ্রহ, কী অসীম দয়া।

মহানবী (সা) মক্কা উপত্যকার চারদিকে দৃষ্টিপাত করেন। আশেপাশের পর্বত চূড়ার দিকে তাকান। শেয়াবে আবী তালিবের দিকে নয়র পড়তেই তাঁর দৃষ্টি থেমে যায়। অতীতের অনেক

স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে। তাঁর জন্য এক সময় এখানেই কুরাইশরা বনু হাশিমকে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছিল! কী দুঃসহ ছিল সে দিনগুলো! এখান থেকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে আবু কুবায়েস পাহাড়ের প্রতি। এই পাহাড়ের একটি গুহায় তিনি দীর্ঘ দিন ধ্যানমগ্ন থেকেছেন। সে পাহাড়ের হিরা গুহায় তাঁর নিকট প্রথম ওহী নাযিল হয় :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

“পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন--সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পড়, তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন--শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।” (৯৬ : ১-৫)

এবার মহানবী (সা)-এর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সেসব পাহাড় ও উপত্যকার উপর যেখানে মক্কা শহর ও বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে থাকা বাড়িঘর এবং এসবের মাঝখানে অবস্থিত কা'বাঘরের উপর। এ সময় গভীর ধ্যান ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাবাবেগে তাঁর দুটো চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কারণ তিনিই সবার চাইতে বেশি জানতেন যে, আল্লাহ ছাড়া অপর কোন মা'বুদ নেই। সবকিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। এসব তাঁর পুরোপুরি উপলব্ধি হয় যে, সেনানায়ক হিসাবে তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য তাঁরুতে আর বিলম্ব না করে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাঁর কাসওয়া নামক উটে আরোহণ করে কা'বাঘরের সামনে পৌঁছান। তিনি পবিত্র কা'বাঘর সাতবার তাওয়াফ করেন। তাওয়াফের সময় তিনি হাতের লাঠি দ্বারা রুকনে ইয়ামনী সাতবার স্পর্শ করেন। তাওয়াফ সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি হযরত ওসমান ইবনে তালহাকে ডেকে পাঠান। তিনি এসে কা'বাঘরের দরজা খুলে দেন। মহানবী (সা) দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন। মানুষ কা'বাঘরে প্রবেশ করতে থাকে। তিনি জনতার উদ্দেশে ভাষণদান করেন। এ সময় তিনি পবিত্র কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا - إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى - إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

“হে মানুষ! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক সাবধানী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব খবর রাখেন।” (৪৯ : ১৩)

পুনরায় তিনি মক্কাবাসীদের উদ্দেশে বলেন, “হে কুরাইশগণ! তোমরা কি জান আমি তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করব?” তারা বলল, “আমরা আপনার নিকট সদ্যবহার প্রত্যাশা করি। আপনি শরীফ ভাই এবং শরীফ ভাইয়ের ছেলে।” মহানবী (সা) বললেন, “যাও তোমরা মুক্ত।” এ কথা বলে তিনি কুরাইশ ও মক্কার অন্য সকল অধিবাসীকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেন।

সাধারণ ক্ষমা

প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন করা কত উত্তম ও উদারতাপূর্ণ পদক্ষেপ। হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার উর্ধ্বে সকল প্রকার নিচতা থেকে মুখ ফিরিয়ে মানবতার উচ্চতম আসনে পৌছা সকল মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু যিনি মানবতার সে স্তরে পৌছতে পারেন, নিঃসন্দেহে তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। পৃথিবীর কোন মানুষেরই তাঁর সাথে তুলনা হয় না। এই কুরাইশদেরই একটি শ্রেণী মহানবী (সা)-কে হত্যার পরামর্শ করেছিল। তার আগে তারা মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট দিয়েছিল। এই কুরাইশরাই বদর ও উহুদে মহানবী (সা) ও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেছিল। খন্দক যুদ্ধে মুসলমানদের অবরোধ করেছিল। তারাই সমগ্র আরববাসীকে মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল। যদি সম্ভব হতো এই কুরাইশরাই মহানবী (সা)-কে হত্যা করে টুকরো টুকরো করতেও দ্বিধা করত না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অপার কৃপায় এই কুরাইশদেরই জীবন মহানবী (সা)-এর দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করছিল। তাদের শিরশ্ছেদ শুধু আল্লাহর রাসূলের একটি নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। তাদের জীবন ও মৃত্যু শুধু তাঁর একট ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করছিল। তাঁর অধীনে হাজার হাজার সশস্ত্র সৈন্য। মুহূর্তে তাঁরা মক্কাবাসীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু মহানবী (সা) ছিলেন আল্লাহর রাসূল। তাঁর অন্তরে কারো সম্পর্কে হিংসা-বিদ্বেষ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি অত্যাচারী কিংবা অহংকারীও ছিলেন না। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শত্রুর উপর ক্ষমতাবান করেছেন। তিনি যা ইচ্ছা করতে পারতেন। তিনি শত্রুদের ক্ষমা করে দেন। তাতে করে তিনি সারা বিশ্ব এবং পৃথিবীর সকল জাতির সামনে দয়া, মহানুভবতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং আত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সারা বিশ্বে এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

কা'বাঘরের ছবি

এক পর্যায়ে মহানবী (সা) কা'বাঘরে প্রবেশ করেন। তিনি কা'বাঘরের ভিতরের দেয়ালে বিভিন্ন নবী ও ফেরেশতার ছবি খোদাই করা দেখতে পান। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একটি ছবি দেখতে পান। এই ছবিটির হাতে জুয়া আর ভাগ্য পরীক্ষার তীর ছিল। তিনি কাঠের তৈরি একটি কবুতরও দেখতে পান। তিনি কবুতরটি নিজ হাতে ভেঙে মাটিতে ফেলে দেন। হযরত ইবরাহীমের ছবিটি তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর বলেন, আল্লাহ তা'আলা এটি ধ্বংস করুন। এতে আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীমকে জুয়া খেলায় রত দেখানো হয়েছে। অথচ জুয়ার তীরের সাথে তাঁর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। হযরত ইবরাহীম ইহুদী কিংবা খৃষ্টানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী এবং একনিষ্ঠ মুসলমান। মুশরিকদের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। ফেরেশতাদের ছবি খোদাই করা হয়েছিল সুন্দরী নারীদের আকৃতির। তিনি এসব ছবি সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং বলেন, ফেরেশতাদের মধ্যে নর কিংবা নারী নেই। তিনি সব ছবি ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। কা'বাঘরের আশেপাশেও প্রতিমা ছিল। কুরাইশ ও অন্যরা এসবের পূজা করত। এগুলো কা'বাঘরের প্রাচীরে শক্ত করে লাগানো ছিল। হোবল দেবতা কা'বাঘরের ভিতরে রাখা হয়েছিল।

মহানবী (সা) তাঁর হাতের ছড়ি দ্বারা এসব দেব-দেবীর প্রতি ইঙ্গিত করতেন এবং নিম্নলিখিত আয়াতটি আবৃত্তি করতেন :

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا .

“এবং বল, ‘সত্য এসেছে এবং মিথ্যে বিলুপ্ত হয়েছে ; মিথ্যে তো বিলুপ্ত হওয়ারই।’
(১৭ : ৮১)

কা'বাঘর প্রতিমা থেকে পবিত্রকরণ

কা'বাঘর ও তার আশেপাশের সব প্রতিমা ভেঙেচুরে ফেলা হয়। তাতে করে কা'বাঘরের সব প্রতিমা নিশ্চিহ্ন করে আল্লাহ তা'আলার ঘরকে পূত-পবিত্র করা হয়। এই কাজটি মহানবী (সা) মক্কা বিজয়ের প্রথম দিনেই সম্পন্ন করেন। বস্তুত এই কাজের জন্য তিনি দীর্ঘ বিশ বছর থেকে সংগ্রাম করে আসছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি মক্কাবাসীদের সাথে বিরাট যুদ্ধ-বিগ্রহেরও মোকাবেলা করেছেন। আজ তিনি সে সব নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। আর এই কাজটি তিনি সম্পন্ন করলেন কুরাইশদের চোখের সামনে। কুরাইশরা দেখতে পেলো, এতদিন তারা ও তাদের পূর্বপুরুষরা যেসব প্রতিমার পূজা-অর্চনা করে আসছিল, মূলত এগুলো কোন কল্যাণ কিংবা ক্ষতি সাধনের ক্ষমতাই রাখে না।

আনসারদের ভয়

মদীনার আনসাররা মহানবী (সা)-এর এ সব পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ করেন। তাঁরা আগে দেখলেন সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করছেন। এসব দেখে তাঁরা ধারণা করলেন, মহানবী (সা) মদীনা ছেড়ে সদ্য বিজয়কৃত জন্মভূমিতেই বসবাস শুরু করবেন। তাঁরা পরস্পরে বলাবলি শুরু করলেন, এরূপ ধারণা কি ঠিক যে, মহানবী (সা) এখন থেকে মক্কাই বসবাস করবেন ? তাঁদের এই ধারণার পিছনে যৌক্তিকতাও ছিল। কারণ মহানবী (সা) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার রাসূল। কা'বাঘর ও মসজিদে হারামও মক্কাই ছিল। কিন্তু মহানবী (সা) দোয়া শেষ করে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমরা কি বলাবলি করছিলে?’ তারা নির্দিধায় মহানবী (সা)-এর নিকট তাঁদের মনের আশংকা প্রকাশ করেন। মহানবী (সা) বললেন, ‘আল্লাহ রক্ষা করুন! আমার জীবন ও মৃত্যু তোমাদের সাথেই হবে।’ এরূপে তিনি বায়'আতে আকাবার প্রতিশ্রুতি রক্ষার অভিমত ব্যক্ত করেন এবং বিপদের দিনগুলোতে আনসাররা যে তাঁর দুঃখ-কষ্টে শরীক ছিলেন তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তিনি আনসারদের নিকট আরো দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করলেন যে, জন্মভূমি কিংবা এখানকার বাসিন্দাদের আকর্ষণ তাঁকে প্রতিশ্রুতি রক্ষা থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

কা'বাঘর প্রতিমামুক্ত হওয়ার পর মহানবী (সা) হযরত বিলাল (রা)-কে ছাদে উঠে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত বিলাল (রা) মহানবী (সা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী কা'বাঘরের ছাদে উঠে আযান দিলেন। মুসলমানরা সবাই নামায আদায় করলেন। মহানবী (সা) স্বয়ং ইমামতি করলেন। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিগত চৌদ্দশ' বছর নামায ও জামাআতের এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। হযরত বিলাল (রা) ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা প্রতিদিন পাঁচবার মাসজিদুল হারামের ছাদে আযান দিয়ে আসছেন। এই সূন্নতের অনুসরণে মুসলমানরা জামাআতে নামায

আদায় করছেন। মুসলমানরা কা'বাঘরের দিকে মুখ করে আল্লাহ তা'আলার প্রতি একাত্মচিহ্নে নামায আদায় করে থাকেন। মহানবী (সা) মক্কা বিজয়ের দিন কা'বাঘরকে প্রতিমা থেকে পাক-পবিত্র করে মুসলমানদের জন্য এই পুণ্যময় সুযোগ অব্যাহত করে দেন।

* আল্লাহ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে পরিশেষে কুরাইশদের মহানবী (সা)-এর দরবারে শির নত করতে হলো। মহানবী (সা)-এর সাধারণ ঘোষণার পর তাদের ভাগ্যেও স্বস্তি এলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশরা মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীদের ভয়-ভীতির মিশ্র দৃষ্টিতে দেখত। মক্কাবাসীদের মধ্যে সতের জনকে মহানবী (সা) সাধারণ ক্ষমার আওতার বাইরে রাখেন। মক্কায প্রবেশের পর তিনি এই সতের জনকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশে বলা হয়, কা'বাঘরের গিলাফ আঁকড়ে থাকলেও তাদের ক্ষমা করা হবে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের ঘরে লুকিয়ে ছিল। আবার কেউ কেউ মক্কা ছেড়ে পালিয়ে যায়। মহানবী (সা) কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তাদের হত্যার নির্দেশ প্রদান করেননি। বরং তারা ক্ষমা না করার মতো অপরাধ করেছিল। তাদের একজন ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ। সে প্রথমে * ইসলাম গ্রহণ করে। তাকে ওহী লেখার দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়। এক পর্যায়ে সে ধর্মচ্যুত হয়ে কুরাইশদের সঙ্গে शामिल হয়। সে প্রকাশ্যে বলে বেড়াতো, আমি ওহী লেখার সময় কুরআনের আয়াত পরিবর্তন করে ফেলতাম। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল। এই লোকটিও প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে। সে তার এক ক্রীতদাসকে হত্যার পর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে। তার দু'টি বাঁদী ছিল। একজনের নাম ফারতানা। আবদুল্লাহ তার দুই ক্রীতদাসীকে মহানবী (সা)-এর কুৎসামূলক গান গাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। বাঁদী দুটোও তাই করত। মহানবী (সা) আবদুল্লাহর সাথে তার দুই ক্রীতদাসীকেও হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। অপর ব্যক্তি ছিল ইকরামা ইবনে আবু জেহেল। সে মহানবী (সা) ও মুসলমানদের প্রতি চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করত। এমনকি মক্কা বিজয়ের পরও সে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদের বাহিনীর উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত হয়নি।

অনুশোচনাকারীদের ক্ষমা প্রদর্শন

পবিত্র মক্কা নগরীতে মুসলমানদের প্রবেশের পর মহানবী (সা) ফরমান জারি করলেন, উপরে উল্লিখিত কয়েক ব্যক্তি ছাড়া যেন আর কাউকে হত্যা না করা হয়। এই নির্দেশ শোনামাত্র উল্লিখিত ব্যক্তির সবাই আত্মগোপন করে। তাদের কেউ কেউ মক্কা ছেড়ে পালিয়ে যায়। কয়েক দিনের মধ্যে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসে। মানুষ মহানবী (সা)-এর সীমাহীন উদারতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। মহানবী (সা) যাদের হত্যার ফরমান জারি করেছিলেন, এ সময় কোন কোন সাহাবী সে সব লোকদেরও ক্ষমা করে দেয়ার জন্য মহানবী (সা)-এর দরবারে নিবেদন করেন। হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা) তাঁর দুখ-ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহকে নিয়ে মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। মহানবী (সা) দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকেন। অতঃপর বললেন, 'ঠিক আছে।' তিনি তাকে নিরাপত্তা দান করেন। ইকরামা ইবনে আবু জেহেল ইয়ামনের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। তার স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে হারেছ ইবনে হিশাম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর স্বামী ইকরামার জন্য মহানবী (সা)-এর খেদমতে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। মহানবী (সা) তাকেও

নিরাপত্তা দান করেন। উম্মে হাকীম তাঁর স্বামীর সন্ধানে বেরিয়ে যান এবং তাকে নিয়ে আসেন। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াও ইকরামার সাথে পালিয়ে গিয়েছিল। মহানবী (সা) তাকেও ক্ষমা প্রদর্শন করেন। ইকরামা ও সাফওয়ান উপকূলীয় পথ ধরে ইয়ামনের দিকে যাচ্ছিল। নৌকা রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। মহানবী (সা) আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাকেও ক্ষমা প্রদর্শন করেন। এই মহিলাই ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণের পর মহানবী (সা)-এর চাচা হযরত হামযার কলিজা চিবিয়েছিল। সারকথা, মহানবী (সা) যাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের অধিকাংশকেই ক্ষমা করে দেন। এসব লোকের মধ্যে মাত্র চারজনকে হত্যা করা হয়। তাদের মধ্যে একজন ছিল হোয়ায়রেস। মহানবী (সা)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা) মক্কা থেকে মদীনা যাওয়ার পথে তাঁকে নির্যাতন করার জন্য হোয়ায়রেস মানুষকে উৎসাহিত করেছিল। নিহতদের একজন ছিল ইবনে খাতাল। সে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে। পরে মদীনায় এক ব্যক্তিতে হত্যা করে ধর্মচ্যুত হয়ে মক্কায় চলে আসে। ইবনে খাতালের দুইজন বাঁদী মহানবী (সা)-এর নিন্দাবাদ করে কবিতা আবৃত্তি করত। তাদের একজনকে হত্যা করা হয়। অপর বাঁদীটি পালিয়ে গিয়েছিল। পরে মানুষের অনুরোধে মহানবী (সা) তাকে নিরাপত্তা দান করেন।

মক্কাতে নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা

মক্কা বিজয়ের পরের দিন সকালে খোয়াআ গোত্রের লোকেরা হোয়ায়েল গোত্রের একজন মুশরিককে হত্যা করে। এই ঘটনায় মহানবী (সা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তিনি এ প্রসঙ্গে জনতার উদ্দেশে ভাষণ দানকালে বলেন :

“হে জনগণ! আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহ তা‘আলা মক্কাতে নিষিদ্ধ এলাকা হিসাবে গণ্য করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত মক্কার এই মর্যাদা বলবৎ থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন লোকের জন্য হেরেম শরীফে রক্তপাত করা কিংবা কোন গাছ কাটা জায়েয নয়। এরূপ করা আমার পূর্বে কারো জন্য বৈধ ছিল না। আমার পরেও কারো জন্য বৈধ হবে না। বর্তমান মুহূর্তে শুধু এখানকার অধিবাসীদের শাস্তি হিসাবে আমার জন্য বৈধ করা হয়েছিল। এরপর থেকে পুনরায় উক্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। তোমাদের মধ্যে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছ, তারা অনুপস্থিতদের এই বিধান জানিয়ে দেবে। তোমাদের নিকট যে ব্যক্তি বলবে যে, আল্লাহর রাসূল মক্কায় যুদ্ধ করেছিলেন, তাকে বলবে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলের জন্য এটা জায়েয করেছিলেন ; কিন্তু বনী খোয়াআদের জন্য তা জায়েয করেননি। তোমরা রক্তপাত থেকে তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে তা কল্যাণকর; কিন্তু এখন আর তার প্রয়োজন নেই। (হে বনী খোয়াআ!) তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ। আমি এই রক্তপাতের বিনিময় পরিশোধ করে দিচ্ছি। আমার এই ঘোষণার পর যদি কেউ নিহত হয়, তার উত্তরাধিকারীদের জন্য দুটো বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। তারা হত্যাকারীকে হত্যা করতে পারবে কিংবা হত্যার বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে।”

এই ভাষণের পর মহানবী (সা) বনী খোয়াআ কর্তৃক নিহত ব্যক্তির রক্তপাতের বিনিময় আদায় করে দেন। এই ব্যবহার এবং তার চাইতেও বড় ব্যাপার সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে মহানবী (সা) মক্কাবাসীদের অন্তর জয় করে ফেলেন। তারা নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের

প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এই পর্যায়ে কোন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সজোরে বলে ওঠে, “তোমরা যারা আল্লাহ তা’আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তারা নিজ নিজ ঘরের সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।” এরপর মহানবী (সা) হেরেম শরীফের আশেপাশের খামগুলো মেরামত করার জন্য বনী খোযাআদের একদল লোককে পাঠিয়ে দেন। তাতে মক্কাবাসীদের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি হয় যে, মহানবী (সা) সত্যি মক্কাতে মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করেন। তাঁর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সুদৃঢ় হয়। মহানবী (সা) মক্কাবাসীদের নিকট এ কথা পরিষ্কার ব্যক্ত করেন যে, অন্য সব লোকের চাইতে মক্কাবাসীরা তাঁর নিকট অধিক প্রিয়। তিনি আরো বলেন, আপনারা যদি আমাকে হিজরত করতে বাধ্য না করতেন, তাহলে কখনো আমি আপনাদের ত্যাগ করতাম না এবং কাউকে আপনাদের সমতুল্য মনে করতাম না। এই ঘোষণার ফলে মহানবী (সা)-এর প্রতি মক্কাবাসীদের আকর্ষণ আরো বেড়ে যায়। এ সময় হযরত আবু বকর (রা) তাঁর পিতাকে মহানবী (সা)-এর খেদমতে নিয়ে আসেন। এই বৃদ্ধই মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুবায়েস পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন। মহানবী (সা) তাঁকে দেখে বললেন, “এই বৃদ্ধকে নিয়ে আসলেন কেন! আমি তো তাঁর নিকট যেতাম।” হযরত আবু বকর (রা) বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনার না গিয়ে তাঁর আসাটাই সঙ্গত হয়েছে।” অতঃপর মহানবী (সা) আবু কুহাফার বক্ষে হাত রেখে বলেন, “ইসলাম গ্রহণ করুন।” বৃদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন পাকা মুসলমান হয়ে যান। মহানবী (সা)-এর এরূপ অমায়িক ব্যবহার ও মহানুভবতায় তাঁর চরম শত্রুরাও পরম বন্ধুতে পরিণত হয়। তাদের অন্তরে মহানবী (সা)-এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার এক অভূতপূর্ব অনুভূতি জেগে ওঠে। কুরাইশ নারী-পুরুষরা দলে দলে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করে।

মহানবী (সা) পবিত্র মক্কা নগরীতে পনের দিন অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি মক্কার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সুসংহত করেন। তিনি মক্কার অধিবাসীদের ধর্মীয় বিধিবিধান শিক্ষাদান করেন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি মুসলিম বাহিনীর কিছু কিছু অংশকে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তাঁদের তিনি কোথাও অস্ত্র ব্যবহার না করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

বনু জুযায়মার উদ্দেশ্যে

বনী শায়বানদের প্রতিমা ওয়্যাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) নাখলার দিকে রওয়ানা দেন। তিনি সেখানে ওয়্যা প্রতিমা ধ্বংস করার পর বনু জুযায়মার দিকে যান। তারা হযরত খালিদকে দেখে অস্ত্র তুলে নেয় এবং মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়। হযরত খালিদ বললেন, “তোমরা অস্ত্র সংবরণ কর। কারণ সবাই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে।” বনু জুযায়মার এক ব্যক্তি বলল, “হে বনু জুযায়মা! তোমাদের অকল্যাণ হোক! ইনি আর কেউ নন, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ। অস্ত্র সংবরণের পর বন্দী ছাড়া তোমাদের ভাগ্যে আর কিছুই জুটবে না। আর বন্দীর পর এ কথা পরিষ্কার যে, তোমাদের হত্যা করা হবে।” এ কথার জবাবে বনু জুযায়মা গোত্রের লোকেরা বলল, “আপনি কি আমাদের হত্যা করতে চাইছেন? আমাদের সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে। যুদ্ধ থেমে গেছে। মানুষকে নিরাপত্তাও প্রদান করা হয়েছে।” এ কথা বলার পর বনু জুযায়মার লোকেরা অস্ত্র সংবরণ করে। কিন্তু

এরপরও হযরত খালিদ (রা) তাদের অনেককে গ্রেফতার করেন। কয়েকজনকে হত্যাও করেন। মহানবী (সা) এই দুঃখজনক সংবাদ শোনামাত্র নিজের দুই হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে বলেন, “হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে, আমি তার দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত!” অতঃপর তিনি হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা)-কে জুযায়মা গোত্রে পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা) তাঁকে বলেন, “তাদের নিকট যাও। পরিস্থিতি মূল্যায়ন কর। অজ্ঞতার যুগের রীতি বন্ধ করতে হবে।” হযরত আলী (রা) মহানবী (সা)-এর দেয়া কিছু মালামাল নিয়ে জুযায়মা গোত্রে পৌঁছান। তিনি নিহতদের রক্তের বিনিময় পরিশোধ করেন। নিহতদের রক্তের বিনিময় ও তাদের মালামালের বিনিময় পরিশোধ করার পরও কিছু মালপত্র অবশিষ্ট থাকে। তিনি সেগুলোও বিতরণ করে দেন।

* মহানবী (সা) পবিত্র মক্কা নগরীতে দুই সপ্তাহ অবস্থানকালে সেখান থেকে পৌত্তলিকতার সকল নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করে দেন। কা'বাঘরের প্রাচীন দায়িত্বগুলোর মধ্যে শুধু চাবি রাখা ও পানি পান করানোর দায়িত্ব ছাড়া আর সব বিলোপ করা হয়। মহানবী (সা) হযরত ওসমান ইবনে তালহা ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের উপর চাবি রাখার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। তিনি বলেন, তাঁরা বংশানুক্রমে এই দায়িত্ব পালন করবেন, কেউ তাদের নিকট থেকে এই পদ বা দায়িত্ব ছিনিয়ে নিলে তাকে জালিম বা অত্যাচারী গণ্য করা হবে। মহানবী (সা) যমযম কূপের পানি পান করানোর দায়িত্ব ন্যস্ত করেন তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর উপর।

তাতে করে মক্কার প্রতিটি লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তাওহীদের আলো মক্কার প্রতিটি ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। এরূপে সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তাওহীদের আলো সারা বিশ্বকে আলোকময় করে।

হুনায়েন ও তায়েফ

* হাওয়ায়েনদের মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি

মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানরা কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করেন। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে বিনা রক্তপাতে এই বিরাট বিজয় ও অপ্রত্যাশিত সাফল্যে মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে চলছিল। হযরত বিলাল (রা)-এর সুললিত কণ্ঠের আযান ধ্বনি শোনার সাথে সাথে তাঁরা নামায আদায়ের জন্য দলে দলে পবিত্র কা'বাঘরে পৌঁছতেন। আল্লাহর রাসূল যেখানে যেতেন মুসলমানরা তাঁর সাথে থাকতেন। মুহাজিররা তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়িঘরে যেতেন। সেগুলোতে বসবাসকারী ইসলাম গ্রহণকারী আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। আল্লাহর এই পবিত্র নগরী বিজয় ও সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বহিরাগত ও স্থানীয় মুসলমান নির্বিশেষে সবাই আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। এই সুন্দর ও আবেগঘন পরিবেশে মুসলমানদের পনের দিন অতিবাহিত হয়।

একটি আকস্মিক সংবাদে মুসলমানদের এই আনন্দমুখর পরিবেশ উদ্বেগাকুল হয়ে ওঠে। সে সংবাদটি হলো, হাওয়ায়েন গোত্রের লোকেরা তাদের বন্ধু গোত্রগুলো নিয়ে মক্কা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। মক্কার দক্ষিণ পূর্বের পাহাড়গুলোতে হাওয়ায়েন গোত্রের লোকেরা বসবাস করত। মুসলমানদের মক্কা বিজয় এবং মক্কার সব প্রতিমা ধ্বংসের খবর পেয়ে হাওয়ায়েনরা ভাবল, মুসলমানরা তাদেরও রেহাই দেবে না। কারণ মুসলমানরা সকল ক্ষেত্রেই দ্রুতগামী। তারা অশ্রবলে আরবের গোত্রগুলোকে ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। এই আশংকা করে হাওয়ায়েনরা তাদের বন্ধু গোত্রগুলোকে নিয়ে আগে-ভাগে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হাওয়ায়েন গোত্রের যুবক ও সাহসী গোত্রপতি মালেক ইবনে আওফ তাদের বন্ধু গোত্র বনু সাকীফ, বনু নাসার ও জুশামকেও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়। অবশ্য হাওয়ায়েন গোত্রের শাখা গোত্র কাআব ও কিলাব তাতে অংশগ্রহণ করতে অসম্মতি জানায়। জুশাম গোত্রের রণাঙ্গন বিশেষজ্ঞ অশীতিপর বৃদ্ধ দুরায়দ ইবনে সুম্মাকেও সমাবেশে উপস্থিত করা হয়। এই লোকটি চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। তাকে খাটিয়ায় করে পরামর্শ দেয়ার জন্য নিয়ে আসা হয়। অভিযানে অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্র, এমনকি গবাদি পশু পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে আসে। সমাবেশের অনতিদূরে এসব রাখা হয়। উট, গাধা আর মেঘপালের চিৎকার এবং শিশুদের ক্রন্দনরোল পুরো পরিবেশটাকে অস্বস্তিকর করে তুলেছিল। দুরায়দ এসব বিচিত্র ধ্বনি শুনতে পেয়ে হাওয়ায়েন সেনাপতি মালেক ইবনে আওফকে জিজ্ঞেস করল, রণাঙ্গনে এসব নিয়ে আসার পেছনে কি তাৎপর্য নিহিত

রয়েছে? আওফ বলল, তাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মনোবল অটুট থাকবে। তারা রণাঙ্গন থেকে পিছুপা হওয়ার ইচ্ছে করবে না। দুরায়দ বলল, রণাঙ্গনে এসব সৈন্যদের মনোবল অটুট রাখতে পারে না। একমাত্র সৈন্যবাহিনী, তরবারি আর তীরই রণাঙ্গনে কাজে লাগে। হে মালেক! যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যদি তুমি এগুলো সরিয়ে না দাও, তাহলে সীমাহীন লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হবে। এ ব্যাপারে মালেক ও দুরায়দের মধ্যে মতবিরোধ হয়। সৈন্যবাহিনীও দুরায়দের পরামর্শের পরিবর্তে তাদের ত্রিশ বছরের যুবক সেনাপতি মালেক ইবনে আওফের অভিমত মেনে নেয়। তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। কারণ যুবক সেনাপতি মালেক ছিল তাদের নিকট দৃঢ়সংকল্প এবং সাহসিকতার এক বিরল প্রতীক। দুরায়দ ইবনে সুম্মা তার দূরদর্শিতামূলক পরামর্শ গ্রহণ না করায় সে নীরব হয়ে যায়।

মালেক ইবনে আওফ তার বাহিনীকে হুনায়েন পর্বতের চূড়া ও গিরিপথের উঁচু স্থানগুলোতে অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করে। সে তাদের বলে, মুসলমানরা এই উপত্যকায় আসামাত্র তরবারি নিয়ে তাদের উপর বজ্রপাতের মতো আকস্মিক ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। ভীত-সন্ত্রস্ত ও ছিন্ন-ভিন্ন মুসলমানরা নিজেরাই একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করবে। তাতে করে তাদের মন ও মস্তিষ্ক থেকে বিজয়ের নেশা কেটে যাবে। সারা আরবে আমাদের বীরত্বগাথা ছড়িয়ে পড়বে। মানুষ বুঝতে পারবে, আমরা হুনায়েনে সারা আরব পদানত করার সংকল্পকারী একটি শক্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। মালেক ইবনে আওফের বাহিনী তার নির্দেশ পালনে কোন প্রকার দ্বিধা করেনি। প্রতিটি দল তাদের সেনাপতির নির্দেশ অনুযায়ী অবস্থান গ্রহণ করে।

মুসলমানদের হুনায়েন অভিযান

মক্কায় দুই সপ্তাহ অবস্থানের পর মুসলমানরা হুনায়েনের উদ্দেশে রওয়ানা হন। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ইতিপূর্বে এত বেশি আর কখনো দেখা যায়নি। বার হাজার বীরযোদ্ধা সমন্বয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দশ হাজার ছিলেন যারা মক্কা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং মক্কা বিজয় করেন। অবশিষ্ট দুই হাজার ছিলেন কুরাইশ নও-মুসলিম। তাঁরা মক্কা বিজয়ের পর পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হরবও ছিলেন। তাঁরা সবাই বর্ম পরিহিত ছিলেন। এই বিশাল বাহিনীর অগ্রভাগে ছিল অশ্বারোহী দল ও রসদবাহী উটের পাল। মুসলমানদের এই বাহিনী ছিল অভূতপূর্ব। আরব উপদ্বীপে এরূপ একটি সুসংবদ্ধ বিশাল সৈন্যবাহিনী এর আগে কখনো দেখা যায়নি। প্রত্যেক গোত্রের সৈন্যদের সামনে ছিল তাদের গোত্রীয় পতাকা। প্রতিটি সৈনিক নিজেদের এই বিশাল বাহিনী নিয়ে গর্ববোধ করছিলেন। কেউ কেউ মুখ ফুটে বলেই ফেললেন, আমাদের এই বিশাল বাহিনীকে কোন শক্তি পরাজিত করতে পারবে না। সূর্যাস্তের পর তাঁরা হুনায়েনে গিয়ে পৌঁছলেন। রাত হওয়ার দরুন তাঁরা গিরিপথের দ্বারপ্রান্তে সমতল ভূমিতে অবতরণ করলেন। এখানেই রাত যাপন করলেন। প্রত্যুষে তাঁরা এখান থেকে শিবির উঠিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। নবী করীম (সা) তাঁর সাদা উটে আরোহণ করে সবার আগে চলছিলেন। অগ্রবর্তী দল হিসাবে তাঁর পিছনে ছিল বনী সুলায়ম গোত্রের সৈন্যরা। তাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)।

মুসলিম বাহিনী তেহামার সমতলভূমি অতিক্রম করে হুনায়েনের সরু গলিপথ দিয়ে এগিয়ে চলছিলেন। শত্রুসৈন্যরা আগে থেকেই গিরিপথের চূড়ায় লুকিয়েছিল। তারা তাদের সেনাপতি মালেক ইবনে আওফের নির্দেশমতো মুসলিম বাহিনীর দিকে বৃষ্টির মতো তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করে। এখনো ভোরের অন্ধকার পুরোপুরি অপসৃত হয়নি। এই আকস্মিক বিপদে মুসলিম বাহিনী হতভম্ব হয়ে পড়ে। শত্রুর তুমুল আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। তাঁদের কেউ কেউ দৌড়ে পালাতে থাকেন। তাঁদের এই অবস্থা দেখে হযরত আবু সুফিয়ান বিস্মিত হন। তিনি বলেন, ‘এইসব লোকই তো মাত্র ক’দিন আগে কুরাইশদের পরাজিত করে মক্কার মতো দুর্গ জয় করেছিল। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, সাগরের এদিকে কোথাও তারা থামতে পারবে না।’ এই মন্তব্য করার সময় তিনি মৃদু হাসছিলেন। তাঁর ঠোঁট দুটোর ফাঁকে দাঁত দেখা যাচ্ছিল।

* এই অবস্থা দেখে মুসলিম বাহিনীর একজন বলে উঠল, “আজ আমিও (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর উপর আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব।” কালাদা ইবনে হাম্বল বলল, “আজ জাদু বাতিল হয়ে গেছে।” কালাদার এ কথা তার ভাই সাফওয়ান শুনে তাকে শাসিয়ে বললেন, “চুপ কর। তোমার মুখে ছাই পড়ুক। আল্লাহর শপথ! আমার নিকট হাওয়ায়েনদের শাসনের চেয়ে যে কোন কুরাইশের শাসন অনেক প্রিয়।”

হাওয়ায়েনদের প্রচণ্ড আক্রমণে ইতিমধ্যে মুসলিম বাহিনীর ভিতর চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। নবী করীম (সা) পিছনে ছিলেন। পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ মুসলিম সৈনিকরা তাঁর পাশ দিয়েই পিছনের দিকে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছিল। পরাজিত বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা পলায়নের সময় নবী করীম (সা)-এর দিকে চোখ তুলে তাকাবারও ফুরসত পাচ্ছিল না।

মহানবী (সা)-এর দৃঢ়তা

এরূপ নায়ক পরিস্থিতিতে মহানবী (সা) কী ভূমিকা গ্রহণ করলেন? ইসলামের প্রচার-প্রসারের এই প্রাথমিক অবস্থায় কি নবী করীম (সা) তাঁর বিশ বছরের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রাম-সাধনার পরিণাম বিফলে যেতে দিবেন? এই নিরাশ অবস্থায় কি আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয় বন্ধুকে কোন প্রকার সাহায্যের হাত বাড়াবেন না। না, কখনো তা হতে পারে না! এরূপ হওয়ার আগে কয়েকটি গোত্র জীবন বিসর্জন দিত। কয়েকটি সম্প্রদায় নিঃশেষ হয়ে যেত। মহানবী (সা) নিজেই তাঁর জীবন উৎসর্গ করতেন। কারণ তাঁর মহান লক্ষ্য তো ছিল আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা এবং সত্যের জয় অব্যাহত করা। আর ‘মৃত্যু তো নির্দিষ্ট সময়ে আসবেই। এক মুহূর্তও আগপিছ হবে না।’ বস্তুত মহানবী (সা) এরূপ নায়ক অবস্থায়ও বিন্দুমাত্র টললেন না। তিনি নিজ স্থানে অটল ও অবিচল রইলেন। একদল মুহাজির ও আনসার তাঁকে ঘিরে রাখলেন। তাঁর পরিবারবর্গও এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন। তাঁর পাশ দিয়ে মানুষ পালিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাদের ডাকলেন। হে মানুষ! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? কিন্তু মানুষ এরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। তারা শুধু ভাবছিল, বনী হাওয়ায়েন ও বনী সাকীফরা পর্বত চূড়ার গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে আসছে এবং তাদের ধাওয়া করছে। তাদের এই ভাবনা

১. এই লোকটি ছিল শায়বা ইবনে ওসমান ইবনে আবু তালহা। তাঁর পিতা ওসমান ইবনে আবু তালহা উহদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয়। -অনুবাদক

অমূলকও ছিল না। কারণ সত্যি বনী হাওয়ায়েন ও বনী সাকীফের লোকেরা লুকানো অবস্থান থেকে বন্যার মতো ধেয়ে আসছিল। তাদের সামনে ছিল লাল বর্ণের উটে আরোহিত এক ব্যক্তি। তার হাতের বর্শার মাথায় একটি কালো পতাকা বাঁধা ছিল। যে কোন মুসলমানকে দেখামাত্র সে বর্শা দ্বারা আঘাত করছিল। তাঁর পিছনে বনী হাওয়ায়েন, বনী সাকীফ ও তাদের সাহায্যকারীরা নিজ নিজ তরবারি চালিয়ে এগিয়ে আসছিল। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে মহানবী (সা) উত্তেজিত হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর সাদা খচ্চর শত্রুবৃহৎ চালিয়ে দিয়ে তাদের বাধা দেয়ার জন্য উদ্যত হলেন। ভাবলেন, আল্লাহর যা ইচ্ছা তা হবেই। কিন্তু সুফিয়ান ইবনে হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব এগিয়ে গিয়ে মহানবী (সা)-এর খচ্চরের লাগাম ধরে ফেললেন। মহানবী (সা)-কে তিনি সামনে অগ্রসর হতে দিলেন না।

হযরত আক্বাসের বজ্রধ্বনি

হযরত আক্বাস ইবনে মুত্তালিব (রা) ছিলেন দীর্ঘ দেহের অধিকারী। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল বলিষ্ঠ। তিনি অত্যন্ত বজ্রকণ্ঠে বললেন, “হে আনসার ভাইসব! আপনারা মহানবী (সা)-কে আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁকে সাহায্য করেছেন। হে মুহাজির ভাইসব! আপনারাই বৃক্ষের নিচে মহানবী (সা)-এর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন। মহানবী (সা) জীবিত আছেন। আপনারা এদিকে ছুটে আসুন।” তিনি বারবার এসব কথা উচ্চকণ্ঠে বলছিলেন। উপত্যকার চারদিকে তাঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। তাঁর এই কণ্ঠধ্বনি সারা উপত্যকায় এক অলৌকিকতা ছড়িয়ে দেয়। আকাবার বায়‘আতে অংশগ্রহণকারীরা আকাবার নাম শুনতে পায়। মহানবী (সা)-এর কথা তাঁদের স্মরণ হয়। এই সঙ্গে আকাবায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের মর্যাদার কথাও তাঁদের অন্তরে ভেসে ওঠে। অনুরূপ মুহাজিররা মহানবী (সা)-এর পবিত্র নাম শুনতে পেয়ে নিজেদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অন্যান্য মর্যাদার কথা স্মরণ করেন। সবাই শুনতে পান মহানবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের একটি ক্ষুদ্র দল নিয়ে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছেন। উহুদ রণাঙ্গনেও তারা এরূপ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারেন এ সময় মহানবী (সা)-কে একলা ছেড়ে গেলে পরিণামে মুশরিকরা আল্লাহর সত্য ধর্মের উপর বিজয় লাভ করবে। এদিকে হযরত আক্বাসের কণ্ঠধ্বনি তাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হচ্ছিল। তাতে তাদের প্রতিটি শিরা-উপশিরা সতেজ হয়ে উঠছিল। তারা চারদিক থেকে শত-সহস্র কণ্ঠে বলে ওঠেন, ‘লাব্বাইক, লাব্বাইক’—আমরা হাযির, আমরা হাযির। অতঃপর তাঁরা অত্যন্ত আবেগ-উত্তেজনা সহকারে রণাঙ্গনে ফিরে আসেন।

মুসলমানদের প্রত্যাভর্তন ও বিজয়

মহানবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের ফিরে আসতে দেখে স্বস্তিবোধ করেন। ইতিমধ্যে হাওয়ায়েনরা তাদের গোপন স্থান থেকে ময়দানে বেরিয়ে আসে। তারা মুসলমানদের বিপরীত দিকে অবস্থান নেয়। সূর্যের কিরণ ভোরের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে। কয়েক হাজার মুসলমান মহানবী (সা)-এর চারপাশে জড়ো হন। তাঁরা শত্রুদের মোকাবেলা করেন এবং তাঁদের সামনে অটল থাকেন। প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাভর্তনকারী মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে চলছিল। যারা সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন, ফিরে আসার ফলে তা সুদৃঢ় হয়। রণাঙ্গনে আনসাররা পরস্পরে উচ্চস্বরে

ডেকে ডেকে বলছিলেন, ‘হে আনসার সম্প্রদায়!’ আবার বলছিলেন, ‘হে খায়রাজ সম্প্রদায়!’ মহানবী (সা) অনুমান করলেন, যুদ্ধ তুমুল হয়ে উঠেছে। মুসলমানরাও অত্যন্ত সাহস নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। সারি সারি শত্রু নিধন করে চলেছেন। তিনি (সা) উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, “এবার যুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি।” তিনি হযরত আব্বাসের নিকট থেকে এক মুঠো পাথর টুকরো নিয়ে শত্রুপক্ষ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, “শত্রুর চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে।” মুসলমানরা সামনে এগিয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিল। তাঁদের নিকট এ সময় আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ তুচ্ছ মনে হচ্ছিল। তাদের মধ্যে এই প্রত্যয় জেগে উঠছিল, জয় আমাদেরই হবে। আমাদের মধ্যে শাহাদাতবরণকারীদের অংশ এই বিজয়ে জীবিতদের চেয়েও বেশি হবে।

উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলছিল। বনী হাওয়ায়েন ও বনী সাকীফরা দেখল, যুদ্ধ করে কোন লাভ হবে না। যুদ্ধ চালিয়ে গেলে সবাইকে জীবন দিতে হতে পারে। তারা পরাজয় বরণ করে দ্রুত রণাঙ্গন ছেড়ে পালাল। তারা এরূপ ক্ষিপ্ৰগতিতে পালিয়েছিল যে, পিছন ফিরেও তাকাল না। তারা নিজেদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন ও বিষয়-সম্পদ ছেড়েই পালিয়ে যায়। মুসলমানরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে এসব দখল করেন। এসব গনীমতের মালের মধ্যে ছিল বাইশ হাজার উট, চল্লিশ হাজার ভেড়া এবং চার হাজার আওকিয়া^১ রূপা। যুদ্ধবন্দীদের সংখ্যা ছিল ছ’হাজার। তাদের প্রহরাধীনে জিরানা উপত্যকায় নিয়ে যাওয়া হয়। মুসলমানরা শত্রুদের পিছন ধাওয়া এবং তায়েফে বনী সাকীফদের অবরোধ অভিযান থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীদের জিরানায় আটকে রাখা হয়।

শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন

মুসলমানরা প্রবল উদ্যমের সাথে শত্রুর পিছনে ধাওয়া করেন। মহানবী (সা) ঘোষণা করেন, যে মুসলমান কোন মুশরিককে হত্যা করবে, নিহতের অস্ত্র ও মাল-সামান সেই মুসলমানকে দিয়ে দেয়া হবে। মহানবী (সা)-এর এই ঘোষণার পর পশ্চাদ্ধাবনে মুসলমানরা আরও বেশি আগ্রহ প্রদর্শন করে। রবীআ ইবনে দুগুন্না একটি উট দেখতে পান। তাতে পালকীর মত একটি হাওদা ছিল। তিনি এটাকে মহিলা মনে করেন। তার মাল-সামান হস্তগত করার মনস্থ করেন। তিনি উটটি বসান। তাতে দেখতে পান এক বৃদ্ধ বসে আছে। যুবক রবীআ বৃদ্ধকে চিনতে পারেনি। এই বৃদ্ধ ছিল দুরায়েদ ইবনে সুম্মা। দুরায়েদ রবীআকে বলল, তুমি কি চাও। তিনি বললেন, আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই। এ কথা বলেই তিনি তরবারি দ্বারা একাধিক আঘাত করেন। কিন্তু তাতে কিছুই হলো না। দুরায়েদ বলল, তোমার মা তোমাকে ভাল তরবারি দেয়নি। হাওদার পিছন থেকে আমার তরবারিটি নিয়ে আস এবং তা নিয়ে আঘাত কর। মস্তিষ্কের নিচে এবং হাড়ের উপরিভাগে আঘাত কর। আমিও মানুষের উপর এরূপে আঘাত করতাম। এরপর যখন তোমার মায়ের নিকট যাবে, তাকে বলবে, আমি দুরায়েদ ইবনে সুম্মাকে হত্যা করেছি। আল্লাহর শপথ! অনেক যুদ্ধে আমি তোমাদের গোত্রের অনেক মহিলাকে রক্ষা করেছি। রবীআ যুদ্ধের পর বাড়ি পৌঁছে তাঁর মাকে এই কাহিনী

১. আওকিয়া রূপার ওজন বিশেষ। এক আওকিয়া সাড়ে দশ তোলার সমপরিমাণ। এই হিসাবে মুসলমানরা এই যুদ্ধে শুধু রূপাই লাভ করে ৪ লাখ ২০ হাজার তোলা। -অনুবাদক

শোনান। তাঁর মা এই কাহিনী শুনে ছেলেকে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন, আল্লাহ তোমার হাত জ্বালিয়ে দিন। দু'রায়দ তোমার নিকট এ কথা বলে আমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি একই দিন তোমার তিন মা অর্থাৎ আমাকে, তোমার দাদী ও নানীকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

মুসলমানরা আওতাস পর্যন্ত হাওয়ায়েনদের পিছন ধাওয়া করেন। সেখানে মুসলমানরা তাদের মোকাবেলা করেন। আওতাসে হাওয়ায়েনরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। মুসলমানরা সেখানে হাওয়ায়েনদের অনেক মহিলাকে গ্রেফতার করেন এবং প্রচুর সম্পদ গণীমত হিসাবে লাভ করেন। বিজয়ী মুসলমানরা এসব বন্দী নারী ও লব্ধ সম্পদ নিয়ে মহানবী (সা)-এর নিকট ফিরে আসেন। মালেক ইবনে আওফ নাসরী কিছুক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের মোকাবেলা করে। এরপর হাওয়ায়েন গোত্রীয় অধিনায়ক তার পরিবার-পরিজন নিয়ে কেটে পড়ে। নাখলা নামক স্থানে পৌঁছে সে তার গোত্রীয় লোকদের থেকেও পৃথক হয়ে যায়। সে তায়েফ চলে যায় এবং সেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করে।

মুশরিকদের পুরোপুরি পরাজয়

এরূপে হুনায়েনের যুদ্ধে মুসলমানরা বিরাট বিজয় লাভ করেন। অপরদিকে মুশরিকরা পুরোপুরি পরাজয় বরণ করে। মুসলমানদের এই সফলতার পিছনে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল মহানবী (সা) ও তাঁর আশেপাশের স্বল্পসংখ্যক মুসলমানদের দৃঢ়তা। ভোরের অন্ধকারে মুশরিকরা বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লে মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। তারা চারদিকে দৌড়াতে থাকেন। এরূপ নাযুক মুহূর্তে মহানবী (সা) রুখে দাঁড়ান। তাঁকে ঘিরে থাকা স্বল্পসংখ্যক মুসলমানও মহানবী (সা)-কে অনুসরণ করেন। তাতে করে মুসলমানরা পুনরায় সংঘবদ্ধ হন এবং মুশরিকদের উপর প্রচণ্ড বেগে পাল্টা আঘাত হানেন। এই ঘটনার বিবরণদান প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مَّدْيَنَ . ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا - وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ - ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ - وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا - وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ - إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

“আল্লাহ তো তোমাদের বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং হুনায়েনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল ও পরে

তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকট থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর দয়া বর্ষণ করেন যাতে তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফেরদের শাস্তি প্রদান করেন। এটাই কাফেরদের কর্মফল। এরপরও যার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ ক্ষমাপরবশ হতে পারেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার নিজ করুণায় তোমাদের অভাবমুক্ত করতে পারেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (৯ : ২৫-২৭)

বিজয়ের মূল্য

এতদসত্ত্বেও এই বিরাট বিজয়ে মুসলমানদের ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। বলা চলে, এই বিজয়ের জন্য মুসলমানদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। তারা যদি প্রথম দিকে রণাঙ্গন ছেড়ে না পালাতো, তা'হলে হয়তো তাদের এতটা ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হতো না। তাদের পালানোর দৃশ্য দেখে হযরত আবু সুফিয়ান (রা) বলেছিলেন, ‘তাদের বোধ হয় সাগর ছাড়া কেউ রুখতে পারবে না।’ এই বিজয় অর্জন করতে মুসলমানদের বেশ কিছু সাহসী যোদ্ধা ও বীরের জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। যদিও কোন ইতিহাস গ্রন্থে এই যুদ্ধের শহীদদের সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাতে মুসলমানদের দুটো পুরো গোত্র প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মহানবী (সা) যুদ্ধে শহীদদের জান্নাত লাভের জন্য দোয়া করেন। এতকিছু সত্ত্বেও এই যুদ্ধে সব দিক থেকে মুসলমানরাই বিজয়ের মালা ছিনিয়ে আনেন। এরূপ পরিপূর্ণ বিজয় যে, মুসলমানরা তাদের শত্রুদের চিরদিনের জন্য পরাভূত করতে সক্ষম হয়। তাঁরা এই যুদ্ধে গনীমত হিসাবে অটেল সম্পদ লাভ করেন। শত্রুপক্ষের অনেক লোককে বন্দী করেন। এর আগে তাঁরা আর কখনো এত সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী লাভ করেননি। বস্তুত কোন যুদ্ধের চরম ও পরম লক্ষ্য থাকে জয়লাভ করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যতোই মূল্য দেয়া হোক না, সেটা ধর্তব্য নয়। এই যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের যে অটেল পুরস্কার দান করেছেন, তাতে তারা খুবই সন্তুষ্ট হন। গনীমতের মাল বণ্টনের পর মুসলমানরা ফিরে আসার ইচ্ছা করেন।

কিন্তু মহানবী (সা)-এর অন্তরে তার চেয়েও বিরাট বিজয়ের পরিকল্পনা ছিল। মালেক ইবনে আওফই বিভিন্ন গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সমবেত করেছিল। আর পরাজয় বরণের পর সে-ই বনী সাকীফদের সাথে তায়েফে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এ সময়ের চাহিদা ছিল মুসলমানদের তায়েফ অবরোধ করা এবং শত্রুদের পাকড়াও করা। মহানবী (সা) উহুদ যুদ্ধের পর খায়বরবাসীদের সাথে এবং খন্দক যুদ্ধের পর বনু কোরায়যাদের বিরুদ্ধে অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত এ সময় মহানবী (সা)-এর চোখের সামনে তায়েফের একটি দৃশ্য ভেসে উঠেছিল। হিজরতের কয়েক বছর আগে তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফে যান। তিনি তায়েফবাসীদের ইসলাম গ্রহণের আহবান জানান। তারা এই আহবানের জবাবে মহানবী (সা)-এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের শিশু-কিশোররা মহানবী (সা)-এর প্রতি পাথর ছুঁড়ে মারে। তিনি তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একটি আঙুরের বাগানে

আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্ভবত এ মুহূর্তে তিনি এ কথাও চিন্তা করে থাকবেন, হিজরতের আগে তিনি তায়েফে গিয়েছিলেন একা। সে সময় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহযোগিতা ও ঈমানী শক্তি ছাড়া তাঁর আর কোন সাহায্যকারী ছিল না। সময়ের বিবর্তনে আজ তায়েফ অভিযানে তাঁর সাথে রয়েছে এক বিরাট মুসলিম বাহিনী। গোটা আরবের ইতিহাসে এত বড় বাহিনীর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

তায়েফ অবরোধ

তায়েফে বনী সাকীফ গোত্রে তাদের নেতা মালেক ইবনে আওফ আশ্রয় নিয়েছিল। মহানবী (সা) সেখানে বনী সাকীফদের অবরোধ করার উদ্দেশ্যে সাহাবীদের তায়েফের দিকে রওয়ানা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তায়েফ ছিল একটি সুরক্ষিত শহর। সেকালে আরবের অন্যান্য শহরের মতো তায়েফেরও দরজা ছিল। প্রয়োজন হলে তা বন্ধ করে দেয়া যেত। সেখানকার অধিবাসীরা অবরোধের ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞ ছিল। তাদের অবস্থা আর্থিক দিক থেকেও সচ্ছল ছিল। এজন্যই তারা সুরক্ষিত দুর্গ তৈরি করে রেখেছিল। মহানবী (সা)-এর নির্দেশে মুসলমানরা তায়েফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। তাঁরা লিয়্যা নামক স্থান অতিক্রম করছিলেন। সেখানে মালেক ইবনে আওফের একটি বিশেষ দুর্গ ছিল। সেটা তাঁরা ধ্বংস করেন। তাঁদের চলার পথে বনী ছাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তির একটি প্রাচীরবেষ্টনী পড়ে। সেটাও তাঁরা ধ্বংস করেন। মুসলমানরা তায়েফের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছান। নবী করীম (সা) তাঁর বাহিনীকে শহরের নিকট এক স্থানে শিবির স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। কিন্তু বনী সাকীফরা তাদের দুর্গের উপর থেকে মুসলমানদের দেখতে পেয়ে তীর বর্ষণ শুরু করে। তাতে কয়েকজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। বনু কোরায়যা ও খায়বরবাসীদের দুর্গ অবরোধকালে মুসলমানরা যেসব কৌশল ও উপকরণ ব্যবহার করেন এখানেও তাই করা হয়। কিন্তু এখানে সেগুলো কার্যকর হয়নি। এক্ষেত্রে বনী সাকীফদের সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করার জন্য অন্য কোন কৌশল ও উপকরণ ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তাঁরা যদি শুধু অবরোধ করে রাখতেন, তাতে কি বনী সাকীফদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারতেন? দুর্গ অভিযান সফল করার জন্য মুসলমানদের পক্ষে আর কোন্ কোন্ পন্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর ছিল? এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মুসলমানদের সময় ও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন ছিল। অপরদিকে বনী সাকীফদের তীর বর্ষণ অব্যাহত ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে দূরদর্শিতামূলক পদক্ষেপ ছিল মুসলিম বাহিনীকে তীরের নিশানার আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া। তাতে মুসলমানদের প্রতিপক্ষের তীরের আঘাতে আর প্রাণ হারাতে হবে না এবং মহানবী (সা) এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাবেন।

তায়েফের মসজিদ

আল্লাহ তা'আলার রাসূল ও একজন বিচক্ষণ সেনাপতি হিসাবে মহানবী (সা)-ও তাই করলেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে তীরের নিশানার আওতার বাইরে এক স্থানে চলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তায়েফ বিজয় ও সেখানকার অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের পর যে স্থানে

একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়, তাঁরা সেখানে চলে আসেন। সে পরিস্থিতিতে মুসলিম বাহিনীকে দুর্গের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া ছাড়া বিকল্প কোন উপায়ও ছিল না। কারণ ইতিমধ্যে বনী সাকীফদের তীরের আঘাতে আঠারো জন মুসলমানকে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল। আহত হয়েছিলেন অনেক মুসলমান। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা)-এর এক পুত্রও ছিলেন। মুসলিম বাহিনীকে তীরের আওতার বাইরে যে স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার এক পাশে লাল চামড়া দ্বারা দুটো তাঁবু তৈরি করা হয়। এগুলো উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা ও হযরত যয়নব (রা)-এর জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। এই তাঁবু দুটোর মধ্যবর্তী স্থানে মহানবী (সা) নামায আদায় করতেন। সম্ভবত এ স্থানটিতেই পরবর্তীতে তায়েফের মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

মহানবী (সা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুসলিম বাহিনী বনী সাকীফদের দুর্গের পাদদেশ থেকে সরে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে এসে তাঁরা নিজেদের এবং শত্রুদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন। এ সময় একজন বেদুঈন এসে মহানবী (সা)-এর নিকট নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! শিয়াল যেমন নিজ গর্তে ঘাপটি মেরে বসে থাকে, বনী সাকীফরাও তাদের দুর্গে তেমনিভাবে অবস্থান করছে। অবরোধ দীর্ঘায়িত ছাড়া তাদের দুর্গ থেকে বের করার বিকল্প কোন উপায় নেই। বর্তমান অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হলেও তারা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু বনী সাকীফদের সমুচিত শিক্ষা না দিয়ে ফিরে যাওয়াও মহানবী (সা) পছন্দ করলেন না। পবিত্র মক্কা নগরীর নিম্নদেশে বসবাসকারী দাওস গোত্রের লোকেরা দুর্গ অবরোধে পাথর নিক্ষেপণ যন্ত্র (মিন্জানিক) ও প্রাচীর বিধ্বংসী অস্ত্র (দাবনু)^১ ব্যবহারে পারদর্শী ছিল। সে গোত্রের সরদার তোফায়েল দাওসী খায়বর অভিযানে মুসলিম বাহিনীতে ছিলেন। তায়েফ অবরোধ অভিযানেও তিনি মহানবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। নবী করীম (সা) সাহায্যকারী নিয়ে আসার জন্য তোফায়েলকে তাঁর গোত্রে পাঠিয়ে দিলেন। দাওস গোত্রের একদল লোক তাদের সে বিশেষ অস্ত্র নিয়ে মুসলিম বাহিনীর সাহায্যে তায়েফে ছুটে আসে। মুসলমানদের তায়েফ অবরোধের চতুর্থ দিনে তারা এসে পৌঁছায়। মুসলমানরা পাথর নিক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে দুর্গ লক্ষ্য করে পাথরগুলো নিক্ষেপ শুরু করেন। তারা দুর্গ প্রাচীর ধ্বংস করার জন্য সে বিশেষ ধরনের শকট ব্যবহার করেন। এই শকটের ভিতর কয়েকজন মুসলমানও ছিলেন। তাঁরা তায়েফের বেষ্টনী প্রাচীর ভাঙার জন্য শকটের মাধ্যমে প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। কিন্তু তায়েফবাসীরাও রণকৌশলে কম পারদর্শী ছিল না। তারা মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করে পিছনে হটতে বাধ্য করে। তায়েফের অধিবাসীরা লোহার টুকরো আগুনে গরম করে উক্ত শকটের উপর ছুঁড়ে মারে। ফলে তাতে ছিদ্র হয়ে যায়। শকটের ভিতর বসা মুসলিম সৈন্যরা আগুনে পুড়ে যাওয়ার ভয়ে বেরিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। সাকীফ গোত্রের লোকেরা পলায়নপর মুসলমানদের লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে শুরু করে। তাতে

১. সেকালে রশির সাহায্যে পাথরের গোলা নিক্ষেপ করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা হতো। এই অস্ত্রকে বলা হতো 'মিনজানিক'। এর আধুনিক সংস্করণ হচ্ছে ক্ষেপণাস্ত্র। আর দুর্গ প্রাচীর ও এ জাতীয় অন্যান্য প্রতিবন্ধক ধ্বংস করার জন্য এক ধরনের শকট ব্যবহার করা হতো। তাতে মানুষও থাকত। এই শকটকে বলা হতো 'দাবাব'। দাবাবের আধুনিক সংস্করণ হচ্ছে ট্যাংক। বর্তমানে দাবাব শব্দটি ট্যাংক অর্থেই ব্যবহার করা হয়। -অনুবাদক

কয়েকজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। মুসলমানদের এই রণকৌশলও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাঁরা দুর্গে প্রবেশ করতে সক্ষম হননি।

এরপর কী পদক্ষেপ নেয়া যায়, সে সম্পর্কে মহানবী (সা) গভীর চিন্তা-ভাবনা করেন। অবশেষে তিনি ভাবলেন, বনু নযীরদের কাবু করার জন্য তাদের খেজুর বাগানে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। এখানেও সে কৌশল অবলম্বন করা যায়। তায়েফের আঙুর বাগানগুলো বনু নযীরদের বাগানের চেয়ে মূল্যবান ছিল। এসব বাগান সারা আরবে প্রসিদ্ধ ছিল। এজন্য তায়েফকে সমগ্র আরবে সবচেয়ে শস্যশ্যামল এলাকা গণ্য করা হতো। বস্তুত এসব বাগানের জন্য উষর আরব মরুর বুকে তায়েফকে স্বর্গ মনে করা হতো। মহানবী (সা)-এর নির্দেশে মুসলমানরা আঙুর বাগান পোড়ান শুরু করেন। যেসব গাছে আগুন লাগছিল না, সেগুলো কেটে সাবাড় করতে থাকেন। এই দৃশ্য দেখে সাকীফরা দিশেহারা হয়ে পড়ল। তারা বুঝতে পারল, মুসলমানরা আজ তাদের গর্বের সম্পদ সব শেষ করে ফেলবে। তারা মহানবী (সা)-এর নিকট সংবাদ পাঠাল, আপনি ইচ্ছা করলে এসব বাগান আপনার নিজের অধিকারে নিতে পারেন। অথবা আপনার ও আমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তার খাতিরে এগুলো আমাদের জন্যও রেখে দিতে পারেন। আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, এসব বাগান ধ্বংস করবেন না। এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা) মুসলিম বাহিনীকে আঙুর বাগান ধ্বংস অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বনী সাকীফদের লক্ষ্য করে বলেন, “তায়েফবাসীদের যে ব্যক্তি আমাদের নিকট এসে যাবে, তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে এবং সে মুক্ত হবে।” এই ঘোষণার পর তায়েফের অধিবাসীদের প্রায় বিশজন দুর্গ থেকে বেরিয়ে চলে আসে। তাদের কথাবার্তা থেকে জানা যায়, দুর্গের ভিতর অটেল খাদ্যসামগ্রী রয়েছে। এসব দ্বারা দুর্গের মধ্যে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করা যাবে। এ থেকে মহানবী (সা) বুঝতে পারলেন, প্রতিপক্ষকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে হলে অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী করতে হবে। এদিকে মুসলিম বাহিনীর ইচ্ছা হলো, তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে গনীমতের মাল ভাগ-বাটোয়ারা করা। মহানবী (সা) ভাবলেন, অবরোধ দীর্ঘায়িত করার জন্য পীড়াপীড়ি করা হলে সৈন্যদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। তা’ছাড়া নিষিদ্ধ মাসগুলো অত্যাশন্ন। সে সময় যুদ্ধ ও রক্তপাত বৈধ নয়। এজন্য তিনি তখনকার মতো অবরোধ উঠিয়ে নেয়াটাই শ্রেয় মনে করেন। তা’ছাড়া যিলকাদ মাসও শুরু হয়ে গিয়েছিল। এসব কারণে তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ওমরা পালনের জন্য ফিরে আসলেন। আসার সময় বলে আসলেন, নিষিদ্ধ মাসগুলো যাওয়ার পর তায়েফবাসীদের সাথে পুনরায় যুদ্ধ হবে।

বনু হাওয়াযেন প্রতিনিধিদল

মহানবী (সা) মুসলিম বাহিনী নিয়ে পবিত্র মক্কায় ফিরে আসেন। পথে জিরানা নামক স্থানে গনীমতের মাল ও যুদ্ধবন্দীদের রেখে আসা হয়েছিল। তিনি সেখানে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তিনি মুসলমানদের মধ্যে গনীমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন শুরু করেন। তিনি এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে অবশিষ্ট সম্পদ বণ্টন করে দেন। মুসলমানরা জিরানা ত্যাগ করার আগেই হাওয়াযেন গোত্রের নবদীক্ষিত মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হন। তাঁরা আশা পোষণ করেন, তাদের নারী, শিশু ও বিষয়-সম্পদ ফিরিয়ে

দেয়া হবে। এসব নারী ও শিশু বেশ ক’দিন থেকে তাদের আপনজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন আছে। এ সময়ে তারা অনেক দুঃখ-কষ্টও ভোগ করেছে। তাঁরা মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের একজন মহানবী (সা)-এর খেদমতে নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে আপনার ফুফু, খালা এবং দাইরাও রয়েছেন, যারা আপনাকে লালন-পালন করেছেন। যদি আমাদের মহিলারা হারেছ ইবনে আবু শিমর অথবা নো’মান ইবনে মুনযেরকে^১ দুধ পান করাতো এবং আজ আমাদের উপর আপনার যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা যদি তাদের হতো, তা’হলে আমরা তাদের নিকট থেকেও দয়া ও অনুগ্রহ পেতাম। আর আপনি তো সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ মানুষ। প্রতিনিধিদলের লোকেরা মহানবী (সা)-এর নিকট তাদের গোত্রের আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা দেখানোর ব্যাপারে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করেনি।^২ যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে এক মধ্যবয়সী মহিলা ছিলেন। তার সাথে মুসলিম বাহিনীর লোকেরা কিছুটা কড়াকড়ি করেন। তাতে মহিলা বলে ওঠেন, “আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের নেতার বোন। আমার সাথে আদব সহকারে কথাবার্তা বল।” কিন্তু মুসলমানরা তাঁর একথা বিশ্বাস করেননি। তাঁরা মহিলাকে মহানবী (সা)-এর নিকট নিয়ে আসেন। তিনি জানতে পারেন, মহিলার নাম শায়মা। তিনি হারেছ ইবনে আবদুল ওয়্যার কন্যা। মহানবী (সা) মহিলাকে সম্মান করেন। নিজের চাদর বিছিয়ে তাতে তাঁকে বসতে দেন। তিনি তাঁকে বলেন, আপনি ইচ্ছা করলে আমার সাথে থাকতে পারেন। অথবা নিজের গোত্রেও ফিরে যেতে পারেন। মহিলা নিজের গোত্রে চলে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।^৩

হাওয়ায়েন গোত্রের যারা ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের সাথে সদয় ব্যবহার করা এবং তাঁদের ন্যায্য দাবি মেনে নেয়াটা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ মহানবী (সা)-এর সাথে যারা সদ্যবহার করেছে, তিনিও তাদের সাথে সদ্যবহার করেছেন। এটা ছিল তাঁর একটা সাধারণ অভ্যাস। দুঃখীর দুঃখ দূর করা এবং ন্যায়নিষ্ঠা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। হাওয়ায়েন গোত্রের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনার পর মহানবী (সা) তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, “পরিবার-পরিজন তোমাদের নিকট অধিক প্রিয়, না তোমাদের ধন-সম্পদ?” তাঁরা বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের মধ্যে যে কোন একটির ব্যাপারে আপনি আমাদের অধিকার প্রদান করেছেন। আপনি আমাদের মহিলা ও শিশুদের ফিরিয়ে দিন। তারাই আমাদের নিকট অধিক প্রিয়।” তাঁদের এই জবনু শুনে মহানবী (সা) বললেন, যেসব জিনিস আমার এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের ভাগে পড়েছে, সেগুলো তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে। আমার যোহরের নামায পড়া শেষ হওয়ার পর তোমরা দাঁড়িয়ে বলবে : “আমরা মুসলমানদের সামনে আল্লাহর রাসূলকে এবং রাসূলের সামনে মুসলমানদের অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের পরিবার-পরিজনদের ফিরিয়ে দিন। সে

১. তারা ছিল গাস্‌সান গোত্রের শাসক। -অনুবাদক

২. এই গোত্রের হালীমা সাদীয়া ছিলেন মহানবী (সা)-এর দুধ-মা এবং হারেছ ইবনে আবদুল ওয়্যার ছিলেন দুধ-পিতা। এ দিক থেকে হাওয়ায়েন গোত্রের লোকেরা মহানবী (সা)-এর আত্মীয়-স্বজন ছিলেন। -অনুবাদক

৩. হযরত সায়মা সেদিনই ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা) গনীমতের মালের তাঁর অংশ থেকে মহিলাকে কিছু দান করেন এবং সসম্মানে আপনজনদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। -অনুবাদক

সময় আমি নিজের অংশ দিয়ে দেব এবং অন্যান্য মুসলমানকেও তাদের অংশ ফিরিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করব।”

হাওয়াযেন বন্দীদের ফেরত দান

হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধিরা যোহর নামাযের পর মহানবী (সা)-এর শিথিয়ে দেয়া কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করেন। প্রতি-উত্তরে মহানবী (সা) বলেন, আমার এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের ভাগে যা রয়েছে, তোমাদের দিয়ে দেয়া হলো। মহানবী (সা)-এর নিকট থেকে এই ঘোষণা শুনে মুহাজিররা বললেন, আমাদের জন্য যা রয়েছে, আমরা সেগুলো আল্লাহর রাসূলের নামে দিয়ে দিচ্ছি। আনসাররাও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু তামীম গোত্রের আকরা ইবনে হাবিস এবং উয়ায়না ইবনে হিস্ন তাদের ভাগের নারী ও শিশুদের ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। সুলায়েম গোত্রের আব্বাস ইবনে মিরদাসও তার গোত্রের অংশ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেন। অবশ্য সুলায়েম গোত্রের লোকেরা আব্বাসের আপত্তির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেননি। এক্ষেত্রে মহানবী (সা) বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে নিজেদের অধিকার ছেড়ে দিতে রাযী নও, তারা যদি রাযী হও, তা’হলে আগামীতে যেসব যুদ্ধবন্দী হস্তগত হবে তা থেকে এখনকার একটির বদলে ছ’টি করে দেয়া হবে। এভাবে হাওয়াযেন গোত্রের নও-মুসলিমদের নারী ও শিশুদের ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

মহানবী (সা) হাওয়াযেন প্রতিনিধিদের মালেক ইবনে আওফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তাঁরা বললেন, সে এখনো সাকীফ গোত্রেই অবস্থান করছে। মহানবী (সা) তাঁদের বললেন, আমার পক্ষ থেকে মালেককে জানিয়ে দিও, সে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে তার পরিবার-পরিজন ছাড়াও একশ’ উট দেয়া হবে। মালেক মহানবী (সা)-এর পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে বনু সাকীফদের চোখ এড়িয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ে মহানবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর মালেক ইবনে আওফ নিজের পরিবার-পরিজন ছাড়াও একশ’ উট লাভ করেন। এই ঘটনার পর মুসলমানরা আশংকা করেন যে, মহানবী (সা)-এর নিকট আগত লোকদের যদি তিনি এভাবে দান করতে থাকেন, তা’হলে গনীমতের মালে তাদের অংশ একেবারে কমে যাবে। এজন্য তারা নিজেদের অংশ নিয়ে নিতে চাইলেন এবং এ ব্যাপারে একে অপরের সাথে কানাঘুসা করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তাদের এই কানাঘুসা মহানবী (সা)-এর নিকট পৌঁছায়। তিনি একটি উটের নিকট গিয়ে দাঁড়ান। উটটির পিঠ থেকে তিনি কিছু পশম উঠান এবং সেগুলো নিজের পবিত্র আঙুলের ফাঁকে রেখে হাত উঠিয়ে মুসলমানদের উদ্দেশে বলেন : “হে ভাইসব! আল্লাহর শপথ, তোমাদের গনীমতের সম্পদে এই পশম পরিমাণও আমার লোভ নেই। অবশ্য আমার যে এক-পঞ্চমাংশ রয়েছে, সেটাও তোমাদের দিয়ে দেয়া হলো। তোমাদের যাদের নিকট গনীমতের সম্পদ রয়েছে, সে জমা কর। তাতে করে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা যাবে। কেউ যদি অন্যায়ভাবে গনীমতের কোন সম্পদ নিজের নিকট রেখে দেয় এবং তা যদি সুঁচ পরিমাণও হয়, তার জন্য তার পরিবারকে কেয়ামত পর্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে।”

মহানবী (সা) কিছুটা বিরক্তির সাথে উপরোক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তার কারণ একজন মুসলমান মহানবী (সা)-এর পবিত্র কাঁধ থেকে তাঁর চাদরটি নিয়ে গিয়েছিল। তিনি

মুসলমানদের উদ্দেশে বলেন : “হে ভাইসব! তোমরা আমার চাদরটি ফিরিয়ে দাও। আল্লাহর শপথ! তোমাদের জন্য যদি তেহামা উপত্যকার বৃক্ষরাজির পরিমাণও গনীমতের সম্পদ হস্তগত হতো, সেসব আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে কৃপণ, ভীরা ও মিথ্যাবাদী দেখতে পাবে না।” এ কথা বলার পর মহানবী (সা)-এর পবিত্র চাদরটি ফিরিয়ে দেয়া হয়। এরপর মহানবী (সা) গনীমতের সম্পদ থেকে তাঁর জন্য নির্ধারিত এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেন। এই সম্পদ থেকে তিনি একটা অংশ কিছুসংখ্যক লোককে দান করেন। কিছু দিন আগেও এসব লোক মহানবী (সা)-এর চরম শত্রু ছিল। এই দান ছিল গনীমতের সম্পদে তাদের নির্ধারিত অংশের অতিরিক্ত। হযরত আবু সুফিয়ান, তাঁর পুত্র হযরত মুআবিয়া, হারেছ ইবনে হারেছ কালাদা হারেছ ইবনে হিশাম, সুহায়েল ইবনে আমর, হুওয়ায়তিব ইবনে আবদুল ওয়যা ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় কুরাইশ নেতা এবং গোত্র সরদার যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের প্রত্যেককে একশ’ করে উট দেয়া হয়। মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের দিক থেকে এদের চেয়ে যারা কম ছিল তাদেরকে পঞ্চাশটি করে উট প্রদান করা হয়। মহানবী (সা) নিজের অংশ থেকে এভাবে যাদের দান করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল দশজনের মতো। সেদিন নবী করীম (সা) দান ও বদান্যতার অভূতপূর্ব নযীর স্থাপন করেন। ফলে গতকাল পর্যন্ত যারা তাঁর চরম শত্রু ছিল, তারা মহানবী (সা)-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়ে। তিনি এসব নও-মুসলিমের প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করেন। তিনি আব্বাস ইবনে মিরদাসকে কয়েকটি উট দান করেন। কিন্তু তাতে সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সে অভিযোগ করে মহানবী (সা) উয়ায়নাহ্, আকরা প্রমুখকে তার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। নবী করীম (সা) বললেন, তাকে নিয়ে যাও এবং আমার পক্ষ থেকে এতটা দান কর, যাতে তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তাই করা হলো। তাতে মিরদাসের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। সে খুশিতে বাগ বাগ হয়ে গেল।

আনসার ও নতুন মুসলমানদের দান

গতকাল পর্যন্ত যারা মহানবী (সা)-এর চরম শত্রু ছিল তাদের প্রতিও তাঁর নযীরবিহীন বদান্যতা দেখে এ সম্পর্কে আনসাররা বলাবলি করছিলেন। তাঁরা একে অপরকে বলতে লাগলেন, “আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কওমের লোকদের পেট ভরে দিয়েছেন।” হযরত সাআদ ইবনে উবাদা (রা) আনসারদের এই অভিমত মহানবী (সা)-এর নিকট প্রকাশ করেন। তিনি নিজেও তাদের অভিমত সমর্থন করেন। নবী করীম (সা) বললেন, তোমার কওমের লোকদের ওই বাগানে একত্র কর। আমিও সেখানে আসছি। হযরত সাআদ আনসারদের সেখানে সমবেত করলেন। নবী করীম (সা)-ও সেখানে গেলেন। নবী করীম (সা) ও আনসারদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয় :

মহানবী (সা) : হে আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব কথা শুনতে পেলাম তা কি সত্যি? তোমাদের মনে কি কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে? আমি কি তোমাদের পথভ্রষ্ট পাইনি? এরপর আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের সত্যপথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা কি গরীব ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের সচ্ছলতা দান করেছেন। তোমরা কি একে অপরের শত্রু ছিলে না? আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করেছেন।

আনসার : হ্যাঁ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন।

মহানবী (সা) : হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি আমার প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেবে না?

আনসার : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের নিকট কি ধরনের জবাব চাচ্ছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যিই আমাদের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন।

মহানবী (সা) : আল্লাহর শপথ! তোমরা ইচ্ছা করলে জবাব দিতে পারতে আর তা সঠিক হতো এবং তা প্রমাণিতও হতো। যেমন তোমরা বলতে পারতে, আপনি এরূপ পরিস্থিতিতে এসেছিলেন যে, মানুষ আপনার কথা বিশ্বাস করছিল না। কিন্তু আমরা আপনাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। সবাই আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল; কিন্তু আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আপনাকে জন্মভূমি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি নিঃস্ব ছিলেন, কিন্তু আমরা আপনার প্রতি সমবেদনা জানিয়েছি। হে আনসার সম্প্রদায়! আমি নতুন মুসলমানদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার যে সামান্য সম্পদ তাদের দিয়েছি, তাতে কি তোমরা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছ? বস্তুত আমি তোমাদের ঈমানের দৃঢ়তার উপর পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করেছি। হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি তাতে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট নও যে, মানুষ তাদের সঙ্গে উট, ছাগল, ভেড়া নিয়ে যাবে আর তোমাদের সাথে থাকবেন আল্লাহর রাসূল। যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, যদি হিজরত না হতো, তা'হলে আমিও আনসারদের একজন হতাম। সব লোক যদি একপথে চলে আর আনসাররা ভিন্ন পথে চলে, আমিও আনসারদের পথে চলব। হে আল্লাহ! আনসারদের প্রতি, তাদের সন্তানদের প্রতি এবং তাদের সন্তানদের সন্তান-সন্ততির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।”

মহানবী (সা)-এর এই আবেগময় ভাষণ আনসারদের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুত আনসারদের প্রতি মহানবী (সা)-এর প্রগাঢ় ভালবাসা ও স্নেহ-প্রীতি ছিল। নবী করীমের এই ভালবাসা ও স্নেহ-প্রীতির যথেষ্ট কারণও ছিল। কারণ তাঁরা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। তাঁর সাহায্যে সব সময় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাতে তাঁরা নিজেরা সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন এবং মহানবী (সা)-এর সম্মান বৃদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। মহানবী (সা)-এর ভাষণে আনসাররা এরূপ প্রভাবিত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা কাঁদতে শুরু করেন। তাঁরা বলতে আরম্ভ করেন, আমরা তাতেই সন্তুষ্ট যে, আল্লাহর রাসূল আমাদের ভাগে এসেছেন।

মহানবী (সা) তাঁর আচার-আচরণ ও কর্ম-পদ্ধতির মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, হুনায়েনের যুদ্ধে লব্ধ সম্পদের প্রতি তাঁর এতটুকু আকর্ষণ ছিল না। অথচ এত বিপুল সম্পদ এর আগে আর কখনো পাওয়া যায়নি। কয়েক সপ্তাহ আগেও যারা কুফর ও শিরকের চোরাবালিতে ঘুরপাক খাচ্ছিল, মহানবী (সা) তাদের আকৃষ্ট করার কাজে এই সম্পদের একটা অংশ সদ্যবহার করেন। তাতে তার লক্ষ্য ছিল, তাঁদের অন্তরে এই প্রত্যয় সৃষ্টি করা, তারা যে ধর্ম গ্রহণ করেছে তাতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার কল্যাণ রয়েছে। এই সম্পদ বণ্টনে মহানবী (সা) মানসিকভাবে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। কারণ তাতে স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির উপক্রম হয়েছিল। নতুন মুসলমানদের মধ্যে অকাতরে দান দেখে আনসাররা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। তা সত্ত্বেও মহানবী (সা) গনীমতের সম্পদ

বণ্টনে অত্যন্ত ন্যায্যনিষ্ঠা, দূরদর্শিতা ও কৌশল অবলম্বন করেন। তাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিরাট সংখ্যক আরবের ফেরার পথে কোন প্রকার অভিযোগ ছিল না। সবাই সন্তুষ্ট ছিল। ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জীবন বিসর্জন দেয়ার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল।

মহানবী (সা) ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে জিরানা থেকে মক্কা রওয়ানা দেন। ওমরা পালনের পর তিনি হযরত আত্তাব ইবনে উসায়দকে মক্কায় তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। হযরত আত্তাবের সাথে হযরত মুআয ইবনে জাবালকেও মক্কায় তাঁর স্থলবর্তী নিয়োগ করেন। মহানবী (সা) হযরত মুআয ইবনে জাবালের উপর মানুষকে ইসলামের বিধান ও পবিত্র কোরআন শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। অতঃপর মহানবী (সা) আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। মদীনায় পৌঁছে পুত্র ইবরাহীমের জন্ম পর্যন্ত তিনি আর কোথাও বের হননি। এ সময় কিছু দিনের জন্য তিনি পার্থিব সমস্যা থেকে স্বস্তি লাভ করেন। এর কিছু দিন পর মহানবী (সা) তাবুক অভিযানের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ প্রদান করেন।

ইবরাহীম ও রাসূল (সা)-এর সহধর্মিণীগণ

আরবে মক্কা বিজয়ের প্রভাব

মক্কা বিজয়, হুনায়েনে সফল অভিযান ও তায়েফ অবরোধ শেষ করে মহানবী (সা) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আরবের প্রতিটি লোকের নিকট এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সমগ্র আরব উপদ্বীপে মহানবী (সা)-এর সাথে মোকাবেলা করার মত কোন শক্তি নেই। এমনকি সে সময় নবী করীম (সা) কিংবা ইসলামের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহসও কারো ছিল না। পবিত্র মক্কা ও হুনায়েনের বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণকারী মুসলমানরা অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে মহানবী (সা)-এর সাথে মদীনায় ফিরে আসেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে মক্কা বিজয়ের গৌরব দান করেছেন। মক্কার অধিবাসীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আরবের বিভিন্ন গোত্র ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। বিজয়ও মুসলমানদের মনে খুশি ও আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দেয়। এবার মুসলমানরা বিভিন্ন পার্থিব সমস্যা থেকে অনেকটা নিশ্চিত হন। তাঁরা মদীনায় সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন শুরু করেন। মহানবী (সা) মক্কায় হযরত আত্তাব ইবনে উসায়দকে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করে আসেন। হযরত মুআয ইবনে জাবালকে শিক্ষক নিয়োগ করেন। তিনি মক্কার মুসলমানদের ইসলামের বিধান ও পবিত্র কোরআন শিক্ষা দান করবেন। এতবড় বিজয় আরব ইতিহাস-ঐতিহ্যে দ্বিতীয়টি ছিল না।

মহানবী (সা) ও ইসলামের এই অভূতপূর্ব সফলতা আরবের প্রতিটি লোকের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই ঐতিহাসিক সফলতা আরবের বিভিন্ন নেতা ও গোত্রপতিদের মনেও প্রভাব বিস্তার করে। তাঁরা কখনো কল্পনাও করেনি যে, একদিন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। আরবের যেসব কবি গোত্রপতিদের মনোরঞ্জনের জন্য তাদেরই ধ্যান-ধারণা কবিতার ভাষায় প্রকাশ করত এবং বিভিন্ন গোত্রের সহযোগিতা-সমর্থন লাভ করত, ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় এসব কবির মনেও রেখাপাত করে। যেসব যাযাবর ও বেদুঈন গোত্র নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকত, তারাও ইসলামের সফলতার প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি। অথচ নিজেদের পতাকা ছাড়া অন্য কোন বিশেষ পতাকার নিচে দাঁড়ানোটা তাদের নিকট ছিল সম্পূর্ণ কল্পনাভীত। কারণ এরূপ অবস্থার জন্য যে কোন কিছুই বিনিময়েই তাদের মানসিক প্রস্তুতি থাকত না। বস্তুত ইসলাম ছিল প্রকৃতিগত এক অনন্যসাধারণ শক্তি। এই শক্তির সামনে কবিদের কাব্যচর্চা, নেতাদের নেতৃত্ব এবং গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের কোনই মূল্য ছিল না। উক্ত শক্তির আঘাত সামলে নেয়ার মতো কোন শক্তি তৎকালীন আরবে ছিলই না।

কাআব ইবনে যোহায়েরের ঘটনা

মক্কা বিজয় আরবদের মধ্যে এরূপ প্রভাব বিস্তার করে যে, মহানবী (সা) তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর বোজায়ের ইবনে যোহায়ের তাঁর ভাই কাআব ইবনে যোহায়েরকে একটি চিঠি লিখেন। তাতে তিনি লিখেন, “যারা কবিতার মাধ্যমে মহানবী (সা)-কে ব্যঙ্গ করত এবং কষ্ট দিত, তিনি মক্কায় তাদের কয়েকজনকে হত্যা করেছেন। তাদের মধ্যে যারা বেঁচে গেছে, তারা এদিক-সেদিক পালিয়ে গেছে। আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি অনতিবিলম্বে মদীনায় নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হও। কারণ যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসছে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের হত্যা করেন না। তুমি যদি রাসূলের দরবারে হাযির হতে না চাও, তাহলে সুদূর কোথাও গিয়ে নিজের জীবন রক্ষা কর।” বস্তুত বোজায়ের ঠিকই লিখেছেন। কেননা মক্কায় মহানবী (সা)-এর নির্দেশে চার ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে হত্যা করা হয়নি। তাদের মধ্যে একজন কবিও ছিল। সে ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে মহানবী (সা)-কে দুঃখ দিয়েছিল। নিহতদের মধ্যে দু’জন মহানবী (সা)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা)-কে কষ্ট দিয়েছিল। তিনি স্বামীর অনুমতি নিয়ে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় তাঁর পিতার নিকট যাচ্ছিলেন। কাআব তার ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করে। সে বুঝতে পেরেছিল, মহানবী (সা)-এর দরবারে না গেলে তাকে আজীবন ফেরার জীবন যাপন করতে হবে। এজন্য সে দ্রুত মদীনায় পৌঁছায়। সেখানে সে তার এক পুরনো বন্ধুর নিকট গিয়ে ওঠে। পরদিন সকালে মসজিদে নববীতে উপস্থিত হয়ে মহানবী (সা)-এর দরবারে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। সেখানে সে তার একটি বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করে। তার প্রথম চরণটি হলো :

بَانتُ سَعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتَبُولٌ × مُتَيْمٌ اَثَرَهَا لَمْ يُفَدْ مَكْبُولٌ

“সুয়াদ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ আমার অন্তর তার বিরহে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও শৃঙ্খলিত। তার মুক্তি আর সম্ভব নয়।”

মহানবী (সা) কবি কাআব ইবনে যোহায়েরকে ক্ষমা করেন। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

মহানবী (সা)-এর দরবারে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি

মক্কা বিজয়ের প্রভাব ও ফলশ্রুতিতে আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিরা মহানবী (সা)-এর দরবারে এসে নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করতে শুরু করে। তাই গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর দরবারে আসে। তাদের নেতৃত্ব দেন যায়েদ আল-খায়েল। মহানবী (সা) তাদের সাদর অভ্যর্থনা করেন। যায়েদ নবী করীম (সা)-এর সাথে কথাবার্তা বলেন। অতঃপর নবী করীম (সা) বলেন, আরবের অনেক লোকের মর্যাদা ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে আমাকে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সাক্ষাৎ ও আলাপের পর দেখা যায় তারা সে পরিমাণ নয়। অবশ্য যায়েদ আল-খায়েল তার ব্যতিক্রম। তিনি যায়েদ আল-খায়েলক যায়েদ ‘আল-খায়ের’ বলে সম্বোধন

১. ‘খায়েল’ শব্দের অর্থ ঘোড়া। সম্ভবত মহানবী (সা) যায়েদের এই নামটি পছন্দ করেননি। তাই তিনি তাকে ‘খায়েল’-এর পরিবর্তে ‘খায়ের’ বা শুভ নামে অভিহিত করেছেন। -অনুবাদক

করেন। যায়েদের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিদের অন্য সদস্যরাও তাঁকে অনুসরণ করেন।

আরবের প্রখ্যাত দানশীল ব্যক্তিত্ব হাতেম তাঈ'র পুত্র 'আদী' ছিল খৃষ্টধর্মের অনুসারী। সে মহানবী (সা)-কে চরম ঘৃণার চোখে দেখত। আরব উপদ্বীপে মহানবী (সা) ও মুসলমানদের সফলতা ও কর্তৃত্ব দেখতে পেয়ে সে নিজের পরিবার-পরিজন ও গবাদিপশু নিয়ে সিরিয়ায় চলে যায়। সেখানে সে স্বধর্মীয় খৃষ্টানদের সাথে বসবাস করতে থাকে। মহানবী (সা) যে সময় হযরত আলী ইবনে আবী তালিবকে তাঈ গোত্রের প্রতিমা ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করেন আদী ইবনে হাতেম সে সময় সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। হযরত আলী (রা) তাঈ গোত্রের সব প্রতিমা ধ্বংস করেন এবং গনীমতের মাল ও অনেক বন্দী নিয়ে মদীনাতে ফিরে আসেন। বন্দীদের মধ্যে আদী ইবনে হাতেমের বোন এবং হাতেম তাঈ'র এক কন্যা ছিল। মসজিদে নববীর দরজার অদূরে বন্দীশালায় তাকে রাখা হয়। বন্দীশালার নিকট দিয়ে মহানবী (সা) যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে মহিলা দাঁড়িয়ে বলে, “হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা মারা গেছেন। ভাই উধাও হয়ে গেছেন। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন। আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।” মহানবী (সা) জানতে পারেন, মহিলার ভাই আদী ইবনে হাতেম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তিনি মহিলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। কিন্তু মহিলা তাঁর পিতার বদান্যতা ও দান-দক্ষিণার উল্লেখ করে। নবী করীম (সা) মহিলাকে মুক্তির নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি তাকে ভাল কাপড়-চোপড় ও রাহা খরচ প্রদান করেন। তাকে সিরিয়ায় গমনকারী কাফেলার সাথে ভাইয়ের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সিরিয়ায় পৌঁছে সে তার ভাইয়ের নিকট মহানবী (সা)-এর এই অমায়িক ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে। বোনের প্রতি এই সদাচরণ আদী ইবনে হাতেমের মনে রেখাপাত করে। সে সিরিয়া থেকে ফিরে এসে মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

এরূপে মক্কা বিজয়, হুনায়েনের সফলতা ও তায়েফ অবরোধের পর আরবের বিভিন্ন গোত্র ও তাদের নেতারা এসে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এ সময় মহানবী (সা) মদীনাতে অবস্থান করছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে মদীনাতে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করছিলেন।

হযরত যয়নবের ইত্তিকাল

কিন্তু সময় কখনো একরূপ থাকে না। মহানবী (সা)-এর খুশি ও শান্তিময় দিনগুলোও শেষ হয়ে আসছিল। পারিবারিক একটা ব্যাপারে তিনি কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁর কন্যা হযরত যয়নব (রা) ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি দীর্ঘ দিন থেকে রোগে শয্যাগত ছিলেন। মক্কা থেকে হিজরতের সময় হোয়ায়রেস ও হাব্বার হযরত যয়নবকে সোয়ারী থেকে ফেলে দিয়েছিল। তাতে তাঁর গর্ভপাত হয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুখের পরিণতিতে হযরত যয়নব (রা) ইত্তিকাল করেন। তাঁর ইত্তিকালের পর মহানবী (সা)-এর সন্তানদের মধ্যে শুধু হযরত ফাতেমা (রা) অবশিষ্ট ছিলেন। হযরত উম্মে কুলসুম ও হযরত রোকাইয়া (রা) আগেই ইত্তিকাল করেন। হযরত যয়নবের ইত্তিকালে মহানবী (সা)

অত্যন্ত শোকাহত হন। তিনি হযরত যয়নবের চারিত্রিক গুণাবলি ও স্বামী আবু আদী ইবনে রবীর প্রতি তাঁর আনুগত্যের কথা স্মরণ করেন। আবুল আসীকে বদর যুদ্ধে বন্দী করা হয়।

হযরত যয়নব (রা) ছিলেন মুসলমান আর আবুল আসী ছিলেন মোশরেক। তিনি স্বামীর জন্য ফেদিয়া বা মুক্তিপণ প্রেরণ করেন। অথচ আবুল আসী মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যদি কুরাইশরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করত, তাহলে হযরত যয়নবের পিতা মহানবী (সা)-কে তারা জীবিত রাখত না। হযরত যয়নবের চারিত্রিক গুণাবলি ও স্বামীর প্রতি আনুগত্য ছাড়াও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের কথাও মহানবী (সা) স্মরণ করেন। মদীনার হিজরত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অসুখ-বিসুখে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন।

মহানবী (সা) নিজের সন্তানই নয়, প্রত্যেক দুঃখীর দুঃখে শরীক হতেন। প্রত্যেক বিপদগ্রস্তের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করতেন। তিনি মদীনার আশেপাশের অসুস্থদের দেখতে যেতেন। বিপদগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতেন। দুঃখীদের খবরাখবর নিতেন। এবার তাঁর নিজের কন্যার ইত্তিকালে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও শোকাহত হন। এর আগে মহানবী (সা)-এর আরো দুই কন্যা ইত্তিকাল করেন। অনুরূপ নবুয়ত লাভের আগে তাঁর দুই পুত্র সন্তান মারা যান। সন্তানের বিয়োগব্যথায় মুহ্যমান হওয়া অশোভনীয় কিছু ছিল না। বরং মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ছিল স্বভাবজাত ব্যাপার। মহানবী (সা) রাসূল হলেও মানব প্রকৃতির উর্ধ্বে ছিলেন না। আর তাই সন্তানদের মৃত্যুতে তিনি একেক সময় অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। আবার কোন কোন সময় তিনি বিহ্বল হয়ে পড়তেন। এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁর এই ব্যথা-বেদনা দূর করে মানসিক প্রশান্তির ব্যবস্থা করেন।

ইবরাহীমের জন্ম

মহানবী (সা)-কে এ ব্যাপারে বেশি দিন এই হতাশায় কাটাতে হয়নি। কিছু দিন পরই হযরত মারিয়া কিবতিয়ার ঘরে মহানবী (সা)-এর এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেন। তিনি নবীদের পিতা হযরত ইবরাহীমের নামানুসারে নবজাত সন্তানের নাম রাখেন ইবরাহীম। মিসরের বাদশাহ মোকাওকিস মারিয়া কিবতিয়াকে উপটোকন হিসাবে মহানবী (সা)-এর খেদমতে পাঠিয়েছিলেন। তখন থেকেই মারিয়া দাসী হিসাবে গণ্য ছিলেন। এজন্য মহানবী (সা)-এর অন্যান্য সহধর্মিণীর মতো মারিয়া মসজিদে নববীর সাথে কোন কক্ষ লাভ করেননি। মহানবী (সা) মদীনার উপকণ্ঠে মারিয়ার বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানেই তিনি থাকতেন। সে স্থানটি এখনো 'মাশরাবাতে উম্মে ইবরাহীম' নামে পরিচিত। মারিয়ার বাসস্থানটি আঙুরের লতাগুল্ল ঘেরা ছিল। সেকালে অন্যরা যেভাবে নিজেদের ক্রীতদাসীদের নিকট যাতায়াত করত মহানবী (সা)-ও তাই করতেন। বাদশাহ মোকাওকিস তাঁর বোন সীরীনের সাথে মারিয়াকে মহানবী (সা)-এর নিকট হাদিয়া বা উপটোকন হিসাবে পাঠালে তিনি তাকে পছন্দ করেন। মহানবী (সা) সীরীনকে হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিতকে দিয়ে দেন।

হযরত খাদীজা (রা)-এর ইত্তিকালের পর দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত মহানবী (সা)-এর স্ত্রীদের মধ্যে কারও ঘরে সন্তানের সম্ভাবনা দেখা যায় না। অথচ উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে কেউ কেউ তখনো যুবতী ছিলেন। কেউ ছিলেন মধ্য বয়সী। মহানবী (সা)-এর সহধর্মিণীর মর্যাদা লাভের

আগে তাঁদের কারো কারো সন্তানও হয়েছিল। এসব কারণে সে সময় মহানবী (সা)-এর সন্তান লাভের কোন আশা ছিল না। হযরত মারিয়া কিবতিয়া যখন গর্ভবতী হন এবং তাঁর ঘরে ইবরাহীমের জন্ম হয়, তখন মহানবী (সা)-এর বয়স ষাট অতিক্রম করে গেছে। এরূপ অবস্থায় পুত্র সন্তান লাভ করে মহানবী (সা) অত্যন্ত খুশি হন। এই মহামানবের পবিত্র অন্তর আনন্দে ভরে ওঠে। তাঁর এই আনন্দ ছিল বর্ণনাভীত। পুত্র সন্তান জন্মের খুশিতে হযরত মারিয়া কিবতিয়ার মর্যাদাও মহানবী (সা)-এর নিকট অত্যন্ত বেড়ে যায়। তিনি দাসীর মর্যাদা থেকে স্ত্রীর মর্যাদায় উন্নীত হন। এজন্য তাঁর সম্মানও অনেক বেড়ে যায়।

মারিয়া কিবতিয়া ও অন্যান্য সহধর্মিণী

হযরত মারিয়া কিবতিয়ার সম্মান ও মর্যাদায় অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীনের মধ্যে ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। এই ঈর্ষা ও ভাবাবেগের আর একটা কারণ হলো, হযরত মারিয়া ছিলেন মহানবী (সা)-এর পুত্র সন্তানের মা এবং অন্যরা ছিলেন নিঃসন্তান। নবজাত সন্তানের প্রতি মহানবী (সা)-এর স্নেহ-মমতা উম্মুল মু'মিনীনের ঈর্ষা আরো বাড়িয়ে তোলে। আবু রাফে'র স্ত্রী বিবি সালমা ছিলেন ইবরাহীমের ধাত্রী। মহানবী (সা) তাঁকেও অত্যন্ত আদর-যত্ন করতেন। ইবরাহীমের জন্ম হওয়ার দিন মহানবী (সা) প্রত্যেক ফকীরকে পুত্রের মাথার চুলের সমপরিমাণ রূপা দান করেন। মহানবী (সা) ইবরাহীমকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব উম্মে সাযফের উপর ন্যস্ত করেন। দুধ সংগ্রহের জন্য তিনি উম্মে সাযফকে সাতটি ছাগল প্রদান করেন। তিনি প্রতিদিন হযরত মারিয়ার ঘরে যেতেন এবং কচি শিশু ইবরাহীমের অঙ্গভঙ্গিতে আনন্দ উপভোগ করতেন। এসব কিছুও উম্মুল মু'মিনীনের ঈর্ষার পিছনে ইন্ধন যোগাচ্ছিল। আর এসব দেখার পর তাদের পক্ষে ঈর্ষা চেপে রাখা খুব একটা সম্ভবপর ছিল না।

একদিন শিশুপুত্র ইবরাহীমকে কোলে নিয়ে মহানবী (সা) হযরত আয়েশার কক্ষে আসেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল আনন্দের আভায় উদ্ভাসিত ছিল। তিনি হযরত আয়েশাকে বললেন, দেখ তো আমার ও ইবরাহীমের মধ্যে কতটা সাদৃশ্য রয়েছে? হযরত আয়েশা (রা) শিশু ইবরাহীমের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বললেন, “আপনার এবং এই শিশুর মধ্যে কোন প্রকার সাদৃশ্যই আমি দেখতে পাচ্ছি না।” হযরত আয়েশা (রা) দেখলেন, মহানবী (সা) ইবরাহীমের বাড়ন্ত স্বাস্থ্য দেখে অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি তাঁর কথার ধরন পাণ্টে বললেন, এ সময়ে ইবরাহীম যে পরিমাণ দুধ পান করে, অন্য কোন শিশু এই বয়সে সে পরিমাণ দুধ পান করলে ইবরাহীমের মতো, এমনকি তার চেয়েও ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকে। বস্তুত ইবরাহীমের জন্ম মহানবী (সা)-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে ঈর্ষার বীজ বপন করে। আর এই ঈর্ষা তির্যক বাক্য বিনিময়েরও সীমা ছাড়িয়ে যায়। মহানবী (সা)-এর জীবনচরিত ও ইসলামের ইতিহাসে এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে ওহীও নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীর মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করেন।

নবী করীম (সা) ও তাঁর সহধর্মিণীগণ

এ ধরনের পরিস্থিতির বহিঃপ্রকাশ ছিল একটা স্বভাবজাত ব্যাপার। মহানবী (সা) তাঁর সহধর্মিণীদের অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা দিয়ে রেখেছিলেন। আরবের ইতিহাসে এর

আগে এমনটি আর কখনো দেখা যায়নি। হযরত ওমর (রা) একবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

“প্রাক-ইসলামী যুগে আমরা মহিলাদের কোন প্রকার হিসাবেই গণ্য করতাম না। ইসলামী যুগে আল্লাহ তা’আলা তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন বিধান নাযিল করেন। এমনকি তিনি নারী জাতির জন্য অংশও নির্ধারণ করেন। একবার আমি কোন এক ব্যাপারে পরামর্শ করছিলাম। আমার স্ত্রী বললেন, এ ব্যাপারে আপনি এই পন্থা গ্রহণ করতে পারেন। তাকে বললাম, এ সম্পর্কে তুমি কি জান। অযথা নাক গলাচ্ছ কেন। তিনি বললেন, ‘হে ইবনে খাত্তাব! তোমার সাথে কোন ব্যাপারে আমার কথা বলাও তুমি পছন্দ করছ না। অথচ তোমার মেয়ে বিভিন্ন ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর সাথে কথা কাটাকাটিও করে থাকে। এজন্য কোন কোন সময় মহানবী (সা)-কে সারা দিন ক্ষোভ ও দুশ্চিন্তায় কাটাতে হয়।’ এ কথা শুনে আমি আমার চাদরটা শরীরে জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। হাফসার ঘরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি, হে আমার কন্যা! তুমি কি বিভিন্ন ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর সাথে কথা কাটাকাটি কর। আর এজন্য তাঁকে সারাদিন ক্ষোভ ও দুশ্চিন্তায় কাটাতে হয়? হাফসা বলল, ‘অবশ্যই, আমরা কোন কোন ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর সাথে কথা কাটাকাটি করে থাকি।’ আমি তাকে বললাম, হে আমার কন্যা! আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি ও রাসূলের ক্রোধ সম্পর্কে সতর্ক করছি। তুমি সে মহিলার পদাংক অনুসরণ করো না। তিনি তো অত্যন্ত সুন্দরী। আর মহানবী (সা) তাঁকে সবচেয়ে ভালবাসেন। তাঁর সাথে তোমার পাল্লা দেয়া সাজে না।’ এরপর আমি উম্মুল মু’মিনীন হযরত উম্মে সালামার ঘরে যাই। কারণ তিনি আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। আমি তাঁর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলি। হযরত উম্মে সালামা আমাকে বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! আর্শ্বের বিষয়, আপনি দেখছি সব ব্যাপারে, এমনকি রাসূলুল্লাহ ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়েও কথা বলছেন! তাঁর এই জবাবে আমি লজ্জিত হই এবং সেখান থেকে চলে আসি।”

ইমাম মুসলিম তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত আবু বকর (রা) মহানবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। অনুমতি লাভের পর তিনি সেখানে যান। এরপর হযরত ওমর (রা) অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁকেও রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। তাঁরা মহানবী (সা)-এর আশেপাশে তাঁর স্ত্রীদের সমবেত দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ (সা) বিষণ্ণ মনে চুপচাপ বসেছিলেন। হযরত ওমর ভাবলেন, আমি এমন কোন কথা বলব, যাতে মহানবী (সা) হেসে ফেলেন। হযরত ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! খারেজার কন্যা যদি আমার নিকট খরচ দাবি করে আমাকে সজোরে চপেটাঘাত করব, যাতে সে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।” হযরত ওমরের এ কথা শুনে মহানবী (সা) হেসে ফেলেন। তিনি বললেন, দেখ, এরা সবাই একত্রিত

১. সম্ভবত হযরত আয়েশার প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত ওমর (রা) তাঁর কন্যা এবং মহানবী (সা)-এর স্ত্রী

হযরত হাফসাকে এ কথা বলেছেন। -অনুবাদক

২. আল্লামা শিবলী নোমানী তাঁর ‘আল-ফারুক’ গ্রন্থে হযরত ওমরের স্ত্রীদের যেসব নাম উল্লেখ করেছেন, তাতে বিন্তে খারেজা বা খারেজার কন্যা নামের কোন মহিলা নেই। অবশ্য মুসলিম শরীফে এই নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। তাবারী গ্রন্থেও এই নাম উল্লেখ করা হয়নি। ‘রুহুল মাআনী’ গ্রন্থে বিন্তে যায়েদ বা যায়েদের কন্যা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এটাই সঠিক। -অনুবাদক

হয়ে আমার নিকট খরচ দাবি করছে। হযরত আবু বকর উঠে তাঁর মেয়ে হযরত আয়েশাকে থাপ্পড় মারেন। অনুরূপ হযরত ওমরও তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসাকে চপেটাঘাত করেন। তাঁরা উভয়ে তাঁদের মেয়েদের বলেন, তোমরা কি এমন জিনিস দাবি করছ, যা মহানবী (সা)-এর নেই! উম্মুল মু'মিনীনগণ বললেন, আল্লাহ্র শপথ! ভবিষ্যতে আমরা আর কখনো এমন দাবি করব না।

মহানবী (সা) মসজিদে যেতে দেরি করছিলেন। এ ব্যাপারে মুসল্লীরা মসজিদে নববীতে কানাঘুসা করছিলেন। এই অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা) মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসার সাথে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের এই ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا . وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا .

“হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, ‘তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করি এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দিই। তোমরা আল্লাহকে, তাঁর রাসূলকে ও পরকাল কামনা করলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।’” (৩৩ : ২৮-২৯)

উম্মুল মু'মিনীনদের পারস্পরিক পরামর্শ

এই ঘটনার পর মহানবী (সা)-এর সহধর্মিণীগণ তাঁর সম্পর্কে সলা-পরামর্শ করতেন। মহানবী (সা)-এর অভ্যাস ছিল আসর নামাযের পর কিছু সময়ের জন্য উম্মুল মু'মিনীনদের প্রত্যেকের কক্ষে যেতেন। একদিন তিনি হযরত হাফসা (রা)-এর কক্ষে, অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রা)-এর কক্ষে, প্রবেশ করেন। সেখানে সাধারণ নিয়মের চেয়ে একটু বেশি সময় অতিবাহিত করেন। তাতে অন্য স্ত্রীগণ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, ‘আমি ও হাফসা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমাদের যাদের কক্ষে মহানবী (সা) প্রবেশ করবেন, আমরা তাঁকে বলব, “হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। আপনি কি কোথাও মাগাফির পান করে এসেছেন?” মাগাফির ছিল এক ধরনের গাছের ফলের রস। খেতে মিষ্টি হলেও তাতে দুর্গন্ধ হতো। আর দুর্গন্ধের প্রতি মহানবী (সা)-এর অত্যন্ত ঘৃণা ছিল।

মহানবী (সা) তাঁদের একজনের কক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি বললেন, “হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি মাগাফির পান করেছেন?” মহানবী (সা) বললেন, “না তো! আমি তো যয়নব বিনতে জাহশের ঘরে মধু পান করেছি। আগামীতে আর পান করব না।” হযরত সাওদা (রা) বলেন, তিনি এ ব্যাপারে হযরত আয়েশার সাথে অভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। তাঁর কক্ষে মহানবী (সা) গেলে বললেন, “হে আল্লাহ্র রাসূল! মনে হয় আপনি মাগাফির পান করেছেন।”

মহানবী (সা) বললেন, “আমি মাগাফির পান করিনি।” হযরত সাওদা বললেন, তাহলে এটা কিসের দুর্গন্ধ? মহানবী (সা) বললেন, হাফসা আমাকে মধু পান করিয়েছে। হযরত সাওদা বললেন, সম্ভবত মৌমাছি উরফুত গাছের রস খেয়েছিল। এরপর মহানবী (সা) হযরত আয়েশার কক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি হযরত সাওদার অনুরূপ মন্তব্য করেন। এবার মহানবী (সা) হযরত সাফিয়ার কক্ষে প্রবেশ করেন। তিনিও পূর্বোক্ত দু’জনের অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। এরপর মহানবী (সা) বলেন, “মধু পান আমার জন্য হারাম।” মহানবী (সা)-এর এই মন্তব্যের পর হযরত সাওদা বলেন, ‘সুব্হানাল্লাহ! আমরা সফল হয়েছি। আমাদের চাতুর্যের শিকার হয়ে আপনি নিজের উপর মধু পান হারাম করলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হযরত সাওদার দিকে তাকালেন এবং তাঁকে নীরব থাকার ইঙ্গিত করলেন। হযরত সাওদা চুপ হয়ে গেলেন।

সেকালে আরবে নারী স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না। পারিবারিক ও সামাজিক কোন ব্যাপারে তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু মহানবী (সা)-এর পরিবার ছিল তার ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর স্ত্রীদের অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছিলেন। আর তাই স্বভাবতই উম্মুল মু’মিনীনগণ কোন কোন সময় এই মর্যাদা ও অধিকারের অপব্যবহারের লোভ সংবরণ করতে পারতেন না। কোন কোন সময় তাঁদের মুখ থেকে এমন সব কথাবার্তা বেরিয়ে পড়ত, যার দরুন মহানবীকে দিনভর বিষণ্ণ কাটাতে হতো। মহানবী (সা)-এর অমায়িকতার সুযোগে তাঁরা যাতে সীমা ছাড়িয়ে না যান, তার জন্য মহানবী (সা)-কে কোন কোন সময় স্ত্রীদের প্রতি কিছুটা কঠোর হতে হতো। হযরত ইবরাহীমের জন্মের পরও অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হযরত মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে হযরত ইবরাহীমের জন্ম হলে মহানবী (সা)-এর স্ত্রীগণ অত্যন্ত ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েন। হযরত আয়েশা (রা) নবজাতক হযরত ইবরাহীমের সাথে মহানবী (সা)-এর সাদৃশ্য অস্বীকার করে বসেন। হযরত আয়েশার এই আচরণ ছিল পরোক্ষভাবে হযরত মারিয়া কিবতিয়ার নির্মল চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ। অথচ তাঁর চারিত্রিক নিষ্কলুষতার প্রতি মহানবী (সা)-এর অগাধ আস্থা ছিল।

মহানবী (সা)-এর নিকট উম্মুল মু’মিনীনদের অভিযোগ

ঘটনাক্রমে একদিন হযরত হাফসা (রা) তাঁর পিতা হযরত ওমরের বাসায় যান। তিনি তাঁর পিতার সাথে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। হযরত মারিয়া মহানবী (সা)-এর সাথে দেখা করতে আসেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাফসার ঘরে অবস্থান করছিলেন। তিনি হাফসার ঘরে মারিয়ার সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করেন। ইতিমধ্যে হযরত হাফসা ফিরে আসেন। তিনি তাঁর কক্ষে হযরত মারিয়াকে মহানবী (সা)-এর সাথে দেখতে পান। হযরত হাফসা মারিয়ার বের হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁর এই প্রতীক্ষা দীর্ঘায়িত হয়। তিনি তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। মারিয়া বেরিয়ে যেতেই হযরত হাফসা কক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি মহানবী (সা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আপনার নিকট কে ছিল, আমি দেখতে পেয়েছি। আপনার কাছে যদি আমার সামান্য মর্যাদা থাকত, তাহলে আপনি আমাকে এভাবে অপমান করতেন না। মহানবী (সা) বুঝতে পারেন, আভিজাত্যের আবেগ হযরত হযরত হাফসাকে ব্যাপারটা হযরত আয়েশা কিংবা অন্য স্ত্রীদের নিকট প্রকাশ করতে প্রলুব্ধ করবে।

মহানবী (সা) হযরত হাফসাকে সন্তুষ্ট করার মনস্থ করেন। তিনি শপথ করেন, হযরত হাফসা যদি ব্যাপারটা অন্য কারো নিকট প্রকাশ না করেন, তা'হলে তিনি আর মারিয়ার সাথে মিলিত হবেন না। তাঁর জন্য মারিয়া হারাম হবে। হযরত হাফসা ব্যাপারটা প্রকাশ করবেন না বলে মহানবী (সা)-কে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু জাত্যাভিমান হযরত হাফসার অন্তরে কাঁটার মতো বিঁধছিল। তিনি ব্যাপারটা গোপন রাখতে পারেননি। চুপে চুপে হযরত আয়েশাকে বলে দেন। হযরত আয়েশাও আকার-ইঙ্গিতে মহানবী (সা)-কে বুঝিয়ে দেন, যে গোপন ব্যাপার হযরত হাফসার অন্তরে সংরক্ষিত ছিল, তা আমিও জেনে ফেলেছি। সম্ভবত ব্যাপারটা হযরত হাফসা ও হযরত আয়েশার মধ্যে সীমিত ছিল না। তাঁরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করার সময় অন্যান্য স্ত্রীও জেনে ফেলে থাকবেন যে, মহানবী (সা) হযরত মারিয়ার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাতে করে তাঁরাও হযরত হাফসা ও হযরত আয়েশার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে ফেলেন।

এটা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল না। কারণ কোন লোকের তাঁর স্ত্রী কিংবা দাসীর প্রতি আসক্ত হওয়া সে যুগে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কেননা ইসলামে এরূপ আসক্ত হওয়া বৈধ ব্যাপার ছিল। বিশেষ করে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর-তনয়াদের মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্নাদের এ নিয়ে মাতামাতি করে মহানবী (সা)-এর উপর প্রতিশোধ নেয়ার মতো এটা কোন ব্যাপারই ছিল না। অবশ্য অতীতেও তাঁরা এমনটি করেছেন। খোরপোষকে কেন্দ্র করে, হযরত যয়নবের ঘরে মধু খাওয়া নিয়ে কিংবা অন্যান্য কারণেও উম্মুল মু'মিনীনগণ মহানবী (সা)-এর সাথে মন কষাকষি করেছেন। এমনকি কোন কোন সময় হযরত আয়েশা কিংবা মারিয়ার প্রতি আসক্তিকে কেন্দ্র করেও তাঁরা মহানবী (সা)-এর সাথে মেজাজ দেখিয়ে কথাবার্তা বলেছেন।

হযরত যয়নব ও আয়েশার ঝগড়া

উম্মুল মু'মিনীনদের এই স্বাধীনতা এতটুকু পর্যন্ত গড়ায় যে, এক দিন মহানবী (সা) হযরত আয়েশার কক্ষে বসা ছিলেন। সবাই হযরত যয়নবকে তাঁদের প্রতিনিধি করে মহানবী (সা)-এর নিকট পাঠান। হযরত যয়নব সেখানে গিয়ে প্রকাশ্যে মহানবীকে লক্ষ্য করে বলেন, “আপনি আপনার স্ত্রীদের প্রতি ইনসাফ করছেন না। আয়েশার প্রতি আপনার অধিক আকর্ষণ আমাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে। আপনি কি আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক দিন এক রাত নির্দিষ্ট করে দেননি? কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা দেখলেন আপনি তাঁর প্রতি লক্ষ্য করছেন না। এমনকি আপনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্টও নন। তিনি আপনাকে খুশি করার জন্য নিজের জন্য নির্দিষ্ট দিন-রাত হযরত আয়েশাকে ছেড়ে দেন।” হযরত যয়নব এ পর্যন্ত বলেই ক্ষান্ত হননি। হযরত আয়েশা (রা) মহানবী (সা)-এর সামনে বসা ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কেও দুকথা শুনিতে দেন। হযরত আয়েশা (রা) জবাব দেয়ার চেষ্টা করেন। মহানবী (সা) ইঙ্গিত করে তাঁকে নীরব রাখেন। কিন্তু চুপ থাকা সত্ত্বেও হযরত যয়নব হযরত আয়েশাকে লক্ষ্য করে কড়া কথা বলতে থাকেন। এবার মহানবী (সা) হযরত আয়েশাকে আর বারণ করেননি। হযরত আয়েশা হযরত যয়নবকে প্রতি-উত্তর দিয়ে লা-জওয়াব করে দেন। তাতে মহানবী (সা) আনন্দ বোধ করেন। তিনি হযরত আবু বকর-তনয়ার জবাব দেয়ার তীক্ষ্ণতা দেখে বিস্মিত হন।

উম্মুল মু'মিনীনদের মন কষাকষির পরিণতি

উম্মুল মু'মিনীনদের পারস্পরিক ঈর্ষা ও মন কষাকষি চরম রূপ ধারণ করে। মহানবী (সা)-এর তরফ থেকে কোন স্ত্রীর প্রতি সোহাগ ও ভালবাসা প্রকাশও অন্যদের সহ্য করা মুশকিল হয়ে পড়ে। এই মনোমালিন্যের পরিণতিতে মহানবী (সা)-এর তাঁর স্ত্রীদের মধ্য থেকে কোন কোন উম্মুল মু'মিনীনকে বিদায় দেয়ার বিষয় চিন্তা-ভাবনা করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। হযরত ইবরাহীমের জন্মের পর তাঁরা আরো ব্যাকুল হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে সবার অগ্রগামী ছিলেন হযরত আয়েশা (রা)। বস্তুত মহানবী (সা)-এর স্নেহ-ভালবাসা ও উদারতাই উম্মুল মু'মিনীনদের এতটা সাহসী করে রেখেছিল। তাছাড়া স্ত্রীদের মনোমালিন্যে জড়িয়ে নিজের সময় নষ্ট করার মতো অবকাশও তাঁর ছিল না। কারণ তিনি নিবিষ্ট মনে রিসালাতের দায়িত্ব পালনেই সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যে একটা সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মাঝে-মধ্যে শাসনমূলক আচরণ করারও প্রয়োজন হতো। এ সময়ও অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। তিনি তাঁদেরকে তালাক দেয়ার হুমকি প্রদান করেন এবং তাঁদের সংস্রব ত্যাগ করেন। তাতে যদি তাঁরা সংশোধন হয়ে যান ভাল কথা। নতুবা পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তিনি তাঁদের বিদায় করে দেয়ার মনস্থ করেন।

স্ত্রীদের সংস্রব পরিত্যাগ

মহানবী (সা) পুরো একমাস উম্মুল মু'মিনীনদের সাথে মেলামেশা ত্যাগ করে আলাদা থাকেন। এ সময় মহানবী (সা)-এর মুখে তাঁদের সম্পর্কে কোন আলোচনাও শোনা যায়নি। কেউ তাঁদের সম্পর্কে তাঁর সামনে আলোচনা করারও সাহস পায়নি। ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং আরবের বাইরে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর জন্য তাঁকে ও মুসলমানদের কি কর্মপন্থা গ্রহণ করা দরকার এসব নিয়ে পুরো মাস তিনি চিন্তাভাবনায় নিমগ্ন থাকেন। হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) ও মহানবী (সা)-এর অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ও ঘনিষ্ঠ সাহাবী উম্মুল মু'মিনীনদের পরিণতি সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। মহানবী (সা)-এর অসন্তোষ এবং তার প্রেক্ষিতে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অসন্তোষের পরিণতিতে উম্মুল মু'মিনীনদের ভাগ্যে কি যেন ঘটে, এ নিয়ে সবাই অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়েন। অনেকে ধারণা করেছিল, গোপন কথা ফাঁস করে দেয়ার জন্য মহানবী (সা) হযরত হাফসাকে তালাক দিয়ে দেবেন। মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক কানাঘুষা হচ্ছিল, মহানবী (সা) তাঁর সকল স্ত্রীকে তালাক প্রদান করবেন। উম্মুল মু'মিনীনগণও ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে একজন অসীম দয়ালু ও উদার স্বামীকে কষ্ট দেয়ার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিলেন। মহানবী (সা) শুধু তাঁদেরই নয়, তাঁদের পিতামাতা, ভাই-বেরাদর, সন্তান-সন্ততি, এক কথায় সকল মানুষের জন্যই ইহকাল ও পরকালে একমাত্র ভরসা। এরূপ কুল-মাখলুকাত শ্রেষ্ঠ মহানবী (সা)-কে কষ্ট দিয়ে তাঁরা অনুশোচনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রীদের থেকে আলাদা অবস্থানকালে অধিকাংশ সময় তিনি তোষাখানা হিসাবে ব্যবহৃত তাঁর উঁচু কক্ষটিতে কাটাতেন। রাবাহ নামক তাঁর এক দাস উক্ত কক্ষের দহলিজে বসা থাকত। মহানবী (সা) একটি খেজুর গাছের গুড়ির সাহায্যে উক্ত কক্ষে আসা-যাওয়া করতেন। তাতে তার বেশ কষ্ট হতো।

হযরত ওমর (রা)-এর পদক্ষেপ

মহানবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকার প্রতিশ্রুতি এক মাসের সে দিন ছিল শেষ দিন। তিনি তাঁর উঁচু কক্ষে বসা ছিলেন। মুসলমানরা মসজিদে নববীতে চিত্তাশ্রিত হয়ে বসেছিলেন। তাঁরা পরস্পর বলাবলি করছিলেন, মহানবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়ে ফেলেছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের সবার চোখে-মুখে উদ্ভিগ্নতার ছাপ ছিল। এ সময় হযরত ওমর (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং মহানবী (সা)-এর অবস্থানরত কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজায় ক্রীতদাস রাবাহ বসা ছিল। হযরত ওমর (রা) তাঁর নিকট ভেতরে ঢোকান অনুমতি চাইলেন। রাবাহ কোন জবাব দিল না। তাতে হযরত ওমর অনুমান করলেন, মহানবী (সা)-এর নিকট থেকে অনুমতি নেয়া হয়নি। তিনি পুনরায় রাবাহকে বললেন। কিন্তু এবারও রাবাহ কোন উত্তর দিল না। এরপর হযরত ওমর উঁচু কক্ষে বললেন, ‘হে রাবাহ! আমার জন্য মহানবী (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা কর। তিনি হয়তো ধারণা করেছেন, আমি আমার কন্যা হাফসার ব্যাপারে সুপারিশ করতে এসেছি। আল্লাহর শপথ! তিনি যদি হাফসাকে দু’টুকরো করে ফেলার নির্দেশ করেন, আমি তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নে দ্বিধা করব না। অতঃপর মহানবী (সা) হযরত ওমরকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দান করেন।

হযরত ওমর (রা) কক্ষে প্রবেশ করে বসে পড়েন। তিনি কক্ষের ভিতর চারদিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলেন। মহানবী (সা) তাঁকে বলেন, হে ইবনে খাত্তাব! কাঁদছ কেন। হযরত ওমর কক্ষটির পরিবেশ দেখে কেঁদেছিলেন। কক্ষে আসবাবপত্র বলতে ছিল একটি খেজুর পাতার মাদুর। তাতে তিনি শুয়েছিলেন। মহানবী (সা)-এর পিঠে মাদুরের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। এ ছাড়া ছিল সামান্য কিছু যব, চামড়া পাকা করার জন্য বাবুল গাছের কিছু ছাল এবং প্রাচীরে ঝুলানো একটি চামড়া। হযরত ওমর তাঁর কান্নার কারণ বর্ণনা করেন। মহানবী (সা) হযরত ওমরকে পার্থিব আরাম-আয়েশ থেকে দূরে থাকার উপদেশ প্রদান করেন। তাতে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করেন। অতঃপর হযরত ওমর বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার স্ত্রীদের ব্যাপারে এতটা উদ্ভিগ্ন কেন। সত্যি যদি আপনি তাদের তালাক দিয়ে ফেলে থাকেন, তা হলে আল্লাহ তা‘আলা আপনার সাথে রয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলার সকল ফেরেশতা, জিবরাঈল, মীকাঈল, আমি, আবু বকর এবং সকল মুসলমান আপনার সাহায্যে সব সময় প্রস্তুত আছি। হযরত ওমর দীর্ঘক্ষণ মহানবী (সা)-এর সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁর রাগ স্তিমিত হয়ে আসে। এক পর্যায়ে তিনি হেসে ফেলেন। হযরত ওমর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, মুসলমানরা মসজিদে নববীতে বসে আপনার স্ত্রীদের তালাক সম্পর্কে কথাবার্তা বলছে। মহানবী (সা) বললেন, আমি আমার স্ত্রীদের তালাক দেইনি। হযরত ওমর এই সব সংবাদ মুসলমানদের শোনানোর জন্য মহানবী (সা)-এর অনুমতি প্রার্থনা করেন। কারণ তাঁরা কোন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য এখনো মসজিদে নববীতে অপেক্ষা করছেন। মহানবী (সা)-এর অনুমতি পাওয়ার পর হযরত ওমর মসজিদে নববীতে আসেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন, আল্লাহর রাসূল তাঁর স্ত্রীদের তালাক দেননি। এই ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ - وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ . وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ - فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا - قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ - إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا - وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ - وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ . عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرٌ مِّنْكَ مُسْلِمًا مَّوَدَّةً قُنِيتَ تَنْبِيتَ عِبْدَتٍ سَخِيتَ ثَبِيتَ وَأَبْكَارًا .

“হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য তা তোমার জন্য নিষিদ্ধ করছ কেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ্ তোমাদের শপথ থেকে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এবং স্মরণ কর, নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল। অতঃপর তার সে স্ত্রী তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। নবী এ বিষয়ে তার সে স্ত্রীকে কিছু বলল এবং কিছু বলল না। নবী যখন তা তাকে জানালো, তখন সে বলল, কে আপনাকে এটা জানাল? নবী বলল, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত। তোমাদের দু’জনের হৃদয় অন্যায়প্রবণ হয়েছে বলে এখন যদি তোমরা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর, তবে জেনে রাখ--আল্লাহ্, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীগণ তার সাহায্যকারী, উপরন্তু ফেরেশতাগণও তার সাহায্য করবে। যদি নবী তোমাদের সবাইকে পরিত্যাগ করে, তবে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে সম্ভবত তাকে তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী দেবেন--যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী ও কুমারী।” (৬৬: ১-৫)

পবিত্র কোরআনের এই ভাষ্য নাযিল হওয়ার পর মহানবী (সা)-এর পারিবারিক পরিস্থিতির এখানেই সমাপ্তি ঘটে। উম্মুল মু’মিনীনগণ তাঁদের পূর্ব প্রবণতা পরিত্যাগ করে সতর্ক হয়ে যান। মহানবী (সা) তাঁদের দিকে ফিরে যান। তাঁরা তওবা করেন, আল্লাহ্ তা‘আলার ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হন এবং নিজেদের ঈমানের পরিপক্বতা লাভ করেন। মহানবী (সা)-ও তাদের পারিবারিক চাহিদা পূরণের প্রতি যত্নবান হন। আর এসব চাহিদা কোন মানুষই উপেক্ষা করতে পারে না।

সমালোচনার কণ্ঠিপাথরে

উপরে যে ঘটনা উল্লেখ করা হলো, অর্থাৎ উম্মুল মু’মিনীনদের কাছ থেকে মহানবী (সা)-এর পৃথক হওয়া, তাদের তালাক নেয়ার এখতিয়ার প্রদান, মহানবী (সা)-এর পৃথক

হওয়ার বিভিন্ন কারণ ও সে সবার পরিণতি প্রভৃতি আমার নিকট বর্ণনাগত দিক থেকে যথার্থ বলে বিবেচিত। তাফসীর ও হাদীসের গ্রন্থরাজির বিভিন্ন বর্ণনা এবং জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থরাজিতে মহানবী (সা) ও উম্মুল মু'মিনীনদের সম্পর্কে যেসব বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোতেও উপরোক্ত ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু জীবনচরিত বিষয়ক কোন গ্রন্থেই উক্ত ঘটনার কারণ ও পরিণতি সুবিন্যস্তভাবে বর্ণনা করা হয়নি। অধিকাংশ জীবনচরিত গ্রন্থে উক্ত ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি। মনে হয়, এসব জীবনীকারদের নিকট উক্ত ঘটনার কোন গুরুত্বই ছিল না। সম্ভবত এজন্যই তাঁরা বিষয়টি আলোচনারই অন্তর্ভুক্ত করেননি। কোন কোন চরিত গ্রন্থে শুধু মধু ও মাগাফিরের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হযরত হাফসা ও হযরত মারিয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিতও করা হয়নি। পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা হযরত হাফসা ও মারিয়ার ঘটনা এবং মহানবী (সা)-কে গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও হযরত আয়েশার নিকট হযরত হাফসার প্রকাশ করে দেয়াটাকেই পুরো ঘটনার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের এরূপ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহানবী (সা) 'অত্যধিক নারী-আসক্ত' ছিলেন, এই ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণার অপপ্রচার করা। আমার মতে, মুসলিম ঐতিহাসিকদের এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকা উচিত নয়। বস্তুত এই ঘটনার গভীরে এক শিক্ষা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। পূর্বোক্ত আলোচনায় আমি অস্পষ্টভাবে সেদিকে কিছুটা ইঙ্গিত করেছি।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা তাঁদের ধর্মীয় সংকীর্ণতার দরুন এই ঘটনার ঐতিহাসিক মূল্যায়নের সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। কোন প্রকার সংকীর্ণতার ছায়া না মাড়িয়ে যদি সঠিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনার মূল্যায়ন করা হয়, তা'হলে মহানবী (সা) তো দূরের কথা একজন সাধারণ মানুষের বেলায়ও কেউ একথা মেনে নিতে পারে না যে, নিজের মালিকানাধীন এবং নিজের জন্য বৈধ একজন দাসীর সাথে তাঁকে হযরত হাফসা এক ঘরে দেখে ফেলেন এবং হযরত আয়েশার নিকট তা প্রকাশ করেন। আর শুধু এজন্য মহানবী (সা) পুরো এক মাস উম্মুল মু'মিনীনদের কাছ থেকে পৃথক থাকেন, তাদের তালাক দেয়ার হুমকি প্রদান করেন। অনুরূপ ঐতিহাসিক মূল্যায়নে একথা সঠিক মেনে নেয়া যায় না যে, মধু ও মাগাফিরের ঘটনা মহানবী (সা)-এর স্ত্রীদের নিকট থেকে তাঁর আলাদা হওয়া ও তালাক দেয়ার কারণ ছিল। বস্তুত নবী করীম (সা) ছিলেন মানবকুলে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অমায়িক স্বভাব, উদারমনা ও ধৈর্যশীল। তাঁর চরিত্রের এসব বৈশিষ্ট্য সকল ঐতিহাসিক অকপটে স্বীকার করেন। এরূপ অবস্থায় উক্ত দুটো মামুলী ঘটনার কোন একটি তাঁর স্ত্রীদের নিকট থেকে পৃথক হওয়া ও তালাকের হুমকির কারণ মনে করা, ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণে এতটুকু টেকে না। কিন্তু এসব কারণ ও পরিণতি আমি যেভাবে বিন্যাস করেছি, সেদিক যদি লক্ষ্য রাখা যায়, তাহলে ঐতিহাসিক ও যুক্তিগ্রাহ্য বিচার-বিশ্লেষণে এই সত্যটি বেরিয়ে আসে যে, এসব ছোটখাটো ঘটনার সাথে অন্যান্য কারণও নিহিত রয়েছে। আর সে সবার প্রেক্ষিতেই উক্ত পরিণতির প্রকাশ ঘটেছে। এদিক থেকে এসব ঘটনা স্বাভাবিক বলেই প্রতীয়মান হবে। আর তা সকল জ্ঞানীগুণীর নিকটই গ্রহণযোগ্য হবে। বস্তুত এসব ঘটনা আমি যেভাবে উপস্থাপন করেছি, তাতে যুক্তিগ্রাহ্যতা রয়েছে এবং মানব প্রবৃত্তির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তদুপরি তাতে মহানবী (সা)-এর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অভিব্যক্তিও প্রকাশ পায়।

প্রাচ্যবিদদের সমালোচনার জবাব

পূর্বে সূরা তাহরীমের যেসব আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, কোন কোন প্রাচ্যবিদ এসব আয়াতকে তাদের সমালোচনার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে বলেন, “কোরআন ছাড়া অন্য কোন আসমানী কিতাবে কোন নবী সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি।” বস্তুত পবিত্র কোরআনসহ বিভিন্ন আসমানী কিতাবে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে, সুদর্শন বালকের ছদ্মবেশে দু’জন ফেরেশতা হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ে অতিথি হিসাবে উপস্থিত হন। হযরত লূতের কওম তাদের সাথে অসদাচরণ করে। তাঁর স্ত্রীর কার্যকলাপও বিভিন্ন আসমানী কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসবের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। তাওরাত কিতাবে তো হযরত লূতের দুই কন্যার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “তাঁর দুই কন্যা আশংকা করে--আল্লাহ্ তা’আলার গযবের শিকার হয়ে তাদের পিতার কওম ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই তারা পরপর দুই রাত পিতাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে ফেলে। সে অবস্থায় তারা পিতার সাথে দৈহিক মিলনে প্রবৃত্ত হয়। তাতে তারা গর্ভবতী হয় এবং সন্তান প্রসব করে। এভাবে তারা হযরত লূতের বংশ রক্ষার প্রয়াস পায়।” বস্তুত সকল আসমানী কিতাবে নবী-রাসূলদের ঘটনাবলি সাধারণ মানুষের শিক্ষা গ্রহণের মহান লক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনেও এ ধরনের কয়েকটি কাহিনী রয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের অবগতির জন্য এসব ঘটনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। আর পবিত্র কোরআন শুধু মহানবী (সা)-এর উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়নি, সমগ্র মানবজাতির জন্যই তা নাযিল করা হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবী একজন রাসূল ছিলেন। তাঁর আগেও অনেক নবী-রাসূল এসেছেন। তাঁদের কথাও পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় মুসলমানদের শিক্ষা ও আদর্শ হিসাবে গ্রহণের জন্য যদি মহানবী (সা)-এর কথা, তাঁর জীবন-চরিতের ঘটনাবলি পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তবে সেসব অন্যান্য আসমানী কিতাবের মতো পবিত্র কোরআনেরও বর্ণনাধারার পরিপন্থী হতে পারে না। কারণ অন্যান্য আসমানী কিতাবেও তো নবী-রাসূলদের ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। তা’ছাড়া পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা)-এর স্ত্রীদের থেকে আলাদা হওয়ার পিছনে শুধু একটি কারণ কার্যকর ছিল না। শুধু এ কারণে মহানবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের থেকে আলাদা হননি যে, মারিয়া কিবতিয়ার সাথে মহানবী

(সা)-এর একাকী অবস্থানের ঘটনাটা হযরত হাফসা (রা) হযরত আয়েশার নিকট প্রকাশ করেছিলেন। কেননা (সেকালে) যে কোন পুরুষের তাঁর স্ত্রী ও দাসীদের সাথে মেলামেশার অধিকার স্বীকৃত ছিল। তাতে দৃষ্ণীয় কিছু ছিল না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি ব্যাপারটার বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে পশ্চিমা সমালোচকদের সমালোচনা ঐতিহাসিক মূল্যায়নের ধোপে টেকে না। বস্তুত আসমানী কিতাবের বর্ণনাধারার দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের সমালোচনা এতটুকু গুরুত্ব বহন করে না।

তাবুকের যুদ্ধ ও ইবরাহীমের ইত্তিকাল

মহানবী (সা) ও তাঁর সহধর্মিণীদের মধ্যকার পারিবারিক ঘটনাবলি তাঁর প্রাত্যহিক তাবলীগ বা ইসলামের প্রচার-প্রসার তৎপরতায় কোনরূপ প্রভাব ফেলতে পারেনি। মক্কা বিজয় ও সেখানকার অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভাব অনেক বৃদ্ধি পায়। আরবের প্রতিটি গোত্র এই সত্য উপলব্ধি করে যে, মুসলমানরা অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। কা'বাঘর যুগ যুগ থেকে সমগ্র আরববাসীর নিকট পবিত্র স্থান হিসাবে বিবেচিত ছিল। আরবের সবাই কাবাঘর ঘিয়ারত করে ধন্য হতো। মক্কা বিজয়ের পর এই ঘর এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দায়িত্ব যেমন চাবি রাখা, হাজীদের সেবা, পানি পান করানো প্রভৃতি মহানবী (সা)-এর নিয়ন্ত্রণে এসে পড়ে।

যাকাত ও খাজনা নির্ধারণ

মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্যে এই উপলব্ধি জাগে যে, আরব উপদ্বীপে প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে তাঁরাই সবার উপরে। আয় বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে স্বভাবতই ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের উপর যাকাত ফরয করা এবং অমুসলিম আরবদের উপর খাজনা নির্ধারণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রথমে ব্যাপারটা তাদের নিকট ছিল অত্যন্ত পীড়াদায়ক। যাকাত ও খাজনা চাওয়া হলে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত। এমনকি যুদ্ধ করার জন্য উদ্যত হতো। কিন্তু ইসলামের নতুন ব্যবস্থার দাবি ছিল, যে কোন অবস্থায় যাকাত ও খাজনা আদায় করতেই হবে। সুতরাং মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা) মুসলমানদের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের জন্য তহশীলদার প্রেরণ করেন। এসব যাকাত আদায়কারী কর্মচারীর প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা যেন আয়ের এক-দশমাংশ আদায় করেন। কোন অবস্থায়ই যেন কারো পুঁজি বা মূলধনের প্রতি হাত না বাড়ান। যাকাত আদায়কারীরা বিভিন্ন দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বিভিন্ন এলাকার মুসলমানরা তাদের হাসিমুখে স্বাগত জানায়। তারা নিজ নিজ উদ্বৃত্ত সম্পদের এক-দশমাংশ সন্তুষ্ট-চিত্তে যাকাত আদায়কারীদের নিকট সমর্পণ করে। বনী তামীমদের একটি শাখা গোত্র এবং বনী মুস্তালিক ছাড়া অন্য কেউ যাকাত প্রদানে দ্বিধা করেনি।

মহানবী (সা)-এর যাকাত আদায়কারীরা বনী তামীমদের প্রতিবেশী গোত্রগুলোকে যাকাত প্রদানের জন্য অনুরোধ করছিলেন। তারাও নিজেদের সম্পদ ও গবাদিপশুর যাকাত কর্মচারীদের নিকট প্রদান করছিল। এরূপ অবস্থায় বনী তামীমদের একটি শাখা বনী আশ্বরের কিছু লোক যাকাত আদায়কারীদের হামলা করে বসে। অথচ তখনো তাদের নিকট যাকাত চাওয়াই হয়নি।

হামলাকারীরা তাদের এলাকা থেকে যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের বের করে দেয়। এ খবর মহানবী (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি উয়ায়না ইবনে হিসনের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী পাঠিয়ে দেন। তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাল্টা আক্রমণ করেন। তাতে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। মুসলিম অশ্বারোহীরা উক্ত গোত্রের পঞ্চাশজনেরও বেশি নারী-পুরুষ ও শিশুকে খেফতার করে মদীনা ফিরে আসেন। মহানবী (সা) এসব বন্দীকে আটক করেন। বনী তামীমের একটি দল এর আগে ইসলাম গ্রহণের পর মক্কা বিজয় অভিযান এবং হুনায়েনের যুদ্ধে মহানবী (সা)-এর সমর্থনে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের কিছু লোক এখনো নিজেদের পুরনো ধর্ম ত্যাগ করেনি। বনী আশ্বরের এই পরিণতি জানতে পেরে তারা তাদের সরদারদের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর খেদমতে প্রেরণ করে। তারা মদীনা পৌঁছে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে। তারা মহানবী (সা)-এর হুজরার পেছন থেকে সজোরে ডাকতে শুরু করে, “হে মুহাম্মদ! বাইরে আস।” তাদের অমার্জিত ডাকাডাকিতে মহানবী (সা) মানসিকভাবে ব্যথিত হন। সে সময় যোহর নামাযের আযান হয়েছিল। নতুবা তিনি তাদের সাথে দেখা করার জন্য বাইরেই আসতেন না। তারা মহানবী (সা)-কে দেখেই তাদের পরিবার-পরিজনের সাথে উয়ায়না ইবনে হিসনের ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ করে। এ প্রসঙ্গে তারা মহানবী (সা)-কে একথাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ‘আমরা আপনার সমর্থনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী।’ তারা আরো বলে, ‘আমরা আপনার সামনে আমাদের গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য এসেছি। আপনি আমাদের বক্তা ও কবিকে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের অনুমতি প্রদান করুন।’ অতঃপর তাদের বক্তা উত্বরেদ ইবনে হাজেব উঠে দাঁড়ায় এবং নিজের গোত্রের গর্বমূলক বক্তব্য শুরু করে। তার অনলবর্ষী বক্তব্য শেষ হওয়ার পর মহানবী (সা) সাবেত ইবনে কায়েসকে এর জবাব দেয়ার নির্দেশ করেন। হযরত সাবেত ইবনে কায়েসের জবাবী ভাষণের পর তাদের কবি যাবরেকান ইবনে বদর উঠে দাঁড়ায়। সে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে এসব কবিতার প্রতিউত্তর প্রদান করেন হাস্‌সান ইবনে সাবিত। এই বাহাছ শেষে তামীম গোত্রের আকরা ইবনে হাবিস দাঁড়িয়ে বলে, ‘আমি আমার পিতার শপথ করে বলছি, এই ব্যক্তির (মহানবীর) প্রতি ঐশী সহানুভূতি রয়েছে। তাঁর বক্তা আমাদের বক্তার চেয়ে অনলবর্ষী এবং তাঁর কবি আমাদের কবির চেয়ে উত্তম। তাঁদের ধ্বনি আমাদের ধ্বনির চেয়ে বলিষ্ঠ।’ অতঃপর তাঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা) তাদের বন্দীদের মুক্ত করে দেন এবং তাদেরকে নিজেদের সম্প্রদায়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

অতঃপর অবশিষ্ট থাকে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী মুস্তালিক গোত্র। তারা যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের দেখে পালিয়ে যায়। কিন্তু তাদের চলে যাওয়ার পর এর পরিণতি ভেবে শংকিত হয়ে পড়ে। তারা মহানবী (সা)-এর দরবারে দূত পাঠিয়ে ফরিয়াদ করে যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কর্মচারীদের দেখে আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। অযথা ভয়-ভীতিই আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে। আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন।’ মহানবী (সা) তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করেন।

আরব উপদ্বীপের আনাচে-কানাচে মহানবী (সা)-এর প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কোন গোত্র তাঁর সাথে মোকাবেলার জন্য উদ্যত হলে মহানবী (সা) তাদের দমন করার জন্য

মুসলিম বাহিনী পাঠিয়ে দিতেন। যেসব গোত্র নিজেদের পুরনো ধর্মবিশ্বাস নিয়ে থাকতে চাইত তাদের খাজনা বা কর দিতে হতো। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করত, তাদের যাকাত দিতে হতো।

রোমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি

মহানবী (সা) আরবের সকল এলাকা থেকে বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার তৎপরতায় ব্যস্ত ছিলেন। এ সময় তিনি খবর পেলেন, মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধূলিসাৎ করে দেয়ার জন্য আরবের উত্তর সীমান্তে প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য রোমানরা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তাদের লক্ষ্য ছিল, প্রচণ্ড আক্রমণের মাধ্যমে আরবের উদীয়মান মুসলিম শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তাতে করে আরবের উত্তর অংশ সিরিয়ায় রোমানদের এবং পূর্ব অংশ হীরায়ে ইরানীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এ খবর ভীতিপ্রদরূপে মহানবী (সা)-এর নিকট পৌঁছায়। কিন্তু তাতে তিনি এতটুকু বিচলিত হননি। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, নিজেই এই আক্রমণ মোকাবেলা করবেন। তাদের শক্তিমদমত্ততা এমনভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন, ভবিষ্যতে যাতে আর কোন দিন রোমানরা আরবভূমি আক্রমণের দুঃসাহস না করে।

গরমকাল তখনও শেষ হয়নি। খরিফ ফসল বোনার আয়োজন চলছিল। সে সময়ও আরবে এরূপ প্রচণ্ড গরম পড়ছিল যে, গ্রীষ্মের দাবদাহকেও হার মানিয়ে দিচ্ছিল। তা'ছাড়া মদীনা থেকে সিরিয়ার দূরত্ব ছিল অনেক। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। এই সুদীর্ঘ সফরে রসদপত্র ও প্রচুর পানি সঙ্গে নেয়ারও প্রয়োজন ছিল। এসব কারণে পুরোপুরি প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে আগেভাগে এ সম্পর্কে মুসলমানদের অবহিত করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এটা ছিল মহানবী (সা)-এর স্বাভাবিক নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ। সাধারণত তিনি সামরিক অভিযানের প্রাক্কালে গন্তব্যস্থল প্রকাশ করতেন না। তাতে করে শত্রুপক্ষ তাঁর অভিযানের লক্ষ্যস্থল সম্পর্কে কোন প্রকার অনুমান করতে পারত না। কিন্তু সিরিয়া অভিযানের ব্যাপারটি ছিল আর পাঁচটা অভিযানের চেয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। প্রস্তুতি গ্রহণের তাগিদেই এ সম্পর্কে মুসলমানদের অবহিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সারকথা, এই অভিযানের খবর তিনি মুসলিম গোত্রগুলোতে পৌঁছে দেন। তিনি তাদের যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। কারণ এই অভিযানে সৈন্যসংখ্যা যত বেশি হবে ততই কল্যাণকর হবে। তা'ছাড়া তিনি সৈন্যবাহিনী গঠনে আল্লাহর নামে বৈষয়িক সাহায্য দেয়ার জন্য বিত্তবানদের আহ্বান জানান। সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যও তিনি বিত্তবানদের অনুরোধ করেন। এরূপ প্রকাশ্য প্রস্তুতির আরেকটা লক্ষ্য ছিল, সুবিন্যস্ত রোমান বাহিনী মুসলমানদের বিরূপ করে প্রস্তুতির খবর পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

মুসলমানদের মধ্যে আহ্বানের প্রভাব

এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার হলো, মহানবী (সা)-এর এই আহ্বান মুসলমানরা কিভাবে গ্রহণ করেছিল। কারণ তারা জানত, এই অভিযানে তাদেরকে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পরিবার-পরিজন ও বিষয়-সম্পদ ছেড়ে মরুভূমির সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। তারা যে শত্রুবাহিনীর মোকাবেলা

করবে, তারা ইরানীদের পরাজিত করেছে। এর আগে মুসলমানরাও সে বাহিনীর সাথে লড়াই করে, কিন্তু জয়লাভ করতে পারেনি। মুসলমানদের মধ্যে ঈমানের দৃঢ়তা, রাসূলের প্রতি ভালবাসা এবং আল্লাহর সত্য ধর্মের সাথে তাদের প্রগাঢ় সম্পর্ক কি এতটা ছিল যে, মহানবী (সা)-এর আহবানে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে সাড়া দেবে? দলে দলে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে দিগন্তহীন মরুর বুকে ছড়িয়ে পড়বে? নিজেদের গবাদিপশুসহ সর্বাঙ্গিক প্রস্তুতি নিয়ে ধূলিধূসর বালুরাশি উড়িয়ে এগিয়ে যাবে। আর শত্রুবাহিনী এ খবর শোনামাত্র ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত পালিয়ে যাবে। একটি বারও পিছনে ফিরে তাকাবে না? মুসলমানদের মধ্যে কি এমন লোকও ছিল, যাদেরকে রাস্তার দুঃখ-কষ্ট, গরমের প্রচণ্ডতা, ক্ষুধা-তৃষ্ণার ভয় রণাঙ্গনে যোগদান থেকে বিরত রাখবে এবং তারা পশ্চাদপসরণ করে নিজ নিজ জায়গায় নিষ্ক্রিয় থাকবে? বস্তুত সে সময় মুসলমানদের ভিতর দু'ধরনের লোকই ছিল। এমন লোক ছিল যাদের অন্তর হেদায়েতের আলোকে সমুজ্জ্বল ছিল। তাঁদের প্রতিটি ধর্মী ঈমানের প্রেরণায় পরিপূর্ণ ছিল। কিছুসংখ্যক এমনও ছিল, যারা কোন প্রকার লোভ-লালসা কিংবা ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা দেখছিল, আরবের সব ক'টি গোত্রই মুসলমানদের সাথে মোকাবেলায় কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তারা একের পর এক মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে এবং জিযিয়া দেয়ার জন্য সম্মতি প্রকাশ করেছে। এই অবস্থা দেখে তারাও গনীমতের মালের প্রতি লোভাতুর হয়ে পড়ে। তাছাড়া এই শ্রেণীটি মুসলমানদের অপরাজেয় শক্তিতে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। কারণ মুসলিম শক্তির বিপরীতে অপর কোন শক্তি তখন দাঁড়াতে পারছিল না। এমনকি আশেপাশের রাজশক্তিও মুসলিম শক্তিকে ভয় করত। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্ততা না থাকলেও লোভ ও ভয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

মহানবী (সা)-এর যুদ্ধ প্রস্তুতির আহবানে প্রথম শ্রেণীর মুসলমানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। এই সাড়াদানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন অত্যন্ত গরীব। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য কোন সওয়ারী বা বাহন পর্যন্ত তাদের ছিল না। অবশ্য স্বতঃস্ফূর্ত ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ বিত্তবান ছিলেন। তাঁরা নিজেদের বিষয়-সম্পদ ইসলামের পথে বিসর্জন দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্য মনে-প্রাণে আকাজক্ষা পোষণ করছিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা মহানবী (সা)-এর আহবানে নানা বাহানা ও ওষর-আপত্তি প্রকাশ করতে লাগল। তারা নিজেদের মধ্যে মহানবী (সা)-এর যুদ্ধাভিযানের আহবান নিয়ে উপহাস করত। তারা বলত, মহানবী (সা) এরূপ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দূর-দূরান্তের একটি এলাকা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই শ্রেণীটি ছিল মোনাফেক। তাদের সম্পর্কে সূরা 'তাওবা' নাযিল হয়। তাতে একদিকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, অপরদিকে মহানবী (সা)-এর আহবানের বিরোধীদের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে।

মোনাফেকদের বিরোধিতা

মহানবী (সা)-এর তরফ থেকে যুদ্ধে যাওয়ার আহবানের প্রেক্ষিতে মোনাফেকরা পরস্পরে বলাবলি শুরু করল, এরূপ প্রচণ্ড গরমে সফরে বের হওয়া উচিত হবে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ - قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا - لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ .
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا - جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

“এবং তারা বলল, গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বল, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তারা বুঝত। অতএব তারা কিঞ্চিৎ হেসে নিক, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তারা প্রচুর কাঁদবে।” (৯ : ৮১-৮২)

মহানবী (সা) বনী সালামা গোত্রের জাদ ইবনে কায়েসকে লক্ষ্য করে বললেন, হে জাদ! তুমি কি এবার বনী আসগারের (রোমানদের) সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে? জাদ বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আমাকে অব্যাহতি দান করুন। আমাকে বিপদে ফেলবেন না। কারণ আমার গোত্রের লোকেরা জানে, নারীর প্রতি আমার অত্যন্ত দুর্বলতা রয়েছে। আমি জানি, বনী আসগারের মহিলারা অত্যন্ত সুন্দরী। আমি ভয় করছি, এসব সুন্দরী মহিলাকে দেখলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব না।’ এ কথা শুনে মহানবী (সা) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত নাযিল হয় :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي - اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا - وَاِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ .

“তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে, ‘আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফিতনায় ফেলো না।’ সাবধান! এরাই ফিতনায় পড়ে আছে। জাহান্নাম তো কাফেরদের ঘিরেই আছে।” (৯ : ৪৯)

যারা মনে মনে মহানবী (সা)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করত, এ সময়ে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং মানুষকে যুদ্ধাভিযান থেকে ফুসলিয়ে ফিরিয়ে রাখার ভাল সুযোগ পেয়ে যায়। মহানবী (সা) কৌশলগত কারণেও এসব লোকের প্রতি এতটুকু নমনীয়তা প্রদর্শন করেননি। কারণ তাতে এসব লোকের হীন উদ্দেশ্য সফলতার আশংকা ছিল। তিনি তাদের শত্রু হাতে ধরার সিদ্ধান্ত নেন। একদিন তিনি জানতে পারেন, তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক সুওয়ায়লিম ইহুদীর ঘরে একত্রিত হয়ে অন্যদের বিভ্রান্ত করে এবং মানুষকে যুদ্ধাভিযান থেকে বিরত থাকার জন্য কুপরামর্শ দিয়ে থাকে। এ খবর শুনে মহানবী (সা) কয়েকজন মুসলমানসহ হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। সে সময় মোনাফেকরা তাদের কুকর্মে লিপ্ত ছিল। মুসলমানরা সুওয়ায়লিম ইহুদীর ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। মোনাফেকদের এক ব্যক্তি ছাদ টপকিয়ে বেরিয়ে যায়। অবশ্য তার পা ভেঙে যায়। অন্যরা আগুনের ভিতর দিয়ে কোনরূপ পালাতে সক্ষম হয়। এরপর তারা আর যুদ্ধাভিযান বিরোধী কোন আচরণ করেনি। এ ঘটনা থেকে অন্যরাও শিক্ষা গ্রহণ করে। ভবিষ্যতে কেউ আর এ ধরনের কিছু করার সাহস করেনি।

দরিদ্র বাহিনীর প্রস্তুতি

উপরোক্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মোনাফেক ও তাদের সমমনাদের মধ্যে বিরাট প্রভাব পড়ে। সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতি ও তাদের জন্য মাল-সামান সরবরাহে বিভূবানরাও মুক্তহস্তে এগিয়ে আসেন। তারা অকাতরে দান করেন। হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা) একাই এক

হাজার দীনার খরচ করেন। তিনি ছাড়া অন্যরাও নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী অর্থ ও মাল-সামান প্রদান করেন। এ ছাড়া যারা নিজেদের ব্যয় নির্বাহে সক্ষম ছিল, তারা নিজেরাই নিজ নিজ খরচের দায়িত্ব গ্রহণ করে। দরিদ্রদের মধ্যে অধিকাংশ তাদেরকে সঙ্গে নেয়ার জন্য মহানবী (সা)-এর খেদমতে আবেদন করে। এসব লোকের মধ্যে যাদের নেয়া সম্ভব হয়েছে, তাদেরকে মহানবী (সা) সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। অবশিষ্টদের ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বলেন, 'তোমাদের জন্য সওয়ারী সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না। এ কথা শুনে এবং নিজেদের সামর্থ্য না থাকায় তাঁরা কেঁদে ফেলেন। এজন্য এসব লোক 'বাকাদিন' বা ক্রন্দনকারী নামে অভিহিত হতে থাকে।

এই অভিযানের বাহিনী গড়ে তুলতে মহানবীকে চরম অর্থসংকট ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এ জন্য এই বাহিনী 'জায়শে উসরাত' বা দরিদ্র বাহিনী নামে পরিচিতি লাভ করে। শেষ পর্যন্ত ত্রিশ হাজার সৈন্য মহানবী (সা)-এর সাথে অভিযানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

মদীনার অদূরে এই বাহিনী সমবেত হয়। মহানবী (সা)-এর অনুপস্থিতিতে হযরত আবু বকর (রা) নামাযের ইমামতি করেন। মহানবী (সা) তখনো মদীনায় ছিলেন। তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতে মদীনার বিভিন্ন ব্যাপার পরিচালনার ব্যবস্থা করছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিকালের জন্য মদীনায় মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে খলীফা মনোনীত করেন। নিজের পরিবারবর্গ ও পারিবারিক অন্যান্য বিষয় দেখাশোনার জন্য হযরত আলীকে নিজের প্রতিনিধি মনোনীত করেন। তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়ার পর মহানবী (সা) সৈন্যবাহিনীর নিকট আসেন এবং তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার গোত্রের কিছু লোক নিয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের জন্য আসে, কিন্তু মহানবী (সা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার লোকদের সৈন্য বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুমতি প্রদান করেননি। কারণ তার প্রতি মহানবী (সা)-এর আস্থা ছিল না। এমনকি তার ঈমান সম্পর্কেও মহানবী (সা) নিশ্চিত ছিলেন না।

সৈন্যবাহিনীর রওয়ানা

মহানবী (সা) সৈন্যবাহিনীকে অভিযানে রওয়ানা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক ধূলি-ধূসরিত হয়ে ওঠে। অশ্বরাজির হেঁষা হেঁষা রবে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। মদীনার মহিলারা বিভিন্ন ভবনের ছাদে উঠে মুসলিম বাহিনীর এই দৃশ্য দেখতে থাকে। এই বাহিনী মহানবী (সা)-এর নেতৃত্বে উষর মরু পাড়ি দিয়ে সিরিয়ার দিকে এগিয়ে চলে। ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাদের এতটুকু পরোয়া ছিল না। এসব দুর্বলতা ও আরাম-আয়েশকে তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বিসর্জন দিয়েছিল। এই বাহিনীর অগ্রভাগে ছিল দশ হাজার অশ্বারোহী। অপর দিকে মদীনার বিভিন্ন ভবনের সঙ্গে দর্শনার্থী মহিলাদের ভিড়। যারা মহানবী (সা)-এর আহবানে সাড়া দেয়নি এবং অভিযানে যোগদান করেনি, তাদের কারো কারো মনে এই দৃশ্য অত্যন্ত আবেগ অনুপ্রেরণার সূচনা করে। তাদের একজন ছিলেন হযরত আবু খায়ছামা (রা)। তিনি এই দৃশ্য দেখে ঘরে ফিরে দেখেন তাঁর দুই স্ত্রী ছাউছি তৈরি করে তাতে পানি ছিটিয়ে রেখেছেন। তাঁর জন্য খাবার ও শীতল পানিরও তাঁরা ব্যবস্থা করেছেন। এসব আয়োজন দেখে হযরত আবু খায়ছামা দুঃখ করে বললেন, মহানবী (সা) প্রচণ্ড রোদ, ঝড় ও

গরম সহ্য করবেন আর আবু খায়ছামা সুশীতল ছায়ায় বসে সুস্বাদু খাবার খাবে, সুন্দরী স্ত্রীদের পাশে বসে চিত্তবিনোদন করবে এবং তার বিষয়-সম্পদও তার চোখের সামনে থাকবে এ কিছুতে হতে পারে না। আমার জন্য পথের খরচপত্র সংগ্রহ কর। আমিও মহানবী (সা)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হব। সুতরাং তার জন্য রাহা খরচের ব্যবস্থা করা হলো। তিনি দ্রুত পথ চলে মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন।’ হযরত আবু খায়ছামা ছাড়া আরো যারা সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেনি, তাঁদের অনেকে অনুতপ্ত হলেন। তাঁরা হযরত আবু খায়ছামাকে অনুসরণ করে মুসলিম বাহিনীতে शामिल হন।

হিজ্র নামক স্থানে যাত্রাবিরতি

মুসলিম বাহিনী একের পর এক মন্বিল অতিক্রম করে হিজ্র নামক স্থানে পৌঁছান। সেখানে ছামূদ জাতির বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল। মহানবী (সা) এই জায়গায় ছাউনি স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন। সৈন্যরা এখানকার কূপ থেকে পানি পান করেন। কিছুটা বিশ্রাম নেয়ার পর মহানবী (সা) সৈন্যদের উদ্দেশে বললেন, “তোমরা এই কূপের পানি পান করবে না। এমন কি ওয়ূতেও ব্যবহার করবে না। এই পানি দ্বারা তোমাদের কেউ আটা ছেনে থাকলে তা উটকে খাইয়ে দাও। নিজেরা তা খাবে না। এ ছাড়া তোমাদের কেউ সঙ্গী-সাথী ছাড়া বাইরে যাবে না। কারণ এই এলাকা দিয়ে লোক চলাচল করত না। এখানে প্রচণ্ড বালুঝড় ওঠে। মানুষ এমনকি উট পর্যন্ত এই ঝড়ের আবর্তে বালিয়াড়ির নিচে চাপা পড়ে যায়। দু’জন মহানবী (সা)-এর নির্দেশ উপেক্ষা করে বাইরে বেরোয়। তাদের একজনকে মরুঝড় উড়িয়ে নিয়ে যায়। অপরজন বালুচাপা পড়ে প্রাণ হারায়। রাত ভোর হওয়ার পর মুসলিম সৈন্যরা দেখলেন কূপটি বালুতে ভরে গেছে। তাতে পানির চিহ্নমাত্র নেই। এই অবস্থা দেখে তাঁরা পানির জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ তাদেরকে আরো সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। ইতিমধ্যে সেখানে এক পশলা বৃষ্টি হয়। মুসলিম বাহিনী বৃষ্টির পানি পান করে তৃপ্ত হন এবং প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করেন। তাতে করে তাদের শংকা দূর হয় এবং খুশির আভা চোখে-মুখে ফুটে ওঠে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে উঠলেন, এটা মহানবী (সা)-এর মু’জিয়া বা অলৌকিক কীর্তি ছাড়া কিছু নয়। আবার কেউ কেউ ভাবলেন, এই বৃষ্টিপাত ছিল একটি আকস্মিক ব্যাপার।

রোমানদের প্রত্যাবর্তন

অতঃপর মুসলিম বাহিনী তাবুকের দিকে যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে রোমানরা বিশাল মুসলিম বাহিনী ও তাদের শক্তিমত্তা সম্পর্কে জেনে ফেলে। এজন্য তারা ফিরে যাওয়াই কল্যাণকর মনে করে। রোমানরা সিরিয়ার অভ্যন্তরে তাদের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেয়।

১. গ্রন্থকার হযরত আবু খায়ছামা সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, ইবনে হিশাম প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে তা ঠিক নয়। তাঁদের মতে তাবুক অভিযানের প্রস্তুতিকালে আবু খায়ছামা মদীনায় ছিলেন না। মহানবী (সা)-এর রওয়ানা দেয়ার পর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। বাড়ি এসে দেখেন স্ত্রীরা তাঁর জন্য শীতল ছাউনি তৈরি করেছেন, বাগান সাজিয়েছেন এবং সুস্বাদু খাবার তৈরি করে রেখেছেন। এসব দেখে তিনি মহানবী (সা)-এর সফর কষ্টের কথা স্মরণ করেন। এরপর তিনিও দ্রুত রওয়ানা দিয়ে মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হন। -অনুবাদক

মহানবী (সা) তারুকে পৌঁছে রোমানদের এই ভীকৃতার খবর পেয়ে যান। তিনি রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তর পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা অপ্রয়োজন মনে করেন। তিনি সীমান্তের নিকট বেশ কিছু দিন^১ অবস্থান করেন। যদি কেউ ইচ্ছা করে এখানে অবশ্যই মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু কেউ এরূপ দুঃসাহস করেনি। এ সময়ে মহানবী (সা) ভবিষ্যত নিরাপত্তার লক্ষ্যে কিছু সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যতে যাতে কেউ এদিক থেকে আরবভূমি আক্রমণের সাহস না করে।

সীমান্তবর্তী রোমান শাসকদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ইউহান্না ইবনে রাউবা। তিনি ছিলেন ঈলার শাসক। মহানবী (সা) তাঁর নিকট দূত পাঠান। দূতের মারফত তাকে জানান হলো, ‘হয় তুমি আমাদের আনুগত্য কর নতুবা আমাদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।’ এই সংবাদ পেয়ে ইউহান্না মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। এ সময় তার গলায় একটি সোনার ক্রুশ ঝুলানো ছিল। তিনি মহানবী (সা)-কে কিছু উপহার প্রদান করেন এবং আনুগত্য স্বীকার করেন। জিযিয়া প্রদানের শর্তে মহানবী (সা)-এর সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। জারবা^২ ও আয়রুহের^৩ শাসকরাও মহানবী (সা)-এর জিযিয়া দেয়ার শর্তে সন্ধিচুক্তি করেন।

সীমান্তবাসীদের সাথে চুক্তি

মহানবী (সা) উপরে উল্লিখিত খৃষ্টান শাসকদের কয়েকটি ‘নিরাপত্তা লিপি’ প্রদান করেন। ইউহান্নাকে দেয়ার নিরাপত্তালিপিটির ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’

এই নিরাপত্তালিপি আল্লাহ্ এবং তাঁর নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর তরফ হতে ইউহান্না ইবনে রাউবা ও ঈলার অধিবাসীদের জন্য। পানি ও স্থলপথে তাদের নৌযান ও কাফেলাগুলোর নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। তারা এবং সিরিয়া, ইয়ামন ও উপকূলীয় এলাকার যেসব অধিবাসী তাদের সাথে রয়েছে, সবাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তা লাভ করবে। তাদের মধ্যে যদি কেউ চুক্তিবিরোধী আচরণ করে, তার সম্পদ ও জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা হবে না। মুহাম্মদের জন্য মানুষের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা বৈধ হবে। তারা যেসব জলাশয়ে যাবে কিংবা যে পানি ও স্থলপথে সফর করবে, তাতে তাদের বাধা দেয়া বৈধ হবে না।”

এই চুক্তিপত্র সম্পর্কে উভয় পক্ষ একমত হন। এই চুক্তির স্মৃতি হিসাবে মহানবী (সা) ইউহান্নাকে একটি ইয়ামনী চাদর উপহার প্রদান করেন এবং তাকে বেশ আদর-আপ্যায়ন করেন। উভয় পক্ষ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ঈলার বাসিন্দারা বার্ষিক তিন শ’ দীনার করে জিযিয়া প্রদান করবে।

১. মহানবী (সা) তারুকে ১৭ দিন অবস্থান করেন। -অনুবাদক

২. জারবা হচ্ছে সিরিয়ার ওমান এলাকার একটি জনপদ।

৩. হিজাজ সীমান্তে বালকা ও ওমানের পার্শ্ববর্তী সিরিয়ার একটি শহরের নাম আয়রুহ।

হযরত খালিদের দূমা অভিযান

রোমানদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন এবং সীমান্তবর্তী খৃষ্টান শাসকদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর এই এলাকায় মহানবী (সা)-এর আর যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তিনি অনেকটা নিশ্চিত ছিলেন যে, রোমান বাহিনী পুনরায় মুসলমানদের সাথে মোকাবেলার সাহস করবে না। এরপরও একটা আশংকা ছিল, রোমানরা দূমাতুল জান্দালের দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। এরূপ অবস্থায় দূমাতুল জান্দালের খৃষ্টান শাসক উকায়দির ইবনে আবদুল মালেক আলকিন্দী রোমান বাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এই দিক লক্ষ্য করে মহানবী (সা) পাঁচশ' অশ্বারোহীসহ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে দূমাতুল জান্দাল অভিযানে পাঠান। নিজে মুসলিম বাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা দেন। হযরত খালিদ (রা) তাঁর অশ্বারোহী সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত গন্তব্য স্থানের দিক রওয়ানা দেন। তিনি রাতে রাতে দূমাতুল জান্দালে পৌঁছান। মুসলিম বাহিনীর অভিযান সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন উকায়দির জ্যেৎশ্রা রাতে তার ভাই হাস্‌সানকে নিয়ে বন্য গরু শিকারে বেরিয়েছিলেন। হযরত খালিদ তাদের দেখে আটক করেন। তিনি হাস্‌সানকে হত্যা করেন এবং উকায়দিরকে শহরের প্রবেশদ্বার খুলে দেয়ার শর্তে বন্দী করেন। প্রবেশদ্বার খুলে না দিলে তাকেও হত্যার হুমকি দেয়া হয়। শহরের অধিবাসীরা তাদের শাসকের জীবনের নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে শহরের প্রবেশদ্বার খুলে দেয়। হযরত খালিদ শহরবাসীদের নিকট থেকে দু'হাজার উট, আট শ' ছাগল, চার শ' ওয়াসাক বা দু'হাজার এক শ' পঞ্চাশ মণ গম এবং চার শ' বর্ম গনীমতের মাল হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি এসব মাল-সামান ও বন্দী উকায়দিরকে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। মহানবী (সা) উকায়দিরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান। উকায়দির ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহানবী (সা)-এর সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন।

মুসলিম বাহিনীর মদীনায় প্রত্যাবর্তন

এই বিরাট বাহিনী নিয়ে মহানবী (সা)-কে সিরিয়া থেকে মদীনায় ফিরে আসা চাউখানি ব্যাপার ছিল না। মহানবী (সা) ঈলা ও আশেপাশের শাসকদের সাথে যেসব সন্ধিচুক্তি করেন অনেক মুসলমান এসবের গুরুত্ব ও সুদূরপ্রসারী কল্যাণ উপলব্ধি করতে পারেননি। বস্তুত এসব চুক্তির মাধ্যমে তিনি গোটা আরবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। সুকৌশলে তিনি এসব এলাকাকে রোমান ও আরবের মাঝখানে একটা প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড় করান। কিন্তু মুসলমানদের অনেকে মহানবী (সা)-এর এই দূরদর্শী পদক্ষেপের গুরুত্বই অনুধাবন করতে পারেনি। তাদের শুধু লক্ষ্য ছিল, তারা দীর্ঘপথ অতিক্রমের কষ্ট স্বীকার করেছে; কিন্তু এরপরও তাদেরকে বন্দী ও গনীমতের মাল ছাড়াই ফিরতে হয়েছে। এমনকি যুদ্ধ করার সুযোগও তাদের হয়নি। দীর্ঘ বিশ দিন তাবুকে অবস্থানের পর তাদেরকে মদীনায় ফিরে আসতে হয়েছে। অথচ এ সময় মরুভূমিতে প্রচণ্ড গরম ছিল। মদীনার ফলফলাদি পেকে গিয়েছিল। এ সময় মদীনায় থাকলে তারা ফলফলাদি দ্বারা উপকৃত হতে পারত। কিন্তু সফরে থাকার দরুন তা সম্ভব হলো না।

১. দূমাতুল জান্দাল সিরীয় সীমান্তের একটি প্রসিদ্ধ শহর। দামেশক ও মদীনার মধ্যবর্তী এই শহরটি দামেশক থেকে সাত মন্‌যিল দূরে অবস্থিত। সেকালে সাধারণত এক মন্‌যিল পথ একদিনে অতিক্রম করা হতো। -অনুবাদক

তারা বলাবলি করছিল, এরূপ পরিস্থিতিতে কেন যে মহানবী (সা) অনর্থক এই দীর্ঘ সফরে বের হলেন, আমাদের বুঝে আসছে না। তাদের মধ্যে একটি দল মহানবী (সা)-এর এই পদক্ষেপ সম্পর্কে উপহাস করছিল। ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান কয়েকজন সাহাবা এই উপহাস সম্পর্কে মহানবী (সা)-কে অবহিত করেন। তিনি সময় ও স্থান বিবেচনায় রেখে উপহাসকারীদের সাথে ব্যবহার করেন। তিনি তাদের সাথে কখনো কঠোর আবার কখনো বিনম্র ব্যবহার করেন। মহানবী (সা)-এর অধিনায়কত্ব ও তত্ত্বাবধানে মুসলিম বাহিনী মদীনাতে ফিরে আসছিল। মদীনাতে পৌঁছার কিছুক্ষণ পরই হযরত খালিদ (রা)-ও দূমাতুল জান্দাল অভিযান শেষে মদীনাতে এসে পৌঁছান। তিনি উকায়দিরকে মদীনাতে নিয়ে আসেন। তাঁর সাথে উট, ছাগল, গম ও বর্মগুলোও ছিল। উকায়দিরের পরনে ছিল রেশমী পোশাক। এই পোশাক দেখে মদীনার অধিবাসীরা বিস্মিত হয়।

যারা অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি

ইতিমধ্যে যারা মহানবী (সা)-এর সাথে তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে পড়ে। আর যারা উপহাস করছিল, তারাও নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। যারা অভিযানে যেতে পারেনি, তারা মহানবী (সা)-এর খেদমতে এসে নিজেদের অক্ষমতার কৈফিয়ত দিচ্ছিল। কিন্তু তাদের এই কৈফিয়ত ছিল বেশির ভাগ বানানো। মহানবী (সা) তাদের ব্যাপারটা আল্লাহ তা'আলার ওপর ছেড়ে দেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অবশ্য তাদের মধ্যে তিনজন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের সামনে সত্য কথা বলেন এবং নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন।

এই তিন ব্যক্তি হলেন কাআব ইবনে মালেক, মুরারা ইবনে রাবী এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া। মহানবী (সা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানরা এই তিন ব্যক্তির সাথে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত সকল প্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবা কবুল করেন। তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন। তাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ - إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ - وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا - حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ - ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا - إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

“আল্লাহ অনুগ্রহঃপরবশ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা তার অনুগমন করেছিল সংকটকালে--এমনকি যখন তাদের একদলের চিত্ত বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করলেন ; তিনি তাদের প্রতি দয়াদ্র, পরম দয়ালু। এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকে, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল

যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই, পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপরবশ হলেন যাতে তারা তাওবা করে। আল্লাহ ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।” (৯ : ১১৭-১১৮)

মোনাফেকদের প্রতি কঠোরতা

তাবুক অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মহানবী (সা) মোনাফেকদের সম্পর্কে কিছুটা কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। এই কঠোরতার কারণ ছিল এই যে, এ সময় মুসলমানদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পায়। তখনো যদি মোনাফেকরা মহানবী (সা) সম্পর্কে উপহাস করতে থাকে, তাহলে এর পরিণতি ভয়াবহ হওয়ার আশংকা ছিল। তাই তাদের এই প্রবণতার প্রতিকার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলকে ওয়াদা প্রদান করেছিলেন, তিনি অবশ্যই ইসলামের বিজয় সূচিত করবেন এবং মহানবী (সা)-এর মর্যাদা উঁচু করবেন। আল্লাহ তা‘আলার এই প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মোনাফেকদের শোচনীয় অবস্থা হওয়ার ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর এতটুকু সন্দেহ ছিল না। এত দিন ইসলাম মদীনা ও তার আশেপাশের এলাকায় সীমিত ছিল। তিনি নিজে সব কিছু দেখাশোনা করছিলেন। কিন্তু এখন তা আরব উপদ্বীপের সকল অংশে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, আরবের বাইরেও ইসলামের প্রচার-প্রসারের সকল উপকরণ ও পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এরূপ অবস্থায় মোনাফেকদের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শনে যে কোন ভয়াবহ পরিণতির আশংকা ছিল। এই হামাগুড়ি খাওয়া বীজাণুগুলো এখনই যদি নিশ্চিহ্ন না করা হয়, তা’ হলে অদূর ভবিষ্যতে এগুলো ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। ইতিমধ্যে মদীনা থেকে এক ঘণ্টার পথের ব্যবধানে যীউয়ান নামক স্থানে কিছু লোক একটি মসজিদ নির্মাণ করে। মোনাফেকদের একটি দল সে মসজিদে জড়ো হতো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তা‘আলার কালামের অর্থ বিকৃত করা। তাতে করে তারা মু‘মিনদের মধ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে পবিত্র ইসলামের ক্ষতিসাধনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে। তারা প্রথম নামায পড়িয়ে মসজিদটি উদ্বোধন করার জন্য মহানবী (সা)-এর খেদমতে আবেদন জানায়। তারা তাবুক অভিযানের পূর্বে এই আবেদন জানায়। তিনি এ ব্যাপারে অভিযান থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তাদের নিকট সময় নিয়েছিলেন। তাবুক অভিযান শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর মহানবী (সা) উক্ত মসজিদ নির্মাণের কূট উদ্দেশ্য জানতে পারেন। তিনি মসজিদটি জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। মহানবী (সা)-এর এই কঠোর নির্দেশে মোনাফেকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ভয়ে তারা নির্জন জীবন যাপন শুরু করে। তাদের নেতা ও মুরব্বী আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছাড়া এ সময় থেকে তাদের আর কোন সমর্থক থাকে না।

তাবুক অভিযানের পর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই দু’মাসের বেশি জীবিত ছিল না। সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুবরণ করে। মহানবী (সা) মদীনায় হিজরতের পর থেকেই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করছিল। কিন্তু মুসলমানদের দ্বারা তার দুঃখ-কষ্ট হোক, মহানবী (সা) তা পছন্দ করতেন না। তার মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়ার জন্য মহানবী (সা)-কে অনুরোধ করা হয়। তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করেন। জানাযার

পর দাফন পর্যন্ত তিনি তার কবরের পাশে উপস্থিত থাকেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর মৃত্যুর পর মোনাফেকদের ক্ষমতা চুরমার হয়ে যায়। অবশিষ্টরা মোনাফেকী পরিত্যাগ করে কৃতকর্মের জন্য তাওবা করে।

তাবুক ছিল শেষ অভিযান

তাবুক অভিযানের পর সারা আরবে ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মহানবী (সা) আরবের বিরোধীদের শত্রুতা থেকে স্বস্তি লাভ করেন। যেসব গোত্র এখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি, এবার তারা মাথা নত করে। তারা মহানবী (সা)-এর দরবারে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে। তাবুক অভিযান ছিল মহানবী (সা)-এর সক্রিয় অংশগ্রহণের শেষ অভিযান। এরপর তিনি আর কোন যুদ্ধ বা সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি। এরপর আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে ধন্য মহানবী (সা) মদীনায় শান্তি ও নিরাপদে জীবন-যাপন শুরু করেন।

পুত্র ইবরাহীমের প্রতি আকর্ষণ

মহানবী (সা)-এর নয়নের পুতুল পুত্র ইবরাহীমের বয়স ছিল তখন ১৬ কিংবা ১৮ মাস। বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের অভ্যর্থনা, মুসলমানদের সাধারণ সমস্যাবলির সমাধান, রিসালাতের দায়িত্ব পালন এবং স্ত্রীদের হক বা প্রাপ্য মিটানোর পর মহানবী (সা) শিশু ইবরাহীমকে দেখে অত্যন্ত খুশি হন। তিনি দেখতে পান, তাঁর আদরের দুলাল ইবরাহীমও দিন দিন বড় হচ্ছে। ধীরে ধীরে তার চেহারায় মহানবী (সা)-এর সাদৃশ্য ফুটে উঠছে। এ সাদৃশ্য দেখে মহানবী (সা) ইবরাহীমের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। এ সময় শিশু ইবরাহীমের দুধ-মা উম্মে সায়েফ তাকে দেখাশোনা করতেন। মহানবী (সা) উম্মে সায়েফকে কয়েকটি ছাগল উপহার দিয়েছিলেন। তিনি এগুলোর দুধ শিশু ইবরাহীমকে পান করাতেন।

শিশু পুত্র ইবরাহীমের প্রতি মহানবী (সা)-এর এই আকর্ষণ রিসালাত দায়িত্বের কোন অংশ ছিল না। এমনকি নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবেও ইবরাহীমের প্রতি মহানবী (সা)-এর এই আকর্ষণ ছিল না। আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং নিজের রিসালাতের দায়িত্বের প্রতি মহানবী (সা)-এর এরূপ ঈমান ও আস্থা ছিল যে, তিনি এ ব্যাপারে নিজের সন্তান কিংবা উত্তরাধিকারী কল্পনাও করেননি। বরং তিনি বলতেন, “আমরা নবীরা কারো উত্তরাধিকারী হই না এবং কেউ আমাদের উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যা রেখে যাই, তা সাদাকা বা দান হিসাবে বিবেচিত হয়।” বস্তুত শিশু ইবরাহীমের প্রতি মহানবী (সা)-এর এই আকর্ষণ ও স্নেহ-মমতা ছিল পিতৃসুলভ। সকল পিতারই সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা রয়েছে। এক্ষেত্রে মহানবী (সা) আর পাঁচজন পিতার ব্যতিক্রম ছিলেন না। অবশ্য মহানবী (সা)-এর মধ্যে এই স্নেহ-মমতা সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল। আর এ মানবীয় অনুভূতি সকল আরবের মধ্যেই ছিল যে, ‘তারপর যেন বংশধারা টিকে থাকে।’ মহানবী (সা)-ও এই অনুভূতি থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। এই অনুভূতির প্রেক্ষিতেই মহানবী (সা) শিশু ইবরাহীমকে অত্যন্ত স্নেহ-মমতার চোখে দেখতেন। ইবরাহীমের প্রতি মহানবী (সা)-এর অত্যধিক স্নেহ-মমতার পিছনে আরো কারণ ছিল। এর আগে কাসেম ও তাহের নামের দুই ছেলে শিশুকালে মারা যান। তাঁরা হযরত

খাদীজা (রা)-এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার ইন্তিকালের পর হযরত ফাতেমা (রা) ছাড়া অন্য কন্যারা সবাই একের পর এক ইন্তিকাল করেন। বড় হওয়ার পর তাঁদের বিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাঁদের ঘরে সন্তানাদিও হয়েছিল। এসব কন্যা ও পুত্ররা চিরদিনের জন্য মহানবী (সা)-কে ছেড়ে চলে যান। তিনি তাদের নিজ হাতে দাফন করেন। এসব পুত্র-কন্যার বিয়োগব্যথায় মহানবী (সা) শোকাভূত হয়ে পড়েছিলেন। এরূপ অবস্থায় ইবরাহীমের জন্মের পর মহানবী (সা)-এর সন্তানের বিয়োগব্যথা অনেকটা উপশম হয়। তাঁর পবিত্র অন্তরে আশার আলো ফুটে ওঠে। এর ফলে মহানবী (সা) অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎফুল্ল থাকতেন।

রোগশয্যায় ইবরাহীম

মহানবী (সা)-এর এই খুশি ছিল মাত্র কয়েক মাস। শিশু ইবরাহীম অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। রোগমুক্তির লক্ষ্যে তাঁকে মায়ের বাসস্থানের অদূরে একটি খেজুর বাগানে রাখা হয়। মা হযরত মারিয়া ও খালা সীরীন শিশু ইবরাহীমের সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর অসুখ বেড়েই চলে। রোগীর অবস্থার চরম অবনতি দেখে মহানবী (সা)-কে খবর দেয়া হয়। তাতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। আত্মসংবরণ করতে পারছিলেন না। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের হাতে ভর করে উক্ত খেজুর বাগানে এসে পৌছেন। এর অদূরে আজো সে উপত্যকাটি দাঁড়িয়ে আছে। মহানবী (সা) এসে দেখেন শিশু ইবরাহীম তাঁর মায়ের কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চলেছেন। তিনি নয়নের মণি শিশু ইবরাহীমকে নিজের কোলে তুলে নেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। পবিত্র চেহারায় শোক-ব্যথার চিহ্ন ভেসে উঠছিল। তিনি শিশু ইবরাহীমকে কোলে নিয়ে বললেন, “হে ইবরাহীম! তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ আমরা ফেরাতে পারি না।” এ সময় মহানবী (সা) পুত্র ইবরাহীমের শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন। দু'চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে। ইবরাহীম চিরবিদায় নিচ্ছিলেন। মা ও খালা কান্নায় ভেঙে পড়েন। কিন্তু মহানবী (সা) তাঁদের বারণ করেননি। ইবরাহীম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর দেহ স্পন্দনহীন হয়ে পড়ে। বিগত কয়েক মাস থেকে মহানবী (সা)-এর হৃদয়ে যে আশার প্রদীপ প্রজ্বলিত ছিল ইবরাহীমের মৃত্যুর সাথে সাথে তা চিরদিনের জন্য নিভে গেল। মহানবী (সা)-এর দু'চোখের পানি আরো সবেগে অঝর ধারায় পড়ছিল। এ সময় তিনি বলেন, “হে ইবরাহীম! মৃত্যু যদি অবধারিত না হতো এবং আল্লাহর ওয়াদা যদি সত্য না হতো, তা'হলে আমরা তোমার মৃত্যুতে আরো বেশি শোক প্রকাশ করতাম। কিন্তু এক দিন আমাদেরকেও মৃতদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।” এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, “চোখ কাঁদছে এবং হৃদয় শোকে মুহ্যমান। কিন্তু আমাদের মুখে এমন কথা উচ্চারিত হবে যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। হে ইবরাহীম! আমরা দুঃখ-বেদনায় ডুবে আছি।”

সাহাবারা মহানবী (সা)-এর এরূপ বেদনাবিধুর অবস্থা দেখতে পান। তাঁদের নেতৃস্থানীয়রা মহানবী (সা)-এর এই অবস্থা দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁরা মহানবী (সা)-এর খেদমতে আবেদন করেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো অন্যদের এ কাজ থেকে বিরত রাখতেন।” তিনি বললেন, “আমি মানুষকে সজোরে কান্নাকাটি থেকে বিরত রেখেছি। কিন্তু এ

ধরনের শোক প্রকাশে নিষেধ করিনি।” তোমরা আমার যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, এ তো স্নেহ-মমতার বহিঃপ্রকাশ। যে ব্যক্তি অন্যকে দয়া করে না, ভালবাসে না, তাকেও অন্যরা দয়া করে না, ভালবাসে না” কিংবা তিনি এ ধরনের অন্য শব্দরাজি বলেছিলেন। অতঃপর তিনি নিজের শোক-দুঃখ সংবরণের মনস্থ করেন। তিনি মারিয়া কিবতিয়া ও সীরীনের দিকে স্নেহভরা দৃষ্টিপাত করেন। তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, “ইবরাহীম বেহেশতে একজন ধাত্রী লাভ করবে।” এক বর্ণনা মতে উম্মে বোরদাহ্, অপর বর্ণনা অনুযায়ী ফযল ইবনে আব্বাস ইবরাহীমকে গোসল প্রদান করেন। এরপর ঘর থেকে একটি ছোট খাটিয়ায় লাশ উঠানো হয় এবং জান্নাতুল বাকী কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। মহানবী (সা) তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবীর একটি দল নিয়ে জান্নাতুল সাথে কবরস্থানে যান। মহানবী (সা) জান্নাতুল নামায পড়ান। এরপর যথারীতি দাফন করা হয়। দাফনের পর মহানবী (সা) কবর বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজ হাতে কবরের মাটি সমান করেন। তাতে পানি ছিটিয়ে দেন। অতঃপর চেনার জন্য তাতে কিছু একটা পুঁতে রাখেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘কবরের এই নির্দেশক দ্বারা মৃতের লাভ-ক্ষতি কিছুই হয় না। এটা জীবিতদের সান্ত্বনা ছাড়া কিছু নয়। মানুষ কোন কাজ করলে তা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে করা উচিত। আল্লাহ তা‘আলাও তাই পছন্দ করেন।

ঘটনাচক্রে ইবরাহীমের মৃত্যু দিবসে সূর্য গ্রহণ ছিল। কোন কোন সাহাবা এটাকে মু‘জিয়া হিসাবে অভিহিত করেন। তাঁরা বলতে শুরু করেন, ইবরাহীমের মৃত্যুশোকে সূর্য কালো হয়ে গেছে বা সূর্যগ্রহণ লেগেছে। তাঁদের এ কথা মহানবী (সা) শুনতে পান। পাঠকবৃন্দ হয়তো ধারণা করবেন, পুত্র ইবরাহীমের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ-মমতা এবং তাঁর মৃত্যু-শোকের দরুন এসব কথায় মহানবী (সা) কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করবেন। কিংবা তিনি অন্তত নীরব থাকবেন। অথবা তিনি এটাকে মানুষের অজ্ঞতা হিসাবে বিবেচনা করবেন। কিন্তু তিনি জানতেন, এটাকে মু‘জিয়া হিসাবে গণ্য করা হলে পরকালে তাঁকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং এ সবার কোনটাই মহানবী (সা)-এর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। যারা মানুষের অজ্ঞতা দ্বারা কিছুটা ফায়দা হাসিল করতে চায় কিংবা শোক ও ব্যথা-বেদনায় যারা সত্যানুভূতি হারিয়ে বসে, তাদের পক্ষেই এ সব শোভা পায়। মহানবী (সা)-এর মতো সৃষ্টিকুলশ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের নিকট এসব কথা কোনই গুরুত্ব বহন করে না। বস্তুত যারা ইবরাহীমের ইন্তিকালের দরুন সূর্যগ্রহণ হওয়ার কথা বলাবলি করছিল, মহানবী (সা) তাদের দিকে তাকিয়ে দেখেন। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বলেন, চাঁদ-সূর্যজ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনের মধ্যে দুটো নিদর্শন। কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের দরুন এসবের গ্রহণ হয় না। তোমরা চন্দ্র কিংবা সূর্যগ্রহণ দেখলে নামায আদায় করে আল্লাহ তা‘আলার যিকিরে মশগুল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর কি অনুপম মন্তব্য! এরূপ শোক-তাপের মধ্যেও তিনি রিসালাতের দায়িত্ব পালনে এতটুকু শিথিলতা প্রদর্শন করেননি।

পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যে যারা মহানবী (সা)-এর এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তারাও মহানবী (সা)-এর এই প্রজ্ঞা অস্বীকার করতে পারেননি। তাদের একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, জীবনের এরূপ নায়ক মুহূর্তেও যিনি সত্য ও ন্যায় থেকে বিচ্যুত হননি, তাঁর অনন্যসাধারণ মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

পাঠকবৃন্দ, ইবরাহীমের ইত্তিকালে মহানবী (সা)-এর শোক-বিহ্বলতায় উন্মুল মু'মিনীনগণও যে সমব্যথিত হয়েছিলেন, তা সহজে অনুমান করতে পারেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে মহানবী (সা)-এর রিসালাতের দায়িত্ব পালন, বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের আগমন ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগের ফলে ইবরাহীমের বিয়োগব্যথা থেকে অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করেন। এ বছর আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য প্রতিনিধিদল আসতে থাকে। এজন্য হিজরী দশ সালকে 'প্রতিনিধিদলের বছর' বলা হয়। এ বছরই হযরত আবু বকর (রা) আমীরে হজ্জের দায়িত্ব পালন করেন।

[illegible][illegible]

প্রতিনিধিদলের বছর এবং হজে হযরত আবু বকর (রা)-এর নেতৃত্ব

তাবুক অভিযানের ফলশ্রুতি

তাবুক অভিযানের পর সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামের বুনিয়াদ মজবুত হয়ে যায়। মহানবী (সা) তাঁর বিরোধীদের বিশৃংখলা ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতা থেকে অনেকটা স্বস্তি লাভ করেন। তখনো যারা পৌত্তলিকতা আঁকড়ে ধরেছিল, তাবুক অভিযান থেকে মহানবী (সা)-এর মদীনায় ফেরার পর তারা দ্বিধাবিহীন হয়ে পড়ে। অবশ্য যে সব মুসলমান মহানবী (সা)-এর সাথে তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের অনেকে মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিল। উষর মরু পাড়ি দিয়ে সিরিয়া গিয়েছিল। পথে তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। রোমানদের সিরিয়ার অভ্যন্তরে পালিয়ে আশ্রয় নেয়ায় কোন প্রকার যুদ্ধ হয়নি। মুসলমানরা গনীমতের সম্পদও লাভ করেনি। এই ছিল অভিযানে অংশগ্রহণকারী এক শ্রেণীর মুসলমানের অসন্তোষের কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অভিযান প্রাচীন ধর্মে অটল আরব গোত্রগুলোর মধ্যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। এই অভিযান তাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। এদিকে দক্ষিণাঞ্চলে ইয়ামন, হাযরামাউত, ওমান প্রভৃতি এলাকার গোত্রগুলোর মধ্যে তাবুক অভিযানের প্রভাব ছিল আরো গভীর। তারা দেখতে পাচ্ছিল, এই রোমান যারা মুসলমানদের ভয়ে পালিয়ে গেল, তারাই একদিন ইরানীদের পরাজিত করে নিজেদের ক্রুশ ফিরিয়ে এনেছিল। অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে তা পুনরায় বায়তুল মোকাদ্দাসে স্থাপন করেছিল। আর ইরানীরাও তো কম ছিল না। ইয়ামন ও আশপাশের এলাকায় দীর্ঘদিন তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইসলামের প্রতি আরবদের আকর্ষণ

শুধু ইয়ামন ও তার আশপাশের এলাকাই নয়, বরং সমগ্র আরবের প্রতিটি অংশে মুসলমানরা ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিল। এরূপ অবস্থায় মহানবী (সা)-এর গড়ে তোলা বৃহত্তর ঐক্যে মিশে যাওয়াই ছিল আরবদের জন্য কল্যাণকর কাজ। বস্তুত রোমান ও ইরানীদের জোর-জুলুম থেকে নিষ্কৃতি লাভেরও এটাই ছিল একমাত্র পথ! আর তাতে বিভিন্ন গোত্রের সরদারদের কোন প্রকার ক্ষতিরও আশংকা ছিল না। কারণ এ বিষয়টি তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, যে কোন গোত্রপতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, মহানবী (সা) তাকে নিজ গোত্রের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত রেখেছেন। সারকথা, হিজরতের দশম সাল ছিল 'প্রতিনিধিদলের বছর'। এই বছর মানুষ দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়।

তারুক অভিযানে রোমান বাহিনীর পশ্চাদপসরণ সাহাবীদের দৃষ্টিতে মক্কা বিজয়, হুনায়েন বিজয় এবং তায়েফ অবরোধের চেয়েও ফলপ্রসূ ছিল।

উরওয়া ইবনে মাসউদের ইসলাম গ্রহণ

তায়েফ অবরোধকালে সেখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। তারা মুসলমানদেরকে শহরে প্রবেশ ছাড়াই অবরোধ তুলে ফিরে আসতে বাধ্য করে। তারুক অভিযানের পর এই তায়েফবাসীরাই সর্বপ্রথম ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এগিয়ে আসে। তারা বেশ চিন্তাভাবনার পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকারী বনী সাকীফ গোত্রের অন্যতম নেতা ও তায়েফের অধিবাসী ছিলেন। মুসলমানরা হুনায়েন বিজয়ের পর তায়েফ অবরোধকালে উরওয়া ইয়ামনে ছিলেন। ইয়ামন থেকে ফিরে এসে তিনি জানতে পারেন, মহানবী (সা) তারুকে সফল অভিযানের পরে মদীনায়ে ফিরে এসেছেন। উরওয়া ইবনে মাসউদ দ্রুত মদীনায়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নিজ সম্প্রদায়ে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর দীন গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদের নিকট মহানবী (সা)-এর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব অজানা ছিল না। কারণ হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় কুরাইশদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা)-এর সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উরওয়াও ছিলেন। মহানবী (সা) জানতে পারেন যে, হযরত উরওয়া (রা) তাঁর সম্প্রদায়ে গিয়ে ইসলাম প্রচারে মনস্থ করেছেন। মহানবী (সা) একথাও জানতেন যে, সাকীফ গোত্র তাদের প্রতিমা লাত-এর পূজাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এজন্য মহানবী (সা) হযরত উরওয়াকে সতর্ক করে বললেন, “তোমার গোত্রের লোকেরা তোমাকে হত্যা করতে পারে।” কিন্তু হযরত উরওয়া (রা) জানতেন, তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। এই জন্য গভীর আস্থা সহকারে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্প্রদায় আমাকে তাদের চোখের পুতুল মনে করে থাকে।”

অবশেষে তিনি তায়েফে ফিরে আসেন। তিনি তার গোত্রকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানান। তারা পরস্পরে সলা-পরামর্শ করে। কিন্তু হযরত উরওয়ার সামনে কোন অভিমত প্রকাশ করেনি। রাত ভোর হওয়ার পর হযরত উরওয়া তাঁর বাসস্থানের ছাদে দাঁড়িয়ে মানুষকে নামাযের প্রতি আহ্বান জানান। মহানবী (সা)-এর আশংকা ঠিক প্রমাণিত হয়। বনী সাকীফের লোকেরা ক্রুদ্ধ হয়ে হযরত উরওয়ার বাসস্থান ঘিরে ফেলে। তারা চারদিক থেকে বৃষ্টির মতো তীর ছুঁড়তে শুরু করে। একটি তীরবিদ্ধ হয়ে হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ (রা) শাহাদাত বরণ করেন। হযরত উরওয়ার পরিবারবর্গ এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা দেখে তখনো হযরত উরওয়া (রা) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেননি। তাঁর মুখের শেষ কথাগুলো ছিল : “এই মর্যাদা আল্লাহ তা‘আলা আমাকে ইসলামের মাধ্যমে দান করেছেন। আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করেছেন। আমার এই মৃত্যু শাহাদাতের মৃত্যু। পূর্বে যারা রাসূলুল্লাহর পক্ষে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছেন, আমার মৃত্যুও তাঁদের মতোই।” শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় হযরত উরওয়া (রা) ওসীয়াত করে যান, তায়েফ অবরোধকালে শাহাদাতবরণকারীদের পাশে যেন তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত

উরওয়ার পরিবারের লোকেরা তাঁর অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করে। তাঁকে সেসব শহীদের পাশে দাফন করা হয়।

কিন্তু হযরত উরওয়ার রক্ত বৃথা যায়নি। তায়েফের আশেপাশের বাসিন্দারা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। বনী সাকীফদের হাতে তাদের একজন নেতার হত্যাকে তাঁরা অত্যন্ত বর্বরোচিত আচরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরূপ অবস্থায় বনী সাকীফরা নিশ্চিত ছিল যে, কোন দলের পক্ষ থেকেই তারা নিরাপদ নয়। তাদের যে কোন লোক বাইরে বের হবে, তাঁর ধ্বংস অনিবার্য। বনী সাকীফরা পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, মুসলমানদের সাথে একটা মীমাংসা ছাড়া তাঁদের কেউ অনিবার্য ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে না। সবাইকে জীবন দিতে হবে। তারা তাদের অন্যতম সরদার আবদে ইয়ালীলকে মহানবী (সা)-এর খেদমতে গিয়ে বনী সাকীফদের পক্ষ থেকে সন্ধি প্রস্তাব পেশ করার জন্য অনুরোধ করে। আবদে ইয়ালীল আশংকা করল, তাঁর সম্প্রদায় হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদের সাথে যে আচরণ করেছে, তার সাথেও অনুরূপ আচরণ করতে পারে। সুতরাং সে একা মহানবী (সা)-এর নিকট যেতে রাযী হলো না। আরো চারজনকে তার সাথে যাওয়ার জন্য শর্তারোপ করল। সে ভাবল, শহরের অধিবাসীরা যদি পূর্বের মতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তাহলে প্রতিনিধিদলের সবাই নিজ নিজ গোত্রের লোকদেরকে বুঝিয়ে-গুনিয়ে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে। অবশেষে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল মদীনাতে রওয়ানা দিল। মদীনার অদূরে প্রতিনিধিদলের সাথে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার দেখা হয়। তিনি খবরটা মহানবী (সা)-কে দ্রুত দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পথে হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে হযরত মুগীরা (রা)-এর দেখা হয়। তাঁকে দ্রুত মদীনাতে যেতে দেখে হযরত আবু বকর (রা) কারণ জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা জানতে পারেন। এরপর তিনি হযরত মুগীরাকে অনুরোধ করেন, এই সুসংবাদটা মহানবী (সা)-এর নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। হযরত মুগীরা (রা) হযরত আবু বকরের অনুরোধ রক্ষা করেন। অতঃপর তিনি বনী সাকীফ প্রতিনিধিদলের আসার সংবাদ মহানবী (সা)-এর নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

মহানবী (সা)-এর খেদমতে বনী সাকীফ প্রতিনিধিদল

নিজের সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রতিনিধিদলটির গর্ব ছিল। মদীনার পথ দিয়ে চলার সময় প্রতিনিধিদলটি মহানবী (সা)-এর তায়েফ অবরোধ এবং সেখান থেকে ফিরে আসা সম্পর্কেও নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছিল। মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎকালে ইসলামী পদ্ধতিতে সালাম বিনিময় করার জন্য হযরত মুগীরা (রা) তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা এই পরামর্শ গ্রহণ করেনি। তারা আইয়ামে জাহেলিয়াতের পদ্ধতিতে মহানবী (সা)-কে সালাম করে। মহানবী (সা)-এর নির্দেশে মসজিদে নববীর আঙিনায় তাদের জন্য একটি তাঁবু খাটান হয়। তারা মুসলমানদের এড়িয়ে চলতে থাকে। তারা নিজেদেরকে মুসলমানদের তরফ থেকে নিরাপদ মনে করেনি। সব সময় তাদের মধ্যে একটা ভীতি কার্যকর ছিল। হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রা) মহানবী (সা) ও বনী সাকীফ প্রতিনিধিদলের মধ্যে দূতের দায়িত্ব পালন করছিলেন। যে খাবার তাদের নিকট পাঠান হতো, হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ তা থেকে কিছুটা না খাওয়া পর্যন্ত তারা স্পর্শ করত না।

প্রতিমা রাখার দাবি

প্রতিনিধিদলটি হযরত খালিদ ইবনে সাঈদের মাধ্যমে মহানবী (সা)-কে জানায় যে, তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে। তবে এই সঙ্গে কিছু শর্ত আছে। তাদের লাত প্রতিমা রাখতে দিতে হবে। তিন বছর পর্যন্ত তা ধ্বংস করা যাবে না। আর তাদেরকে নামায থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।^১

মহানবী (সা) তাদের এসব দাবি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর তারা লাত প্রতিমা দু'বছর, এক বছর, এমনকি এক মাস রাখার দাবি জানায়। মহানবী (সা) তাও প্রত্যাখ্যান করেন। বস্তুত তারা মহানবী (সা)-এর নিকট এ ধরনের দাবি পূরণ কি করে আশা করতে পারে? কারণ তিনি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, একটি প্রতিমাও যেন অবশিষ্ট না থাকে। সুতরাং প্রতিমার ব্যাপারে তাঁর নিকট থেকে কোন প্রকার নমনীয়তা কোন অবস্থায়ই আশা করা যায় না।

বস্তুত ঈমান ও কুফরী হচ্ছে দুটো বিপরীত পথ। তাতে দ্বিধা ও সন্দেহের এতটুকু গুরুত্ব নেই। কুফরী ও ঈমান যেমন একই অন্তরে একত্রিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার, তেমনি সন্দেহ ও ঈমানও একই হৃদয়ে স্থান পেতে পারে না। বনী সাকীফদের লাত প্রতিমা রাখতে দেয়ার দাবির অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিমারও পূজা করা যাবে। এটাই তো আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা। আর এটা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন না।

নামায থেকে অব্যাহতির দাবি

বনী সাকীফ প্রতিনিধিদল তাদের গোত্রকে নামায থেকে অব্যাহতি দেয়ার দাবি জানায়। মহানবী (সা) তাদের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, যে ধর্মে নামায নেই, সে ধর্মে কোন কল্যাণ নিহিত নেই। অবশেষে বনী সাকীফ প্রতিনিধিরা তাদের লাত প্রতিমা রাখার দাবি ত্যাগ করে। তারা নামায পড়ার বিধানও মেনে নেয়। কিন্তু তারা এও দাবি করে যে, আমাদের নিজ হাতে প্রতিমা ধ্বংস করার জন্য আমাদেরকে যেন বাধ্য না করা হয়। আমরা এই মাত্র ঈমান আনলাম। আমরা কি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি, তা জানার জন্য আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। এরূপ পরিস্থিতিতে আপনি আমাদেরকে নিজ হাতে প্রতিমা ধ্বংসের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দান করুন। এ ব্যাপারে মহানবী (সা) তাদের সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করেননি। কারণ বনী সাকীফদের নিজ হাতে প্রতিমা ধ্বংস করা আর অন্যদের করাতে কিছু আসে যায় না। উভয় অবস্থায়ই প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে তাদের সম্মতি প্রকাশ। সুতরাং মহানবী (সা) তাদেরকে বললেন, নিজ হাতে প্রতিমা ভাঙার ব্যাপারে আমি তোমাদের আপত্তি বিবেচনা করলাম। এই প্রতিনিধিদলে সবচেয়ে কম বয়সের ছিলেন ওসমান ইবনে আবুল আস। কম বয়স হওয়া সত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রা) ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সাহাবীর মতে ইসলামের শিক্ষা লাভ ও পবিত্র কোরআন অনুধাবনের দিক থেকে তিনিই ছিলেন প্রতিনিধিদলে যোগ্যতর ব্যক্তি। এজন্য মহানবী (সা) তাঁকে নেতা মনোনীত করেন। বনী সাকীফ প্রতিনিধিদল পবিত্র রমযান মাসে মদীনায়ে এসেছিলেন। রমযানের অবশিষ্ট দিনগুলোয় তাঁরা মহানবী (সা)-এর খেদমতে অবস্থান করেন। তাঁরা রোযাও

১. এই সঙ্গে মদ্যপান ও ব্যভিচারের অধিকার দেয়ার শর্তও ছিল। -অনুবাদক

রাখেন। মহানবী (সা) তাদের জন্য সেহরী ও ইফতারীর ব্যবস্থা করতেন। এই প্রতিনিধিদল নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে যাওয়ার সময় মহানবী (সা) দলনেতা হযরত ওসমান ইবনে আবুল আসকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলেন : “জামাআতে নামায দীর্ঘ করবে না। মুকতাদীদের কথা স্মরণ রাখবে। কারণ তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, শিশু, দুর্বল ও কারবারী লোকও থাকে।”

লাত প্রতিমা ধ্বংস

বনী সাকীফ প্রতিনিধিদল তাদের এলাকা তায়েফে ফিরে আসে। মহানবী (সা) লাত প্রতিমা ধ্বংসের ব্যবস্থা করার জন্য হযরত আবু সুফিয়ান ও হযরত মুগীরা ইবনে শো'বাকে প্রতিনিধিদলের সাথে পাঠিয়ে দেন। কারণ বনী সাকীফদের মধ্যে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা ছিল। হযরত আবু সুফিয়ান ও হযরত মুগীরা (রা) প্রতিমা ভাঙার জন্য তায়েফে পৌঁছান। হযরত মুগীরা (রা) প্রতিমাটি চুরমার করে ফেলেন। বনী সাকীফ রমগীরা খোলা মাথায় কেঁদে কেঁদে প্রতিমাটির জন্য শোক প্রকাশ করছিল। বনী সাকীফদের কেউ প্রতিমা ভাঙায় বাধা দেয়া কিংবা প্রতিমাটির নিকট যাওয়ার সাহস করেনি। কারণ লাত মূর্তি ধ্বংসের ব্যাপারে মহানবী (সা) ও সাকীফ প্রতিনিধিদলের মধ্যে রীতিমত চুক্তি হয়েছিল। লাত মূর্তিকে যেসব স্বর্ণালংকার পরানো ছিল এবং সেখানে যত সম্পদ ছিল হযরত মুগীরা সেগুলো হস্তান্তর করেন। মহানবী (সা)-এর নির্দেশমতো তিনি এসব দ্বারা হযরত উরওয়া ও হযরত আসওয়াদের ঋণ পরিশোধ করেন। এ ব্যাপারে হযরত আবু সুফিয়ানও তাঁর সাথে অভিন্নমত পোষণ করেন।

লাত প্রতিমা ধ্বংস ও তায়েফের অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের পর হিজাজের অন্যান্য গোত্রও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাতে করে সমগ্র হিজাজ ইসলামের আওতায় এসে পড়ে। এবার মহানবী (সা)-এর প্রভাববলয় উত্তরে রোমান সাম্রাজ্য সীমান্ত সিরিয়া এবং দক্ষিণে ইয়ামন ও হায়রামাউত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। দক্ষিণের অবশিষ্ট এলাকার বাসিন্দারাও নতুন ধর্ম গ্রহণে এগিয়ে আসছিল। এই সঙ্গে তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যাপারেও পুরো শক্তি নিয়োগ করছিল। নতুন ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে প্রতিনিধি আসছিল। মদীনায় এসে তারা নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করছিল।

প্রতিনিধিদলের মদীনায় অনবরত আগমন

এ সময়ে প্রতিনিধিদল অনবরত মদীনায় আসতে থাকে। এই ধারা কয়েক মাস অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে হজ্জের মওসুম এসে পড়ে। তখনো মহানবী (সা) আজকের মুসলমানদের মতো সব অনুষ্ঠানসহ হজ্জব্রত পালন করেননি। সেবার আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কি মহানবী (সা)-এর হজ্জে যাওয়া উচিত ছিল? কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রোমানদের ওপর বিজয় দান করেছেন। তায়েফের অধিবাসীরাও ইসলামের আওতায় এসে পড়েছিল। এ ছাড়া দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিনিধিদল আসা অব্যাহত ছিল। অবশ্য তখনো আরব উপদ্বীপের অনেক অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করেনি। কাফের ছাড়া ইহুদী-খৃষ্টানও ছিল। কাফেররা এখনো আইয়ামে জাহেলিয়াতের রীতিতে পবিত্র মাসগুলোতে মক্কায় এসে হজ্জ পালন করত। অথচ বিশ্বাসের দিক থেকে তারা ছিল অপবিত্র। এরূপ পরিস্থিতিতে আরবের প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহর কালেমা বা ইসলামের প্রসার না হওয়া পর্যন্ত মহানবী (সা) মদীনায় অবস্থান

করাই শেষ মনে করলেন। তা'ছাড়া আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে অনুমতি না আসা পর্যন্ত তিনি কি করে হজ্জে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন। এসব কারণে মহানবী (সা) সেবার (নবম হিজরী) হজ্জে গেলেন না। হযরত আবু বকর (রা)-কে হজ্জের আমীর মনোনীত করেন।

হযরত আবু বকর (রা)-এর নেতৃত্বে হজ্জ

হযরত আবু বকর (রা) তিন শ' মুসলমান সঙ্গে নিয়ে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হন। পৌত্তলিকরা যুগ যুগ থেকে বায়তুল্লাহর হজ্জ করে আসছিল। সেবারও তাদের যথারীতি হজ্জে আসার কথা। কিন্তু মহানবী (সা) ও মুশরেকদের মধ্যে এমন কোন চুক্তি ছিল না যে, কেউ কা'বাঘরের যিয়ারতে আসলে তাকে বাধা দেয়া যাবে না, সম্মানিত মাসগুলোতে কাউকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা যাবে না। মহানবী (সা) ও আরব গোত্রগুলোর মধ্যে নির্ধারিত সময়ের জন্য এমন কোন সিদ্ধান্তও নেয়া হয়নি যে, এসব সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকা পর্যন্ত অমুসলিমদেরও কা'বাঘরের যিয়ারত করতে দিতে হবে! এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের শাসনেই অমুসলিমরা আইয়ামে জাহেলিয়াতের রীতিনীতিতে কা'বাঘরের আশেপাশে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করছিল। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কিছু সিদ্ধান্ত ও দেশের প্রচলিত নিয়ম-কানূনের প্রেক্ষিতে কা'বাঘরের যিয়ারত কিংবা অনুষ্ঠানাদি থেকে তাদের কাউকে বিরত রাখা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবশ্য তখন অনেক এলাকার প্রতিমা ধ্বংস করা হয়েছিল। এমনকি কা'বাঘরের ভিতরের কিংবা আশপাশের মূর্তিগুলোও নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে কাফের ও মুশরিকদের সাথে শিরুক ও পৌত্তলিকতা বিরোধীদের একত্র সমাবেশ ছিল একটা বোধগম্যহীন ও বৈপরীত্য ব্যাপার। কেউ হয়তো বলতে পারে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা তো বায়তুল মোকাদ্দাসে একসাথে যিয়ারত করে থাকে। সেটা অনেকটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার। কারণ ইহুদীদের মতে বায়তুল মোকাদ্দাস তাদের 'প্রতিশ্রুত ভূমি'। আর খৃষ্টানদের দৃষ্টিতে এটা হযরত ঈসার জন্মভূমি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় সম্প্রদায়ের একত্রে বায়তুল মোকাদ্দাস যিয়ারত অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যে কা'বাঘর ও তার আশপাশ এলাকাকে প্রতিমামুক্ত করে পূত-পবিত্র করা হয়েছে, সেখানে পৌত্তলিকদের ঢুকতে না দেয়াটাই ছিল যুক্তিগ্রাহ্য ও স্বাভাবিক পদক্ষেপ। এ সম্পর্কে সূরা বারাতের কয়েকটি আয়াতও নাযিল হয়েছে। কিন্তু তখন হজ্জের মওসুম শুরু হয়ে গেছে। মুশরিকরা দূর-দূরান্ত থেকে মক্কায় এসে পড়েছে। এরূপ অবস্থায় সঙ্গত মনে করা হয় যে, এবার মুশরিকদের আল্লাহ তা'আলার ফরমান জানিয়ে দেয়া হোক। তাদের সামনে একথা স্পষ্ট ঘোষণা করা হোক যে, মু'মিন ও মুশরিকদের মধ্যে এত দিন যেসব নিয়ম-নীতি প্রচলিত ছিল, এখন থেকে সেগুলো বাতিল গণ্য হবে। তবে যেসব চুক্তি কোন নির্ধারিত সময় পর্যন্ত করা হয়েছে, সেগুলো উক্ত সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা) হযরত আলী (রা)-কে হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য মক্কায় পাঠিয়ে দেন। তাঁদেরকে নির্দেশ করেন, আরাফাতে হজ্জের দিনে মানুষকে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরোক্ত ফরমান শুনিতে দেয়া হয়। হযরত আলী (রা) এই ফরমান নিয়ে হযরত আবু বকর (রা) ও হজ্জে গমনার্থী অন্যান্য মুসলমানের সাথে মিলিত হন। তাঁকে দেখে হযরত আবু বকর (রা) বললেন, "আমীর করে, না অনুগত করে পাঠানো হয়েছে।" হযরত আলী (রা) বললেন, "একজন অনুগত হিসেবে

এসেছি।” এরপর হযরত আলী (রা) বললেন, “আমি যেহেতু মহানবী (সা)-এর পরিবারের একজন সদস্য, তাই তিনি আমাকে একটি ফরমান শুনিয়ে দেয়ার নির্দেশ করেছেন।” অতঃপর মানুষ হজ্জের অনুষ্ঠান পালনের জন্য মিনায় সমবেত হলে হযরত আলী (রা) উঠে দাঁড়ান। তাঁর একপাশে হযরত আবু হুরায়রাও উপস্থিত ছিলেন। হযরত আলী (রা) উচ্চকণ্ঠে সূরা বারআতের নিম্নলিখিত আয়াতগুলো পড়ে শোনান :

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ . فَسِيحُوا
فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي
الْكَافِرِينَ . وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ
بِرِئَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ . فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ الْيَمِّ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ .

১. “এটা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে সেসব মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে।

২. অতঃপর তোমরা দেশে চার মাসকাল পরিভ্রমণ কর এবং জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না এবং আল্লাহ কাফেরদের লাঞ্চিত করে থাকেন।

৩. মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরফ হতে এটা এক ঘোষণা যে, আল্লাহর সাথে কাফেরদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তাঁর রাসূলের সাথেও নয়। তোমরা যদি তাওবা কর, তবে তোমাদের কল্যাণ হবে, আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না ; এবং কাফেরদের মর্মভুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

৪. তবে কাফেরদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ এবং পরে যারা তোমাদের চুক্তিরক্ষায় কোন ভ্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে, আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।

৫. অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে কাফেরদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁত পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. কাফেরদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবে, কারণ তারা অজ্ঞ লোক।

৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট কাফেরদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে ? তবে যাদের সাথে তোমরা মাসজিদুল হারামের নিকট পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, যে পর্যন্ত তারা

তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে। আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।

৮. কেমন করে থাকবে? তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দিবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট রাখে কিন্তু তাদের হৃদয় তা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

৯. তারা আল্লাহর আয়াতকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে ও তারা মানুষকে তার পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে থাকে, তা অতি নিকৃষ্ট।

১০. তারা কোন মু'মিনের সাথে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না; তারাই সীমালংঘনকারী।

১১. অতঃপর তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দীন সম্পর্কে ভাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বিবৃত করি।

১২. তাদের চুক্তির পর তারা যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের দীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, তবে কাফেরদের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করবে, তারা এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয়। সম্ভবত তারা নিরস্ত হতে পারে।

১৩. তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর! মু'মিন হলে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং এটাই আল্লাহর নিকট শোভনীয়।

১৪. তোমরা তাদের সাথে সংগ্রাম করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয়ী করবেন এবং মু'মিন সম্প্রদায়ের হৃদয় প্রশান্ত করবেন।

১৫. এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৬. তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেবেন, যখন এ পর্যন্ত তিনি প্রকাশ করেননি, তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ এবং কে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণকারী নয়? তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সর্বিশেষ অবহিত।

১৭. মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে, তখন তারা আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, এমন হতে পারে না। তারা এমন যাদের সব কাজ ব্যর্থ এবং তারা দোযখেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

১৮. তারাই তো আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। তাদেরই সৎপথ পাওয়ার আশা আছে।

১৯. যারা হাজীদের পানি সরবরাহ করে এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তোমরা কি তাদেরকে ওদের পুণ্যের সমজ্ঞান মনে কর, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে

এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে ? আল্লাহর নিকট ওরা সমতুল্য নয়। আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

২০. আল্লাহর নিকট তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, যারা বিশ্বাস করে, দীনের জন্য গৃহত্যাগ করে এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং তারাই সফলকাম।

২১. তাদের প্রতিপালক তাদের সংবাদ দিচ্ছেন নিজ দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি।

২২. সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহর নিকটই রয়েছে মহা পুরস্কার।

২৩. হে মু'মিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে ওদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা ওদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারাই সীমালংঘনকারী।

২৪. বল, 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা অপেক্ষা প্রিয় মনে হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

২৫. আল্লাহ তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়েনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।

২৬. অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর দয়া বর্ষণ করেন। যাতে তাদের হৃদয় প্রশান্ত হয় এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। এটাই কাফেরদের কর্মফল।

২৭. এরপরও যার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ ক্ষমাপরবশ হতে পারেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৮. হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র ; সুতরাং এই বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তবে জেনে রাখ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদের অভাবমুক্ত করতে পারেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২৯. যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ বিশ্বাস করে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।

৩০. ইহুদী বলে 'ওযায়ের আল্লাহর পুত্র' এবং খৃষ্টান বলে 'মসীহ আল্লাহর পুত্র'। ওটা তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ওরা তাদের মতো কথা বলে। আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুন। ওরা কেমন করে সত্যবিমুখ হয় !

৩১. তারা আল্লাহ্ ছাড়া তাদের পণ্ডিতদেরকে ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়ম-তনয় মসীহকেও। কিন্তু ওরা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি কত পবিত্র!

৩২. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নিভিয়ে ফেলতে চায়। কাফেররা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না।

৩৩. মোশরেকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সব দীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথ-নির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁর রাসূল পাঠিয়েছেন।

৩৪. হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মভূদ শাস্তির সংবাদ দাও।

৩৫. যেদিন জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে, সেদিন বলা হবে, এটা তাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিলে। সুতরাং আশ্বাদ গ্রহণ কর তার, যা তোমরা পুঞ্জীভূত করতে।

৩৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারটি। তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের জুলুম করো না এবং তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে থাকে। এবং জেনে রাখ, আল্লাহ সাবধানীদের সঙ্গে আছেন।” (৯ : ১-৩৬)

মানুষ মিনায় হজ্জের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করছিল। হযরত আলী (রা) তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে সূরা তাওবার উপরোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন।

আমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সবগুলো আয়াত উল্লেখ করেছি। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। এসব আয়াত পাঠ করার পর হযরত আলী (রা) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। এরপর তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেন, হে সমবেত মানুষ! যদি কোন কাফের বেহেশতে যেতে না পারে, তাহলে এ বছরের পর কোন মুশরিক যেন হজ্জের উদ্দেশ্যে না আসে। কোন উলঙ্গ মানুষ যেন কা'বাঘর তওয়াফ না করে। মহানবী (সা)-এর সাথে যাদের চুক্তি রয়েছে তা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বলবত থাকবে। হযরত আলী (রা) এ চারটি কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় মানুষের মধ্যে ঘোষণা করেন। এরপর তিনি মক্কায় আসা লোকদেরকে নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য মহানবী (সা)-এর পক্ষ থেকে চার মাস সময় দান করেন। এ দিন থেকে কোন মুশরিক আর হজ্জ করতে আসেনি। কোন উলঙ্গ মানুষও কা'বাঘর তওয়াফ করেনি। এ দিন থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি

ইসলামী রাষ্ট্রের এই বুনিয়াদ বা ভিত্তি ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে আমি সূরা তাওবার উপরের আয়াতগুলো এক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি। মহানবী (সা)-এর প্রতিনিধি হযরত আলীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও তাই ছিল। আর এজন্যই তিনি এসব আয়াত শুধু হজ্জের দিনই নয়, বরং

এরপরও বিভিন্ন মনযিলে মানুষের সামনে পাঠ করেন। বহু বর্ণনায় হযরত আলীর এই তৎপরতার সমর্থন রয়েছে। বস্তুত সূরা বারাতের প্রথম দিকের আয়াতগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করলে একথা পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, এসবের সারমর্ম একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনেরই ইঙ্গিত।

সূরা তাওবা মহানবী (সা)-এর সর্বশেষ সামরিক অভিযানের পর নাযিল হয়। তায়েফের অধিবাসীদের মতো দুর্ধর্মরাও এ সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সমগ্র হিজাজ, তেহামা ও নজদের অধিবাসীরা ইসলামের পতাকাতলে এসে পড়েছিল। এমনকি আরবের দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ গোত্র মহানবী (সা)-এর আনুগত্য স্বীকার করে নতুন ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের ইঙ্গিতবহু এসব আয়াত নাযিল হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পরিষ্কার হয়ে যায়। কেননা একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে, সে ভূখণ্ডের অধিবাসীদের সবাইকে একটি বিশেষ আদর্শের অনুসারী হতে হবে। তাতে করে প্রয়োজন মুহূর্তে যেন তারা নিজেদের সর্বাঙ্গিক শক্তি দ্বারা উক্ত আদর্শ রক্ষা করতে পারে। আর এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর সাথে নিজেকে একাত্ম জানা, তাঁকে সর্বশক্তিমান ও একমাত্র রক্ষাকারী মনে করার চেয়ে মানুষের জন্য উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কি হতে পারে? কিন্তু কিছু লোক যদি এই নতুন রাষ্ট্রাদর্শের বিরোধিতা করে, তবে তাদেরকে অবশ্যই পাপাসক্ত বলা যাবে। এ ধরনের লোককে বিশৃংখলার উৎস গণ্য করা যাবে। এই শ্রেণীর লোকের সাথে কোন প্রকার চুক্তি রাখা ঠিক হবে না। তাদের সাথে যুদ্ধ করা অপরিহার্য। অবশ্য তাদের বিরোধিতার ভিত্তি যদি রাষ্ট্রদ্রোহিতা না হয়--যেমন আসমানী কিতাবধারীদের বিরোধিতা--তা'হলে এ ধরনের লোকদের জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করা যেতে পারে।

হজ্জের সময় হযরত আলী (রা) সূরা তাওবার যেসব আয়াত সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে পাঠ করেন, ঐতিহাসিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হলে এগুলোর সারমর্ম আমাদেরকে উপরোক্ত প্রতিবেদনের প্রতিই পথ-নির্দেশ করে। যে কোন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু বিবেকবান ব্যক্তি এসব আয়াত থেকে এই সারমর্মই অনুধাবন করবেন। কিন্তু যারা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে ইসলাম ও মহানবী (সা)-এর সমালোচনা করে থাকে, তারা উপরোক্ত প্রতিবেদনের সাথে দ্বিমত পোষণ করে। তারা বলে, সূরা তাওবার এসব আয়াতে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও পক্ষপাতিত্বের আহ্বান রয়েছে। আর তা সভ্যতা ও সহনশীলতার পরিপন্থী। তাদের মতে এসব আয়াতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এগুলোতে মুসলমানদের শিখানো হয়েছে, যেখানেই মুশরিকদের পাবে, কোন বিচার-বিবেচনা ছাড়াই হত্যা করবে। তাতে করে এসব আয়াত বরং জোরজবরদস্তি ও শক্তির মদমত্ততারই আহ্বান জানিয়েছে। এই অভিমত হচ্ছে অধিকাংশ পাশ্চাত্য লেখকের। যেসব মানুষের মধ্যে ইতিহাস ও সভ্যতার নীতিমালার বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা নেই, তারা সহজে এই অভিমত দ্বারা প্রভাবিত। কিছু কিছু মুসলমানও এই শ্রেণীতে রয়েছে। কিন্তু তাদের এই অভিমতের সাথে ঐতিহাসিক ও তামাদ্দুনিক বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এই অভিমত পোষণকারীরা সূরা তাওবার এসব আয়াত ও পবিত্র কোরআনের এ জাতীয় অন্য আয়াতগুলোর এমন ব্যাখ্যা করে যার সাথে মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিতের ঘটনাবলির এতটুকু মিল পাওয়া যায় না। নবী করীম

(সা)-এর আবির্ভাব ও ইত্তেকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনাবলিতে তাদের ব্যাখ্যার কোন সমর্থন নেই। তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে, তাদের অভিমত ও ব্যাখ্যা বাস্তবতা থেকে অনেক অনেক দূরে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সভ্যতার নৈতিক বা আদর্শগত বুনিয়াদের সাথে মহানবী (সা) প্রদর্শিত আদর্শিক বুনিয়াদ বা ভিত্তির একটা মূল্যায়নধর্মী পর্যালোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বর্তমান সভ্যতার আদর্শগত ভিত্তি হচ্ছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। আর এর কোন সীমা-পরিসীমা নির্ধারিত নেই। এই স্বাধীনতাকে আইন-কানুন বা বিধি-বিধান বলা হয়। এই মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের অন্তরে একটা গভীর বিশ্বাস হিসাবে বিরাজ করছে। অত্যন্ত জোরালোভাবে এই বিশ্বাসের প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং একে সংরক্ষণ করা হয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মানুষ জীবন বিসর্জন দিয়ে থাকে। এর প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান হয়। এর জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহও সংঘটিত হয়। মানুষ এই স্বাধীনতাকে পূত-পবিত্র মনে করে। এর জন্য বিভিন্ন জাতি গর্ববোধ করে। নিজেদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এসব কারণে উপরে উল্লিখিত পাশ্চাত্য লেখকরা বলে থাকে, মুসলমানদের প্রতি ইসলামের জিহাদের আহবান এবং আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধের অনুমতি ধর্মীয় গোঁড়ামির শিক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। আর এটা বর্তমান যুগের মতো প্রকাশের স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বস্তুত ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ কোন আদর্শ বা মতবাদের প্রতি যদি অন্যদের আহবান জানান না হয় এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া না হয়, তা'হলে তার কোন মূল্যই থাকে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মোশরেকদের প্রতি ইসলাম গ্রহণের আহবান এবং ইসলামী মতবাদ বাস্তবায়নের উদ্যোগের সমালোচনা করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। আর যে সব মোশরেক বা পৌত্তলিক আনুগত্য স্বীকার করে জিযিয়া দিতে সম্মত হয়েছে, অন্যদেরকে পৌত্তলিকতার প্রতি আহবান জানান পরিত্যাগ করেছে এবং নিজেরাও প্রকাশ্যে পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হয়নি, ইসলাম কখনো তাদের সাথে যুদ্ধের অনুমতি দেয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, বর্তমান সভ্য জগতে ভিন্নমত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে যেকোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, সেকালে মুসলমানরা মোশরেকদের প্রতি তেমন কঠোরতাও প্রদর্শন করেননি। বর্তমান সভ্য যুগে সাধারণ অভিমতের বিপরীতে ভিন্ন মতো পোষণকারীদের উপর যে সব বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়, এগুলো কিতাবধারীদের প্রতি ইসলামের বাধ্যতামূলক জিযিয়ার চেয়েও কঠিন।

আমরা এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যে দাস ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত যুদ্ধকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করতে চাই না। অথচ এই দাস ব্যবসাকে পাশ্চাত্যের একটি শ্রেণী বৈধ মনে করত। কেউ হয়তো বলতে পারে, ইসলামও এই ব্যবসাকে খারাপ মনে করেনি। এই অভিযোগ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, সেকালের সামাজিক পরিবেশ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ বা অস্বীকার করা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে সম্ভবপর না হলেও এই প্রথা টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলমানরা কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়েনি।

এক্ষেত্রে আর একটা বিষয় উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেটা হচ্ছে উন্নত সভ্যতার দাবিদার ইউরোপ কর্তৃক বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। আর তাদের সমর্থন করছে আমেরিকা, এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ। আমাদের মিসরও বলশেভিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাশ্চাত্যকে সমর্থন দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। অথচ বলশেভিকদের মতবাদ পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদবিরোধী একটি শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়া কিছুই নয়। কি অদ্ভুত ব্যাপার! আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মুশরিক বা পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি ইসলামের যুদ্ধের আহ্বানকে সাম্প্রদায়িক ও বর্বরোচিত বলে চিত্রিত করা হচ্ছে! শুধু তাই নয়, একে স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরোধী হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। আর পাশ্চাত্য সভ্যজগতে প্রচলিত পুঁজিবাদ বিরোধী বলশেভিজমের সাথে যুদ্ধ ঘোষণাকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে ঢাকঢোল পিটানো হচ্ছে। এই যুদ্ধকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হচ্ছে। এই হচ্ছে পাশ্চাত্য লেখক-চিন্তাবিদদের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার-বিবেচনার (?) দৃষ্টান্ত।

নগ্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ইউরোপের কোন কোন শহরে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে নগ্নতার প্রবণতা দেখা দেয়। তাদের অভিমত হলো, বিশ্বাস ও মত প্রকাশের বেলায় যেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, তেমনি শারীরিক ব্যাপারেও এই বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। তাদের মতে মানুষের পুরো শরীর কিংবা অংশবিশেষ আবৃত রাখাটাই যৌন অনুভূতি ও আকর্ষণের মূল উৎস। আর তা মানুষের চরিত্রে কুপ্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাদের ধারণা, সব মানুষ বিবস্ত্র জীবন যাপন করলে যৌন অপরাধ থাকবে না। এই ধ্যান-ধারণার সমর্থকরা তাদের চিন্তাধারা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা কোন কোন শহরে নগ্ন থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট কেন্দ্র স্থাপন করে। ইচ্ছুক নর-নারীরা এসব কেন্দ্রে এসে নগ্ন থাকার অভ্যাস করতে থাকে। এই প্রবণতা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দেখে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্বেগ হয়ে ওঠেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন, এই প্রবণতা ব্যাপক হলে চারিত্রিক ধ্বংস ও সামাজিক অবক্ষয় ডেকে আনবে। তাঁরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তাঁরা এসব নগ্নতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আইন করে এগুলো বন্ধ করে দেন। এমনকি এরূপ ধ্যান-ধারণাকে সভ্যতার আইন-কানুন-বিরোধী বলে সাব্যস্ত করেন।

একথা অনস্বীকার্য যে, যদি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে উক্ত নগ্নতার ধারণার ব্যাপক বাস্তবায়ন দেখা দেয়, তা'হলে তাদের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের যুদ্ধ ঘোষণার ন্যায্য অধিকার রয়েছে। কারণ এই ধারণা মানুষের আত্মিক শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। একই কারণে পাশ্চাত্যে শ্বেতাঙ্গ মানুষ বেচাকেনা ও নারী ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এসব কেন হয়েছে। শুধু এজন্য যে, বিশ্বাস ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার কুপ্রভাব সমাজের জন্য ক্ষতিকর না হওয়া পর্যন্ত বরদাশত করা যায়। তার মানে সে বিশ্বাস ও অভিমত ব্যক্তিগত

১. বলশেভিক বলা হয় লেনিন অনুসারীদের। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত বিপ্লবের পর সেখানে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। এই গৃহযুদ্ধে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার ১৪টি দেশ হস্তক্ষেপ করে। তারা বিপ্লব বিরোধীদের প্রতি সক্রিয় সমর্থন দান করে। এই অঘোষিত যুদ্ধে তারা সোভিয়েত ভূ-খণ্ডের কোন কোন এলাকায় নিজেদের সৈন্যবাহিনী নামায়। -অনুবাদক

পর্যায় পোষণ করার সুযোগ দেয়া যায়। কিন্তু যখনই তা সাধারণ সমাজকে প্রভাবিত করতে শুরু করে, তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই প্রভাব বিস্তার চারিত্রিক, সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক ও যে কোন ক্ষেত্রে হতে পারে। তবে এই কুপ্রভাবের ধরন ও ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা-বিরোধী আইন প্রণয়নের বৈধতা

বর্তমান যুগের আইন-কানুনও দেশ ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর বলগাহীন মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সমর্থন করে। এ ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন জাতির জীবন ব্যবস্থা থেকে বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু তাতে আলোচনা দীর্ঘায়িত হয়ে পড়বে। এজন্য এক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। তা সত্ত্বেও শুধু এতটুকু বলা যায়, যে অভিমত বা ধ্যান-ধারণা জাতীয় সংহতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির পরিপন্থী হবে, দেশের আইন-কানুন তার বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের কঠোরতা ও বাধ্যবাধকতা আরোপের ন্যায়ত অধিকার রাখে। দেশের আপামর জনসাধারণকে সার্বিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র উক্ত ধ্যান-ধারণা পোষণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করতে পারে। সুতরাং মোশরেকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি ইসলামের যুদ্ধ ঘোষণার আহ্বান সঠিক ছিল কিনা তা জানতে হলে আমাদেরকে পৌত্তলিকতা ও তার পরিণতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে হবে। আর এজন্য অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার। যদি প্রমাণিত হয় যে, পৌত্তলিকতা বিভিন্ন যুগে সত্যি মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর ছিল, তা হলে একথা অনস্বীকার্য যে, মোশরেক বা পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে ইসলামের জিহাদের আহ্বান শুধু বৈধই ছিল না, একান্ত প্রয়োজন ছিল।

মুশরিকদের জীবন চিত্র

নবী করীম (সা)-এর আমলে যে ধরনের পৌত্তলিকতার প্রচলন ছিল, তা শুধু মূর্তিপূজা পর্যন্ত সীমিত ছিল না। এমনকি নিছক মূর্তিপূজা হলেও তার বিরুদ্ধে জেহাদ অত্যাৱশ্যক ছিল। কারণ কোন মানুষ কর্তৃক নিজীব পাথরকে পূজনীয় মনে করা মানবতার অপমান বৈ কিছু নয়। কেননা তাতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকেই খাটো করা হয়। বস্তুত সেকালে পৌত্তলিকতা বলতে ছিল অন্ধ অনুকরণ, অজ্ঞতাসুলভ বিশ্বাস ও আচার-আচরণের সমষ্টি। পৌত্তলিকতাভিত্তিক যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার চেহারা, দাস ব্যবসা, বলশেভিজম, এমনকি বর্তমান বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে মানুষ যা কল্পনা করতে পারে তার চেয়েও ঘৃণ্য ছিল। সে যুগের মোশরেক বা পৌত্তলিকরা কন্যা সন্তান হলে জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলত। একাধিক স্ত্রী রাখার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। একজন পুরুষ ত্রিশ, চল্লিশ, একশ', তিনশ' এমনকি তার চেয়েও বেশি স্ত্রী রাখতে পারত। সুদ অত্যন্ত ঘৃণ্যভাবে প্রচলিত ছিল। সমাজে আইন-কানুন বলতে কিছু ছিল না। চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। আরবের পৌত্তলিকরা বদঅভ্যাস, ভ্রান্ত রীতি-নীতি ও কুসংস্কারের দিক থেকে সমকালীন বিশ্বে চরম অধপতিত ছিল।

এবার আমরা ন্যায়পরায়ণ ও সুষ্ঠু বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করছি, মানব সমাজের মধ্যে যদি একটি দল বা সম্প্রদায় নিজেদের জন্য এমন একটা জীবন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে, যার চিন্তাধারা ও লক্ষ্য হচ্ছে কন্যা সন্তানদের জ্যান্ত কবর দেয়া, অসংখ্য বিয়ে করা, দাস

ব্যবসা করা এবং চরম ঘৃণ্য পন্থায় সুদ অল্প প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ জবর দখল করা। অপরদিকে এসব অন্যায়-অধিকারের বিরুদ্ধে যদি একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে সমাজদেহকে এসব দুষ্ট ক্ষত থেকে পূত-পবিত্র করা। এরূপ অবস্থায় আমরা কি শেষোক্ত আন্দোলনকে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরোধী হিসাবে অভিযুক্ত করব? এ বিষয়টিই অন্যভাবে বলা যায়। ধরুন, কোন সম্প্রদায় যদি এরূপ নীচ ও অধঃপতিত সমাজ ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে পড়ে এবং তা যদি অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ার আশংকা হয়, এরূপ পরিস্থিতিতে অন্যান্য জাতি যদি উক্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, তাহলে তাদের এই পদক্ষেপ কি বৈধ হবে, না অবৈধ! এই সামরিক পদক্ষেপ কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও অবৈধ ও অন্যায় কাজ? অথচ এই যুদ্ধে শুধু পুঁজিবাদী লোভ-লালসার প্রেক্ষিতে পৃথিবীর লাখ লাখ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। এসব বাস্তব তথ্যের বর্তমানে সূরা তাওবার উল্লিখিত আয়াতগুলো সম্পর্কে পাশ্চাত্য লেখকদের সমালোচনা কি কোন গুরুত্ব বহন করে? বস্তুত পৌত্তলিকতা ও পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে ইসলামের যুদ্ধ ঘোষণা ছিল সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ পৌত্তলিকরা মানবতা বিবর্জিত একটি ক্রোদাক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছিল। এই ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। অপরদিকে ইসলামের লক্ষ্য ছিল এসবের অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিভিত্তিক একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা।

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার বৈধতা

আরবের পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজার ছত্রছায়ায় যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, উপরে ইতিহাসের বাস্তবতার আলোকে তারই একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে মহানবী (সা)-এর জীবনচরিত থেকেও আমরা আর একটি বাস্তব ইতিহাস জানতে পারি। নবুয়ত লাভের পর মহানবী (সা) দীর্ঘ তের বছর আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে মানুষকে সত্য ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন। তাঁর এই আমন্ত্রণের ভাষা ছিল অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। তিনি সত্যধর্ম সম্পর্কে মানুষের সঙ্গে অত্যন্ত সৌজন্যের সাথে আলোচনা করতেন। মানুষকে আল্লাহর দীন গ্রহণের আবেদন জানাতেন। পরবর্তীতে মোশরেকদের সাথে মহানবী (সা)-এর যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে, সেগুলোতেও তিনি কখনো বাড়াবাড়ি করেননি। বরং এসব যুদ্ধ ছিল আত্মরক্ষামূলক। বাধ্য হয়ে মুসলমানদের এসব আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। তাদের ধর্ম, তাদের স্বাধীনতা, সর্বোপরি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই তাদেরকে মুশরিকদের সাথে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে জড়াতে হয়েছে। এ ছাড়া তাদের বিকল্প কোন উপায়ও ছিল না। কারণ নিজেদের ঈমান রক্ষার জন্য তারা জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকত। আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পিছনেও একটা বিরাট তাৎপর্য ছিল। মোশরেকরা ছিল অপবিত্র। তারা ঘৃণ্য ও মানবতা-বিবর্জিত সমাজ ব্যবস্থার অনুসারী ছিল। তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ও চুক্তির কোন মূল্য দিত না। মুসলমানদের কথাবার্তার পরোয়া করত না। তাই তাদেরকে সৎপথে আনার লক্ষ্যে বাধ্য হয়ে মহানবী (সা)-কে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে। তাও মহানবী (সা) সর্বশেষ সামরিক অভিযান তাবুক থেকে ফিরে আসার পর তিনি মোশরেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা প্রদান করেন। এ সময় আরবের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য

সেসব এলাকায় তখনো বহু মুশরিক বা পৌত্তলিক ছিল। তারা পৌত্তলিকতার ধ্বংসাত্মক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আঁকড়ে রেখেছিল। মুসলমানরা তাদেরকে মানবতা বিবর্জিত এই ব্যবস্থা পরিত্যাগ করার আহবান জানায়। আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিধি-নিষেধ অনুসরণ করার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু এসব পৌত্তলিক মুসলমানদের আহবানে এতটুকু সাড়া দেয়নি। এরূপ পরিস্থিতিতে যে কোন ন্যায়পরায়ণ লোক এ কথা স্বীকার করবেন যে, ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে মোশরেকদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এ সময় যুদ্ধের হুমকি ছাড়া মোশরেকদেরকে পাপাচার থেকে সৎপথে আনার বিকল্প কোন পথ ছিল না।

এ জন্যই হযরত আলী (রা) মহানবী (সা)-এর নির্দেশে হজ্জের সমাবেশে পিছনে উল্লিখিত সূরা তাওবার আয়াতগুলো পাঠ করেন। তিনি সমবেত জনতাকে আরো বলেন, বেহেশতে কোন কাফের প্রবেশ করবে না। সুতরাং এ বছরের পর কোন মুশরিক যেন হজ্জ করতে না আসে। কেউ যেন উলঙ্গ হয়ে কা'বাঘর তাওয়াফ না করে। হযরত আলীর এই ঘোষণার পর আশাতীত ফল পাওয়া যায়। এত দিন যেসব গোত্র দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল, ইসলামের আহবানে সাড়া দিতে গড়িমসি করছিল, তাদের সে মনোভাব কেটে যায়।

আমের ইবনে তোফায়েল

হজ্জের সময় হযরত আলী (রা)-এর ঐতিহাসিক ঘোষণার পর ইয়ামন, মাহরা, বাহরায়েন ও ইয়ামামা'র প্রায় সব অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। অবশ্য এসব এলাকার মুষ্টিমেয় কিছু লোক তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি। নিজেদের নেতৃত্বের গর্বে তারা তখনো পাপাচারময় জীবন আঁকড়ে থাকে। এই শ্রেণীর লোকদের একজন ছিল আমের ইবনে তোফায়েল। সে বনী আমের গোত্রের একদল প্রতিনিধি নিয়ে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনা আসে। সে মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি। আমের নিজেকে মহানবী (সা)-এর সমকক্ষ বলে দাবি করে। মহানবী (সা) আমেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনেক বোঝান। কিন্তু সে তার অহমিকায় অটল থাকে। অবশেষে সে মহানবী (সা)-এর দরবার থেকে উঠে আসার সময় বলে, “আল্লাহর শপথ! আমি আপনার সাথে বোঝাপড়া করার জন্য এই শহর অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা ভরে দেব।” মহানবী (সা) আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে বললেন, “হে দয়াময়! আপনি আমাকে আমের ইবনে তোফায়েলের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।” আমের তার সম্প্রদায়ে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা দেয়। পথেই সে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তার ঘাড়ে ফোঁড়া ওঠে। বনী সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে সে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর সময় সে দুঃখ করে বলে, “হে বনী আমের! এ ধরনের ফোঁড়া তো উটের ঘাড়ে উঠতে দেখা যায়। আমার ভাগ্যেও এই ফোঁড়াতে মৃত্যু লেখা হয়েছে!”

আরবাদ ইবনে কায়েস

এই প্রতিনিধিদলে একজনের নাম ছিল আরবাদ ইবনে কায়েস। সেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সে বনু আমের গোত্রে পৌছতে সক্ষম হয়। একদিন সে তার একটি উট বিক্রির জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। পথে বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়। আমের ও আরবাদের অস্বীকৃতি

তাদের গোত্রের লোকদের মধ্যে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তারা মহানবী (সা)-এর আহবানে সাড়া দেয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

মুসায়লামা

আমের ও আরবাদের চেয়েও অধপতিত আর একজন ছিল মুসায়লামা ইবনে হাবীব। সে ছিল ইয়ামামার বাসিন্দা। ইয়ামামার বনী হাবীব গোত্রের প্রতিনিধিদের সাথে সে মদীনায়ে আসে। সঙ্গীরা তাকে মহিলাদের দেখাশোনা করার দায়িত্বে রেখে মহানবী (সা)-এর দরবারে যায়। তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (সা) তাদের প্রত্যেককে কিছু না কিছু উপহার প্রদান করেন। তারা মহানবী (সা)-এর নিকট মুসায়লামার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি তাকেও কিছু উপহার প্রদান করেন এবং বলেন, “সে মর্যাদায় তোমাদের চেয়ে কম নয়।” মহানবী (সা) মুসায়লামা সম্পর্কে একথা বলার কারণ ছিল প্রতিনিধিদের মাল-সামান পাহারায় নিয়োজিত থাকায় সে আসতে পারেনি। এজন্য অন্যরা যেন তাকে খাটো মনে না করে। কিন্তু দলের লোকদের নিকট তার সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর মন্তব্য শুনে সে নিজেই নবুয়তের দাবি করে বসে। সে বলে, “আল্লাহ্ তা‘আলা (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে তাকেও নবুয়তের অংশীদার করেছেন। সে তার নিকট ওহী আসার দাবি করে একটি ছন্দময় বাক্য আবৃত্তি করে। বাক্যটি হল :

لقد انعم الله على الحبلى ماخرج منها

نعمة تسعى من بين صفاق وحشا

“আল্লাহ্ গর্ভবতী মহিলাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। তার পেট থেকে জীবিত শিশু জন্ম গ্রহণ করেছে। এই শিশু হাঁটাচলা করে।”

মুসায়লামা মদ্যপান ও ব্যভিচার বৈধ করে এবং নিজের সম্প্রদায়কে নামায থেকেও অব্যাহতি দেয়। তাকে রাসূল মেনে নেয়ার জন্য মানুষের প্রতি আহবান জানায়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কেউ তার কথায় কর্ণপাত করেনি। অপরদিকে মহানবী (সা)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা দলে দলে মদীনায়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হতে থাকে। এসব লোকের মধ্যে আরবের বিশিষ্ট লোকেরাও ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আদী ইবনে হাতেম, আমর ইবনে মা‘দিকারিব প্রমুখ। হিমইয়ারের অধিপতি একজন দূত মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা)-ও এক চিঠির মাধ্যমে তাঁকে ইসলামের বিধি-বিধান এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেন। আরবের দক্ষিণাঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার পর মহানবী (সা) সে এলাকায় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবাকে পাঠান। তাঁরা সেখানকার নও-মুসলিমদের ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত করেন। তাদের এই ধর্মে অবিচল থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

বিভিন্ন আরব প্রতিনিধিদের নাম

কোন কোন জীবন-চরিতকারের মতে আমরা এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিনিধিদের বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করব না। কারণ ইসলাম গ্রহণের পর তারা বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে

একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিনিধিদল হিসাবে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। অবশ্য ইবনে সাআদ তাঁর 'তাবাকাতে কুবরা' গ্রন্থে পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রতিনিধিদলের পরিচিতি আলোচনা করেছেন। প্রতিনিধিদল সম্পর্কে এ ধরনের দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। তবু এক্ষেত্রে প্রতিনিধি দলগুলোর গোত্র কিংবা শাখা গোত্রের একটা নাম-তালিকা দেয়া যেতে পারে। এগুলো হচ্ছে : মুযায়না, আসাদ, তামীম, আবস, ফাযারাহ, মুররাহ, ছা'লাবাহ, মুহারিব, সাআদ ইবনে বাকার, কিলাব, রুআস ইবনে কিলাব, উকায়ল ইবনে কাআব, জা'দাহ, কোশাইর ইবনে কাআব, বনী আল-বাক্বা, কানানাহ, আশযা, বাহেলা, সূলায়েম, হিলাল ইবনে আমের, আমের ইবনে সা'সাআ, সাকীফ, বনী রবীআ গোত্রের আবদুল কায়েস, বাকার ইবনে ওয়ায়িল, তাগলিব, হানীফা, শায়বান। ইয়ামনের প্রতিনিধিদলগুলোর মধ্যে রয়েছে তাঈ, তুজীব, খুলান, জা'ফী, সুদা, মুরাদ, যুবায়েদ, কিন্দাহ, সাদাফ, খুশায়ন, সাআদ হুযায়েম, বাল্লী, বাহরা, উদ্রাহ, সালামান, জুহায়নাহ, কালব, জুরশা, আজদ, গাস্‌সান, হারেছ ইবনে কাআব, হামদান, সাআদুল আশীরাহ, আন্স, আদ্দারায়েন, রাহাবীন। মায়জাহ গোত্র থেকে গামেদ, নাখা, বাজীলাহ, খাছআম, আশআরীন, হাযরামাউত, আযদ ওমান, গাযফক, বারিক, দাওস, ছুমালাহ, হুদান, আসলাম, জুযাম, মাহ্রাহ, হিমইয়ার, নাজরান ও জায়শান।

সমগ্র আরব উপদ্বীপে এমন কোন গোত্র কিংবা শাখা গোত্র ছিল না, যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। তবে হ্যাঁ, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইসলাম থেকে দূরে থাকে। পূর্বে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আরবের মোশরেকরা অত্যন্ত দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করে এবং মূর্তিপূজা ছেড়ে দেয়। তাতে করে অল্প দিনের মধ্যে সমগ্র আরব প্রতিমার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়। আর তা হয় তাবুক অভিযানের পর। আরবরা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা রক্তপাতের প্রয়োজন হয় না। এবার ইহুদী-খৃষ্টানরা মহানবী (সা)-এর সাথে কিরূপ আচরণ করেছে এবং তিনি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন, তা দেখা যাক।

বিদায় হজ্জ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা) মুসলমানদের নিয়ে হজ্জ করার সময় মুসলমান ও মোশরেকদের সামনে হযরত আলী (রা) সূরা তাওবার প্রথম দিকের আয়াতগুলো পাঠ করেন। মিনায় এসে সমবেত জনতার উদ্দেশে তিনি মহানবী (সা)-এর একটি ফরমান ঘোষণা করেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেন, 'কোন কাফেরের বেহেশতে প্রবেশ সম্ভব নয়। এ বছরের পর কোন মুশরিককে হজ্জ করার অনুমতি দেয়া হবে না। নগ্ন হয়ে কেউ কা'বাঘর তাওয়াফ করতে পারবে না। অবশ্য যাদের সাথে মহানবী (সা)-এর চুক্তি রয়েছে, তাদেরকে এসব বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত গণ্য করা হবে। সম্পাদিত চুক্তি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বলবত থাকবে।' এই ঘোষণার পর মুশরিকদের মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, এরপর তাদের জন্য মূর্তিপূজার আর কোন উপায় থাকবে না। এই ঘোষণার পরও যদি কেউ পৌত্তলিকতা আঁকড়ে থাকে, তবে তার অর্থ হবে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুধ্যমান আছে। এই বিশ্বাস জন্মেছিল আরবের দক্ষিণাঞ্চলের ইয়ামন ও হাযরামাউতের বাসিন্দাদের মধ্যে। কারণ হিজাজ ও পার্শ্ববর্তী উত্তরাঞ্চলের লোকেরা ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে নতুন ধর্মের আশ্রয়ে এসে পড়েছিল। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে মোশরেক ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মোশরেক বা পৌত্তলিকদের সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা দলে দলে নতুন ধর্ম ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছিল। তারা মদীনায় একাধিক প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তাদের অধিকাংশকে পূর্বের সামাজিক পদমর্যাদায় বহাল রাখা হচ্ছিল। এজন্য নতুন ধর্মের প্রতি তাদের আকর্ষণ আরো বেড়ে যায়।

ইহুদী-খৃষ্টান ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য

অপরদিকে ইহুদী-খৃষ্টানদের সম্পর্কেও পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয়। হযরত আলী (রা) হজ্জের সময় সূরা তাওবার যেসব আয়াত উচ্চকণ্ঠে পাঠ করে শোনান, সে সবার মধ্যেও তাদের সম্পর্কিত আয়াত রয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ مُنْكَرُونَ (الْيَوْمِ الْآخِرِ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ - وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ - هَذَا مَا كَنْزْتُمْ . لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ .

“যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ বিশ্বাস করে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়। ইহুদীরা বলে, ‘উযায়ের আল্লাহর পুত্র’ এবং খৃষ্টানরা বলে, ‘মসীহ আল্লাহর পুত্র’। ওটা তাদের মুখের কথা! পূর্বে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ওরা তাদের মতো কথা বলে। আল্লাহ্ ওদেরকে ধ্বংস করুন। ওরা কি করে সত্যবিমুখ হয়?

তারা আল্লাহ্ ছাড়া তাদের পণ্ডিতদের এবং সংসার বিরাগীদের তাদের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়ম-তনয় মসীহকেও। কিন্তু ওরা এক ইলাহুর ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি কত পবিত্র!

তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নিভিয়ে ফেলতে চায়। কাফেররা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না।

মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সব দীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথ-নির্দেশ ও সত্য দীনসহ রাসূল পাঠিয়েছেন।

হে মু’মিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। যারা সোনা ও রূপা জমা করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মভুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

যেদিন জাহান্নামের আগুনে ওটা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। সুতরাং স্বাদ গ্রহণ কর তার, যা তোমরা জমা করতে।” (৯ : ২৯-৩৫)

সূরা তাওবার উপরোক্ত আয়াতগুলোর প্রেক্ষিতে অধিকাংশ পশ্চিমা ঐতিহাসিক অভিযোগ করে থাকেন, এসব আয়াত মহানবী (সা)-এর নিকট ওহী নাযিল হওয়ার শেষ দিকের। দু’বছর আগেও ইহুদী-খৃষ্টানদের সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর যে নীতি ছিল, এসব আয়াতে তা পরিবর্তন করা হয়েছে। কোন কোন প্রাচ্যবিদ এও বলেছেন, এসব আয়াতে ইহুদী-খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের একই সারিতে এনে দাঁড় করানো হয়েছে। অথচ এই ইহুদী-খৃষ্টানদের সহায়তা নিয়েই মহানবী (সা) আরব উপদ্বীপে পৌত্তলিকতা নির্মূল অভিযানে কামিয়াব হয়েছিলেন। নবুয়তের প্রথম দিকে বলতেন, তিনি ঈসা, মূসা, ইবরাহীম ও অন্যান্য পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্য নিয়ে এসেছেন। কিছু দিন পর ইহুদীদের শত্রুতার অজুহাতে তাদেরকে নির্মূল করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি তাদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেন। এ

সময় তিনি খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখেন। তিনি মানুষের সামনে খৃষ্টানদের প্রশংসাসূচক আয়াত আবৃত্তি করতেন। পবিত্র কোরআনের এসব আয়াতের মধ্যে একটি আয়াত হচ্ছে :

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي - ذَلِكَ بَانَ
مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ .

“অবশ্য মু’মিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদী ও মোশরেকদেরই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে এবং যারা বলে ‘আমরা খৃষ্টান’ মানুষের মধ্যে তাদেরকেই তুমি মু’মিনদের নিকটতর বন্ধু রূপে দেখবে, কারণ তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী আছে, আর তারা অহংকারও করে না।” (৫ : ৮২)

কিন্তু পরবর্তীতে খৃষ্টানদের সাথেও সে আচরণ শুরু করা হয়, যা পূর্বে ইহুদীদের সাথে করা হয়েছে। যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না, তিনি খৃষ্টানদেরকেও সেসব পৌত্তলিকদের সমপর্যায়ে গণ্য করা শুরু করেন। অথচ তাঁর সফলতার পেছনে খৃষ্টানদেরও অসামান্য অবদান রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীরা মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করলে খৃষ্টান শাসক নাজ্জাশীই তাদেরকে সেখানে স্বাধীনভাবে বসবাসের অনুমতি দান করেন। পরবর্তীতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই নাজরান ও অন্যান্য এলাকার খৃষ্টান অধিবাসীদের প্রতিশ্রুতিপত্র প্রদান করেন যে, তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম-কর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে। এসব প্রাচ্যবিদ আরো লিখেছেন, “হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যবহারের পরিবর্তনের পরই খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কের ব্যবধান দিন দিন বাড়তে থাকে। বর্তমানে তাদের মধ্যে হৃদয়তা গড়ে ওঠা অসম্ভব না হলেও বেশ মুশকিল হয়ে পড়েছে।”

প্রাচ্যবিদদের এসব যুক্তি-প্রমাণ সরল ও অজ্ঞ মানুষের মনে রেখাপাত করতে পারে কিন্তু ইতিহাস ও পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের পটভূমি সম্পর্কে গভীর পর্যালোচনা করলে এই সত্য পরিষ্কার প্রতিভাত হয় এবং ইহুদী-খৃষ্টানদের সম্পর্কে ইসলাম ও ইসলাম প্রবর্তকের নীতি শুরু থেকে মহানবী (সা)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত অভিন্ন ছিল। তাতে এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। প্রথম থেকেই পবিত্র কোরআন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মকে পৃথিবীর সামনে আল্লাহ তা‘আলার একজন বান্দা ও রাসূল হিসাবে পেশ করেছে এবং তাকে মাবুদ বিশ্বাস করার তীব্র নিন্দা করেছে। বিশ্ববাসীকে একত্ববাদের শিক্ষা দেয়ার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে। ইসলামের বুনিয়াদই একত্ববাদের বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এরূপ অবস্থায় খৃষ্টানদের খুশী করার জন্য ইসলাম হযরত ঈসাকে কি করে আল্লাহ তা‘আলার সাথে শরীক করতে পারে? পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই হযরত ঈসার প্রশংসা করেছেন। তাঁকে ‘রুহুল্লাহ’ ও ‘কালিমুল্লাহ’ উপাধি প্রদান করেছেন। তাঁকে নবুয়ত ও কিতাব দান করেছেন। বরকতময় করেছেন। আজীবন নামায ও যাকাত আদায়ের উপদেশ দিয়েছেন। অবশ্য পবিত্র কোরআনে এই সঙ্গে এ কথাও পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, ‘আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।

আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, কারো জাত নন এবং কেউ তাঁর সমকক্ষও নয়।' একত্ববাদের এই তত্ত্বের উপরই ইসলামের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। আর তা প্রথম থেকে আছে এবং পৃথিবীর শেষ দিনটি পর্যন্ত থাকবে।

বস্তুত খৃষ্টানদের সাহায্য-সহযোগিতা নেয়ার আশায় মহানবী (সা) যে কখনো অযথা প্রশংসা ও স্তাবকতার ছায়া মাড়াননি, তার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে, নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদলের ঘটনা। এই ঘটনা ছিল সূরা তাওবা নাযিল হওয়ার বহু আগের। উক্ত প্রতিনিধিদল তাওহীদ বা একত্ববাদ ও হযরত ঈসার মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর সাথে বাহাস করার উদ্দেশ্যে মদীনায় আসে। আলোচনার এক পর্যায়ে তারা মহানবী (সা)-কে প্রশ্ন করে, আপনি দাবি করছেন আল্লাহ্ এবং তাঁর কোন শরীক নেই এবং তাঁর কোন পুত্রও নেই। হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা ছিলেন হযরত মরিয়ম। এখন আপনি বলুন, তাঁর পিতা ছিল কে? খৃষ্টান পাদরীদের জবাব দান প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয় :

انَّ مَثَلِ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ - خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ . فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ . إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ - وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ - وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ .

“আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত-সদৃশ। তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর তাকে বলেছিলেন, ‘হও’, ফলে সে হয়ে গেল।”

“এই সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে, সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।”

“তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তর্ক করে, তাকে বল, ‘এসো আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের নিজদেরকে, অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং রাখি মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ।”

“নিশ্চয়ই এটা সত্য কাহিনী। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ্ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। তুমি বল, ‘হে কিতাবীগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করি না, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক করি না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেও প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করে না।’ যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বল, আমরা আত্মসমর্পণকারী, তোমরা সাক্ষী থেকে।” (৩ : ৫৯-৬৪)

সূরা আলে ইমরানের এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদী-খৃষ্টানদের ভৎসনা করেছেন যে, তারা মু'মিনদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। নিজেরাও আল্লাহ তা'আলার বাণী অস্বীকার করছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হযরত ঈসা, হযরত মুসা ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি যেসব বিধি-বিধান নাযিল করা হয়েছে, সূরা আলে ইমরানে সেগুলোই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ইহুদী-খৃষ্টানরা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের এসব শিক্ষা পরিবর্তন করে নিজেদের পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। সূরা আলে ইমরানে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের যেসব শিক্ষা বর্ণনা করা হয়েছে, পবিত্র কোরআনের অন্যান্য সূরায়ও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। যেমন সূরা মায়িদায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثُلَاثٍ وَمِمَّنْ آتَاهُ الْوَحْيُ وَوَاحِدٌ - وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ - وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ - قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ - كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ - اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ اَنْظُرْ أَنْتَى يُؤْفَكُونَ .

“যারা বলে ‘আল্লাহ্‌ই মরিয়ম-তনয় মসীহ’ তারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে ; অথচ মসীহ বলেছিল, ‘হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর। কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস অগ্নি ; সীমালংঘনকারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

যারা বলে ‘আল্লাহ্‌ তো তিনের মধ্যে একজন’, তারা অবশ্যই সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে--যদিও এক ইলাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তারা যা বলে তা থেকে নিবৃত্ত না হলে তাদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের উপর মর্মভুদ শাস্তি আপতিত হবে।

তবে কি তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না এবং তাঁর নিকট কি ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মরিয়ম-তনয় মসীহ তো কেবল একজন রাসূল ; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তার মা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তারা উভয়ে খাদ্যাহার করত। দেখ, তাদের জন্য আয়াত কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি। আরো দেখ, তারা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়।” (৫ : ৭৩-৭৫)

সূরা মায়েদার অপর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ - قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ

“আল্লাহ্‌ যখন বলবেন, ‘হে মরিয়ম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, ‘তোমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া আমাকে ও আমার মাকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর?’ সে বলবে, ‘তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম, তবে তুমি তো তা জানতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত

আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই ; তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ।”

(৫ : ১১৬)

এ আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো (১১৬-১১৮) আমি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। আর খৃস্টান ঐতিহাসিকরা এই সূরা মায়েদারই একটি আয়াত তাদের অনুকূলে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে থাকে।

আয়াতটি হচ্ছে :

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا -
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي - ذَلِكَ بِأَن
مِّنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ .

“অবশ্য বিশ্বাসীদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদী ও মোশরেকদেরকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে এবং যারা বলে ‘আমরা খৃস্টান’ মানুষের মধ্যে তাদেরকেই তুমি মু’মিনদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখবে, কারণ তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত সংসারবিরাগী আছে, আর তারা অহংকারও করে না।” (৫ : ৮২)

উপরোক্ত আয়াতটি উদ্ধৃত করে খৃস্টান ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রথম দিকে খৃস্টানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু সমগ্র আরবে বিজয় লাভের পর তাঁর কাজ হাসিল হয়ে যায়। এবার তিনি চোখ ফিরিয়ে নেন। খৃস্টানদেরকেও পৌত্তলিকদের সমপর্যায়ভুক্ত করে তিনি তাদের নির্মূল করার জন্য তৎপরতা শুরু করেন।

বস্তুত খৃস্টান ঐতিহাসিকদের উক্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ সূরা তাওবার বিভিন্ন আয়াতে খৃস্টানদের সম্পর্কে (ইহুদীসহ) যা বলা হয়েছে, এসব তাদেরকে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের প্রতি ঈমান আনার জন্য বলা হয়নি। বরং তাদের নিন্দা করার মূল কারণ হল, আল্লাহ তা‘আলার সাথে অন্যকে শরীক করা, মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা এবং আল্লাহর রাস্তায় সোনারূপা ব্যয় না করে পুঞ্জীভূত করা। ইসলাম খৃস্টানদের এসব কাজকে হযরত ঈসা (আ)-এর ধর্মীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুতি হিসাবে গণ্য করে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজকে বৈধ মনে করা এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি অবিশ্বাসসুলভ আচরণ সত্ত্বেও ইসলাম তাদেরকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী বলে বিবেচনা করেনি। এমনকি তাদেরকে পৌত্তলিকদের সমপর্যায়েরও মনে করেনি। এসব অন্যায় ও অবৈধ কাজের জন্য ইসলাম ইহুদী-খৃস্টানদের শুধু জিযিয়া দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছে। সুতরাং মহানবী (সা) সম্পর্কে খৃস্টান ঐতিহাসিকদের অভিযোগ কোন দিক থেকেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

প্রতিনিধিদলের অব্যাহত আগমন

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হজ্জের সময় হযরত আলী (রা)-এর ঘোষণা আরব উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলে ইসলাম গ্রহণের এক ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সে এলাকার অধিবাসীরা দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে। বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিরা বাঁধ ভাঙা বন্যার বেগে মদীনা আসতে শুরু করে। তাদের মধ্যে মুশরিক ও কিতাবী উভয় সম্প্রদায়ের

লোকই ছিল। মহানবী (সা) প্রতিটি প্রতিনিধিদলকে অত্যন্ত আদর-যত্ন করতেন। তাদের নেতাদেরকে পদ-মর্যাদায় বহাল করে মদীনা থেকে বিদায় দিতেন। এসবের মধ্যে একটি প্রতিনিধিদল ছিল ইয়ামনের সম্ভ্রান্ত গোত্র বনু কিন্দার। তাদের দলপতি ছিলেন আশআছ ইবনে কায়েস। এই দলে আশি জন আরোহী ছিল। তাঁরা মসজিদে নববীতে মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তারা বেশ সেজেগুঁজে আসে। তাদের কাঁধে রেশমী মেখলা জড়ানো ছিল। চোখে ছিল সুরমা লাগানো। পরনে ছিল কারুকার্য খচিত রেশমী জুব্বা। মহানবী (সা) তাদের দেখে বললেন, “তোমরা কি এখনো ইসলাম গ্রহণ করনি?” তারা জবাব দিল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সবাই মুসলমান।’ মহানবী (সা) বললেন, ‘তাহলে কেন তোমরা গলায় রেশমী মেখলা জড়িয়ে রেখেছ?’ এ কথা শুনেই তারা নিজ নিজ গলা থেকে মেখলা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

প্রতিনিধিদলের নেতা আশআছ ইবনে কায়েস বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ‘আকিলুল মুরার’-এর বংশধর এবং আপনিও। এ কথা শুনে মহানবী (সা) মৃদু হেসে বললেন, “আকিলুল মুরার”-এর বংশধর হওয়ার গর্ব তো হচ্ছে আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেব ও রবীআ ইবনে হারেছ ইবনে আবদুল মোত্তালেবের। আমি তাঁদের সন্তান নই। সুতরাং আমি আকিলুল মুরার-এর বংশধর হব কেন।”

উক্ত প্রতিনিধিদলে আশআছ ইবনে কায়েসের সাথে ওয়ায়েল ইবনে হুজর কিন্দীও এসেছিলেন। তিনি ছিলেন হায়রামাউতের উপকূলীয় শহর ও জনপদগুলোর সামন্ত সরদার। তিনিও মহানবী (সা)-এর দরবারে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা) ওয়ায়েলকে তাঁর পূর্ব-মর্যাদায় বহাল রাখেন। তবে শর্ত করা হয় যে, তিনি তাঁর এলাকার অধিবাসীদের নিকট থেকে ফসলের

১. আকিলুল মুরার-এর শাব্দিক অর্থ দাঁতন বৃক্ষ ভক্ষণকারী। এই উপাধি ছিল ইয়ামনের বনু কিন্দা গোত্রের বাদশাহ হারেছ ইবনে আমরের। তাঁর এই উপাধির পিছনেও একটি কাহিনী রয়েছে। তিনি একবার নিজের গোত্র থেকে দূরে কোথাও ছিলেন। এই সুযোগে গাস্‌সান গোত্র প্রধান আমর ইবনে হাইউলা কিন্দা গোত্র আক্রমণ করে। আমর কিন্দা গোত্রের অটেল সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় হারেছ ইবনে আমরের স্ত্রী উম্মে উনাম বিনতে আওফকেও উঠিয়ে নিয়ে যায়। উম্মে উনাম পথে নিজের স্বামী সম্পর্কে আমর ইবনে হাইউলাকে ভয় দেখিয়ে বলে, ‘তুমি তো আমাকে নিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু শিগ্গিরই উটের মতো পা ওয়ালা এবং দাঁতন বৃক্ষ ভক্ষণকারী কৃষ্ণকায় লোকটি এসে তোমার ঘাড় মটকে দিবে। বস্তুত পরবর্তীতে তাই হয়েছিল। আর সেদিন থেকে হারেছ ইবনে আমরের উপাধি হয় আকিল মুরার বা দাঁতন গাছ ভক্ষণকারী। কিন্দা গোত্রের বাদশাহী কয়েক পুরুষ থেকে ছিল। এদিকে মহানবী (সা)-এর পূর্বপুরুষ কীলাব ইবনে মুরার মা ছিলেন কিন্দা গোত্রের। কুরাইশরা ইয়ামনের কিন্দা গোত্রের আত্মীয়তা নিয়ে গর্ব করত। একবার মহানবী (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা) ও তাঁর ভাতিজা রবীআ ইবনে হারেছ বাগিজ্য উপলক্ষে বাইরে যান। তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা বলেন, “আমরা আকিলুল মুরার-এর বংশধর। আর তাদের এ কথা আরবে ছড়িয়ে পড়ে। ওদিকে কিন্দা গোত্রও মক্কার কুরাইশদের সাথে আত্মীয়তা নিয়ে গর্ব করত। এই পটভূমির প্রেক্ষিতে কিন্দা গোত্রের প্রতিনিধিদলের নেতা আশআছ ইবনে কায়েস মহানবীকে লক্ষ করে বলেছিলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা উভয়ে আকিলুল মুরার-এর বংশধর। কিন্তু মহানবী (সা) পূর্ব-পুরুষের মাতৃপরিচয়ে পরিচিত হতে চাননি। এজন্য তিনি প্রতিউত্তরে আশআছ ইবনে কায়েসকে বললেন, ‘আকিলুল মুরার-এর বংশধর হওয়ার গৌরব থাকলে আব্বাস ও রবীআর থাকতে পারে। আমি তো নযর ইবনে কানানার বংশধর। আমি আমার পূর্বপুরুষের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার পক্ষপাতী, তাদের মাতৃকুল পরিচয়ে নয়। -অনুবাদক

এক-দশমাংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করে মহানবী (সা)-এর মনোনীত তহসীলদারদের নিকট পৌঁছে দেবেন।

মহানবী (সা) সেখানকার মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষা দেয়ার জন্য ওয়ায়েল ইবনে হুজরের সাথে হযরত মুআবিয়া (রা)-কে পাঠিয়ে দেন। পথে হযরত মুআবিয়া (রা) ওয়ায়েলের সাওয়ারীর পেছনে বসার আবেদন করেন। ওয়ায়েল হযরত মুআবিয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি প্রচণ্ড রোদ থেকে বাঁচার জন্য তার জুতো জোড়া দিতেও অস্বীকার করেন। অবশ্য তার সাওয়ারীর পেছনের ছায়ায় চলার অনুমতি প্রদান করেন। ইসলামে এ ধরনের আচরণের কোন অবকাশ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে সব মুসলমান ও মু'মিন পরস্পর ভাই ভাই। তা সত্ত্বেও হযরত মুআবিয়া (রা) ওয়ায়েলের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তিনি ভাবলেন, ওয়ায়েল নতুন মুসলমান। এ নিয়ে তার সাথে তর্ক করলে সে বিগড়ে যেতে পারে। এর পরিণতিতে তার সম্প্রদায়কে ইসলামে দীক্ষিত করার সুযোগই নষ্ট হয়ে যাবে। এই ভেবে হযরত মুআবিয়া (রা) ওয়ায়েলের এই নির্দয় আচরণ উপেক্ষা করলেন।

ইয়ামনে ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়। সেখানকার বাসিন্দাদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষাদীক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে মহানবী (সা) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান। রওয়ানা দেয়ার সময় প্রতিনিধিদলের নেতাকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “হে মুআয! যতটা সম্ভব মানুষের সাথে অমায়িক ব্যবহার করবে। কারো সাথে কঠোর ব্যবহার করবে না। মানুষের সাথে অন্তরঙ্গতা গড়ে তুলবে। কাউকে ঘৃণা করবে না। ঘৃণা করলে মানুষ তোমার থেকে দূরে সরে পড়বে। সেখানে কিতাবধারীদের সাথে তোমার দেখা হবে। তারা তোমার নিকট বেহেশতের চাবি সম্পর্কে জানতে চাইবে। তুমি বলবে, বেহেশতের চাবি হচ্ছে এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই।”

হযরত মুআযের সাথে শীর্ষস্থানীয় মুসলমান ও রাজস্ব আদায়কারীদের যে দলটি গিয়েছিলেন, তাঁরা মানুষকে শুধু ইসলামী শিক্ষাদীক্ষাই প্রদান করতেন না, স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যারও সমাধান দিতেন। আর এসব সমাধান ও বিচার-আচার করা হত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুযায়ী।

আরবে ইসলামী সংহতি

এ সময়ে আরব উপদ্বীপের আনাচে-কানাচে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। আরবের পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ একই উন্মত্তে পরিণত হয়। আরবরা সবাই একই পতাকাতলে সমবেত হয়। আর সে পতাকা ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পতাকা। সবাই একই ধর্মে দীক্ষিত হয়। আর সে ধর্ম হল পবিত্র ইসলাম। সবাই একই দিকে, একই লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। আর তা ছিল এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত।

এই গোত্রগুলোই তখন থেকে মাত্র কুড়ি বছর আগে পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করত। একে অপরের জানমালের চরম শত্রু ছিল। কিন্তু ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার সাথে সাথে তাদের মন-মানসিকতা পৌত্তলিকতার কদর্যতামুক্ত হয়। তাদের অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের প্রেরণায় ভরে ওঠে। তাদের মধ্যকার একে অপরের প্রতি

হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটে। এত দিন যে তরবারি নিজের ভাইদের উপর চালানো হত, এখন তা দেশরক্ষা ও ইসলামের হেফাজতের জন্য ব্যবহার শুরু হয়।

নাজরানের খৃষ্টানদের ইসলাম গ্রহণ

নাজরানের বনু হারেছ গোত্রের খৃষ্টানদের অধিকাংশ আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কিছুসংখ্যক লোক তখনো তাদের পূর্বধর্ম আঁকড়ে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য হযরত খালিদ (রা)-কে নাজরানে পাঠান। হযরত খালিদের আহ্বানে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত খালিদ (রা) গোত্রের নেতৃস্থানীয়দের সমবায়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা) এই প্রতিনিধিদলকে অত্যন্ত আদর-যত্ন করেন।

সর্বশেষ প্রতিনিধিদলের আগমন

ইয়ামনের 'নাখআ' গোত্র তখনো ইসলামের প্রতি বৈরী ছিল। একটা অসুস্থ ধারণা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখছিল। এতদিন ইয়ামনবাসীরা হেজাজ আক্রমণ করত। কিন্তু হেজাজ কোন দিন ইয়ামন আক্রমণ করেনি। এজন্য নাখআ গোত্র মনে করত, তারা হেজাজীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। তারা কেন হেজাজের ধর্ম গ্রহণ করবে। এই অসুস্থ ধারণা 'নাখআ' গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখছিল। মহানবী (সা) তাদের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য হযরত আলী (রা)-কে সেখানে পাঠান। হযরত আলীর সাথে তিন শ' অশ্বারোহী ছিল। নাখআ গোত্রের লোকেরা হযরত আলীর সাথে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। তারা মোকাবেলার জন্য এগিয়ে আসে। হযরত আলীর বয়স তখন কম হলেও তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তাদের মোকাবেলা করেন। তিনি তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। এরপর তারা পুনরায় একত্র হয় এবং মুসলমানদের আক্রমণ করে। হযরত আলী (রা) সাহসিকতার সাথে তাদের ঘিরে ফেলেন এবং ধরাশায়ী করা শুরু করেন। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণে বাধ্য হয়ে তারা আত্মসমর্পণ করে। হযরত আলীর আহ্বানে শেষ পর্যন্ত তারা ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত আলী (রা) তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পন্ন হওয়ার পর মদীনায় ফিরে আসেন। নতুন মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষা দেয়ার দায়িত্ব তিনি হযরত মুআয (রা)-এর উপর ছেড়ে আসেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাদেরও একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় মহানবী (সা)-এর খেদমতে আসেন। মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় মদীনায় আগমনকারী প্রতিনিধিদলগুলোর মধ্যে এটাই ছিল সর্বশেষ প্রতিনিধিদল।

মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের প্রস্তুতি

হযরত আলী (রা) ইয়ামন থেকে ফেরার পথে মক্কা হয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় মহানবী (সা)-ও হজ্জে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সে সময় বছরের অধিকাংশ মাস অতিক্রান্ত হয়ে যিলকাদ মাসের দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ পর্যন্ত মহানবী (সা) ছোট হজ্জ অর্থাৎ দু'বার ওমরা পালন করেছেন। কিন্তু তখনো তাঁর বড় হজ্জব্রত পালনের সুযোগ

হয়নি। মুসলমানদের হজ্জের বিধি-বিধান সম্পর্কে সরাসরি অবহিত করাও মহানবী (সা)-এর এবার হজ্জে যাওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

মহানবী (সা)-এর হজ্জে যাওয়ার কথা এবং এই সঙ্গে সাধারণ মুসলমানদেরকে রাসূলুল্লাহর সাথে হজ্জব্রত পালনের আহ্বান আরব উপদ্বীপের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে সারা আরব উপদ্বীপে একটা অভাবনীয় আবেগ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। পাহাড়-পর্বত, মাঠ-প্রান্তর, ধূসর মরু অতিক্রম করে দলে দলে মানুষ মদীনা আসতে থাকে। মদীনার আশেপাশের এলাকা তাঁবুর শহরে পরিণত হয়। মহানবী (সা)-এর সাথে হজ্জব্রত পালনের জন্য তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক লাখেরও অধিক মুসলমান মদীনা সমবেত হয়। আল্লাহর কী কুদরত! এই লোকগুলো কিছুদিন আগেও একে অপরের রক্তপিপাসু ছিল। কিন্তু পবিত্র ইসলামের বরকতে আপন ভাইয়ের চাইতেও তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও হৃদয়তা গড়ে ওঠে। প্রতিটি লোক মহানবী (সা)-এর সাথে হজ্জ পালনের সুযোগ লাভের আনন্দে উদ্বেল ছিল। তাদের এই সমাবেশ ছিল পবিত্র ইসলামের সত্যতা ও বিশ্বস্ততার এক মূর্ত প্রতীক। ইসলামের শত্রুরা এই নতুন ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কতই না চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের বিজয় অবধারিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের নূরের আলোতে আরবভূমির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত আলোকিত হয়েছে। যে আরবরা আগে একে অপরের চরম শত্রু ছিল, ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার পর তাদের সে মনমানসিকতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তারা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লৌহ প্রাচীরের মত সুদৃঢ় ও অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হজ্জে রওয়ানা

হিজরী দশ সালের পঁচিশে যিলকাদ মহানবী (সা) হজ্জে রওয়ানা দেন। তিনি তাঁর সকল সহধর্মিণী সঙ্গে নেন। যেসব মুসলমান মহানবী (সা)-এর সাথে হজ্জব্রত পালনের প্রবল আগ্রহ নিয়ে মদীনা সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরাও মহানবী (সা)-কে অনুসরণ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল নব্বই হাজার। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এক লাখ চৌদ্দ হাজার। প্রত্যেকের হৃদয়-মন আল্লাহর ঘরের যিয়ারত ও হজ্জব্রত পালনের আনন্দে উন্মুখ ছিল। এই বিরাট কাফেলা যুল-হোলায়ফা পৌঁছলে মহানবী (সা) শিবির স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন। সুতরাং কাফেলা যুল-হোলায়ফায় রাত অতিবাহিত করেন। ফজর নামায আদায়ের পর মহানবী (সা) ও কাফেলার সবাই ইহ্রাম বাঁধেন। ধনী-দরিদ্র সবাই একই পোশাক পরিধান করেন। আর তা ছিল একটি লুঙ্গি ও একটি চাদর। এর চাইতে সাধারণ পোশাক আর কী হতে পারে। তাতে করে তাঁরা সাম্য ও মৈত্রীর সত্যিকার ও বাস্তব এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

ইহ্রাম ও তালবিয়া

ইহ্রাম বাঁধার পর মহানবী (সা) অত্যন্ত কায়মনে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করেন। আবেগজড়িত কণ্ঠে তাকবীর বলেন :

لَبَّيْكَ - اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ - الْحَمْدُ وَالنُّعْمَةُ
وَالشُّكْرُ لَكَ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ -

“হে আল্লাহ! আমরা তোমার সামনে হাযির হয়েছি। তোমার কোন শরীক নেই। সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। নেয়ামত বা প্রাচুর্য তোমারই অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। সকল প্রকার কৃতজ্ঞতা তোমারই জন্য। হে অদ্বিতীয় ও অংশীদারহীন আল্লাহ! আমরা তোমার সামনে উপস্থিত।”

মহানবী (সা)-এর অনুসরণে অন্যান্য মুসলমান সুউচ্চ কণ্ঠে তাকবীর পাঠ করেন। তাদের কণ্ঠধ্বনিতে পাহাড়-পর্বত ও সমভূমি কেঁপে ওঠে। এই কাফেলা মক্কা ও মদীনার মাঝপথে সারিফ নামক স্থানে পৌঁছার পর মহানবী (সা) সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে যাদের সাথে কোরবানীর পশু নেই, তারা ওমরার নিয়ত করে নাও। কিন্তু যারা কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে এসেছে, তাদের ওমরার নিয়ত করা জায়েয হবে না। তাদেরকে হজ্জের নিয়ত করতে হবে। যিলহজ্জের চার তারিখে মহানবী (সা) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মক্কা নগরীতে পৌঁছান। তিনি সরাসরি কা’বাঘরে যান। সেখানে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। কা’বাঘর সাতবার তাওয়াফ করেন। অন্যরাও তাঁকে অনুসরণ করেন। তাওয়াফ প্রথম চার বার দ্রুত করেন এবং পরবর্তী তিন বার সাধারণ গতিতে তাওয়াফ করেন। এই অনুষ্ঠান শেষে মহানবী (সা) সাফা পাহাড়ে চলে যান। সেখানে তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ান। সাফা-মারওয়ার সাঙ্গ সম্পন্ন হওয়ার পর মহানবী (সা) ঘোষণা করেন, ‘যেসব যিয়ারতকারীর সঙ্গে কোরবানীর পশু নেই, তারা ইহ্রাম খুলে ফেল।’ কিন্তু কোন কোন মুসলমান এই ব্যাপারে ইতস্তত করেন। তাতে মহানবী (সা) অত্যন্ত রেগে যান। তিনি বলেন, “আমি তোমাদেরকে যা নির্দেশ করছি, তা পালন কর।” তিনি ক্ষুব্ধ অবস্থায় তাঁবুতে যান। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! কি কারণে আপনি এরূপ রাগান্বিত হয়েছেন।” মহানবী (সা) বললেন, “রাগব না কেন, আমি তাদের যা নির্দেশ করছি, তারা তা পালন করছে না।”

সাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁবুতে আসেন। তিনি মহানবী (সা)-কে ক্ষুব্ধ দেখে বলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার অসন্তুষ্টিকারীকে আল্লাহ তা’আলা দোষখে নিষ্ক্ষেপ করবেন।” মহানবী (সা) বললেন, “তুমি কি এ ব্যাপারটা অনুভব করনি যে, আমি তাদেরকে যা নির্দেশ করছি, তারা তা পালন করতে দ্বিধা করছে। ‘হজ্জের কিরানের’ অসুবিধা সম্পর্কে যদি আমার অভিজ্ঞতা থাকত, আমি কোরবানীর পশু কিনে সঙ্গে নিয়ে আসতাম না এবং ইহ্রাম খুলে ফেলতাম।”

মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে, “মহানবী (সা)-এর অসন্তুষ্টির কথা জানতে পেরে মুসলমান হজ্জব্রত পালনকারীরা অনুতপ্ত হন। যাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল না, তারা সবাই ইহ্রাম খুলে ফেলেন। মহানবীর সহধর্মিণীগণ এবং তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা)-ও ইহ্রাম খুলে ফেলেন। কিন্তু যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল, তাদেরকে ইহ্রাম খুলতে হয়নি।

ইয়ামন থেকে হযরত আলী (রা)-এর প্রত্যাবর্তন

মুসলমানরা হজ্জের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনে নিয়োজিত ছিলেন। এ সময় হযরত আলী (রা) ইয়ামন থেকে মক্কায় এসে পৌঁছান। যখন জানতে পারেন যে, মহানবী (সা) মানুষের সাথে হজ্জ পালন করছেন, হযরত আলীও ইহ্রাম বাঁধেন। কিন্তু তিনি হযরত ফাতেমার নিকট পৌঁছে তাঁকে ইহ্রাম খোলা অবস্থায় দেখতে পান। কারণ জিজ্ঞেস করলে হযরত ফাতেমা

(রা) বলেন, “রাসূলুল্লাহ্ ওমরার নিয়ত করে ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথা শুনে হযরত আলী (রা) তখনই মহানবী (সা)-এর খেদমতে যান। তিনি সেখানে ইয়ামনের অবস্থা সম্পর্কে মহানবী (সা)-কে অবহিত করেন। কথা শেষ হওয়ার পর মহানবী (সা) বললেন, “যাও, আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ কর। এরপর অন্যদের মতো তুমিও ইহরাম খুলে ফেল।”

হযরত আলী (রা) বললেন, “হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ইহরাম বাঁধার সময় নিয়ত করেছিলাম, ‘হে আল্লাহ্‌, আমি সেসব শব্দের দ্বারা তালবিয়া’ বলছি, যেসব শব্দ দ্বারা তোমার নবী, তোমার বান্দা এবং তোমার রাসূল মুহাম্মদ (সা) বলেছেন।” এ কথা শুনে মহানবী (সা) হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কোরবানীর পশু আছে? হযরত আলী (রা) বললেন, ‘জ্বী না’। এরপর মহানবী (সা) নিজের কোরবানীর পশুর সাথে হযরত আলী (রা)-কে শরীক করে নিলেন। তাতে করে হযরত আলী (রা) ইহরাম পরা থাকেন। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় হজ্জের বিভিন্ন বিধান পালন করেন।

হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন

আটই যিলহজ্জ তালবিয়ার দিন মহানবী (সা) মক্কা থেকে মিনায় যান। সেখানে তাঁর জন্য টাঙানো তাঁবুতে তিনি অবস্থান করেন। এ দিনের ইবাদত-বন্দেগী তিনি তাঁবুতেই আদায় করেন। এই তাঁবুতে তিনি রাত যাপন করেন। ভোরে তাঁবুতেই ফজর নামায আদায় করেন। সূর্য উদয়ের পর তিনি তাঁর উট কাসওয়ায় আরোহণ করেন এবং আরাফাত প্রান্তরের দিকে রওয়ানা দেন। এ দিন ছিল ৯ যিলহজ্জ। এক লাখ লোকসহ তিনি আরাফাতে পৌঁছান। সেখানে মুসলমানরা মহানবী (সা)-এর আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। এ সময় মুসলমানরা কেউ তালবিয়া পড়ছিলেন আবার কেউ কেউ পড়ছিলেন তারবিয়া। তাঁরা সজোরে পড়ছিলেন। মহানবী (সা) কাউকে বারণ করেননি।^১

আরাফাতের পূর্ব প্রান্তে নামেরা বস্তির অদূরে মহানবী (সা)-এর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। তিনি সেখানে আরাম করেন।

বিদায় হজ্জে ভাষণ

সূর্য পশ্চিমাকাশে যাওয়ার পর মহানবী (সা) তাঁর বাহন উটটি নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদান করেন। তাতে আরোহণ করে তিনি আরাফাত প্রান্তরের মাঝখানে আসেন। এখানে উটে বসেই তিনি ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ দান করেন। তিনি উঁচু কণ্ঠে ভাষণ দেন। প্রতিটি বাক্য তিনি বিরতি দিয়ে বলতেন। এ সময়ে রবীআ ইবনে উমাইয়া ইবনে খালফ মহানবী (সা) উচ্চারিত বাক্যগুলো সজোরে পুনরাবৃত্তি করতেন। আল্লাহ্‌ তা‘আলার প্রশংসা করার পর মহানবী (সা) সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশে বলেন :

১. তালবিয়া মানে ‘লাক্বায়কা, লাক্বায়কা’। -গ্রন্থকার

২. তালবিয়া হচ্ছে “আল্লাহ্‌ আকবর, আল্লাহ্‌ আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ ওয়াল্লাহ্‌ আকবর আল্লাহ্‌ আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ।” ৮ই যিলহজ্জ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত এই বাক্য প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তিন বার করে পড়া ওয়াজিব। -অনুবাদক

“হে সমবেত মানুষ! তোমরা আমার কথা মনোযোগ সহকারে শুনে রাখ। কারণ এ বছরের পর হয়তো আমি এখানে তোমাদের সাথে আর কখনো মিলিত হতে পারব না।

“হে মানুষ! তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ কেয়ামত পর্যন্ত পরস্পরের জন্য সম্মানিত যেমনি করে এই দিন ও এই মাস তোমাদের নিকট সম্মানিত। অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। তিনি তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। ভাল করে জেনে রাখ, আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছি। যার নিকট কারো আমানত রয়েছে, সে অবশ্যই তা মালিককে ফিরিয়ে দেবে। আজ থেকে সকল প্রকার সুদ মওকুফ করা হল। তোমরা শুধু আসল পাওনা পাবে। তোমরা কারও প্রতি জুলুম করবে না। তোমাদের সাথেও জুলুম করা হবে না। আল্লাহ তা‘আলাই সুদ নিষিদ্ধ করেছেন। আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেবের যে সুদ অন্যদের যিম্মায় রয়েছে, তা মওকুফ করা হল।

“স্মরণ রেখ, অজ্ঞতা আমলের সকল হত্যার কিসাস বা রক্তের বদলা রক্ত কিংবা ক্ষতিপূরণ রহিত করা হল। সবার আগে আমি বনু হাশিম গোত্রের ইবনে রবীআ ইবনে হারেছ ইবনে আবদুল মোত্তালেবের জীবনের বদলা ও ক্ষতিপূরণ মাফ করে দিচ্ছি।

“মনোযোগ সহকারে শোন, এখন থেকে আরবে আর শয়তানের পূজা করা হবে না। অবশ্য ছোটখাটো ব্যাপার যেগুলো তোমরা বড় পাপ মনে করবে না, সেগুলোতে শয়তানের অনুসরণ হবে এবং তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকবে। সুতরাং ধর্মীয় ব্যাপারে তোমরা শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে থাকবে।

“হে মানুষ! সম্মানিত বা নিষিদ্ধ মাসগুলো বৈধ দিনের সাথে অদল-বদল করা কুফরী ব্যাপার। কোন মু‘মিন তাতে জড়িত হতে পারে না। কিন্তু কাফেরদের তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তারা এ বছরের (সম্মানিত চার) মাসের এক মাস আগামী বছরের হিসাবে রেখে দেয়। আগামী বছর তা বাকীর হিসাবেও থেকে যায়। এটাই আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে হারামকৃত বিষয়কে হালাল গণ্য করা এবং হালালকৃত বিষয়কে হারাম গণ্য বই কিছু নয়।’ (দেখ), আল্লাহ তা‘আলা প্রথমে আকাশ ও পৃথিবী তৈরি করেন। সময় আবর্তিত হয়ে পুনরায় আজকের বিন্দুতে এসে পড়েছে। আল্লাহ তা‘আলার নিকট মাস হচ্ছে বারটি। তার মধ্যে চারটি হচ্ছে সম্মানিত বা নিষিদ্ধ। তিনটি পরপর (যিলকাদ থেকে মুহাররম) রজব হচ্ছে একলা। এটি জুমাদাল উলা ও শা‘বানের মধ্যবর্তী।

“হে মানুষ! মহিলাদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে। তোমাদের উপরও মহিলাদের অধিকার রয়েছে। মহিলাদের উপর তোমাদের অধিকার হল, তারা অন্য পুরুষকে তাদের নিকটে আসতে দেবে না। এটা তোমাদের জন্য ক্রোধ ও ক্ষোভের কারণ হবে। মহিলাদের নির্লজ্জতা থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে। যদি তারা এরূপ করে, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন, তোমরা তাদেরকে আলাদা শয্যায় শুতে দিবে এবং হালকা দৈহিক শাস্তি দিবে। অতঃপর তারা সংশোধিত হলে যথারীতি তাদের পানাহারের দিকে লক্ষ্য রাখবে। মহিলাদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তারা তোমাদের সাহায্যকারিণী। তারা

১. মহানবী (সা) তাঁর এই বাণীতে পবিত্র কোরআনের সূরা তওবার ৩৭ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। উক্ত আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে, নিষিদ্ধ কালকে অন্য মাসে পিছিয়ে দিয়ে কাফেররা নিষিদ্ধ মাসকে বৈধ মাস হিসাবে গণ্য করে নিষিদ্ধ কাজ করত। -অনুবাদক

নিজেদের জন্য কিছুই রাখে না। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার এই আমানতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছ। আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত বাক্যের (ইজাব-কবুলের) মাধ্যমে তাদেরকে নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছ।

“হে মানুষ! আমার কথাগুলো অনুধাবন কর। কারণ আমি আল্লাহ্ তা'আলার বার্তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। আমি তোমাদের মধ্যে যেসব জিনিস রেখে যাচ্ছি, সেগুলো যদি সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত।

“হে মানুষ! তোমরা আমার কথাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শোন। মনে রেখো এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। এবং সকল মুসলমান পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং নিজের ভাইয়ের সম্মতি ছাড়া তার কোন জিনিস নেয়া কারো জন্য বৈধ নয়। তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করা থেকে বিরত থাকবে।

“হে আল্লাহ্! তুমি শুনছ, আমি তোমার বার্তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছি।”

মহানবী (সা) চাচ্ছিলেন মানুষ যেন তাঁর এই ভাষণ ভাল করে আত্মস্থ করে। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিটি বাক্য থেমে থেমে বলছিলেন। রবীআ প্রতিটি বাক্য উচ্চকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করছিলেন। পুরোপুরি আত্মস্থ করার জন্য মহানবী (সা) ভাষণের মাঝে সমবেতদের নিকট কিছু প্রশ্নও রাখতেন। যেমন তিনি বলেছেন, “তোমরা কি জান আজ কি বার?”

সমবেতরা জবাব দিতেন, “আজ হচ্ছে আকবরের দিন।” মহানবী (সা) বললেন, “স্বরণ রেখ, আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ পরস্পরের জন্য হারাম করেছেন—যেমনটি করেছেন আজকের দিন ও এই মাস।”

ভাষণ শেষ করে তিনি বললেন, “আমি কি আল্লাহ্ তা'আলার বার্তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি?”

সকল দিক থেকে আওয়ায ধ্বনিত হয়, “অবশ্যই।” মহানবী (সা) বলেন, “হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকে; আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।”

দীন পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ

ভাষণ শেষ হওয়ার পর মহানবী (সা) উট থেকে অবতরণ করেন। যোহর ও আসর নামায এক সাথে আদায় করেন। এরপর আবার উটে আরোহণ করেন। সাখরাত নামক স্থানে অবতরণ করেন। সেখানে পবিত্র কোরআনের শেষ আয়াত নাযিল হয়। তখনই তিনি মানুষকে আয়াতটি শুনিয়ে দেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا .

“আজি আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসাবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।”

হযরত আবু বকর (রা) এই আয়াত শুনে কেঁদে ফেলেন। কারণ তিনি তাঁর ঈমানী প্রজ্ঞা দ্বারা বুঝে ফেলেছিলেন, রিসালাতের মিশন যখন সম্পন্ন হয়ে গেছে, আল্লাহ তা'আলা অদূর ভবিষ্যতে মহানবী (সা)-কে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিবেন।

মহানবী (সা) আরাফাত থেকে মুযদালেফায় রওয়ানা দেন। সেই রাত তিনি মুযদালেফায় অতিবাহিত করেন। ফজরের নামাযের পর তিনি মুযদালেফা থেকে রওয়ানা হন। পথে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন। এরপর মিনায় পৌঁছে নিজের তাঁবুতে অবস্থান করেন। মহানবী (সা) মদীনা থেকে কোরবানীর জন্য একশ' উট নিয়ে এসেছিলেন। ৬৩টি উট তিনি নিজের তরফ থেকে কোরবানী করেন। এই হিসাব ছিল তাঁর বয়সের প্রতি বছরের জন্য একটি করে। অবশিষ্ট ৩৭টি হযরত আলী (রা) কোরবানী করেন। এরপর মহানবী (সা) পবিত্র শির মুগুন করেন। তাতে করে ইহ্রাম খুলে তিনি হজ্জের সকল আনুষ্ঠানিকতা থেকে মুক্ত হন।

এই হজ্জকে কেউ কেউ বলেন 'হিজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্জ। কেউ কেউ হিজ্জাতুল ইসলাম, আবার কেউ কেউ হিজ্জাতুল বালাগ নামে অভিহিত করেন। মূলত এই হজ্জের ক্ষেত্রে তিনটি নামই প্রযোজ্য হতে পারে। এটা ছিল মহানবী (সা)-এর শেষ হজ্জ। এই হিসাবে একে বিদায় হজ্জ বলা যায়। কারণ এরপর আর কখনো মহানবী (সা)-এর মক্কা মুকাররমা ও বায়তুল্লাহ যিয়ারতের সুযোগ হয়নি। হাজ্জাতুল ইসলাম এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা ইসলামের সম্পূর্ণতার ঘোষণা এই হজ্জের সময়ই করেন। আর হজ্জাতুল বালাগ বলা হয় এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা যেসব বিষয় মানুষকে অবহিত করার জন্য মহানবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি এই হজ্জের সময় তা সম্পন্ন করেন।

বস্তুত মহানবী (সা) ছিলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। এই দিক থেকে মহানবী (সা)-এর উপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল, এই হজ্জের সময় তিনি তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করেন।

মৃত্যুরোগ ও ইন্তেকাল

বিদায় হজ্জের দিনগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। মহানবী (সা)-এর সাথে হজ্জব্রত পালনের সৌভাগ্য লাভকারী লাখ লাখ মুসলমান নিজ নিজ বাড়িঘরে রওয়ানা দেয়। নজদের অধিবাসীরা নজদের দিকে রওয়ানা দেয়। তেহামার লোকেরা তেহামার দিকে এবং ইয়ামন ও হাযরামাউতের অধিবাসীরা দক্ষিণ দিকে রওয়ানা হয়। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মুহাজির ও আনসারদের সাথে মদীনায় চলে আসেন।

ইতিমধ্যে আরব উপদ্বীপে ইসলামের চরম উন্নতি সাধিত হয়। মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। আরব গোত্রগুলো একের পর এক মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছিল। যে ভূমি এত দিন কলহ-বিবাদের কেন্দ্র ছিল, যেখানে গোত্রীয় বিরোধ একের পর এক মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, ইসলামের বরকতে এখন তা শান্তি ও নিরাপত্তার রাজ্যে পরিণত হয়। বিভিন্ন গোত্রের সরদার এবং বিভিন্ন এলাকার শাসকরা আগে একে অপরের বিরুদ্ধে সব সময় সশস্ত্র থাকত। কোন ব্যাপারে তাদের ঐকমত্য হওয়া ছিল একটা অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু এসব লোকই মহানবী (সা)-এর রিসালাতের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা তাঁকে নেতা হিসাবে স্বীকার করে নেয়। এর প্রধান কারণ ছিল, ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা) তাদেরকে নিজ নিজ পদমর্যাদায় বহাল রাখেন। কোন নও-মুসলিম সরদার কিংবা গোত্রপতিকে তিনি তার পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেননি। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা ইয়ামনে দেখতে পাই। পারস্য সম্রাট সেখানে 'বাদহান' নামক এক ব্যক্তিকে গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। এই লোকটি ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা) তাকে তার পদমর্যাদায় বহাল রাখেন। এর ফলে বাদহান ইয়ামনে ইসলামের একজন উদ্যমী প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। অবশ্য একথা সত্য যে, তখনও আরব উপদ্বীপে কিছু লোক ইসলামের বিশ্বয়কর অগ্রগতিতে জ্বলে পুড়ে ছাই হচ্ছিল। তারা বিদ্রোহ করে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পর্ক হিন্দু করার ফন্দি-ফিকিরে ছিল। কিন্তু মহানবী (সা) তাদের বিরোধিতার এতটুকু পরোয়া করেননি। কারণ সমগ্র আরব উপদ্বীপে তখন মহানবী (সা)-এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ আরব তখন পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার সামনে শির নত করে। আগে যে হৃদয় হেদায়েতের আলো থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল, এখন তারা সত্যের আলোতে দীপ্তিমান হয়ে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদাবনত হয়।

মিথ্যা নবীদের আবির্ভাব

উপরে উল্লিখিত কারণেই আরবের কোন কোন এলাকায় মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের আবির্ভাব শুরু হলে মহানবী (সা) তাদের প্রতি বিশেষ একটা দৃষ্টিপাত করেননি। একথা সত্য

যে, মহানবী (সা)-এর অনন্যসাধারণ সফলতা দেখে আরবের দূর-দূরান্ত এলাকার অধিবাসীরা ভাবে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে কুরাইশ যে মান-মর্যাদা ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তারাও নিজ নিজ গোত্রের নবুয়তের দাবিদারদের মেনে নিলে অনুরূপ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। এই ভেবে তারাও নিজ নিজ গোত্রের মিথ্যা নবীদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকে। তাদের এলাকা মক্কা-মদীনা থেকে অনেক দূরে হওয়ায় মহানবী (সা)-এর সফলতার সত্যিকার কারণ সম্পর্কে তারা পুরোপুরি অবহিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারেনি যে, সারাদেশে ইসলাম সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থার মর্যাদা লাভ করেছে। সুতরাং এর মোকাবেলা সহজ ব্যাপার নয়। তা'ছাড়া সত্য ধর্ম ইসলামের প্রচার-প্রসারে মহানবী (সা) যে সব অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছেন, আরবের ঘরে ঘরে তার আলোচনা হচ্ছিল। মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার বুঝতে পারেনি, আবদুল্লাহ-তনয় ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এ ধরনের দুঃখ-কষ্টের দশ ভাগের এক ভাগ সহ্য করাও সম্ভব নয়। সর্বোপরি মহানবী (সা) সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। আর তাই তিনি কামিয়াব হয়েছেন। কিন্তু অন্যসব নবুয়তের দাবিদারদের পুরো ব্যাপারটাই ছিল মিথ্যার উপর ভিত্তি করে। সুতরাং তারা কি করে সফল হবে?

মিথ্যা নবী তালীহা, আসওয়াদ আনসী ও মুসায়লামা

মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের মধ্যে একজন ছিল তালীহা। সে ছিল বনী আসাদ গোত্রের সরদার। তাকে আরবের অন্যতম বীর গণ্য করা হত। একবার সে তার গোত্রের কয়েক ব্যক্তির সাথে অতিক্রম করছিল। সময়টা প্রচণ্ড গরমের মওসুম। মরুভূমির দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোথাও পানি দেখা যাচ্ছিল না। কাফেলাটা পানির পিপাসায় ছটফট করছিল। হঠাৎ তালীহার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, শিগুগিরই তোমরা পানির সন্ধান পাবে। ঘটনাচক্রে তাই হল। কিছুক্ষণের মধ্যে কাফেলাটি একটি পানির উৎসের নিকট পৌঁছে যায়। এই ঘটনা তালীহার নবুয়তের দাবির একটি উপায় হয়ে দাঁড়ায়। সে এটাকে তার নবুয়তের সপক্ষে একটা মু'জিয়া বা অলৌকিক ঘটনা হিসাবে প্রচার করতে শুরু করে। অবশ্য মহানবী (সা)-এর জীবিতাবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করার সাহস করেনি। মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে তালীহা বিদ্রোহ করে। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ তালীহাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করে।

তালীহা ছাড়া মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের মধ্যে ছিল মুসায়লামা ও আসওয়াদ আনসী। তারা মহানবী (সা)-এর জীবিতকালেই নবুয়তের দাবি করে আসফালন করতে থাকে। মুসায়লামা দু'জন দূতের মারফত মহানবী (সা)-এর নিকট এক চিঠি পাঠায়। তাতে সে লিখে, “আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যেমন নবী করেছেন, আমাকেও তেমনি নবী করে পাঠিয়েছেন। আপনি সমগ্র আরব করতলগত করতে চাইছেন। কিন্তু আরবের অর্ধেক হচ্ছে আমার আর অর্ধেক হচ্ছে কুরাইশদের। কিন্তু কুরাইশ কওম ন্যায়পরায়ণ নয়।” চিঠিটি মহানবী (সা)-কে পড়ে শোনানোর পর তিনি মুসায়লামার পত্রবাহকদের দিকে তাকান। তিনি বললেন, “যদি দূতদের হত্যা করা জায়েয হত, তাহলে আমি তোমাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিতাম। এরপর তিনি মুসায়লামার

চিঠির জবাব প্রদান করেন। তাতে লেখা হয়, “আমি তোমার চিঠি শুনেছি। এটা পুরোটাই মিথ্যা। তুমি আরবের অর্ধাংশের উপর দাবি করেছ। কিন্তু পুরো পৃথিবীর মালিক আল্লাহ তা‘আলা। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন।”

মিথ্যা নবী আসওয়াদ আনসী ছিল ইয়ামনের বাসিন্দা। ইয়ামনে মুসলিম গভর্নর বাজহানের মৃত্যুর পর জোরপূর্বক সে ক্ষমতা দখল করে বসে। সে একজন জাদুকর ছিল। গোপনে তাবিজ-টোনাও করত। এ ব্যবসায়ে তার কিছুটা সুবিধে হয়। এবার সে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। মহানবী (সা)-এর তহসীলদারদের সে ইয়ামন থেকে বের করে দেয়। এরপর সে নাজরান আসে। এখানে ইয়ামনের গভর্নর বাজহানের পুত্রকে হত্যা করে এবং তাঁর স্ত্রীকে জোর করে বিয়ে করে। আসওয়াদ আনসী এই এলাকায় তার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। মহানবী (সা) তাকেও তেমন গুরুত্ব প্রদান করেননি। তিনি আসওয়াদের বিরুদ্ধে নিয়মিত কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেননি। মহানবী (সা) ইয়ামনে তাঁর রাজস্ব আদায়কারীদের লিখে পাঠান, সম্ভব হলে আসওয়াদ আনসীকে গ্রেফতার করবে। নতুবা যে কোন কৌশলে তাকে হত্যা করে ফেলবে। ইয়ামনে অবস্থানকারী মুসলমানরা আসওয়াদের স্ত্রীর সাথে গোপনে যোগাযোগ করেন। তাঁরা তার স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে আসওয়াদকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। এই মহিলা তার প্রথম স্বামী ইবনে বাজহানের হত্যাকারী আসওয়াদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আগে থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। মুসলমানদের এই প্রস্তাব সে খুশীমনে গ্রহণ করে। সে কৌশলে আসওয়াদ আনসীকে শেষ করে।

রোমানদের উপর প্রতিশোধ পরিকল্পনা

মহানবী (সা) আরবের দক্ষিণ দিক থেকে আশংকামুক্ত হয়েছিলেন। কারণ সে এলাকার বাসিন্দাদের প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী (সা)-এর প্রতি আনুগত্যের গৌরব লাভ করেন। কিন্তু আরবের উত্তর দিক সম্পর্কে তখনো তাঁর আশংকা ছিল। কেননা, সেদিকে খৃষ্টানদের রোমান সাম্রাজ্য মুসলমানদের চরম বিরোধী ছিল। এজন্য বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পরই মহানবী (সা) এই আশংকা দূর করার লক্ষ্যে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেন। বস্তুত মুতার যুদ্ধের পরই মহানবী (সা) রোমানদের আক্রমণ আশংকা তীব্রভাবে অনুভব করেন। সে যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। যদি হযরত খালিদ (রা) সামরিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীকে রোমান ঘেরাও থেকে বের করে না আনতেন, প্রতিটি মুসলমান সৈন্যকে রোমানদের হাতে শাহাদাতবরণ করতে হত। এরূপ পরিস্থিতিতে উত্তর সীমান্তের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং সিরিয়ার সাথে মিলিত সীমান্ত এলাকায় মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। তাতে একদিকে রোমানদের আক্রমণাত্মক তৎপরতা প্রতিরোধ হবে, অপরদিকে ফিলিস্তিনে আশ্রয় গ্রহণকারী আরব থেকে নির্বাসিত খৃষ্টান যারা সেখানকার লোকদের সহায়তায় আরবে ফিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করছিল, তাদের সে পরিকল্পনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

এসব কারণে মহানবী (সা) যখনই জানতে পারলেন, রোমানরা আরব সীমান্তে আক্রমণের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছে, তিনি তাদের কোন প্রকার সুযোগ দিলেন না। তিনি একটি বিরাট

মুসলিম বাহিনী সংগঠিত করেন এবং নিজে তাদের নিয়ে তাবুকে পৌঁছান। রোমানরাও মহানবী (সা)-এর এই অভিযানের সংবাদ পেয়ে যায়। তারা জানতে পারে, মহানবী (সা) উত্তর সীমান্ত মরু প্রান্তরে প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মোকাবেলার জন্য এগিয়ে আসছেন। তাতে রোমানরা সাহস হারিয়ে ফেলে। তারা মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা না করে নিজেদের সৈন্যবাহিনীকে সীমান্ত থেকে পেছনে সরিয়ে নেয় এবং দুর্গে অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। তা সত্ত্বেও মহানবী (সা) উত্তপ্ত সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। সব সময় তাঁর আশংকা ছিল, নাজরান ও আরবের অন্যান্য এলাকার নির্বাসিত খৃষ্টানদের পরাজয়ের দরুন রোমান সাম্রাজ্য মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করতে পারে। এমনকি তারা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় লুটতরাজেরও চেষ্টা করতে পারে। এসব কারণে মুসলমানদের বিদায় হজ্জ থেকে মদীনা ফিরে আসার পর সিরিয়া অভিযানের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা) সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন। এই বাহিনীতে হযরত আবু বকর (রা) হযরত ওমর (রা)-এর মতো শীর্ষস্থানীয় মুহাজির ও সাহাবারাও ছিলেন। মহানবী (সা) হযরত উসামা ইবনে যায়েদকে এই বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেন।

উসামার প্রতি মহানবী (রা)-এর উপদেশ

এ সময়ে হযরত উসামা ইবনে যায়েদের বয়স বিশ বছরও অতিক্রম করেনি। এ ধরনের একজন যুবককে শীর্ষস্থানীয় মুহাজির ও অন্যান্য সাহাবার নেতা নিয়োগের ব্যাপারটি মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল। আল্লাহর রাসূলের প্রতি যদি তাদের ঈমান ও আস্থা না থাকত, তারা এই নিয়োগ কিছুতেই মেনে নিত না। একাধিক কারণে মহানবী (সা) হযরত উসামাকে সিরিয়ার অভিযানকারী বাহিনীর নেতা মনোনীত করেন। হযরত উসামার পিতা হযরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে মহানবী (সা) অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হযরত যায়েদ (রা) মৃত্যুর যুদ্ধে খৃষ্টানদের হাতে শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে মহানবী (সা) অত্যন্ত মর্মান্ত হন। মহানবী (সা) হযরত উসামাকে তাঁর পিতার স্থলবর্তী মনোনীত করেন, যাতে তিনি পিতৃহত্যার পুরোপুরি প্রতিশোধ নিতে পারেন এবং পিতার শাহাদাতের বিনিময়ে বিজয়ের গৌরব লাভ করতে পারেন। এই নিয়োগের পেছনে আর একটা কারণ ছিল, মহানবী (সা) এরূপ দায়িত্বে যুবকদের নিয়োগ করে তিনি তাঁদেরকে বিপদ-আপদ সহ্য করা ও মোকাবেলা করায় অভ্যস্ত করে তোলার মনস্থ করেছিলেন।

মহানবী (সা) হযরত উসামাকে নির্দেশ প্রদান করেন, ফিলিস্তিন পৌঁছে মৃত্যুর অদূরে বালকা ও দারোম সীমান্তে যেখানে তোমার পিতা শাহাদাতবরণ করে সেখানে আক্রমণ করবে। ভোরের অন্ধকারে আক্রমণ করবে। শত্রুপক্ষের যাকে পাবে হত্যা করবে। প্রয়োজন হলে আগুনে নিক্ষেপ করতেও দ্বিধা করবে না। শত্রুপক্ষের নিকট সংবাদ পৌঁছার আগেই অত্যন্ত দ্রুত অভিযান সম্পন্ন করবে। অভিযান সম্পন্ন হওয়ার পর সেখানে বিলম্ব করবে না। গনীমতের সম্পদ নিয়ে দ্রুত মদীনা ফিরে আসবে।

১. হযরত উসামা ইবনে যায়েদকে সেনাপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে আর একটা নীতিও কার্যকর ছিল। মহানবী (সা) একজন নবীন সেনাপতি নিয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের এই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, নেতা যে কোন বয়সেরই হোক না কেন, তার প্রতি আন্তরিকভাবে অনুগত থাকতে হবে। -অনুবাদক

মহানবী (সা)-এর অসুস্থতা ও উসামা বাহিনী

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ তাঁর বাহিনী নিয়ে মদীনার অদূরে জুরাফে পৌছান। সেখানে তিনি রওয়ানা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার আগেই মহানবী (সা) অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর পৌঁছায়। দু'এক দিন পর জানা গেল, মহানবী (সা)-এর অবস্থা অবনতির দিকে। এ খবর শুনে উসামা বাহিনীর রওয়ানা মূলতবী হয়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, যে বাহিনীর অভিযানের জন্য মহানবী (সা) এরূপ তাকীদ করেন, সেটা মূলতবি রাখা হল কেন। এর জবাব হচ্ছে, সিরিয়া সফর ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। পথ ছিল সীমাহীন দুর্গম। পথে ছিল ভয়ংকর মরুপ্রান্তর ও বিপদসংকুল বন-বাদার। মহানবী (সা)-কে মদীনায় অসুস্থ ফেলে রেখে এরূপ দীর্ঘ পথ সফর করা মুসলমানদের নিকট এক অসমীচীন ও অসহনীয় ব্যাপার ছিল। কারণ মহানবী (সা) ছিলেন সাহাবীদের নিকট সবকিছুর ঊর্ধ্বে প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব। এরূপ অবস্থায় অসুস্থ নবীকে মদীনায় ফেলে রেখে কি করে তাঁরা বাইরে যাবেন? অথচ তাঁরা জানেন না মহানবী (সা)-এর এই অসুস্থতার পেছনে কী ভবিষ্যত নিহিত রয়েছে। এ পর্যন্ত নবী করীম (সা) মাত্র দু'বার অসুখে পড়েছিলেন। প্রথমবার ষষ্ঠ হিজরীতে। সেবার চরম ক্ষুধায় মহানবী (সা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছুসংখ্যক মুসলমান মনে করেন, ইহুদীরা মহানবী (সা)-কে জাদু করেছে। তাদের এই ধারণা সঠিক ছিল না। দ্বিতীয়বার অসুখ হয়েছিল সপ্তম হিজরীতে। সেবার খায়বরে এক ইহুদী মহিলা মাংসের সাথে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। বিষের প্রতিক্রিয়া নিরাময় করার উদ্দেশ্যে শরীরের দূষিত রক্ত বের করার জন্য মহানবী (সা)-কে শিংগা লাগাতে হয়েছিল।

মহানবী (সা)-এর জীবন পদ্ধতি এবং অন্যদের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কিত শিক্ষা-দীক্ষা থেকেও অনুমান করা যায়, তিনি অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ছিলেন। মহানবী (সা)-এর আহার ছিল অল্প এবং পোশাক-আশাক ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শরীর পরিষ্কার রাখার ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ওয়ূ হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার উত্তম মাধ্যম। কিন্তু নবী করীম (সা) এর জন্য শুধু ওয়ূ যথেষ্ট মনে করতেন না। তিনি মুখ ও দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্য নিয়মিত মেসওয়াক করতেন। তিনি বলতেন, “উম্মতের জন্য যদি একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার না হত, তাহলে আমি তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ প্রদান করতাম।”

মহানবী (সা) সাধারণত ইবাদত ও জীবন ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধ্যাবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। যে কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণের আগে তিনি তাঁর পবিত্রতা ও স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর কিনা লক্ষ্য রাখতেন। ভোগ-বিলাস থেকে দূরে জীবন ও জগতের সাথে এরূপ সম্পৃক্ততা যে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হবে, তিনি স্বাস্থ্যবান ও রোগ-ব্যাধিমুক্ত থাকবেন না কেন। তার উপর তিনি যদি হন জন্মগতভাবে স্বাস্থ্যবান এবং বলিষ্ঠ দেহ-মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী, তাহলে এমনিতেই অসুখ-বিসুখ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এ জন্যই মহানবী (সা)-এর মতো বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিত্ব যখন অজ্ঞাত ব্যাধিতে শয্যাশায়ী, তখন তাঁর সাহাবারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। আর এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না।

বস্তুত এসব সাহাবার চোখের সামনেই মহানবী (সা) দীর্ঘ বিশ বছর জীবন সংহারক বিপদ-আপদের মোকাবেলা করেছেন। তিনি শুধু মানুষকে আহবান জানিয়েছিলেন, ‘তোমরা

পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর। কারণ পৌত্তলিকতার সমর্থনে তোমাদের নিকট এ ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই যে, তোমাদের পূর্বপুরুষরাও এসবের পূজা করত। এই সহজ সরল ও স্পষ্ট আহ্বানের জন্য মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীদেরকে মক্কাবাসীদের অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এমনকি, এক পর্যায়ে তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে সুদূর আবিসিনিয়ায় হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন। শুধু তাই নয়, এই আহ্বানের জন্য মক্কার কুরাইশরা মহানবী (সা)-কে তিন বছর পার্বত্য উপত্যকায় (শেয়াবে আবু তালেব) অবরোধ জীবন যাপনে বাধ্য করে। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী (সা)-কে বায়আতে আকাবার পর ইয়াসরিব বা মদীনায় হিজরত করতে হয়। এই সফর ছিল অত্যন্ত বিপদসংকুল। উত্তপ্ত মরুভূমিতে যে কোন সময় মৃত্যুর আশংকা ছিল। পেছনে ছিল কুরাইশদের আসার ভয়। তদুপরি ইয়াসরিবে কিরূপ সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে, তাও জানা ছিল না। কারণ সেখানে আগে থেকেই ইহুদী পুঁজিপতিরা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছিল।

মদীনায় হিজরতের পর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে বিভিন্ন আরব গোত্র দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করা শুরু করে। এ সময় মহানবী (সা)-এর কর্মব্যস্ততা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। নও-মুসলিমদের শিক্ষা-দীক্ষা, বিভিন্ন প্রতিনিধিদলকে সাক্ষাতদান প্রভৃতি দায়িত্ব মহানবী (সা)-কে সম্পাদন করতে হত। আর এসব কাজ মহানবী (সা)-এর মতো বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারীর পক্ষেই আনজাম দেয়া সম্ভব হয়েছে।

মদীনায় হিজরতের পরও মহানবী (সা) স্বস্তিতে বসতে পারেননি। সংঘবদ্ধ কুরাইশরা তাঁর পেছনে লেগেই ছিল। প্রতি বছর কয়েকবার তারা মুসলমানদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধে এমন সব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যা সামাল দিতে গিয়ে যে কোন যুবক বুড়ো হয়ে যাওয়ার কথা। ওহুদ যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তাতে এক পর্যায়ে মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। মহানবী (সা) পর্বত চূড়ায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। কিন্তু আক্রমণকারী কুরাইশরা এখানেও তাঁর পিছু ছাড়েনি। শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে মহানবী (সা)-এর দুটো পবিত্র দাঁত শহীদ হয়ে যায়। হুনায়েনের কথাই ধরুন, কী ভয়াবহ অবস্থা। ভোরের আলো পুরোপুরি না ছড়াতেই শত্রুরা তীর বর্ষণ শুরু করে। আক্রমণের প্রচণ্ডতা সামলাতে না পেরে মুসলিম বাহিনী দিকবিদিকশূন্য হয়ে পালাতে থাকে। মুসলমানদের এই শোচনীয় দৃশ্য দেখে আবু সুফিয়ানের মতো যুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তি বলেছিলেন, 'তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, তারা সাগরতীরে না পৌঁছে থামবে না।' এরূপ নাজুক পরিস্থিতিতেও আল্লাহর রাসূল রণাঙ্গনে অটল-অনড় থাকেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে বলতে থাকেন, "আরে তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?" ফিরে এসো। আমি রণাঙ্গনে রয়েছি।" মহানবী (সা)-এর পবিত্র কণ্ঠধ্বনি শুনে মুসলমানরা বলীয়ান হয়ে উঠে। তারা ফিরে আসে। অবশেষে হুনায়েনের যুদ্ধে মুসলমানরাই বিজয় ছিনিয়ে আনে।

এসব কিছু ছাড়াও রিসালাতের দায়িত্ব ছিল এক বিরাট ও কঠিন দায়িত্ব। এর এক প্রান্ত ছিল বিশ্বজগত ও তার রহস্যাবলির সাথে গ্রথিত এবং অপর প্রান্ত ছিল মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এই দুই প্রান্তের যোগসূত্রের সম্পাদন ছিল আরো কঠিন। এ

সম্পর্কে মহানবী (সা) নিজেই বলেছেন, “আমাকে সূরা হূদ ও অনুরূপ অন্যান্য সূরা অসময়ে বৃদ্ধে পরিণত করেছে।”

মহানবী (সা)-এর জীবনে এসব ঘটনা ও বিপদ-আপদ তাঁর সাহাবীদের সামনেই ঘটেছে। কিন্তু তাঁর সাহস ও দৃঢ়তায় কখনো কেউ এতটুকু দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করেনি। এমনকি কোন ঘটনার দরুন তিনি হঠাৎ অসুস্থও হয়ে পড়েননি। কিন্তু সকল বিপদ-আপদ ও সমস্যা উৎরাবার পর মহানবী (সা) হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর এই অবস্থা দেখে সাহাবা কিরামের মধ্যে উদ্বেগাকুলতা ছিল অত্যন্ত সঙ্গত ব্যাপার। আর এই কারণেই রাসূলের নির্দেশে গঠিত ও জুরাফে সমবেত মুসলিম বাহিনীর সিরিয়া অভিযান স্থগিত রাখা হয়েছিল। অভিযান স্থগিত রেখে তাঁরা প্রতীক্ষা করছিলেন এরপর আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে কি প্রকাশিত হয় তা প্রত্যক্ষ করার জন্য।

কবরবাসীদের উদ্দেশে নবী করীম (সা)-এর ভাষণ

এ সময়ে আর একটি ঘটনায় সাহাবায়ে কিরাম আরো শংকিত হন। রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রথম রাতেই মহানবী (সা) অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েন। সারারাত ঘুম হয়নি। এই অবস্থা দীর্ঘায়িত হয়। সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল। ফুরফুরে বাতাস বইছিল। এরূপ মনোরম পরিবেশে এক রাতে মহানবী (সা) শহরের বাইরে খোলা মাঠে পায়চারি করতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বিছানা থেকে উঠেন। নিজের খাদেম আবু মুওয়াযহিবাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের বাইরে আসেন। তিনি শহরের বাইরে মুসলমানদের শেষ আশ্রয়স্থল বাকী কবরস্থানে যান। কবরস্থানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবরবাসীদের উদ্দেশে বলেন :

“হে কবরবাসী! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যে অবস্থায় আছ, তাতে সন্তুষ্ট থাক। কারণ তোমাদের এই অবস্থায়, মানুষ যে অবস্থায় আছে, তা থেকে অনেক উত্তম। দেখ! অন্ধকার রাতের অমানিশার স্তরের মতো ফিতনা একের পর এক আসছে। এক ফিতনার পর দ্বিতীয়টি আসছে। দ্বিতীয়টির পর আসছে তৃতীয়টি। তাতে প্রত্যেক দ্বিতীয়টি তার পূর্ববর্তীটি থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ।”

হযরত আবু মুওয়াযহিবা (রা) এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, নবী করীম (সা) আমাকে ডেকে বললেন :

“হে আবু মুওয়াযহিবা! আমাকে বাকি কবরস্থানে সমাধিস্থদের জন্য দোয়া করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তুমিও আমার সাথে চল।”

সুতরাং আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে কবরস্থান পর্যন্ত গেলাম। সেখানে তিনি কবরবাসীদের জন্য দোয়া করার পর আমার দিকে ফিরে বললেন :

“হে আবু মুওয়াযহিবা! আল্লাহ তা‘আলা আমাকে পার্থিব ধন-সম্পদ, অমরত্ব কিংবা বেহেশত ও আল্লাহর দীদার--এই দু’দিকের কোন এক দিক বেছে নেয়ার অধিকার প্রদান করেছেন।”

“আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। আপনি প্রথমে পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও পার্থিব জীবন গ্রহণ করুন। এরপর আল্লাহ তা‘আলার দীদার ও বেহেশত কামনা করুন।”

মহানবী (সা) বললেন : “হে আবু মুওয়াযহিবা! এ হতে পারে না। আমি আমার রবের সাক্ষাত ও বেহেশতই বেছে নিয়েছি।”

হযরত আবু মুওয়াযহিবা (রা) যা দেখেছেন এবং শুনেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন। বস্তুত যে রাতে নবী করীম (সা) বাকী কবরস্থানে যান, তার পরদিন সকালেই অসুখ আরো বেড়ে যায়। তাতে মানুষ অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় হযরত উসামা বাহিনীর অভিযান মূলতবী হয়ে যায়।

কোন কোন ঐতিহাসিক হযরত আবু মুওয়াযহিবার বর্ণনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে শুধু মহানবী (সা)-এর অসুখের অবনতিই হযরত উসামা বাহিনীর রওয়ানা মূলতবি হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল না। বরং শীর্ষস্থানীয় মুহাজির ও আনসাররা এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কাউকে অধিনায়ক না করে একজন যুবককে করায় তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। মহানবী (সা)-এর অসুখের চেয়ে এটা ছিল উসামা বাহিনীর অভিযান মূলতবি হওয়ার প্রধান কারণ। এসব ঐতিহাসিক তাদের অভিমত প্রমাণের জন্য কয়েকটি ঘটনার সহায়তা নিয়েছেন। এসব ঘটনা এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে। আমরা এই অভিমত পোষণকারীদের সমালোচনা করার পক্ষপাতী নই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা)-এর বাকী কবরস্থানে গমন ও সেখানে সমাধিস্থদের জন্য মাগফেরাত কামনার ঘটনা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অনুরূপ এ বিষয়টি মেনে নেয়ার ব্যাপারেও আমাদের কোন প্রকার ওজর-আপত্তি থাকতে পারে না যে, মহানবী (সা) বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত এসে গেছে এবং অচিরেই তিনি আল্লাহ্ তা‘আলার সান্নিধ্য লাভ করতে যাচ্ছেন। এমনকি বর্তমান যুগেও আত্মার সাথে কথোপকথনের ব্যাপারটি অসম্ভব মনে করা হয় না। এই বিদ্যার বিশেষজ্ঞরা বলেন, আত্মার সাথে কথোপকথনের ব্যাপারটা মানুষের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করে। আত্মিক শক্তি প্রবল হলে মৃতদের সাথে দু’এক কথা নয়, অনেক আলাপ-আলোচনা করা যায়। এই কথোপকথনে যেখানে অতীত ও ভবিষ্যত পরস্পরে মিলিত হয়, সেখানে স্থান-কালের শর্তও প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও এই বিদ্যার মূল পদার্থ বা প্রকৃতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন জ্ঞানী-বিজ্ঞানী যখন আত্মার সাথে কথোপকথন স্বীকার করেন তখন হযরত আবু মুওয়াযহিবা (রা)-এর উক্ত বর্ণনা অস্বীকার করার সঙ্গত কোন কারণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে কৌতুক

মহানবী (সা) যে রাতে কবরস্থানে গিয়েছিলেন, তার পরদিন সকালে তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় হযরত আয়েশার মাথা ব্যথা করছিল। তিনি মাথায় হাত দিয়ে চেপে ধরে উহ্ আহ্ করছিলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে নবী করীম (সা) বললেন : “আয়েশা! আমারও প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করছে।” অবশ্য তখনো মহানবী (সা)-এর মাথা ব্যথা শয্যাশায়ী হওয়া কিংবা স্ত্রীদের সাথে হাসিঠাট্টা করার পর্যায় ছাড়িয়ে যায়নি। মহানবী (সা)-এর মাথা ব্যথার কথা প্রকাশ করার পরও হযরত আয়েশার উহ্ আহ্ বন্ধ হয়নি। মহানবী (সা) হযরত আয়েশাকে লক্ষ্য করে বললেন, “আয়েশা! তুমি কিসের চিন্তা করছ। আমার আগে তুমি

মারা গেলে আমি নিজে তোমার গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করব। নিজে জানাযা পড়ব এবং দাফনের ব্যবস্থা করব।”

মহানবী (সা)-এর এই সরস কৌতুকে হযরত আয়েশার মধ্যে নারীসুলভ ভাবাবেগ জেগে উঠে। তা'ছাড়া তখন তিনি যৌবন অতিক্রম করছিলেন। তিনি বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন। তিনি প্রতিউত্তরে মহানবী (সা)-কে বললেন, “আপনি তো এটাই প্রত্যাশা করেন যে, কোন প্রকারে আমাকে মাটির নিচ করতে পারলেই হল। এরপর আমার কক্ষে ফিরে এসে অন্যান্য স্ত্রীদের নিয়ে স্বাদ-আহলাদ করা যাবে।”

হযরত আয়েশার এই জবাব শুনে মহানবী (সা) মৃদু হাসলেন এবং চুপ হয়ে গেলেন। মহানবী (সা)-এর ব্যথা ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। ব্যথার তীব্রতায় হাসি-তামাশা করার মতো মন-মানসিকতা তখন আর তাঁর ছিল না। কিছুক্ষণ পর ব্যথা কিছুটা হ্রাস পায়। মহানবী (সা) তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী প্রত্যেক স্ত্রীর কক্ষে যাওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু পুনরায় ব্যথা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হযরত মায়মুনা (রা)-এর কক্ষে পৌঁছার পর প্রচণ্ড ব্যথায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সব স্ত্রীকে তিনি উক্ত কক্ষে ডাকেন এবং বলেন, “আমার চলার শক্তি নেই। তোমরা আমাকে আয়েশার ঘরে থাকার অনুমতি দান কর।”

মহানবী (সা)-এর শারীরিক অবস্থা দেখে উম্মুল মু'মিনীনরা সবাই খুশি মনে তাঁকে হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করার অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর মহানবী (সা) হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রা)-এর কাঁধে ভর দিয়ে হযরত মায়মুনার কক্ষ থেকে হযরত আয়েশার কক্ষে আগমন করেন। প্রচণ্ড ব্যথায় মহানবী (সা) অস্থির হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল।

অসুস্থ অবস্থায় মসজিদে গমন

অসুখের প্রাথমিক দিনগুলোতে অনেক সময় মহানবী (সা)-এর শরীরের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেড়ে যেত। মনে হত, মহানবী (সা)-এর পবিত্র শরীর থেকে যেন আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর জ্বর কিছুটা হ্রাস পেত। মহানবী (সা) নামায পড়ানোর জন্য মসজিদে যেতেন। কিছু দিন এভাবে চলতে থাকে। মহানবী (সা) মসজিদে যেতেন এবং নামায পড়িয়ে হযরত আয়েশার কক্ষে ফিরে আসতেন। যথারীতি মুসল্লীদের ভাষণ ইত্যাদি দিতেন না। ইতিমধ্যে নবী করীম (সা) জানতে পারেন, কিছু সংখ্যক লোক হযরত উসামার অধিনায়কত্ব সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করছে। তারা বলাবলি করছে, শীর্ষস্থানীয় মুহাজির ও অন্যান্য সাহাবাকে বাদ দিয়ে একজন অল্প বয়স্ক যুবককে সিরিয়া অভিযানে অধিনায়ক করার মধ্যে মহানবী (সা) কী কল্যাণ দেখতে পেলেন। এ ধরনের কথাবার্তা শুনে মহানবী (সা) ব্যাপারটা সূচনাতেই নির্মূল করা প্রয়োজন মনে করলেন। এ সময় প্রচণ্ড জ্বর ছিল। কিন্তু এই অবস্থায়ই তিনি মসজিদে যাওয়ার মনস্থ করেন। উম্মুল মু'মিনীন ও অন্যদের নির্দেশ প্রদান করলেন, “বিভিন্ন সাতটি কূপ থেকে সাত পাত্র পানি এনে আমার শরীরে ঢালার ব্যবস্থা কর। আমি বাইরে গিয়ে মানুষের সাথে কিছু কথা বলব।” অতঃপর সাতটি কূপ থেকে পানি আনা হয়। মহানবী (সা)-এর সহধর্মিণীগণ তাঁকে হযরত হাফসার একটি পাত্রে বসিয়ে পানি ঢালা শুরু

করেন। এক পর্যায়ে মহানবী (সা) বলেন, ব্যস্ ব্যস্, আর প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি কাপড় পরেন। মাথায় পট্টি বাঁধেন এবং মসজিদে যান। মিসরে বসেন। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেন এবং ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য মাগফেরাত কামনা করেন। সমবেতদের উদ্দেশে বলেন :

“বন্ধুগণ! উসামার বাহিনীকে যেতে দাও। আজ তোমরা তার নেতৃত্বের ব্যাপারে আপত্তি করছ। অতীতে তার পিতার নেতৃত্ব সম্পর্কেও আপত্তি করেছিলে। বস্তুত উসামা যেমন নেতৃত্বের যোগ্য, তেমনি তার পিতাও নেতৃত্বের যোগ্য ছিল।” এ পর্যন্ত বলার পর মহানবী (সা) নীরবতা অবলম্বন করেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় ভাষণ শুরু করেন এবং বলেন : “আল্লাহ তা'আলা এক ব্যক্তিকে পার্থিব প্রাচুর্য কিংবা আল্লাহ তা'আলার নিকট পরকালে যা কিছু রয়েছে, তা গ্রহণ করার অধিকার প্রদান করেছেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তাই বেছে নিয়েছেন।”

এরপর মহানবী (সা) আবার নীরবতা অবলম্বন করেন। এ সময়ে সমবেত মুসল্লীরাও নীরব বসেছিল। মনে হচ্ছিল তাদের মাথায় যেন পাখি বসে আছে। তারা আশংকা করছিল, একটু নড়লেই পাখিটি উড়ে যাবে। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) বুঝতে পারলেন, ‘এক ব্যক্তি’ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেকে বুঝিয়েছেন এবং মহানবী (সা) পৃথিবী থেকে বিদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। এই ধারণা হতেই হযরত আবু বকর (রা) আবেগাপ্ত হয়ে পড়েন। তিনি নিজেকে সংবরণ করতে পারছিলেন না। ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেন। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে তিনি নিবেদন করেন :

“হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জীবন এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি আপনার জন্য কোরবান হতে প্রস্তুত।”

রাসূলুল্লাহ (সা) আশংকা করলেন, হযরত আবু বকরের কান্না দেখে অন্যরাও কান্না শুরু করতে পারে। তাতে করে মসজিদ কান্নাকাটির মজলিসে রূপান্তরিত হয়ে পড়বে। মহানবী (সা) হযরত আবু বকরকে নীরব থাকার উপদেশ দিলেন। এই সঙ্গে তিনি হযরত আবু বকরের ঘরের দরজা ছাড়া মসজিদ সংলগ্ন অন্যসব ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। সব ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়ার পর তিনি পুনরায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে বললেন :

“আমার সাথীদের মধ্যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ রয়েছে আবু বকরের। আমার উম্মতের মধ্যে পৃথিবীতে কাউকে বন্ধুত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করার অনুমতি থাকলে আমি আবু বকরকেই করতাম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর সামনে একত্রিত করা পর্যন্ত ইসলামের বন্ধনই বন্ধুত্বের জন্য যথেষ্ট।”

আনসারদের ব্যাপারে মুহাজিরদের প্রতি উপদেশ

এই ভাষণ দেয়ার পর নবী করীম (সা) মিসর থেকে অবতরণ করেন এবং হযরত আয়েশার হুজরার দিকে পা বাড়ান। পুনরায় তিনি সমবেতদের লক্ষ্য করে বলেন :

“হে মুহাজিরগণ! তোমরা আনসারদের সাথে সদ্যবহার করবে। অন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ; কিন্তু আনসারদের সংখ্যা বাড়বে না। আমার আনসাররা বঞ্চিত। অথচ আমি তাদের

নিকট আশ্রয় পেয়েছি। সুতরাং তাদের গুণাবলির মর্যাদা দিবে এবং তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবে।”

মসজিদে ভাষণ শেষে মহানবী (সা) হযরত আয়েশার কক্ষে গমন করেন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি যে পরিশ্রম করলেন, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল অসুখ আরো বেড়ে যাওয়া। মহানবী (সা) শারীরিক দিক থেকে কিরূপ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, এ থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, ঘরের বাইরে গিয়ে মানুষকে কিছু বলার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য তাঁর পবিত্র শরীরে সাত মশক পানি ঢালতে হয়েছিল। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও তিনি মুসলিম উম্মার জন্য চিন্তাশ্রিত ছিলেন। বিভিন্ন চিন্তা তাঁর মন-মস্তিষ্কে সুদৃঢ় ছায়া বিস্তার করছিল। তাই তিনি অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায়ও এসব থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। উসামা বাহিনীর অনিশ্চয়তা, তাঁর অবর্তমানে আনসারদের অবস্থা এবং নবদীক্ষিত উম্মতের ভবিষ্যত--এসব চিন্তাভাবনা মহানবী (সা)-এর মন-মস্তিষ্কে প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল। এসব কারণে তিনি পরদিনও মসজিদে গিয়ে নামায পড়বার মনস্থ করেন। কিন্তু অসুখ বেড়ে যাওয়ায় তিনি ঘরের বাইরে যেতে পারেননি। মহানবী (সা) বললেন, “আমার পরিবর্তে আবু বকরকে নামাযের ইমামতি করতে বল।”

হযরত আয়েশা (রা)-এর ইচ্ছা ছিল, মহানবী (সা) নামায পড়াবেন। কারণ নামায পড়ানটাও এক ধরনের সুস্থতার লক্ষণ ছিল। তিনি নিবেদন করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর কোমলমনা লোক। তাঁর কণ্ঠস্বরও সুউচ্চ নয়। তিনি পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের সময় কান্না সংবরণ করতে পারেন না।” কিন্তু নবী করীম (সা) হযরত আয়েশার এসব কথার গুরুত্ব প্রদান করলেন না। তিনি পুনরায় বললেন, “আবু বকরকে নামায পড়াতে বল।” হযরত আয়েশা (রা) তাঁর অনুরোধ পুনরাবৃত্তি করলেন। এবার মহানবী (সা) উঁচুকণ্ঠে বললেন : নিশ্চয় তোমরাই সেই নারী জাতি, যারা ইউসুফকে ফুসলানোর চেষ্টা করছিলে। আবু বকরকে বল, তিনি যেন ইমামতি করেন।”

সুতরাং নবী করীম (সা)-এর নির্দেশই বাস্তবায়ন করা হল। হযরত আবু বকর (রা) মহানবী (সা)-এর স্থলে ইমামতি করলেন। একদিন হযরত আবু বকরের মসজিদে আসতে কিছুটা বিলম্ব হয়। হযরত বিলাল (রা) হযরত ওমর (রা)-কে নামায পড়ানোর অনুরোধ করেন। হযরত ওমর (রা) বজ্রকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। নবী করীম (সা) হযরত আয়েশার কক্ষ থেকে হযরত ওমরের তাকবীর ধ্বনি শুনতে পান। মহানবী (সা) বললেন, “আবু বকর কোথায়। আবু বকরের পরিবর্তে অন্য কেউ নামায পড়ানটা আল্লাহ তা‘আলা ও মুসলমানরা পছন্দ করেন না।” এই বাণী থেকে কেউ কেউ মনে করেন, মহানবী (সা) তাঁর পর হযরত আবু বকরকে খলীফা মনোনীত করেছেন। কারণ ইমামতি হচ্ছে মহানবী (সা)-এর স্থলবর্তী হওয়ার প্রাথমিক প্রমাণ।

হযরত ফাতেমা (রা)-এর সাথে আলাপ

মহানবী (সা)-এর অসুখ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। জ্বরও প্রচণ্ড বেড়ে যায়। মহানবী (সা)-এর পবিত্র চেহারা কাপড় দ্বারা আবৃত ছিল। উম্মুল মু‘মিনীনগণ কিংবা অন্য কোন খেদমতগার কাপড়ের উপর হাত রাখলেই জ্বরের প্রচণ্ডতা অনুভব করতেন। হযরত ফাতেমা (রা) প্রতিদিন এসে দেখাশোনা করতেন। মহানবী (সা) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যখনই

হযরত ফাতেমা (রা) মহানবী (সা)-এর সামনে আসতেন, তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁর মাথায় চুমো দিতেন। তাঁকে নিজের পাশে বসাতেন। এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও তাঁর এই অভ্যাসের পরিবর্তন দেখা যায়নি। একদিন হযরত ফাতেমা (রা) দেখতে যান। মহানবী (সা) তাঁকে পাশে বসান এবং কানে কানে কি যেন বলেন। মহানবী (সা)-এর গোপন কথাটি শুনে হযরত ফাতেমা (রা) কেঁদে ফেলেন। অতঃপর একইভাবে মহানবী (সা) পুনরায় কি যেন বলেন। এবার হযরত ফাতেমা (রা) হাসেন। হযরত আয়েশা (রা) হযরত ফাতেমাকে এই কান্না ও হাসার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, “আমি আল্লাহর রাসূলের এই গোপন কথা প্রকাশ করব না।”

মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ফাতেমা (রা) নিজের থেকেই ব্যাপারটা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁকে বলেছিলেন, “অসুখ থেকে তিনি আর আরোগ্য লাভ করবেন না।” এ কথা শুনে আমি কেঁদে ফেলি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “আমার পর আমার পরিবারবর্গ থেকে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।” একথা শুনে আমি আনন্দের আতিশয্যে হেসে উঠি।

প্রচণ্ড জ্বরের দরুন একটি পানির পাত্র মহানবী (সা)-এর শিয়রের পাশে রেখে দেয়া হয়। মহানবী (সা) বারবার তাতে হাত ডুবাতেন এবং ভিজা হাত দ্বারা চোখ-মুখ মুছতেন। ইতিমধ্যে মহানবী (সা)-এর চেতনা লোপ পাওয়া শুরু হয়। জ্ঞান ফিরে আসতেই তাঁর পবিত্র চেহারা ব্যথার প্রচণ্ডতার চিহ্ন ভেসে উঠত। একদিন ব্যথা-বেদনা ও ব্যাকুলতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। হযরত ফাতেমা (রা) অস্থির হয়ে বলেন, ওহ! আমার পিতার কীরূপ কষ্ট হচ্ছে! নবী করীম (সা) বললেন, “আজকের পর তোমার পিতার আর কোন কষ্ট হবে না।” মহানবী (সা)-এর এই বাণীর অর্থ ছিল, আজই কোন এক সময় তিনি এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে এমন এক স্থানে যাবেন, যেখানে তাঁকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করতে পারবে না।

নবী করীম (সা)-এর এরূপ ব্যাকুলতা দেখে উপস্থিত সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মানুষকে উপদেশ দিতেন, অসুস্থ অবস্থায় ব্যথা-বেদনা প্রকাশ করবে না। এখন আপনি এরূপ ব্যাকুল কেন।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “এ সময়ে দু’জন অসুস্থ ব্যক্তির যে পরিমাণ কষ্ট হয় আমার একারই তা হচ্ছে।”

কাগজের ঘটনা

মহানবী (সা)-এর শয্যাশায়ী অবস্থায় কয়েকজন সাহাবা তাঁর আশেপাশে বসা ছিলেন। মহানবী (সা) বললেন, “আমার নিকট দোয়াত ও কাগজ নিয়ে আস। আমি তোমাদের কিছু লিখে দেব। তা আমল করলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।” একথা শুনে উপস্থিতদের মধ্যে একজন বললেন, “রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। এরূপ অবস্থায় তাঁকে আরো কষ্ট দেয়া ঠিক হবে না। আমাদের নিকট পবিত্র কোরআন রয়েছে। এটাই আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসাবে যথেষ্ট। পবিত্র কোরআন অনুসরণ করলে আমরা কখনো পথভ্রষ্ট হব না।” কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, এই কথাগুলো হযরত ওমর (রা) বলেছিলেন। এ ব্যাপারে উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। কেউ কেউ বলেন, মহানবী (সা)-এর নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে। তাতে মহানবী (সা)-এর অবর্তমানে মুসলমানদের পথভ্রষ্টতার আশংকা

থাকবে না। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, এরূপ মুমূর্ষু অবস্থায় নবী করীম (সা)-কে কষ্ট দেয়া ঠিক হবে না। আমাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। সাহাবীদের এই কথা কাটাকাটির দৃশ্য দেখে মহানবী (সা) বললেন, “তোমরা আমার সামনে থেকে সরে যাও। নবীর সামনে এরূপ ঝগড়া করা ঠিক নয়।”

পরবর্তীকালে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্তিম সময়ের এই নির্দেশ পালন না করে মানুষ অনেক কিছু হারিয়েছে। কিন্তু হযরত ওমর (রা) এই অভিমতের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলতেন, “আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন—
مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ—“আমি এই কিতাবে কোন কিছু লিখতে ত্রুটি করিনি।”

মহানবী (সা)-এর এই গুরুতর অসুখের খবর দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত উসামা ও জুরফে অবস্থানরত তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা এই সংবাদ শুনে মদীনাতে ছুটে আসেন। মদীনাতে এসে হযরত উসামা (রা) মহানবী (সা)-এর শয্যাপাশে উপস্থিত হন। কিন্তু ইতিমধ্যে মহানবী (সা)-এর কথা বলার শক্তি লোপ পায়। নবী করীম (সা) হযরত উসামাকে সামনে দাঁড়ান দেখতে পান। তিনি দোয়ার উদ্দেশ্যে দু’হাত আকাশের দিকে উঠান এবং এরপর উসামার উপর রাখেন।

ওষুধ পানে অসন্তোষ

মহানবী (সা)-এর এরূপ উদ্বেগাকুল অবস্থা দেখে তাঁর পরিবারবর্গ তাঁকে ওষুধ পান করানোর প্রতি যত্নবান হন। উম্মুল মু‘মিনীন হযরত মায়মূনার এক আত্মীয়া হযরত আসমা (রা) একটি শরবত তৈরি করেন। তিনি আবিসিনিয়ায় নির্বাসিত জীবনে এই শরবতের প্রস্তুত প্রণালী শিখেন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কয়েক ফোঁটা শরবত মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখগহ্বরে দেয়া হয়। জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি শরবতের তিক্ততা অনুভব করেন। মহানবী (সা) বলেন, “আমাকে এই শরবত কেন পান করান হল।” মহানবী (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা) বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে নিমোনিয়া আক্রমণের আশংকা করেছিলাম।” মহানবী (সা) বললেন, “আমাকে তো আল্লাহ তা‘আলা নিমোনিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সে সময় হযরত আব্বাস (রা) ছাড়া ঘরে উপস্থিত সবাইকে উক্ত শরবত পান করার নির্দেশ প্রদান করেন। মহানবী (সা)-এর এই নির্দেশ পালন করা হয়। হযরত মায়মূনা (রা) রোযা রেখেছিলেন। মহানবী (সা)-এর নির্দেশের প্রেক্ষিতে তাঁকেও উক্ত শরবত পান করতে হয়।

শেষ পুঁজি সাদাকার নির্দেশ

রোগশয্যা কালে মহানবী (সা)-এর নিকট সাতটি দীনার ছিল। অসুখ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তিনি আশংকা করেন এই দীনারগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় হয়তো তাঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হতে পারে। তিনি এসব দীনার দান করে দেয়ার জন্য পরিবারের লোকদের নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু মহানবী (সা)-কে নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন তাঁরা মহানবী (সা)-এর এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে ভুলে যান। রোববার দিন ছিল মহানবী (সা)-এর ইহজীবনের

শেষ দিন। এ দিন তাঁর অবস্থার কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। চেতনা ফিরে আসে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, দীনারগুলো কি হল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এগুলো এখন আমার নিকট আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) দীনারগুলো তাঁর নিকট নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদান করেন। দীনারগুলো তাঁর নিকট আনা হলে এগুলো হাতে নিয়ে তিনি বলেন, “এসব দীনার যদি এভাবে থেকে যেত, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট কি ধারণা নিয়ে উপস্থিত হতাম।” এরপর তখনই এগুলো মুসলমান ফকীরদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়।

শেষবার মসজিদে গমন

সেই রাত মহানবী (সা) শান্তিতে অতিবাহিত করেন। জ্বরও কমে যায়। মানুষ মনে করে, পরিবারের লোকেরা ওষুধ পান করানোর ফলে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। মহানবী (সা) বেশ সুস্থ বোধ করেন। ফজরের নামাযের সময় তিনি মাথায় পটি বাঁধেন। হযরত আলী ইবনে আবু তালেব এবং হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা)-এর সহায়তায় মহানবী (সা) মসজিদে যান। এ সময় হযরত আবু বকর (রা) নামায পড়াচ্ছিলেন। মানুষ মহানবী (সা)-কে মসজিদে আসতে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাঁরা জায়নামায পর্যন্ত যাওয়ার জন্য পথ করে দেন। মহানবী (সা) তাঁদেরকে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দেন নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করো না। মানুষকে নামাযে মশগুল দেখে নবী করীম (সা) নিজেও অত্যন্ত আনন্দ বোধ করেন। হযরত আবু বকরও বুঝতে পারেন, নবী করীম (সা) মসজিদে আসছেন। মুসল্লীরা মহানবী (সা)-কে আসার পথ করে দিচ্ছেন। সুতরাং হযরত আবু বকরও নিজের স্থান পরিত্যাগ করে পিছনের সারিতে আসার জন্য উদ্যত হন। কিন্তু নবী করীম (সা) আবু বকরের পিঠে হাত রেখে বলেন, “তুমিই নামায পড়াও।” নিজে হযরত আবু বকরের ডান পাশে বসে যান এবং তাঁর ইমামতিতে নামায আদায় করেন। নামায শেষে সমবেত মুসল্লীদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বলেন :

“হে মানুষ! আগুন জ্বলে উঠেছে। অন্ধকার রাতের অমানিশার মতো ফিতনা ধেয়ে আসছে। আল্লাহর শপথ! আমার নির্দেশ ছাড়া তোমরা অন্য কোন কিছু আঁকড়ে ধরবে না। আল্লাহর শপথ! পবিত্র কোরআন তোমাদের জন্য যা হালাল করেছে আমিও তোমাদের জন্য তাই হালাল করেছি। আর পবিত্র কোরআন তোমাদের জন্য যা হারাম করেছে আমিও তাই হারাম করেছি। আল্লাহ তা‘আলার অভিশাপ সে জাতির উপর, যারা নিজেদের নবীদের মাযারগুলো মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।”

স্বাস্থ্যের উন্নতিতে মুসলমানদের আনন্দ

নবী করীম (সা)-এর অবস্থার উন্নতি দেখে মুসলমানরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে সিরিয়া অভিযানে রওয়ানা দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত আবু বকর (রা) নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। আজ আমার হাবীবা বিনতে খারিজার নিকট যাওয়ার কথা। আমি কি কিছু সময়ের জন্য তার সেখানে যেতে পারি। মহানবী (সা) হযরত আবু বকর (রা)-কে যাওয়ার অনুমতি দান করেন। তাঁর স্ত্রী হাবীবা মদীনার উপকণ্ঠে সুনাহ গ্রামে থাকতেন। তিনি সেখানে চলে যান। হযরত ওমর (রা) ও

হযরত আলী (রা)-ও নিজ নিজ কাজে চলে যান। অন্যান্য মুসলমান যারা গতকাল পর্যন্ত মহানবী (সা)-এর আশংকাজনক অবস্থার দরুন চিন্তাভিত ও ব্যাকুল ছিলেন, মহানবী (সা)-এর অবস্থার উন্নতি দেখে খুশী মনে নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে যান। মহানবী (সা)-ও হযরত আয়েশার কক্ষে ফিরে আসেন। সে সময় মহানবী (সা) যদিও অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন, কিন্তু নামাযের প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণ ও তন্ময়তা দেখে তিনি অত্যন্ত খুশী হন। হযরত আয়েশা (রা)-এর কক্ষে ফিরে আসার পরই নবী করীম (সা)-এর অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। হযরত আয়েশা (রা) যার হৃদয় মহানবী (সা)-এর মতো শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ ছিল, তিনি মহানবীর এই অন্তিম মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করছিলেন। হযরের রোগযন্ত্রণা দেখে তিনি ভাবছিলেন, তাঁর জীবনের বিনিময়েও যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে সুস্থ করে দিতেন।

ইন্তেকাল-পূর্ব সুস্থতা

বস্তুত মহানবী (সা)-এর মসজিদে গমন ছিল ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তের সুস্থতা। ঘরে ঢোকার পরই তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে তিনি পূর্বের তুলনায় দুর্বলতর হয়ে পড়ছিলেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন পৃথিবী থেকে চিরবিদায় ঘনিয়ে আসছে। তাঁর নিকট সন্দেহাতীত ছিল যে, ইহজীবনের আর মাত্র কিছু সময় বাকি আছে। প্রশ্ন জাগে, এই অন্তিম মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সেরা মহামানব কি ভাবছিলেন। এ সময় কি তাঁর মনে নবুয়ত লাভের মুহূর্তগুলো ভেসে উঠছিল, না নবুয়তের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি জীবনে যেসব দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করেছেন, সেগুলো স্মরণ হচ্ছিল? নবুয়তের দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার যেসব নিয়ামত লাভ করেছিলেন, তিনি কি সেগুলোর স্মৃতিচারণ করছিলেন? না সত্য ধর্মে দীক্ষিত করার মাধ্যমে যেভাবে তিনি আরবদের অনুগত করেছিলেন, তার আনন্দ অনুভব করছিলেন? সারা জীবন তিনি যেমন আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা ইস্তিগফার করতেন, অনুরূপ জীবনের শেষ মুহূর্তেও কি তিনি করুণাময়ের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন? নাকি মৃত্যু-যন্ত্রণায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জীবনের সকল ঘটনা বিস্মৃত হয়ে পড়েছিলেন? এ সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে সেদিন তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন। সে দিনটি ৬৩২ খৃষ্টাব্দের আটই জুন। এদিন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। মহানবীর শিয়রের পাশে পানিভর্তি পাত্র রাখা হয়েছিল। মহানবী (সা) তাঁর দুর্বল হাতটি পানিতে রাখছিলেন এবং ভিজা হাত দ্বারা পবিত্র মুখমণ্ডল স্পর্শ করছিলেন।

এ সময়ে হযরত আবু বকর (রা)-এর এক ছেলে একটি মেসওয়াক নিয়ে হযরত আয়েশার কক্ষে প্রবেশ করেন। মহানবী (সা) মেসওয়াক করার আগ্রহ নিয়ে ছেলেটির দিকে তাকান। হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (সা)-এর তাকানোর উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। তিনি ছেলেটির কাছ থেকে মেসওয়াকটি চেয়ে নেন এবং নিজের মুখে চিবিয়ে নরম করে মহানবীর হাতে তুলে দেন। নবী করীম (সা) উক্ত মেসওয়াক দ্বারা নিজের পবিত্র মুখ পরিষ্কার করেন। ইতিমধ্যে মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়। মহানবী (সা)-এর জন্য তা ছিল অসহনীয় ব্যাপার। তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ করে বলেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মৃত্যু-যন্ত্রণায় সাহায্য কর।”

ইন্তেকাল

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় নবী করীম (সা)-এর পবিত্র শির আমার কোলে ছিল। আমি অনুভব করলাম মহানবীর পবিত্র দেহ হঠাৎ ভারী হয়ে গেছে। তাঁর পবিত্র চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখি, চোখ দুটো শক্ত হয়ে আসছে। পবিত্র মুখে উচ্চারিত হচ্ছে, “এখন আমি বেহেশতে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর নিকট যেতে চাচ্ছি।”

এ কথা শুনে আমি বলি, “মহান আল্লাহর শপথ! যিনি সত্য নবী হিসাবে আপনাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তিনি আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার দান করেছিলেন। আপনি আখিরাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন।”

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কোলে হেলান দেয়া অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তার কারণ এই ছিল যে, আমি এ পর্যন্ত কখনো কারো অন্তিম অবস্থা প্রত্যক্ষ করিনি। আমার কম বয়স ও অজ্ঞতার দরুন আমি বুঝতেই পারিনি যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা চলছে। মহানবীর ইন্তেকাল অনুভব করার পর আমি তাঁর পবিত্র শির বালিশে রেখে দেই। এ সময় অন্য মহিলারা কান্নাকাটি করছিল। আমিও তাদের সাথে শামিল হই এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি।

নবী করীম (সা) ইন্তেকাল করেন। কিন্তু কোন কোন মুসলমানের তাঁর অন্তর্ধান বিশ্বাস হচ্ছিল না। এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিরাট বিশৃংখলা দেখা দেয়। আল্লাহ তা'আলা যদি অনুগ্রহ না করতেন এবং তাঁর সত্য ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল না হতেন, তা'হলে আরবদের মধ্যে এই বিশৃংখলার পরিণতিতে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাফন

ইন্তেকালের সংবাদে মুসলমানদের হতবুদ্ধিতা

মহানবী (সা) হযরত আয়েশার কক্ষে এবং তাঁর কোলে মাথা রাখা অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। হযরত আয়েশা (রা) মহানবী (সা)-এর পবিত্র শিরের নিচে একটি বালিশ দিয়ে অদূরে ক্রন্দনরতা মহিলাদের নিকট যান এবং নিজেও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এ সময় যেসব লোক মসজিদে নববীতে ছিলেন, তাঁরা মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়েন। কারণ একটু আগে তাঁরা মহানবীকে ফজর জামাআতে দেখতে পেয়েছেন। বাহ্যিক অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। কেউ একথা কল্পনাও করেননি যে, নবী করীম (সা) এত তাড়াতাড়ি তাদের ছেড়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন। এজন্য হযরত আবু বকরের মতো নিবেদিতপ্রাণ ঘনিষ্ঠতম সহচরও কিছুক্ষণের জন্য সূন্য হামে স্ত্রী হাবীবা বিনতে খারিজার নিকট চলে যান।

হযরত ওমর (রা)-এর অস্বীকৃতি

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর হযরত ওমর (রা) দ্রুত হযুরের পবিত্র দেহের নিকট আসেন। মহানবীর ইন্তেকাল তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল অনাবৃত করেন। পবিত্র দেহের কোথাও বিন্দুমাত্র নড়াচড়ার চিহ্ন দেখতে পাননি। তিনি এই অবস্থাকে সংজ্ঞাহীনতা বলে অভিহিত করেন। তিনি মনে করেন, অবশ্যই মহানবী (সা) খুব তাড়াতাড়ি সংজ্ঞা লাভ করবেন। হযরত মুগীরা ইবনে শ'বা (রা) হযরত ওমর (রা)-কে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। হযরত মুগীরা (রা) পীড়াপীড়ি করলে হযরত ওমর (রা) বলেন, “তুমি মিথ্যে বলছ।” বাইরে এসে মসজিদে এক ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন :

“কোন কোন মোনাফেক রটিয়ে বেড়াচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তেকাল করেছেন। তাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যে। মহানবী (সা) হযরত মূসা ইবনে ইমরানের মতো তাঁর প্রতিপালকের নিকট গেছেন। হযরত মূসাও চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁর সম্প্রদায়ে অনুপস্থিত ছিলেন। এ সময়ে মানুষ বলতে শুরু করেন, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু হযরত মূসা (আ) যেমন ফিরে এসেছিলেন, তেমনি নবী করীম (সা)-ও ফিরে আসবেন। যারা মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের সংবাদ রটাচ্ছে, তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হবে।”

মুসলমানরা এ সময় অত্যন্ত দিশেহারা অবস্থায় ছিল। একদিকে হযরত আয়েশার কক্ষ থেকে মহিলাদের কান্নার রোল ভেসে আসছিল। তাতে মনে হচ্ছিল, মহানবী (সা) এই নশ্বর

পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। অপরদিকে হযরত ওমর (রা) মসজিদে ঘোষণা করছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের সংবাদ মোনাফেকরা রটাচ্ছে। অচিরেই তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে ফিরে আসবেন। তিনি মোনাফেকদের হাত-পা কেটে দেবেন। সাধারণ মুসলমানরা স্থির করতে পারছিল না, তারা কোন্টা বিশ্বাস করবে আর কোন্টা করবে না। এরূপ দিশেহারা অবস্থায় তারা হযরত ওমরের আশেপাশে জড়ো হয় এবং তার ভাষণ শুনতে থাকে। হযরত ওমরের ভাষণ শুনে মানুষ দ্বিধাম্বিত হয়ে পড়ে। বস্তুত পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে, তারা মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের ধারণা করার জন্য মানসিক প্রস্তুতিই নিতে পারছিল না। কারণ একটু আগে তাঁরা মহানবী (সা)-কে মসজিদে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। তারা একথাও ধারণা করছিল যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এখনো রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন হয়নি। এই দুটো বিরাট সাম্রাজ্য অধিকার না করা পর্যন্ত মহানবী (সা) কি করে ইন্তেকাল করতে পারেন? এসব ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা ধীরে ধীরে হযরত ওমরের প্রতি আস্থাশীল হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে প্রবল আশার সঞ্চার হয়, অদূর ভবিষ্যতে মহানবী (সা) তাদের মাঝে ফিরে আসবেন।

হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রত্যাবর্তন

ইতিমধ্যে এই হৃদয়বিদারক খবর পেয়ে হযরত আবু বকরও সূনাহ্ থেকে ফিরে আসেন। তিনি দেখতে পান হযরত ওমর (রা) মসজিদে নববীতে ভাষণ দিচ্ছেন এবং মানুষ তা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছে। কিন্তু তিনি সেদিকে ফিরে তাকাননি। সরাসরি হযরত আয়েশা (রা)-এর হুজরার দরজায় পৌঁছেন এবং ভিতরে যাওয়ার অনুমতি চান। প্রতি-উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আজ কারো অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। হযরত আবু বকর (রা) ভিতরে প্রবেশ করেন এবং মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের আবরণ খোলেন। মহানবীর পবিত্র ললাটে চুমু দিয়ে বলেন, “কত বরকতময় ছিল আপনার জীবন এবং কত পবিত্র ছিল আপনার জীবন! এরপর পবিত্র শির বালিশ থেকে সামান্য উঠিয়ে গভীরভাবে দেখেন। তখন মহানবীর পবিত্র চেহারা জীবিতাবস্থার মতোই সজীব ছিল। হযরত আবু বকর (রা) বলেন, “আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত! আল্লাহ্ তা‘আলার তরফ থেকে আপনার জন্য যে ইন্তেকাল নির্ধারিত ছিল, তাই হয়েছে। এরপর আর কখনো আল্লাহ্ তা‘আলা আপনার উপর ইন্তেকাল নাযিল করবেন না।”

হযরত আবু বকর (রা) একথা বলে মহানবীর পবিত্র শির পুনরায় বালিশে রাখেন। পবিত্র চেহারা চাদর দ্বারা ঢেকে দেন। এরপর তিনি মসজিদে নববীতে আসেন। হযরত ওমর (রা) তখনো মানুষকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছিলেন, নবী করীম (সা) ইন্তেকাল করেননি। মানুষ হযরত আবু বকর (রা)-কে দেখে সামনে যাওয়ার জন্য পথ করে দেন। তিনি হযরত ওমরের নিকট পৌঁছান এবং বলেন, ‘ওমর চুপ কর।’ কিন্তু হযরত ওমর (রা) শুনেও যেন শুনলেন না। তিনি তাঁর বক্তব্য অব্যাহত রাখেন। হযরত আবু বকর (রা) মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং বলেন, “আমি যা বলি মনোযোগ সহকারে শোন।” এরূপ অবস্থায় এমন কে আছে যে, হযরত আবু বকরের কথার প্রতি মনোযোগ দিবে না? কারণ তিনি হচ্ছেন মহানবী (সা)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এজন্য মানুষ হযরত আবু বকরের আহ্বানে দ্রুত সাড়া দেয়। তারা

হযরত ওমরের পরিবর্তে হযরত আবু বকরের প্রতি মনোযোগী হয়। তিনি প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেন। এরপর সমবেতদের উদ্দেশে বলেন :

“হে ভাইসব! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পূজা করত, সে শুনে রাখুক, হযরত মুহাম্মদ (সা) ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু যিনি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা জীবিত আছেন। মৃত্যু কখনো তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।” এরপর তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করেন :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ
انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ - وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا -
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ .

“মুহাম্মদ রাসূল ছাড়া কিছু নয় ; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ শিগগিরই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন?”

হযরত ওমর (রা) দেখলেন, মানুষ হযরত আবু বকরের ভাষণ মনোযোগী হয়ে শুনছে। তিনি নিজেও ভাষণ বন্ধ করে হযরত আবু বকরের কথা শুনতে শুরু করেন। হযরত আবু বকর (রা) পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করার পর হযরত ওমরের পা কেঁপে ওঠে। তিনি মাটিতে পড়ে যান। তাঁর মধ্যে এই প্রত্যয় জন্মে যে, নবী করীম (সা) ইন্তেকাল করেছেন। অন্যান্য মানুষও আয়াতটি শুনে অনুভব করে তারা যেন এটি এর আগে আর কখনো শোনেনি। তাতে করে তাদের মনের সকল প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হয়। তারা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে যে, বাস্তবিকই মহানবী (সা) এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

আসলে কি মহানবী (সা) ইন্তেকাল করেছেন ?

এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়, হযরত ওমর (রা) যেরূপ দৃঢ়তার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তেকাল অস্বীকার করছিলেন এবং অন্যদেরকেও নিজের অভিমতের সমর্থকে পরিণত করার চেষ্টা করছিলেন, এটা কি তাঁর বাড়াবাড়ি ছিল ? এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলব, ‘না, এটা বাড়াবাড়ি ছিল না। তাঁর এই অস্বীকৃতির ব্যাপারে একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। বর্তমান যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে, সূর্যের আলো অত্যন্ত মন্তরগতিতে দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। একদিন এমন আসবে, যখন তাতে বিন্দুমাত্র আলোও থাকবে না। তখন সূর্য একটা কালো ও অন্ধকারময় গোলাকার বস্তুতে পরিণত হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এই অভিমত কি নির্দিধায় গ্রহণ করা যায় ? একথা কি মেনে নেয়া যায়, যে সূর্য আজ পরিপূর্ণ আলো ও প্রখরতার সাথে দীপ্তিময়, তা একদিন বিবর্ণ হয়ে যাবে! এমনকি সূর্য ধ্বংস হওয়ার পরও অবশ্যই পৃথিবী অন্তত এক দিন টিকে থাকবে ? আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও

১. সূরা আলে ইমরান, ১৪৪ নং আয়াত।

উজ্জ্বলতা, প্রখরতা ও শক্তিমত্তার দিক থেকে সূর্যের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিলেন না। সূর্য যেমন তার আলো দ্বারা বিশ্বজগতকে আলোকিত করেছে, তেমনি রাসূলুল্লাহ (সা)-ও ইহজগতে আবির্ভূত হয়ে নিজের শিক্ষা দ্বারা সারা পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন। আর তাঁর শিক্ষার আলো পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সূর্যের প্রভাব যেমন পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে দীপ্তিমান, তেমনি আল্লাহর রাসূলের পবিত্র আত্মাও বিশ্বজগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছায়া বিস্তার করে আছে। সুতরাং হযরত ওমর (রা) যদি মহানবী (সা)-এর ইন্তেকাল অস্বীকার করে থাকেন, তাতে তাঁকে দোষারোপ করা যায় না। কেননা মহানবী (সা) তাঁর গুণাবলির দিক থেকে চিরঞ্জীব, কখনো তাঁর মৃত্যু হতে পারে না।

উসামা বাহিনীর মদীনা প্রত্যাবর্তন

হযরত উসামা (রা) সেদিন ফজরের সময় নবী করীম (সা)-কে মসজিদে তাশরীফ আনতে দেখেন। অপরাপর মুসলমানদের মতো তাঁর মনেও এই প্রত্যয় হয় যে, মহানবী (সা) সুস্থ হয়ে উঠবেন। তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে মদীনা থেকে জুরফে সৈন্য ছাউনির দিক রওয়ানা হন। ছাউনিতে পৌঁছে তিনি সৈন্যদেরকে রওয়ানা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তেকালের খবর এসে পৌঁছে। এই বেদনাবিধুর সংবাদ পেয়েই হযরত উসামা (রা) তাঁর সৈন্য নিয়ে মদীনা ফিরে আসেন। তিনি সৈন্যবাহিনীর পতাকা হযরত আয়েশার হুজরার অদূরে দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং মুসলমানদের পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষায় থাকেন।

সাকীফায়ে বনী সাইদার ঘটনা

এ সময় মুসলমানরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। হযরত আবু বকরের ভাষণের মাধ্যমে তাঁরা নিশ্চিত হল যে, নবী করীম (সা) এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তারা মসজিদে নববী থেকে এদিক-ওদিক চলে গেল। কিন্তু আনসারদের একটি দল সাকীফায়ে বনী সাইদা মহল্লায় তাদের নেতা হযরত সাআদ ইবনে উবাদা (রা)-এর নিকট গিয়ে জড়ো হল। কয়েকজন মুহাজির সাহাবী বনী আবদিল আশহাল মহল্লায় হযরত আবু বকরের বাসস্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এদিকে হযরত আলী, হযরত যোবায়র ইবনে আওয়াম ও হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) হযরত ফাতেমা (রা)-এর বাসস্থানে এসে বসে রইলেন। এরই মধ্যে এক ব্যক্তি এসে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরকে খবর দিলেন, হযরত সাআদ ইবনে উবাদা সাকীফায়ে বনী সাইদায় আনসারদের নিয়ে বৈঠক করছেন। আনসাররা হযরত সাআদ ইবনে উবাদাকে মহানবী (সা)-এর স্থলবর্তী মনোনয়নের জন্য সলা-পরামর্শ করছেন। সংবাদবাহক আরো বললেন, মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের প্রতি যদি আপনাদের কোনরূপ আগ্রহ থাকে, তা'হলে আনসারদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগেই আপনাদের সাকীফায়ে বনী সাইদা পৌঁছা দরকার।

তখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাফন-দাফন হয়নি। মহানবীর পবিত্র লাশ হযরত আয়েশার কক্ষেই ছিল। পরিবারের লোকেরা কক্ষের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন। হযরত ওমর (রা) আনসাদের বৈঠকের কথা শুনে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তিনি হযরত আবু বকরকে বললেন,

“এখনই আমাদের সাকীফায়ে বনী সাইদায় পৌঁছা দরকার। আমাদের দেখতে হবে, আনসাররা সেখানে কি করছে।” এরপর তাঁরা উভয়ে কয়েকজন মুহাজিরসহ সাকীফায়ে বনী সাইদার দিকে রওয়ানা দেন। পথে দু’জন আনসারের সাথে তাঁদের দেখা হয়। তারা জিজ্ঞেস করে, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন। যখন জানতে পারে যে, সাকীফায়ে বনী সাইদায় যাচ্ছেন, তখন তারা বলে, ‘আপনাদের সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না। বরং আপনাদেরকে নিজেদের ব্যাপারে পৃথকভাবে সমাধা করাই উচিত।’ হযরত ওমর (রা) বললেন, “না, অবশ্যই আমাদেরকে সেখানে যেতে হবে।” অতঃপর তাঁরা সাকীফায়ে বনী সাইদায় পৌঁছেন। তাঁরা সেখানে দেখতে পান, এক ব্যক্তি কঞ্চল জড়িয়ে শুয়ে আছে। হযরত ওমর (রা) বললেন, “ইনি কে?” সমবেতরা বলল, তিনি সাআদ ইবনে উবাদা। অসুস্থতার দরুন শুয়ে আছেন। মুহাজিররা বসার পর আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি আল্লাহ্ তা‘আলার প্রশংসার পর বলেন :

“ভাইসব! আপনারা সবাই জানেন, ‘আমরা আল্লাহ্‌র আনসার।’ মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে রণনিপুণ সামরিক শক্তি। হে মুহাজির ভাইসব! আপনারা হচ্ছেন এই ইসলামী সামরিক বাহিনীর একটি অংশমাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয়! আপনাদের এই ক্ষুদ্র দল মদীনা থেকেই আমাদের শিকড় কেটে অধীন করার পরিকল্পনা তৈরি করছেন এবং আমাদেরকে নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছেন।”

আনসারদের উদ্দেশে হযরত আবু বকর (রা)

মহানবী (সা)-এর আমলেও কোন কোন আনসার এরূপ ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করেছে। উপরোক্ত বক্তব্য শোনামাত্র হযরত ওমর (রা) প্রতিউত্তর দেয়ার জন্য উদ্যত হন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) জানতেন, হযরত ওমর (রা) একজন কঠোর স্বভাবের লোক। এজন্য তিনি হযরত ওমরকে চুপ থাকার অনুরোধ করেন। হযরত আবু বকর (রা) নিজে আনসারদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন :

“হে আনসার ভাইসব! আমরা মুহাজিররা সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি। বংশ-মর্যাদার দিক থেকে আমরা দেশের সবার চেয়ে সম্মানিত। আমাদের জন্মস্থান পবিত্র মক্কানগরী। এই শহর আরবের প্রতিটি জনপদ ও শহরের মধ্যে একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সকল সৌন্দর্যের কেন্দ্র হচ্ছে এই শহর। জনসংখ্যার দিক থেকে আমরা আরবের সকল গোত্রের চেয়ে বেশি। আর আত্মীয়তার দিক দিয়ে দেশের যে কোন গোত্র থেকে আমরা মহানবী (সা)-এর ঘনিষ্ঠতর। আমরা তোমাদের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি। পবিত্র কোরআনেও তোমাদের আগে আমাদের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন :

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ

بِإِحْسَانٍ .

“মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রাথমিক অগ্রানুসারী এবং যারা সদনুষ্ঠানের সাথে তাদের অনুগমন করে, আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট।”

আমরা মুহাজির এবং তোমরা আনসার। তোমরা আমাদের ধর্ম সম্পর্কের ভাই। গনীমতের সম্পদে তোমরা আমাদের অংশীদার। যুদ্ধ-বিগ্রহে তোমরা আমাদের সাহায্যকারী। তোমরা নিজেদের যেসব গুণ উল্লেখ করলে আমরা সেগুলোও অস্বীকার করছি না। বস্তুত এসব গুণ অবশ্যই তোমাদের রয়েছে। বরং পৃথিবীতে তোমরাই সবচেয়ে প্রশংসনীয়। কিন্তু আরবের কোন গোত্র কুরাইশ ছাড়া অন্য কারো নেতৃত্ব মেনে নেবে না। এজন্য আমীর বা খলীফা হবে কুরাইশদের মধ্য থেকে এবং মন্ত্রী হবে আনসারদের থেকে।”

হযরত আবু বকর (রা)-এর ভাষণ শেষ হতে না হতে এক আনসার যুবক^১ দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, “এটা হতে পারে না। আমরা তোমাদের অধীনতা মেনে নিতে পারি না। বড় জোর এ হতে পারে যে, একজন আমীর তোমাদের মধ্য থেকে হবেন আর একজন হবেন আমাদের মধ্য থেকে।” হযরত আবু বকর (রা) বললেন, “না, এটা হতে পারে না। আমি প্রথমেই বলছি, আমীর আমাদের মধ্য থেকে হবে এবং উযীর বা মন্ত্রী হবে তোমাদের মধ্য থেকে। ওমর ও আবু উবায়দা বসে আছেন। তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার প্রতি বায়আত বা আনুগত্য প্রকাশ কর।”

এ সময় বেশ হটগোল হতে থাকে। মতপার্থক্য তীব্র আকার ধারণ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে হযরত ওমর (রা) উচ্চকণ্ঠে বললেন, “আবু বকর! আপনি হাত বাড়ান।” হযরত আবু বকর (রা) হাত বাড়িয়ে দেন। হযরত ওমর (রা) তাড়াতাড়ি তার হাতে বায়আত হন। অতঃপর বলেন :

“হে আবু বকর! রাসূলুল্লাহ (সা) কি আপনাকে মুসলমানদেরকে নামায পড়ানোর নির্দেশ প্রদান করেননি? এজন্য আপনিই তাঁর খলীফা। আমরা এজন্য আপনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছি যে, আপনি নবী করীম (সা)-এর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন।”

হযরত ওমরের এই মর্মস্পর্শী বক্তব্য উপস্থিত সবার মনে রেখাপাত করে। দ্রুত তাঁদের মধ্যে এই উপলব্ধি হয় যে, হযরত আবু বকর (রা)-কে ইমাম নিয়োগ করে মহানবী (সা) জীবদ্দশায়ই তাঁর স্থলবর্তী হওয়ার ব্যাপারটির সমাধান দিয়ে গেছেন। কেননা ইমামতি ছিল স্থলবর্তীর প্রাথমিক প্রকাশ। সুতরাং উপস্থিত মুহাজিররা প্রথমে এবং পরে আনসাররা সবাই আন্তরিকতার সাথে হযরত আবু বকরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

মসজিদে নববীতে সাধারণ বায়‘আত

সাকীফায়ে বনী সাইদায় বায়‘আত শেষে পরদিন মুসলমানরা মসজিদে নববীতে সমবেত হয়। হযরত আবু বকর (রা) মিম্বরে উঠে বসেন। এ সময় হযরত আবু বকর (রা) কিছু বলার আগেই হযরত ওমর (রা) উঠে দাঁড়ান। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রশংসার পর সমবেতদের উদ্দেশে বলেন :

“ভাইসব! গতকাল আমি আপনাদের সামনে যেসব কথা বলেছি, সেগুলো আল্লাহর কিতাবে নেই। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকেও আমি কখনো শুনিনি। কিন্তু ভক্তিশ্রদ্ধা ও ভালবাসার আতিশয্যে আমি মনে করেছিলাম, নবী করীম (সা) সব সময় আমাদের মাঝে

১. এই যুবকের নাম হাক্বাব ইবনে মুন্যির। -অনুবাদক

জীবিত থাকবেন। আমাদের সকল বিষয় তিনি সরাসরি তত্ত্বাবধান করবেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তাঁর কিতাব রেখেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-ও এই কিতাব থেকে পথ-নির্দেশ লাভ করেছেন। সুতরাং তোমরা এই কিতাবকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করলে হেদায়েত লাভ করবে, যেমনটি নবী করীম (সা) লাভ করেছেন। যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, আল্লাহ তা'আলা তাঁকেই তোমাদের খলীফা মনোনীত করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘনিষ্ঠতম সহচর। গারে ছওর বা ছওর গুহায় তিনিই রাসূল (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন। এজন্য উঠ এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর।”

হযরত ওমরের ভাষণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সমবেত মুসলমানরা সবাই এগিয়ে গিয়ে হযরত আবু বকরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এ দিনের বায়'আত ছিল বায়'আতে আম বা সাধারণ বায়'আত। তার আগের দিন বনু সাইদায় ছিল 'বায়'আতে খাস' বা বিশেষ বায়'আত। সে বায়'আতে বিশিষ্ট ব্যক্তির অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম খলীফার ভাষণ

সমবেত সবার বায়'আত শেষ হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা) উঠে দাঁড়ান। তিনি সবার উদ্দেশে ভাষণদান করেন। তাঁর এই ভাষণ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার পর তিনি বলেন :

“ভাইসব! তোমরা আমাকে তোমাদের আমীর বা নেতা নির্বাচন করেছ। কিন্তু আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই। আমি ভাল করলে তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে। মন্দ কাজ করলে আমাকে বারণ করবে। সত্য হচ্ছে আমানত আর মিথ্যে হচ্ছে খেয়ানত। তোমাদের দুর্বল লোকটি আমার নিকট শক্তিশালী, যতক্ষণ না তার ন্যায্য প্রাপ্য আমি তাকে প্রদান করতে পারি। তোমাদের মধ্যকার শক্তিশালী লোকটি আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ না তার নিকট থেকে প্রাপ্য আদায় করতে পারি। যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ বন্ধ করে দেয়, আল্লাহ তার উপর অপমান চাপিয়ে দেন। যে জাতির মধ্যে নির্লজ্জতা ছড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তার উপর বিপদ-আপদ ও শাস্তি ব্যাপক করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকব, তোমরা আমার প্রতি অনুগত থাকবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতামূলক কোন কাজ যদি আমার দ্বারা হয়, আমার অনুগত থাকা তোমাদের উপর বাধ্যতামূলক নয়। এখন নামাযের জন্য দাঁড়াও। আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।”

কোথায় রাসূলকে দাফন করা হবে

খেলাফতের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে যে মতপার্থক্য ছিল, সাকীফায়ে বনী সাইদা এবং পরে মসজিদে নববীর সাধারণ সমাবেশে হযরত আবু বকরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের পর তার পরিসমাপ্তি হয়। এদিকে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র দেহ যে খাটে তিনি ইন্তেকাল করেন সেখানেই ছিল। মহানবী (সা)-এর পবিত্র লাশের আশেপাশে তাঁর শোকাত্ত পরিবার-পরিজনরা বসেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর মানুষ মহানবীর

কাফন-দাফনের ব্যাপারে এগিয়ে আসে। এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। নবী করীম (সা)-কে দাফনের ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দেয়। মুহাজিরদের একদল বলেন, মহানবীকে মক্কায়ে নিয়ে দাফন করতে হবে। কারণ পবিত্র মক্কা নগরী তাঁর জন্মভূমি। সেখানে তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে দাফন করা হয়েছে। কেউ কেউ মহানবীকে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে দাফন করার পরামর্শ দেন। সেখানে তাঁর পূর্ববর্তী অনেক নবী-রাসূলকে দাফন করা হয়েছে। বিশ্বয়কর ব্যাপার হল, এই প্রস্তাব কিভাবে করা হল, বুঝে আসে না। কারণ তখনো বায়তুল মোকাদ্দাস রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর রোমান ও মুসলমানদের মধ্যে মুতা ও তাবুক যুদ্ধ থেকে শত্রুতা চলছিল। এমনকি ইত্তিকালের মাত্র ক’দিন আগে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উসামার নেতৃত্বে সিরিয়া অভিযানের নির্দেশ প্রদান করেন। মুসলমানদের অধিকাংশ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা মহানবীর পবিত্র লাশ মক্কায়ে নেয়ার ব্যাপারেও সম্মত হননি। তাঁরা মহানবী (সা)-কে মদীনায়ে দাফনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ মক্কার কাফেরদের অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী (সা) এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানকার অধিবাসীরাই তাঁর সর্বাঙ্গিক সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসে।

মদীনায়ে দাফন করার সিদ্ধান্ত হওয়ার পর প্রশ্ন দেখা দেয়, কোথায় দাফন করা হবে। এ সময় কিছু সংখ্যক মুসলমান প্রস্তাব করেন, নবী করীম (সা)-এর পবিত্র দেহ মসজিদে নববীর মিস্বরের স্থানে দাফন করা হোক। কারণ এখানে দাঁড়িয়ে তিনি খোত্বা প্রদান করতেন। অপর কিছু সংখ্যক বললেন, মিস্বরের পাশে যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি নামায পড়াতেন সে স্থানে দাফন করা হোক। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি হাদীস উদ্ধৃতির প্রেক্ষিতে এই দুটো প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, “মৃত্যুশয্যায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র চেহারা একটি কালো চাদর দ্বারা আবৃত ছিল। রোগ-যন্ত্রণায় কখনো তিনি চাদরটি পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে সরিয়ে দিতেন আবার কখনো জড়িয়ে নিতেন। এরূপ অবস্থায় নবী (সা) বলেন, “যে জাতি তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে, আল্লাহ তা’আলা তাদের ধ্বংস করেন।”

এই ব্যাপারটির মীমাংসা করেন হযরত আবু বকর (রা)। তিনি বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “প্রত্যেক নবী যেখানে ইত্তেকাল করেছেন, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে।”

সুতরাং সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যে স্থানে নবী করীম (সা) ইত্তেকাল করেন, সেখানেই তাঁর কবর খোদাই করা হবে।

নবী করীম (সা)-এর গোসল

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘনিষ্ঠ জনরা তাঁকে গোসল করান। তাঁরা হলেন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা), হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেব (রা), তাঁর দুই পুত্র হযরত ফযল (রা) ও হযরত কুছাম (রা)। এই সঙ্গে ছিলেন হযরত উসামা ইবনে যায়দ ও নবী করীম (সা)-এর দাস হযরত শুকরান (রা)। তাঁরা দু’জন মহানবীর পবিত্র শরীরে পানি

ঢালছিলেন এবং হযরত আলী (রা) গোসল দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র দেহে একটি জামা ছিল। কেউ কেউ জামাটি খুলে ফেলার পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু হযরত আলী (রা) জামা খুলতে অস্বীকার করেন। গোসল দেয়ার সময় আল্লাহর রাসূল (সা)-এর পবিত্র শরীর থেকে সুগন্ধি বেরুচ্ছিল। এ সময় হযরত আলী (রা) বলেন, “আমার পিতামাতা তাঁর জন্য উৎসর্গিত। জীবিতকালেও মহানবীর পবিত্র দেহ থেকে সুগন্ধি ছড়াতো, এখনো তাই হচ্ছে।”

কোন কোন প্রাচ্যবিদ ইন্তেকালের পর নবী করীম (সা)-এর পবিত্র দেহ থেকে সুগন্ধি বের হওয়ার ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জীবিতকালে যেসব জিনিস সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন, তার মধ্যে খোশবু বা সুগন্ধি ছিল অন্যতম। সারা জীবন তিনি এত সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন যে, সেগুলো তাঁর শরীরে মিশে গিয়েছিল। ইন্তেকালের পরও তাঁর পবিত্র দেহ থেকে সেসব বেরুচ্ছিল। গোসলের পর নবী করীম (সা)-কে কাফন পরানো হয়। কাফন ছিল তিনটি চাদর। তার মধ্যে দুটো ইয়ামনের সুহার নামক এলাকার তৈরি ছিল। এ ছাড়া একটি জামা আগেই মহানবীর পরনে ছিল।

শেষ দেখা

কাফন পরানোর পর নবী করীম (সা)-এর পবিত্র জানাযা খাটের উপর রাখা হয়। এ সময় সর্বসাধারণের শেষ দেখার জন্য হাজার দরজা খুলে দেয়া হয়। মুসলমানরা মসজিদের দিকের দরজা দিয়ে কক্ষ প্রবেশ করত। নবী করীম (সা)-কে শেষবারের মতো দেখে তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করে শোক-বিহ্বল অবস্থায় অপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেত। এই অবস্থা দীর্ঘ সময় ধরে চলে।

নামাযে জানাযা

হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা) জানাযা পড়ার জন্য কক্ষ প্রবেশ করেন। মুহূর্তে সারা কক্ষ লোকে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। নবী (সা)-এর জানাযা এক সাথে পড়া সম্ভব হয় না। সাহাবায়ে কিরামকে জামাআত না করে পৃথক পৃথক নামাযে জানাযা পড়তে হয়। সারা কক্ষ লোকে পরিপূর্ণ হওয়ার পর এক গভীর নীরবতা বিরাজ করছিল। হযরত আবু বকর (রা) উচ্চকণ্ঠে বলেন :

১. লেখক অমুসলিম প্রাচ্যবিদদের বস্তুবাদী অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি তা খণ্ডন করেননি। মূলত বস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যারা সব কিছু মূল্যায়ন করেন, ইন্তেকালের পর নবী করীম (সা)-এর পবিত্র দেহ থেকে সুগন্ধি বেরুনোর তাৎপর্য তাদের উপলব্ধি হওয়ার কথা নয়। কারণ এটা হচ্ছে, সৃষ্টির সেরা আমাদের প্রিয়নবীর অলৌকিক ব্যাপার। এই অলৌকিক ব্যাপার বোঝার দিব্যদৃষ্টি তাদের নেই। বরং প্রাচ্যবিদরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটাই অবাস্তব। কারণ কোন সুগন্ধিই চিরস্থায়ী দূরে থাকুক, দীর্ঘস্থায়ী হয় না। জীবিতকালে ব্যবহৃত সুগন্ধি কখনো শরীরে মিশে গিয়ে মৃত্যুর পর সুগন্ধি ছড়ায় না। যদি তাই হত, পাশ্চাত্যের অনেক বিজ্ঞানী লোক যারা সারা জীবন সুগন্ধিতে ডুবে থাকে, মৃত্যুর পর তাদের দেহ থেকেও সুবাস ছড়াতো। তা তো হয় না। এ থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, ইন্তেকালের পর গোসল দেয়ার সময় নবী করীম (সা)-এর পবিত্র দেহ থেকে যে সুবাস ছড়চ্ছিল, তা পার্থিব সুবাস নয়। এ ছিল তাঁর মুজিয়া, অলৌকিক ব্যাপার। দিব্যদৃষ্টি ছাড়া তা উপলব্ধি করা যায় না। -অনুবাদক

“হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর নবী ও রাসূল ছিলেন। আপনি আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছানোর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দীনের পূর্ণ বিজয় দান না করা পর্যন্ত আপনি এ পথে সব সময় সংগ্রামরত ছিলেন। আমরা এ কথাও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহর রাসূল তাঁর প্রতিপালককে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন, তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত করেছেন। তিনি মানুষকে এই শিক্ষা দান করেছেন যে, তারা যেন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করে।”

সমবেত মুসলমানরা হযরত আবু বকরের প্রতি বাক্য আবৃত্তির পর অত্যন্ত তন্ময়তার সাথে আমীন বলতেন। এভাবে পুরুষদের নামাযে জানাযা সম্পন্ন হয়। পুরুষদের পর মহিলাদের আগমন শুরু হয়। মহিলাদের পর আসে শিশুদের পালা। তারা তাদের প্রিয়নবী (সা)-এর দর্শনের সুযোগ লাভ করে ধন্য হয়। আল্লাহর রাসূল (সা)-এর বিয়োগব্যথায় প্রতিটি মানুষ ছিল সীমাহীন ভারাক্রান্ত। এমন কোন লোক ছিল না, যার চোখে-মুখে দুঃখ-বেদনা, হতাশা ও উদ্ভিগ্নতা ভেসে ওঠেনি।

ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা

নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকাল ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা। নবী করীম (সা) ইন্তেকাল করেছেন আজ থেকে চৌদ্দ শ’ (১৪০০) বছর আগে। কিন্তু এখনো এই ঘটনা স্মরণ করার সাথে সাথে দেহমন কেঁপে উঠে। একটু চিন্তা করুন, কী মর্মান্তিক দৃশ্য! হযরত আয়েশার কক্ষে আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টির সেরা মহান ব্যক্তিত্ব চিরনিদ্রায় গুয়ে আছেন। অথচ কাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সারা বিশ্বজগতের জন্য আলোর দিশারী, দয়ার সাগর। তিনিই বিশ্বমানবকে পথভ্রষ্টতা ও অন্ধকারের অমানিশা থেকে উদ্ধার করে ঈমান ও বিশ্বাসের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। দয়া ও স্নেহ-মমতা, সাহসিকতা ও ন্যায়নিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। রাসূল-প্রেমিকরা জীবিতাবস্থায় প্রজাপতির মতো রাসূলের চারপাশে থাকতেন। আর আজ এই লোকগুলোই তাদের প্রিয় রাসূল (সা)-এর বিয়োগব্যথায় একেকটা স্ট্যাচুতে পরিণত হয়েছেন। তাঁরা প্রিয়নবী (সা)-কে শেষবারের মতো দেখে পাশ দিয়ে অতিক্রম করছেন। অন্যদের আসার জায়গা করে দিচ্ছেন। কী মর্মান্তিক দৃশ্য। এত দিন যে মহান ব্যক্তিত্বের দর্শনে ধন্য হত, প্রশান্তি লাভ করত, কাল সে মহান ব্যক্তিত্ব মাটির অন্তরালে চলে যাবেন। তাঁকে আর কোন দিন দেখার ভাগ্য হবে না। এই দৃশ্য কল্পনা করা মাত্র দেহ-মন ভয়ে কেঁপে ওঠে। হাজারো চেষ্টা করেও তা কল্পনায় আয়ত্ত্ব করা যায় না।

আরব গোত্রগুলোর ধর্মত্যাগের প্রবণতা

নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন আরব গোত্রে দুর্বলমনা মুসলমানদের মধ্যে ধর্মত্যাগের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা মদীনার শাসন-শৃংখলামুক্ত হয়ে প্রাক-ইসলামী যুগের যাযাবর ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীন উচ্ছৃংখল জীবনধারায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। মোনাফেকদের অশুভ তৎপরতা, ইহুদী-খৃষ্টানদের রাষ্ট্রদ্রোহিতা

প্রকাশ্য রূপ নেয়। তাতে করে চারদিকে মুসলমানদের শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মক্কার বাসিন্দারাও ধর্ম ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এমনকি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিযুক্ত মক্কার প্রশাসক হযরত আব্তাব ইবনে উসায়দ ধর্মত্যাগের সিদ্ধান্তকারীদের ভয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। এরূপ নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত সুহায়েল ইবনে আমর (রা) অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি মক্কাবাসীদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তেকালের আলোচনা করে বলেন, “এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় ইসলামের শক্তি বাড়বে বই কমবে না। যে ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ করবে, আমরা তার শির উড়িয়ে দিব।” এরপর তিনি বলেন, “হে মক্কাবাসী! তোমরা সবার শেষে ইসলাম গ্রহণ করেছ। এখন সবার আগে ধর্ম ত্যাগকারী হয়ো না। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অবশ্যই ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করবেন।”

হযরত সুহায়েল (রা) ইবনে আমরের তেজোদীপ্ত ভাষণের পর মক্কাবাসীদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়। তারা ইসলামে বহাল থাকে।

কবর খনন

সেকালে আরবে কবর খননের দুটো পদ্ধতি ছিল। একটি ছিল মক্কাবাসীদের পদ্ধতি। তারা সিন্দুকী কবর খনন করত। অপর পদ্ধতিটি ছিল মদীনাবাসীদের। সেটা ছিল বগলী কবর। সে আমলে মদীনায় দু’ব্যক্তি কবর খননে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাদের একজন ছিলেন হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা)। তিনি মক্কাবাসীদের পদ্ধতি অনুযায়ী কবর খনন করতেন। অপরজন ছিলেন হযরত আবু তালহা যায়েদ ইবনে সাহল (রা)। তিনি মদীনার অধিবাসীদের পদ্ধতিতে বগলী কবর খনন করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবর খনন নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। একদল ছিলেন বগলী কবরের পক্ষে, অপরদল সিন্দুকী কবরের পক্ষপাতী ছিলেন। হযরত ওমর (রা) বললেন, ‘এ নিয়ে মতপার্থক্য ঠিক নয়। উভয়ের নিকট লোক পাঠানো হোক। যিনি আগে আসবেন তিনি তাঁর পদ্ধতিতে কবর খনন করবেন।’ সুতরাং হযরত আব্বাস (রা) তাঁদের উভয়ের নিকট লোক পাঠান। ঘটনাচক্রে হযরত আবু উবায়দা বাসায় ছিলেন না। হযরত আবু তালহা (রা) আসেন। তিনি মদীনার প্রথানুযায়ী বগলী কবর খনন করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাফন

রাসূলে করীম (সা)-কে শেষবারের মতো দর্শনার্থীদের আগমন শেষ হতে মধ্যরাত হয়ে যায়। এরপর পরিবারের লোকেরা রাসূলুল্লাহকে দাফন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নবী করীম (সা) যে লাল চাদরকে ব্যবহার করতেন, সেটি কবরে বিছিয়ে দেয়া হয়। পরিবারের যে ক’জন ভাগ্যবান সদস্য নবী করীমকে গোসল করানোর সুযোগ লাভ করেছিলেন, তারাই নবী করীম (সা)-এর পবিত্র দেহ কবরে নামান। পবিত্র দেহ কবরে রাখার পর কাঁচা ইট দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়। এরপর মাটি দ্বারা কবর তৈরি করা হয়। হযরত আয়েশা ও হযরত ফাতেমা

১. কালী কবর খননের পদ্ধতি হচ্ছে, সিন্দুকী কবর খননের পর মৃতের ডান পাশ দিয়ে ভিতর খোদাই করা। -অনুবাদক

(রা) বলেন, মধ্যরাতে কোদালের আওয়ায শুনে আমরা বুঝতে পারলাম রাসূলুল্লাহকে দাফন করা হয়েছে। ইন্তেকালের দু'দিন পর ১৪ রবিউল আউয়াল নবী করীম (সা)-এর দাফন সম্পন্ন হয়।

হযরত আয়েশা (রা) ও মাযার কক্ষ

হযরত আয়েশার কক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দাফন করা হয়। দাফনের পরও তিনি উক্ত কক্ষে অবস্থান করেন। রাসূলের প্রতিবেশি হওয়ায় হযরত আয়েশা (রা) নিজের জন্য গর্ব অনুভব করতেন। হযরত আবু বকরের ইন্তেকালের পর তাঁকে রাসূলের পাশে দাফন করা হয়। অনুরূপ হযরত ওমরও ইন্তেকালের পর তাঁর দুই সঙ্গীর পাশে চির নিদ্রার সুযোগ লাভ করেন। বর্ণিত আছে, উক্ত কক্ষে হযরত ওমরকে দাফনের আগ পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রা) মুখাবরণ ছাড়াই যিয়ারত করতেন। কিন্তু হযরত ওমরকে দাফনের পর তিনি মুখাবরণ ছাড়া সেখানে যাতায়াত বন্ধ করে দেন। এরপর যখনই তিনি মাযার যিয়ারতে যেতেন মুখাবৃত করে রীতিমত পর্দা রক্ষা করে যেতেন।

উসামা বাহিনীর রওয়ানা

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাফন-দাফনের পরই হযরত আবু বকর (রা) তাঁর নির্দেশ পালনে ব্রতী হন। তিনি হযরত উসামা বাহিনীকে সিরিয়া অভিযানে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় হযরত উসামাকে সেনানায়ক করার ব্যাপারে যারা প্রশ্ন তুলেছিলেন, এবারও তাঁরা আপত্তি করেন। এবার হযরত ওমরও আপত্তি উত্থাপনকারীদের সমর্থন করেন। তিনি বললেন, এখন সামরিক অভিযান মূলতবী রাখা হোক। কারণ চারদিক থেকে ধর্ম ত্যাগের খবর আসছে। খোদা না করুন, মদীনায় সামরিক শক্তি না থাকলে শত্রুরা এর সদ্ব্যবহার করতে পারে। তারা মদীনায় হানা দিতে পারে। যদি এই অভিযান মূলতবী রাখা সম্ভব নাই হয়, তবে অন্তত উসামার পরিবর্তে একজন বয়স্ক ও অভিজ্ঞ সেনাপতি নিয়োগ করা হোক। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) উভয় প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি হযরত উসামাকে তাঁর বাহিনী প্রস্তুত করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অভিযানে রওয়ানা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। রওয়ানা দেয়ার সময় হযরত আবু বকরও তাদেরকে বিদায় জানাবার জন্য মদীনার বাইরে যান। এ সময় তিনি হযরত ওমরকে মদীনায় রেখে যাওয়ার জন্য হযরত উসামাকে অনুরোধ করেন। তাতে রাষ্ট্র পরিচালনায় হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকরকে সহযোগিতা করতে পারবেন। হযরত উসামা (রা) হযরত ওমরকে মদীনায় থেকে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। উসামা বাহিনী অভিযানে যাওয়ার বিশ দিনের মধ্যেই বালকা সীমান্ত আক্রমণ করে। এই আক্রমণের মাধ্যমে হযরত উসামা (রা) মৃত্যুর যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী মুসলমান এবং তাঁর পিতা হযরত যায়দ ইবনে হারেছার পুরোপুরি প্রতিশোধ নেন। তাতে করে হযরত উসামা (রা) প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং পরে হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত করেন। উসামা বাহিনী সকল অভিযান শেষে বিজয় কেতন উড়িয়ে মদীনায়

ফিরেন। মদীনায ঢোকার সময় হযরত উসামা যে ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন, এটি ছিল তাঁর পিতার হত্যাকারী। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উসামাকে যে পতাকা প্রদান করেছিলেন সেটি উক্ত ঘোড়ার জিনে উড়ানো ছিল।

নবীদের উত্তরাধিকার

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ফাতেমা (রা) একদিন খলীফা হযরত আবু বকরের নিকট যান। হযরত ফাতেমা (রা) নবী-দুহিতা হিসাবে সম্পদের অংশ দাবি করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ফাদাক ও খায়বরে যে জমি রেখে গেছেন তা থেকে তাঁর অংশ দিয়ে দেয়া হোক। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, ‘আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, “আমরা নবীরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন অংশীদার রেখে যাই না। যা কিছু আমরা ছেড়ে যাই সেটা সাদাকা গণ্য করতে হবে।” অতঃপর হযরত আবু বকর (রা) বলেন, তা সত্ত্বেও আপনার পিতা যদি এই সম্পত্তি আপনার নামে হেবা করে গিয়ে থাকেন, আপনি দাবি করায় আমি উক্ত সম্পত্তি আপনাকে দিয়ে দেব।’

হযরত ফাতেমা (রা) বললেন, ‘নবী করীম (সা) এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলেননি। তবে উম্মে আয়মান (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এসব জমি আমাকে হেবা করে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।’ একথা শোনার পর হযরত আবু বকর (রা) ফাদাক ও খায়বরের জমিগুলো বায়তুলমালে জমা করে দেন।

রাসূলের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার

রাসূলুল্লাহ (সা) এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এখানকার কোন নশ্বর বস্তু তিনি কারো জন্য রেখে যাননি। যে অবস্থায় তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন, ঠিক একই অবস্থায় তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। কিন্তু মানবজাতির জন্য পবিত্র ইসলাম ও ইসলামী তাহজীব-তামাদুনরূপী সম্পদ রেখে গেছেন। এর সজীবতা দানকারী ঝর্ণাধারা থেকে তৃষ্ণার্ত পৃথিবী কেয়ামত পর্যন্ত পিপাসা নিবারণ করতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাবের আগে পৃথিবী থেকে তাওহীদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি এসে পুনরায় তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেন। পৌত্তলিকতার সকল নিদর্শন থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করেন। তিনি মানুষকে পারস্পরিক সদ্যবহার, স্নেহ-মমতা এবং প্রতিটি ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠতার প্রতি লক্ষ্য রাখার শিক্ষা দান করেন। নিজের অবর্তমানে আল্লাহর কিতাবকে মানুষের হেদায়েত ও রহমতের উৎস হিসাবে রেখে যান। তিনি ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য উত্তম আদর্শ। তিনি যা বলেছেন, নিজের জীবনে তা বাস্তবায়িত করে গেছেন। মৃত্যুশয্যায় একবার ভাষণ দানকালে তিনি বলেছেন :

“হে মানুষ! আমি যদি কারো পিঠে বেত্রাঘাত করে থাকি, আমার পিঠ প্রস্তুত, সে তার প্রতিশোধ নিতে পারে। আমার মুখ থেকে যদি কারো সম্পর্কে অপ্রীতিকর কথা বেরিয়ে থাকে, সে এখন অনুরূপভাবে আমার উপর প্রতিশোধ নিতে পারে। আমার নিকট যদি কেউ কিছু পাওনা থাকে, আমার সম্পদ থেকে সে তার প্রাপ্য নিয়ে নিতে পারে। এসব লোক সম্পর্কে আমার মনে কিছুমাত্র হিংসা-বিদ্বেষ হবে না। কারণ কারো সম্পর্কে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা আমার স্বভাবে নেই।”

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই ভাষণের পর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তিন দিরহাম দাবি করে। রাসূল (সা) তা সঙ্গে সঙ্গে পরিশোধ করেন। এরূপে আমাদের প্রিয়নবী এক অনুপম আধ্যাত্মিক সম্পদ রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই সম্পদ কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। তা থেকে পৃথিবীর প্রতিটি শ্রেণী এবং প্রতিটি যুগের মানুষ অংশ লাভ করবে, উপকৃত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ধর্মের সাহায্য করবেন। এই ধর্মকে প্রতিটি বাতিল ধর্মের উপর বিজয়ী করবেন। তাতে করে আল্লাহ্র ধর্ম কাফেরদের হিংসা-বিদ্বেষের কারণ হবে। এটা আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি। আর তা অবশ্যই পূরণ হবে। পরিশেষে আমরা রাসূলে পাকের পবিত্র আত্মার প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করে এই আলোচনা সমাপ্ত করছি।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اٰمِيْن .

সমাপ্ত





ইনভার্মিক ফাউন্ডেশন

imahirul07@gmail.com